দুই বাংলার
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্পাদনা
লীলা মজুমদার ☐ এখলাস্‌উদ্দিন আহ্‌মদ

নির্বাহী সম্পাদক ঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

মডেল পাবলিশিং হাউস ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ঃ ৭০০ ০৭৩

Dui Banglar Chhotoder Shrestha Galpa
A collection of juvenile stories.
Edited by Lila Mazumdar & Ekhlasuddin Ahmad.

Managing Editor: Biswanath Bhattachariya

প্রথম সংস্করণ : মহালয়া ১৯৬৩

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা : পূর্ণেন্দু পত্রী
স্কেচ : নিতাই ঘোষ
অলংকরণ : রবীন দাস

জয়দেব ঘোষ কর্তৃক ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০ ৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং দি বোস প্রিন্টিং হাউস ৫৫ ধনদেবী খান্না রোড কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

ফটো টাইপ সেটিং :
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার
৬৯ শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলায় ছোটদের গল্পের রাজ্য বিশাল। দুই বাংলা মিলে এর পরিধি বিশালতর। খণ্ডে খণ্ডে ছোটদের গল্পের সংকলন দু'দেশেই হয়তো অনেক আছে। কিন্তু দুই দেশের এই গল্পগুলোকে একত্রিত করে এক জায়গায়, অর্থাৎ দু'মলাটের মধ্যে পাওয়া—সম্ভবত আগে কখনোই হয়নি।

আমাদের প্রয়াস সেই দুই বাংলাকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। দেশের বিভিন্ন বেড়াজাল,নানা প্রথাগত নিয়মকানুন সবকিছু ডিঙিয়ে দু'দেশের লেখকদের নিয়ে এক জায়গায় উপস্থিত হতে পারা—এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। দুই বাংলার লেখকদের লেখার সঙ্গে ছবিও এঁকেছেন দুই বাংলার শিল্পীরা।

সম্পাদকদ্বয়ের পরামর্শ, গল্প বাছাই, খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা—এই সংকলনকে সুসংবদ্ধ করতে পেরেছে। তাঁদের সাহায্য ছাড়া আশা করি এই গ্রন্থ প্রকাশনার কথা ভাবা অসম্ভব। প্রত্যেকেই তাঁদের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে এ কাজের সুষ্ঠু রূপ দিয়েছেন।

এ বই প্রকাশনায় প্রেস বাইণ্ডার, শিল্পী, প্রুফ রীডার প্রত্যেকেরই অবদান যথেষ্ট। সবাইকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

বিনীত
জয়দেব ঘোষ

ভূমিকা

মানুষের চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও স্ফূরণ হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে এক যুগের শেষ হয়ে গেল, অন্য এক নতুন যুগ এল, এ কথা বলা শোভা পায় না। কারণ সাহিত্য হল যা সঙ্গে সঙ্গে যায়। তার মধ্যে যেটুকু অদরকারি হয়ে পড়ে, কিম্বা কালের অনুপযোগী মনে হয়, তাকে সরিয়ে রেখে সাহিত্য ক্রমেই এগিয়ে যেতে থাকে। কিছু বাতিল হয় না। তবে অযত্নে লোকে তাকে ভুলে যাবার ভয় থাকে। আবার কোনো দিন কোনো সাহিত্যপ্রেমিক তাকে আবিষ্কার করেন। এই সব কারণে মনে হয়, ৫/১০ বছর পর পর সেই সময়টুকুর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে সে যুগের গুণী লেখকদের কথা সাহিত্য প্রেমিকরা ভুলতে পারেন না। এ-কথা বিশেষ করে ছোট গল্প, কবিতা আর রম্যরচনার বেলা খাটে। আরেকটি অব্যর্থ কথা আছে যা বিশেষ করে ছোটদের গল্পের বেলা খাটে। তাদের কি ভালো লাগে সেটি বুঝবার বিধিদত্ত ক্ষমতা থাকলেও তাদের কি কি পড়া উচিত সেটা বুঝবার বুদ্ধি তাদের থাকে না। কি করে থাকবে? তারা কি কি খাওয়া উচিত, তা বোঝে? কি পরা উচিত, তাও বোঝে? না কি-ভাবে দিন কাটানো উচিত, তা-ই বোঝে? তবে সুখের বিষয় ভালো জিনিস ধরে দিলে, তাদের ভালো লাগে। সাহিত্যের বেলাও তাই। বেছে বেছে ভালো জিনিসটি হাতে ধরিয়ে দিতে পারলে, আপনা থেকেই তাদের রুচি গড়ে ওঠে; তখন ভালো জিনিসটি নিজেরাই চিনতে পারে। তাহলে ছোটদের কেমনধারা জিনিস দেওয়া হবে? না, যা পড়লে ওদের ভালো হবে, আবার পড়তেও ওদের ভালো লাগবে। নইলে সব পণ্ড হবে। প্রসাদগুণ না থাকলে ছোটদের বই অচল। সব পাঠ্য পুস্তককে আমি সাহিত্য বলি না, যদিও সাহিত্যও পাঠ্য পুস্তক হতে পারে।
এই বইখানিতে গত ৭০/৮০ বছরের মধ্যে লেখা কিশোর সাহিত্য থেকে ৫০ জন লেখকের রচনা নির্বাচন করা হয়েছে পশ্চিমবাংলা থেকে আর ৫০ জন বাংলাদেশের লেখা। এখানে একটা মজার কথা মনে রাখতে হবে। ঐ ৫০ জন পশ্চিমবাংলার লেখকের মধ্যে অনেকেরি আদি বাস পূর্ব-বাংলায়। তাদের মধ্যে আমিও একজন বলে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। লেখকের পা-দুখানি কোথায় রইল, সেটা সব চাইতে বড় কথা নয়। মনটি কোন দিকে উড়ল তাই নিয়েই কথা; কত সময় ভিক্টোরীয় যুগের কোনো হয়তো অখ্যাত লেখকের দু-ছত্র লেখা পড়ে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে, এ রহস্য কেই বা জানে।
তবে দেশের মাটির একটা প্রভাবও থাকে বই কি। কিছু নিয়মকানুনও এক দেশে যেমন চলে, অন্য দেশের লোকেরা হয়তো তা ভেবেও দেখেনি। কিন্তু মানুষের তৈরি নিয়মকানুনের উপরে মানবিকতা বলে যে একটা জিনিস কাজ করে, সেটির আবেদন মেনে না চললেই নয়। ছোটদের জন্য লেখাতে কোনো বিকট, নিষ্ঠুর, হিংস্র, অপরিষ্কার উপাদান থাকলে চলবে না, এ কথা জগতের সব মা-বাবারাই নিশ্চয় মানেন। অথচ বিদেশে কমিক্স্ নামে যা চলেছে, তার বেশির ভাগই ঐ সব বস্তুগুলোকেই মূলধন রূপে ব্যবহার করছে এবং বাংলাতেও তার অবিকল অনুকরণ দেখে মর্মাহত হয়েছি। কমিক্স্কে মন্দ বলছি না; রসের কবিতার মতো কমিক্স্ও জলের মতো হতে পারে। তা হলেও তাকে আমি সাহিত্য বলি না।

ছবির ঠেকো না পেলে যা দাঁড়ায় না, তাকে আমি সাহিত্য বলি না; অতিশয় উপাদেয় হলেও নয়। সাহিত্যের অবলম্বন ভাব আর ভাষা,লিখিত অক্ষর পর্যন্ত দরকার নেই। মুখে মুখেই সে সব ছড়া গল্প অমর হয়ে থাকে। আদি রচয়িতা যে কে তাও লোকে ভুলে যায়। ক্রমে বোঝা যায় ভাষার ভূমিকাটিও ভাবের চাইতে ছোট। ঐ সব অমর রচনা, যে ভাষাতেই অনুবাদ হক না কেন, সে দেশের লোকে লুফে নেয়। কোথায় যে তার আদি মূল তাও শেষটা বোঝা যায় না। এই সব লোক কথা, রূপ কথা, ছড়ার গান হল গিয়ে ছোটদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ধন। এবং আমাদের এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছোট। কিন্তু বাদ যায়নি।

পশ্চিমবাংলার ৫০টি গল্পের শুরু রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এবং শেষ আজকের তরুণ লেখকদের দিয়ে। তাও বহু সম্ভাবনাময় গুণীকে বাদ দিতে হল।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়; সেটি হচ্ছে গল্পের বিষয় বৈচিত্র। এই বৈচিত্রই হল বাংলা কিশোর সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। সব কিছুর নমুনা দেওয়া যায়নি। দুঃখের বিষয়, আজকাল অধিকাংশ গুণী লেখকরা কিশোরদের জন্য লেখেন, অর্থাৎ যাদের বয়স অন্ততঃ বড় ১০/১২। প্রথম যুগের বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিশুদের জন্যেই প্রধানত লিখতেন। তাঁদের পরেই উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ ইত্যাদির জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী মনে হয় আরেকটু বড়দের জন্য। উপেন্দ্রকিশোরের রামায়ণ মহাভারত ছোটদের ভালো লাগলেও, 'মহাভারতের গল্প' বইটির রস গ্রহণ করতে হলে আরেকটু বড় হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ, সে, খাপছাড়া—এ সবের রসগ্রহণ করতে বোধ হয় শিখতে হয়। আসলে রবীন্দ্রনাথের বঞ্চিত শৈশব এর জন্য দায়ী। সারা জীবন তিনি ছোটদের জন্য ভেবেছেন, যার মূলমন্ত্র হল ছোটদের প্রকৃতির বুকে ছেড়ে দেওয়া যাক; প্রকৃতির মতো মাস্টার-মশাই আর কেউ নেই। নিজে যা যা পান নি, তার সব কিছুই তিনি ছাত্রদের দিতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গুরুর আসন ছাড়তে পারেন নি। ছোটদের ভালোবেসেছেন, ওদের জন্য চিন্তা করেছেন, কিন্তু ওদের দলে ভিড়তে পারেননি। যে ছেলে কখনো গাছে চড়ে আম পাড়েনি, মার্বেল খেলার সাথী পায়নি, কারো সঙ্গে মারামারিও করেনি, সে যে কত বঞ্চিত, বিশ্বকবিকে দেখে তা বোঝা যায়। তিনি নিজেও সেটা জানতেন বলে মনে হয়। ছোটদের জানতেন, বুঝতেন, কিন্তু নিজে ছোট হয়ে যেতে পারতেন না। তাই ওঁর ছোটদের বিষয়ে গল্প কবিতা এত মর্মস্পর্শী, কিন্তু ছোট হবার মন্ত্রটি কবে তাঁর হারিয়ে গেছিল।

এই বইতে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বনফুল, দুই বিভূতিভূষণ ও কল্লোল যুগের লেখকদের থেকে আরম্ভ করে এখনকার সেরা লেখকরা আর কমবয়সী, স্বীকৃতি পাওয়া এবং সমান গুণী কিছু স্বীকৃতি না পাওয়া বেশ কিছু গল্পকার স্থান পেয়েছেন। দুঃখের বিষয় তার চাইতেও অনেক বেশি স্থানাভাবে বাদ পড়েছেন। আমার মতে যিনি একটিমাত্র প্রথম শ্রেণীর অনন্যসাধারণ গল্প দেশের কিশোরদের উপহার দিয়েছেন, তাঁর স্থান যাঁরা শতাধিক দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্প লিখেছেন, তার উপরে। লেখক বাছাই করার চাইতে লেখা বাছাই করা ভালো। মানের চাইতে গুণ বড়।

এই ধরনের সংগ্রহ প্রকাশ করে মডেল পাবলিশিং দেশসেবার মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। ৫ বছর অন্তর ঐ ৫ বছরের লেখা থেকে বাছাই করা একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলে দুই বাংলা কৃতার্থ হবে। ইতি—

লীলা মজুমদার

সূচীপত্র

দুই বাংলার
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

কর্তার ভূত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, "তুমি গেলে আমাদেব কী দশা হবে।"

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, "আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে।"

তা বলে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, "ভাবনা কী। লোকটা ; হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।"

২

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই । না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, "এই চোখ বুজে হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম কীটাণুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস ;।"

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিচ্ছুই না থাক্—অন্ন হোক, বস্ত্র হোক,

স্বাস্থ্য হোক—শান্তি থাকে।

কত-যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ

অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

৩

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

৪

এ দিকে দিব্যি ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো'। সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, 'বর্গি এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি-চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "এমন হল কেন।"

তারা একবাক্যে শিখা নেড়ে বললে, "এটা ভূতের দোষ নয়, ভূতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন।"

শুনে সকলেই বললে, "তা তো বটেই।" অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক্, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, "খাজনা দাও।" আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, "খাজনা দাও।"

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে 'খাজনা দেব কিসে।'

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হুঁশ ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, "বেহুঁশ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।"

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

৫

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না 'খাজনা দেব কিসে'।

শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা করে তার উত্তর আসে, "আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।"

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরও একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, “ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।”

শুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, “কী সর্বনাশ। এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে সনাতন ঘুমের কী হবে—সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের ?”

প্রশ্নকারী বলে, “সে তো বুঝলুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়।”

মাসিপিসি বলে, “বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।”

অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, “যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।”

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, “চুপ। এখনো ঘানি অচল হয় নি।”

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, “কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি।”

কর্তা বলেন, “ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।”

তারা বলে, “ভয় করে যে কর্তা।”

কর্তা বলেন, “সেইখানেই তো ভূত।”
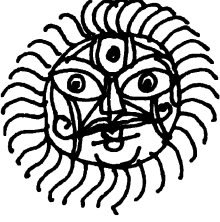
সাত মার পালোয়ান

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক রাজার দেশে এক কুমার ছিল ; তার নাম ছিল কানাই।

কানাই কিছু একটা গড়িতে গেলেই তাহা বাঁকা হইয়া যাইত ; কাজেই তাহা কেহ কিনিত না। ন্তু তাহার স্ত্রী খুব সুন্দর হাঁড়ি কলসী গড়িতে পারিত। ইহাতে কানাইয়ের বেশ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। সে সকল মেহন্নত তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে ফেলিয়া সুখে বেড়িয়া বেড়াইতে পারিত। কিন্তু । স্ত্রী বড়ই রাগী ছিল, কানাইকে আলস্য করিতে দেখিলেই সে ঝাঁটা লইয়া আসিত। সুতরাং । উপর বেচারার কষ্টই ছিল বলিতে হইবে।

একদিন কানাইয়ের স্ত্রী কতকগুলি হাঁড়ি রোদে দিয়া বলিল, 'দেখ যেন কিছুতে মাড়ায় না।'

কানাই কিছু চিঁড়ে আর ঝোলাগুড় এবং একটা লাঠি লইয়া হাঁড়ি পাহারা দিতে বসিল। এক-একবার চিঁড়ে খায় আর এক-একবার হাঁড়ির পানে তাকাইয়া দেখে, কিছুতে মাড়াইল কি ।

কানাইয়ের ঝোলাগুড়ের খানিকটা কেমন করিয়া হাঁড়ির উপর পড়িয়াছিল, অনেকগুলি মাছি । তাহা খাইতে বসিয়া গেল। কানাই তাহা দেখিয়া বলিল, 'বটে! হাঁড়ি মাড়াচ্ছ? আচ্ছা, !' এই বলিয়া সে তাহার লাঠি দিয়া মাছিগুলোকে এমন এক ঘা লাগাইল যে তাহাতে ছিও মরিয়া গেল, হাঁড়িও গুঁড়া হইয়া গেল।

কানাই গনিয়া দেখিল যে, সাতটা মাছি মরিয়াছে। তাহাতে সে লাঠি বগলে করিয়া ভারি হইয়া বসিয়া রহিল। হাঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রী ঝাঁটা হাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা ল, 'কি হয়েছে?' কানাই কথা কয় না। তাহার স্ত্রী যতই জিজ্ঞাসা করে, সে খালি আরো র হইয়া যায়।

শেষটা যখন তাহার স্ত্রী বাড়াবাড়ি করিল, তখন সে চোখ লাল করিয়া বলিল, 'দেখ্, হিসেব করে কথা কোস্। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস ?'

কানাই আর কাহারো সঙ্গে কথা কয় না। বেশি পীড়াপীড়ি করিলে খালি বলে, 'হিসেব করে কথা কোস্। এক ঘায় সাতটা মেরেছি, জানিস ?'

শেষে একদিন কানাই এক থান মার্কিন দিয়া মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিল। বনের ভিতর হইতে বাঁশ কাটিয়া একটা ভয়ানক মোটা লাঠি তয়ের করিল। তারপর পিরান গায়ে দিয়া কোমর বাঁধিয়া, ঢাল হাতে করিয়া জুতা পায় দিয়া, রাজার বাড়িতে পালোয়ানগিরি করিতে চলিল। যাইবার সময় তাহার স্ত্রীকে বলিয়া গেল—'আমি আর তোদের এখানে থাকব না। আমি এক ঘায় সাতটা মারতে পারি।'

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে, 'কানাই, কোথায় যাও ?' কানাই সে কথার কোন উত্তর দেয় না। সে মনে করিয়াছে যে এখন হইতে আর কানাই বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিবে না। সে এক ঘায় সাতটা মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন কি আর তাহাকে কানাই ডাকা সাজে ? এখন তাহাকে বলিতে হইবে, 'সাতমার পালোয়ান।'

রাজার নিকট গিয়া কানাই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহার সেই এক থান মার্কিনের পাগড়ি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি হে ? কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমার নাম সাতমার পালোয়ান। আমি এক ঘায় সাতটাকে মারতে পারি।'

কানাই রাজার বাড়িতে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। এখন তার দিন সুখেই যায়।

ইহার মধ্যে একদিন সেই রাজার দেশে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত। সে মানুষ মারিয়া, গরু বাছুর খাইয়া, দৌরাত্ম্য করিয়া দেশ ছারখার করিবার জোগাড় করিল। যত শিকারী তাহাকে মারিতে গেল, সব কটাকে সে জলযোগ করিয়া ফেলিল। রাজামহাশয় অবধি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'দেশ আর থাকে না।'

এমন সময় কোথাকার এক দুষ্ট লোক আসিয়া রাজার কানে কানে বলিল, 'রাজামহাশয়, এত যে ভাবছেন, তবে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে পালোয়ান রেখেছেন কি করতে ? তাকে ডেকে কেন বাঘ মেরে দিতে হকুম করুন না।'

রাজা বলিলেন, 'আরে তাই ত ! ডাক্ পালোয়ানকে !'

রাজার তলব পাইয়া কানাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন, 'সাতমার পালোয়ান, তোমাকে ঐ বাঘ মেরে দিতে হবে। নইলে তোমার মাথা কাটব।'

কানাই লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা মহারাজ, এখনি যাচ্ছি।' ঘরে আসিয়া কানাই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায়, হায় ! এমন সুখের চাকরিটা আর রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝি প্রাণটাও যায় ! কানাই বলিল, 'এখন আর কি ? বাঘ মারতে গেলে বাঘে খাবে, না গেলে রাজা মারবে। দূর হোক গে, আমি আর এদেশে থাকব না।'

সেদিন সন্ধ্যার পর কানাই তাহার পাগড়িটা মাথায় জড়াইয়া, কোমরটা আঁটিয়া বাঁধিল। এক হাতে ঢাল, আর-এক হাতে ডান্ডা, পিঠে পুঁটুলি, পায়ে নাগরা জুতো। সকলে মনে করিল সাতমার পালোয়ান বাঘ মারিতে চলিয়াছে। কানাই মনে করিল, এ রাজার দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভাল। একটা ঘোড়া হইলে আরো শীঘ্র শীঘ্র যাওয়া হইত

ততক্ষণে বাঘ করিয়াছে কি, এক বুড়ির ঘরের পিছনে চুপ মারিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছাটা, বুড়ি

কিংবা তাহার নাতনী একটিবার বাহিরে আসিলেই ধরিয়া খাইবে। বুড়ি ঘরের ভিতরে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছে। তাহার বাহিরে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। এতক্ষণে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িত, খালি নাতনীটার জ্বালায় পারিতেছে না। বুড়ি অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঘুম পাড়াইতে পারে নাই। শেষে রাগিয়া বলিল, 'তোকে বাঘে ধরে নেবে।' নাতনী বলিল, 'আমি বাঘে ভয় করি না।' বুড়ি বলিল, 'তবে তোকে ট্যাঁপায় নেবে।'

বাস্তবিক ট্যাঁপা বলিতে একটা কিছু নাই, বুড়ি তাহার নাতনীকে ভয় দেখাইবার জন্যই ঐ নামটা তয়ের করিয়াছিল। কিন্তু বাঘ ঘরের পিছন হইতে ট্যাঁপার নাম শুনিয়া ভারি ভয় পাইয়া গেল! সে মনে মনে বলিল, 'বাস রে! আমাকে ভয় করে না, কিন্তু ট্যাঁপাকে ভয় কববে! সেটা না জানি কেমন ভয়ংকর জানোয়ার। যদি একবার সেই জানোয়ারটা এই দিক দিয়ে আসে, তা হইলে ত মুশকিল দেখছি।'

অন্ধকারে বসিয়া বাঘ এইরূপ ভাবিতেছে, আর ঠিক এমনি সময় কানাই সেই পথে পলায়ন করিতেছে। বাঘকে দেখিয়া কানাই মনে মনে ভাবিল, 'বাঃ, এই ত একটা ঘোড়া বসে আছে!' এই বলিয়াই সে কোমরের কাপড়টা খুলিয়া বাঘের গলায় বাঁধিল।

অন্ধকারে বাঘকে কানাই ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। বাঘও কানাইকে তাহার পাগড়ি-টাগড়ি সুদ্ধ একটা নিতান্তই অদ্ভুত জন্তুর মতন দেখিল। একটা মানুষ হঠাৎ আসিয়া যে তার মতন জন্তুর সামনে এতটা বেয়াদবি করিয়া বসিবে, এ কথা তাহার মাথায় ঢুকে নাই। সে বেচারা নেহাত ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল—'এই রে, মাটি করেছে। আমাকে ট্যাঁপায় ধরেছে!'

কানাই ভাবিল, 'ঘোড়া যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াতাড়ি কিসের? ঘরে একটু ঘুমুই, রপর শেষরাত্রে ঘোড়ায় চড়ে ছুট দেব।' এই ভাবিয়া সে বাঘকে তাহার বাড়ির পানে টানিয়া চলিল। বাঘ বেচারা আর কি করে! সে মনে করিল, 'এখন ট্যাঁপার হাতে পড়েছি, এর

কথামতনই চলতে হবে।'

বাড়ি আসিয়া কানাই বাঘকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া দরজা আঁটিয়া দিল। তারপর বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, 'শেষ রাত্রেই উঠে পালাব।'

কানাইয়ের ঘুম ভাঙিতে ভাঙিতে ফরসা হইয়া গেল। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘোড়া আনিতে গিয়া দেখে—সর্বনাশ! বাঘ যে ঘরে বন্ধ আছে! বাহিরে আসিয়া তাহাকে খাইতে পারিবে না, সে কথা তখন তাহার মনেই হইল না। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া দরজায় হুড়কা আঁটিয়া বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এদিকে সকালবেলা সকলে সাতমার পালোয়ানের বাড়িতে খবর লইতে আসিয়াছে, বাঘ মারা হইল কি না। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, বাঘ ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া গিয়া রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, দেখুন এসে, সাতমার পালোয়ান বাঘকে ধরে এনে ঘরে বেঁধে রেখেছে!'

রাজামহাশয় আশ্চর্য হইয়া সাতমার পালোয়ানের বাড়ি চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে সত্যই বাঘ ঘরে বাঁধা। ততক্ষণে কানাই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আসিয়া রাজামহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজা বলিলেন, 'সাতমার, ওটাকে মার নি কেন?'

কানাই বলিল, 'মহারাজ, আমি এক ঘায় সাতটাকে মারি, ও যে শুধু একটা!'

এখন হইতে সাতমার পালোয়ানের নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল। রাজামহাশয় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মাইনে পাঁচ শত টাকা করিয়া দিলেন। কানাইয়ের দিন খুব সুখেই কাটিতে লাগিল।

কিন্তু সুখের দিন কি চিরকাল থাকে? দেখিতে দেখিতে কানাইয়ের আর এক নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবারে বাঘ নয়, আর-একটা রাজা। সে অনেক হাজার সৈন্য লইয়া এই রাজার দেশ লুটিতে আসিয়াছে। এ রাজাটা নাকি বড়ই ভয়ানক লোক, তাহার সঙ্গে কিছুতেই আঁটা যায় না।

রাজামহাশয় বলিলেন, 'সাতমার, এখন উপায়? তুমি না বাঁচালে আমার আর রক্ষে নেই! তোমাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, যদি এবার বাঁচিয়ে দিতে পার।'

কানাই বলিল, 'রাজামশাই, কোন চিন্তা করবেন না, এই আমি যাচ্ছি! আমাকে একটা ভাল ঘোড়া দিন।'

রাজার হুকুমে সরকারি আস্তাবলের সকলের চাইতে ভাল যুদ্ধের ঘোড়াটি আনিয়া কানাইকে দেওয়া হইল!

কানাই আজ দুই থান মার্কিন দিয়া পাগড়ি বাঁধিল। পোশাকটাও দস্তুর মতন করিল। মনে মনে কিন্তু তাহার মতলব এই যে, যুদ্ধে যাইবার ভান করিয়া একবার ঘোড়ার পিঠে চড়িতে পারিলেই পলায়নের সুবিধা হয়।

কিন্তু হায়, সেটা যে যুদ্ধের ঘোড়া কানাই তাহা জানিত না। সে বেচারা যতই ঘোড়াটাকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে চায়, ঘোড়া কিছুতে রাজি হয় না। যুদ্ধের বাজনা শুনিয়া ঘোড়া যখন নাচিতে লাগিল, কানাইয়ের তখন পিঠে টিকিয়া থাকা ভার হইল। শেষে ঘোড়া তাহার কোন কথা না শুনিয়া একেবারে যুদ্ধের জায়গায় গিয়া উপস্থিত। পথে কানাই লতাপাতা গাছপালা খড়ের গাদা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে ঘোড়া থামিল না। সেই গাছপালা আর খড়ের গাদা সবসুদ্ধই সে কানাইকে

লইয়া ছুটিল।

এদিকে সেই বিদেশী রাজার সৈন্যরা শুনিতে পাইয়াছে যে এদেশে একটা সাতমার পালোয়ান আছে, সে এক ঘায় সাতটাকে মারে—বাঘকে ধরিয়া আনিয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখে! এ কথা শুনিয়াই তাহারা বলাবলি করিতেছে, 'ভাই,ওটা আসিলে আর যুদ্ধ-টুদ্ধ করা হইবে না। বাপরে, এক ঘায় সাতটাকে মারিবে।'

এমন সময় সাতমারের ঘোড়া সেই দুই থান মার্কিনের পাগড়ি আর সেই-সব গাছপালা আর খড়ের গাদা সুদ্ধ সাতমারকে লইয়া আসিয়া দেখা দিল! দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটা পাহাড়-পর্বত ছুটিয়া আসিতেছে। বিদেশী রাজার সৈন্যরা তাহা একবার দেখিয়া আর দুবার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল না। একজন যেই চেঁচাইয়া বলিল, 'ঐ রে আসছে। এবারে গাছ পাথর ছুঁড়ে মারবে।' অমনি মুহুর্তের মধ্যে সেই হাজার হাজার সৈন্য চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে কোথায় ছুটিয়া পলাইল তাহার ঠিকানা নাই।

কানাই দেখিল যে বিদেশী সৈন্য সব পলাইয়াছে, খালি তাহাদের রাজাটা ছুটিতে পারে নাই বলিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কানাই মনে মনে ভাবিল, 'এ ত মন্দ নয়! পালাতে চেয়েছিলুম, মাঝখান থেকে কেমন করে যুদ্ধে জিতে গেলুম! এখন রাজাটাকে বেঁধে নিলেই হয়!'

আর কি! এখন ত সাতমার পালোয়ানের জয়জয়কার! অর্ধেক রাজ্য পাইয়া এখন সে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।
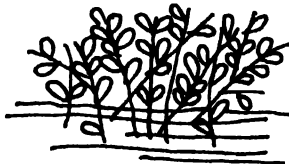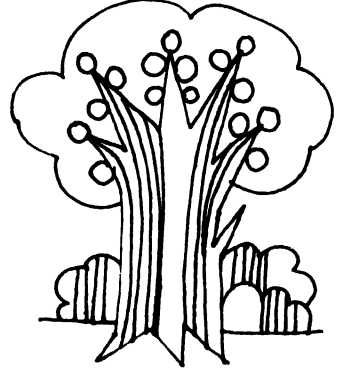
কারিগর ও বাজিকর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কারিগর যেখানে থেকে কারিগরি করে সে দেশে কাজ হয় আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে। এতটুকু বীজ যেমন হয়ে ওঠে মস্ত গাছ আস্তে আস্তে, গুটিপোকা যেমন আস্তে ধীরে হয়ে ওঠে রঙিন প্রজাপতি, সেইভাবে কাজ চলে কারিগরি-পাড়ায়। হঠাৎ কিছু হবার জো নেই সেখানে। আর বাজিকর-পাড়ায় যেখানে বাজিকর কারসাজি করে সেখানে সবই অদ্ভুত রকমের হঠাৎ হয়ে যায়। হাউয়ের পাঁকাটি ফোঁস করে আকাশে উঠে ঝর-ঝর করে তারা-বৃষ্টি করে পালায়। লাল বাতি হঠাৎ সবুজ আলো দিয়ে দপ করে জ্বলেই নেভে—হয়তো কোথাও কিছু নেই একটা বোমা হাওয়াতে ফাটল আর রাতের আকাশ দিনের সমস্ত জানা-অজানা পাখির কিচমিচিতে ভরে গেল।

কারিগরকে কেউ বড়ো-একটা চেনে না, কিন্তু বাজিকরের নাম ছেলে-বুড়ো রাজা-বাদশা ফকির সবার মুখেই শোনা যায়। পয়সাও করে বাজিকর যথেষ্ট আজগুবি তামাসা দেখিয়ে।

এক সময় রাজসভায় কারিগর আর বাজিকর দুজনেরই কাজ দেখাবার হুকুম হল। যেখানে যত কারিগর যত বাজিকর সবাই যে-যার গুণপনা দেখাতে হাজির আপনার আপনার দলের সর্দারকে নিয়ে। দুই দলের মধ্যে এক মাস তেরো দিন লড়াই চলেছে, কোনো দল জেতেও না হারেও না। ভূত-চতুর্দশীর দিন রাজা দিলেন ছুটি দুই সর্দারকে শেষ হার-জিতের জন্য প্রস্তুত হতে।

ভূত-চতুর্দশীর সারা রাত বাজিকরের ঘরে কারো ঘুম নেই। পঁচিশ গণ্ডা চেলা, তারা লোহাচুর করতে বসে গেল, তাই নিয়ে বাজিকর অদ্ভুত সব বাজি করলে যা কেউ কখনো দেখে নি। তার উপর গাছ-চালা নল-চালা থেকে আরম্ভ করে যা-কিছু বিষয় তার ছিল সব একত্র করে সে একটা মস্ত সিন্দুক ভর্তি করে ভোর না হতে রাজ-বাড়িতে গিয়ে হাজির হল, সঙ্গে পঁচিশ গণ্ডা চেলা,

তারা তাল ঠুকে ডিগবাজি করে যেন সভা চমকে তুললে।

রাজা সভা করে বসে আছেন, রানীরা আড়াল থেকে উঁকি দিতে লেগেছেন। বাজি শুরু হয়, কিন্তু কারিগরের দেখা নেই। রাজা ব্যস্ত হয়ে বলেন—'গেল কোথায় ?'

বাজিকর হেসে বলে—'মহারাজ, সে তার একগণ্ডা চেলা নিয়ে বোধহয় রাতারাতি চম্পট দিয়েছে। অনুমতি দেন তো বাজি কাকে বলে দেখাই!'

বলেই বাজিকর একলাফে আকাশে উঠে হাওয়ার উপর তিন-চারটে পাক খেয়ে ঝুপ করে একেবারে রাজার ঠিক সিংহাসনটা বাঁচিয়ে মাটিতে সোজা এসে দাঁড়াল! সভার চারি দিকে হাততালি আর সাধুবাদ শুরু হয়ে গেল। সেই সময় বাজিকর বিদ্যের সিন্দুক খুললে। অমনি চরকি বাজির মতো বন্-বন্ করে, ছুঁচো বাজির মতো চড়-বড় করে বাজির ধূম লেগে গেল এমন যে কারুর চোখে মুখে দেখবার বলবার অবসর রইল না। রাজা মহা খুশি হয়ে গজমোতির মালা খুলে বাজিকরকে দেন—এমন সময় কারিগর এসে হাজির হল একলা।

রাজা তাকে দেখে বললেন—'তুমি কোথায় ছিলে, এমন বাজিটা দেখতে পেলে না!'

কারিগর একটু হেসে বললে—'এইবার তবে আমার পালা মহারাজ ?'

বাজিকর তাকে ধমকে বললে—'তোমার পালা কি রকম ? এতক্ষণ এসে পৌঁছতে পারো নি, বেলা শেষ হয়েছে, যাও!'

রাজা বাজিকরকে থামিয়ে বললেন—'না, তা হয় না। সময় আছে, এরই মধ্যে যা পারে ও দেখাক কারিগরি।'

একদিকে কারিগর আর-এক দিকে বাজিকর। কারিগর একটা পাখির পালক বাজিকরের হাতে দিয়ে বললে—'এইটে ওড়াও।'

বাজিকর পালকটা নিয়ে ফুঁ দিতেই সেটা উড়ে গিয়ে সভা ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল। সভাসুদ্ধ কারিগরকে দুয়ো দিয়ে উঠল।

তখন কারিগর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে—'এইবার আমায় উড়াও তো দেখি কত বড়ো বাজিকর!'

সভাসুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল, কী হয়! বাজিকর ফুঁ দেয়, কারিগর হেলেও না!

খানিক পরে বাজিকর চোখ রাঙিয়ে বললে—'কই তুমিই আমায় ওড়াও তো দেখি কত বড়ো কারিগর!'

কারিগর একটু হেসে বাঁশিতে ফুঁ দিতেই একধার থেকে একটা লোহার পাখি সভার মধ্যিখানে কারিগরের চেলারা এনে হাজির করলে। কারিগর বাজিকরকে বললে—'এগিয়ে এসো। পাখির পিঠে চড়ে পড়ো, কেমন না-ওড়ো দেখি।'

কলের পাখির বিকট চেহারা দেখে বাজিকর শুকনো মুখে রাজার দিকে চাইতে রাজা বললেন—'আচ্ছা হয়েছে, আর পরীক্ষায় কাজ নেই, ছেড়ে দাও।'

বাজিকর তখন বললে—'সে কী মহারাজ, ও আমায় ওড়াবে কী? লোকটা আগে নিজেই উড়ুক তো দেখি কেমন পারে! আমি মনে করলে এখনি ওর পাখিসুদ্ধ ওকে পালকের মতো এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারি। শুধু ছেলেমানুষ বলে এতক্ষণ রেহাই দিয়েছি। আর না, দেখাচ্ছি মজা এবার!'

কারিগর হাসতে হাসতে আপনার হাতে গড়া পাখির উপর সওয়াল হল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পাখি রঙিন আলোয় ডানা মেলে কারিগরকে নিয়ে মাটি ছেড়ে খুব আস্তে আস্তে আকাশে উঠতে আরম্ভ করলে। রাজা সাধুবাদ দিতে যাবেন এমন সময় বাজিকর পাখিটার পেটের তলায় দাঁড়িয়ে একটা মন্তর আউড়ে চারটে ফুঁ দিয়ে বললে—'দেখেন মহারাজ। এবার একেবারে উড়ল। যাঃ ফুঃ! আর আসিসনে, ভাগ্!'

পাখি সন্ধ্যার অন্ধকারে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর ফিরল না।

রাজা বললেন—'এ বাজিকরটা যা বললে, তাই তো করলে!'

রাজা বাজিকরকেই বকশিশ দিলেন।

কারিগর খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখে সভা শূন্য। কা কস্য পরিবেদনা। শুকনো মুখে অন্ধকারে শুধু তার একগণ্ডা চেলার মধ্যে মোটে একজন গালে হাত দিয়ে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়। বাকি চেলারা বাজিকরের কাছে বিদ্যে শিখতে চলে গেছে।
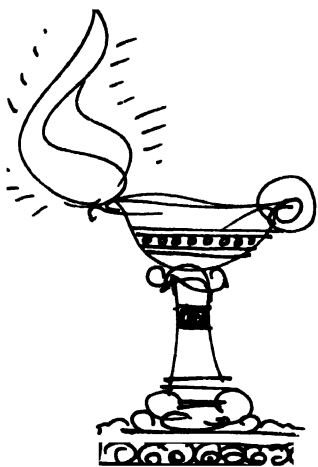
লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তার ডাকনাম ছিল লালু। ভাল নাম অবশ্য একটা ছিলই, কিন্তু মনে নেই। জানো বোধ হয়, হিন্দীতে 'লাল' শব্দটার অর্থ হচ্ছে—প্রিয়। এ-নাম কে তারে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সঙ্গতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।

ইস্কুল ছেড়ে আমরা গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম, লালু বললে, সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেদারি শুরু করে দিলে। আমরা বললাম, লালু, তোমার পুঁজি ত দশ টাকা। সে হেসে বললে, আর কত চাই, এই ত ঢের।

সবাই তাকে ভালবাসতো, তার কাজ জুটে গেল। তার পরে কলেজের পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম, লালু ছাতি মাথায় জনকয়েক কুলি-মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটখাটো মেরামতির কাজে লেগেছে। আমাদের দেখে হেসে তামাশা করে বলতো—যা যা দৌড়ো—পারসেণ্টেজের খাতায় এখুনি ঢ্যারা পড়ে যাবে।

আরও ছোটকালে যখন আমরা বাংলা ইস্কুলে পড়তাম, তখন সে ছিল সকলের মিস্ত্রী। তার থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামানদিস্তার ডাঁটি, একটা নরুণ, একটা ভাঙ্গা রি, ফুটো করবার একটা পুরোনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল,—কি জানি কোথা সে এ-সব সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু এ দিয়ে পারতো না সে এমন কাজ নেই। ইস্কুল-সুদ্ধ ভাঙ্গা ছাতি সারানো, স্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে ছিঁড়ে গেলে তখনি জামা-কাপড় করে দেওয়া—এমন কত কি। কোন কাজে কখনো না বলতো না। আর করতোও মৎকার। একবার 'ছট্' পরবের দিনে কয়েকপয়সার রঙ্গিন কাগজ আর শোলা কিনে কি একটা তৈরি করে সে গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেলনা বিক্রি করে ফেললে। তার আমাদের পেটভরে চিনেবাদাম-ভাজা খাইয়ে দিলে।

বছরের পরে বছর যায়, সকলে বড় হয়ে উঠলাম। জিমনাস্টিকের আখড়ায় লালুর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহস ছিল তেমনি অপরিসীম। ভয় কারে কয় সে বোধ করি জানতো না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদেই সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ

পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারতো না। এতে ছেলে-বুড়ো-গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতাম না, ভয় দেখাবার এমন সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় একনিমিষে কোথা থেকে আসে! দু'-একটা ঘটনা বলি। পাড়ার মনোহর চাটুজ্জের বাড়ি কালীপূজো। দুপুর-রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটলো ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো,—উপায়? এত রাত্রে ঘাতক মিলবে কোথায়? দেবীর পূজো পণ্ড হয়ে যায় যে! কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে কেটেছে। লোক দৌড়ল তার কাছে, লালু ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলো, বললে—না।

না কি গো? দেবীর পূজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে!

লালু বললে, হয় হোক গে। ছোটবেলায় ও-কাজ করেছি, কিন্তু এখন আর করব না।

যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগলো, আর দশ-পনরো মিনিট মাত্র সময়, তার পরে সব নষ্ট, সব শেষ। তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন,—না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও। সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

লালুকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের ভাবনা ঘুচলো। সময় নেই,—তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, বাড়িসুদ্ধ সকলের 'মা' 'মা' রবের প্রচণ্ড চীৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতের খড়্গ নিমিষে ঊর্ধ্বোত্থিত হয়েই সজোরে নামলো, তার পরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়ারা কালো মাটি রাঙ্গা করে দিলে। লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল। ক্রমশঃ ঢাক ঢোল কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এলো। যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আবার তার কপালে চড়লো সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙ্গা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা' 'মা' ধ্বনি। আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নীচে নেমে এলো—পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বার-কয়েক হাত-পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হ'লো; তার কাটা-গলার রক্তধারা রাঙ্গামাটি আরও খানিকটা রাঙ্গিয়ে দিলে।

ঢুলিরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে, উঠানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বহু লোকের বহু প্রকারের কোলাহল; সম্মুখের বারান্দায় কার্পেটের আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে মুদ্রিত নেত্রে ইষ্টনাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সমস্ত সাড়া-শব্দ গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কি! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দুটো যেন ঘুরছে, চেঁচিয়ে বললে, আর পাঁঠা কৈ?

বাড়ির কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দু'টো করেই বলি হয়।

লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার-দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশকণ্ঠে গর্জন করে উঠলো—নেই পাঁঠা? সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাবো ধরে নরবলি দেব—মা মা—জয়-কালী! বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে পড়লো, তার হাতের খাঁড়া তখন বনবন করে ঘুরচে। তখন যে কাণ্ড ঘটলো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটলো সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়েছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারও পায়ের ফাঁকের মধ্যে গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করচে, কারও গলা কারও বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মত হয়েছে, একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে,—কিন্তু এ-সব মাত্র মুহূর্তের জন্য। তার পরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠলো—মনোহর চাটুজ্জে কৈ? পুরুত গেল কোথায়?

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। চাটুজ্জেদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুর-দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু, বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলে, বললে, চলো হাড়িকাঠে গিয়ে দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন, লালু! বাবা! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ—আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোট ভাইয়ের মত।

সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চলো তোমাকে বলি দেব! মায়ের আদেশ!

চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখ্খনো নয়—মা যে জগজ্জননী!

লালু বললে—জগজ্জননী! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঁঠা-বলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে? বলো।

চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কোনদিন নয় বাবা, আর কোনদিন নয়, মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করচি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ।

ঠিক ত?

ঠিক বাবা ঠিক। আর কখনো না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাব।

লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে? গুরুদেব? সে কৈ? এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুরদালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলার ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠলো। সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে, লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ—করে হেসে উঠে দুম্ করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো।

তখন কারো বুঝতে বাকী রইল না খুন-চাপা-টাপা সব মিথ্যে, সব তার চালাকি। লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটলো। ঠাকুরের পূজো তখনো বাকী, তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে, এবং মহা হৈচৈ কলরবের মধ্যে চাটুজ্জে মশাই সকলের সম্মুখে বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন—ঐ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয়।

কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয়নি। ভোরে উঠেই সে যে কোথায় পালালো, সাত-আটদিন কেউ তার খোঁজ পেলে না। দিন-সাতেক পরে একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধূলো নিয়ে সে-যাত্রা বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে। কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জেবাড়ির কালীপূজোয় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল।

ডালিমকুমার

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

ক রাজা, রাজার এক রাণী, এক রাজপুত্র। রাণীর আয়ু একজোড়া পাশার মধ্যে,—রাজপুরীর তালগাছে এক রাক্ষসী এই কথা জানিত। কিন্তু কিছুতেই রাক্ষসী যো পাইয়া উঠে নাই। একদিন রাজা মৃগয়ায় গিয়াছেন, রাজপুত্র সখা সাথী পাঁচজন লইয়া পাশা খেলিতেছিলেন; দেখিয়া, রাক্ষসী, এক ভিখারিণী সাজিয়া রাজপুত্রের কাছে গিয়া পাশা জোড়া চাহিল; রাজপুত্র কি জানেন? হেলায় পাশা জোড়া ভিখারিণীকে দিয়া ফেলিলেন। তিন ফুঁয়ে রাক্ষসী, রাণীর আয়ু পাশা, কোন্ রাজ্যে পাঠাইল কে জানে? রাণীর ঘরে রাণী মূর্চ্ছা গেলেন! রাক্ষসী তাড়াতাড়ি গিয়া রাণীকে খাইয়া রাণীর মূর্তি ধরিয়া বসিয়া রহিল।

রোজ যেমন, আজও রাজা আসিলেন—রোজ যেমন, আজও রাণী সেবা যত্ন করিলেন। কেবল রাজপুত্র দেখিলেন, খাবার দিবার সময়, মায়ের জিভের একফোঁটা জল টস্ করিয়া পড়িল। গা ছম্ ছম্! রাজপুত্র আর খাইলেন না; চুপ করিয়া উঠিয়া গেলেন। এ কথা আর কেহই জানিল না।

ক'বৎসর যায়, রাজার সাত ছেলে হইল। রাজা খুব ধূমধাম করিলেন। কেবল রাজপুত্র দেখিলেন, তালগাছের আগা দিন দিন শুকায়, তালগাছে কোন পক্ষী বসে না। রাজপুত্র চুপ করিয়া রহিলেন।

সাত ছেলে বড় হইল। রাজা সময়মত তাহাদের অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, সব করাইলেন। তখন রাজপুত্রেরা বলিলেন,—"এখন আমরা দেশ ভ্রমণে যাইব।"

রাজা বলিলেন,—"বড়কুমার গেল না, তোরা কি করিয়া যাইবি?" রাজা বড়কুমারকে খবর দিলেন।

খবর পাইয়াই এক পক্ষিরাজে চড়িয়া বড়কুমার ভাইদের কাছে গেলেন,—"কেন রে ভাই! দাদাকে তোরা ভুলিয়া গিয়াছিলি? চল্, এইবার দেশ ভ্রমণে যাইব।" আট ভাই সাজ-সজ্জা । চর-কটক সঙ্গে রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন।

ছাদের উপরে রাক্ষসী রাণী দেখে,—বড় বিপদ,—কুমার তো গেল। আছাড়ি-বিছাড়ি রাক্ষসী ঘরে গিয়া এক কৌটা খুলিল; কৌটার মধ্যে সূতাশঙ্খ-সাপ। রাক্ষসী বলিল,—

"সূতাশঙ্খ, সূতাশঙ্খ শাঁখের আওয়াজ!
কুমারের আয়ু কিসে বল্ দেখি আজ?"

সূতাশঙ্খ সূতার মত ছোট্ট—সরু; কিন্তু আওয়াজ তা'র শঙ্খের মত। সরু ফণা তুলিয়া শঙ্খের আওয়াজে সূতাশঙ্খ বলিল—

"তোর আয়ু কিসে রাণী, মোর আয়ু কিসে?
ডালিম কুমারের আয়ু ডালিমের বীজে।"

রাক্ষসী বলিল,—

"যাও ওরে সূতাশঙ্খ, বাতাসে করি ভর,—
যম-যমুনার রাজ্য-শেষে পাশাবতীর ঘর!
এই লিখন দিও নিয়া পাশাবতীর ঠাঁই,
সাত ছেলের তরে আমার সাত কন্যা চাই।
রিপু অরি যায়, সূতা, চিবিয়ে খাবে তারে,
সতীনের পুত যেন পাশা আন্‌তে নারে।"

লিখন নিয়া সূতাশঙ্খ, বাতাসে ভর দিয়া গাছের উপর দিয়া-দিয়া চলিল! রাক্ষসী, এক ডালিম হাতে, আবার মন্ত্র পড়িল—

"পক্ষিরাজ, পক্ষিরাজ, উঠে চলে যা,
পাশাবতীর রাজ্যে গিয়া ঘাস জল খা।

মন্ত্র পড়িয়া রাক্ষসী তাড়াতাড়ি আসিয়া রাজপুরীর হাজার সিঁড়ির ধাপে উঠিয়া বলিল,—"সিঁড়ি, তুমি কা'র?"

সিঁড়ি বলিল,—"যে যখন যায়, তা'র!"

রাক্ষসী বলিল,—"তবে সিঁড়ি দু'ফাঁক হও, এই ডালিমের বীজ তোমার ফাটলে থা'ক।" ডালিমের বীজ হাজার সিঁড়ির ধাপের নীচে জন্মের মত বন্ধ হইয়া রহিল;—রাক্ষসী গিয়া নিশ্চিন্তে দুধ-ধব্ ধব্ শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

অমনি,—আট রাজপুত্র কোন্ বনের মধ্যে পড়িয়া ছিলেন, সেইখানে খটাস্ করিয়া বড়কুমারের চোক অন্ধ হইয়া গেল,—বড়কুমার চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ভাই রে! বিছার কামড়,—গেলাম গেলাম!!"

সূর্য্য ডুবিয়া গেল, চারিদিকে ঝড় বৃষ্টি, অন্ধকার,—বনের মধ্যে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না, বড় রাজকুমার কোথায় পড়িয়া রহিলেন, চর-কটক কোথায় গেল—সাত রাজপুত্রের ঘোড়া ঝড়ের আগে ছুটিয়া চলিল।

(২)

রাক্ষসী তো স্বপ্ন দেখে,—সূতাশঙ্খ এতক্ষণে যম-যমুনা দেশের 'সে পার'! ওদিকে সূতাশঙ্খ সারাদিন গাছে গাছে চলিয়া, হায়রাণ; একখানে রাত্রি হইল, কে আর যায়? পরিপাটী রাজার বাগান,—বাগানের এক গাছের ফলের মধ্যে ঢুকিয়া, বেশ করিয়া কুণ্ডলী মণ্ডলী পাকাইয়া, সূতা ঘুমাইয়া রহিল।

রাজকন্যা রোজ সেই গাছের ফল খান। মালী নিত্যকার মত ফল আনিয়া দিল; রাজকন্যা মত ফলটি খাইলেন।—ফলের সঙ্গে সূতাশঙ্খ, রাক্ষসীর লিখন, রাজকন্যার পেটে
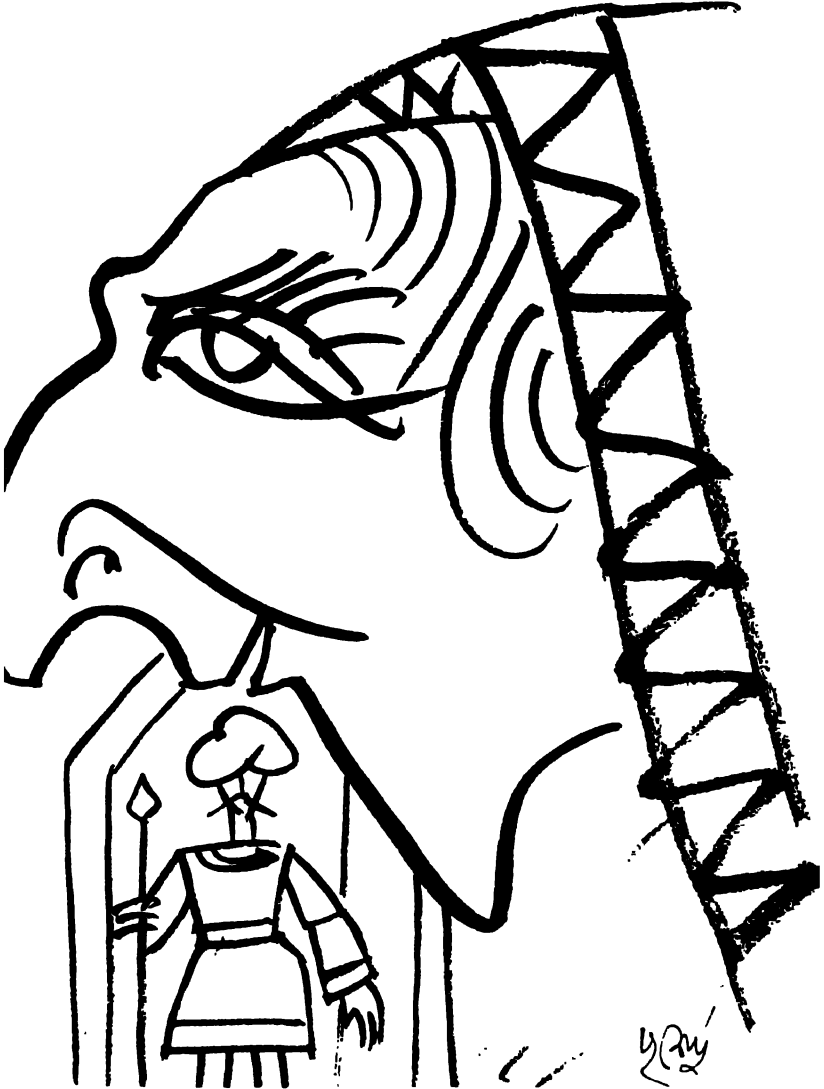
টিখন ওসব কথা রাজপুত্রেরা কি জানে? উড়িয়া, ছুটিয়া, পক্ষিরাজেরা যে কোথা' কি করিয়া গেল, কেহই জানে না। একখানে গিয়া ভোর হইল; সকলে দেখেন,—দাদা ! ভাবিলেন, পাছে পড়িয়া গিয়াছেন! রাশ আল্‌গা দিয়া সাত ভাই দাদার জন্য পক্ষিরাজ াইলেন।

নাঃ,—দিন যায়, রাত যায়, দাদার দেখা নাই! তখন, এক ভাই বলিলেন,—"ঘোড়া যদি

আগে গিয়া থাকে!”

“ঠিক্, ঠিক্!!” সকলে পক্ষিরাজ সামনে ছুটাইয়া দিলেন।

মন্ত্র-পড়া পক্ষিরাজ একেবারে পাশাবতীর পুরে গিয়া উপস্থিত! পাশাবতীর পুরে পাশাবতী দুয়ারে নিশান উড়াইয়া ঘর-কুঠরী সাজাইয়া, সাজিয়া, বসিয়া আছে। যে আসিয়া পাশা খেলিয়া হারাইতে পারিবে, আপনি, আপনার ছয় বোন নিয়া তাহাকে বরণ করিবে। রাজপুত্রদিগবে দেখিয়া পাশাবতী বলিল,—“ কে তোমরা ?”

রাজপুত্রেরা বলিলেন,—“অমুক দেশের রাজপুত্র, দেশ ভ্রমণে আসিয়াছি।”

পাশাবতী বলিল,—“না! দেখিয়া বোধ হয় যক্ষ রক্ষ।—তোমরা আমার পণ জান ?”

‘জানি না’

“আমার পাশার পণ।—দানব যক্ষ রক্ষ হইলে পরখ্ দেখিয়া নিব; মানুষ হইলে খেলিতে হইবে।

যে দিনে সে মালা পায়,
হারিলে মোদের পেটে যায়!”

রাজপুত্রেরা বলিলেন,—“পরখ্ কর!”

পাশাবতী লিখন দেখিতে চাহিল,—“দানব যক্ষ রক্ষ হইলে লিখন থাকিবে।”

রাজপুত্রেরা বলিলেন,—“লিখন কিসের ? লিখন নাই।”

“তবে খেল।”

খেলিয়া রাজপুত্রেরা হারিয়া গেলেন। পাশাবতীর সাত বোনে সাত রাজপুত্র, পক্ষিরাজ সব কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া হালুম হালুম করিয়া খাইয়া ফেলিল। ফেলিয়া, আবার রূপসী মূর্তি ধরিয় বসিয়া রহিল। রাক্ষসী-রাণী স্বপ্ন দেখে কি, আর তা'র কপালে হইল কি! রাক্ষসীর মাথায় টনব পড়িয়াছে কি না, কে জানে ? যা'ক্!

(৩)

অন্ধ রাজকুমারকে পিঠে করিয়া পক্ষিরাজ ঝড়-বৃষ্টি অন্ধকারে শূন্যের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে,—হাতের রাশ হারাইয়া রাজকুমার কখন্ কোথায় পড়িয়া গেলেন। পক্ষিরাজ এব পাহাড়ের উপর পড়িয়া পাথর হইয়া রহিল।

রাজকুমার যেখানে পড়িলেন, সে এক নগর! সেই নগরে রাজপুরীতে সন্ধ্যার পর লক্ষ কাড়া লক্ষ সানাই, ঢাক ঢোল সব বাজিয়া উঠে, ঘরে ঘরে চূড়ায় চূড়ায় পথে পথে মশাল জ্বলে, নিশান উড়ে, হৈ হৈ আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়।

ভোরে সব চুপ! তা'রপর কেবল কান্নাকাটি, চীৎকার, হাহাকার, বুকে চাপড় ছুটাছুটি—চোকের জলে দেশ ভাসে, শোকে রাজ্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

আবার, দুপুর বহিয়া গেলে, যখন রাজার হাতী সাজিয়া গুজিয়া বাহির হয়, তখন রাজ্যের লোক নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গিয়া খাওয়া দাওয়া করে,—তাহার পর সমস্ত নগরের লোক পথে পথে সারি দিয়া দাঁড়ায়।

পাট হাতী ছোটে, ছোটে,—একজনকে ধরিয়া, সিংহাসনে তুলিয়া নেয়—অমনি ঢাক ঢোল বাজাইয়া শাঁকে ফুঁ দিয়া সিপাই, সান্ত্রী, মন্ত্রী, অমাত্য সকলে তুলিয়া-নেওয়া মানুষকে লইয়া গিয় রাজ্যের রাজা করে। রাজকন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়।—আবার আনন্দের হাট বসে।

পরদিন দেখা যায় রাজকন্যার ঘরে কেবল হাড় গোড়; রাজার চিহ্নও নাই!! এই রকমে কত

হইল, কত রাজা গেল। কিন্তু রাজা না থাকিলে রাজ্য থাকে না, তাই নিত্য নূতন রাজা
়! রাজকন্যা জানেন না, কেহই বুঝিতে পারে না, রাজাকে কিসে খায়!

পাটহাতী ছুটিয়াছে। নগরে "সার্ সার্" সোর পড়িয়া গিয়াছে; সকলে চীৎকার করিতেছে, "পথ ছাড়, পথ ছাড়, কাতার দাও।"

রাজকুমারের জ্ঞান হইয়াছে, শব্দ শুনিয়া রাজকুমার উঠিয়া বসিলেন,—কিসের পথ, কোথায় াসিয়াছেন, রাজপুত্র কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; রাজপুত্র থতমত খাইয়া

হাতী কাতারের কাহাকেও ছুঁইল না;—হু হু করিয়া সকল পথ ছাড়াইয়া আসিয়া রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইল। রাজ্যের লোক "রাজা! রাজা!" বলিয়া জয়-জয়কার দিয়া অন্ধ রাজকুমারকে নিয়া রাজা করিল।

ধূমধাম, অভিষেক, জাঁকজমক, বিচার আচার, সভা, দরবার—সব—শেষে রাত্রি-রাজার দেশে সব ঘুমাইয়াছে। নগরে সহরে সাড়াটি নাই, দুয়ার দরজায় পাহারা নাই—থাকিয়া কি । ? কা'ল যা' হইবে সকলেই তো তা' জানে, পাহারারা আর পাহারা দেয় না! রাজকন্যা ঘুমে ভোর!

সেই কাল্‌রাত্রে কেবল রাজকুমার জাগিয়া আছেন। ঘর বা'র নিঝুম; পৃথিবী-সংসারে টুঁশব্দ -পোকা-মাকড় পক্ষীটিও ডাকে না;—কাল্ নিশির কাল্‌ঘুমে সব যেন ছাইয়া আছে।

ঘরে প্রদীপ দপ্ দপ্, রাজপুত্রের মন—ছব্ ছব্; কোনই সাড়া নাই—কোনই শব্দ নাই।

হঠাৎ ঘুমের রাজকন্যা চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইলেন; চিড়িক্ দিয়া ঘরে বিজলী জ্বলিয়া ন, চড় চড় করিয়া দেওয়ালের গা ফাটিয়া গেল; চুর্ চুর্ ঝুর্ ঝুর্ চারিদিকে ঝালর-পাত পড়িতে লাগিল।—রাজপুত্রের সকল গা কাঁটা—শক্ত করিয়া তরোয়ালের মুঠি ধরিয়া গাড়িয়া রাজকুমার বলিলেন, "কে?" রাজপুত্র কিছুই দেখিতে পান না; ঘরের আলো, ্যুতের চমক,—রাজকন্যার শরীর কাঠের মত শক্ত,—রাজকন্যার নাকের ভিতর হইতে —মিহী—চুলের মত সাপ বাহির হইল! সেই চুল দেখিতে দেখিতে সূতা—দড়া,—কাছি, া'রপর প্রকাণ্ড অজগর! শঙ্খের মত আওয়াজে সেই অজগর গর্জ্জিয়া উঠিল।

পুরী থর্ থর্ কাঁপে! হাতের তরোয়াল ঝন্ ঝন্—রাজপুত্র হাঁকিলেন—"জানি না,—যে হও ী, রক্ষ যক্ষ দানব!—যদি রাজপুত্র হই, যদি নিষ্পাপ শরীর হয়, দৃষ্টির আড়ালে তরোয়াল ম, এই তরোয়াল তোমাকে ছুঁইবে!"

বলা আর কহা,—সূতাশঙ্খ বত্রিশ ফণা ছড়াইয়া বিষদাঁতে আগুন ছুটাইয়া লক্‌লক্ করিয়া ;—রাজপুত্রের তরোয়াল ঝ-ঝন্-ঝন্ শব্দে ঘরের ঝাড় বাতি চূর্ণ করিয়া সূতাশঙ্খের ফণায় গিয়া লাগিল! অমনি রাজপুত্র দেখেন,—সাপ! ঘরময় বিদ্যুতের ধাঁধা, চারিদিকে !—রাজপুত্র শন্‌শন্ তরোয়াল ঘুরাইয়া বলিলেন,—"চক্ষু পাইলাম!!!" তরোয়ালে অজগর ৮ খণ্ড হইয়া কাটিয়া গেল; সেই নিশিতে রাক্ষসী-রাণীর পুরীতে ধবড়্ধবড়্ শব্দে হাজার সিঁড়ির ধ্বসিয়া গেল, রাজকুমারের আয়ু সহস্রডাল সোণার ডালিম গাছ হইয়া গজাইয়া উঠিল। াজপুরীতে ভূমিকম্প—গুড়্-গুড় দুড়্-দুড়্ শব্দ! ভয়ে রাক্ষসী ইঁদুর হইয়া "চিঁচিঁ" করিতে রিতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। রাণীর শরীর আবার মূর্চ্ছা গিয়া পড়িয়া রহিল। রাজ্যে রাজপুরীতে র,—"এ সব কি!"

রাত-রাজার রাজ্যের লোক নিত্যকার মত কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছে—দেখে—ধন্য! !—রাজা! রাজা আজ জীয়ন্ত!!! লোকের আনন্দ ধরে না! দেখে হাজারো ফণা সাত কুচি

সাপ—মেজেতে পড়িয়া!! "কি সর্ব্বনাশ!"—সকলে বুঝিল, এই সাপে এত দিন এত রাজা খাইয়াছে!—"সাপকে পোড়াও।"

পোড়াইতে গিয়া, সাপের পেটে লিখন! লিখন রাজার কাছে আসিল। পড়িয়া রাজপুত্র বলিলেন,—রাজকন্যা! আর তো আমি থাকিতে পারি না—আমার সাত ভাই বুঝি রাক্ষসের পেটে গিয়াছে!—আমি চলিলাম!" রাজ্যের লোক মনঃক্ষুণ্ণ—"শেষে এক রাজা পাইলাম তিনিও কোথায় চলিলেন।" রাজা কবে ফিরিবেন,—সকলে পথ চাহিয়া রহিল।

ডালিমকুমার যাইতেছেন, যাইতেছেন, এক পাহাড়ে উঠিয়া দেখেন পক্ষিরাজ! ছুঁইতেই আবার প্রাণ পাইয়া পক্ষিরাজ, "চিঁহী হিঁ!" করিয়া উঠিল। রাজপুত্র বলিলেন,—"পক্ষিরাজ এইবার চল।"

যম-যমুনার দেশ—অন্ধকার গায়ে ঠেক, বাতাসে পাথর উড়ে, রাজপুত্র কিছুই মানিলেন না—'ঝড়ের গতি কোন ছার, পক্ষিরাজে আসন যা'র।' তীর-বজ্রের মত পক্ষিরাজ ছুটিয়া চলিল।

কতক দূরে গিয়া কড়ির পাহাড়। কড়ির পাহাড়ে পক্ষিরাজের পা চলে না; ছট্‌ফট্ রটারা শব্দ। রাজপুত্র বলিলেন,—"পক্ষি! থামিও না; ছুটে' চল।" পক্ষিরাজ তীর-বজ্রের গতি—সারারাত্রি পায়ের নীচে কড়ির পাহাড় চূর হইয়া গেল।

তার পরেই হাড়ের পাহাড়। হাড়ের পাহাড়ের নীচে কলকল শব্দে রক্ত-নদীর জল তোড়ে ছুটিয়াছে; রক্তের তরঙ্গ, রক্তের ঢেউ! দাঁত বাহির করিয়া মড়ার মুণ্ড "হী! হী!" করিয়া উঠে হাড়ে হাড়ে কটাকট্ খটাখট্ শব্দ,—কাণ পাতা যায় না। রাজপুত্র বলিলেন,—"পক্ষি! ভয় নাই চোখ বুজিয়া চল।" পায়ের নীচে হাড়ের পাহাড় খট্-খট্-খটাং, ছর্-র্-র্-র্—ছট্‌ফট্ শব্দে চূর হইয়া গেল। তখন রাত্রি পোহাইল, রাজপুত্র দেখেন, দূরে পাশাবতীর পুর।

পাশাবতীর পুরে ফটকে নিশান; নিশানে লেখা আছে,—

"পাশা খেলিয়া যে হারাইবে, সাত বোনে মালা দিব!"

রাজপুত্র হাঁকিলেন,—"পাশা খেলিব!"

খেলিতে বসিয়া রাজপুত্র চমকিয়া গেলেন,—এ পাশা তো তাঁরি! খেলিতে গিয়া রাজপুত্র হারিয়া গেলেন,—দেখেন, এক ইঁদুর পাশা উল্টাইয়া দেয়। আনমন রাজপুত্র বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাশাবতী বলিল,—"রাজপুত্র! পণ ফেল।"

"পক্ষিরাজ নাও; কাল আবার খেলিব।" বলিয়া রাজপুত্র উঠিয়া গেলেন। পাশাবতীরা তখনি পক্ষিরাজকে গরাসে গরাসে খাইয়া ফেলিল।

পরদিন এক গ্রামের মধ্যে গিয়া রাজপুত্র এক বিড়ালের ছানা নিয়া আসিলেন বলিলেন,—"এস, আজ খেলিব।"

খেলিতে বসিয়াছেন—আজ ইঁদুর আসে-আসে করে, আসে না—কি যেন দেখিয়া পলায়।

রাজপুত্র দা'ন ফেলিলেন—

"এই হাতে ছিলে পাশা, পুনু এলে হাতে,—
এত দিন ছিলে পাশা—কা'র দুধ-ভাতে?"

আর দা'ন পড়ে। পলক ফেলিতে না ফেলিতে পাশাবতী হারিয়া গেল। রাজপুত্র বলিলেন,—"আমার পক্ষিরাজ দাও।"

রাক্ষসী পক্ষীরাজ দিল।

আবার খেলা। রাক্ষসী আবার হারিল; রাজপুত্র বলিলেন,—"আমার ঘোড়ার মত ঘোড়া, আমার মত রাজপুত্র দাও।" পাশাবতী এক রাজপুত্র এক ঘোড়া আনিয়া দিল; রাজপুত্র দেখেন, ভাই; ভাইয়ের ঘোড়া! রাজপুত্র আবার খেলিলেন। খেলিতে খেলিতে রাজপুত্র—সাত ভাই, সাত ভাইয়ের ঘোড়া, পাশাবতীর রাজ-রাজত্ব ঘর পুরী সব জিতিলেন। শেষে বলিলেন, —"এখন কি দিবে? এই পাশা আর ইঁদুর দাও।" পাশাবতী কি পাশা অমনি দেয়?—তখন রাজপুত্র বিড়ালের ছানা ছাড়িয়া দিলেন,—বিড়াল গড়্ গড়্ করিয়া ইঁদুরকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল। ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল,—রাজ-রাজত্ব কোথায় সব? হাতের পাশা হাতে, রাজপুত্র দেখেন—সাত পাশাবতী সাত কেঁচো হইয়া মরিয়া রহিয়াছে!

পাশা বলিল,—"কুমার, কুমার, ঘরে চল্।"

আট রাজপুত্র আট পক্ষিরাজ হু হু করিয়া ছুটাইয়া দিলেন।

রাজপুরীতে রাণী উঠিয়া বসিয়াছেন,—"কতকাল ঘুমাইয়াছি! —আমার কুমার কৈ?"

'কুমার কৈ!'—চারিদিকে জয়ঢাক বাজে, পথের ধূলায় অন্ধকার—আট রাজপুত্র আট পক্ষিরাজের সারি দিয়া রাজ্যে ফিরিয়াছেন। কুমার আসিয়া বলিলেন,—"মা কৈ, মা কৈ?"—আট রাজপুত্র রাণীকে ঘিরিয়া প্রণাম করিলেন। শূন্য পুরীতে আবার সোনার হাট মিলিল।

"ভাইদের খোঁজে কবে গিয়াছেন, সবে-জীয়ন্ত এক রাজা আমাদের, আজও ফিরেন না।" খুঁজিয়া খুঁজিয়া রাত-রাজার দেশের যত লোক আসিয়া দেখিল,—"আমাদের রাজা এইখানে!" তখন রাজকন্যা রাজপাট তুলিয়া সেইখানে নিয়া আসিলেন।

সকল দেখিয়া রাজা অবাক্!

পরদিন ভোর বেলা সোণার ডালিম গাছে হাজার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে;—আর দুপুর বেলা রাজপুরীর তালগাছটা, কিছুর মধ্যে কিছু না, শিকড় ছিঁড়িয়া দুম্ করিয়া পড়িয়া, ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল।

ডাকাতের কৃতজ্ঞতা

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গ্রামের নাম বিদগ্রাম—সহজ কথায় বিদগাঁ। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার একটি প্রসিদ্ধ পল্লী।

সে অনেকদিন আগের কথা। শ্রীহট্ট শহরে ওকালতি করিতেন শ্যামকিশোর সেন মহাশয়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত উকিল। সেন মহাশয়ের বাড়ি ছিল বিদগাঁ গ্রামে। কর্মস্থলে তাঁহার যেমন বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল, অর্থ উপার্জনও তেমনি করিতেন। লোকজনের উপকারে, দান-ধ্যানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। প্রতিবৎসর শারদীয় পূজা উপলক্ষে দেশে যাইতেন, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পূজা করিতেন—জগন্মাতা শ্রীদুর্গার। সেই কয়দিন তাঁহার বাড়িতে ও গ্রামে আনন্দ উৎসব লাগিয়া থাকিত। যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় রেলগাড়ি ছিল না, স্টীমার চলিত না। সুদূর শ্রীহট্ট হইতে দেশে আসিতে হইত নৌকাযোগে।

দেশে ফিরিতে সময় লাগিত অবস্থা বিশেষে পাঁচ-সাত দশ দিন। সময় সময় একপক্ষও লাগিত। মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি ছোট-বড় অনেক নদী পার হইয়া আসিবার সময় নদীর স্রোত, আবহাওয়া ও ঝড়জলের জন্যও বিলম্ব হইত। পথে অনেক সময় বন্দর, হাট-বাজারে নৌকা লাগাইয়া যাত্রীরা রান্না বান্না করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতেন—তাড়াহুড়ো না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বাড়ির পথে চলিতেন; কিন্তু সর্বদা ছিল ভয়ভীতি। কবে কখন ডাকাতের হাতে পড়েন, কখন ঝড় উঠে, নৌকাডুবি হয়। সেজন্য এ অঞ্চলের যাঁহারা শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলে থাকিতেন, তাঁহারা চেষ্টা করিতেন পরিচিত কয়েকজন একসঙ্গে মিলিত হইয়া শক্তিশালী মাঝি-মল্লাসহ বাড়ি যাইতে। কখন কি বিপদ ঘটে তাহার ত কোন স্থিরতা নাই! একদিকে যেমন এই-যাত্রা নৌকাযাত্রা-পথে আনন্দ ছিল—নদীর দুই পাড়ের মনোরম দৃশ্য, দূরে নানা পল্লী, গাছপালার অপূর্ব শোভা, শরতের আকাশের নির্মল সুষমা, তেমনি রাত্রিবেলা পাশাপাশি নৌকার মাঝিদের

ভাটিয়ালি গান প্রাণে দিত অপার আনন্দ। তখনকার দিনে জিনিসপত্র ছিল অত্যন্ত সুলভ। কাজেই হাটে, বন্দরে, কেনা-কাটা করিতে আসা ছিল আনন্দপ্রদ। দাস-দাসীরা রান্নার যোগাড় করিয়া দিত। গৃহিণীরা নৌকা হইতে নামিয়া ভাল স্থান দেখিয়া আনন্দের সঙ্গে রন্ধন করিতেন। তারপর হইত নৌকারোহী সকলের ভোজন।

সেবার পূজা আশ্বিন মাসের শেষাশেষি। সেন মহাশয় চলিয়াছেন বাড়ির-পথে। সঙ্গে তাঁহার প্রৌঢ়া স্ত্রী, দুইটি ছেলে ও একটি কিশোরী মেয়ে। কনিষ্ঠ ছেলেটির বয়স ছিল তিন-চারি বৎসর মাত্র। সে ছিল ভয়ানক দুর্দান্ত। তাহাকে সামলাইয়া রাখা বড় সহজ ছিল না। সঙ্গে দুইজন ভৃত্য দুইজন দাসী এবং একজন ছিল সাহসী লাঠিয়াল। আগেই বলিয়াছি, সেকালের যাত্রীরা যাতায়াতের সময় সর্বদা সতর্ক ভাবে থাকিতেন, কখন কোন বিপদ ঘটে তার ত কোন স্থিরতা নাই। সেন মহাশয়ের নৌকা চলিয়াছে দেশের পথে। দেশ ত কাছে নয়—দূর বিক্রমপুরে। একখানি পানসি নৌকাতে কর্তা গৃহিণী ও ছেলেমেয়েদের নিয়া চলিয়াছেন। আর দুইখানি নৌকাতে ছিল পূজার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র। আর অন্য একখানি নৌকাতে ছিল দাসদাসীরা ও খাদ্যদ্রব্যাদি। মাঝে দুই এক বার ঝড় আসিয়াছিল, তবে কোন বিপদ ঘটে নাই। তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন মেঘনা ও পদ্মা নদীর সঙ্গমস্থলে। এখানকার নদীর দৃশ্য সাগরের মতো—পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী আসিয়া মিশিয়া একেবারে সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে শুধু জল আর জল—অথৈ জল। সে জল কিন্তু স্থির শান্ত। শ্যামকিশোর বাবু উৎসাহভরে চিৎকার করিয়া বলিলেন—'সনাতন মাঝি, এবার পাড়ি দাও।'

এ-সময়ে ঈশান কোণে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিয়াছিল। বাতাসও জোরে বহিতেছিল। মাঝি বলিল, বাতাসের অবস্থা না দেখে নদী পাড়ি দেওয়া চলে না। কর্তামশাই, এখানে রাত্রির মতো নৌকা ভেড়াই। কাল সকালের দিকে পাড়ি দিয়ে বেলাবেলি গিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেব।

কর্তা বলিলেন 'তাই করো। বাড়ির কাছে এসে পড়ে থাকব, তাইত মন কেমন কেমন করছে।'

মেঘনা নদীর পূর্বতীরে নৌকা ভিড়ান হইল। পশ্চিম পাড় ঘেঁষিয়া ছিল বিরাট এক চর। চরের অপর দিকে আর একটা নদী পদ্মার আর একটি শাখা। সেই নদী ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মেঘনায় মিশিয়াছে। মেঘনা নদী পার হইয়া ঐ নদীর ভেতর দিয়া গিয়া পদ্মার কাছে পৌছানো যায়। সেই পথেও শ্যামকিশোর বাবুর বাড়িতে যাওয়া যায়। ঐ পথ সনাতন মাঝিরও অজানা ছিল না। কিন্তু সে সেইপথে যাইতেও অস্বীকার করিল। কারণ মেঘনার সেই পাড়টা নিরাপদ নয়। দস্যু-ডাকাতের বিলক্ষণ ভয় আছে—সে কথা শ্যামকিশোর বাবু মাঝিকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

মাঝি বলিল—'কর্তা, এতটা পথ নিরাপদে এলাম, শেষটায় কি ঘরের দুয়ারে এসে নৌকোডুবি হবে। কোন ভয় নেই। সাবধানে থাকব। কোন ভয় করবেন না।'

সত্য সত্যই রাত্রিটা নিরাপদে কাটিল। পরদিন সকাল সকাল নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। সে দিন প্রকৃতি ছিল শান্ত। সূর্য উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রাতঃকালীন শোভা চারিদিকে বিকাশমান। চরে কাশ গাছের অপূর্ব শোভা। কাশ ফুল বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যেন চামর ঢুলাইতেছে। নদী বিরাট প্রশস্ত নিস্তরঙ্গ। ছোট ছোট ঢেউগুলি উঠিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে। ঢেউয়ের বুকে নাচিতে নাচিতে নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন বেলা অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে। এমন সময় রাজবাড়ীর বিখ্যাত মঠের পাশে একটি হাটের কাছে নৌকা ভিড়ান হইল। হাটের নাম দীঘির পাড়—বিখ্যাত হাট। রাজবাড়ীর মঠ সেই প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি বুকে করিয়া মাথা

তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের চুড়াটিকে নানা গাছে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

বেলা শেষে পদ্মার বুকে ক্রমশঃ ঢেউ উঠিয়াছে। আকাশে অল্প অল্প মেঘ উঠিয়াছে। সকলের নিরাপদে আহার ইত্যাদির পর নৌকা ধীরে ধীরে চলিতেছে—কখনও কোন খালের মধ্য দিয়া, কখনও পদ্মার বুকের উপর দিয়া। খানিক পরে নদীর বুকে বেশ একটু জোরে ঝড়ো হাওয়া বহিতে লাগিল। সেন মহাশয় আশা করিয়াছিলেন সন্ধ্যা নাগাদ গিয়া গ্রামে পৌঁছিবেন, কিন্তু নদী

ও খালের উজান স্রোতে নৌকা দ্রুত চালান সম্ভবপর হইল না। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছিল। তীব্র হাওয়া বহিতেছিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমন সময় পশ্চিম দিক হইতে দুইখানি ছিপ নৌকা অতি দ্রুতবেগে আসিয়া সেন মহাশয়ের নৌকাখানি ঘিরিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে ছিপ নৌকা হইতে চার-পাঁচ জন লোক দুপ্ দুপ্ শব্দ করিতে করিতে নৌকার উপর লাফাইয়া পড়িল। নির্জন স্থান—আশে পাশে মুসলমান পল্লী, পদ্মার চরে নূতন বসতি। এ অঞ্চলটি ডাকাতির জন্য বিখ্যাত।

হা-রে-রে-রে শব্দে নৌকায় উঠিয়াই লোকগুলি চিৎকার করিয়া বলিল—'দে তোদের যা আছে দে।'

বাতাসের দাপাদাপি, মেঘের গর্জন, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি, তাহার মধ্যে ডাকাতদের ভীষণ

চীৎকার শুনিয়া শ্যামকিশোর সেন মহাশয় বাহিরে আসিলেন। নৌকার গলুইতে ডাকাত উঠিতেই তাহার স্বর শুনিয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন—কে রে? তুই কে রে? কলিমুদ্দী নাকি রে? কলিমুদ্দী সেই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। শ্যামকিশোর বাবুর গলা শুনিয়া ডাকাত কহিল—'কে? কে? বাবু নাকি। বাড়ি চলেছেন? হাঁ আমি কলিমুদ্দী।'

কলিমুদ্দী মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া ছিপওয়ালাদের ইশারা করিল প্রস্থান করিতে।

কলিমুদ্দী নৌকায় রহিল দুইজন সঙ্গী লইয়া। সেন মহাশয়কে সেলাম করিয়া সে কহিল—সেলাম কর্তা। খোদার দোয়ায় আপনার রক্ষা হলো!

তখন শ্যামকিশোর বাবু হাসিয়া বলিলেন—'মায়ের দয়ায় মা-ই রক্ষা করলেন।'

কলিমুদ্দী জিজ্ঞাসা করিল—'নায়ে কে কে আছেন?'

উত্তর দিলেন সেন মহাশয়—'তোমার মা, আর ছেলেমেয়েরা আর দাসদাসী, মাঝি মাল্লারা।'

কলিমুদ্দী তাহার সঙ্গীদের বলিল—'ওরে খেতে এখনও জল আছে। সে পথে নৌকা চালা। তাড়াতাড়ি বাবুর বাড়ি পৌঁছা যাবে।'

আকাশ তখন মেঘশূন্য। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রাঙা মেঘ ছড়াইয়া পড়িয়াছে সারা আকাশে। চল-চল ছল-ছল শব্দে নৌকা চলিল।

সেন মহাশয় আনন্দে বিভোর। কতকাল পরে আবার দেশে আসিতেছেন।

শোনা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও কীর্তন। ক্রমশঃ নৌকা আসিয়া ভিড়িল সেন মহাশয়ের বাড়ির ঘাটে, উৎকণ্ঠিত বাড়ির লোকেরা আনন্দের ধ্বনি করিয়া মাতিয়া উঠিল। সে কি আনন্দ।

কলিমুদ্দী ও তাহার সঙ্গীরা গ্রামের লোকজনদের সহিত সমুদয় দ্রব্যাদি নামাইয়া দিল। পূজা মণ্ডপে শ্রীদুর্গার মূর্তি শোভা পাইতেছে। পরদিন বোধন।

সেন মহাশয় কলিমুদ্দীকে নিভৃতে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন—বাবা কলিমুদ্দী, পূজোর তিনদিন আমার বাড়িতে রইলো তোদের নিমন্ত্রণ। আসতে হবে—

আসবো কর্তা আসব, পূজো দেখবো। খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন। নইলে কি যে করে ফেলতাম।

* * * *

এই কলিমুদ্দী এক ডাকাতির মোকদ্দমায় ধরা পড়িয়া মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হাকিমের এজলাসে বিচারাধীন হয়। সেই সময় শ্যামকিশোর সেন মহাশয় তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমায় তাহাকে খালাস করিয়া আনেন। সেইদিন হইতে বরাবর কলিমুদ্দী ছিল তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে ডাকাতি ছাড়ে নাই।

দৈবাৎ সেদিন তাহার হাতে পড়িয়াও শ্যামকিশোর বাবু রক্ষা পাইয়াছিলেন। ডাকাত হইলেও সে অকৃতজ্ঞ ছিল না। দেখিলে ত ডাকাতদেরও কৃতজ্ঞতা আছে।

অবিভক্ত বাঙলার ঢাকা জেলার একটি বর্ধিষ্ণু পরগনা বিক্রমপুর। বিক্রমপুর এখন স্বাধীন বাঙলাদেশের অন্তর্গত

রাম-খেল-তিলক-সিং

সুখলতা রাও

এক মুদীর এক মেয়ে ছিল। মুদী সকলের কাছে গল্প ক'রে বেড়াত, "আমার মেয়ে যেমন কাজ করে, তেমন আর কেউ পারে না।" একদিন সে রাজামশাই এর কাছে বড়াই করল, "আমার মেয়ে চরকা দিয়ে খড় থেকে সোনার সুতো বানাতে পারে।" রাজা খুব টাকা ভালবাসেন, এ কথা শুনে তিনি লাফিয়ে উঠলেন, বল্লেন, "সত্যি? তাহলে তোমার মেয়েকে কাল আমার বাড়ী নিয়ে এস।"

মুদী ত ভারি মুস্কিলে পড়ল। সত্যি সত্যি কি আর খড় থেকে সোনার সুতো হয়? মুদী খালি বড়াই করবার জন্য ও কথা বলেছিল। কিন্তু রাজামশাই এর হুকুম, কাজেই এখন আর কি করে? পরদিন সে তার মেয়েকে নিয়ে রাজবাড়ীতে গেল। রাজা সেই মেয়েকে এক ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘর ভরা কেবল খড়, আর এক কোণে একটা চরকা আছে। সে চরকা আর খড় দেখিয়ে রাজা বল্লেন, "কাল সকালের মধ্যে এই সমস্ত খড় কেটে সোনার সুতো বানিয়ে রাখবে। যদি না পার তবে তোমাকে কেটে ফেলব!"

রাজামশাই চলে গেলে মেয়েটি ব'সে কাঁদতে লাগল। সে ত জানে না কি ক'রে খড় থেকে সোনার সুতো তৈরী করতে হয়। আর রাজামশাই বলেছেন, না পারলে তাকে কেটে ফেলবেন! তাই সে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় কোত্থেকে একটি ছোট্ট মানুষ খুট্ খুট্ ক'রে ঘরে এসে ঢুকল। তার চেহারা এমনি যে, দেখলে না হেসে থাকা যায় না। এক হাত লম্বা মানুষটি, রোগা হাত পা, মস্ত বড় পেট, আর লম্বা দাড়ি! সে এসে মুদীর মেয়েকে বল্ল, "তুমি এত কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে?"

মুদীর মেয়ে বল্‌ল, "রাজামশাই আমাকে এই ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছেন, আর বলেছেন যে, কাল সকালের মধ্যে এই সব খড় কেটে সোনার সুতো তৈরি ক'রে দিতে না পারলে, আমাকে কেটে ফেলবেন। খড় থেকে কি কখনও সোনা হয়? তাত আমি পারব না; কাজেই রাজা আমাকে কেটে ফেলবেন!"

বামন এই কথা শুনে বল্‌ল, "আচ্ছা যদি আমি এই খড় কেটে সোনা ক'রে দিতে পারি, তবে আমাকে কি দেবে?" মেয়েটি বল্‌ল, "আমার গলার হার দেব।" তখন বামন চরকা নিয়ে বসল। চরকার ভিতর খড় দিয়ে ঘর্ ঘর্ ক'রে ঘোরায় আর অমনি সেই খড় লম্বা লম্বা সোনার সুতো হয়ে বেরিয়ে আসে। এমন ক'রে দেখতে দেখতে সে সমস্ত খড়গুলো সোনা বানিয়ে ফেলল। তারপর মুদীর মেয়ের গলার হার নিয়ে চলে গেল।

পরদিন সকালে রাজা এসে দেখেন সমস্ত খড় সোনা হয়ে গেছে। তা দেখে তিনি বড়ই আশ্চর্য হলেন আর তখনই অনেক খড় নিয়ে এলেন। এই খড়গুলোকে অন্য এক ঘরে রেখে তিনি মেয়েকে বল্লেন "এই সব খড় থেকে আবার সোনার সুতো বার করতে হবে। কাল সকালের আগেই করবে; যদি না পার তোমাকে কেটে ফেলব।" এই ব'লে তো রাজামশাই চলে গেলেন। তারপর মুদীর মেয়ে ব'সে ব'সে কাঁদছে আর ভাবছে, "আজও সেই বামন আসে ত বেশ হয়।" ভাবতে ভাবতেই দেখে, সত্যি সত্যিই সেই ছোট্ট মানুষটি খুট্ খুট্ ক'রে এসে উপস্থিত; এসে জিজ্ঞাসা করল, "আজ আমায় কি দেবে?"

মুদীর মেয়ে বল্লে, "হাতের বালা দেব।"

অমনি ঘরর্ ঘরর্ চরকা ঘুরতে ঘুরতে দেখতে দেখতে সেই ঘরভরা সমস্ত খড় হয়ে গেল চক্‌চকে সোনার সুতো! তারপর বামন চলে গেল হাতের বালা নিয়ে।

রাজা এসে সোনা দেখে ভারি খুসি। আরো ঢের বেশী খড় এনে আরো বড় একটা ঘর ভ'রে দিয়ে মুদীর মেয়েকে বল্লেন, "আজ রাত্রের মধ্যে যদি এই খড় থেকে সোনা বানাতে পার, তবে তোমাকে আমার রাণী করব, আর না পার তবে মেরে ফেলব।" রাজা ভাবলেন, 'মুদীর মেয়ে হ'লে কি হয়, খড় থেকে কেমন সোনা করতে পারে!'

সেদিন মুদীর মেয়ে ভাবছে, 'যদি বামন আসে ত বেশ হয়।' আর অমনি বামন এসে হাজির। বামন জিজ্ঞাসা করল, "আজ কি দেবে?" মুদীর মেয়ে বল্ল, "আর ত আমার কিছু নেই।" বামন বল্ল, "তুমি রাণী হবে, তোমার প্রথম ছেলেটিকে আমায় দেবে কিনা?"

খড় ত কাটতেই হবে, সোনা ত বানাতেই হবে, তা না হ'লে ত তাকে কেটেই ফেলবে। কাজেই মুদীর মেয়ে বল্ল, প্রথম ছেলেটিকে দেবে।

সেদিনও বামন সমস্ত খড় কেটে সুতো বানিয়ে দিল, আর যাবার সময় ব'লে গেল, "মনে থাকে যেন।"

তারপর রাজা এসে দেখলেন, সত্যি সত্যি তাঁর সব খড় সোনা হয়েছে। দেখে ত তিনি মহা খুসী। তিনি তখনি পুরুত ডাকিয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে, মুদীর মেয়েকে তাঁর রাণী ক'রে ফেললেন।

কিছুদিন পর রাণীর একটি সুন্দর ছেলে হ'ল। এতদিনে সে বামনের কথা রাণী প্রায় ভুলেই গিয়েছেন। কিন্তু বামন তাঁকে ভোলেনি। একদিন সে হঠাৎ রাণীর কাছে এসে বলে, "কি মনে আছে ত? এখন তোমার ছেলে দাও।" রাণীর মাথায় ত আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি কত কি দিতে চাইলেন, সে কিছুতেই নেয় না। সে বলে, "ছেলেটি চাই, তা ছাড়া আর কিছুতেই হবে না।" তখন রাণী ভয়ানক কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে বামনের মনে দুঃখ হ'ল। "আচ্ছা, যদি তিন দিনের মধ্যে আমার নাম বলতে পার তবে তোমার ছেলে নেব না।" ব'লে বামন চলে গেল। অমনি রাণী করলেন কি, যত রকমের বিদঘুটে নাম আছে, সব নাম জানবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন বামন এসে জিজ্ঞাসা করল, "বল ত আমার নাম কি? তিনবার বলতে দেব।" রাণী বল্লেন, "তোমার নাম কাতু।" বামন মাথা নেড়ে বল্ল, "হল না।" "তবে কি বেঙ্গা? কি প্যাঁচু?" বামন হাসতে হাসতে বল্ল, "না না। হ'ল না। আবার কাল আসব।"

তার পরদিন বামন আবার এসে বল্ল, "বলতে পার আমার নাম কি?" রাণী বল্লেন, "হয় দাড়িয়াল, নয় ভুঁড়িয়াল, নয় তো বাঁটুল।" "হোঃ হো, হ'ল না। আবার কাল আমি আসব।" বলে

বামন গেল চলে। আর একদিন মোটে বাকি আছে। রাণীর মনে ভারী ভয় হয়েছে। হাজার গণ্ডা নাম আছে পৃথিবীতে, বামনের কি নাম তিনি কি করে জানবেন ? তিনি নামও বলতে পারবেন না, কাজেই ছেলেকেও দিয়ে দিতে হবে।

যে সব লোককে তিনি নাম জানতে পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজন এসে বল্‌ল, "কোন নূতন নাম জানতে পারলাম না। কিন্তু বনের ভিতর দিয়ে আসবার সময়ে একটা ভারি মজা দেখেছি। বনের ভিতরে একটা ছোট পাহাড়ের উপর একটা ছোট্ট ঘর আছে। দেখলাম কি, সেই ঘরের সামনে আগুন জ্বেলে, একজন একহাত লম্বা মানুষ লাফাচ্ছে আর বলছে—

'আজ করব রান্না, খাব পেট ভ'রে,
কাল আনব রাণীর ছেলে, ড্যাং ড্যাং ক'রে ;
আমি রাম-খেল-তিলক-সিং
তাই নাচি তিড়িং তিড়িং তিড়িং।'

এ কথা শুনেই ত রাণী বুঝতে পারলেন যে, একহাত লম্বা মানুষ আর কেউ নয়, সেই বামন, আর তার নাম রাম-খেল-তিলক-সিং। পরের দিন বামন যখন এসে হাসতে হাসতে বল্‌ল, "আজ বল দেখি আমার কি নাম ?" রাণী প্রথমে বল্‌লেন, "তোমার নাম পিঠকুঁজো।' বামন বল্‌ল, "দূর দূর, হ'ল না।" রাণী তখন যেন কতই ভাবছেন এমনি মুখ ক'রে বল্‌লেন, "তবে হাঁড়িমুখো।" বামনের মুখে হাসি আর ধরে না। সে বল্‌ল, "হ'ল না, হ'ল না। আর শুধু একবার।" বলে সে হাততালি দিতে লাগল। শেষে রাণী বললেন, "তবে বুঝি রাম-খেল-তিলক-সিং ?"

এই কথা শুনেই বামন এমন চমকে উঠল যে, আর একটু হ'লে সে পড়েই যেত। তারপর রেগে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চেঁচাতে লাগল, "কোন্ শয়তান তোমাকে ব'লে দিয়েছে, কোন্ ডাইনী তোমাকে বলেছে !" ব'লে সে দুই হাতে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে সেখান থেকে ছুটে পালাল, । এল না।

ভেলকির হুমকি

হেমেন্দ্র কুমার রায়

সবাই বলে গুলে-সর্দ্দার পিশাচ-সিদ্ধ। সে ইচ্ছা করলেই যেখানে খুসি যেতে পারে, যে কো
পশু-পক্ষীর আকার ধরতে পারে, বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে পারে!

গুলে-সর্দ্দারের নামে বর্দ্ধমান জেলার ছেলে-বুড়ো মেয়ে ভয়ে থরহরি কম্পমান! তার ম
সাহসী ও নিষ্ঠুর ডাকাতের নাম আর কখনো শোনা যায় নি!

সে যে কত লোকের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল, কত মানুষের প্রাণ বধ ক'রেছিল, কত গ্রা
জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তার আর কোন হিসাব নেই।

জ্যান্তো বা মৃত—যে অবস্থাতেই হোক্, তাকে ধরতে পারলে সরকার অনেক টাকা বখ্‌সি
দেবেন ব'লে প্রচার করলেন বটে, কিন্তু আজ দশ বৎসরের ভিতরে কেউ তার মাথায় একগাছ
চুল পর্য্যন্ত ছুঁতে পারলেন না! আমার মনেও সন্দেহ হ'ল, তবে কি সত্যই সে ভূতুড়ে মন্ত্রতন্ত্র কি
জানে?

তারপর তার অত্যাচারে আমরা সকলেই যখন দিশেহারা হয়ে উঠেছি,তখন হঠাৎ একদি
শোনা গেল, গুলে-সর্দ্দার ধরা পড়েছে।

॥২॥

মথুরা মণ্ডল ছিল এ অঞ্চলের খুব বড় মহাজন। ডাকাতের দল নিয়ে গুলে-সর্দ্দার এ
অমাবস্যার রাত্রে তার বাড়ী আক্রমণ করলে। ঢেঁকি দিয়ে বাড়ীর দরজা ভেঙে ডাকাতরা ভিত
ঢুকেই দেখ্‌লে, উঠানের উপরে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, স্বয়ং মথুরা মণ্ডল! পর মুহূর্ত্তেই
বন্দুক ছুঁড়লে এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাকাত আহত হয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। কিন্ত
চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে গুলে-সর্দ্দার বাঘের মত মথুরার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল

। দ্বিতীয় বার বন্দুক ছোঁড়বার আগেই গুলে তার ধারালো রাম-দা চালালে বেচারা মথুরার থা উড়ে গেল তখনি।

মথুরা মারা পড়ল বটে, কিন্তু তার ভাগ্নে ছিল উঠানের পাশের একখানা ঘরে। সেইখান সে জান্‌লা দিয়ে ক্রমাগত বন্দুক ছুঁড়তে লাগল। বেগতিক দেখে ডাকাতের দল ভয়ে থেকে চম্পট দিলে। কিন্তু পালাবার সময়ে গুলে-সর্দ্দার অন্ধকারে পাঁচিলের উপর থেকে নভাবে হুম্‌ড়ি খেয়ে মাটির উপরে এসে পড়ল যে, তখনি অজ্ঞান হয়ে গেল। তাকে বন্দী া হ'ল সেই সুযোগে।

॥ ৩ ॥

সেখানকার থানার ইন্‌স্পেক্টর ছিলুম আমি। গাঁয়ের লোকেরা গুলে-সর্দ্দারকে আমার কাছে রে নিয়ে এল।

লোকটার চেহারা কি ভয়ানক!—মাথায় একগাছা চুল নেই, চোখ দুটো ভাঁটার মত াল,—জবাফুলের মত লাল, নাক খ্যাঁদা, গোঁফ বিড়ালের মত, হাতে কাঁধে আর বুকে লোহার ত শক্ত শক্ত মাংসপেশী। লম্বায় সে প্রায় সাড়ে ছ'ফুট উঁচু এবং তার গায়ের রং আবলুস কাঠের ত কুচ্‌কুচে কালো। তার গায়ে আর কাপড়ে রক্ত মাখা থাকাতে তাকে আরো ভয়ানক খাচ্ছিল।

যদিও তার হাত-পা বাঁধা, তবু তাকে দেখে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। াহারাওয়ালাদের হুকুম দিলুম, তারা যেন সর্দ্দারের চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুলে দাঁত বার ক'রে হেসে বললে, "যতই ঘিরে থাকো আর হাত-পা বাঁধো বাবা, আমাকে কেউ ধ'রে রাখতে পারবে না!"

এমন সময়ে পুলিসের বড় সাহেব খবর পেয়ে তাকে দেখতে এলেন। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে াকে দেখে সাহেব বললেন, "সর্দ্দার, আর তুমি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না!"

গুলে ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাস্য ক'রে বললে, "আরে রেখে দাও সায়েব, তোমাদের বাহাদুরি! ামাকে ধ'রে রাখে কে, আমি পাখী হয়ে উড়ে পালাব।"

সাহেব বললেন, "ননসেন্স! ....এই সেপাই, আসামীকো গারদ মে লে যাও!"

গুলে আবার অট্টহাস্য ক'রে দুই হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে, "এই ব'লে রাখলুম ায়েব, আমি তোমাদের ঠিক কলা দেখাব।"

॥ ৪ ॥

বিচারে গুলে-সর্দ্দারের ফাঁসির হুকুম হ'ল! ফাঁসির কথা শুনে সে আদালতের মাঝখানেই কামরে হাত দিয়ে নাচতে নাচতে হেঁড়ে গলায় গান ধ'রে দিলে! জজ-সাহেব তো অবাক! ামি ভেবেছিলুম, তার এই মুখসাবাসি আর বেশীদিন থাকবে না। কিন্তু ফাঁসির দিন যতই নিয়ে আসতে লাগল, তার হাসি-ঠাট্টা বেড়ে উঠল যেন ততই। রোজই সে বলত, "আমার সখ ব'লেই দিনকয়েক জেলখানার ভেতরে ব'সে জিরিয়ে নিচ্চি! ...কিন্তু ফাঁসির দিন কেউ ামাকে খুঁজে পাবে না!"

জেলের প্রহরীরা সকলেই তার এই সব কথা বিশ্বাস করত। তারা আমাকে বললে, "হুজুর, ও । যাদুকর! ও নিশ্চয়ই আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাবে। আমরা কি করব বলুন, ও যদি রাত্তির বেলায় মশা-মাছি হয়ে উড়ে যায়, কে ওকে দেখতে পাবে?" বলতে লজ্জা হয়, কিন্তু আমারও

মনে কেমন একটা খটকা লাগল।

গুলে-সর্দ্দারের ফাঁসির ঠিক আগের দিনে আমি পুলিসের বড় সাহেবের কাছে গিয়ে, মনের সন্দেহের কথা খুলে বললুম। সাহেব প্রথমটা হেসেই আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন "ও-সব বাজে কথা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই।"

আমি বললুম, "সায়েব, আমাদের দেশে কিন্তু ভোজবাজীতে মানুষ উড়িয়ে নিয়ে যাওয় কথা শোনা যায়।"

—"এমন ব্যাপার তুমি নিজে কখনো দেখেচ ?"

—"না।"

—"তবে ?"

—"কিন্তু অনেক ঘটনার কথা শুনেছি। গুলে-সর্দ্দার যে রোজ এককথাই বলচে, আর ফাঁসির হুকুম পেয়েও এতটা মনের খুসিতে আছে, এর কারণ কি ?"

সাহেব খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করলেন। তারপর দোমনার মতন বললেন, "দেখ, যদিও আমি এ-সব আজগুবি ব্যাপারে বিশ্বাস করি না, তবু সাবধানের মার নেই। কাল সকালে তো সর্দ্দারের ফাঁসি হবে ? আচ্ছা, আজ রাতে তার ঘরের সামনে আমরা দুজনেই পাহারা দেব !"

॥ ৫ ॥

গুলে-সর্দ্দার যে ঘরে বন্দী ছিল, তার দরজার সামনে সাহেব আর আমি দু'খানা চেয়ারের উপরে ব'সে আছি। আমাদের আশেপাশে আরো দুজন প্রহরী। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি, ঘরের

। ব'সে গুলে-সর্দ্দার প্রাণের ফুর্তিতে তুড়ি দিয়ে গান গাইছে।

রাত ক্রমে গভীর হয়ে উঠল। ....এখন গানের বদলে গুলের ভীষণ নাসা গর্জ্জন শুনতে ়! কাল সকালে তার ফাঁসি, আর আজ সে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা দিচ্ছে! আমার মনটা সন্দেহে পূর্ণ হয়ে উঠল। ...কিন্তু ঢং ঢং ক'রে তিনটে বাজল, তবু তো অস্বাভাবিক কিছুই ঘটল না।

সাহেব কৌতুক-হাস্য করে বললেন, "বাবু, দেখচ তো, একালে ভোজবাজি আর চলে না?"

আমি আর কিছু বললুম না! নিজের কুসংস্কারে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল।

... .

প্রায় যখন ভোর হয়ে এসেছে, তখন সাহেব আর আমি দুজনেই একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলুম। াৎ প্রহরীদের চীৎকারে চম্‌কে মাথা তুলে দেখি, কয়েদখানার দেয়ালের ঘুল্‌ঘুলির নীচেই একটা ভয়ঙ্কর কালো বিড়াল দাঁড়িয়ে আছে! আমরা সকলেই তার দিকে ছুটে গেলুম। ...কেউ কেউ বন্দুকের কুঁদো ও কেউ লাথি তুলে তাকে বারবার মারবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সেই বিড়ালটা আমাদের সকলকেই এড়িয়ে, উঠানের দিকে চোঁচা দৌড় মারলে।

—"Look out!"—ব'লেই পুলিস-সাহেব তাঁর রিভলভার তুলে ঘোড়া টিপলেন, গুলিটা লের পিছনের একটা পায়ে গিয়ে লাগল, সে আর্ত্তনাদ ক'রে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আরো ই-এক পা এগিয়ে স্থির হয়ে প'ড়ে রইল! আমরা ছুটে কয়েদখানার ঘুলঘুলির কাছে গিয়ে উঁকি দেখলুম, গুলে-সর্দ্দার ঘরের মেঝের উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে যন্ত্রণাপূর্ণ স্বরে আমাদের লক্ষ্য ক'রে গালাগালি দিচ্ছে!

আমি আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, "আসামী ঘরের ভেতরেই আছে!"

সাহেব রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "থাকবে না তো যাবে কোথায়! -সব কুসংস্কার আমি মানি না—যদিও প্রথমটায় আমারো সন্দেহ হয়েছিল।"

॥ ৬ ॥

গল্পটা এইখানেই শেষ করা যাক্—বাকি আছে খালি আর দুটো কথা।

আজ সকালে যথাসময়ে গুলে-সর্দ্দারকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু তাকে নিয়ে যাবার সময়ে দেখা গেল, তার একখানা পা হঠাৎ ভেঙে গেছে, সে অত্যন্ত । খুঁড়িয়ে চলেছে।
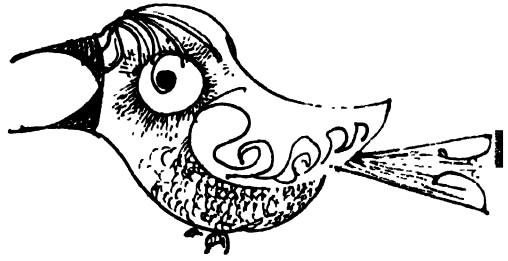
দ্রিঘাংচু

সুকুমার রায়

এক ছিল রাজা।

রাজা একদিন সভায় বসেছেন—চারিদিকে তাঁর পাত্রমিত্র আমির ওমরা সিপাই শান্ত্রী গি গিজ্ করছে—এমন সময় কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক উড়ে এসে সিংহাসনের ডান দিকে উঁ থামের উপর ব'সে ঘাড় নিচু ক'রে চারদিক তাকিয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কঃ"।

কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এ রকম গম্ভীর শব্দ—সভাসুদ্ধ সকলের চোখ এক সঙ্গে গো হয়ে উঠল—সকলে একেবারে একসঙ্গে হাঁ ক'রে রইল। মন্ত্রী এক তাড়া কাগজ নিয়ে কি যে বোঝাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বক্তৃতার খেই হারিয়ে তিনি বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন। দরজা কাছে একটা ছেলে বসেছিল, সে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে উঠল, যে লোকটা চামর দোলাচ্ছিল চামরটা তার হাত থেকে ঠাই ক'রে রাজার মাথার উপর পড়ে গেল। রাজা মশাইয়ের চোখ ঘু ঢুলে এসেছিল, তিনি হঠাৎ জেগে উঠেই বললেন, "জল্লাদ ডাক।"

বলতেই জল্লাদ এসে হাজির। রাজা মশাই বললেন, "মাথা কেটে ফেল।" সর্বনাশ! কা মাথা কাটতে বলে; সকলে ভয়ে ভয়ে নিজের নিজের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। রাজা মশা খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে আবার তাকিয়ে বললেন, "কই মাথা কই?" জল্লাদ বেচারা হাত জোড় ক' বলল, "আজ্ঞে মহারাজ, কার মাথা?" রাজা বললেন, "বেটা গোমুখ্যু কোথাকার, কার মাথ কিরে! যে ঐ রকম বিটকেল শব্দ করেছিল, তার মাথা।" শুনে সভাসুদ্ধ সকলে হাঁফ ছেড়ে এম ভয়ানক নিশ্বাস ফেলল যে, কাকটা হঠাৎ ধড়ফড় ক'রে সেখান থেকে উড়ে পালাল।

তখন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বুঝিয়ে বললেন যে, ঐ কাকটাই ওরকম আওয়াজ করেছিল! তখ রাজা মশাই বললেন, "ডাকো, পণ্ডিত সভার যত পণ্ডিত সবাইকে।" হুকুম হওয়া মাত্র পাঁ মিনিটের মধ্যে রাজ্যের যত পণ্ডিত সব সভায় এসে হাজির।

তখন রাজা মশাই পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে একটা কাক এসে আমার সভার ধ্যে আওয়াজ করে গোল বাধিয়ে গেল, এর কারণ কিছু বলতে পার ?"

কাক আওয়াজ করল তার আবার কারণ কি! পণ্ডিতেরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে াাগলেন। একজন ছোকরা মতো পণ্ডিত খানিকক্ষণ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল,—"আজ্ঞে, বোধ হয় তার খিদে পেয়েছিল।"

রাজা মশাই বললেন, "তোমার যেমন বুদ্ধি! খিদে পেয়েছিল, তা সভার মধ্যে আসতে যাবে ।? এখানে কি মুড়ি মুড়কি বিক্রি হয়! মন্ত্রী, ওকে বিদেয় ক'রে দাও—" সকলে মহা তম্বী ক'রে বললে, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ওকে বিদেয় করুন।"

আর একজন পণ্ডিত বললেন, "মহারাজ, কার্য থাকলেই তার কারণ আছে—বৃষ্টি হলেই বুঝবে মেঘ আছে, আলো দেখলেই বুঝবে প্রদীপ আছে, সুতরাং বায়স পক্ষীর কণ্ঠনির্গত এই রূপরূপ ধ্বনিরূপ কার্যের নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকবে, এতে আশ্চর্য কি ?"

রাজা বললেন, "আশ্চর্য এই যে, তোমার মতো মোটা বুদ্ধি লোকেও এই রকম আবোল াল বকে মোটা মোটা মাইনে পাও। মন্ত্রী, আজ থেকে এঁর মাইনে বন্ধ কর।" অমনি সকলে হাঁ করে উঠলেন, "মাইনে বন্ধ কর।"

দুই পণ্ডিতের এ রকম দুর্দশা দেখে সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। মিনিটের পর মিনিট যায়, ঁ আর কথা কয় না। তখন রাজা মশাই দস্তুরমতো খেপে গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন, এর । না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সভা ছেড়ে না ওঠে। রাজার হুকুম—সকলে আড়ষ্ট হয়ে বসে ।। ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ ঘেমে ঝোল হয়ে উঠল, চুলকিয়ে চুলকিয়ে কারো কারো

মাথায় প্রকাণ্ড টাক পড়ে গেল। বসে বসে সকলের খিদে বাড়তে লাগল—রাজা মশাইয়ে
খিদেও নেই, বিশ্রামও নেই—তিনি বসে বসে ঝিমুতে লাগলেন।

সকলে যখন হতাশ হয়ে এসেছে, আর মনে মনে পণ্ডিতদের "মূর্খ অপদার্থ নিষ্কর্মা" ব'
গাল দিচ্ছে, এমন সময় রোগা সুঁটকো মতো একজন লোক হঠাৎ বিকট চীৎকার ক'রে সভা
মাঝখানে পড়ে গেল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র উজির নাজির সবাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কী হলে
কী হলো ?"

তখন অনেক জলের ছিটা পাখার বাতাস আর বলা কওয়ার পর লোকটা কাঁপতে কাঁপ
উঠে বলল, "মহারাজ, সেটা কী দাঁড়কাক ছিল ?" সকলে বলল, "হাঁ-হাঁ-হাঁ, কেন বল দেখি
লোকটা আবার বলল, "মহারাজ, সে কি ঐ মাথার উপর দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসেছিল—
মাথা নিচু ক'রে ছিল, আর চোখ পাকিয়েছিল, আর 'কঃ' ক'রে শব্দ করেছিল ?" সকলে ভয়া
ব্যস্ত হয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ—ঠিক ঐ রকম হয়েছিল।" তাই শুনে লোকটা আবার ভেউ ভে
ক'রে কাঁদতে লাগল—আর বলতে লাগল, "হায়, হায়, সেই সময়ে কেউ আমায় খবর দিলে
কেন ?"

রাজা বললেন, "তাই তো, একে তোমরা তখন খবর দাওনি কেন ?" লোকটাকে
চেনে না, তবু সে কথা বলতে সাহস পেল না, সবাই বললে, "হ্যাঁ, ওকে একটা খবর
উচিত ছিল"—যদিও কেন তাকে খবর দেবে, আর কী খবর দেবে, একথা কেউই বুঝতে পার
না। লোকটা তখন খুব খানিকটা কেঁদে তারপর মুখ বিকৃত ক'রে বলল, "দ্রিঘাংচু"। সে
কি ! সবাই ভাবল, লোকটা খেপে গেছে।

মন্ত্রী বললেন, "দ্রিঘাঞ্চু কি হে ?" লোকটা বলল, "দিঘাঞ্চু নয়, দ্রিঘাংচু।" কেউ কিছু বুঝ
পারল না—তবু সবাই মাথা নেড়ে বলল, "ও !" তখন রাজা মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "সে
রকম হে ?" লোকটা বলল, "আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থে
দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখ
দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের ডান দিকের থামের উপর ব'
মাথা নিচু ক'রে দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে, চোখ পাকিয়ে 'কঃ' ব'লে শব্দ করে। আমি তো
কিছু জানি না—তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" পণ্ডিতেরা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "
না, ওর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।"

রাজা বললেন, "তোমায় খবর দেয়নি ব'লে কাঁদছিলে, তুমি থাকলে করতে কী ?" লোক
বলল, "মহারাজ, সে কথা বললে লোকে যদি বিশ্বাস না করে, তাই বলতে সাহস হয় না।"

রাজা বললেন, "যে বিশ্বাস করবে না, তার মাথা কাটা যাবে—তুমি নির্ভয়ে ব'লে ফেল।
সভাসুদ্ধ লোক তাতে হাঁ হাঁ ক'রে সায় দিয়ে উঠল।

লোকটা তখন বলল, "মহারাজ, আমি একটা মন্ত্র জানি, আমি যুগজন্ম ধরে বসে
দ্রিঘাংচুর দেখা পেলে সেই মন্ত্র যদি তাকে বলতে পারতাম তা হলে কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হত
কেউ জানে না। কারণ, তার কথা কোনো বইয়ে লেখেনি। হায় রে হায়, এমন সুযোগ আর
পাব ?" রাজা বললেন, "মন্ত্রটা আমায় বলত।" লোকটা বলল, "সর্ব্বনাশ ! সে মন্ত্র দ্রিঘাং
সামনে ছাড়া কারুর কাছে উচ্চারণ করতে নেই। আমি একটা কাগজে লিখে দিচ্ছি—
দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালে উঠে সেটা পড়ে দেখবেন। আপনার
দাঁড়কাক দেখলে, তাকে আপনি মন্ত্র শোনাতে পারেন, কিন্তু খবরদার, আর কেউ যেন তা

শোনে—কারণ, দাঁড়কাক যদি ড্রিঘাংচু না হয়, আর তাকে মন্ত্র বলতে গিয়ে অন্য লোকে শুনে ন, তা হ'লেই সর্বনাশ!"

তখন সভা ভঙ্গ হল। সভার সকলে এতক্ষণ হাঁ ক'রে শুনছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; । ড্রিঘাংচুর কথা, মন্ত্রের কথা আর আশ্চর্য ফল পাওয়ার কথা বলাবলি করতে করতে বাড়ি গেল।

তারপর রাজা মশাই দু'দিন উপোস ক'রে তিন দিনের দিন সকালবেলা—সেই লোকটার । কাগজখানা খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আছে—

"হল্‌দে সবুজ ওরাং ওটাং
ইঁট পাট্‌কেল চিৎ পটাং
মুস্কিল আসান উড়ে মালি
ধর্মতলা কর্মখালি।"

রাজা মশাই গম্ভীরভাবে এটা মুখস্থ ক'রে নিলেন। তারপর থেকে তিনি দাঁড়কাক দেখলেই সব তাড়িয়ে তাকে মন্ত্র শোনাতেন, আর চেয়ে দেখতেন কোনো রকম আশ্চর্য কিছু । কি না! কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি ড্রিঘাংচুর কোনো সন্ধান পাননি।
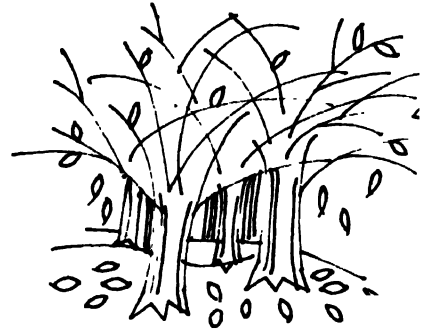
ঠেলাগাড়ী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি, রোদ তখনও ভালোরকম ওঠেনি—খিড়কি দোরের জগডুমুর গাছটার মাথায় গোটাকতক শালিখ পাখীতে কিচ্ কিচ্ ও ঝটাপটি বাধিয়েছে—আমি উঠে মনে মনে তোলাপাড়া করছি যে কাল রাত্রের বাসি কলার বড়া যা আমাদের জন্যে রান্নাঘরে ঝুলন্ত শিকায় বড় জাম বাটিতে টাঙানো আছে—তা কোন্ অছিলায় মার কাছে চাওয়া যায়, বা মুখ ধোবার পূর্বে তা চাইতে গেলে সেটা শোভনীয়ই বা কতদূর হবে—এমন সময় আমাদের বাহির দরজার কাছে একটা ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রিনরিনে গলায় ডাক শোনা গেল—

—টুনি-ই-ই-দা-আ-আ—ও টুনি ····

অমনি আমার বৃদ্ধা জেঠাইমা মারমুখী হয়ে কি একটা হাতে উঁচিয়ে ছুটে গেলেন—সকাল বেলা জুটলে এসে? এখনো কাক-পক্ষীর ঘুম ভাঙেনি, অমনি এলে ছেলেটাকে টুইয়ে বার ক'রে নিয়ে যেতে? সকাল নেই, সন্দে নেই, দুপুর নেই, সব সময় ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ—যাই দিকি একবার হর গাঙ্গুলীর কাছে, বলি, ছেলেটাকে যে দিন নেই রাত নেই গাড়ী ঘড়ঘড় ক'রে বেড়াতে দিচ্ছ, ওর পরকালটা যে ঝরঝরে হয়ে গেল—যা এখন যা, টুনি এখন যাবে না। গাড়ীর ঘড়ঘড় সহ্যি হয় না বাপু সব সময়—যা ওসব নিয়ে যা ····

আমি নিরীহ মুখে পূজনীয়া জেঠাইমার পিছনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গাড়ীর শব্দ আমাদের ঘাটের পথ দিয়ে দূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল, তারপর হাত-মুখ ধুতে গিয়ে খিড়কি দোরের কাছে মৃদু শব্দ কানে এল—ও টুনিদা? ··· আমি একবার পিছন ফিরে জেঠাইমার অবস্থিতি ও তাঁর দৃষ্টির গতির দিগ নির্ণয় ক'রে নিয়েই ঝট্ করে খিড়কি দোরটা খুলে বার হয়ে এ সকালের পদ্মের মত নির্মল, প্রফুল্ল, তরুণ নরু হাসিভরা ডাগর চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসবি নে টুনিদা?

—এই উঠলাম যে, এখনও মুখ ধুইনি, খাবারও খাইনি—বাড়ীর মধ্যে আয় না!

নরু চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বললে—কোথায়?

—কিছু বলবে না জেঠাইমা, আয় তুই ···

উত্থাপিত প্রস্তাবে সে মনে প্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হ'ল না।

—তুই আয় মুখ ধুয়ে টুনিদা—আমি চাল্‌তেতলায় আছি গাড়ী নিয়ে, চড়বি তো টুনিদা?

দুজনে মিলে পাড়ায় বেরিয়ে গেলুম। তেঁতুলতলায় খেলার জায়গায় খুব ভিড়—মুখুজ্যে পাড়ার কোন ছেলে আর বাকী নেই। নরু হাসিমুখে বললে—আয় পটুদা, নিতাইদা—আমি গাড়ী এনেছি—দেখ্ ঠিক সময়টা আসিনি? আয় চড় ···· গাড়ী একা নরুই টানতে লাগল। চড়ল সকলেই। পটু বললে—দুপুর বেলা আমাদের বাড়ী যাবি নরু?

নরু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে।

পটু বললে—যাস তুই—সেদিন যে একেবারে কাকার সামনে গিয়ে পড়েছিলি, তা কি হবে?

নরু বললে—আমি আর যাচ্ছিনে তোমাদের বাড়ী পটুদা। তোমার কাকা সেদিন একেবারে মারতে··· বললে রোজ রোজ গাড়ী ঠেলে বেড়ানো বার করছি। আমি না পালালে সেদিন মার খেতাম ঠিক। যদি এর পর গাড়ী কেড়ে রাখে?

সেখান থেকে দুজনে গিয়ে পথের ধারে বড় জামতলার ছায়ায় ব'সে গল্প করলুম। রোজই কত গল্প হ'ত। এর পরে কে কি হবে তাই নিয়ে গল্প।

খোকার অত ভবিষ্যৎ ভেবে দেখবার বয়স হয়নি! সে এর পরে কি হবে অত গুছিয়ে বলতে পারে না—খাপছাড়া ভাবে উত্তর দেয়, বলে—সে নৌকোর মাঝির সর্দার হবে, রেল গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবে, ইস্টিমার যারা চালায়, তাদের কি বলে—তাও হতে চায়। আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় একটু অকালপক্ক, বলতাম—আমি ভাই সায়েব ডাক্তার হবো। মহকুমার হাকিম হবো। ····

অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙামুখে বাড়ী ফিরত। বাবা যেদিকে বসে, সেদিকে না গিয়ে চুপি চুপি অন্য দিক দিয়ে বাড়ী ঢোকে। মা বলত—ওরে দুষ্টু, তুমি সেই বেরিয়েছ কোন্ সকালে, আর এই দুপুর ঘুরে গেল, এখন তুমি ···

খোকা বলে—চুপ চুপ—না, আমি তো ওই ওদের বাড়ীর জামতলায় চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে খেলা কচ্ছিলাম, আমি আর টুনিদা—কোথাও তো যাইনি মা! সত্যি ···

কি জানি কেন ওকে বড় ভালোবাসতুম। গ্রামের সকল ছেলের চেয়ে এর মুখে চোখে, কথায় কি মোহ যে ছিল—সারাদিনটির মধ্যে একবার অন্তত ওর সঙ্গে না দেখা ক'রে পারতুম না। খোকাও আমার বাড়ী না হয়ে পাড়ার অন্য কোথাও বেরুত না।

এক-একদিন আমাদের বাড়ীর সামনের জামতলা দিয়ে সে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায় দুপুরের আগে। আমার দিকে চেয়ে বলে—এমন দুষ্টু এই নিতাইটা, এত ক'রে বললুম, চড় গাড়ীতে, আয় তোকে ঠেলে গয়লাপাড়া ঘুরিয়ে আনি ··· তা কিছুতে চড়লো না, বললে, মা বকবে, তেল আনতে যাচ্ছি—আয় চড়বি টুনিদা?

—তোর বুঝি আজ আর কেউ চড়ার লোক হয়নি খোকা?

—আমাদের পাড়ায় কেউ চড়লে না, কখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সব যা দুষ্টু। আসবি টুনিদা?

খোকার চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তখনকার দিনে আমার এড়াবার সাধ্য হ'ত না কোনমতেই। আমি চড়তুম। মহা খুশির সঙ্গে খোকা চৈত্র-বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্যকে উপেক্ষা ও

অবজ্ঞা ক'রে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াত··· সূর্য্যও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওর কচি মুখ রাঙিয়ে দিতেন, ঘামে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

তার বয়স অল্প ও দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ মেয়েলী ধরণের ছিল ব'লে পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে বলে সে পেরে উঠত না ····সকলের কাছে তাকে অবিচার সহ্য করতে হ'ত। দুর্বলের প্রতি সবলের অধিকার তার ওপর নির্বিবাদে জারি করত সকলেই।

সেদিনটা ছিল ভারি গরম। চৈত্র-বৈশাখের দিন গ্রামের পথের ধুলো তেতে আগুন হয়েছে—পঞ্চাননতলায় বারোয়ারীর আসর সাজানো, বাঁশের মাচা বাঁধা—সবাই কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটছে।

বড় পিটুলি গাছতলাটায় তার ঠেলাগাড়ির ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল। অনু বললে—ওই নরু আসছে। পিছনে পরমসঙ্গী কেরোসিনের ঠেলাগাড়ীটা টেনে নরু হাজির। বাঁধা আসরের দিকে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে—যাত্রা কবে বস্‌বে রে টুনিদা ?

সংবাদ সংগ্রহের পর সে সন্তোষের হাসি হাসল। আঙুল দিয়ে গাড়ীটার দিকে দেখিয়ে বললে—চড়বি পটুদা ? পটু ঘাড় নেড়ে বললে—চড়ব, টানবে কে ?

খোকা খুব খুশি হয়ে বললে—কেন আমি ?

আসন্ন আমোদের প্রত্যাশায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পটু বললে, দূর, তুই বুঝি টানতে পারিস ? টান দিকি কেমন—হয় না আর আমাকে···

—বসো না ? টানতে কেমন পারিনে !

পটুর পাল্লা শেষ হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে অনু, বরু, হরু উপস্থিত সব ছেলেই উঠল গাড়ীতে। এদের মধ্যে বড় ছোট সব রকমই আছে, টানতে টানতে খোকা হয়রান হয়ে পড়লেও সে

উৎসাহের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ঠিক টেনে নিয়ে বেড়াল সকলকে। সকলের শেষ হয়ে গেলে সে হেসে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমায় একটু এইবার টান।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলে। ভাবে বোঝা গেল, তাকে কেউ টানতে রাজী নয়। তার প্রতি কৃপা ক'রে তার গাড়ীতে চ'ড়ে তাকে দিয়ে টানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা হয়েছে, এতে আবার তার পরকে দিয়ে টানাবার কোন্ দাবী আছে? সকলে মিলে এই ভাবটা দেখালে।

—বাঃ, সকলকে চড়িয়ে দিলাম, আর আমার বেলায় বুঝি কেউ ···

আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে টানি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপহাসের ভয়েই হোক বা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকার দরুণই হোক—যেতে পারলুম না। সে গাড়ী টেনে নিয়ে চ'লে গেল। এদের মধ্যে পূর্বে কি পরামর্শ হয়েছিল আমার জানা নেই—গাড়ীখানা খানিক দূর যেতে না যেতেই দলের একজন একটা বড় ঝামা ইঁট নিয়ে গাড়ীতে ছুঁড়ে মেরে বসল।

গাড়ীখানার তলা তখনি মচ্ মচ্ ক'রে দেশলাইয়ের বাক্সের মত ভেঙে গেল। খোকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল—পরে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে এসে গাড়ীর অবস্থা দেখেই আর একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে। তারপর সে চাইলে আমার দিকে—তার চোখে সে ব্যথা-ভরা বিস্ময়ের অপ্রত্যাশিত না-বুঝতে-পারা দৃষ্টি আমার বুকে তীরের মত বিঁধল। ভাবল এই রকম যে, তুইও টুনিদা এর মধ্যে?

কিন্তু সে কোন কথা কাউকে না বলে ভাঙা গাড়ীটার পাশে ব'সে প'ড়ে দেখতে লাগল। এর আগেই আমাদের দল সেখান থেকে স'রে পড়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ সে ব'সে ব'সে নেড়েচেড়ে দেখলে গাড়ীখানার ভাঙা তলাটা কি ক'রে সারানো যায়। পাশে একটা ছোট বাকস্ ফুলের গাছের সাদা ডালে থোলো থোলো বাকস্ ফুল দুলছিল—তারই পাশে গাব্ ভেরেণ্ডার ঝোপের ধারে সে গাড়ীখানা রেখে খানিক ব'সে ব'সে পরে ঠেলে নিয়ে গেল।

সারারাত ভাল ঘুম হ'ল না। সকালে ওদের বাড়ী ছুটে গিয়ে যদি ভাব ক'রে ফেলতুম তো বেশ হ'ত, কিন্তু কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল। খোকা রোজ সকালে আসে, সেদিন এল না, অভিমানে ভুল বুঝেছে।

দু'তিন দিন ক'রে সপ্তাহখানেক কেটে গেল।

অল্পদিন পরেই আমি বাড়ীর সকলের সঙ্গে মামার বাড়ী চ'লে গেলুম ছোট মাসীমার বিয়েতে। ফিরতে হয়ে গেল আট-দশ মাস।

খোকাকে ফিরে এসে আর দেখিনি। আগের পৌষ মাসে সে হুপিংকাশিতে মারা গিয়েছে। ফেরবার দিন দশেক পরে একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম। খোকার মা উঠানে কুল রৌদ্রে দিয়েছিল, তখন তুলছে, আমায় দেখে বললে—টুনি, তোরা দেশে এলি? ···আমি কোন কথা বলার আগেই তার মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—তবুও এসেছিস তুই টুনি—আর কি কেউ আসবে এ বাড়ী বেড়াতে? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েছে রে! বোস্ বোস্, বাতাবী নেবু পাকা ঘরে আছে, কেটে দেব, খাবি নুন দিয়ে? ওই পেকে পেকে থাকে, কেউ খায় না—খোকা কত খেত—খা না ব'সে ব'সে।

শরতের অপরাহ্ন। নির্মেঘ নীল আকাশের তলায় অবসন্ন বৈকালের রৌদ্রে ডানা মেলে কি

পাখী উড়ে চলেছে। কার্নিস ভাঙা ছাদের ফাটলে কোথায় ঘুঘুর ডাক···· উঠানের ছায়াস্নিগ্ধ বাতাস শুকনো কুলের গন্ধে ভরপুর! ···

খোকার সেই ঠেলাগাড়ীখানা দেখলুম—কাঠের মাচার নীচে তোলা আছে। দড়িটা পর্যন্ত। অনেকদিন গাড়ীটাতে কেউ হাতও দেয়নি।

বহুকালের কথা হলেও আমি কিন্তু চোখ বুজে ভাবলেই দেখতে পাই—কতকাল আগেকার আট বৎসরের সেই ছোট্ট খোকাটি ঠেলাগাড়ীটা টেনে নিয়েবেড়াচ্ছে। নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালেদের জামরুল বাগানের ছায়ায় ···আমাদের বড় মাদার গাছটার তলাকার পথ দিয়ে, রাঙা মুখে আশা ও আনন্দ-ভরা উজ্জ্বল চোখে সে তার কেরোসিন কাঠের গাড়ীখানা টেনে টেনে আসছে ···নারিকেলতলা বেয়ে—পটুদের বড় দো-ফলা আমগাছটার তলা বেয়ে··· যেতে যেতে ক্রমে তার মূর্তি মাইতি-পুকুরের মোড়ের পথে সুপারি গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ····
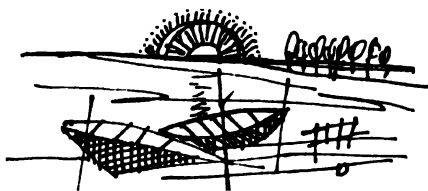
মিঞা ভাই

ইবরাহীম খাঁ

মনে মনে ষড়যন্ত্র করেই ইস্কুল কমিটীর সভা সেদিন বেলা ৮ টায় দিয়েছিলাম। আশা ছিল, বেলা ১০ টার মধ্যে সভা শেষ হয়ে যাবে, ১২টা মধ্যে বাড়ী এসে খাওয়া দাওয়া করব, তারপর ১টার মধ্যে ছিপ নিয়ে বসুদের পুকুরের দিকে বেরিয়ে পড়তে পারব।

কিন্তু হায়রে কপাল! সভা শেষ করতেই বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেল। কমিটীর মেম্বরেরা যার যার বাড়ী চল্ল, কেবল আমি গালে হাত দিয়ে সেখানেই গুম হয়ে বসে রইলাম।

ভাবলাম, আজের মাছ ধরা সত্যি ভেস্তে গেল। কিন্তু কি বুদ্ধি এই মেম্বরগুলোর! ইস্কুলে কোষ নাই, অথচ কোষাধ্যক্ষ হওয়ার জন্য তারা তিনজনে তিনঘন্টাভর ধবস্তাধবস্তি করল! একটা লাশ পড়ে যায় নাই, এই-ই ভাগ্যি!

শুধু বসুদের পুকুরের কথা ভাবতে মনটা খুঁত খুঁত করে উঠল ঃ আচ্ছা, বসুরা তো পুকুরে মাচা বেঁধে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে, তারপর চাতকের মত চেয়ে থাকার পরো যখন দেখবে যে আমরা আর গেলাম না, তখন তারা কি ভাববে? বড় আশা নিয়ে চারে মাছেরা আসবে—রৌ কাতলা, মীরকা, তারা বড়শী খুঁজবে, না পেয়ে গোশ্‌শায় পুচ্ছ প্রহারে পুকুরের পানি তোলপাড় করে তুলবে, তখন কেমন দেখাবে? মাছেরা আখেরে বদ-দোয়া করবে না তো?

আখেরে আমি উঠে বাড়ী চল্লাম। পয়লা আষাঢ়ের আকাশ, অথচ তার বুকে এক টুকরা মেঘ নাই। দুপুরের রোদ হাওয়ার দোলায় চড়ে দিকে দিকে গরমের পিচকারী ছুঁড়ে ফিরছে। বেদেল হয়ে উঠলাম।

একটু পর হঠাৎ একটি বাচ্চা সাথী মিল্ল। বেঁচে গেলাম। বছর সাতেকের একটি ছেলে—পরনে গামছা—একটা খালি দুধের ভাঁড় হাতে দুলিয়ে ক্ষেতের বাতর বেয়ে বেয়ে চলছে আর আনমনে গুনগুন করছে ঃ তাইরে নাইরে নাইরে না।

ছেলেটির কাছে গেলাম। আমাদের কথাবার্তা শুরু হল।

'তোমার নাম কি, চাচা ?

'ইস ! এতবড় বুইড়া মানুষ, আমি আবার তারই চাচা ! আমি কি বুইড়া অইছিনা ? তারুণ্যের চিরন্তন প্রতিবাদ।

'না-না, চাচা নয়—চাচা নয় ; ভাইস্তা-ভাইস্তা।

'হ্যাঁ, এহন সে কথা মানায়।

'তোমার নাম কি, ভাইস্তা ?

'হোনা শেখ।

'সোনা শেখ ? বাঃ বেশ ভাল নামটি তো ?

'হুঁ—কত ভালা। পোলাপানে খালি সে ক্ষেপায়।

'এই ভাল নাম নিয়ে ক্ষেপায় ? আচ্ছা, কি কয়ে ক্ষেপায়, ভাইস্তা ?

'হ্যাঁ—তোমারে কইয়া দেই, আর তুমি ক্ষেপাও !

'না—না, আমি কখখনো ক্ষেপাব না। বল, ওরা কি কয়।

'গরু রাখবার যাই তো; তহন রাহালেরা কয়

হোনা শেখ হোনা
ধান ক্ষেতের কোনা,
আষাঢ় মাসের বিলের পারে
ছাইতান মাছের পোনা।

'ওহ্ ! এ তো ওদের ভারী অন্যায় ! আচ্ছা, তুমিও ওদের ক্ষেপাও না ?

'আমিও ক্ষেপাই ! ওদের ক্ষেপানি হুইনাও আমি চুপ থাকমু না ?

'না তা কি চুপ থাকতে পার ? আচ্ছা, তুমি কি কও ?

'ওয়াগরে একজনের নাম আছীর কিনা, আমি ক্ষেপাই

আছীরার আ—ছী,
ভাঙ্গা নায়ের কা—ছি,
ধইরা ধইরা না—চি।

'বাঃ তোমার ক্ষেপানিটাই তো ভাল !

'ভালা অবনা ? আমি কদর আলীর পুত না ? আমাগরে বা-জান কত মানষেরে ধুয়া বাইন্দা দেয়।

'ও—তুমি কদর আলী শেখের ছেলে ?

'বাঃ রে বাঃ ! ভাইয়েরে চিনোনা, ভাইস্তারে চিনো, খুব তো মানুষ !

'চিনি-চিনি, ভাইস্তা, কদর আলী ভাইকে চিনি। —আচ্ছা, ভাইস্তা তোমার হাতে ঐ যে ভাঁড়, ওতে করে বুঝি কাঁঠাল বেচতে বাজারে গিয়েছিলে ?

'মানুষটা পাগল না কি রে ! আচ্ছা, এই ছোট্ট ভারের মুখ দিয়া ঐ বড় বড় কাঁঠাল বুঝি ভিতরে যাবে, না ?

'তা হলে বুঝি ধান বেচতে গিয়েছিলে ? ধান তো ও ভাঁড়ের মুখ দিয়ে খুব যাবে।

'আরে দূর-দূর-দূর ! ধান মানুষে বেচবার নেয় খুটিতে কইরা, না ছালায় ভইরা ?

'তাই তো ! তা হলে....

। ভার—দুধের ভার।

'বুঝলাম। আচ্ছা, দুধ বুঝি কিনতে গিয়েছিলে ?

'আবার! আচ্ছা, খালি ভার দেই খাও দিশা পাওনা যে দুধ কিনতে গেছিলাম, না বেচতে গেছিলাম ?

'এখন দিশা পেলাম। আচ্ছা, ভাইস্তা, পাশের এ ক্ষেতটা কার ?
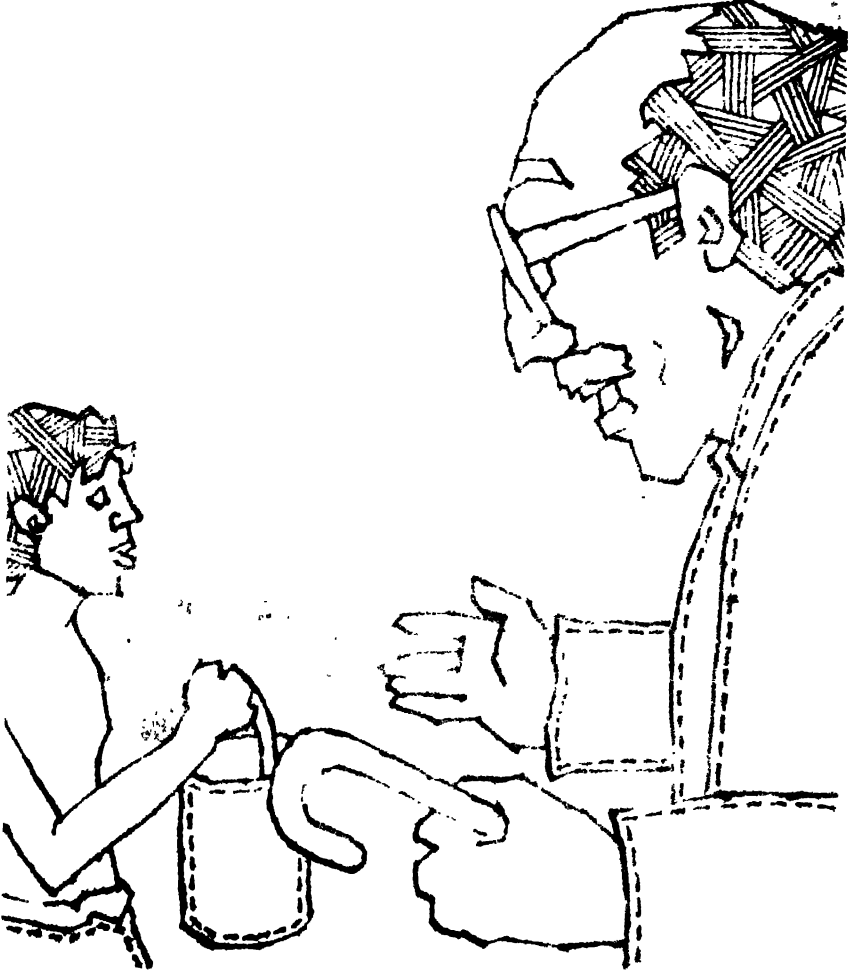
'ওডা পিনছিল সাবের ক্ষেত। আচ্ছা, পিনছিল সাবেরে তুমি চিন না ?

'না। পিনছিল সাবটা কে, ভাইস্তা ?

'পিনছিল সাব না আমাগরে দেশেরই মানুষ। আচ্ছা, মুল্লুকের মানষে তারে চিনে, তুমি বুইড়া অইয়া তারে চিননা কেন্ ?

'ওটা আমার পক্ষে সত্যি বড় অন্যায় কথা, ভাইস্তা। আচ্ছা তুমি তো পিনছিল সাবকে চিন ?

'বাঃ রে! আমাগরে জাগার মানুষ, তারে চিনমুনা ? ঐ যে বাড়ী আইলেই সভা করে আর বক্তিমা দেয় ?

'হ্যাঁ, ভাইস্তা, আমি তোমাদের বাড়ী যেতে চাই যে ?

'যাওনা কেন ?

'ক্ষিদে পেয়েছে যে ?

'কেন ? হকাল বেলা উইঠা পান্তা খাও নাই বুঝি ?

'না, খাই নাই।

'ঐডাই তো বেআক্কেলের কাম করছ। ভোরে এক থালা পান্তা খাইয়া নিলে দুপুর লাগাত পেট ঠাণ্ডা থাকে !

'তোমাদের বাড়ী গেলে কিছু খেতে দিবে না ?'

'তা না করছি না কি ? গিরস্ত বাড়ী থাইকা বুঝি দুপুইরা অতিথ খালি পেটে ফেরত দেওয়া যায়, না ?

'কেন ভাইস্তা, ফেরত দিলে দোষটা কি ?

'ফেরত দেওয়া যায় না—যায় না, এই অইলো মুদ্দা কথা ; তার উপর আবার কথা কি ?

'আচ্ছা তোমাদের বাড়ীতে কি কি চীজ আমাকে খেতে দিবে ?

'যা যা আছে তাই দিমু।

'কি কি আছে ?

'আমি কি মাইয়া মানুষ নাকি ? কি কি আছে, তা মায়ে জানে, আমরা কি করে জানুম ?

'ও—তবে পাকের ঘরের কর্তা বুঝি তোমার মা ?

'নিশ্চয়। বাজান তো কেবল আইনা দেয়, তারপর মায়ে যা রান্ধে, আমরা তাই খাই।

'আচ্ছা, ভাইস্তা, তোমার মায়ে যদি কাঁকড়া রান্ধে ?

'দূর-দূর-দূর ! এ কি আমাগরে হৎমা যে ব্যাঙ কাঁকড়া রাইন্ধা দিবে।

সোনার সাথে তাদের বাড়ী গেলাম। সোনার বাপকে আমি চিনতাম। আনার শেখের ঐ একটি ছেলে ছিল কদর আলী। আনার শেখের জমি ছিল চৌদ্দ পাখী, কিন্তু তা সমস্তই ছিল তার বাপের ঋণের দায়ে বন্ধক। কি অদ্ভুত মনের জোর ছিল এই আনার শেখের! সমস্ত জমি খাইখালাসী দিয়ে সে পরের বাড়ী কামলা দিয়ে পেটের ভাত জোটাত। জমি বিক্রি করে খাওয়ার কথা কেউ পরামর্শ দিলে সে তাকে মারতে উঠত। বুড়ো বয়সে সমস্ত জমি খালাস করে। কদর আলীও ছোট বেলায় পরের বাড়ী কামলা দিয়েছে, চীনার ভাত খেয়েছে, উপোস কাপাস করেছে। তারপর যৌবনে দেখল সে সুখের মুখ। এখন সে দুটি হাল চালায়, নিজের চৌদ্দ পাখী ছাড়া কিছু জমি বর্গা চষে, একটা কামলা খাটায়, দুইটা গাই পানায়, টীনের ছাপড়ার তলে শোয়, গামছা ছেড়ে লুঙ্গী পরে।

আমি বাইর বাড়ী দাঁড়িয়ে ডাকলাম, কদর আলী ভাই, বাড়ী আছ ? কদর আলী বাইরে এল। বল্লাম, 'রোদে বড় হয়রান হয়ে পড়েছি, কদর আলী ভাই, তোমার এখানে একটু বসতে চাই। কদর আলী দৌড়িয়ে বাড়ীর মধ্যে গেল। কতক্ষণ পর গামছা দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে একটা মোড়া নিয়ে এল। এই-ই তার বাড়ীর শ্রেষ্ঠ আসন। ঘরের ধন্নার সাথে এ আসন সে ঝুলিয়ে রাখে, ম্যায় মেহমান এলে নামিয়ে ঝেড়ে মুছে বসতে দেয়।

সলাম। বল্লাম, 'কদর ভাই, ভাইস্তা সোনা যে আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে এল, এখন কি
; দিবে বলতো? কদর আলী হা-হা করে হেসে উঠল। বল্ল—
মিঞা ভাইর যে কথা! সত্যি ও আপনার সাথে কথা কইছে?
কেবল কথা কইছে? কথায় কথায় আমাকে হারিয়ে দিয়েছে?
হায়-হায়, মিঞা ভাই কয় কি? মিঞা ভাইর সাথেও শয়তান না জানি কত বেয়াদবী করছে!
কোন বেয়াদবী করে নাই, কদর ভাই। আল্লা ছেলেটি তোমাকে ভাল দিয়েছে!
(চোখ টল মল) মিঞা ভাই গো, চার চারটা ছাওয়াল এই হাতে গোর দেওয়ার পর অনেক
; করে পেলাম আপনাগরে গোলাম ঐ বাচ্চা জল্লাকে। দোয়া করবেন যেন ওর হাতে আমি
রব মাটি পাই।
খুব দোয়া করি।
কিন্তু মিঞা ভাই, ও যে গরীবের বাড়ী হাতী নিয়ে এল, তার আমি কি করি? ও তো আর
না যে কি ঐরাবতের সাথে ও এতক্ষণ কথা কয়ে এল:
ভুলটা তো আসলে তুমিই করছ, কদর ভাই। ও মানুষকে মানুষ বলেই চিনেছে। তুমি সে
। করে মানুষকে হাতী ঘোড়া বানাচ্ছ।
হায়-হায়, মিঞা ভাই না-না-না, আমি কখখনো অমন কথা ভাবি নাই।
কিন্তু শোন কদর ভাই, আমার যে বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু না খেয়ে তো আমি এখান
ক উঠতে পারব না।
মিঞা ভাই সত্যি খেতে চান?
হাঁ-হাঁ-সত্যি খুব ক্ষিদে পেয়েছে।
হায়-হায়, মিঞা ভাই, আমি তো আছমান থেকে পড়ে গেলাম।
কেন ভাই?
আপনাকে খেতে কি দেই এখন? ঐ শয়তানটার জ্বালায় ঘরে কি মুড়ি চিড়া কিছু রাখবার
আছে? মইল্লার ছাওয়াল কিছু কইতেও পারি না।
তোমাদের জন্য যে দুপুরের ভাত হয়েছে, তাই চারটে দাওনা? আমি মোটা চালের ভাত
তই ভালবাসি।
তা হলে পাক কইরা দেই, মিঞা ভাই? একটু সবুর করুন?
'কেন তোমাদের খাওয়া কি শেষ হয়ে গেছে?
'শেষ তো হয় নাই, মিঞা ভাই; তবে এই—এই—এই...
'কথাটা খুলে বলনা কেন?
'গরমের সময় সকাল বেলায় আমরা পান্তা খাই কি না।
'সে তো ভাল কথা। কেতাবেই লেখা আছে—

> পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে কাপড় দিয়ে গায়—
> গরু চরাতে পাচন হাতে রাখাল মাঠে যায়।

হায়—হায়, মিঞা ভাই, আমাগরে পান্তার কথাও কিতাবে আছে?
'নিশ্চয়। পান্তার ইজ্জত কি কম। হাঁ, পান্তার কথা কি বলছিলে?

কোন দিন বেশী থাকলে, তা দিয়ে জাই রান্না হয়। আজ তাই হয়েছে।

াঃ—বাঃ, বাঃ আরে ভাই আমি তো পান্তা ভাতের জাই পেলে বেঁচে যাই। কতকাল হয়
। জাই খাই না। শহরের বাবুর্চী ব্যাটারা ও-চীজ রাঁধতেও জানেনা।

'গরীব বলে মিঞা ভাই ঠাট্টা করছেন ?

'আরে না—না—না ; সত্যি পান্তা ভাতের জাই খেতে চাই। জলদী নিয়ে এস।

'ওঁ—হোঁ—পারমুনা, মিঞা ভাই।

'কি পারবে না, কদর ভাই ?

'পান্তা ভাতের জাই দিবার পারুম না।

'কেন ? এর মধ্যে আবার কি হল ?

'পেটে যে সবে না ?

'আমার পেটে সয়না এমন কোন জিনিসের কথা এ পর্যন্ত শুনেছ, কদর ভাই ? আমি এখনো লোহা খেয়ে হজম করতে পারি, তা তো জানই।

'কিন্তু বড় মিঞা ভাই শুনলে কি কইব ?

'কিচ্ছু কইব না, খুশী অইব।

'তারপর পাড়ার মানুষ যদি ক্ষেপে ? যদি তারা কয় যে মিঞা ভাইরে পান্তার জাই দিয়ে আমি পাড়ার ইজ্জত মেরেছি ?

'সে কৈফৎ দেওয়ার ভার আমি নিলাম।

'তা হলে মিঞা ভাই সত্যি ছাড়বাইন না ?

'না।

কদর আলী দৌড়িয়ে বাড়ীর মধ্যে গেল। একটু পরে শোনা গেল বাসনের ঠোকাঠুকি তারপর কানে আসতে লাগল খসখস ঘসঘস আওয়াজ। ভেসে এল কদর আলীর চাপা আগে ঘসো বালু দিয়ে, তার পর মাজো ছাই দিয়ে ; যদি কোনখানে একটু ময়লা থেকে তবে হুঁ.... ।

খাবার ডাক পড়ল। তকতকে লেপা মাটির মেঝে, তার উপর পাতা শপ, শপের উপর পানি গামছা। সামনে কাসার গেলাস, পিতলের বদনা—ঝকঝকে, চাইলে চোখ ঝলসে অত্যন্ত ছাফ কাসার মস্ত বাসন—কদর আলীর বৌ দেড়হাত ঘোমটা টেনে এসে তারই পান্তা ভাতের জাই দিয়ে গেল। পর্দানশীন বৌ—তাকে দিয়ে অজানা অতিথির পরিবেশন—এ আমার প্রতি কদর আলী ভাইর মস্ত সম্মান। বল্লাম, 'কদর ভাই, জাইয়ে আর কিছু খাওনা ?' সে বল্ল—'খাই, কিন্তু মিঞাভাই আপনে তো তা খেতে পারবেন না। জাইয়ের সাথে খাই কাঁচা মরিচ আর তাজা সরষের তেল।' আমি বল্লাম-'আন আমি তাই খাব।'

ইরানের বাদশার বাড়ী গিয়েছি, তাঁর মনজিলে বসে পাহ্‌লুভী খানা খেয়েছি, সুলতানদের সুন্দরতম প্রাসাদ দোলমা বাগচায় বসে তুর্ক রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আহার নিউইয়র্কের প্লাজা হোটেলে ছউদী শাহাজাদা আমীর ফয়ছলের দস্তর খানে ভোজের হয়েছি, কিন্তু আজ যে অকৃত্রিম তৃপ্তির সঙ্গে এ পান্তা ভাতের জাই খেলাম এমন তো কোথাও খাই নাই।

কদর আলীকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ী চল্লাম। খানিক দূর এসেছি এমন সময় মনে হল, থেকে কে আমার আচকানের দামন ধরে টানছে। ফিরে চেয়ে দেখি, সোনা ভাইস্তা। সে দিকে চেয়ে বল্ল :

'বাজান কান্দে যে ?

'কেন-কাঁদে ?

'তুমি তারে কিছু করছ, তা না অইলে কান্দব কেন ?

'কিচ্ছু তো করি নাই ভাইস্তা।

'ও কথা হুনি না। য্যাবা কান্দাইছো, হ্যাবা ফিরা যাইয়া কান্দন থামান নাগব। তা না অইলে মি যাবার দিমু না।

ফিরে গেলাম। আমাকে দেখে কদর আলী তার গামছার কানি দিয়ে চোখ মুছল। াম—'তুমি নাকি কাঁদছ, তাই তোমার ছেলে গিয়ে আসামী পাকড়াও করে এনেছে। এখন বল ভাই, হঠাৎ হল কি ? বল্ল—মিঞাভাই গো, আমরা শুনি, আপনে চলাফিরা করেন জজ । সাথে। সেই আপনে এসে যে আমার বাড়ীতে চেয়ে পান্তার জাই খেয়ে গেলেন, এ রব আমি থুই কোথায় ?

আবার কদর আলীর চোখ টলমল।

আমি কিছু বলতে চেষ্টা করলাম ; পারলাম না। আওয়াজ গলায় বেঁধে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ । চলে এলাম।

বাড়ী এসে ছোট ভাইকে ডেকে বল্লাম—

'কদর আলী ভাই চাষ আবাদ করে কেমন ?

'খুব ভাল আবাদ করে।

'ওকে পাখীদুই জমি বাগী দেওয়া চলে না ?

'খুব চলে। লোকটা ভয়ানক খাটে।

'আমার আলগা জমি আছে ?

'হ্যাঁ। জমির তালুকদারের মধ্যে দুই পাখী জমি ছিল আজ চার বছর। আবাদ সে কোন দিনই । করেনা ; এবার তো করেছে একদম গায়েব।

'অতএব ?

'তার কাছ থেকে জমি ছাড়িয়ে নিয়েছি।

'বেশ, আগামী পরশু কদর আলী, জমির তালুকদার দুজনকেই ডাক ; বুঝিয়ে মানিয়ে জমি । করে দেই।

সেদিন ওকিং মছজিদের ভূতপূর্ব ইমাম মওলানা বেদার বখত সাহেব আমার মেহ্‌মান। । নাশ্‌তার পর চা খেতে খেতে তাঁর আলাপ শুনছি। লণ্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা, নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক শহরের বুকে সভার পর সভায় ইছলামের মহান ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করে । তিনি খৃষ্টান পাদ্রীদের পর্যন্ত একদম লাজওয়াব করে দিতেন ; উদ্দীপ্ত ভাষায় তিনি তাই । যাচ্ছেন, আর আমি অবাক হয়ে শুনছি।

এমন সময় কদর আলী ভাই আর জমির তালুকদার এসে হাজির হল। তারা বারান্দার । বসতে বসতে বল্ল : 'মিঞা ভাই, সেলাম অইলাম।' বল্লাম—ভাই, ওখানে বস, আমি ই পরে কথা বলি। জমির ভাই কেমন আছ ? আহা, বড় শুকিয়ে গেছ তো।'

ওলানা সাব বল্লেন—

'লোকগুলো কারা রে, ভাই ?

'আমার পড়শী।

'গোমর করো না ; ওরা তোমার শরীক শরাগত ?

'না, কিন্তু হলে দোষের ছিল না।

'তবে হাঁটু পর্যন্ত ধূলা নিয়ে এসে লোকগুলো বেঞ্চিতে বসে কোন্ আক্কেলে ?

'বাবা আদম ধরার যে ধূলায় নেমে এসেছিলেন, ওরা যে এখনো সেই পবিত্র ধূলার মধ্যে আনাগোনা করে, মওলানা সাব ?

'তামাসা রাখ। আমি সব সইতে পারি, নোংরামি বরদাশ্‌ত করতে পারি না।

'সে তো বটেই।

'আর ওরা যে তোমাকে 'মিঞাভাই', 'মিঞাভাই' বলে হাম্বা হাম্বা করে, এই-ই বা কেমন একটা অশোভন মাখা-মাখির ভাব ?

'ঐ তো ওদের দোষ, মওলানা। আমি যদি কোন দিন পাকিস্তানের লাটও হই, তবু ওদের কাছে আমি মিঞাভাই-ই থাকব।

এ কথা জোর করে বলতে পার ?

'পারি। আজো আমি শহরে বাজারে, কাগজে পত্রে অনেকের কাছে অনেক কিছু কিন্তু ওদের কাছে আমি শুধু মিঞা ভাই।

'কেন ওদের এ ব্যারাম, বল তো ?

'জানি না, হয়তো ওরাও জানে না।

'তবে ?

'তবে অনুমান করতে পারি। ওদের পূর্ব পুরুষেরা যখন প্রথম ইছলাম কবুল করে তখন ধর্মের যে মহান বিশ্বভ্রাতৃত্ব তারা জীবনে রূপায়িত করেছিল, হয় তো তারই অনুপ্রেরণার প্রতিধ্বনি অলক্ষ্যে ওদের রক্তের কনায় কনায় অনুক্ষণ ঝঙ্কার দিয়ে ফিরে; তাই ওরা অকুণ্ঠ চিত্তে অন্য যে কোন মুছলমানকে ভাই বলে ডাকে, তার পদমর্যাদার দিকে ফিরে তাকায় না।

'তুমি আমাকে তো ভাবিয়ে দিলে, ভাই ?

'আচ্ছা, আমি ওদের সাথে একটু কথা বলে নেই। হ্যাঁ, ভাই জমির তালুকদার। তোমার বুঝি দুই পাখী জমি ছিল ?

'ছিল।

'তা না কি.....?

'হ্যাঁ, তার গত আবাদ একদম বরবাদ হয়ে গেছে।

'কিন্তু কেন এমন হল ? আগে তো তোমার আবাদের সুনাম ছিল ?

'একই মাত্র ছেলে ছিল, মিঞা ভাই; খেত খোলার কাম ইদানীং সেই-ই দেখে শুনে করত; গত আবাদ সামনে করে সে হঠাৎ চলে গেল। এই ভাঙ্গা শরীর মন নিয়ে একা সামলাতে পারলাম না, মিঞা ভাই, শুভধানী জাহান্নামে গেল।

'বড় আফছোছের কথা, জমির ভাই !

'ছোট মিঞা ভাই কইল, জমি ছেড়ে দাও। বল্লাম, অপরাধ করেছি, শাস্তি তো দিবেনই।

'তারপর ?

'আগুন মাসের শেষাশেষি একখানা কাচি হাতে নিয়ে নাইলতা বাড়ী চল্লাম—ধান কামলা দেওয়ার জন্য। দোপা বাড়ীতে কেবল নেমেছি, এমন সময় একটা আছাড় পড়ার শুনলাম। ফিরে চেয়ে দেখি—অভাগী ছেলের কবর বুকে নিয়ে বলছে—'আর একজন তো বিদেশে; তুইও যে এখানে শুয়ে রইলি, বাবা আমি চালের তলে থাকি কারে নিয়ে ?

'ওহ্।

'ফিরলাম। ওকে হাত ধরে তুলে ঘরে নিয়ে এলাম।

'কিন্তু চলছে তোমার কি করে ?

'যখন কামলা দিতে পারি, দুজনেই দুমুঠা খাই। যখন লোকে কামলা না নেয়, তখনই তো বপদ।

'তখন না খেয়ে থাক ?

'তখন না খেয়ে না খেয়ে হয় তো মরেই যেতাম—যদি কদর আলী ভাই কাছে না থাকত। যখনি বিষম ঠেকায় ঠেকেছি, তখনি ওরা আমাদেরে ওদের খোরাকীর বরাদ্দ থেকে চাল দিয়ে ।। বাকি চাল দিয়ে ওরা কখনো খেয়েছে নাইয়ের জাই, কখনো বা খেয়েছে আধা-চাল াধা-মাষ-কলাইর ভাত।

'কদর আলী ভাই, তুমি ------

'আমি কিন্তু, মিঞা ভাইর কাছে একটা আরজী নিয়ে এসেছি।

'কি আরজী, কদর আলী ভাই ?

'জমি দুই পাখী জমির ভাইর মধ্যেই রেখে দিন, মিঞা ভাই। ওর গরু বাছুর নাই, তা ক্ষেতে হাল বাইছ আমিই করে দিব। নিড়ানি কোড়ানি, কাটা মলা সে ও নিজে করে নিতে পারবে।

'জমি দুই পাখী কিন্তু তোমাকে দেওয়ার জন্যই তোমাদের ডেকেছিলাম।

'ওকে দিলেই আমাকে দেওয়া হবে, মিঞা ভাই ?

'সম্বন্ধে খেশ কুটুম কিছু হয় ?

'খেশ কুটুমের চেয়েও যে বড় সম্বন্ধ ওর সাথে, মিঞা ভাই ?

'সে আবার কি সম্বন্ধ গো ?

'সে পড়শীর সম্বন্ধ। খেশ কুটুমেরা থাকে দশ বিশ মাইল দূরে, কিন্তু আমার ঘরের বারান্দায় ালে যে ওর রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায় ? ওদের চুলায় যখন আগুন না জ্বলে, তখন । দেখে কি করে ওদের ফেলে নিজেরা মুখে ভাত দেই, মিঞা ভাই ?

'মওলানা দোস্ত, অমন উসখুস শুরু করলে যে ?

'আমার ক্যামেরাটা খুঁজছি, ভাই, তুমি ওদের ঠিক করে বসাও, আমি ওদের একটা ফটো নিব।

'হঠাৎ এ মতলব কেন ?

'যা কেবল কিচ্ছা কাহিনীতে শুনেছিলাম, আজ তাই চোখে দেখলাম। ওদের ফটো লকেটে । বুকে ঝুলিয়ে রাখব ; হয়তো জীবন নতুন প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।
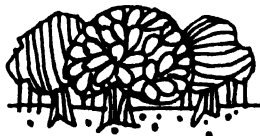
ঘটা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মামার বাড়ীতে এসেই রন্তু মস্ত এক উৎসবের মধ্যে পড়ে গেল। উৎসবটা ঠিক মামার বাড়ীতেই না হলেও একেবারেই পাশের বাড়িতে, তার উপর কাজের জন্য এ বাড়ীর সবাই ও-বাড়ীতে এত যাওয়া-আসা করছে যে মনে হচ্ছে দুটো বাড়ী যেন এক হয়ে গেছে।

খুব বড় না হোক বাপ-কাকা-দাদাদের মত, তবু এই বছর সাতের মধ্যে ঘটা কয়েক রকম দেখেছে বৈকি; নিজেরই তো জন্মতিথি হয়ে গেল এই ক'দিন আগে, তারও আগে হ'ল দাদার পৈতে, পিসীর বিয়ে। আরও ঘটা দেখেছে কত, নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে, কিন্তু এ ধরনের ঘটা ঠিক দেখেনি। মামার বাড়ীর মতই বেশ বড় বাড়ী, তার সামনে প্রকাণ্ড দুটো সামিয়ানা পড়েছে, তার নীচে কত কি ব্যাপার! একটাতে কেত্তন-গান হচ্ছে, তিনজন মেয়ে আর খোল কত্তাল আরও কি সব বাজনা। একটাতে পূজো হবে, তার জন্য কত কি সব সরঞ্জাম। চারখানা পালঙ্ক গদি, বালিশ, চাদর-দেওয়া, মশারি-ফেলা। কত ঘড়া, কত থালা, কত ঘটি, কত গেলাস সাজানো হয়েছে, একদিকে বাছুর সুদ্ধ কি চমৎকার গোরু একটা, মালা পরানো; একদিকে একটা ধপ্‌ধপে সাদা ষাঁড়, তার গলাতেও মালা; পূজোর জায়গায় কাপড়, শাড়ী, নৈবিদ্যি, কত ফুল ধূপ ধুনো আরও কত কি—সব বড় বড় পূজোতেই যেমন হয়। আরও খানিকটা সরে দশ-বারোজন বই খুলে মিষ্টি সুরে দুলে দুলে কি সব পড়ছে।

পূজো আরম্ভ হ'ল—সেও কতক্ষণ ধরে। পুরুতের পাশে বসেছে নেড়ামাথা, মোটা সোটা টকটকে রং ধপ্‌ধপে কাপড় পরা একজন লোক। আরও ঐরকম নেড়ামাথা টকটকে রং, ধপ্‌ধপে কাপড়-পরা তিনজন ঘোরাঘুরি করছে আর মাঝে মাঝে এসে বসছে। পূজোর পাশেই প্রকাণ্ড সতরঞ্চির উপর সাদা ধপ্‌ধপে চাদর পাতা, তাতে অনেক লোক রয়েছে বসে।

বাড়ীর ভিতর প্রকাণ্ড উঠানের উপর মস্ত বড় চাদর টাঙিয়ে একদিকে রান্না হচ্ছে, বড়

কত রকম রান্না! একদিকে হচ্ছে খাবার তৈরি—কচুরি, রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, । এক জায়গায় বড় কাঠের বারকোশে ময়দা ঠাসা হচ্ছে। ...দই এসেছে! দই এসে গেছে হল, রন্তু ময়দা ঠাসা দেখছিল—বেশ লাগে তো, খোকাকে চটকাবার মত। নিজেরও ইচ্ছে ঠাসি—শব্দ শুনে ছুটে এল। হাঁড়িতে হাঁড়িতে কত দই। ভাঁড়ার ঘর থেকে ক'জন মেয়ে এল। "এদিকে নিয়ে এসগো, একেবারে ঘরে তোল।" ...বলতে না বলতেই—"ক্ষীর ঘরে রাখা হবেগো?" রন্তু ঘুরে দেখে ছোট হাঁড়ি করে হাঁড়ি হাঁড়ি ক্ষীর!

কত কি যে হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দেখে যেন থৈ পাচ্ছে না রন্তু।

এক জায়গায় পিসির মত কত মেয়ে। পিসির চেয়ে বড় আবার পিসির চেয়ে ছোটও—সবাই পান সেজে জমা করে যাচ্ছে। কত গেলাস, কত খুরি, কত পাতা, কত আসন! ঘটা অনেক খেছে বৈকি রন্তু, কিন্তু এরকম ঘটা ত দেখেনি। বিকেলে পূজো হয়ে গেল। এবার কাপড়, ন, পালং—সব নাকি দিয়ে দেওয়া হবে। কিছু কিছু বাসন তখুনি কত লোকে এসে নিয়ে াল। একজন খাতা দেখে নাম ডেকে ডেকে বলছে আর সবাই নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক]লও পড়ে, আরও সবই এসে নিয়ে যাবে। একখানা বিছানা-সুদ্ধ পালং আর অনেকগুলো রন্তুর মামার বাড়ীর লোকেরা এসে নিয়ে গেল।

তারপর রাত্তিরে সে কি নেমন্তন্নর ঘটা! কত আলো, কত লোক, হৈ-হল্লা! এতবড় নেমন্তন্ন। কখনও দেখেছে কি রন্তু? কৈ, মনে পড়ে না তো। খুব খেলেও রন্তু। ওকে নেমন্তন্নয় কেউ দেয় না। ছেলেমানুষ, জিভ মোটা হয়ে যাবে বলে। এখানে একটার বদলে দুটো পান।

কিসের এত ঘটা তা জিজ্ঞেস করেছিল রন্তু ওর দিদিমাকে। "ও-বাড়ীর কত্তা আশি বছরে গেলেন কিনা, তাই ছেলেরা দানসাগর সেরাদ্দ করেছে। খুব বড় বড় চাকরি করে ত লরা, অনেক টাকা, দুখানা মোটর।" আরও জিজ্ঞেস করেছিল রন্তু, সেরাদ্দ যেমন দেখেনি নি সগ্‌গও ত দেখেনি কখনও। কাউকে যেতেও দেখেনি। দিদিমা বললে, "সে নাকি এর য়ও ভাল জায়গা, আর রোজ রোজ সেখানে নাকি এর চেয়ে কত বড় বড় ঘটা হয়, কত ং-বেরঙের আলো। রন্তুরা যদি আর ক'দিন আগে এসে পড়ত তো দেখতে পেত কত জনাবাদ্যি করে, কত পয়সা দো-আনি ছড়াতে ছড়াতে কত সাজিয়ে গুছিয়ে সবাই সগ্‌গে নিয়ে াল ওবাড়ীর কত্তাকে। সবাই যায় সগ্‌গে, আগে ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা, দাদামশাই-দিদিমারা যায়, রপর তার ছেলেমেয়েরা, তারপর তার ছেলেমেয়ে—সবাই যখন বুড়ো হয়ে ওঠে। পুণ্যির থাকলেই যায়। যেমন টাকার জোর থাকলে তবে ত কলকাতায় গিয়ে বাড়ী করতে পারে । তবে একবার গেলে আর ফিরতে চায় না। আর কেনই বা ফিরবে? অত ঘটা, অত সেখানে। দেখা হয় বৈকি সেখানে। ছেলেমেয়েরা যাবে, তারপর তার ত-নাতনীরা, তারপর আবার তার ছেলেমেয়েরা বুড়ো হলে। কি করতেই বা আসবে অমন ৎকার জায়গা ছেড়ে?

বুড়ো না হলে যায় না, যেতেও নেই। তাইতেই না দিদিমা ওরকম করে ধমক দিয়ে উঠল , যখন সে বেচারি সব শুনেটুনে যেতে চেয়েছিল সেখানে।

আসতই মামার বাড়ীতে, আরও একটা মস্তবড় ঘটা রয়েছে যে এখানে। রন্তুর জন্মতিথি। দাদামশাইও আশী বছরে পড়লেন কিনা, তাই এবারে নাকি খুব ঘটা হবে আর সেইজন্যই রন্তুরা সবাই এল এবার। নইলে অতদূর থেকে ত রোজ রোজ আসা না, এই তিন বছর পরে তারা এসেছে। মা বলেন—ঠিক এই তিন বছর পাঁচ মাস পরে।

আরও পরে আসত, তবে পাশের বাড়ীতেই নাকি এতবড় কাজ হচ্ছে—দানসাগর ত আজকাল আর কেউ করে না বাপ-মায়ের জন্যে—নিজের মোটরগাড়ি করবে, বড় লোকেদের পার্টি দেবে না, বাপ-মায়ের দানসাগর করবে? তাই অতবড় একটা কাজ হচ্ছে বাড়ীর পাশেই, আর ওদের সঙ্গে খুব ভাবও ত, দুদিন আগেই সবাই চলে এল।

বেশ লাগছে এখানে রন্তুর। শ্লেট দ্বিতীয় ভাগ বাক্সয়, সবাই দেশের চেয়ে আরও ভালবাসে তারপর এই ঘটার উপর ঘটা। দাদুর জন্মতিথি এসে গেল বলে, আর মাত্র আটটি দিন আছে তারপর এবাড়িতেও কত আলো, কত ঘটা, কত নেমন্তন্ন।

রন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। আর মোটে তিন দিন বাকি, তবু এ বাড়ীতে ত ঘটার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও বাড়ীর কর্তার দানসাগরের ঠিক তিন দিন আগে ওরা এসেছিল। তখন থেকেই কত কাজ পড়ে গেছে ও-বাড়ীতে, বাসন-কোসন কিনে কিনে আনছে বাজার থেকে—আরও কত সব জিনিস। পালং চারটে বড় বড় মোটর গাড়ি করে এসে পড়ল, তাতে ফিতে জড়ান হ'ল, তারপর বিছানা পাতা হ'ল। বাইরে উঠোন পরিষ্কার করছে কত 'মুনিস' এসে। তার পরদিন সামিয়ানা এসে পড়ল। কত হৈ হৈ করে কত লোকে দাঁড় করাল সে দুটো। মুনিসদের বাড়ীর মেয়েরা এসে পূজোর জায়গা নিকোচ্ছে গোবর দিয়ে। আরও কত কাজ রাত্তিরে বড় বড় আলো জ্বেলে করছে সবাই। তার পরদিন বাড়ীর উঠানের উপর চাদর টাঙিয়ে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল, উনুন তৈরি, ওদিকে উনুন জ্বেলে খাবার তৈরী, এদিকে কুটনো কোটা কত হৈ হৈ রৈ রৈ। তার পরদিন সকাল থেকে তো কথাই নেই।

এর মামার বাড়ীতে কিন্তু কই সেরকম ত কিছু হচ্ছে না। কাল হয়ে গেলেই ত পরশু, কিন্তু সামিয়ানাও আসছে না, খাট-বাসন-কোসন এসবও কিছু আসছে না। মুখটা চুন করে ঘুরে ঘুরে

বেড়াচ্ছে রন্তু। আরও একটা দিন গেল, কাল সকাল হলেই জন্মতিথি, কিন্তু কোথাও কিছু নেই!

এসে পর্যন্ত দেখছে এ বাড়ীর সবাই ওদের কাজে ব্যস্ত! শুনে এসেছিল মামার বাড়ী গিয়ে সবার কাছে খুব আদর পাবে, তা ত হয়ই নি, দু' এক জন ছাড়া সবার সঙ্গে ভাল করে জানাশোনাও হয়নি যে জিজ্ঞেস করে—দাদুর জন্মতিথি এসে পড়ল অথচ ঘটার কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন। একটু জানাশোনা হয়েছে ছোটমামার সঙ্গে, আর সেই যেন দাদুর জন্মতিথির জন্য একটু ব্যস্ত, কয়েকবার তার মুখেই শুনল জন্মতিথির জন্য এ জিনিসটা এখন এসে পড়ল না, ও জিনিসটা এসে পড়ল না। তবে ব্যস্ত বলেই তাকে জিজ্ঞেস করার সুবিধে হচ্ছে না। তবু ওরই মধ্যে একবার একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করল—"দাদুর জন্মতিথিতে ঘটা হবে না?"

ছোটমামা কোথায় যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়াল, একটু যেন রেগে গিয়ে একটু হেসেই বলল, "এই দেখো। বোকা ছেলে কাজে বেরুচ্ছি পেছু ডেকে দিলে! সেই জন্যই তা যাচ্ছিরে হাবা, ঘটা যখন হবে তখন দেখবি!"

হন্ হন্ করে চলে গেল। সেই থেকে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহসও হচ্ছে না, কে কাজে যাচ্ছে কে কাজে যাচ্ছে না কি করে জানবে? ছোট মামা আদর করে তাই তবু একটু হেসে বকলে, আর কেউ হলে তো চোখ রাঙিয়ে বকত।

মুখ বুজে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রন্তু। এক একবার মনে হচ্ছে হয় ত কোথাও কিছু নেই, একবারে হুড় হুড় করে সব এসে পড়বে। যেমন গল্প শুনেছে আলাদীন পিদিম জ্বেলে দিলে আর হুড় হুড় করে সবকিছু এসে পড়ল—প্রকাণ্ড বাড়ী, খাট পালং, নানা রকম খাবার, হাতি ঘোড়া। কিংবা যেমন সিনেমাতে দেখছে, কিংবা যেমন ম্যাজিকে দেখলে সেদিন—কোথাও কিছু নেই, টুপির মধ্যে থেকে ম্যাজিকওলা বের করতে লাগল—রুমাল, জামা, হাঁস, তার ডিম, সন্দেশ, টাকা। মামার বাড়ী এক আশ্চর্য জায়গা সে তো শুনে এসেছেই—ছড়ায়, গল্পে; ওদের দেশের চেয়ে এদেশটা কত বিষয়ে কত নূতন তাও তো দেখে আসছে; এ বিশ্বাসটা করতে মোটেই বাধল না রন্তুর, বরং যতই সময় যেতে লাগল, এখনই কি হয়ে বসে, এইবার বুঝি হু হু করে যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ হয়ে যায়—এই রকম একটা আশার সঙ্গে বিশ্বাসটা যেন বেড়েই যেতে লাগল। কোথায় হঠাৎ আরম্ভ হয়ে পড়বে তারই সন্ধানে যেন বাড়ীর এখানে ওখানে টুপ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই না ঘটতে দেখে ওর বিশ্বাসটা যেন কমে আসতে লাগল, যেন স্পষ্ট করে কিছু একটা জানতে না পারলে আর স্বস্তি পাচ্ছে না। এই নৈরাশ্য, তার উপর আর একটা নূতন জিনিস মনে হয়ে ওর এক এক সময় বোধ হচ্ছে যেন কান্না ঠেলে আসছে গলায়।

—দাদুর কথা ভাবছে রন্তু। আহা খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, নয় শুয়ে আছেন, না হয় বারান্দাটিতে চেয়ারে বসে আছেন, নিজে কিছু করতে পারেন না, সামান্য কাজও ডেকে ডেকে করাতে হয়, কেউ যদি একটু না ভাবে তাঁর জন্মতিথির এত বড় ঘটাটা, তিনি নিজে হাতে কি করে করবেন? এক একবার দূর থেকে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে—চোখ বুজে গড়গড়ায় তামাক খেতে খেতে কি যেন ভাবছেন দাদু—নিশ্চয় এই সব কথাই, বড় অসহায় বলে বোধ হয় ওকে, গলায় কান্না ঠেলে আসে রন্তুর। ঘুম পাচ্ছে। একটু পরেই দিদিমা ছোটদের ডেকে খাওয়াতে বসাবেন; তার পরেই ঘুমিয়ে পড়বে রন্তু। দাদু চেয়ারে চোখ বুজে বসে তামাক খাবেন, জন্মতিথির কি হবে কেউ ভাববে না সেকথা, আহা! রন্তু দাদুকে ভালবাসে তাই তার

মনে এত কষ্ট, আর দাদুর ত নিজের জন্মতিথি, তাঁর মনে যে কি কষ্টটা হচ্ছে তা কি বোঝে না রন্টু? তার পর ভাবল একটু গোড়া বেঁধে এগোনই ভাল, সব কথা ত ঠিকমত জানেও না, এই ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে যা ভেবেছিল তা হচ্ছে না; প্রশ্ন করল—"পাঁচ মামা ত তোমার নিজেরই ছেলে দাদু?"

দাদু যে হঠাৎ অমন করে গড়গড়ার নলটা মুখে থেকে সরিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন কেন রন্টু তা ঠিক বুঝে উঠতে পাবল না। বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল; দাদু হেসেই বললে—"ধরে নিলুম আমারই, তা কি বলতে চাস তুই?" লজ্জায় পড়ে গেছে, রন্টু একবার মাথাটা ঘুরিয়ে চারিদিকটা দেখে নিল কেউ শুনছে কিনা। তার পর বলল—"বলছিলাম তা হলে তোমার বেলায় ও-বাড়ীর কত্তার মত ঘটা হচ্ছে না কেন? তোমার ত একজন ছেলে বেশী দাদু।"

এবারেও একটু হেসে উঠলেন দাদু, বললেন—"তার যে শ্রাদ্ধ ছিল, ছেলেরা ঘটা করে দানসাগরের উজ্জুগ করেছে।"

একটু আবার ভাবতেই হ'ল, তারপর মাথাটা আর একটু এগিয়ে দাদুর কাঁধে রেখে বলল,—"আমিও সেই কথাই বলছিলাম দাদু। তুমি মামাদের ডেকে বলে দাও না—জন্মতিথিটা থাকগে, তোরা বরং সেরাদ্দই করে দে আমার, দানসাগরের উজ্জুগ করে। .... আহা, এরা সবাই কতদিন পরে এসেছে ঘটা দেখবে বলে।"
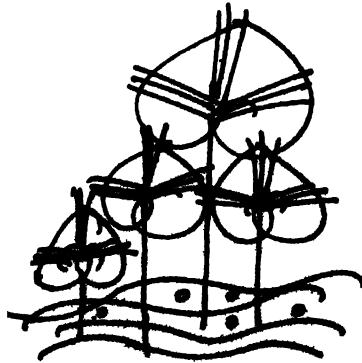
ডাকাতের ডুলি

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

চাল্‌দাপুরের জঙ্গলের কাছে যখন পাল্কি এসে পৌঁছলো, তখন ভরসন্ধ্যা।

বেহারারা পথের ধারে পাল্কি নামিয়ে বল্‌লে—"হুজুর, আর এগোতে সাহস হয় না ; ছাম্‌নে তিন কোশের' মধ্যে গাঁ নেই—"

হরি ডাক্তার তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। বেহারাদের একটানা "হুঁ হুঁ হো হো—ও—ও" সুরে, বর্ষার মেঠো ভিজে বাতাসে তাঁর চোখ দুটো একটু বুজে এসেছিল। অবস্থাটা হঠাৎ বদ্‌লে যাওয়ায় তন্দ্রাটুকু ছুটে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে বল্‌লেন—"কি বল্‌লি ?"

"—হুজুর, ছাম্‌নে চাল্‌দাপুরের জঙ্গল। সাঁঝও লাগ্‌লো। জলকাদায় পা ব'সে যায়। দেয়ার বুঝি 'লামে'—"

—"তাই ব'লে একটা লোক মারা যাবে ?"

—"কি কর্‌বো হুজুর ? আমাদেরও তো জান—"

"হুঁ!"—ব'লেই ডাক্তারবাবু উঠে বস্‌লেন ; তারপর পাল্কির ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বাঁ-দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"ঐ চাঁদখালির আলো দেখা যায় না ?"

—"হেঁ।"

এমন সময় দূরে একপাল শেয়াল তারস্বরে ডেকে উঠ্‌লো।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"ওখানে যেতে পার্‌বি ?"

—"না হুজুর ! ওদিকে যেতে হ'লেও জঙ্গলটার পূব দিক ভাঙ্গতে হবে—"

—"বটে ! জঙ্গলে আছে কি ?"

—"হুজুর, রাতের বেলা যেনাদের নাম করতে নেই, পূব দিকে আছেন তেনারা ; আর মাঝ বরাবর হলো টিয়ের আড্ডা। আমরা যাব না—"

—"তাই ব'লে একটা লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে?"

গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে একজন বেহারা বল্‌লে—"কি করব হুজুর? ঘরে ছেলে-পুলে ছেড়ে এসেছি—"

হরি ডাক্তার ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন—"মিছে কথা! কোন বেটার ছেলে নেই। ঐ যে, কে যায় না? এই—কে যায়?"

অন্ধকার ততক্ষণে আরও গাঢ় হ'য়ে এসেছে। যা স্পষ্ট ছিল, তা হ'য়ে গেছে ছায়া, যা ছায়া ছিল তা গ'লে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে! যে যাচ্ছিল, সে ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়ালো। তার হাতে একখানা লাঠি।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"হারিকেন জ্বাল্। ঐ লোকটাকে এদিকে ডাক্—"

পাল্কির লোহার টানার সঙ্গে বাইরে একটা হারিকেন বাঁধা ছিল। একজন সেটা খুলে নিয়ে জ্বালতে লাগ্‌লো।

এদিকে ডাক্তারবাবুর আর ডাকের দেরি সইছিল না; নিজেই হাঁক্‌লেন—"এই—কে তুমি? এদিকে এস—"

লোকটা কাছে আস্‌তেই তিনি জিগ্যেস কর্‌লেন—"তুমি যাচ্ছ কোন্ দিকে? বাড়ি কোথায়?"

সে লাঠি দিয়ে দেখিয়ে বল্‌লে—"জঙ্গলের ওপারে—"

—"তা তো বুঝ্‌লাম। জঙ্গলের ওপারে কোথায়?"

—"আজ্ঞে কর্তা, তুলসীপুরই বটেন, তবে—"

ভাল পুরনো ডাক্তার হ'লে একটুতেই চটেন। হরি রায় তার ওপর খুব ভাল ডাক্তার ও বুড়ো মানুষ। ধমক দিয়ে বল্‌লেন—"আহাম্মক কোথাকার!"

ধমক খেয়ে লোকটা যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"এখন যাচ্ছিস্ কোথায়?"

—"আজ্ঞে, জঙ্গলের ওপারে—"

—"হুঁঃ। আমায় চিনতে পারিস্? সাতগড়ের হরি ডাক্তারের নাম শুনেছিস্?"

লোকটা এবার হাত জোড় ক'রে নিচু হ'য়ে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—"আজ্ঞে কর্তা, নাম শুনেছি, কিন্তু তেনার ওষুধ খাই নি।"

—"আমিই সাতগড়ের হরি ডাক্তার। আমার ওষুধের বাক্সটা মাথায় ক'রে তুলসীপুরের সতীশ মণ্ডলের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবি? দু'টাকা বক্‌শিস দেব—"

হারিকেনটা ততক্ষণে জ্বালা হয়ে গেছে। তার ম্লান আলোয় হরি ডাক্তার দেখ্‌লেন, লোকটার চেহারা চোয়াড়ের মতো, কিন্তু শরীর বেশ মজবুৎ ও লম্বা। তার চোখের দৃষ্টি সরল নয়, বাঁকা ও রুক্ষ এবং মাথায় লম্বা চুল, পরনের কাপড়, গায়ের চাদরখানা ময়লা।

ডাক্তারবাবু আবার জিগ্যেস করলেন—"পারবি?"

সে বল্‌লে—"আজ্ঞে তা পারি—"

বেহারারা বল্‌লে—"হুজুর! এই জঙ্গল ভেঙ্গে রাতের বেলা আপনি—"

ডাক্তারবাবু ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন—"চুপ!" তারপর "আমার ছাতি, লাঠি, স্টেথস্‌কোপ আর ওষুধের বাক্সটা বা'র কর্" বল্‌তে বল্‌তে তিনি জুতো পায়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পাল্কি থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়ালেন।

পাল্কির তো[illegible]কের নিচে দু'পাশে ছিল ছাতি ও লাঠি; পায়ের দিকে দেওয়ালের গায়ে

তাকের ওপর ছিল স্টেথসকোপ ও ওষুধের বাকস। বেহারাবা সেগুলো বা'র করতেই ডাক্তারবাবু স্টেথসকোপটা পকেটে পুরে ছাতি ও লাঠিখানা হাতে নিতে নিতে লোকটাকে
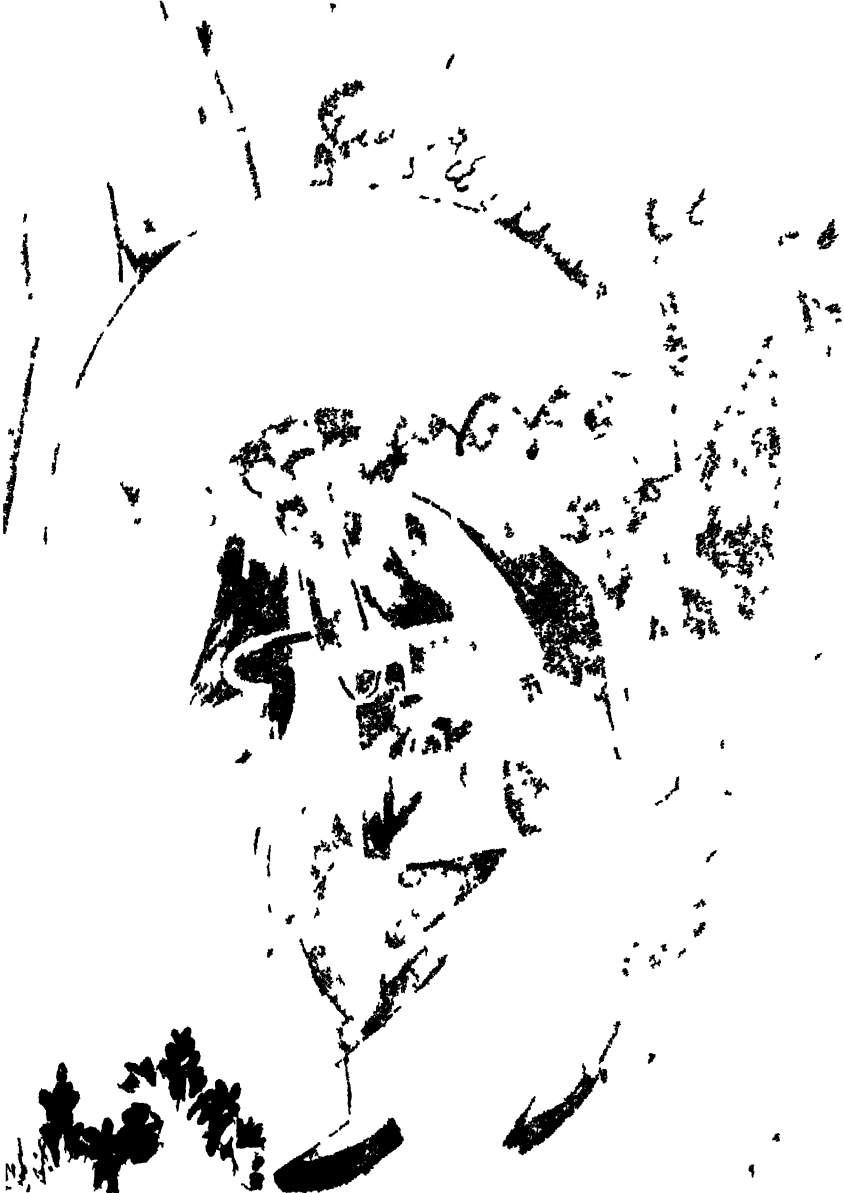
বললেন—"এই! শুনছিস্ ওরে! বাক্সটা মাথায় নে। খবরদার! ওর তলায় তেলের দাগ লাগে না যেন—"

লোকটা গায়ের চাদরখানা দিয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললে,—"কর্তা! আমরা

গরীব মানুষ,। তেল পাব কোথায় ?”

তারপর বাক্সটা মাথায় তুলে নিতে, ডাক্তারবাবু লাঠি দিয়ে লণ্ঠনটা দেখিয়ে একজন বেহারাকে বল্লেন—‘ওটা ওর হাতে দে। চল্—”

বেহারারা বল্লে—“হুজুর! আমরা— ?”

—“তোরা বাড়ি গিয়ে ছেলে-পুলেকে কোলে বসিয়ে নাড়ু খাওয়া গে—”

—“হুজুর, আমাদের ওপর মিছে রাগ করলেন। এই আঁধার রাতে একেবারে যমের মুখে—”

ডাক্তারবাবু কয়েক পা গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন—“যেতে পারবি নে, একথা আগে বল্লি নে কেন ? যা—যা বেটারা! আমার ভয় নেই। যম আমার স্যাঙাৎ!”

বেহারারা উত্তর না দিয়ে শূন্য পাল্কি কাঁধে তুলে সাতগড়ের দিকে ফিরে চল্লো। কিন্তু তাদের পা আর চলে না। ভয়ে বুক দুরু-দুরু করছে। মনে মনে বলতে লাগলো,—“আজকের রাতে এক মহা সব্বনাশ হবে। জয় মা কালী!—”

সেদিন সকাল থেকে সারাক্ষণই বৃষ্টি হয়েছে; বিকেলের দিকে কিছুকালের জন্যে ধরেছিল, আবার ঝুর-ঝুর ক'রে নাম্লো। হরি ডাক্তার ছাতা খুলে মাথায় দিলেন। বাক্সটার ওপর ছিল একখানা অয়েলক্লথের ঢাক্নি।

যেতে যেতে ডাক্তারবাবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে এদিক্-ওদিক্ তাকালেন, কিন্তু কিছুই দেখ্তে পেলেন না। অন্ধকারে ও বৃষ্টিতে সব চুপ্সে, মুছে, ধেব্ড়ে কালো হ'য়ে আছে। হারিকেনের আলোয় যেটুকুও দেখা যায়, সেটুকুর দৃশ্যও বিশ্রী। কেবল জল-কাদা, ঝোপ-জঙ্গল, মাঝে মাঝে দুটি একটি বড় গাছ। এর ওপর দিয়ে বাহকের কোমর থেকে পা দু'খানার সুদীর্ঘ কালো ও মোটা ছায়া নাচ্তে নাচ্তে চলেছে। বাতাস উঠেছিল। চারধার থেকে বৃষ্টিবিন্দুর টুপ্-টাপ্ শব্দ, ভিজে ডালপালার দীর্ঘশ্বাস এবং ব্যাঙ ও ঝিঁঝির সরু-মোটা নানা রকমের ডাক ও শব্দ এক সঙ্গে জোট পাকিয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু অনুমান করলেন, দু'জনে চাল্দাপুরের জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছেন। তবুও জিগ্যেস করলেন—“কোথায় এলাম রে ?”

—“কর্তা! চাল্দাপুরের জঙ্গলে। ঐ বাঁয়ে শিবকালীর পাট—” বললে লোকটা।

ডাক্তারবাবু সেদিক ফিরে তাকালেন; কিন্তু অন্ধকারে দেখ্বেন কি ? হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো, এতক্ষণ লোকটার নাম জিগ্যেস করা হয় নি; বললেন—“তোর নাম কিরে ?”

—“কর্তা! আমরা গরীব লোক; আমাদের আবার নাম কি ?”

ডাক্তারবাবু মনে মনে বল্লেন “বেটা আচ্ছা আহাম্মক তো! প্রকাশ্যে বললেন,—“তবুও—”

“আজ্ঞে, বুনো। কর্তা, একটু ডানদিক ঘেঁষে আস্বেন। বাঁয়ে গর্ত—”

ডানধার ঘেঁষে যেতে যেতে ডাক্তারবাবু থম্কে দাঁড়ালেন; বল্লেন—“বুনো, ও কিসের শব্দ রে ? কে কাঁদ্ছে না ?”

সত্যিই একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কে যেন দূরে কোথায় কাঁদছে—

“আহা—হা—হা, আহা—হা—হা!”

বুনো সমানে চল্তে লাগ্লো; ডাক্তারবাবুর কথায় জবাব দিলে না।

—“হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়ই কাঁদ্ছে। এই দাঁড়া। ঐ শোন, এ যে আর্তনাদ!”

লোকটা বল্লে,—“কর্তা। চুপ্-চাপ্ চ'লে আসুন। এখনও শিবকালীর পাট ছাড়াই নি—”

বাতাসের সজল সুরে শব্দটা প্রায় মিশে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু ভাব্লেন, ‘তবে কি সত্যিই চাল্দাপুরের জঙ্গলের পুবে—”

তিনি মাথা নিচু ক'রে চলেছেন। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ বার দুই পেঁচার ডাক শুন্‌তে পেলেন; একটা কাছে, আর একটা তার একটু দূরে। পেঁচা রাতের বেলাতেই ডাকে। এতে আর ভয়ের কি ?

তারপর আরও কিছুদূর গিয়েই একটা সুতীক্ষ্ণ শিসের শব্দে ডাক্তারবাবু চম্‌কে উঠ্‌লেন। শব্দটা বাতাসে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে, ডালের ফাঁক দিয়ে, বনের তলা দিয়ে, গাছের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ঐ দূর থেকেও শিস্ ভেসে আসছে। আবার একটা পেঁচা ডেকে উঠ্‌লো।

ডাক্তারবাবু হাঁক্‌লেন—"এই বুনো, দাঁড়া—"

বুনো ফিরে দাঁড়ালো।

—"কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ ?"

—"না কর্তা—"

আবার দূর থেকে শিস্ ভেসে এলো। ডাক্তারবাবুর এবার আর সন্দেহ রইলো না। তিনি বত্রিশ বছর ডাক্তারী কর্‌ছেন। এ পথেও বার কয়েক এসেছেন, তবে দিনের বেলা। কিন্তু এরকমটা কখনও হয় নি। নিশ্চয়ই আজ তিনি টিয়ার হাতে পড়েছেন! বল্‌লেন,—"এই বুনো—"

কিন্তু তাঁর কথা শেষ না হ'তেই পাশের ভিজে জঙ্গল থেকে দুটি ছায়া মূর্তি এসে সজোরে তাঁর হাত দু'খানা চেপে ধর্‌লো।

বুনো ততক্ষণাৎ ধমক দিয়ে উঠলো—"খবরদার! স'রে দাঁড়া। কেউ ওঁর গা ছুঁবি নে—"

লোক দুটো চট্ ক'রে স'রে দাঁড়ালো।

বুনো হারিকেনটা ওপর দিকে তুলে বল্‌লে,—"কর্তা, সঙ্গে কি আছে ?"

ডাক্তারবাবু বুনোর মুখের দিকে চোখ তুলে বললেন—"একটা ঘড়ি আর রূপোর চেন, কয়েক আনা পয়সা, চশমা জোড়া—"

বুনোর মাথায় তখনও ওষুধের বাক্‌সটা ছিল। সে তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"আর কিছু নেই ?"

—"হরি ডাক্তার মিছে কথা কয় না—"

—"এই বিচ্ছু, বাক্‌সটা ধর্। বুড়োটার কাপড়-চোপড় তালাস কর্‌বো।'

বিচ্ছু বাক্‌সটা বুনোর মাথা থেকে নিজের মাথায় তুলে নিতেই, বুনো ডাক্তারবাবুর সামনে এগিয়ে এলো।

হরি ডাক্তার বল্‌লেন,—"তুই বুঝি টিয়া ?"

—"হ্যাঁ গো মশায়। এইবার দাও তো সঙ্গে কি আছে ?"

হরি ডাক্তার চেনটা বুক থেকে খুলে, ঘড়িটা বুক-পকেট থেকে বার ক'রে, টিয়ার হাতে দিতে দিতে বল্‌লেন,—"এ সবে তোর কি হবে ? বেচ্‌লে দশটা টাকাও পাবি নে।

—"ঐ সঙ্গে তোমার জানটাও খাব—"

—"তাতে কি লাভ হবে ? যে লোকটার চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছি মাঝ থেকে সেই-ই মারা যাবে। তার চেয়ে এক কাজ কর্। আমি রোগী দেখে ফিরে আসি। সেখানে যে টাকাগুলো পাব সেগুলো, আর এই সব তোকে দিয়ে যাবো—"

—"ওরে বংশী, বুড়োটার রগড়ের কথা শোন্। প্রাণ দিতে কেউ ফিরে আসে ? ঐ ক'রে পালাতে চাও বাবু ?"

"পালাবার হ'লে এ জঙ্গলের রাতের বেলা ঢুকতাম না। ছাপান্ন বছর বেঁচেছি, আরও দু'চার বছর না বাঁচ্‌লে ক্ষতি কি? ছেলেটা ছিল সেটাও তো মারা গেছে—"

"তবে আর দেরী কেন? এখনই মর" ব'লেই টিয়া তার হাতের মোটা লাঠিখানা তুল্‌লো।

—"দেখ্, টিয়া, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার বড় আনন্দ হয় রে। ওটা আমার অভ্যাস হ'য়ে গেছে। একবার রোগীটাকে দেখবো। যদি আমার কথা কিছু শুনে থাকিস্, তা হ'লে এটাও নিশ্চয়ই শুন্‌তে পেয়েছিস্, হরি ডাক্তারের যে কথা সেই কাজ। আমি ঠিক ফিরে আস্‌ব।"

টিয়া কি যেন একটু ভাব্‌লে; তারপর বল্‌লে—"আচ্ছা, আমি তোমায় এখান থেকে ডুলিতে চড়িয়ে তুলসীপুর নে যাব। সে ডুলিতেই আবার ফিরে আস্‌বে।" কিন্তু খবরদার! আমাদের যদি কোন ক্ষেতি হয়, আর যদি ফিরে না আস, তা' হ'লে তোমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে, তোমায় খুন ক'রে গাছে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌বো। কেউ ঠেকাতে পার্‌বে না।"

হরি ডাক্তার খুব সহজ সুরে বল্‌লেন—"আচ্ছা।"

বুনো বললে, "ওরে বংশী, ডুলি আন্। হীরু আর মন্দাকেও ডেকে আন্‌বি—" মিনিট দশেকের মধ্যেই একখানা ডুলি এলো।

ডাক্তারবাবু তাতে উঠে বসলেন। বেহারা হলো বিচ্ছু, বংশী, হীরু আর মন্দা; টিয়া নিলে হাতে হারিকেন, মাথায় ওষুধের বাকসটা।

জল-কাদা ভেঙ্গে ডাক্তারবাবুকে কাঁধে নিয়ে বাহকরা ছুটে চল্‌লো তাদের গলা থেকে একটানা শব্দ বা'র হচ্ছে—"উঁহু হুঁ-হুঁ-উঁহু হুঁ-হুঁ।"

আবার বৃষ্টি পড়ছে; দূরে শেয়াল ডেকে উঠলো। ডাক্তারবাবু চুপ ক'রে ব'সে ভাবছেন, এ মন্দ নয়। গল্প শুনেছি, ভূতের ওঝারা ভূতের পাল্কি চ'ড়ে বেড়ায়। আমি চলেছি ডাকাতের ডুলিতে।

রাত তখন বারোটা হবে। জঙ্গলটা শেষ হয় আর কি। এমন সময় হঠাৎ চারধার থেকে মশাল ও বন্দুক হাতে একদল লোক ডাক্তারবাবুর ডুলি ঘিরে ধ'রে হাঁক্‌লে—"এই! খাড়া রহো—"

বাহকরা স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। হরি ডাক্তার ডুলি থেকে মুখ বা'র ক'রে দেখেন, সাম্‌নে দারোগা সাহেব; হাতে পিস্তল।

দারোগা সাহেব হরি ডাক্তারকে দেখেই বল্‌লেন—"তাজ্জব ব্যাপার! ভেবেছিলাম, ডুলিতে টিয়া বেটা বউ সেজে পালাচ্ছে, তার বদলে আপনি!"

হরি ডাক্তার বললেন—"হাঁক শুনে আর মশালের আলো দেখে আমারও বুক কাঁপছিল—বুঝি ডাকাতটার হাতে পড়লাম! এখন দেখ্‌ছি আপনি—"

—"আপনার সাহস আছে তো ডাক্তারবাবু! এই রাত্রে জঙ্গল ভেঙ্গে চলেছেন কোথায়?"

—"কি আর করি বলুন? যাচ্ছি তুলসীপুর সতীশ মণ্ডলের বাড়ি। তার ছেলের কলেরা। জানেন তো আমরা ডাক্তার মানুষ যমের স্যাঙাৎ; আমাদের সময়-অসময় কিছু নেই। আপনি এমন অসময়ে এই জঙ্গলে?"

—"খবর পেয়েছি, বেটা এখন এই জঙ্গলে আছে। আপনার ডুলি কোথাকার।"

—"সাতগড়ের—"

—"পাল্কিতে এলেন না কেন?"

—"পাওয়া গেল না।"

—"বটে! আপনার ডুলির বেহারাগুলোর চেহারা কিন্তু ভাল নয়। যেটার মাথায় বাক্সটা আছে সেটা ঠিক—"

ডাক্তারবাবু দারোগা সাহেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"কোন দিন হয়তো বল্‌বেন, আমার চেহারাটাও খুনীর মতো—"

দারোগা সাহেব হাঁক্‌লেন—"এই জমাদার! ডাক্তারবাবুকো যানে দেও।—নমস্কার।"

"নমস্কার!" ডাক্তারবাবু হাঁকলেন—'ওরে শশী! পা চালিয়ে চল্‌। বেটারা এখানেই রাত কাবার কর্‌বি।"

বেহারারা এবার আরও জোরে শব্দ করতে লাগলো—"উহুঁ—হুঁ—হুঁ—ও; উহুঁ—হুঁ—হুঁ—ও!"

তাদের পা আরও জোরে চল্‌ছে।

তারপর তা'রা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যখন তুলসীপুরে সতীশ মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে পৌঁছল তখন রাত ঠিক একটা। চারধার নিঝুম, কেবল দূর থেকে চৌকীদারের হাঁক ভেসে আস্‌ছে। মণ্ডল মশায়ের বৈঠকখানার বারান্দায় ব'সে কে যেন 'ফুড়ুৎ' 'ফুড়ুৎ' শব্দে হুঁকো টান্‌ছিল। তার পাশে একটা হারিকেন জ্বলছে। বারান্দার এক কোণে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। বেহারারা ডুলিখানা অন্ধকার উঠোনে নামাতেই কুকুরটা 'ঘেউ ঘেউ' কর্‌তে কর্‌তে উঠে দাঁড়ালো। যে লোকটা হুঁকো টান্‌ছিল, সে বল্‌লে—"কে এল।"

বংশী বল্‌লে—"সাতগড়ের ডাক্তারবাবু—"

লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে ভিতর বাড়ির দিকে চ'লে যেতেই ডাক্তারবাবু ডুলি থেকে বেরিয়ে এলেন।

টিয়া হঠাৎ তাঁর কাদামাখা পা দু'খানা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—"কর্তা, আপনি আমার মা-বাপ। এই পা ছুঁয়ে কিরে ক'রে গেলাম, আমার জান থাক্‌তে কেউ আপনার ক্ষেতি করতে পার্‌বে না। ওরে বংশী, এই মদ্দা, তোরা দেবতার পায়ের ধুলো জিভে, মাথায় ঠেকা—"

ইতিমধ্যে মণ্ডল মশায় বেরিয়ে এলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে টিয়ার দলও হাওয়া।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারবাবু সাতগড়ের নিজের বৈঠকখানার বারান্দায় জলচৌকির ওপর ব'সে তামাক খাচ্ছেন। দুপুরে তুলসীপুর থেকে আসবার পথে শুনেছিলেন, পুলিশ চাল্‌দাপুরের জঙ্গলে টিয়ার আড্ডার সন্ধান পেয়েছে; কিন্তু কারুকে ধরতে বা কিছুই উদ্ধার করতে পারে নি। তিনি নিজের মনে ব'লে উঠলেন—"বেটা বাহাদুর!"

এমন সময় একটা ছায়ামূর্তি অন্ধকার উঠোনের ওপর দিয়ে এসে তাঁর চৌকীর সামনে একজোড়া মস্ত ইলিশমাছ ও চারটে আনারস রেখে মাটিতে টিপ্‌ ক'রে মাথা ঠুকেই মিলিয়ে গেল।

এটা পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। এখন সে ডাক্তারবাবু ও টিয়া কেউ-ই নেই, আছি শুধু আমি, আর চাল্‌দাপুরের জঙ্গলের খানিকটা। সেখানে গেলে শিবকালীর পাট আজও দেখা যায়।

গবিন সিংয়ের ঘোড়া

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গবিন সিং পশ্চিম দেশের ছত্রী—গোঁফ গালপাট্টা আর লম্বা লাঠি নিয়ে বাংলাদেশে চাকরী করতে এসেছিল। এসে দেশটা এমনি ভালো লাগল যে, এ-দেশেই সে বাস করে ফেললো। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এলো, বাড়ি-ঘর করলো, সঙ্গে-সঙ্গে কিনলো এক ঘোড়া। ছত্রীদের ঘোড়া হলো ইজ্জৎ। আগেকার কালে ছত্রীদের ছিলো প্রকাণ্ড বড়ো ঘোড়া আর তলোয়ার। এ-যুগে তলোয়ার গেছে, লাঠি ধরতে হয়েছে। ঘোড়াটা আছে, কিন্তু বড়ো থেকে ছোট হয়েছে। গবিন সিং বলতো, নসীব ; কপালে হাত দিতো।

তারপর বলতো, ইংরেজ। ঐ সাদা-চামড়া ফিরিঙ্গি-ইংরেজ। লোক হাসতো।

গবিন সিং ছেলের নাম রেখেছিলো নবীন। বাংলাদেশেই নবীনের জন্ম, তাই। এদেশের বাপ ছেলেতে, ভাইয়ে ভাইয়ে নামের মিল রাখার রেওয়াজের মতোই নাম রেখেছিল। গবিনের ছেলে নবীন। লোকে তার বুড়ো ঘোড়াটার নাম রেখেছিল প্রবীণ। গবিনও হেসে ফেলতো, বলতো, ইয়ে বাঙ্গালী লোক আরেঃ বাপ। মগজ বহুৎ সাফা। এইসা ঝাটসানি ছড়া বনা দেতা। হায় হায়!

প্রবীণ ছোট হলে কি হবে—গুণ অনেক। গবিনের অবস্থা বোঝে। ঘরে খায় না, চরে খায়—সকালবেলা ঘর থেকে বার হয়েই গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ক্ষুরে ক্ষুরে খপখপ শব্দ তুলে ছুটে বেরিয়ে যায়। সামনে লোকজন থাকলে নিজেই চিঁ-হি-হি করে চেঁচিয়ে উঠে বলে—হট্ যাও! হট্ যাও!

লোকেরা বলে—ঐ রে, প্রবীণ আসছে! তারা সরে দাঁড়িয়ে পথ দেয়। বুড়ি বা বুড়ো পথে পড়লে প্রবীণ নিজেই পাশ কাটিয়ে চলে যায় বা থমকে দাঁড়ায়। তারা চলে গেলেই আবার ছুটতে আরম্ভ করে—খপ্ খপ্, খপ্ খপ্। একেবারে গাঁ পেরিয়ে মজা দীঘিটায় গিয়ে নামে, সেখানে ঘোড়াদাম নামে ঘাস প্রচুর জন্মায়, তাই খায়। ঠিক সন্ধের সময় ফিরে নিজের চালাটার

ামনে দাঁড়িয়ে চিঁ-হি চিঁ-হি শব্দ করে। শব্দ করে সে ডাকে। কাউকে আসতেই হবে—হয় গবিনকে, নয় নবীনের মাকে। বলতে হবে—এসেছিস?

প্রবীণ অমনি ঘাড়টা লম্বা করে মুখটা কাছে নিয়ে আসবে, সেখানে কয়েকটা আদর করে চাপড় মারতে হবে—বাস। তাহলেই হলো। প্রবীণ খুশি হয়ে চালায় গিয়ে ঢুকবে। তা না হলে কিছুতেই চালায় ঢুকবে না, চিঁ-হি-চিঁ-হি ডাকতেই থাকবে, তাতে বিরক্ত হলে বিপদ। চাবুক মারো আর চেলা কাঠ দিয়েই পেটো, সে ডাকতেও থামবে না, ঘরেও ঢুকবে না, পালিয়েও যাবে না। ঠায় দাঁড়িয়েই থাকবে আর চেঁচাবে।

গবিন সিং মধ্যে মধ্যে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে যায়। বাবুদের বাড়ির চাকরি ছেড়ে সে এখন টাকা দাদনের ব্যবসা করে। চাষীদের টাকা ধার দেয়। দলিল না, খৎ না—শুধু-হাতে দেয়, আদায়ের সময় ঘোড়ায় চেপে গিয়ে বাঁ হাতে লাঠি ধরে ডান হাত পাতে—দাও টাকা, টাকায় মাসে দু-পয়সা সুদ মাস-মাস সুদ চাই, মেয়াদ অন্তে টাকা চাই। আজ টাকাটা দিয়ে ফের কাল নাও তা দেবে গবিন সিং, কিন্তু কথার খেলাপ অর্থাৎ ঠিক দিনে টাকাটা না পেলে সর্বনাশ। দিনগুলো গবিন সিং-য়ের মুখস্থ থাকে। ঠিক দিনে সে ঠিক হাজির হবে। খেয়ে-দেয়ে সাদা চাদরের পাগড়ি বেঁধে, ছোটো লাঠি হাতে তৈরী হয়ে নবীনকে বলে, নবীনোয়া, বোলাও তো পরবীনোয়াকো!

নবীন গাঁয়ের ধারে এসে হাঁকে বিচিত্র সুরে—আ-আ-আ-ওঃ!

প্রবীণ কান খাড়া করে শুনে মজা দীঘি থেকে উঠে খপ্ খপ্ করে ছুটে এসে নবীনের সামনে দাঁড়ায়। নবীন প্রবীণের গলাটা ধরে পিঠে উঠে পড়ে, চুল মুঠোয় চেপে ধরে লাগামের মতো। প্রবীণ সটান এসে ওঠে বাড়িতে। গবীন তার পিঠে কম্বল বেঁধে, মুখে লাগাম এঁটে চড়ে বসে। প্রবীণ চলতে আরম্ভ করে ঠুক্ ঠুক্ করে। এটুকুও প্রবীণের একটা গুণ। গবিন বলে, আরে মশা, পরবীন সম্‌ঝে সব। ভরতি-পেটমে দৌড়েগা তো হামারা তকলিফ্ হোগা!

লোকে বলে, কিন্তু আসবার সময়? তখনও তো সেই ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্।

—হাঁ হাঁ পাকিটমে টাকা থাকে, কাঁধমে তরকারি-উরকারি থাকে, ঝম্‌ঝমাবে নেহি। গির যাবে নেহি! পরবীন সব সম্‌ঝে মশা।

গাঁয়ের ছেলেরা গবিন সিং-য়ের কথাকে সমর্থন করে। ওরা প্রবীণের তেজস্বিতার সঙ্গে পরিচিত। মধ্যে মধ্যে ওরা দল বেঁধে দীঘির ধারে যায়, প্রবীণের পিঠে চড়ে তেপান্তরের মাঠে ছুট দেবার জন্য। ওদের দীঘির পাড়ে দেখলেই প্রবীণ ঘাড় উঁচু করে দাঁত বের করে শুরু করে চিঁ হি চিঁ-হি।

ছেলেরা কিন্তু ওতে ভয় পায় না। ওরা তাড়া দিতে থাকে। প্রবীণ কামড়াতে আসে। ওরা খুব চতুর। দূর থেকে বিচিত্র কৌশলে নানা দিক থেকে ওকে বিভ্রান্ত করে, মাথার চুল এবং কান চেপে ধরে দড়ি দিয়ে বাঁধে। তারপর তারা পালা করে চাপে। চাপামাত্র প্রবীণ সামনের জোড়া পা তুলবে তাতে ওরা না পড়লে প্রবীণ পিছনের পা ছুঁড়বে, আবার সামনের পা তুলে দাঁড়াবে। শেষ পর্যন্ত ছুটবে—ছুটে গিয়ে গাছের গুঁড়িতে গা ঘেঁষে দাঁড়াবে। অর্থাৎ সওয়ারের পা-খানাকে টিপে ধরবে গাছ ও নিজের পেটের সঙ্গে। সওয়ার পড়লেই সে তখন প্রচণ্ড বেগে ছুটবে প্রান্তরের মধ্যে। চক্রাকারে সার্কাসের ঘোড়ার মতো ছুটবে। ছেলেরাও ছুটবে তাকে আবার ধরবার জন্য।

কিন্তু এ মজা-দীঘির ঘাসে ভরা কাদামাটি নয়, শক্ত মাটির ডাঙা, এখানে প্রচণ্ড দৌড়োয় প্রবীণ। ছেলেরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত থামে না। ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে বসলে সে দাঁড়ায়, চিঁ-হি

চিঁ-হি করে সম্ভবত মুখ ভেংচে আবার চলে যায় দীঘির দিকে।

ছেলেরা বলে—তীর বেগে দৌড়তে পারে প্রবীণ। কিন্তু ভারি পাজি। কলকাতার ঘোড়দৌড়ের কথা শুনেছে তারা। তারা বলে—যা ছোটে, কলকাতায় ঘোড়দৌড়ে প্রবীণ ফার্স্ট হতে পারে!

কিন্তু কে চাপবে? গবিন সিং-য়ের পেট কব্ কব করে, সে চড়লে প্রবীণকে আস্তে হাঁটতে হবে। ছেলেরা চাপলে সামনের পা তুলবে, পেছনের পা ছুঁড়বে, দেওয়াল ঘেঁষে সওয়ারকে ঘেঁষটে দেবে। ততোক্ষণে বাকি ঘোড়ারা মেরে নেবে বাজি।

এক পারে নবীন। নবীন শুধু পিঠের ওপর উঠে ঘাড়ের মুঠোটি ধরলেই প্রবীণ ছুটবে—যেন পক্ষীরাজ!

ছেলেবয়সে নবীন পুলকিত হতো। কিন্তু ক্রমশ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লজ্জিত হতে আরম্ভ করলো। তার বাপ তাকে পরবীনোয়াকে বোলাইতে বললে সে বলতো—আমি পারবো না।

বাপ বলতো—কাহে ?

ছেলে বলতো—না। পেটমোটা একটা বিশ্রী ঘোড়া !

পেট মোট্টা ! বিস্মিত হতো গবিন সিং। কী হলো তাতে ? সে বলতো—পেটমোট্টা তো কী হয়েছে ? ইয়ে তো দেশকে দস্তুর। বাংগালকা পানিমে পেটমোট্টা হোতা হ্যায়। পিলিহা রে বেটা, পিলিহা। সব লোকের পেটমে পিলিহা—পরবীনকো ভি পিলিহা—কেয়া হুয়া উস্‌মে ?

নবীন রাগ করে বেরিয়ে যেতো। গবিন সিং অগত্যা নিজেই গিয়ে হাঁকতো—

—আঃ—আঃ—আঃ—ও—

পরবীন এসে হাজির হতো, কিন্তু মন্থর গতিতে। নবীনের হাঁকে যেমন ছুটে আসতো—তেমন ছুটে আসতো না।

সেই প্রবীণ সেদিন মরলো।

গোটা গ্রামটায় হৈ-হৈ পড়ে গেলো। কথাটা অবশ্য আশ্চর্যের কথা। একটা ঘোড়ার মৃত্যুতে হৈ-হৈ পড়ে কোনোকালে ? পড়ে না, কিন্তু প্রবীণ যে আত্মহত্যা করলো ! এও অবশ্য অবিশ্বাস্য কথা, কিন্তু লোকে বললে তাই। পৃথিবীর লোকে অবিশ্বাস করুক, গাঁয়ের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস—প্রবীণ আত্মহত্যা করেছে। গ্রামের ধারে ছোটো নদীটার ওপর যে খুব উঁচু সাঁকোটা আছে, সেইখান থেকে ঝাঁপ খেয়ে নিচে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরলো প্রবীণ।

আগাগোড়াই তো সব তারা জানে—চোখে দেখলে।

নবীন অনেকদিন থেকেই প্রবীণের পেটের পিলের জন্য লজ্জিত ছিলো। সে লজ্জা তার চারগুণ বেড়ে উঠেছিলো বিয়ের পর। ক্রোশ চারেক দূরে কামাৎপুর-পুণ্যার ছত্রীদের বাড়িতে নবীনের বিয়ে হলো। প্রবীণের পিঠে চেপে শ্বশুরবাড়ি যেতে হলো তাকে বাপের তাড়ায়। প্রবীণকে দেখে নবীনের শালারা আর ঠাট্টার সীমাপরিসীমা রাখলো না—নবীন, এটা চিঁ-হিঁ করে ডাকে, না হুঁকো-হুঁকো করে ডাকে হে ?

নবীন লজ্জা সত্ত্বেও বললো, একবার চেপে দেখো না কেমন শির-পা করে লাফিয়ে ওঠে !

তার কথাটা শেষ হতে-না-হতে কামাৎপুরের ছত্রীদের তিনমণি ওজনের পরশুরাম সিংজি দাওয়ার ওপর থেকে ঝপ্‌ করে প্রায় ঝাঁপিয়ে আচম্‌কা প্রবীণের পিঠে চেপে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে কোঁক্‌—একটা শব্দ করে প্রবীণ পেছনের পা দুটো দুমড়ে বসে গেলো।

সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। নবীনের মাথাটা যেন কাটা গেলো। ঠিক এই সময় নিজেদের ঘোড়ায় চেপে গ্রামান্তর থেকে উপস্থিত হলো তার বড়ো শালা।

পুণ্যার ছত্রীদের ঘোড়াটা মস্ত বড়ো। নির্লজ্জ প্রবীণ সেটাকে দেখে ক্ষেপে উঠলো। চিৎকার করে সামনের পা তুলে তাকে আক্রমণ করলো। বড়ো ঘোড়াটা বোধ হয় তুচ্ছ করেই তার পানে পেছন ফিরে দাঁড়ালো—অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দিলো পেছনের জোড়া-পায়ের লাথি। ব্যাস্‌ !

প্রবীণের হুঙ্কারের আধখানা তার মুখেই থেকে গেলো—সে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে গেলো মাটিতে।

প্রবীণ কাৎরালো কি না নবীন তা বুঝতে পারলো না, কামাৎপুরের ছত্রীদের সেই হা-হা করে হাসিতে আকাশ তখন ফেটে যাচ্ছে। নবীন তখন দেখতে পেলো, প্রবীণের নাক থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে।

রাত্রে স্ত্রী বললো, তুমি ঐ ছাগলটায় চেপে আর এসো না।

নবীন মনে মনে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলো। আসবার সময় ঘোড়াটায় চাপলে না। লাগামের দড়ি ধরে টেনে হেঁটেই ফিরলো।

শালারা বললো, আ-হো সওয়ার, ই কেয়া বাত? চড়ো—তোমার পক্ষীরাজে চড়ো।

নবীন বললো, বড়ো ঘোড়া কিনে তবে চড়ে আসবো।

প্রবীণ কিন্তু দড়ির টানে চলবে না, সে ঘাড় টেনে দাঁড়িয়ে গেলো। সওয়ার না হলে সে যেতে নারাজ। বার-কয়েক সে চিঁ-হিঁ চিঁ-হি করে বললো, চড়ো, চড়ো! নাকে আমার চোট লেগেছে, ও কিছুই না। চড়ো তুমি।

নবীন চাবুকের বাঁটটা দিয়ে পিটতে শুরু করলো। পিছন থেকে পিটতে পিটতে তাকে চার ক্রোশ পথ ছুটিয়ে নিজেও ছুটতে-ছুটতে এলো। বাড়িতে পৌছে বাপের সামনে চাবুকটা আছড়ে ফেলে দিয়ে বললো, অকিঞ্চন ধোবার বাড়ি চললাম আমি।

—ধোবার বাড়ি? আভি? কাহে?

—তোমার প্রবীণকে আজ বেচবো আমি।

গবিন সিং হুংকার দিয়ে উঠলো, তুম্‌কো হম্ বেচেঙ্গে। বুলাকি মেহরথ্‌কো পাশ বেচ্ দেঙ্গে।

নবীন থমকে দাঁড়ালো এবার। বললো, বেশ, তোমার বাড়ি থেকে চললাম আমি।

গবিন বললো, আভি, আভি, আভি নিকালো!

প্রবীণের ক্ষত বিক্ষত দেহে সে হাত বুলোতে লাগলো।

নবীন আলাদা হয়েই গেলো। গবিন সিং তাতে দুঃখ করলো না। মরদের লড়কা মরদ, আপন হিম্মতে অর্থাৎ শক্তিতে করে খায়। বাপের রোজগারে যে খায় তার মরদনানি কোথায়?

নবীন সত্যি মরদ। সে বেশ রোজগার শুরু করে দিলো। হাটে-হাটে গ্রামে গ্রামে সে ধান চাল কেনা-বেচা কারবার আরম্ভ করলো। বছর ছয়েক পরে একদিন সে তার শালার সেই বড়ো ঘোড়াটায় চেপে বাড়ি এলো। পুরানো বাড়িতে। বাপের বাড়িতে এসে বললো, কিনলাম এটা।

গবিনের মুখ গম্ভীর হলো। নবীনের শালাদের দেনা হয়েছে সে জানতো, নিজেও কিন্তু টাকা পেতো; টাকাটা অবশ্য এবার সে পাবে কিন্তু নবীন এইভাবে টাকাটা নষ্ট করলো, এটা তার ভালো লাগলো না। বড়ো ঘোড়া—তার ছোলা চাই; জৈ চাই, দলাই-মলাই চাই। মনে হলো তার প্রবীণের কথা। লক্ষ্মী—প্রবীণ তার লক্ষ্মী!

নবীন বললো, তোমার আস্তাবলে ঘোড়াটা এখন থাকবে। ঐ গাধাটা থাকবে বাইরে এখন।

গবিন বললো, কেয়া করুঁ? নাচার! তুম্ লে-আয়া রূপেয়াকে মাল—গবিন চালায় ঘোড়া বাঁধলো, দানা দিলো, পেছনের দিকে দুটো খোঁটা পুঁতলো, পা টেনে দড়ি দিয়ে খোঁটার সঙ্গে বাঁধলো। প্রবীণের এসব দরকারও ছিলো না, খোঁটাও ছিলো না।

সন্ধেবেলা নবীন স্ত্রীকে বললো, দেখো দেখো, পায়ে হেঁটে তোমার ভাইরা এখন থেকে আসবে এখানে—সেটা আমারই লজ্জা হবে। একটা কাজ করলে হয় না?

স্ত্রী মুখের দিকে চাইলো—কি কাজ?

—প্রবীণকে তোমার ভাইদের দিয়ে দি। কি বলো? ঘোড়া তো, ছাগল তো নয়! আর ছাগল যদিও হয়, তাতেই বা কী? পায়ে হাঁটার চেয়ে ভালো তো?

স্ত্রীর সঙ্গে একটা ঝগড়া বেধে যেতো। কিন্তু তার পূর্বেই চি-হি চিৎকার গোটা পাড়াটা একেবারে হকচকিয়ে গেলো।

নবীন লাফিয়ে উঠলো। গেলো প্রবীণ গেলো? আজ আবার—

ছুটে গেলো সে। গিয়ে যা দেখলো, তাতে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেলো। প্রবীণ যায় নি, যেতে বসেছে বড়ো ঘোড়াটাই। আজ তার পেছনের পায়ে বাঁধা রয়েছে সে। সামনে গলায় বাঁধন। প্রবীণ দীঘি থেকে ফিরে তার আস্তাবলে সেই পুরোনো দুশমনকে দেখে ক্ষেপে গিয়ে তাকে আক্রমণ করেছে। বন্ধনদশার সুযোগ নিয়ে সে সামনের পা দুটো তার পিঠে দাপিয়ে কামড়ে ধরেছে তার ঘাড়! গবিন সিং তাকে পিটছে, বলছে,—ছাড় ছাড়! তবু সে ছাড়ছে না।

নবীন প্রকাণ্ড এক লাঠি এনে পিটিয়ে তাকে ছাড়ালে। প্রবীণ বুড়ো ঘোড়াটার ঘাড়টা থেকে খানিকটা মাংস খুবলে নিয়েছে কঠিন আক্রোশে। নবীন বললো, ওকে আমি মেরেই ফেলবো!

গবিন আজ আর প্রবীণের পক্ষ নিতে পারলো না। এমন ঘোড়া, এতো টাকা দাম—তাকে জখম করে দিলো প্রবীণ! সে বিনয় করে বুঝিয়ে বললো, গোস্যা মৎ কর বেটা। ভালা হো-যায়েগা। থোড়া সে জলদি।

নবীন কোনো কথা না বলে তার ঘোড়াটাকে খুলে নিচে চলে গেলো। প্রবীণ ঠুক্-ঠুক্ করে তার আস্তাবলে গিয়ে ঢুকলো। গবিন সিং মারা গেলো মাস-দুয়েক পর। হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলো। নবীন বাড়িতে ফিরলো না। এ বাড়িতে সে ধান-চালের গুদাম করবে। পাশাপাশি বাড়ি, নিজের নতুন বাড়িতে নিয়ে গেলো তার মাকে। শুধু আস্তাবলের চালাটা ভেঙে দিলো।

প্রবীণ সন্ধ্যায় এলো, এসে সেই খোলা চালাতেই গিয়ে দাঁড়ালো।

নবীন ওকে খুব ঘা-কতক দিয়ে তাড়িয়ে দিলো। কিন্তু সকালে উঠে দেখলো প্রবীণ ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে আবার উঠলো লাঠি নিয়ে। স্ত্রী বাধা দিয়ে বললো মারছো কেন?

—আপদকে দূর করতে হবে।

—না।

—তবে ওকে বেচে দেবো আমি। আজই বেচে দেবো।

—না।

—না তো ওকে কী করবো আমি?

—ধান-চালের ছালা চাপিয়ে হাটে যাবে-আসবে। গরুর গাড়ি ভাড়া লাগবে না।

—ঠিক। ঠিক। খুব খুশী হলো নবীন।

বাপের শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে নবীন সেদিন হাটে বার হলো। ধান-চাল বেশ কিছু জমেছিল, ছালায় ভর্তি করে প্রবীণের পিঠে চাপিয়ে দিলো। নিজের বড়ো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কারবারের মজুরটাকে বললো, ওটার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চল।

নিজে সে রওয়ানা হলো। বড়ো ঘোড়াটা টগবগ করে বেরিয়ে গেলো।

খানিকটা এসেই পেছনে শব্দ শুনে সে চমকে উঠলো—চিঁ-হি, চিঁ-হি! ফিরে তাকিয়ে দেখলো—প্রবীণ ছালার বোঝা পিঠে নিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে। চীৎকার করছে, হিংস্র আক্রোশে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। যে লোকটা দড়ি ধরে আনছিলো তার কোনো চিহ্ন নেই। প্রবীণ তার হাতের দড়ি ছিঁড়ে পাগলের মতো ছুটে আসছে। নবীনের ঘোড়াও চঞ্চল হয়ে উঠলো। সেও ডাকতে শুরু করে দিলো। নবীন রাশ টেনে তাকে বাগ মানাতে গেলো। প্রবীণ এসে সামনের পা তুলে দাঁত বের করে আক্রমণ করতে চেষ্টা করলো। নবীন জিনের পাশে যে লাঠিটা বাঁধা ছিলো সেটা খুলে নিলো। লাঠিটা সাংঘাতিক লাঠি, মাথায় ছুঁচলো একটা ফলা আছে—হঠাৎ চোখে পড়ে না। কিন্তু আক্রমণের সময় বেশ বল্লমের মতো ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তার আগেই তার বড়ো ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করলো—ভয়ে ছুটতে শুরু করলো। প্রবীণ

খোলা। সে সওয়ারের হাতে বাঁধা। তার ওপর প্রবীণের দাঁতগুলোয় বড়ো ধার, সেকথা তার মনে আছে। নবীন রাশ টানলো—তবু সে মানবে না। ওদিকে প্রবীণও ছুটছে। প্রাণপণে ছুটছে। মোটা পেটটা যেন দৌড়ের লম্বা পা ফেলার টানে সরু হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়দৌড়ে বাজি জেতবার জন্যই যেন সে ছুটছে! পিঠের ছালার বাঁধন খুলে ধান-চাল পড়ছে। প্রবীণ—ছুটছে—ছুটছে। দেখতে-দেখতে সে এগিয়ে এলো। নবীনের ঘোড়াটা এবার থামতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নবীন এবার তাকে ছোটালো। হাতে নিলো সেই লাঠিটা।

দুটো ঘোড়া ছুটছে।

প্রবীণ প্রাণপণে ছুটছে। এমন ছোটা তার কেউ কোনোদিন দেখেনি। সেও জীবনে কোনোদিন এমন ছোটা ছোটেনি।

রাস্তার লোক দেখছে। হাততালি দিচ্ছে।—কে জেতে?—কে জেতে?

—বলিহারি—বাহ্‌বা—প্রবীণোয়া! বাহ্‌বা—বাহ্‌বা!

সামনেই সাঁকোটা বাজি-জেতার চিহ্নিত স্থানের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

—বলিহারি প্রবীণোয়া! বলিহারি!

প্রবীণই পৌঁছালো সেখানে বড়ো ঘোড়ার আগে।

বাস! আর তার জীবনের কি প্রয়োজন? উঁচু সাঁকোটার পাশের রেলিং অনেক দিন ভেঙেছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড মেরামত করায় নি। বিশ হাত নিচে নুড়ি-পাথর-ভরা নদীর গর্ভ। প্রবীণ সেইখান দিয়ে খেলো ঝাঁপ।

নবীন সজোরে চেপে ধরলো তার ঘোড়ার লাগাম।

ঘোড়াটার ঠোঁট কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেলো। সে থামলো। নবীন ঘোড়া থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছে বললো শয়তান! গাধা!

লোকে চোখে দেখলো—প্রবীণ বাজি জিতে ইচ্ছে করে লাফিয়ে পড়লো সাঁকো থেকে।

প্রবীণের মৃতদেহও তারা দেখতে পেলো নদীর বুকে নেমে।

ঘাড় গুঁজে পড়েছে বেচারি। ভেঙে গেছে ঘাড়টা।

কিন্তু ওর পেছনে পায়ের ওপরে এগুলি কী? অনেকগুলি রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন?
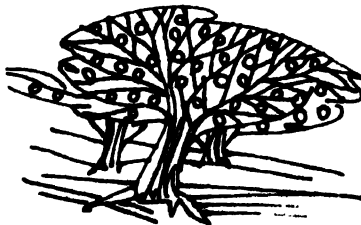
স্বামী চপেটানন্দ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপালচন্দ্র—ওরফে জেনারেল ন্যাপলার সঙ্গে বোধ হয় তোমাদের পরিচয় আছে। একবার সে বুদ্ধি খাটিয়ে মিশন স্কুলের গুণ্ডা ছেলেদের কেমন জব্দ করেছিল, সে গল্প হয়তো পড়ে থাকবে।

নেপাল ছেলেটি দেখতে রোগা-পটকা বটে, আর বয়সও খুব কম,—কিন্তু তার মাথায় এতরকম বুদ্ধি আসে যে, কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। বাংলার মাস্টার বলাইবাবু তার মাথায় গাঁট্টা মেরে ভারি বিপদে পড়েছিলেন, সেই থেকে কোন মাস্টার তার গায়ে হাত তুলতেন না।

নেপাল পড়াশুনায় ভালই ছিল। কিন্তু তবু পরীক্ষার সময় কার না ভয় হয়? বিশেষত বলাইবাবু ওৎ পেতে আছেন, একটু সুবিধা পেলেই তাকে ফেল করিয়ে দেবেন।

বলাইবাবুর ভয়ে নেপাল ভীষণ মনোযোগ দিয়ে বাংলা পড়ছে; কিন্তু তবু প্রাণে শান্তি নেই—কি জানি কী হয়।

সেদিন বাংলার পরীক্ষা। ভোরবেলা উঠেই নেপাল সজোরে পড়া মুখস্থ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এমন সময় তার বন্ধু সুধা এসে হাজির।

সুধা বললে, 'কিরে, আজও পড়া মুখস্থ করছিস?'

নেপাল বললে, 'হ্যাঁ ভাই, আজ যে বাংলা পরীক্ষা।'

সুধা বললে, 'বাংলা পরীক্ষায় এত ভয় কিসের? তার চেয়ে চল, কালীতলায় এক নতুন সাধু এসেছেন, তাঁকে দেখে আসি।'

সাধু দেখবার মত মনের অবস্থা নেপালের ছিল না, সে বললে, 'না ভাই, আজ বলাইবাবু এগজামিনার, আজ যদি একটা ভুল করি তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।'

সুধার নিজের সাধু দেখবার খুব ইচ্ছা ; অথচ একলা যেতেও কেমন বাধো-বাধো ঠেকে। তাই সে সাধুর বর্ণনা আরম্ভ করলে ; বললে—'কিন্তু আশ্চর্য সাধু ভাই! তাঁর নাম স্বামী চপেটানন্দ, ভক্তেরা তাঁকে 'চড়ুবাবাজী' বলে ডাকে। তিনি নাকি যাকে একটি চড় মারেন তার কার্যসিদ্ধি হবেই।'

নেপাল অবাক হয়ে বললে, 'যাঃ! তা কখনো হয় ?'

সুধা বললে, 'হ্যাঁ রে, তাঁর চড়ের নাকি অদ্ভুত গুণ। সমরেশদার ছোটভাই ক্যাবলার ইয়া বড় পিলে হয়েছিল ; চড়ুবাবাজী তাকে একটি চড় মারলেন—ব্যাস, পিলে অমনি ভাল হয়ে গেছে!'

'অ্যাঁ! বলিস কী ?'

'হ্যাঁ। ভয়ঙ্কর ভাল সাধু—যে যা মানস করে যায়, তার তা সিদ্ধ হবেই। স্বামীজীর চড়ের এমনি মহিমা!'

নেপালের মাথায় অমনি বুদ্ধি গজালো। সে ভাবতে-ভাবতে বললে, 'আচ্ছা—মনে কর তিনি যদি আমাকে একটা চড় মারেন তাহলে আমি পরীক্ষায় পাস করতে পারব ?'

সুধা ভারি উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই পারবি। বলাইবাবু তোকে কিছুতেই ফেল করাতে পারবেন না। তাই চল্ নেপাল, চড়ুবাবাজীর কাছে একটা চড় খেয়ে আসবি—ব্যাস্ কেল্লা ফতে! পড়তেও হবে না কিছুই, ড্যাং-ড্যাং করে পাস হয়ে যাবি। আমিও চড় খাব, যা থাকে বরাতে। হিস্ট্রিটা ভাল লিখতে পারিনি—তারিখগুলো আমার একদম মনে থাকে না। চল্, আর দেরি নয়।'

নেপাল আর লোভ সামলাতে পারলে না। দুই বন্ধু তখন বার হল।

গঙ্গার ধারে কালীতলা। সেখানে প্রকাণ্ড অশথ্ গাছের নিচে বাঘের চামড়ার উপর চপেটানন্দ স্বামী বসে আছেন। তখনও ভক্তেরা কেউ এসে জোটেনি।

সুধা আর নেপাল ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলে। বাবাজীর চেহারাটি চিম্‌ড়ে, মুখে অনেক দাড়ি-গোঁফ আছে চোখদুটি করমচার মত লাল। তাঁকে দেখে ভারি তিরিক্ষি মেজাজের লোক বলে মনে হয়। তিনি আবার কথা কন না। সব সময় মৌনী হয়ে থাকেন। সুধা আর নেপালকে তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন।

চড়ুবাবাজীর রুক্ষ চেহারা দেখে নেপালের খুব ভরসা হল ; সে ভাবল—নিশ্চয় ইনি খুব তেজী সন্ন্যাসী—এঁর চড় কখনও বিফল হবে না। হাত জোড় করে সে বললে—'চড়ুবাবা, আজ আমার বাংলার পরীক্ষা। প্রিপারেশন ভালই করেছি, তবু ভয় হচ্ছে বলাইবাবু আমাকে গোল্লা খাওয়াবেন। তাই আপনার কাছে এসেছি আপনি যদি দয়া করে আমাকে একটি চড় মারেন তো বড় ভাল হয়।—বেশি জোরে মারবেন না প্রভু, আস্তে মারলেই কাজ হবে—'

কিন্তু চড়ু মহারাজ তা শুনবেন কেন! তিনি নেপালের গালে একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় কষিয়ে দিলেন। নেপাল একে দুর্বল, তার উপর হঠাৎ এত বড় চড় আশাই করেনি ; সে একেবারে চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। চপেটানন্দ স্বামী চড় মেরেই আবার গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

গালে হাত বুলোতে-বুলোতে নেপাল উঠে বসল। তার মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু কাউকে কিছু বলবার নেই, সে নিজেই তো চড় খেতে চেয়েছে। সুধা তার হাত ধরে টানতে টানতে বললে—'চলে আয়, চলে আয় নেপাল, তোর কাজ হয়ে গেছে। এবার নিশ্চয় পাস করবি।'

সুধা নিজে আর চড় খেলে না। বাবাজীর চড়ের বহর দেখেই তার পিলে চমকে গিয়েছিল। সে মনে-মনে ভাবলে—কী হবে চড় খেয়ে? হিস্ট্রি পরীক্ষা তো হয়েই গেছে—এখন চড় খেলে হয়তো কোনও ফলই হবে না তার চেয়ে নেপাল চড় খেয়েছে এই ভাল হয়েছে।

* * * * * *

ভাল কিন্তু মোটেই হয়নি। নেপাল সেদিন বাংলা পরীক্ষা দিলে বটে, কিন্তু চড় খেয়ে তার মাথা ঘুলিয়ে গিয়েছিল বলেই হোক, অথবা যে-কারণেই হোক, বেচারা পাস করতে পারলে না। বলাইবাবু তাকে অনেক গোল্লা দিলেন। ফলে, সে একশোর মধ্যে মোটে বারো নম্বর পেলে।

এদিকে, কী করে জান না, স্বামী চপেটানন্দের কাছে চড় খাওয়ার খবরটা ক্রমে স্কুলে রাষ্ট্র হয়ে গেল। সবাই নেপালকে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে, 'কি রে, চড় খেলি তবু পাস করতে পারলি না।'

কেউ বললে, 'আর একটা চড় খেয়ে আয়, তাহলে তোর মাথায় বুদ্ধি গজাবে।'

গিরীন বললে, 'ন্যাপলা, আমি একটা হনুমান পুষেছি, তুই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, তাহলে তোর বুদ্ধি বাড়বে।'

এতদিন বুদ্ধির জন্য সবাই নেপালকে মনে-মনে ভয় করত; তাই এখন তাকে বোকা বলবার

সুযোগ পেয়ে সকলেই মনের আনন্দে তাকে খেপাতে শুরু করলে।

নেপালের মনের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়; সে ভারি মুষড়ে পড়ল। চড়ুবাবাজী যে একটা ভণ্ড সন্ন্যাসী তাতে আর সন্দেহ রইল না। যদি সত্যিকার সাধুই হবে, তবে সে ফেল করলে কেন?

কয়েকদিন কেটে গেল। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধার সঙ্গে খেলার মাঠে নেপালের দেখা হয়। নেপাল মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, সুধা অনেক খোশামোদ করে তার সঙ্গে ভাব করলে। নেপাল বললে, 'তুইই যত নষ্টের গোড়া।'

অনুতপ্ত সুধা বললে, 'আমি তো ভাই জানতুম না। তা—এখন আর রাগ করে লাভ কী বল? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার চেয়ে আয় ঐ ভণ্ড বাবাজীটাকে জব্দ করি।'

চড়ুবাবাজীকে জব্দ করবার মতলব নেপালের মাথায় ক'দিন থেকেই ঘুরছিল, কিন্তু সে কোনও উপায় ঠিক করতে পারছিল না। দুই বন্ধুতে এখন মাঠে বসে অনেক পরামর্শ করলে। কিন্তু একটিও মনের মতন ফন্দি মাথায় এল না। নেপাল তখন বুকে ঘাড় গুঁজে ভাবতে শুরু করলে।

আধ ঘণ্টা পরে সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, 'হয়েছে, এবার বাবাজীকে চড় মারার মজা টের পাইয়ে দেব, হুঁ হুঁ—মহাবীর!'

সুধা আশ্চর্য হয়ে বললে, 'মহাবীর কী?'

নেপাল বললে, 'গিরীনদার মহাবীর। এখন চল, কাল সকালে সব ঠিক হবে। গিরীনদাকেও দলে নিতে হবে।'

* * * *

পরদিন সকালবেলা স্বামী চপেটানন্দ তাঁর বাঘের চামড়ার উপর শুয়ে ছিলেন আর দু'জন ভক্ত তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল। এমন সময় গিরীন, সুধা আর নেপাল গুটি-গুটি সেখানে গিয়ে উপস্থিত। গিরীনের কোলে একটি সাত-আট বছরের ছেলে কিংবা মেয়ে—আগাগোড়া র‍্যাপারে ঢাকা। দেখে মনে হয়, বুঝি তার ভারি অসুখ করেছে, তাই তাকে চড়ুবাবাজীর চড় খাওয়ার জন্য আনা হয়েছে। এরকম রোগী বাবাজীর কাছে রোজই দু'-চার জন আসে।

তিনজন স্বামীজীকে দণ্ডবৎ করলে। একজন ভক্ত গিরীনের কোলের র‍্যাপার-ঢাকা মূর্তিটি দেখিয়ে বললে, 'ওর কী হয়েছে?'

নেপাল বিনীতস্বরে বললে, 'ওর বড় অসুখ; তাই বাবাজীর কাছে নিয়ে এসেছি। উনি যদি দয়া করে ওকে ভাল করে দেন।'

ভক্ত বললে, 'তা ভাল করে দেবেন। ওর কি রোগ হয়েছে?'

নেপাল বললে, 'তা তো জানি না; কিন্তু ও কথা বলতে পারে না। এখন বাবাজী যদি ওর মুখে কথা ফুটিয়ে দেন তো বড় ভাল হয়। আমরা পাঁচ টাকা মানত করেছি। বাবাজীর পায়ে প্রণামী দেব যদি একে ভাল করে দিতে পারেন।'

প্রণামীর কথা শুনে চপেটানন্দ উঠে বসলেন। ভক্ত বললেন, 'এই! এ আর বেশি কথা কী, প্রভু চড় মেরে-মেরে অনেক বড় বড় রোগ ভাল করেছেন। ওকে কাছে নিয়ে এস।'

নেপাল বললে, 'কিন্তু ও বড় রাগী—আর, কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না।'

ভক্ত বললে, 'তাতে ক্ষতি নেই। বাবার চড় খেলেই সব রোগ সেরে যাবে।'

'কথা কইতে পারবে তো?'

'খুব পারবে। দু'দিনের মধ্যেই মুখে খৈ ফুটবে।'

গিরীন তখন কোলের রোগীটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। আর চপেটানন্দ স্বামী মারলেন তার গাল লক্ষ্য করে এক প্রকাণ্ড চড়।

অমনি—হুলুস্থুল কাণ্ড!

চড় খেয়ে র‍্যাপারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—রোগী নয়, প্রকাণ্ড একটা গোদা হনুমান। সে হচ্ছে গিরীনের পোষা হনুমান, তার নাম মহাবীর। মহাবীর ভয়ানক রাগী, গিরীন ছাড়া আর কারুর শাসন মানে না। সে একেবারে চড়ুবাবাজীর ঘাড়ে উপর লাফিয়ে পড়ল। ভক্ত দু'জন 'বাবাগো' বলে টেনে দৌড় মারলে।

চড়ুবাবাজীর সঙ্গে মহাবীরের রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। মহাবীরের গায়ে ভীষণ জোর, সে বাবাজীর ঘাড়ে এক কামড় বসিয়ে দিলে। বাবাজীর আর মৌনব্রত রইল না, তিনি—'খেলে রে! গেলুম রে! বাবা রে!' বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

মহাবীর কিন্তু ছাড়ে না। সে একে হনুমান, তার উপর চড় খেয়ে বেজায় চটে গিয়েছিল। চিমড়ে চড়মহারাজ তাকে সামলাবেন কী করে! সে আঁচড়ে-কামড়ে দাড়ি-গোঁফ ছিঁড়ে—বাবাজীর অবস্থা শোচনীয় করে তুললে।

নেপাল গিরীন আর সুধা দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। আরও অনেক লোক জুটে গেল। নেপাল মাঝে-মাঝে বলতে লাগল, 'প্রভু, মহাবীরের মুখে কথা ফোটাতে পারলেন না!'

প্রভুর তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে। তিনি আর কী করেন, শেষে দৌড় দিয়ে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়লেন। মহাবীর তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

চপেটানন্দ স্বামী সেই যে সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে পালালেন, আর ফিরে এলেন না। তিনি যে সত্যিকার সাধু নন, একজন ভণ্ড তপস্বী, তা শহরের লোকেও ক্রমে বুঝতে পারলে। কারণ দেখা গেল, তিনি যাদের চড় মেরেছিলেন তারা কেউ সিদ্ধিলাভ করেনি।

ফেল হওয়ার দুঃখ নেপালের একেবারে যায়নি বটে, কিন্তু সে যে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে এই আনন্দেই বিভোর হয়ে আছে। স্কুলের ছেলেরা আর তাকে কেউ ঠাট্টা করে না।
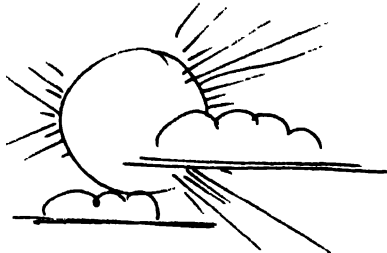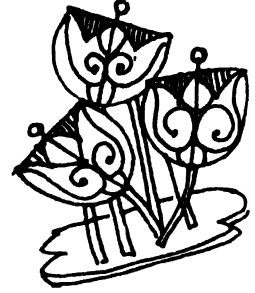
বিকেলবেলা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

তোমার টুটুকে চেন না? খুব ভালো স্কিপ করতে পারে। হলে কী হবে—ক'দিন থেকে ওর ভারি জ্বর! প্রলাপ বকছে:

পশমের জামা পরে পিসিমা ঘুমাচ্ছে,
মেঘের রুমাল নাকে আকাশটা হাঁচছে,
চড়ে ভাঙা ট্যাক্সি
উড়ে চলে খ্যাঁকশিয়ালটা;
পিসিমাও বাইকে
ছোটে নিয়ে ভাইকে
পালটা।
দূর থেকে দেখা যায় Monte Carlo,
ঘুম-ঘুম নিঝ্‌ঝুম—মনটি কাড়লো।

যমে-মানুষে টানাটানি—টুটুকে হায়রান করে ছাড়লে। পঁয়ত্রিশ দিনে ওর জ্বর নামল—জানলায় বসে-বসে এখন কবিতা বানায়। ডাক্তার এসে বলে গেল রোজ বিকেলে হাওয়া খেতে বেরুতে হবে,—গাঁয়ের হাওয়ায় গায়ে আভা ফুটবে।

টুটুরা থাকে পশ্চিমে,—ওর বাবা সেখানে মস্ত চাকুরে। ওর বাবা তাঁর ছ-সিলিণ্ডার মোটর-গাড়ি ছেড়ে দিলেন,—টুটুর কিন্তু একাই পছন্দ। আসন-পিঁড়ি হয়ে ও গাড়ি চড়বে—দড়ির গদিতে বসে।

বিকেলবেলা টুটু একদিন বেড়াতে বেরিয়েছে—তারই গল্প বলছি। গাড়িতে আর কেউ নেই—টুটু আর তার মা। একাওয়ালা এদের পরিচিত—পথ হারাবার ভয় নেই।

ফাকা গাঁয়ে গাড়ি গড়িয়ে পড়েছে—আঁকাবাঁকা রাস্তা, শাড়ির পাড়ের মত। দিনের আলোর পদ্ম তখন বুজে এসেছে,—আকাশ মলিন, ঘুমো চোখে চেয়ে আছে। পল্‌কা পাখার ঝাপট দিতে-দিতে সবুজ পাখির ঝাঁক উড়ে চলেছে—কোথায় তাদের নীড় কেউ জানেনা। একটা পথহারা গোরু করুণ সুরে রাখাল ছেলেকে ডাকছে—ঘরে ফিরে যেতে।

বাইরে বেরিয়ে টুটুর ফুর্তি আর ধরে না! একটা ছিপি-খোলা সোডার বোতলের মত ওর পেট থেকে হাসির ফেনা উঠছে। সেজেছেও চমৎকার! পাঁচ বছরের মেয়ে টুটু—মনে হয় যেন একটি শিশু-পরী—মেঘের ভেলায় ভেসে মাটির দেশে পা রেখেছে! এসেন্সের গন্ধে বিকেলের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

খানিক দূর এগিয়ে গাড়িটা যখন একটা শিমুল গাছের তলা দিয়ে বাঁক নেবে, অমনি একটি বছর-আটেকের ভিখিরি ছেলে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল। দুপুর থেকেই ছেলেটি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে, কিন্তু একটিও পয়সা হয়নি। হঠাৎ ওর দুই কাহিল, শীর্ণ হাত প্রসারিত করে কেঁদে উঠল,—আমাকে কিছু ভিক্ষে দাও মা, আজ দুদিন কিছু খেতে পাইনি।

অর্ধনগ্ন বিকলাঙ্গ কুৎসিত ছেলেটার হাড়-বেরুনো মুখের পানে চেয়ে টুটুর মা মুখ কুঞ্চিত করলেন।

টুটু কলরব করে উঠল,—ওকে কিছু দাও মা, দুদিন ও কিছু খেতে পায়নি!

মা শাসনের সুরে ধমক দিয়ে বললেন, না!

টুট বললে, না-খেয়ে থাকলে ভীষণ ক্ষিদে পায় মা! আমি এত দিন জ্বরে ভুগলাম, মনে হচ্ছিল বোধহয় একটা পাহাড় গিলে ফেলতে পারি! আমি তবু তো রোজ হরলিকস্ খেয়েছি, বেদানার রস—ও তো তাও খায়নি বলছে।

মা বললেন, ওর মোটেই ক্ষিদে পায়নি।

তবে ও মিথ্যে কথা বলছে?

তা ছাড়া আর কী? ছেলেটা ভণ্ডামি শুরু করেছে।

টুটু বললে, কিন্তু কেমন সুর করে বলছিল ও বোধহয় বেশ গাইতে পারবে। গাড়িটা ফিরিয়ে নিয়ে চল না মা, ওর গান শুনব।

মা ফের ধমক দিয়ে উঠলেন, দূর বোকা!

গাড়ি তখন শিমূল-তলার বাঁক ঘুরে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। টুটু জিজ্ঞেস করলে, ওর—ছেলেটির বাড়ি কোথায় মা? সন্ধে হয়ে গেল, ওর মা ভাববে না ওর জন্যে?

মা এই কথা শুনে একবার একটু চমকে উঠলেন। ওঁর হঠাৎ মনে হল, টুটু আর বাড়ি নেই, কোনদিন ফিরবেও না। মায়ের আর্তনাদ শুনেও আকাশ বধির, নিরুত্তর—এই যদি হয়, তাহলে? টুটুকে তিনি বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, ঐ দেখ টুটু। কেমন এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে।

টুটু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। হিন্দুস্থানী ছেলেমেয়েদের মত হাত তুলে ডাকতে লাগল—

বগুলা বগুলা, দুধ দে।

সাগরগোটি লে লে।

তারপর মাকে বললে, ওদের বাড়ি কোথায় মা?

মা বললেন, কত দূর! কত বন পাহাড় পেরিয়ে, কোন্ নদীর ধারে, কে জানে!

ওরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, না মা? সবাই বাড়ি ফিরছে এবার। কিন্তু ঐ ছেলেটি এখনো যায়নি কেন? ও কি রাত হয়ে গেলেও ভিক্ষে করবে? ওকে কিছু দিলেনা কেন মা?

মা টুটুর রোগা অথচ সুন্দর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। ভিখিরি ছেলের করুণ মুখের ছায়াটি যেন মেয়ের মুখের ওপর এসে পড়েছে। মা ভাবলেন, পথের মাঝে আর কোন ভিখিরির দেখা পেলই তাকে কিছু দিয়ে দেবেন। ঐ ছেলেটিকে দেননি বলে কী হয়েছে! সবাইকেই দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। সবাইকেই যদি দিতে হয়, তাহলে ফতুর হতে আর বাকি থাকে না। বিধাতাও এত বড় দাতা নন।

টুটু বললে, আচ্ছা মা, আমি যদি ভিখিরি হতাম, তাহলে আমিও ওরকম নোংরা কাপড় পরে পথে বসে কেঁদে কেঁদে ভিক্ষে চাইতাম? আমাকে তখন তুমি চিনতে পারতে? আমাকে তখন তোমার সব কিছু দিয়ে দিতে, না?

মার বুক শিউরে উঠল। কে জানে, আজ না হয় ওরা গাড়ি চড়ছে—একদিন যদি ওদেরই বুকের উপর দিয়ে গাড়ি চলে যায়! ভাগ্য যদি একদিন মুখ কালো করে তাড়না করে—লক্ষ্মী যদি

পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে আর ফিরে না আসে! কে বলতে পারে—টুটু যদি একদিন এই ভিখিরি ছেলেটির মতই গৃহছাড়া আশ্রয়হীন হয়ে এমনি করে দুর্বল মুঠি মেলে ধরে!

মন থেকে এই সব কুভাবনা দূর করে দিয়ে মা বললেন, ঐ দেখ—এক—দুই—তিন—কেমন সুন্দব তারা ফুটে উঠছে। কালো পাথরের থালায় যেন রূপোর টুকরো।

টুটু ফের তার হাতদুটি তুলে উঠল। চার, পাঁচ, ছয়, সাত, ঐ যে—ঐ যে! গোনা যায় না! ওরা কারা মা!

খোকাখুকুর চোখ।

মাটির খোকাখুকুর?

হ্যাঁ।

টুটু খুশিতে চোখ বড় করে বললে, তাহলে আমার চোখও আছে ওখানে?

মা বললেন, হ্যাঁ, ঐ যে। বলে সন্ধ্যাতারাটি দেখিয়ে দিলেন।

টুটু বললে, ঐ ভিখিরি ছেলেটির চোখ আছে মা আকাশে? না, ও ভিখিরি বলে ওর চোখ ওখানে নেই?

মা ঢোক গিলে বললেন, আছে।

টুটু আগ্রহে অধীর হয়ে বললে, কই?

মা আঙুল দিয়ে খুশিতে আরেকটি তারা দেখিয়ে দিলেন।

টুটু নরম ঘাড়টির সঙ্গে কোঁকড়ানো চুলগুলি একটু এগিয়ে কাৎ করে বললে, হ্যাঁ, তাই ও-তারাটি বুঝি কাঁদছে, না মা? ভারি ছলছল করছিল ওর চোখ, দেখেছ?

গাড়ি তখন চলেছে বুড়ো শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে।

টুটু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওগুলি কী মা?

মা বললেন, কুঁড়ে ঘর।

কারা থাকে মা ওখানে?

যাদেব পয়সা নেই, গরিব।

টুটু মুখ ভার করে বললে, ভিখিরি-ছেলেরাও এমনি ভাঙা ঘরে থাকে? ওদের মা আছে ওখানে? খেতে না পেলে ওদের ঘুম আসে? ঝড়ে ওদের পাতার চাল উড়ে যায় না?

যায় বৈকি।

টুটু অবাক হয়ে বললে, চাল উড়ে যায়? তাহলে ওরা কী করে? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভেজে? ভিক্ষে করতে বেরুলেই ভিক্ষে দিতে কেউ বেরোয় না। কোথায় থাকে মা, তখন ওরা?

গাছতলায়,—পথের পাশে।

তখন ওরা সোজা আমাদের বাড়িতে চলে আসে না কেন? আমাদের বাড়িতে চাকরদের ব্যারেকটা তো একদম খালি পড়ে আছে।

মা এবার দস্তুরমত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর, টুটু। বকবক কোরো না। দুষ্টু মেয়ে!

টুটু তক্ষুনি অভিমানে মুখখানি ফুলিয়ে রইল। এ মুখখানি যেন অনেকটা সেই ছেলেটির মত। তেমনি একটি ম্লান অভিমান চোখের তারায় কাঁপছে।

মার মনে হল, তিনি তো এতদিন এমনি কত আকুতি-মিনতি করে বিধাতার কাছে টুটুর জীবনভিক্ষা চেয়েছেন। বিধাতা যদি এমন ঘাড় বেঁকিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতেন! যদি হাতের মুষ্টি শিথিল না করতেন।

মা তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন, গাড়ি ফেরাও সেই শিমুল তলায় যেখানে ভিখিরি ছেলেটি বসে ছিল। শিগগির।

গাড়ি ফিরে চলল।

অন্ধকার তখন বেশ জমাট বেঁধে আসছে।

টুটু ভারি খুশি হয়ে মার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে বললে, আমাকে দাও না মা টাকাটা। আমি টাকাটা ভিখিরি-ছেলের হাতে গুঁজে দেব, ভারি খুশি হয়ে আমাকে দেখবে। আমার এই লাল ফ্রকটার দিকে—এই চুলের রিবনের দিকে চেয়ে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবে, না?

টুটুর সঙ্গে-সঙ্গে মাও গাড়ি থেকে গাছের তলায় নেমে এলেন। দূরে মাঠের শেষে শেয়ালরা হল্লা শুরু করেছে। পাশে একটা বেতের ঝোপ থেকে ঝিল্লীরা শব্দ করছে অবিশ্রান্ত। কতগুলি বুনো ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে।

মা ও টুটু দুজনে অন্ধকারে একটুখানি এপাশ-ওপাশ খুঁজল, গাছের তলায় কাউকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

টাকা হাতে করে ম্লান মুখে টুটু আস্তে আস্তে গাড়িটায় গিয়ে উঠে বসল। তার চোখদুটি নাম-না-জানা দূর তারার মত ছলছল করছে।
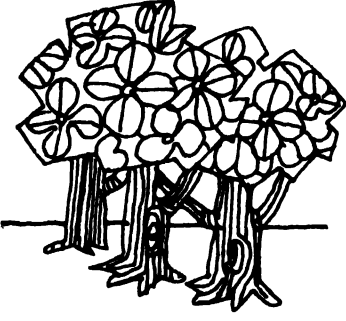
আক্কেল গুড়ুম

আবুল ফজল

এক যে ছিল বুড়োবুড়ি। ভুল বল্লাম ছিল নয়, আজো আছে। এখানে ওখানে অনেকখানে এমন বুড়োবুড়ি অনেক আছে আজো বেঁচে। এমন কি মরেও তারা বেঁচে থাকে। আমাদের গল্পের এ বুড়োবুড়ি থাকে এক গাঁয়ে—যে গাঁ শহর থেকে অনেক দূরে।

বুড়ো ভিখ্ মেগে আনে, বুড়ি তা রাঁধে, বাড়ে, দু'জনে বসে খায় এক সাথে। বুড়োবুড়ির দিন সুখেই কাটে। ওরা নাক গলায় না গাঁয়ের সাতে কি পাঁচে। এক ঝুপড়ি বেঁধে থাকে এ গাঁয়ের এক ধারে। পাড়ার গোরস্তানের উত্তর পাশে।

বুড়ো চলে লাঠি ঠক্ ঠক্ করে, ধনুকের মতো বাঁকা দেহটা তখন দু'ভাজ হয়ে আরো নুয়ে পড়ে। পথ চলে এক মনে, এক ধ্যানে—কি ভাবে বুড়োই জানে। চায়না এদিক ওদিক কোনো দিক্ পানে।

বুড়ো যখন ভিখ্ মেগে ফেরে গাঁ থেকে গাঁয়ে, বুড়ি তখন ঝুপড়ির দুয়ারে বসে নিজের মাথার উকুন নিজেই বাছে। বুড়ির মাথাটা যেন কুরবাল পাখীর বাসা, তাতে ইচ্ছা করলে লুকোচুরি খেলতে পারে ইঁদুর ছানা। হয়তো রাতে খেলেও বা। বুড়োর মাথা দেখায় যেন পেঁজা-তুলোর এক আস্ত বোঝা আর মুখের গোঁফ-দাড়ি সে তো যেন পুরোনো বটের ঝুলে-পড়া সাদা ঝুরি।

গাঁয়ের মানুষ কেউ জানে না কোথায় বা কখন এদের জন্ম। কোথায় বা এদের ঘর-বাড়ী, নাম-হারিয়ে যারা হয়েছে আজ স্রেফ বুড়োবুড়ি। যে দশ গাঁয়ে ওরা ভিখ্ মেগে খায়, সেখানে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সবার কাছে এ তাদের একমাত্র পরিচয়।

বুড়ো-বুড়ি
যাও শ্বশুর বাড়ী
শ্বশুর বাড়ী মধুর হাঁড়ি
যদি বেঁচে থাকে শাশুড়ী।

গরু চরাতে এসে রাখাল ছেলেরা এ ছড়া কাটে—ঝুপড়ির চার পাশে হাততালি দিয়ে নেচে নেচে তারা এ ছড়া গায়। বুড়োবুড়ি সেদিক পানে ফিরেও তাকায় না—শুনেও না শোনে ছেলের দল কি গায় বা কি গায় না। ওরা থাকে নির্বিকার, ধারে না কারো কথার কিছুমাত্র ধার। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তারা এ গাঁয়ে কেউ রাখে না তার খবরাখবর। কেউ-ই জানে না কখন হয়েছে সে আদ্যিকালে আশি কি এক শ' বছর আগে ওরা দু'জনার শাদী, নাকি আদৌ হয় নি? সে সব কথা আজ গাঁয়ের লোকের কাছে আদ্যিকালের এক বদ্যিকাহিনী। হয়তো বুড়োবুড়ির কাছেও তাই। তবুও বুড়ো যখন চায় বুড়ির দিকে আর বুড়ি যখন চায় বুড়োর পানে তখন হঠাৎ উভয়ের মনের পটে উঁকি মেরে যায় বুঝি হারিয়ে যাওয়া দিনের বহু ছেঁড়া ছবি। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওদের নিষ্প্রভ বুড়ো চোখেও হাসির দ্যুতি। হয়তো বা মনে পড়ে যায় অতীত কালের কিছু ছেঁড়া-খোঁড়া কথা।

শত বিপদ আপদের মধ্যেও অবস্থার শত হের ফেরেও একজন কিন্তু অন্যজনকে কখনো ছাড়ে নি। যখন যা জুটেছে একসাথে খেয়েছে, যখন জোটে নি উপোস দিয়েছে দু'জনে এক সঙ্গে। অভাবের দিনে এক মুঠোকে খেয়েছে দু'মুঠো করে। এ অবস্থায়ও একজনকে দেখে অন্যজনের ঠোঁটে সব সময় হাসি ফুটেছে। এভাবে ওদের তিন কাল কেটে এবার শেষকালে এসে ঠেকেছে। ভাগ্যও যেন এবার ওদের প্রতি ফিরে তাকালো—ফিরে তাকালো শুধু নয় যেন অট্টহাসিতে ওদের উপর ফেটে পড়লো। শেষ বয়সে ওদের সুখের দিন এলো ফিরে।

এ গাঁয়ে এবং আশে পাশের দশ গাঁয়ে সবাই জানে এরা স্রেফ একজোড়া বুড়োবুড়ি—ওদের সম্বন্ধে জানা নেই এর চেয়ে বেশী কিছু। এমন কি জানা নেই ওদের নাম-নিশানা অথবা ওদের সাবেক ঠিকানা। গাঁয়ের লোক বেমালুম ভুলে গেছে ওদের পুরানো দিনের কথা। এখন জানেই না কখন এসে এরা সুরু করেছে এখানে বাস করতে, তাদের পাড়ার এ সীমান্তে। হাল আমলের গাঁয়ের মানুষেরা তো জন্ম থেকেই দেখে আসছে, বুড়োবুড়ি এ ঝুপড়িতে এভাবেই দিন কাটাচ্ছে। তাদের বাপ-দাদাও নাকি এদের এ হালেই দেখেছে। এরা যেন চিরকেলে বুড়োবুড়ি, গাঁয়ের লোক ভাবতেই পারে না ওরাও ছিল একদিন অল্প বয়সের অধিকারী। মুখে মুখে এদের নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক কিম্বদন্তী অনেক কেচ্ছাকাহিনী।

গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস এমন বুড়োবুড়ি আর কোথাও নেই—শহর বন্দর গাঁও গ্রামে কোথাও নেই এদের জুড়ি। বিশ্ব-দুনিয়ায় এরাই অদ্বিতীয় বুড়োবুড়ি। এরা এ গাঁয়ের গর্ব—এ গাঁয়ের অহঙ্কার, গ্রামের এক অজানা সম্পদ—ওদের বিশ্বাস এদের বরকতেই কেটে যায় পাড়ার সব আপদ-বিপদ।

মাঝে মাঝে ভিন্ গাঁয়ের লোকদের ওরা বুক ফুলিয়ে চ্যালেঞ্জও জানায়ঃ আছে তোমাদের গাঁয়ে এমন বুড়োবুড়ি? থাকে যদি হাজির করো দেখি?

নেই, অন্য কোথাও নেই। ভিন্ গাঁয়ের লোকেরা একদম লা-জওয়াব। শরমে ওদের মাথা হয়ে যায় হেঁট। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে লোকদের ডেকে ওরা করে সলা—করে নানা মন্ত্রণা। কিন্তু বুড়োবুড়িকে হাত করার খুঁজে পায় না কূল-কিনারা। রাতে এসে মোটা ঘুষ দিয়ে, নানাভাবে ফুসলিয়ে এমন কি ভয় দেখিয়েও চেয়েছে বুড়োবুড়িকে হাত করতে—বলেছে পালিয়ে গিয়ে ওদের গাঁয়ে চলে যেতে—পারে নি ওদের কিছুতেই রাজি করাতে। লোভ দেখিয়েছে—পাকা বাড়ি করে দেবে, খাওয়া-পরার করে দেবে দরাজ ব্যবস্থা! বুড়োকে তখন ভিখ্ মাগতে হবে না—বুড়িকে হবে না পোয়াতে রান্নাবাড়ার কোন ঝামেলা। দু'জনের কারো করতে হবে না একটা কুটো ছিঁড়ে দু'টুকরো।

বুড়োবুড়ি তবুও নাছোড়বান্দা—এ ভাঙা ঝুপড়ি ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজি না। একগুঁয়ে বুড়োবুড়িব সে এক জওয়াব ঃ তা হয় না, আল্লাহ্ যেখানে রেখেছেন, সেখান থেকে যাওয়া যায় না।

অনেক গাঁয়ের লোক, এভাবে তদ্‌বিরের পর তদ্‌বির করে বার বার ব্যর্থ হয়ে গেছে ফিরে। কোন কোন গাঁয়ের লোক গভীর রাতে চুপি চুপি এসে বুড়োবুড়িকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার ফন্দিও যে মনে মনে আঁটে নি তা নয়, কিন্তু থানা-পুলিশের কথা ভেবে অত বড় দুঃসাহসিক কাজের পথে সাহস পায় নি পা বাড়াতে ওরা। জানে, এ গাঁয়ের লোকেরাও তো সহজে ছাড়বে না—লোকের চোখে ধুলো দিয়ে বুড়োবুড়িকে কাঁহাতক পারা যাবে লুকিয়ে রাখা? তখন বড়োবুড়ির দখল নিয়ে দু'গাঁয়ে বেধেও যেতে পারে ভীষণ এক দাঙ্গাহাঙ্গামা। তখন পুলিশ তো পুলিশ মিলিটারি এসেও হবে হাজির। গাঁয়ের ঘরে ঘরে দেবে ওরা হানা—কাকেও রেয়াৎ দেবে না। হয়তো বসাবে পাইকারী জরিমানা। বুড়োবুড়ি এমন বস্তুও নয় যে খড়ের গাদায় রাখা যাবে লুকিয়ে কিম্বা রাখা যাবে মাটির নিচে পুঁতে। পুঁতে রেখে একদম যে গুম করে দেওয়া যায় না তা

নয় তবে তা করলে আসল উদ্দেশ্যই তো যাবে ব্যর্থ হয়ে। দখল করে দখল দেখাতে না পারলে অন্য গাঁয়ের সামনে ফখর করা যাবেও বা কি করে?

এখানে ওখানে নানা কানাঘুষা শুনে এ পাড়ার লোকেরাও হয়ে গেছে হুঁশিয়ার—তাদের সাধের ধন চুরি যেতে পারে এ ভয়ে এবার তারাও মোতায়েন করেছে বুড়োবুড়ির ঝুপড়ীর চার ধারে কড়া পাহারা। সাবধানের মার নেই, তাই থানায়ও দিয়ে রেখেছে ডায়রি। ফলে বুড়োবুড়ি আজো যায় নি চুরি। গাঁয়ের ধন আজো গাঁয়ে আছে, অত্যন্ত বহাল তবিয়তে।

গাঁয়ের লেখাপড়ুয়ারা কেতাবে পড়েছে দুনিয়ায় স্রেফ সাতটা আশ্চর্য বস্তুই আছে। তাদের বিশ্বাস, কেতাব লিখিয়েরা খবর রাখে না বলেই এমন ভুল কথা লিখে দুনিয়ার মানুষকে এতকাল বোকা বানিয়ে ছেড়েছে—স্রেফ সাতটা আশ্চর্য বস্তুর কথা বলে আর লেখে।

এখন নতুন লেখকদের নতুন করে লিখতে হবেঃ দুনিয়ায় সাতটা নয়, আছে আট-টা পরমাশ্চর্য বস্তু যা দেখে শুধু অবাক নয়, হতে হয় আক্কেল গুড়ুম। আর আট নম্বরেরটা আছে ওদের গাঁয়ে, যে গাঁয়ের নাম এখনো লেখা হয় নি ইতিহাসে। তবে তাদের বিশ্বাস একদিন লেখা হবেই—লেখা হবে এ বুড়োবুড়ির দৌলতেই। হয়তো একদিন এদের কাহিনী লিখে কেউ কেউ পেয়েও যাবে ডক্টরেট্, এ সম্বন্ধে তারা রাখে পুরোপুরি বিশ্বাস।

বিদেশ থেকে কোন হোমরা চোমরা বেড়াতে এলে আমাদের দেশে আমরা দেখাই কাপ্তাই হ্রদ, কক্সবাজারের সমুদ্রতীর, ঢাকার যাদুঘর বা লালবাগের কেল্লার ভগ্নাবশেষ। এ গাঁয়ে কেউ বেড়াতে এলে, সে জামাই কি বেয়াই, ছেলের মামা কি নিজের মামা-শ্বশুর, যাই হোক তাকে এরা দেখায় এ বুড়োবুড়িকে, এ গাঁয়ের একমাত্র দর্শনীয় হিসেবে। না দেখিয়ে ছাড়ে না কাকেও, কেউ না দেখতে চাইলে জোর করে টেনে এনে দেখিয়েই ছাড়ে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেঃ বুড়োবুড়ির বয়স কত?

চট্ করে কেউ হয়তো বলে বসেঃ এক শ'।

আর একজন তাকে শুধরে দিয়ে বলে ওঠেঃ তুই কচু জানিস। দেড় শ'র কম নয় এক মাসও।

তৃতীয়জন চেঁচিয়ে বলেঃ আরে তুই দেখছি আস্ত একটা মানকচু। বুড়োবুড়ির বয়স খাঁটি দুই শ'।

ঃ আমার দাদুর দাদু মইরবার সময় কইয়া গেছে না! আর মইরবার সময় কেউ ঝুটা কথা কয় না কি?

চতুর্থজন বলে ওঠেঃ আমার দাদী খইছন বুড়া-বুড়ি দুইজনার হমান বয়স, কারো একদিন বেশি কিম্বা নয় কম।

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে ওঠেঃ তোর দাদী আমার ইয়া জানে...। বলেই দুই বুড়ো আঙুল দেখিয়েই ছাড়ে।

ঃ কি খ'ছ? আমার দাদীরে অপমান? এক্ষুনি মাথা ফাটাইয়া দিমু তোর। ঘুষি বাগিয়ে মারমুখো হয়ে ওঠে আগের জন।

অন্যজনও ওঠে রুখেঃ গায়ে হাত দেয় দেখি। এক্ষনি বাইগুন ভর্তা বানাইয়া ছাড়মু তোরে।

বুড়োবুড়ির বয়স নিয়ে হর-হামেশাই চলে এমন কাণ্ড। মাঝে মাঝে লেগে যায় হাতাহাতি—ঘটে যায় রক্তারক্তি।

আহাম্মকদের কাণ্ড কারখানা দেখে বুড়োবুড়ি মুখ টিপে টিপে হাসে। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করে বুড়োকে। ওরা অনেক সময় সালিস মেনে বসে। বুড়ো তখন ফোকলা মুখে বাঁকা হাসি

ছড়িয়ে বলেঃ তোমাগো হক্কল্লের কথাই ঠিক।

বুড়ির দিকে চেয়ে নিজের কথারই যেন সায় খোঁজেঃ না রে বুড়ি?

বুড়ি পাকা চুলের কুরালপাখী-বাসা নেড়ে জানায়ঃ হাঁচা। হাঁচা।

জোর পেয়ে বুড়োও যেন ধুয়া ধরেঃ বুড়াবুড়ি কয় না মিছা।

ঃ সে কি করে হয়? সমস্বরে বলে ওঠে সবাইঃ এক শ',দেড় শ', দু' শ' সব এক সঙ্গে কি করে হয় ঠিক?

ঃ হয়, হয়। জানলে হয় না, না জানলে না হয়ে যায় না। কার্পাসের জটা নেড়ে নেড়ে বুড়োই বিড় বিড় করে।

সঙ্গে সঙ্গে বুড়িও সায় দেয়ঃ আলবৎ, জানলে হয় না, না জানলে এক' শ' থেকে দু' শ' সবই হয়। হতে বাধাই বা কোথায়?

ঃ সে কি কথা বুড়া-বুড়ি! অবাক কণ্ঠে সবাই শুধায়।

ঃ হাঁ, হাঁ, তাই। যা বলেছি তা বিলকুল হক কথাই। পাকা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বুড়ো বলতেই থাকেঃ জানার মধ্যেই যত গোলমাল, যত সব লড়াই—মতামতের হাতাহাতি, পরস্পরে লাঠা-লাঠি কিম্বা মাথা ফাটা-ফাটি। না জানায় সব মিল, সবাই এক—সব শূন্য।

শূন্য নিয়ে কেউ করে না হানাহানি বরং পরস্পরে করে কোলাকুলি, তখন এক শ' দু' শ' হতে কিম্বা দু' শ' এক শ' হতে কোন বাধাই থাকে না।

আসল কথা, হে ভালো মানুষের পোলারা জানলে হয় না, না জানলে সবই হয়।

ঃ বুড়ো, তোমাদের না কি এক শ' তিনটা ছেলে-মেয়ে এক শ' তিনটা দেশে বাস করে?

ঃ তোমাদের নাকি তিন শ' চৌষট্টিটা নাতি-নাত্নি আছে?

গাঁয়ের লোক একের পর এক মাঝে মাঝে এমন সব প্রশ্নও ছুঁড়ে মারে।

ঃ হাঁ, হাঁ, না জানলে সব ঠিক্ হ্যায়, জানলে বিশ্বাস করাই দায়। আসল কথাঃ বিশ্বাসে মিলে স্বর্গ কথাটাই সব কথার সেরা কথা। জানলে মনের বিশ্বাসটাই যায় উড়ে, স্বর্গ যায় হারিয়ে। অতএব না জানায় সুখ, না জানাতেই আরাম। জানায় সারারাত অনিদ্রা, না জানায় দিনেও মৌতের ঘুম। অজ্ঞতায় সুখের নেই শেষ—আক্কলমনদের এইতো উপদেশ।

এরপর থেকে বুড়োবুড়ির কথা আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে গাঁ থেকে গাঁয়ে—দশ গ্রামের লোক এসে এ গাঁয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ওদের কথার মানে বুঝতে, খুঁজতে আর ব্যাখ্যা করতে লেগে যায় পাড়ার জ্ঞানী-গুণীরা। যতই বুঝতে পারে না, খুঁজে পায় না মানে ততই ওরা অবাক হয়।

ভেবে ভেবে হয়ে পড়ে হয়রান-পেরেশান—তখন মনে হয় বুড়োবুড়ির কথা অমৃত সমান। বুড়োবুড়ির কথা যতই ভাবে বিদ্যাবুদ্ধিও ওদের যায় থ মেরে, আক্কেল যায় একদম গুড়ুম হয়ে।

—'জানলে হয় না, না জানলে না হয়ে যায় না', এ গভীর কথার গভীর অর্থের কূল-কিনারা না পেয়ে গাঁয়ের লোক এবার ভালো করে বুঝতে পারেঃ এরা সাধারণ বুড়োবুড়ি নয়, নয় যা তা মানুষ। এ ওদের ঝুটা ছদ্মবেশ, আসলে ওরা দু'জনই কামেল ফকির, মানুষের কাছে ধরা না দেওয়ার জন্যই ধরেছে এ ভেক। কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে দেরি লাগে না—মানুষের মনে মনে ভক্তি যায় আরো বেড়ে, ভক্তির কূল-ভাঙ্গা জোয়ার বয়ে চলে গাঁ থেকে গাঁয়ে, দূর থেকে দূরান্তে।

দেখতে দেখতে বুড়োবুড়ির ঝুপড়ি আর ঝুপড়িই রইল না, হয়ে গেলো ফকির-ফকিরনীর আস্তানা। এখান থেকে ওখান থেকে এসে জুটলো অনেক মস্তান মস্তানাও।

ভুলে কেউ এখন হঠাৎ আগের মতো বুড়োবুড়ি বলে ফেল্লে, এর মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় খাদেম হয়ে পড়ছে তারা ছুটে আসে মারতে : বেয়াদব কাহাঁকা, ফকির-ফকিরনী বলতে পারিস না ?

এখন থেকে বুড়োকে আর বের হতে হয় না ভিখ্ মাগতে ; বুড়িকে হয় না রাঁধতে, বাটনা বাটতে, বা কুটনা কুটতে। সরু চালের রাঁধা ভাত আসে ডেক্‌চি ভরে, সে সঙ্গে মুর্গি আর কবুতরের এন্তার গোস্তও। খেয়ে শেষ করা যায় না, দিতে হয় বিলিয়ে, কাক পক্ষীকে ছড়িয়ে। লেগে যায় কুকুরবিড়ালের জেয়াফৎ, এ ভাবে গাঁয়ের লোক হাসিল করে দেদার ফজিলৎ। ঝুপড়ির নাম নিশানা এখন খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল—উঠেছে ওখানে এখন অনেক দালান কোঠা আর ইমারৎ।

আসতে থাকে খাঁচা খাঁচা হাঁস মুর্গি—আসে মানৎ করা খাসি। আর অগৌণে দেখা দেয় গরু গয়ালের সারি। এমন কি আসে দু' একটা করে দুম্বা আর উটও—ওদের গলায় দোলে মালা আর পেছনে পেছনে বাজতে থাকে ঢোল বাজনা। মানুষ আসে কাতারে কাতারে, চারদিকে জমায়েৎ হয় হাজারে হাজার। সে এক এলাহি কাণ্ড—এতদিনের অজ পাড়াগাঁ হয়ে উঠে যেন মুহূর্তে শহর-বন্দর—দেখে শুনে অনেকের আক্কেল গুড়ুম।

কেউ চায় পানি পড়া, কেউ চায় দোওয়া তাবিজ। বুড়োবুড়ি কিন্তু রা করে না। খাওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময় খোলেই না মুখ। সব সময় থাকে একদম খামোস্। ফলে লোকের মনে ভক্তি যায় আরও বেড়ে—তারা বুড়োবুড়ির না-বলা কথার কেরামৎ আর বুজরুগি পায় খুঁজে—বুড়োবুড়িকে যতই দেখে ততই হয়ে যায় ওদের আক্কেল গুড়ুম।

দেখে দেখে হয়রান হয়ে উঠলে ভক্তরা থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে : 'জানলে হয় না, না জানলে না হয়ে যায় না।'

উপস্থিত সবাই সে সঙ্গে ধুয়া ধরে—ভক্তিতে একদম গদ গদ হয়ে পড়ে। কখনো সবাই মিলে গুন্‌গুন্ করে জপতে থাকে : 'জানলে হয় না, না জানলে না হয়ে যায় না।'

ভিন্ গাঁ থেকে আগত নতুন লোক হয়তো জিজ্ঞাসা করে বসে : কি অর্থ এর ?

: বলতে পারলে আমরাই তো হয়ে যেতাম কামেল ফকির—বলে উঠল অনেক ভক্ত এক সঙ্গে। প্রধান খাদেম বলে : এ এক আজব ইছিম—এর নাম আক্কেল গুড়ুম। এ ইছিমের বরকতে আমাদের সবার আক্কেলও হয়ে গেছে গুড়ুম। আসলে আক্কেলটাই মানুষের যত নষ্টের মূল, সে নষ্টেরই করতে হবে মূলোৎপাটন। পাপ তাপ গোনাহ্-বেদাৎ সবকিছুর গোড়া তো মানুষের আক্কেল। এ আক্কেলের জন্যই মানুষকে বার বার দিতে হয় আক্কেল সেলামী। অতএব সে আক্কেলকেই করতে হবে দুনিয়া ছাড়া। এখন ভাই আক্কেল-মারা কল চাই, আক্কেল-মারা কল।

: আমাদের ফকির তাই, আমাদের ফকির তাই। বলে উঠল সবাই এক সাথে।

: হাঁ হাঁ। তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে ওঠে অনেকে—চুরি ডাকাতি, খুন রাহাজানি, সবই তো আক্কেলের কাজ।

: আহম্মকেরা কি পারে এসব কাজ করতে বা সামাল দিতে ? করতে গেলে বোকারা নির্ঘাত পড়বেই ধরা।

: ঘুষ যে নেয় আর ঘুষ দিয়ে কাজ যে হাসিল করে, তার চেয়ে আকলমন্দ আর কোথায় আছে ? বলে ওঠে অন্য একজন, হাবা গোবা বে-আক্কেল দিয়ে হয় নি এমন কাজ কোন কালেই হবেও না কোনদিন।

তাই আক্কেলকে গুড়িয়ে নস্যাৎ করে দিতে না পারলে মানুষের নেই নজাৎ। আক্কেল গুড়ুম তা করারই মন্ত্র। এ মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে এ ফকির-ফকিরনী আমাদের নজাতের রাস্তাই বাৎলেছেন। আস্তানার বড় খাদেম সাহেবেই কথাগুলো বলেন।

ঃ আক্কেল গুড়ুমের চেয়ে বড় মন্ত্র আর হতে পারে না। পাড়ার নিম-মোল্লা অন্যতম খাদেম আলীজানেরই গলা। সঙ্গে সঙ্গে ও হাঁক দিয়ে বলে ওঠে ঃ ভাই সব এবার জপ করো—আক্কেল গুড়ুম, আক্কেল গুড়ুম। আক্কেল গুড়ুম, আক্কেল গুড়ুম আওয়াজে চারদিক গুম গুম করতে থাকে। থেকে থেকে তরুণরা চেঁচিয়ে ওঠে ঃ আক্কেল গুড়ুম জিন্দাবাদ। উপস্থিত সবাই সে সুরে মিলায় সুর। এভাবে আক্কেল গুড়ুম মন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে পাড়া থেকে পাড়ায়, গ্রাম থেকে গ্রামে, এমন কি থানা মহকুমা জেলার সীমা ছাড়িয়ে দূর দূর এলাকায়ও। কেউ আর এখন বুড়ো-বুড়িকে বুড়ি-বুড়া কিম্বা ফকির-ফকিরনী বলে না। মন্ত্র আর মন্ত্রদাতা এখন এক। আক্কেল গুড়ুম বল্লে এখন সারা দেশ বুঝে নেয় কাকে বোঝাচ্ছে বা কার কথা বলা হচ্ছে। এমন কি এখন এ গাঁয়ের নামও হয়ে পড়েছে তাই। গাঁয়ের পুরোনো নাম কবেই বুঁজে গেছে—আস্তে আস্তে সবাই ভুলে যেতেও বসেছে। পথ চলতি লোককে এখন কেউ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পায় ঃ আক্কেল গুড়ুম যাচ্ছি কিম্বা আক্কেল গুড়ুম থেকে ফিরছি। তার বেশি আর বলতে হয় না কিছুই।

এখন আক্কেল গুড়ুম বল্লে শুধু ফকির ফকিরনীকে নয় গাঁওটাকেও বুঝিয়ে থাকে। এখন গাঁয়ের লোক আর ভক্তরা জোর তদ্‌বির চালাচ্ছে যেন এ নামটা ডাক বিভাগের খাতায়ও ওঠে।

তোমরা হয়তো জানতে চাইছ কোথায় এ গ্রাম, আক্কেল গুড়ুম যার নাম ? যেখানে থাকে ঐ নামের ফকির-ফকিরনী—যাদের নামে অহোরাত্র পড়ে শির্ণী। আছে আছে, যা নেই তা কি কোন লেখকের মাথায় আসে ? ভাবছো বার্ষিক পরীক্ষাটা দিয়ে একবার না হয় আক্কেল গুড়ুম ঘুরেই আসবে। বলা তো যায় না, পরীক্ষকদের মোটেও যায় না বিশ্বাস করা। তার চেয়ে অনেক ভালো আক্কেল গুড়ুম যাওয়া—ওখানকার দোওয়া নিয়ে এসে তারপর তক্‌দিরে চাই দেওয়া।

সত্য সত্যই অনেক ছেলে পরীক্ষা দিয়ে আক্কেল গুড়ুম জেয়ারৎ করে আসে। হয়তো ওরা ফয়দাও পেয়ে থাকে। তবে যারা নকল করে পাশ আর করতে চায় ভালো ফল, তাদের আক্কেল গুড়ুম গিয়ে কাজ নেই। কারণ আক্কেল গুড়ুম গিয়ে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলে তারা নির্ঘাত হাতে নাতে ধরা পড়বেই তখন সমস্ত প্লানটাই হয়ে যাবে একদম ভণ্ডুল।

তবুও আক্কেল গুড়ুম গাঁয়ের ঠিকানাটা তোমাদের জানাচ্ছি, যার খুশী মন দিয়ে শোনো, যার ইচ্ছা খাতায় টুকে রাখো। তোমাদের কারো না কারো একদিন্ সেখানে যেতে ইচ্ছা হতে পারেও তো।

আক্কেল গুড়ুম গাঁয়ে অর্থাৎ আক্কেল গুড়ুম ফকিরের আস্তানায় পৌঁছতে হলে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম যেদিকে তোমার খুশী চলে যাও সোজা নাক বরাবর সামনের দিকে, ন'মাইল গিয়ে থেমে কিছুক্ষণ আক্কেল গুড়ুম ইছিম পড়ে নাও তারপর পেছন ফিরে অর্থাৎ এবাউটটার্ণ করে আবার হাঁটতে থাকো নাক বরাবর, হাঁটতে হাঁটতে পার হয়ে এসো ন'দ্বিগুণে আঠারো মাইল। এবার দাঁড়িয়ে কম সে কম তিনবার আক্কেল গুড়ুম মন্ত্র পড়ো। তারপর ফেরো ডান দিকে, হাঁটতে থাকো আবার সোজা নাক বরাবর, এভাবে আঠারো দ্বিগুণে ছত্রিশ মাইল হেঁটে, কিছুক্ষণ থেমে বার কয়েক আক্কেল গুড়ুম মন্ত্র পড়ে ফেরো এবার বাঁ দিকে। সোজা নাক বরাবর চলতে থাকো, এভাবে তিন নং বেয়াল্লিশ মাইল হেঁটে ফের থামো। চোখ ছানাবড়া করে ভাবছো আমি নামতা গেছি ভুলে, তিন নং বেয়াল্লিশ কিছুতেই হতে পারে না। আসলে খাস দিলে আক্কেল গুড়ুম ইছিম

পড়লে আক্কেল গুড়ুম না হয়েই যায় না, আক্কেল গুড়ুম হলে তিন নং বেয়াল্লিশ কেন বায়ান্ন কি বিরানব্বইও হতে পারে, হতে তখন কোন বাধাই থাকে না। 'জানলেই হয় না, না জানলে না হয়ে যায় না'—আক্কেল গুড়ুম হচ্ছে না জানার মন্ত্র, আদি ও অকৃত্রিম, এ এক ইল্‌ম।

এবার চোখ বন্ধ করে মনে মনে সাতবার আক্কেল গুড়ুম জপে নাও। তারপর চোখ খুলে দেখো সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে যেদিকে তোমার খুশী, দেখতে পাবে ঠিক তোমার সামনেই আক্কেল গুড়ুম দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পাবে জমায়েৎ হয়েছে ওখানে হাজার হাজার মানুষ—এক পাশে বাঁধা আছে এন্তার গরু-ছাগ-মহিষ। আসছে কাতারে কাতারে বনি-আদম, সবার মুখে একবুলি, এক ইল্‌ম ঃ আক্কেল গুড়ুম, আক্কেল গুড়ুম। আক্কেল গুড়ুম গাঁয়ের আর আক্কেল গুড়ুম ফকিরের এই ঠিকানা—এইটুকু শুধু আমার জানা। অতএব এর বেশী আর জানতে চেয়ো না। মনে রেখো ঃ

জানায় অন্তহীন দুখ
না-জানায় অশেষ সুখ।
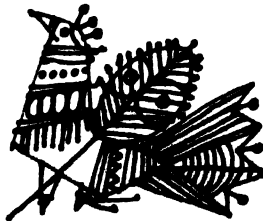
মশা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গল্পটাই আগে বলব, না, গল্প যাঁর মুখে শোনা সেই ঘনশ্যাম-দার বর্ণনা দেব, বুঝে উঠতে পারছি না।

গল্পটা কিন্তু ঘনশ্যাম-দা, সংক্ষেপে ঘনাদার সঙ্গে এমন ভাবে জড়ান, যে তাঁর পরিচয় না দিলে গল্পের অর্ধেক রসই যাবে শুকিয়ে। সুতরাং ঘনাদার কথা দিয়েই শুরু করা বোধ হয় উচিত।

ঘনাদার রোগা লম্বা শুকনো হাড়-বার-করা এমন একরকম চেহারা, যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোন বয়সই তাঁর হতে পারে। ঘনাদাকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য একটু হাসেন, বলেন, "দুনিয়াময় টহলদারি করে বেড়াতে বেড়াতে বয়সের হিসেব রাখবার কি আর সময় পেয়েছি! তবে—" বলে ঘনাদা যে গল্পটা শুরু করেন, সেটা কখনো সিপাই মিউটিনির, কখনো বা রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধের সময়কার। সুতরাং ঘনাদার বয়স আন্দাজ করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু এইটুকুই মেনে নিয়েছি যে গত দু'শ বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যান নি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই।

কয়েক বছর হ'ল কেন যে কৃপা করে তিনি আমাদের এই গলিটির ছোট্ট মেসে এসে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারি না। আমাদের ছুটিছাটার আড্ডায় তিনি যে নিয়মিতভাবে এসে বসেন, এও তাঁর অসীম করুণা বলতে হবে। প্রায়ই অবশ্য তিনি ভয় দেখান যে পাততাড়ি গুটিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, কিন্তু সাধারণতঃ সেটা মাসের শেষে, মেসের খরচের তাগাদা পড়বার সময়। বুঝে শুনে কিম্বা হতাশ হয়েই তাঁর কাছে তাগাদা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ঘনাদা আমাদের আড্ডায় এসে নিয়মিতভাবে সবচেয়ে ভালো আরাম-কেদারাটায় বসেন, যার ভাগ্য যেদিন ভাল থাকে, তার কাছে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরান, তারপর চোখ বুজে

প্রায় ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়তো আমাদের কোন একটা কথায় বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরেই হেসে ওঠেন।

অপ্রস্তুত হয়ে আমরা তখন তাঁর দিকে তাকাই। ঘনাদা একটু নড়ে চড়ে উঠে বসে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলেন, "কি কথা হচ্ছিল—বন্যার ?"

আমরা লজ্জিত ভাবে স্বীকার করি যে সামান্য দামোদরের বানের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম।

ঘনাদা আমাদের দিকে এমন করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকান মনে হয় দামোদরের বানে আমাদের নিজেদের ভেসে যাওয়াই ভালো ছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, "টাইড্যাল ওয়েভ কাকে বলে জান ? দেখেছ কখনো সেই প্রলয়ের ঢেউ—যাকে বলে সমুদ্র-জলোচ্ছ্বাস !"

সঙ্কুচিতভাবে স্বীকার করি যে নামটা জানলেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিজেদের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

ঘনাদা হেসে বললেন,—"কেমন করে আর থাকবে ! তাহলে শোন। তখন মুক্তোর ব্যবসা করব বলে তাহিতি দ্বীপে গিয়ে উঠেছি ...."

ঘনাদার সেই সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক গল্প থেকে জানা যায় যে কি করে এই রকম এক টাইড্যাল ওয়েভের মাথায় এক বেলায় তাহিতি থেকে একেবারে ফিজি দ্বীপে গিয়ে তিনি উঠেছিলেন।

এ গল্প শোনার পর আমাদের অবস্থা কি হয়, তা বলাই বাহুল্য। দিন দুপুরে সূর্যের সামনে মিটমিটে লণ্ঠনের মত আর কি !

ঘনাদার ভয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয় ; কিন্তু আঁটঘাট বেঁধে যতই কিছু বলি না কেন, ঘনাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। দেখা যায়, ঠিক তিনি টেক্কা দিয়ে বসে আছেন।

হয়তো কথায় কথায় কে বলেছে যে আজকাল অনেকেরই চোখে চশমা—চোখের জোর আর বড় বেশী নেই। ঘনাদা তাঁর মার্কা-মারা হাসিটি হেসে অমনি গিয়ে উঠলেন একেবারে অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের চূড়ায়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি 'কণ্ডর' শকুনের বাসার খোঁজে।

হ্যাঁ, চোখের জোর দেখেছি বটে সেবার ! অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের ওপর পথ হারিয়ে ফেলেছি, শীতে প্রায় জমে যাবার যোগাড়, সঙ্গে একজন আর্জেনটাইন শিকারী আর 'বোরোরো' জাতের এক সাড়ে ছ-ফুট লম্বা রেড্ ইণ্ডিয়ান গাইড্। সন্ধ্যা হয় হয়, আর খানিকক্ষণের মধ্যে পথ না খুঁজে পেলে এই পাহাড়ের ওপরই বরফ চাপা পড়ে মরতে হবে। এমন সময় আমাদের চূড়োর নিচেকার খানিকটা মেঘ একটু ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু বারো হাজার ফুট ওপর থেকে সেই ফাঁক দিয়ে কি আর দেখা যাবে। কিন্তু তখনো 'বোরোরো' জাতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা তো জানি না। হাত দুটো দূরবীনের মত করে সে একবার চোখের সামনে ধরলে তারপর বললে, 'ব্যস্ আর ভয় নেই !'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ভয় ত নেই, কিন্তু কি দেখতে পেলে তুমি ?'

সে হেসে বললে, 'কেন, ওইত নিচে শিকারীদের তাঁবু ফেলা রয়েছে, বড় একটা কুকুর নিয়ে লাল কোট-পরা এক শিকারী এইমাত্র তাঁবুতে ঢুকল'—শুনে আমি ত' অবাক্।

ঘনাদার কথা শুনে আমরা ততোধিক অবাক্ হয়ে বললাম,—"বারো হাজার ফুট ওপর থেকে লাল রঙের কোট পর্যন্ত দেখতে পেলে।"

"তা না হলে আর চোখের জোর কিসের ! শকুনের চোখ কি রকম জানো ? দু' মাইল ওপর থেকে ভাগাড়ের গরুর লাশ ওরা দেখতে পায়। এই বোরোরো শিকারীদের চোখ তেমনি।"

এরপর আমরা যে নির্বাক হয়ে গেলাম তা বলা বাহুল্য।

প্রায় নির্বাক হয়েই আজকাল থাকি। এর ভেতর সেদিন কি থেকে বুঝি মশার প্রসঙ্গ উঠে পড়েছিল। ঘনাদা তখনও এসে পৌছান নি। তাই বোধ হয় আমাদের অতটা সাহস। তাছাড়া ভেবেছিলাম যে সামান্য মশা মারবার ব্যাপারে ঘনাদা তাঁর কামান দাগা প্রয়োজন বোধ করবেন না।

কিন্তু ভুল ভাঙতে আমাদের দেরি হোল না। বিপিন সবে তাদের গাঁয়ে কি ভাবে মশা মারবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কথা তুলেছে, হঠাৎ দরজায় ঘনাদার আবির্ভাব।

"কি কথা হচ্ছিল হে?"

আমরা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলি,—"নাঃ, এমন কিছু নয়, এই মশা মারবার কথা বলছিলাম।"

বিপিন তাড়াতাড়ি আরাম-কেদারাটা ছেড়ে সসম্মানে ঘনাদার জন্যে জায়গা করে দেয়।

ঘনাদা তাতে সমাসীন হয়ে শিশিরের কাছে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বললেন, "ওঃ, মশা!"

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হই। যাক ঘনাদার দৃষ্টি তাহলে মশা পর্যন্ত পৌছবে না! কিন্তু পরমুহূর্তেই বোমা ফাটল—যে সে বোমা নয়, একেবারে 'অ্যাটমিক'!

"হ্যাঁ, মেরেছিলাম একবার একটা মশা।"

আমরা স্তম্ভিত। ঘনাদা মশার প্রসঙ্গও বাদ দিতে চান না দেখে নয়, তাঁর এই অবিশ্বাস্য বিনয়ে। মশাই যদি মারতে হয়. তাহলে ঘনাদা মাত্র একটি মশা মারবেন,\এ যে কল্পনাও করা যায় না।

শিশির সাহস করে বলেই ফেলল—"একটি মশা মেরেছিলেন!"

"হ্যাঁ, একটিমাত্র মশাই জীবনে মেরেছি।" আমাদের হতবুদ্ধি করেই ঘনাদা বলে চললেন—"মেরেছি ১৯৩৯ সালের ৫ই অগস্ট, সাখালীন দ্বীপে।"

আমরা ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু চুপ করে আবার বললেন, "সাখালীন দ্বীপের নাম শুনেছ, কিন্তু কিছুই জানো না—কেমন? দ্বীপটা জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মত উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিক্‌টা ছিল জাপানীদের, আর উত্তরটা রাশিয়ার। সেই দ্বীপের পুব-দিকের সমুদ্রকূলে তখন অ্যাম্বার সংগ্রহ করবার জন্য একটি কোম্পানির হয়ে কাজ করছি। এমন অখাদ্য পাণ্ডববর্জিত জায়গা দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ। বছরের অর্ধেক সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, আর বাকি অর্ধেক বরফে সব জমে যায়। তার ওপর আছে ভীষণ তুষার ঝড় আর গাঢ় জমাট কুয়াসা। কোন রকমে দামী কিছু অ্যাম্বার সংগ্রহ করেই সেমুখো আর হব না এই ছিল মতলব, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। আমাদের কোম্পানির তান্‌লিন নামে এক চীনা মজুর একদিন সকালে হঠাৎ নিরুদ্দেশ; তার সঙ্গে এ পর্যন্ত যা অ্যাম্বার যোগাড় হয়েছিল, সেই মহামূল্য থলিটাও।

সাখালীন দ্বীপটি ত' নেহাত ছোটখাট নয়, তার বেশীর ভাগ আবার জঙ্গল আর পাহাড়। সে সব পাহাড়-জঙ্গলের অনেক জায়গায় মানুষের পায়ের চিহ্নই পড়েনি। সুতরাং এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বার করা সোজা নয়। তবে একটা আশার কথা ছিল এই যে, অ্যাম্বারের মত দামী রত্ন চুরি করে সাখালীন দ্বীপে লুকিয়ে থেকে কারুর লাভ নেই। সে চোরাই মাল বেচতে তাকে কোন বড় দেশে যেতেই হবে। আর সাখালীন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেক্‌জ্যান্‌ড্রোভস্‌ক্ থেকে ব্লাডিভস্টকের স্টীমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পরে অবশ্য সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যায়। তখন লুকিয়ে কুকুর-টানা স্লেজে করে পালান সম্ভব। কিন্তু প্রধান স্টীমার-ঘাটায় কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে তার আগে চোর কিছুতেই সাখালীন থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবে না। অক্টোবর পর্যন্ত তাকে খুঁজে বার করবার সময় অন্ততঃ আমরা পাব।

বেতারে অ্যালেক্‌জ্যান্‌ড্রোভস্‌ক্ এর পুলিসের কাছে সমস্ত খবর পাঠিয়ে আমি ও আমাদের ক্যাম্পের ডাক্তার মিঃ মার্টিন দুজন কুলি নিয়ে তান্‌লিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটা হদিস পেয়ে গেলাম।

টিয়ারা পাহাড়ের কাছে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁবু ফেলেছি। ওখানকার আদিম গিলিয়াক জাতির এক শিকারীর কাছে সকাল বেলায় একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, এই দিক্ দিয়ে একজন চীনাকে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে খবরে বিশ্বাস করবার মত কোন প্রমাণ পাই নি।

রাত্রে তাঁবুর মধ্যে ঘুমোন একরকম অসম্ভব। সাখালীন দ্বীপে বড় হিংস্র জানোয়ার বলতে শুধু ভালুক ছাড়া আর কিছু নেই। সাধারণতঃ তারা মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে, তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়। আমি আর মিঃ মার্টিন তাই কোন

রকমে ঘুমোতে না পেরে তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, 'দেখেছেন মিঃ মার্টিন!'

মিঃ মার্টিনের দৃষ্টিও সেদিকে তখন গেছে। অবাক্ হয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! বেশ জোরালো আলো বলে মনে হচ্ছে। এই জনমানবহীন জায়গায় ওরকম আলো আসছে কোথা থেকে? ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি?'

খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে বললাম, 'না, ভূতুড়ে নয়, বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। দূরের ওই পাহাড়ে টিবিটার পেছনে নিশ্চয়ই কোন একটা বাড়ি আছে—এ আলো সেখান থেকেই আসছে।'

মিঃ মার্টিন অবাক্ হয়ে বললেন, 'কিন্তু এখানে শখ করে অমন বাড়ি করবে কে? গিলিয়াক, ওরোক বা টুঙ্গুস জাতের অসভ্য শিকারী ছাড়া এ অঞ্চলে ত' কেউ আসে না।

এদিকে কোন খনি ইদানীং হয়েছে বলেও জানি না।'

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল যত বেশীই হোক, সন্ধান নেবার জন্যে সকাল পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করতাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে রাত্রির স্তব্ধতা হঠাৎ এক অমানুষিক চীৎকারে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একবার আমি ও মিঃ মার্টিন দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলাম, তারপর ভেতর থেকে টর্চটা বের করে এনে কোন কথা না বলেই বেরিয়ে পড়লাম। একেবারে নিরস্ত্র যে আমরা ছিলাম না তা বোধ হয় বলবার দরকার নেই। দুজনের কোমর-বন্ধেই পিস্তল আঁটা ছিল।

যে পাথুরে টিবিটার পেছন থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটা খুব বেশী দূর নয়, প্রায় শ তিনেক গজ হবে। টিবিটার পাশ দিয়ে ঘুরে যাবার পরই দেখা গেল আমাদের অনুমান ভুল হয় নি। একটা মাঝারি গোছের বাড়ির একটা জানালা থেকে উজ্জ্বল আলোটা দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অমানুষিক যে চীৎকার আমরা শুনেছিলাম, তা একবার উঠেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারিধার এমন শান্ত যে দুজনে এক সঙ্গে সে শব্দ না শুনলে মনের ভুল বলেই সেটা গণ্য করতাম।

বাড়িটার কাছে এসে তখন আমরা বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছি। এখন করা যায় কি! অজানা জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাড়িতে হঠাৎ মাঝরাতে এসে ডাকাডাকি করাটা মোটেই সুবিধের হবে না, তা বুঝতে পারছিলাম; কিন্তু ফিরে যাওয়া ত' তখন আর যায় না।

যে জানালাটা দিয়ে আলো আসছিল সেখানে গিয়ে সাবধানে একবার উঁকি দিলাম। মস্তবড় একটা ঘর, মিউজিয়াম যেমন থাকে অনেকটা সেইরকম। প্রকাণ্ড একটা কাঁচে ঘেরা টেবিল ঘরটার মাঝখানে বসান। সে কাঁচের ভিতর কি আছে দেখতে পেলাম না। লোকজনও কেউ সেখানে নেই। এত রাত্রে থাকবার কথাও নয়।

সেখান থেকে সরে এসে দরজায় ধাক্কা দেব কি না ভাবছি, এমন সময় পেছন থেকে সরু অথচ তীক্ষ্ণকণ্ঠে ইংরেজীতে এক আদেশ শুনলাম, 'প্রাণে বাঁচতে চাও ত হাত তোল'—

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, বেঁটে গোছের জোয়ান একটি লোক আমাদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে লম্বা-চওড়া যমদূতের মত চেহারার এক প্রহরী; তারও হাতে পিস্তল।

ব্যাপারটা বেশ নাটুকে হয়ে জমে উঠেছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের পরিচয় পাওয়ার পর সব আবার থিতিয়ে সহজ হয়ে গেল।

পিস্তল হাতে যিনি আমাদের হাত তুলতে বলেছিলেন, জানতে পারলাম, তিনি মিঃ নিশিমারা নামে একজন জাপানী কীটতত্ত্ববিদ্। সাখালীনের কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে এই

ঘাটিটি বসিয়েছেন। আমরা কী উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম শোনবার পর লজ্জিত হয়ে তিনি আমাদের কয়েকদিন তাঁর ওখানে থেকে তাঁর কাজকর্ম দেখে যেতে অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলেন যে পলাতক চীনা মজুরের সন্ধান তাঁর লোকজনের মারফত তিনিই করিয়ে দেবেন। এ অঞ্চল তাঁর একরকম হাতের মুঠোয়। তাঁর লোকজনের হাত এড়িয়ে কারুর পালাবার ক্ষমতা নেই।

কথাটা যে কতখানি সত্য, একদিন পার না হতেই বুঝতে পারলাম। পরের দিন সকালেই মিঃ নিশিমারা তাঁর গবেষণাগার আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন। সাধারণ কীটতত্ত্বের গবেষণা তিনি যে করেন না, তাঁর ল্যাবরেটরির নানা বিভাগ দেখেই তা অবশ্য বোঝা যায়। শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, কীটপতঙ্গ লালন-পালন ও পরিবর্ধন করবার জন্য রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক নানা যন্ত্রপাতি ও উপাদান-উপকরণ তাঁর বিরাট ল্যাবরেটরিতে আছে।

মিঃ মার্টিন এক সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোকা মাকড়ের ভেতর মশাই দেখছি আপনার গবেষণায় প্রধান বিষয়।'

মিঃ নিশিমারা একটু হেসে বললেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে? মানুষের সভ্যতার মশাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু। এই সাখালীন দ্বীপ থেকে শুরু করে সমস্ত পৃথিবীতে শুধু ম্যালেরিয়ার বাহন হিসাবে মশা কি পরিমাণ ক্ষতি প্রতিনিয়ত করছে, ডাক্তার হিসেবে আপনার নিশ্চয় অজানা নয়।'

মিঃ মার্টিন বললেন—'কিন্তু আপনার গবেষণাগারে ত' দেখছি মশার লালন-পালনই হ'ল আসল কাজ। এর দ্বারা ম্যালেরিয়ার কি প্রতিকার হবে বুঝতে পারছি না।'

নিশিমারা আবার হেসে বললেন, 'না বোঝবারই কথা। শুধু মশা মেরে নয়, মশা যাতে আর ম্যালেরিয়ার বাহন না হতে পারে, সেই চেষ্টা করে আমি ম্যালেরিয়া সমস্যার নতুন ভাবে সমাধান করতে চাই।'

আমাদের একটু অবাক্ হতে দেখে তিনি বললেন,—'মশা কি করে রোগের জীবাণু ছড়ায় আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে। তার মুখ একটা ডাক্তারী যন্ত্রের বাক্স বললেই হয়। গায়ের ওপর বসে প্রথম একটি যন্ত্রে সে চামড়া ফুটো করে, তারপর আর একটি যন্ত্রে মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে। এরপর তৃতীয় যন্ত্র-নল দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়।

আমাদের শরীরে যে রোগের জীবাণু ঢোকে, সে তার ওই দ্বিতীয় যন্ত্রের লালা থেকে। মশার জন্মের পর যদি কোন উপায়ে তার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন করে দেওয়া যায় যে, বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু তার ভেতর বাঁচতেই পারবে না, তাহলে মশা হাজার কামড়ালেও আর আমাদের ভয় নেই। আমার গবেষণাগারে মশার লালা পরিবর্তনের সেই চেষ্টাই আমি করছি।'

বিশ্বাস করি না করি, নিশিমারার কথায় প্রতিবাদ কিছু করিনি। সমস্ত গবেষণাগারটা আমাদের কাছে তখনই কেমন রহস্যময় মনে হয়েছে। আগের রাত্রের সেই অমানুষিক চীৎকারের শব্দের কথা তখনও ভুলতে পারিনি। নিশিমারাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেটা কোন বন্য জন্তুর আওয়াজ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনে হয়েছে কিছু যেন তিনি গোপন করে যাচ্ছেন।

সেই গোপন রহস্য যে কি, সেইদিন রাত্রেই টের পেলাম। নিশিমারা আমাদের যত্ন আতিথ্যের কোন ত্রুটি করেননি। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা তখন আমাদের জন্যে

নির্দিষ্ট ঘরটিতে শুতে এসেছি, হঠাৎ মিঃ মার্টিন বললেন, 'এরি মধ্যে শুয়ে কি হবে? আসুন একটু বাইরে ঘুরে আসি।' তাঁর কথায় রাজী হয়ে বাইরে বেরুতে গিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। আমাদের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

'এর মানে?' মিঃ মার্টিন অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। মানে ঠিক না বুঝতে পারলেও এই দরজা বন্ধ করার পেছনে যে কোন শয়তানী মতলব আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ তখন আর আমাদের নেই।

কিন্তু এত সহজে আমরা হার মানব কেন? ছাদের কাছে হাওয়া-চলাচলের একটা ছোট ভেন্টিলেটর ছিল। কোন রকমে তারই পাল্লা ভেঙে দুজনে সেখান দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে নামলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। শুধু ল্যাবরেটরির একটা ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। সন্তর্পনে সেই ঘরটার পেছনে একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই সেই কালকের রাতের মত রক্ত জল-করা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সে আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানালা বেয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েছি। কিন্তু একি ব্যাপার। যার খোঁজে আমরা বেরিয়েছি, সেই তান্‌লিনই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে অসীম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার একপাশে কাল রাতে যাকে দেখেছিলাম সেই যমদূতের মত কাফ্রী প্রহরী দাঁড়িয়ে, অন্য পাশে ফাঁপা একটা কাঁচের মোটা নলের জিনিস হাতে করে মিঃ নিশিমারা।

'ব্যাপার কি মিঃ নিশিমারা?' বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম। মিঃ নিশিমারা আমাদের দেখে রাগে বিস্ময়ে খানিক কথাই বলতে পারলেন না। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললেন, 'আমার আতিথেয়তার ওপর একটু বেশি অত্যাচার করছেন না কি আপনারা? এ ঘরে আসতে কে আপনাদের অনুমতি দিয়েছে?'

'কেউ দেয় নি, এখন বলুন এখানে হচ্ছে কি?'

মিঃ নিশিমারা অদ্ভুত ভাবে হেসে বললেন, 'যা হচ্ছে তা ত' দেখতেই পাচ্ছেন। এ লোকটাকে সাপে কামড়েছে, তারই চিকিৎসা করছিলাম।' মিঃ মার্টিন তখন মেঝেয় বসে পড়ে তান্‌লিনকেই পরীক্ষা করছিলেন। তিনি মুখ তুলে কঠিন স্বরে বল্লেন, 'এত' মারা গেছে। আর সাপেও একে কামড়ায় নি। বলুন, কি করেছেন একে?'

'কি করেছি জানতে চান?' নিশিমারা কখন এরি মধ্যে কোথা থেকে একটা পিস্তল হাতে নিয়েছেন লক্ষ্যই করিনি। সেইটে আমাদের দিকে উঁচিয়ে ধরে তিনি বল্লেন,—বেশ, সেই কথাই বলব তাহলে, শুনুন। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শুনে মরার সৌভাগ্য আপনাদেরই হোক। আপনাদের তান্‌লিন সাপের কামড়ে মারা যায় নি—মারা গেছে মশার কামড়ে—সামান্য একটা মশার কামড়ে।

নিশিমারা তীক্ষ্ণ উচ্চ অট্টহাস্যে আমাদের স্তম্ভিত করে আবার বলতে লাগলেন, বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা, কেমন? কোন ভাবনা নেই, এক্ষুণি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাদের দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলে যাই, শুনুন। মশার লালার রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা যা বলেছিলাম মনে আছে ত'। সে পরিবর্তন আমি সত্যিই করেছি। ডিম থেকে শুরু করে মশা যখন সামান্য জলের পোকা হয়ে থাকে, তখন পর্যন্ত তার ওপর নানা প্রক্রিয়া চালিয়ে মশার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন আমি ঘটিয়েছি যে, সাপের বিষের চেয়েও সে লালা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে যে চীৎকার শুনেছিলেন, সে এমনি একজনের ওপর মশার কামড়ের পরীক্ষার ফল।

তান্‌লিনের অবস্থা ত' সামনেই দেখতে পাচ্ছেন—এইবার আপনাদের পালা।'

নিশিমারার ইঙ্গিতে যমদূত তখন মিঃ মার্টিনকে অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছে। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশিমারা বললেন, এই কাঁচের নল দেখছেন, এর ভেতর একটি মাত্র বিষাক্ত মশা ভরা আছে। এই একটি মশা কিন্তু এখনো আপনার মত জনবিশেক জোয়ানকে অনায়াসে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে। আপনি বিজ্ঞানের পীঠস্থান, সভ্য মার্কিন মুলুকের লোক। তাই আপনাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রাণ দেওয়ার গৌরব আমি আপনাকেই দিতে চাই। বেশী কিছু আপনাকে করতে হবে না। এই নলটি এমন কায়দায় তৈরী যে গায়ে চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঢাকনাটা ভেতর দিকে খুলে যায়,—হিংস্র মশাটাও উড়ে এসে কামড়ে দিতে দেরি করে না ....'

সমস্ত মাথার ভেতর কেমন ঝিমঝিম করছিল। মনে হচ্ছিল আর যেন দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ মরিয়া হয়ে সজোরে একটা ঘুষি ছুঁড়লাম। নিশিমারা আচমকা ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কাঁচের নলটা মেঝেয় আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

তারপর যে ব্যাপার ঘটল তা বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা কর যে, ভাঙা নল থেকে বেড়িয়ে সেই সাক্ষাৎ শমন ঘরের ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে আর তিনটে মানুষ উন্মাদ হয়ে তাকে এড়িয়ে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছে—ঘরের মাঝখানে আবার তান্‌লিনের মৃতদেহ।

কোনরকমে দরজার কাছে পৌছে খিলটা খুলে বেরুতে যাব এমন সময় সেই বিশাল কাফ্রী বাঘের মত আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

আর বুঝি আশা নেই! মশাটা ঠিক আমার নাকের কাছে একবার ঘুরে গেল। তার পরেই সেই কাফ্রী এক সঙ্গে পাঁচটা রেলের ইঞ্জিনের মত চীৎকার করে আমার ঘাড়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে গেল। বুঝলাম, মশার দংশন জ্বালার সঙ্গে সব জ্বালা তার জুড়িয়েছে।

কিছু ভাববার আর সময় নেই। উঠে পড়ে আবার পালাতে যাচ্ছি এমন সময়ে দেখি মিঃ নিশিমারা যুযুৎসুর প্যাঁচে মিঃ মার্টিনকে চিত করে ফেলে দিয়েছেন আর মশাটা ঠিক তার মাথার কাছে উড়ছে। ছুটে গিয়ে হেঁচকা টান দিয়ে মিঃ মার্টিনকে খানিকটা সরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিশিমারার আর্তনাদ শোনা গেল। মশাটা ঠিক তাঁর গালের ওপর গিয়ে বসেছে।

এবার আর একমুহূর্ত দেরি হোল না। আমার প্রচণ্ড এক চাপড় গিয়ে পড়ল নিশিমারার গালে। মশা আর নিশিমারার ভবলীলা এক সঙ্গেই সাঙ্গ হয়ে গেল।

মশা মারবার পরিশ্রমেই যেন হাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘনাদা বললেন,—"জীবনে তারপর মশা মারতে আর প্রবৃত্তি হয় নি।"
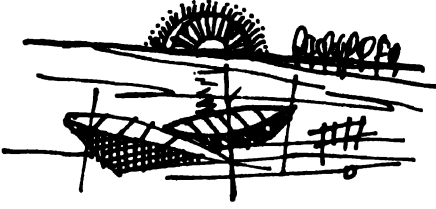
য়্যাড্‌ভেঞ্চার

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

ছোটবেলা হইতে প্রচুর য়্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প পড়িয়া অসীম, নীলাদ্রি প্রভৃতির ভারি শখ্ হইয়াছে জীবনে তাদেরও একটা বড় রকমের কিছু য়্যাড্‌ভেঞ্চার জোটে। কিন্তু ভগবানের কি বিধানই এই যে, যে যা চাহিবে কিছুতেই তা পাইবে না?

অসীম, নীলাদ্রি এবং ভবতোষ সম্প্রতি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছে। পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া হঠাৎ যখন তারা একেবারে কলকাতার মতো জন-সমুদ্রে আসিয়া পড়িল তখন দিন কতক য়্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা তাদের একটু কমিয়া ছিল বটে। কলকাতার রাস্তা দিয়া হাঁটা-চলার কাজই যে একটা মস্ত য়্যাড্‌ভেঞ্চার! মোটর-ট্রাম-বাস্ গাড়িঘোড়ার ভিড় সামাল দিয়া প্রতিদিনকার কাজকর্ম সারিয়া অক্ষত শরীরে দিনান্তে বাড়ি ফেরা য়্যাড্‌ভেঞ্চার বই আর কি?

কিন্তু দু-তিন মাস কলকাতার কলেজে পড়িয়া পূজার ছুটিতে যখন তারা আবার পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিল তখন নিভিয়া-আসা য়্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা আবার যেন নতুন করিয়া মাথা চাগিয়া দাঁড়াইল।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবার একটা সুযোগও জুটিল মন্দ নয়।

দিন পনের-কুড়ি আগে শহরে একটি গণৎকার আসিয়াছিলেন; লোকটি ঠিক পেশাদার গণৎকার নন, তবে অসীমেরা আসিয়া দেখিল আখ্‌ড়ায় লোকের খুবই ভিড় হইতেছে—লোকটার গণনা নাকি আশ্চর্য রকম মিলিয়া যায়। ভবানীবাবুর হাত দেখিয়া গণৎকার বলিয়াছিলেন আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে তাঁর শারীরিক কষ্ট হইবে। রবিবার তিনি হাত দেখাইয়াছিলেন, ঠিক পরের রবিবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠে এক গুঁতা খাইয়া বসিলেন। ব্যোমকেশবাবুকে গণৎকার বলিয়াছিলেন এক মাসের মধ্যে তাঁর বাড়িতে একটি আশ্চর্য ঘটনা

ঘটিবে। ঠিক আটাশ দিনের দিন দেখা গেল তাঁর বড় ছেলে—যে চা না খাইয়া প্রাতে বাড়ির বার কখনোই হয় না, সে নাকি কোন্ কাজে খুব ভোরে চা না খাইয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গণৎকার বলিয়াছিল পাড়ায় কিছু কিছু চুরি হইবে, তাহাও হইতে লাগিল। অসীম ভাল গান গাহিতে পারিত, চুরি যাইবে তো তার সাধের হার্মোনিয়াম্‌টাই এক দিন চুরি গেল।

এইবার অসীমেরা একটা প্রকৃত য়্যাড়্‌ভেঞ্চারের সুযোগ পাইল। তারা শুনিয়াছিল গণৎকার বলিয়াছে মাঝে মাঝে চুরি হইবে; তবে তাক্ মাফিক্ থাকিতে পারিলে চোর ধরা আর কিছু শক্ত কাজ নয়। চোর ধরা যে য়্যাড়্‌ভেঞ্চার এ কথা কে না স্বীকার করিবে?

সামান্য একটু রাত হইতেই কাহাকেও কিছু না জানিতে দিয়া তিন বন্ধু—অসীম, নীলাদ্রি এবং ভবতোষ—মোটা মোটা লাঠি এবং টর্চের আলো হাতে দিন কয়েক চোরের উদ্দেশে ফিরিতে লাগিল। প্রথম প্রথম দিন কয়েক উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটিল না বটে, কিন্তু দু-চার দিন বাদেই যে ঘটনা ঘটিল তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে তবে অন্ধকার তখনো কিছু কিছু আছে। গ্রাম একেবারে নিঝুম নিস্তব্ধ! তিন বন্ধু বোস-পাড়ায় টহল সারিয়া সেন-পাড়ার দিকে আগাইতেছিল, স্পষ্ট দেখিতে পাইল সেই ঈষৎ অন্ধকারের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া এক ব্যক্তি মাথার উপর মাঝারি সাইজের একটি ক্যাশ-বাক্স চাপাইয়া হন্ হন্ করিয়া গাঁয়ের বাহিরে মাঠের দিকে চলিয়াছে। দৃশ্যটা তিনজনেরই এক সঙ্গে চোখে পড়িল, কাজেই সে আর কিছু দৃষ্টি-বিভ্রম হইতে পারে না।

পাড়াগাঁয়ে প্রত্যেক লোকই প্রত্যেকের চেনা, কিন্তু এ লোকটিকে তিন বন্ধুর একজনও কখনো চোখে দেখে নাই। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া এ অবস্থায় তাই তার চোরত্ব সম্বন্ধে কারোই আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

কিন্তু তিন-জনেই এত বেশি উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে চট্ করিয়া কারো মাথাতেই কোন উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইল না। এ অবস্থায় লোকটার উপর টর্চ ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিলেই ফল ভাল হইবে, না কি চীৎকার করিয়া লোকজন জোটাইয়া লওয়াই কর্তব্য, তা ঠিক করিতে খানিকটা সময় কাটিয়া গেল, এবং ততক্ষণে বাক্সমাথায় লোকটি লোকালয় ছাড়াইয়া নির্বিঘ্নে গাঁয়ের বাহিরে মাঠের উপর আসিয়া পড়িল।

সে মুলুকটা পাহাড়ে—মাঠের উপর জমি তাই উঁচু-নীচু; চারিদিকে ছোটখাটো টিলার মতো ঢিবিও কতগুলি ছড়ান, গাছও আছে কতগুলি। সেখানে সকলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল ভোরের আলো তখন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অসীমেরা বুঝিল, এ-ই সুযোগ—এরূপ ফাঁকা মাঠের উপর একসঙ্গে তিন তিন জন লোকের তাড়া খাইলে চোরের বাছার পক্ষে পালাইয়া গা-ঢাকা দেওয়া অসম্ভব হইবে, বামাল-শুদ্ধ সে ধরা পড়িবেই। তখন হুহুঙ্কারে এবং সগর্জনে তিন বন্ধু সামনের দিকে ধাইয়া চলিল—তাদের একটু আগে আগে বাক্স-মাথায় লোকটা যাইতেছে। হঠাৎ চমকাইয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল মাত্র, তার পর উর্ধ্বশ্বাসে একটা ঢিবির আড়াল দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অসীমেরা তখন তিন দিক্ হইতে তাকে ঘেরাও করিয়াছে, এখনই তাদের বৃত্ত ক্রমশ ছোট করিয়া আনিয়া তাকে ধরিয়া ফেলিবে, সন্দেহ নাই!

কিন্তু যাহা ঘটিল ভেল্কীবাজীও বোধ করি তাহা অপেক্ষা বেশি আশ্চর্যজনক নয়, ভৌতিক কাণ্ডও বোধ করি তাহা অপেক্ষা বেশি বিশ্বাস্য। তিন দিক্ হইতে অসীম, নীলাদ্রি ও ভবতোষ ক্রমশ আগাইয়া দেখে, চোর বা চোরাই মালের চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু লোকটা অন্তর্হিত হইয়া গেল কি ভাবে? তাদের তিন-জনার সামনা দিয়া, ফাঁকা মাঠের উপর দিয়া সে পালাইয়াছে—এমন

কথা প্রাণ গেলেও কেউ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়! লোকটার ডানা থাকিলে উড়িয়া সে যাইতে পারিত বটে, কিন্তু তবুও তা তাদের চোখে পড়িতই। এই অল্পক্ষণের মধ্যে সে যে একটা ক্যাশ-বাক্স সমেত কোন গাছে চড়িয়া গা-ঢাকা দিয়া আছে তাহাও একেবারেই অবিশ্বাস্য। তবুও

তারা তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেক টিলা এবং টিবির আশ-পাশ খুঁজিয়া দেখিতে কসুর করিল না, কিন্তু কোথাও চোরের টিকিটিরও সাক্ষাৎ মিলল না। লোকটা নিশ্চয়ই কোন পাকা যাদুকর!

বেলা আটটা পর্যন্ত ঠায় সেখানে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিবার পর অসীমেরা শেষে গ্রামের ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপারটা সকলের গোচর করিল। কিন্তু ইংরেজীতে সেই যে একটা কথা আছে 'অনিষ্টের উপর অপমান'—তাই হইল তাদের কেবল লাভ, যখন সকলে এই আষাঢ়ে-গল্প শুনিয়া তাদের পকেটে হাত দিয়া দেখিতে আসিল—গাঁজার কলিকা-টলিকা কিছু আছে কিনা!

তার পর উপর্যুপরি আরও কয়েক রাত অসীমেরা প্রবল উৎসাহের সহিত পাড়ায় পাড়ায় টহল দিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু ন্যাড়া নাকি একবারের বেশি বেলতলায় যায় না, চোরও তাই একবারের বেশি আর দর্শন দিল না।

এদিকে পূজার ছুটি ক্রমেই ফুরাইয়া আসিতেছিল, অসীমদের কলকাতা ফিরিবার সময় কাছাইয়া আসিল। বড়ই আফ্‌শোষ তাদের, এত বড় একটা য়্যাড়্‌ভেঞ্চারের সুযোগ হাতে আসিয়াও দুরদৃষ্ট বশত ফস্‌কাইয়া গেল; লাভ হইল কেবল পাড়া-পড়শীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ। আচ্ছা এটি না হোক, যাইবার পূর্বে আর একটি য়্যাড়্‌ভেঞ্চার তারা করিয়া যাইবে—প্রতিবেশীদের বুঝাইয়া যাইবে সাহস-সামর্থ দুই-ই তাদের আছে, নাই কেবল সুযোগ আর সুবিধা। চৌধুরী-বাগানে বন-ভোজন করিয়া তারা তা প্রমাণ করিবে।

কথাটা একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। গ্রাম যেখানে শেষ হইয়াছে সেস্থান হইতে মাইল দুই গেলে একটি প্রকাণ্ড জঙ্গল পাওয়া যায়। এ জঙ্গলটি এ অঞ্চলের বিভীষিকা। দু-তিনশো বছর আগে এটি নাকি নবাবী আমলের কোন্ জমিদারের আম-বাগান ছিল, তাই আজিও এর নাম চৌধুরী-বাগান। কিন্তু গ্রামের অতি বৃদ্ধেরাও এমন কোনো লোকের নাম বলিতে পারেন না যে এই চৌধুরী-বাগানে কখনও নির্ভয়ে হাঁটিয়া-চলিয়া বেড়াইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে একটি অতি পুরাতন ভাঙা শিব মন্দির আছে, সেটি নাকি ভূত-প্রেতদের লীলাভূমি। সন্ধ্যার পর যেসব লোমহর্ষণ কাণ্ড সেখানে ঘটে তার নাকি তুলনা নাই। অসীম, নীলাদ্রি এবং ভবতোষ ঠিক করিল এই চরম ভয়ের স্থলে যাইয়াই তারা বনভোজন সারিয়া আসিবে। বিংশ শতাব্দীর ছেলে তারা, ঠাকুরদাদাদের ভূত-প্রেতকে থোড়াই কেয়ার করে।

কিন্তু বাড়িতে এ কথা প্রকাশ করার উপায় নাই, কারো মা-বাবাই তবে তাদের বাড়ির বাহির হইতে দিবেন না। এক দিন বেলা গোটা তিনেকের সময় তাই তারা ভিতরের কোন কথা কাহাকেও না ভাঙিয়া স্টোভ্, ন্যাপ্‌শ্যাক্, টর্চ-আলো প্রভৃতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল, বাড়িতে কেবল কহিয়া গেল, 'বনভোজনে যাইতেছি, সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ফিরিব।'

চৌধুরী-বাগানে ঢুকিয়া একটা পছন্দসই জায়গা বাছিয়া নিয়া তারা স্টোভ্ ধরাইতে বসিল তখন মাথার উপরকার খট্‌খটে রোদের দরুনই হউক্, অথবা পরস্পরের সান্নিধ্যের জন্যই হউক্, জায়গাটা যে কতখানি ভীষণ তা কেউ বুঝিতে পারে নাই। খাওয়া-দাওয়া পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার মধ্যেই চুকিয়া গেল, কিন্তু হেমন্তের বেলা—তখনই চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। তারপর সেই ভাঙা মন্দির খুঁজিয়া বাহির করিতে তারা ক্রমশ নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে দু-চারিটা মরা জানোয়ারের হাড়গোড় তাদের চোখে পড়িল, তারা দেখিয়াও দেখিল না। খানিকটা যাইতেই মন্দির পাওয়া গেল—চারিদিক্‌কার জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে ভাঙা মন্দির আত্মগোপন করিয়া আছে।

সহসা কিন্তু মন্দিরের মধ্যে ঢুকিতে কারোই সাহসে কুলাইল না। ভবতোষ ছেলেটা কথা কয় কম, কিন্তু সাহস তারই বেশি। সে-ই প্রথম দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল; সূচীভেদ্য অন্ধকার, কিছুই নজরে আসে না। টর্চ জ্বালাইয়া তখন সে একেবারে ভিতরে

ঢুকিয়া পড়িল, পিছন পিছন অসীম ও নীলাদ্রি আলো হাতে আসিতে লাগিল। তিন জনেই যার যার আলো ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মন্দিরের ভিতরটা দেখিতে লাগিল—কোনো প্রাণীরই সেখানে সাড়াশব্দ নাই, একটি টিকটিকি বা আরশুলার পর্যন্ত নয়।

ঠিক এমনি সময়ে বাহির হইতে একটা ভীষণ শব্দ আসায় তিন জনেই একেবারে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। সর্বনাশ! এ যে বাঘের আওয়াজ, এবং অনুমানে বোধ হয় আওয়াজ খুব দূরেও নয়। তাদের অবস্থার ভীষণত্ব এইবার যেন প্রথম তাদের চোখে ধরা দিল। এই অবস্থায় এই থম্‌থমে অন্ধকারে বন পার হইয়া গ্রামের দিকে রওনা হওয়া নিতান্ত পাগল ছাড়া আর কেউ কল্পনায়ও আনিতে পারে না। মন্দিরের মধ্যে বসিয়া থাকা আরও বিপদসঙ্কুল; কে জানে, ইহাই হয় তো বাঘের বাসস্থান। উপায় একমাত্র, অতি দ্রুত কোনো উঁচু গাছে উঠিয়া রাত্রি ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা। পাড়াগেঁয়ে ছেলে, গাছে ওঠার অভ্যাসটা খুবই আছে; তিন জনে তাই তাড়াতাড়ি মন্দির হইতে বাহির হইয়া উঁচু একটা গাছের চূড়ায় উঠিয়া পড়িয়া বসিল।

মিনিট দশেক দুরু দুরু বুকে নিঃশব্দে থাকার পর হঠাৎ যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়িল তাতে মানুষের বুকের ভিতর পর্যন্ত হিম হইয়া আসে! যে অন্ধকার মন্দিরটি একটু আগেই তারা ছাড়িয়া আসিয়াছে, স্পষ্ট দেখা গেল তারই মধ্যে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তবে তো গ্রামের বৃদ্ধরা বড় মিথ্যা বলেন না, কেননা ভৌতিক কাণ্ড ছাড়া এ যে আর কি হইতে পারে তা কল্পনায়ও আনা কঠিন। একটু আগে মন্দিরটাকে তারা ঘুটঘুটি অন্ধকার এবং জনপ্রাণীশূন্য দেখিয়া আসিয়াছে: সঙ্গের তিনটা টর্চ তাদের সঙ্গেই রহিয়াছে; যে গাছটাতে তারা উঠিয়াছে সেটি মন্দির হইতে মাত্র হাত দশেক দূরে; সমস্তটা সময় তারা তিন জনে সমানে চাহিয়া রহিয়াছে—মানুষ তো দূরের কথা, একটা ইতর প্রাণী পর্যন্ত মন্দিরের ধারে যায় নাই। তবে মন্দিরের ভিতরে আলো আসিল কোথা হইতে?

"খস্‌স্—খস্‌স্"

তিন জনেই চম্‌কাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে, একটা শৃগাল প্রাণভয়ে ছুটিয়া মন্দিরের দিকে আসিতেছে, আর ঠিক তারই পিছনে বিদ্যুতের গতিকেও পরাস্ত করিয়া ধাইয়া আসিতেছে বনরাজ্যের বিভীষিকা—একটি দুরন্ত বাঘ।

সার্কাসে বা চিড়িয়াখানায় অস্থিচর্মসার বাঘ তারা বহুবার দেখিয়াছে, কিন্তু স্বাধীন, মুক্ত অবস্থায় এই দুর্ধর্ষ জীব শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—এ দৃশ্য জীবনে এই প্রথম! ভয়ে তাদের কণ্ঠনালী শুকাইয়া আসিল, কিন্তু ঠিক পরের মুহূর্তেই যে ঘটনা চোখে পড়িল তা বোধ করি আরও ভীতিপ্রদ, আরও রোমহর্ষক। মন্দিরের একটা ভাঙা জানালা দিয়া এক ঝলক তীব্র আলো বাঘটার চোখে-মুখে আসিয়া পড়িল আর সেই আলোয় অসীমেরা দেখিতে পাইল সেই দুরন্ত জীবের মুখে নিদারুণ ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এক পা অগ্রসর সে তো হইলই না, বরং নিতান্ত ভীরুর মতো লেজটি তুলিয়া সুড়্ সুড়্ করিয়া সে পিছু হাঁটা দিল। তার ব্যবহারে সে যেন স্পষ্টই জানাইয়া দিয়া গেল, মন্দিরে প্রবল কোন ভয়ের কারণ আছে এবং তার প্রমাণ ইতিপূর্বে আরও সে পাইয়াছে। বাঘ ভয় পাইয়া মুখের গ্রাস ফেলিয়া পালায়, না জানি কি ভীষণ আতঙ্করই না ব্যাপার!

পরস্পর যে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিবে, সেটুকু সাহসও অসীমদের অবশিষ্ট ছিল না, একদৃষ্টে তারা মন্দিরের আলোর পানে চাহিয়া রহিল। সেই আতঙ্ককর আলো হঠাৎ এক সময় অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ভাবে সেই হতভাগ্য ছেলে তিনটির চোখের উপর দিয়া সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, ভোরের সূর্য দেখা দিল। তিন বন্ধু গাছ হইতে নামিল চারিদিক্ ভালো করিয়া

আলোকিত হইয়া ওঠার পর। অসীম এবং নীলাদ্রি গ্রামে ফিরিবার সব চাইতে সহজ পথ কোন দিকে তাই নিয়া তর্ক করিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্তব্ধ হইয়া গেল গোঁয়ার ভবতোষের মৎলব শুনিয়া। সূর্যের আলো বোধকরি তার বুকে নূতন সাহস আনিয়া দিয়াছিল, সে দৃঢ়স্বরে জানাইল মন্দিরের ভিতরে কি আছে না জানিয়া সে সে-স্থান হইতে এক পাও নড়িবে না,—এতে তাকে বাঘেই ধরুক্, সাপেই কাটুক্, আর ভূতেই মারুক্।

দুই জনে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল; তারা তাকে বিস্তর বুঝাইতে চেষ্টা পাইল যে তার এ প্রস্তাব পাগ্‌লামির চূড়ান্ত, কাল যা হইয়া গিয়াছে সে য়্যাড্‌ভেঞ্চারেরই তুলনা নাই। এরূপ মারাত্মক স্থানে আর মুহূর্তকাল থাকা মৃত্যুকেই নিজে হইতে ডাকিয়া আনার সামিল—ইত্যাদি। কিন্তু ভবতোষ অটল; উত্তর দিল, "বেশ তো তোরা এগো না, আমি না হয় একটু বাদেই যাচ্ছি!"

তাকে ওইভাবে একা ফেলিয়া সত্যিই কিন্তু আর গাঁয়ে ফেরা চলে না, তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভয়ে মুখ কালো করিয়া অসীম এবং নীলাদ্রি ভবতোষের সঙ্গে ভাঙা মন্দিরের পানে চলিল। মন্দিরের ভিতরে সূর্যের আলো তখন ঢুকিয়াছে। বাহির হইতে তিন-জনে উঁকি মারিতে লাগিল, কিন্তু আশ্চর্য, কোন প্রাণীই যে ভিতরে আছে এমন মনে হইল না। ভবতোষই সাহস করিয়া ঢুকিয়া পড়িল, অসীম এবং নীলাদ্রি দুরু দুরু বুকে তার অনুসরণ করিল।

কিন্তু কোথায় জনপ্রাণীর সাড়া! মন্দির একেবারে শূন্য!

এই ভূতুড়ে ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া এইবার তিন-জনেই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। রাত্রে মন্দিরে তীব্র আলো জ্বলিয়াছিল; সেই হইতে তারা খরদৃষ্টিতে নজর রাখিয়াছে, কোন জনপ্রাণী মন্দির হইতে বাহিরে আসে নাই। অথচ এখন দেখা যাইতেছে মন্দির শূন্য—খাঁ খাঁ করিতেছে! কে এই ভৌতিক ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিবে?

দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও টর্চ জ্বালিয়া তারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া মন্দিরের আনাচে-কানাচে পরীক্ষা করিতে লাগিল। হঠাৎ ভবতোষ ভয়ার্ত-স্বরে বিষম এক চীৎকার করিয়া উঠিতেই বাকি দু-জনে চমকিয়া ফিরিয়া দেখে, মেঝে ফুঁড়িয়া সে মাটির নীচে তলাইয়া যাইতেছে—যেন কেউ নীচে হইতে তাকে টানিয়া লইতেছে। এইবার অসীম ও নীলাদ্রির মাথার চুল একেবারে খাড়া হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মাটির তলা হইতে ভবতোষের চাপা আওয়াজ আসিল "শীগ্‌গির নেমে আয়, শীগ্‌গির চ্যাটাল পাথর দুটোর জোড়ার মুখে দাঁড়া।"

মন্দিরের এক কোণে বাটনা-বাটা শিলের মতো দুটো বড় বড় চ্যাটাল পাথর মুখোমুখী জোড়া অবস্থায় পড়িয়া ছিল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো অসীম এবং নীলাদ্রি তার উপর গিয়া দাঁড়াইতেই সড়াৎ করিয়া দু-জনে মাটির তলায় গলিয়া গেল। যেখানে গিয়া তারা পৌঁছিল, অবাক হইয়া দেখিল সেটি একটি গুপ্ত পাতাল-কুঠি-ভবতোষ ইতিমধ্যেই টর্চ জ্বালিয়া সেটিকে আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই গুপ্ত কুঠিময় নানা প্রকার জিনিস ছড়ান। প্রথমেই যে জিনিসটির উপর অসীমের নজর পড়িল সেটি তারই হার্মোনিয়াম্—এখন পর্যন্ত তার উপর তার নামের আদ্যক্ষর এ· এম লেখা আছে। তা ছাড়া আরো অনেক জিনিস সেখানে মজুত—ক্যাশ-বাক্স, কাপড়ের গাঁট, রূপা-কাঁসার জিনিসপত্র, এমন কি একটা বন্দুক অবধি। কিন্তু লোকের কোন সাড়াশব্দ নাই। বিস্ময়ে তিন-জনেই তখন অভিভূত। গুপ্তকুঠির এক-দিকে একজোড়া দরজার মতো কি ভেজান ছিল, সেটা খুলিয়া সামনের দিকে টর্চের আলো ফেলিতেই তারা মাটির তলা দিয়া সোজা একটা গলির রাস্তা দেখিতে পাইল। সেই গলি-পথে বহু দূর তারা তিন-জন পর পর সারি দিয়া আগাইয়া চলিল—সে কতদূর তাদের খেয়াল নাই, এক মাইল, দেড় মাইলও হইতে পারে,

বেশি হওয়াও অসম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত সেই গলির পথ এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গেল, এবং মনে হইল উপর হইতে যেন অতি ক্ষীণ একটা আলোর ধারা আসিতেছে। সেই আলোর পথ উদ্দেশ করিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে অতি সহজেই সে কাজ সম্পন্ন হইয়া গেল—তারা পৃথিবীর উপরে, আলো-বাতাসের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল। উপরে উঠিয়াই কিন্তু তারা এই দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল যে তারা তাদের গাঁয়ের শেষের মাঠটাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং যে স্থানটা দিয়া তারা পাতালপুরী হইতে পৃথিবীর উপর উঠিয়া আসিয়াছে, সেটি একটা টিলারই ঠিক পাদদেশে অবস্থিত!

সমস্ত ব্যাপারটা তখন তাদের চোখে কাচের মতো স্বচ্ছ হইয়া গেল। তারা বুঝিল যে, যে গলির পথে তারা এতটা পথ চলিয়া আসিয়াছে সেটা প্রকৃতপক্ষে এক গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথ। সেকালের রাজ-রাজড়াদের. এবং তাদেরই সামিল বড় বড় জমিদারদের এরূপ গুপ্ত সুড়ঙ্গ থাকা সম্বন্ধে বিস্তর গল্প তারা শুনিয়াছে। চৌধুরী বাগান নবাবী আমলে যে জমিদারদের আমের বাগান ছিল, খুব সম্ভবত এই গুপ্ত সুড়ঙ্গটিও ছিল তাদেরই সম্পত্তি এবং 'গুপ্ত' বলিয়াই লোকে কোনো দিন ইহার কথা জানিতে পারে নাই। পাহাড়ে মুলুক. প্রত্যেক টিলার নীচেই কিছু-না-কিছু পাথর আছে; কিন্তু কী অপূর্ব কৌশলে তারই একটার মধ্য দিয়া সেই পুরান শিল্পীরা অত বড় একটা সুড়ঙ্গের মুখ করিয়া রাখিয়াছে, কেউ কি স্বপ্নেও তা ভাবিতে পারিয়াছে? আজ যেমন দৈবক্রমে তারা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, ঠিক এইরূপই দৈবক্রমে কিছুদিন আগে এক চোর-প্রভুও সুড়ঙ্গ-রহস্যটি টের পাইয়াছেন, এবং তারই ফলে প্রতিনিয়ত এই গুপ্তপথে চোরাই মাল চালান দিয়া ভাঙা মন্দিরের তলাকার কুঠিতে সেগুলি মজুত করিতেছেন। সুড়ঙ্গের পথ দিয়া মন্দিরে সে প্রায় প্রত্যহই যাতায়াত করিতেছে, এবং কালও তারা মন্দির হইতে বাহির হইবার পর সে-ই সেখানে গিয়া আলো জ্বালাইয়াছিল। জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারদের চোখে তীব্রদ্যুতির টর্চ ফেলিয়া—এবং বোধ করি দু-চারটাকে গুলি করিয়া মারিয়া—তাদের মনে সে দারুণ ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে, যার ফলে বাঘও তার সান্নিধ্যে ভড়কাইয়া যায়। নিশ্চয়ই এই চোরটাকেই সেদিন তারা এইখানে পাক্‌ড়াও করিয়াছিল। এই সুড়ঙ্গ-পথেই সে অমন আশ্চর্যভাবে উধাও হইয়া গিয়াছিল—টিলার আড়ালে থাকায় প্রকৃত রহস্য তারা বুঝিতে পারে নাই।

গ্রামে ঢুকিতেই অসীমেরা সাশ্চর্যে শুনিল আজ প্রত্যুষেই নাকি তিন মাইল দূর হইতে দারোগা আসিয়া গণৎকার বাবাজীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে—সে নাকি দাগী চোর. সম্প্রতি আবার কোথায় নতুন অপকর্ম করিয়া গণৎকার সাজিয়া বেড়াইতেছে। দারোগাবাবু এক হাতে একটা মোটা নকল গোঁফ্ এবং অপর হাতে একটা বাব্‌রিওয়ালা পরচুলা লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলেন. "ব্যাপার মন্দ নয়! রাতে 'জার্মেন্ গোঁফ্' পরে চুরি, আর দিনে গোঁফ ফেলে, মাথায় বাব্‌রি এঁটে গণৎকারী! আহা! বাবাজীর আমার কি গোণার শক্তি—'আজ থেকে দশ দিনের ভেতর অমুকের একটা হাঁচি হবেই হবে; 'আজ থেকে পনেরো দিনের খেতে বসে ভেতর অমুকের ঝাল্ লাগবেই লাগ্‌বে! বাহ্‌বা কি বাহ্‌বা!"

বাব্‌রিশূন্য গণৎকারের দিকে অসীমেরা এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল; এ লোকটাই সেদিন কাইজার-মার্কা' গোঁফ্ পরিয়া তাদের ফাঁকি দিয়া পালাইয়াছিল বটে—মাথায় কদম ফুলের সূঁয়া যে এখনও গজ গজ্ করিতেছে!
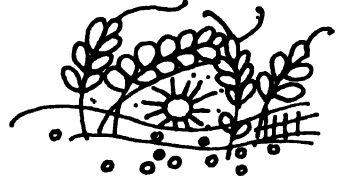
লাভের বেলায় ঘণ্টা

শিবরাম চক্রবর্তী

ঘাটশিলার শান্তিঠাকুর বলেছিলেন আমায় গল্পটা .....ভারী মজার গল্প।

দারুণ এক দুরন্ত ছেলের কাহিনী ...

যত রাজ্যের দুষ্টবুদ্ধি খেলত ওর মাথায়। মুক্তিপদ ছিল তার নাম, আর দুষ্টুমিরাও যেন পদে পদে মুক্তি পেত ওর থেকে। আর হাতে হাতে ঘটত যত অঘটন!

এই রকম অযথা হস্তক্ষেপ আর পদক্ষেপের ফলে একদিন যা একটা কাণ্ড ঘটল... গাঁয়ের শিবমন্দিরের ঘণ্টাটার ওপর ওর লোভ ছিল অনেক দিনের।

শিবঠাকুরের মাথার ওপর ঘণ্টাটা থাকত ঝোলানো। শিবরাত্রির দিন ওটাতে দড়ি বেঁধে দেওয়া হতো। ভক্তরা সেই দড়ি ধরে টান মেরে একবার করে বাজিয়ে যেতো ঘণ্টাটা।

কী মিষ্টি যে ছিল তার আওয়াজ!

শিবরাত্রির পর্ব ছাড়া আর কোনোদিন ওটা বাজানো হতো না কিন্তু।

শিবঠাকুরের পাশেই ছিলেন পার্বতী দেবী। তাঁর মাথায় ঝকমক করত সোনার মুকুট। কিন্তু সেদিকে মুক্তিপদর মোটেই নজর ছিল না।

মুক্তিপদ তক্কে তক্কে থাকত কি করে ঘণ্টাটা হাতানো যায়।

একদিন সে দেখল পূজারী ঠাকুর কোথায় যেন বেরিয়েছে, মন্দির ফাঁকা পড়ে, চারধারে কেউ কোথ্থাও নেই।

সুবর্ণসুযোগ জ্ঞান করে সে মন্দিরের ভেতরে গিয়ে সেঁধুলো।

কিন্তু হাত বাড়িয়ে দ্যাখে যে ঘণ্টাটা তার নাগালের বাইরে। যদ্দূর তার হাত যায়, তার থেকেও এক হাত ছাড়িয়ে ওপরে রয়েছে ঘণ্টাটা।

ওটাকে পাড়ার জন্য সে তাই শিবলিঙ্গের মাথার ওপরে খাড়া হ'ল।

কিন্তু তখনো সেটাকে হাত দিয়ে পাকড়ানো যায় না, আঙুলে ঠেকে, কিন্তু মুঠোর মধ্যে আনা যায় না ঘণ্টাটাকে!

ভারী মুস্কিল তো! কিন্তু এ কী ...! শিবের মাথায় চড়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল সেই অঘটনাটা!

স্বয়ং শিবঠাকুর তার সম্মুখে আবির্ভূত! মুক্তিপদর পদক্ষেপেই দেবাদিদেব মুক্তি পেলেন নাকি?

'বৎস, তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা করো।'

'অ্যাঁ?' হকচকিয়ে গেছে মুক্তিপদ।

'ভয় খেয়ো না। তুমি কি আমায় চিনতে পারছো না?'

'চিনব না কেন? তুমি শিবঠাকুর। দেখেই টের পেয়েছি। পটে দেখেছি তো। পটের সঙ্গে বেশ মিলে যায়।'

'তোর মতন ভক্ত আর হয় না।' শিবঠাকুর বলেন, 'লোকে আমার মাথায় ফুল বেলপাতা চড়ায়, তুই নিজেকেই আমার ওপর চড়িয়েছিস। তোর সবটাই দিয়েছিস আমায়। তোর মতন ভক্ত আমি দেখিনি। এখন বল্ তুই কী চাস?'

'কী আবার চাইব!' থতমত খেয়ে সে বলে।

'রাজা হতে চাস তুই?"

'রাজা!'

'অনেক লোক-লস্কর নিয়ে বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হবার বাসনা আছে তোর?'

মুক্তিপদ ভাবতে থাকে।

'সে ভারী ঝামেলা!' ভেবে-চিন্তে সে জানায়ঃ 'রাজা হতে আমার প্রাণ চায় না। রাজ্যি চালানো আমার কম্মো নয়। কি করে রাজ্য চালায় তাই আমি জানিনে!'

'তাহলে কী চাস বল? পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যে?'

রাজকন্যে নিয়ে আমি কী করব?'

'কেন, বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করবি? আবার কী?'

'বিয়ে! এখনই আমি বিয়ে করব কি। আমার গোঁফ বেরয়নি এখনো। তুমি বলছো কি ঠাকুর?'

'তাহলে হাতী ঘোড়া কী চাস বল্ তুই!' বর দিতে এসে এমন বিড়ম্বনা শিবঠাকুরের বুঝি কখনো হয়নি।—'আমি তোকে বর দিতে চাই। বর না দিয়ে আমি ছাড়ব না।'

'হাতী ঘোড়া কি কেউ চায় নাকি আবার?'

'টাকাকড়ি ধনদৌলত?'

রাখব কোথায়? বাবা টের পেলে মারবে না। একবার বাবার একটা টাকা সরিয়েছিলাম, তাইতেই এমন একখানা চড় খেয়েছিলাম যে! ...এখনো আমার মনে আছে বেশ। না, টাকাকড়ি আমার চাইনে।'

'তোর দেখছি কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি নেই। মুক্তপুরুষ মনে হচ্ছে। তাহলে তুই কি চাস— ভক্তি, মুক্তি?

'সে তো আমার পাওয়া গো। আমার নামই মুক্তি। আর আমার বাবার নাম ভক্তিপদ— ভক্তি মুক্তি তো না-চাইতেই পেয়ে গেছি।' 'তাহলে তুই হয়ত চাস, মনে হচ্ছে, ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা—'

'সে তো বিবেকানন্দরা চায়। পড়েছি বইয়ে। আমি বিবেকানন্দ হতে চাই না।'

'ভাল ফ্যাসাদ হ'ল দেখছি।' মহাদেব নিজের জটাজুট চুলকোন। ছেলেরা কী চাইতে পারে, কী তাদের চাওয়ানো যায়, কিছুই তিনি ভেবে পান না।

নিজের ছেলেবেলায় কী সাধ ছিল তাঁর? তাও কিছু তাঁর স্মরণ নেই এখন। সেই সুদূর

অতীত বাল্যকালের কথা তাঁর মনেই পড়ে না আর। কবে যে তিনি দুগ্ধপোষ্য বালক ছিলেন, আদৌ ছিলেন কিনা কখনো—কিছুই তাঁর ঠাওর হয় না।

কী চাইতে পারে ছেলেটা? কী পছন্দ হতে পারে ছেলেটার? তিনি খতিয়ে দেখতে যান।

তাঁর আর তার টান সমান হবার কথা নয়। আদ্যিকালের তিনি আর সেদিনকার এই ছোঁড়ার রুচি কি এক হবে? যে বস্তু তাঁর প্রিয় ওর কাছে হয়ত তা মূল্যহীন।

ছেলেটা এই বয়সেই চোখে ধুতরো ফুল দেখতে রাজী হবে কি? বিল্বফলের জন্যেও সাধ করে হাত বাড়াবে না নিশ্চয়?

মাথায় হাত দিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন। কূল-কিনারা পান না কিছু।

হঠাৎ নিজের কপালের চাঁদে তাঁর হাত ঠেকে যায়। হাতে যেন চাঁদ পান তখন।

'এই চাঁদ?' তিনি উচ্ছ্বসিত হন—'এই চাঁদখানা তুমি পেতে চাও নিশ্চয়? এমন চাঁদ পাবার সাধ হয় না তোমার?'

প্রস্তাবটা শুনে মুক্তিপদ নাক সিঁটকোয়। চাঁদ নিয়ে সে কী করবে? মা যেমন খোঁপায় চুলদের আটকে রাখার জন্য চিরুনি লাগান, শিবঠাকুর তেমনি নিজেই জটাজুট সামলাতে ঐ চাঁদটাকে লাগিয়েছেন।

মুক্তিপদর তো ঝাঁকড়া চুলের বালাই নেই, দিব্যি ব্যাক-ব্রাশ চুল তার। চাঁদকে মাথায় করে রাখবার সখ নেইকো মোটেই। চাঁদ না হয়ে চন্দ্রপুলি হলে না হয় দেখা যেত।

'ও তো আধখানা চাঁদ, ও নিয়ে আমি কী করব? আপনি বুঝি আমায় অর্ধচন্দ্র দিচ্ছেন? ঘুরিয়ে অপমান করছেন আমায়?' ফোঁস করে ওঠে সে—'আপনি সোজা-সুজিই বলতে পারতেন, আমার মন্দির থেকে বেরিয়ে যাও।'

'না না। তা বলব কেন? তা কি বলতে আছে?' শিবঠাকুর শশব্যস্ত হন—'এত বড়ো ভক্ত তুমি আমার। তোমাকে আমি অমন কথা বলতে পারি কখনো? ভক্তাধীন ভোলানাথ, শোনোনি নাকি কথাটা?'

'তাই বলুন!'

'আমি ভাবছিলাম চাঁদের টুকরোটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে তুমি দেখতে যদি একবারটি। আর যদি তোমার পছন্দ হ'ত…'

'চাঁদে হাত দিতে যাব কেন আমি? আমি কি বামন নাকি যে…. ? বামনরাই তো চাঁদের দিকে হাত বাড়ায়। আমি বেশ ঢ্যাঙা, দেখছ না? এর মধ্যেই পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। বাবা বলছেন, আরো আমি ঢ্যাঙা হব। আমাদের বংশে সবাই নাকি তালগাছ!'

'তাহলে তো তুমি এমনিতেই চাঁদ পাবে। তালগাছের মাথাতেও চাঁদ থাকে। দেখা যায় প্রায়। দ্যাখোনি তুমি?'

'পুকুরের জলের মধ্যেও দেখেছি। ডোবার মধ্যেও আবার।'

'চাঁদের সঙ্গে আমাকেও তুমি ডোবালে দেখছি! ভারী ফ্যাসাদে ফেলবে আমায়। বর দেব বলে কথা দিয়েছি, অথচ কিছুই তোমায় দিতে পারছি না। কিছুই তুমি চাও না। অথচ দিতেই হবে আমায় কিছু। না দিয়ে উপায় নেই। নইলে আমার কথাটা মিথ্যে হয়ে যায়। মিথ্যে কথা আমি বলি না আবার। কী মুস্কিলে যে পড়লাম। আচ্ছা, তুমি কি কিছু খেতে চাও?'

খাবারের কথায় তার উৎসাহ দেখা দেয়—'কী খাওয়াবেন বলুন?'

'কী খাওয়ানো যায় তোমায় ভাবছি তাই।' শিবঠাকুর বলেন—'সত্যি বলতে, আমাকেই সবাই ভোগ দেয়, আমি কখনো কাউকে ভোগ দিইনি কোনো। এমন কি তোমার ওই পার্বতী ঠাকরুণকেও না। তোমার ভোগে কী লাগতে পারে ভেবে দেখি এখন…। তিনি ভাবতে থাকেন।

'তারকেশ্বরের ডাব ?' হাতের কাছে প্রথমেই তিনি ডাবটা পান, সেটাই পাড়েন সবার আগে।

'ডাব ? ডাব কেন ? আপনার সঙ্গে আমার তো আড়ি হয়নি যে ডাব দিয়ে ভাব পাতাতে হবে ?'

'তাহলে বৈদ্যনাথধামের প্যাঁড়া ? ...কাশীর মালাই-লচ্ছি ? কৈলাসের ভাং ?'

'ভাংটা কী জিনিস ?' জানতে চায় মুক্তিপদ।

কিন্তু মহাদেব ওর বেশি ভাঙতে যান না। ছোট্ট ছেলের কাছে নেশার কথা পাড়াটা ঠিক হবে না তাঁর মনে হয়।—নন্দী ভৃঙ্গী ঘোঁটে, তারাই বানায়, তারাই জানে কী জিনিস।

তারপর ঘুরিয়ে বলেন কথাটা—'ভাং মানে, এই সিদ্ধি আর কি—শুদ্ধ ভাষায় তুমি কি সিদ্ধিলাভ করতে চাও ?'

'একদম না।' ও তো সাধক লোকেরা চায়। আমি কি সাধক ? যোগী ঋষি আমি ? তাহলেও শুনি তো—'

'আমি খাই কেবল। মানে, আমি পান করি মাত্র।'

'খেতে কেমন ? সিরাপের মতন কি ? আখের রস যেমন ধারা হয়ে থাকে ? খেতে মিষ্টি হলে দিতে পারেন আমায়।'

'না, তা খেয়ে তোমার কাজ নেই। পানীয় তো আর খাদ্য নয়। ওতে পেট ভরে না। তোমাকে আর কী দেওয়া যায় দেখছি ...' মনে মনে তিনি দিগ্বিদিক ঘোরেন, যে খাবারগুলি তাঁর দিব্যনেত্রে দেখতে পান, আউড়ে যান ....

'মালদহের খাজা খাবে ? কেষ্টনগরে সরভাজা ? বর্ধমানের মিহিদানা ? রানাঘাটের ছানার জিলিপি ? জনাইয়ের মনোহরা ? পাঁশকুড়োর অমৃতি ? নাটোরের দেদোমণ্ডা ... ?'

'গণ্ডা গণ্ডা ?' মুক্তিপদ বাধা দিয়ে জানতে চায়।

'যতো চাও ! বাগবাজারের রসগোল্লা ? ভীমনাগের সন্দেশ ? ....'শিবঠাকুরের ফিরিস্তি আর ফুরোয় না : 'চাই তোমার ? কোন্‌টা চাই বলো আমায় ? না, সবগুলোই চাও তুমি ?'

'আমার জন্যে হয়রান হয়ে ঘুরে আপনি যোগাড় করবেন তা আমি চাই না, আপনার হাতের কাছে যা আছে তাই আমায় দিন।'

'হাতের কাছে ? পার্বতী দেবীর ঐ স্বর্ণমুকুটটা চাও বুঝি ?' তিনি দেবীর দিকে হাত বাড়ান।

'না না। সোনার মুকুট নিয়ে আমি কী করবো ? ওটা তো পরাও যাবে না ! পরতে গেলে লাগবে আমার মাথায়। তাছাড়া মুকুট পরে বেরুলে পাড়ার ছেলেরাই বা বলবে কী ?'

'তাহলে কী তোমার চাই বলো তাই।'

'আপনার মাথার ওপরে ঐ যে ঘণ্টা ওটাই আমি চাই—ঐটে আমায় পেড়ে দিন !'

'বাঁচালে !' বলে হাঁফ ছেড়ে মহাদেব ওর হাতে ঘণ্টাটা তুলে দেন। দিয়েই অন্তর্ধান হন।

মুক্তিও ঘণ্টা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসে।

ঘণ্টাটা তাকে কষ্ট করে বাজাতেও হয় না। ওর লাফ-ঝাপের দাপটে সেটা আপনিই বাজতে থাকে।
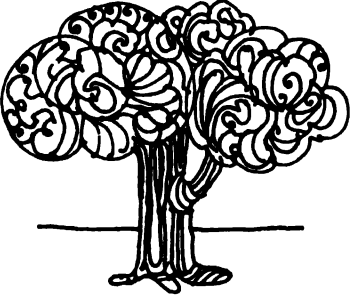
লাল গরুটা

সত্যেন সেন

লাল গরুটা বুড়ো হয়ে গেছে। দুধও দেয় না, কোন কাজেও লাগে না। বাড়ির কর্তা নিধিরাম বলল, এটাকে রেখে আর কি হবে ? দু'চার টাকা যা পাই,তাতেই বিক্রী করে একটা দুধালো গাই কিনে নিয়ে আনাই ভাল। আমরা গরীব মানুষ, আমরা কি আর বাজার থেকে দুধ কিনে খেতে পারি ?

নিধিরামের বউ বলল, এমন কথা বলো না গো, অধর্ম হবে। আমার শাশুড়ীর বড় আদরের ছিল গরুটা। বড় লক্ষ্মী আর শান্তস্বভাব, একটু ঢুঁ-টাও মারে না। এরকম গরু হয় না। এতকাল মায়ের মত আমাদের দুধ খাইয়ে এসেছে, আর এখন ক'টা টাকার লোভে আমরা ওকে কশাইয়ের কাছে বেচে দেব ?

না না, কশাইয়ের কাছে বেচব কেন ? নিধিরাম বলল, যারা চাষবাস করে খায়, এমন লোকের কাছেই বেচব।

নিধিরামের বউ চাষীর ঘরের মেয়ে, চাষীর ঘরের বউ, সব খবরই রাখে। সে অবিশ্বাসের সুরে বলল, হ্যাঃ, ওকে দিয়ে কি আর চাষের কাজ চলবে ? বুড়ো হয়ে রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছে। দেখছো না হাড় ক'খানা মাত্র বাকী আছে। যেই ওকে কিনুক, দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক, কশাইয়ের কাছে বেচে দেবেই।

তবে করব কি ? নিধিরাম একটু গরম হয়েই বলল, এই অকম্মা গরুকে আর কতকাল বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব ? যাদের টাকার জোর আছে, তারা তা পারে। আমাদের গরীব মানুষের কি আর সেই সাধ্য আছে ?

নিধিরাম মিছে কথা বলে নি। কিন্তু তার বউ কিছুতেই সে কথা শুনতে চায় না। সে বলল, দেখ, আমরাও একদিন বুড়ো হব, আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি তখন বলে, তোমরা বুড়ো হয়ে

গেছ, কোন কাজেই লাগ না। তোমাদের আমরা আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না। তখন আমাদের কেমন লাগবে? আর আমরা যাবই বা কোথায়?

মানুষ আর গরু এক নয়, এ ঠিকই কথা। কিন্তু নিধিরামের বউ-এর মন কিছুতেই মানতে চায় না। আহা, এতদিনের গরুটা। সে বার বার কেবল এই কথাই বলে, আর নিধিরামের কাছে বকুনি খায়।

ছেলেমেয়েরা কথাটা জানতে পেরে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। লাল গরুটাকে ছেড়ে তারা কিছুতেই থাকতে পারবে না। বাড়িশুদ্ধ সব একদিকে আর নিধিরাম একদিকে। কিন্তু নিধিরামের গোঁ বড় বিষম গোঁ। বাধা পেলে তার জিদ্‌টা আরও বেড়ে ওঠে।

নিধিরাম মুখটা ভারী করে বলল, আমার গরু আমি যা খুশী করব, তোমরা কেউ এর মধ্যে কোন কথা বলতে এসো না। আমিই ওকে কিনে এনেছিলাম, আমিই ওকে বিক্রী করব।

নিধিরামের পাঁচ বছরের ছেলে বিশু সটান দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল, আমার গরু। কাউকে বিক্কিরি করতে দেব না।

ওর মুখের ভাব আর কথার ভঙ্গীতে এত দুঃখের মধ্যেও সবাই হাসল। বিশু কাউকে ভয় করে না। এমন-যে বদমেজাজী বাপ, তাকেও না।

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশু দ্বিতীয় বার গম্ভীরভাবে তার ঘোষণা জানাল—আমার গরু।

তোর গরু? তোর গরু আবার কেমন করে হোল? নিধিরাম জিগ্যেস করল।

বিশু বলল, আমারই তো, আমি-যে রোজ ওকে ঘাস খাওয়াই।

কিন্তু যে যতই বলুক না কেন, কারুই কোন কথা খাটল না। নিধিরাম লাল গরুটাকে মাত্র কুড়ি টাকায় বিক্রী করে দিল। দু ক্রোশ দূরে সোনাকান্দা গ্রাম। সেখানকার একজন বুড়ো লোক তাকে কিনে নিয়ে গেল।

লাল গরুটার সাদা সরল মন। সে এত সব কিছু জানে না। ভাবতেও পারে নি। সারা জন্ম তার এই বাড়িতেই কেটে গেল। এ সব বেচাকেনার খবর সে রাখে না। যে-মানুষগুলোকে সে এত ভালবাসে, তারা-যে তার সঙ্গে এমন করতে পারে, সে তা কেমন করে বুঝবে? ভাবল, একটা বুড়ো লোক তাকে মাঠে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে চলেছে। অবশ্য তার সঙ্গে ওর জানাশোনা নেই। নাই বা থাকল। ওর ঘাস খাওয়া নিয়ে কথা। সে কোন আপত্তি না করে দিব্যি তার পেছন পেছন চলে গেল। আর ঠিক সেই সময়টায় নিধিরামের বউ তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাশের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। এ কি চোখের সামনে দেখা যায়।

তারপর ফিরে এসে যখন শুনল লাল গরুকে নিয়ে গেছে, তখন বিশুর কি কান্না। তাকে সামলানো মুসকিল হয়ে উঠল। ছেলেমেয়েদের সবার মুখই ভার। ছেলেমেয়েদের মায়ের অবস্থাও তাই। সেদিন বাড়ির কারুই ভাল করে খাওয়া হোল না। কিন্তু নিধিরামকে কেউ কিছু বললে না। কেউ কিছু বললে সে নিশ্চয়ই খুব রেগেমেগে উঠত। রাগবার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েও ছিল। কিন্তু কেউ তাকে সেই সুযোগ দিল না। নিধিরাম এমন বিপদে আর কখনও পড়ে নি। কি আশ্চর্য, এমন যে তেজস্বী নিধিরাম, সে যেন ঠাণ্ডা-জল হয়ে গেল। বাড়িতে আর আসতে চায় না। চোরের মত এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এর সাত আট দিন বাদে এক অবাক কাণ্ড। বিকাল বেলা লাল গরুটা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। নিধিরাম উঠানের ধারে বসে বেড়া বাঁধছিল। আর এদিক ওদিক নয়, লাল গরুটা সোজা তার কাছে গিয়ে লম্বা মুখটা তার কাঁধের উপর তুলে দিল। ঠাণ্ডা নাকটা গায় লাগতেই নিধিরাম

চমকে উঠল, এটা আবার কি? ওমা, এ-যে লাল গরুটা। অ্যাঁ, কেমন করে এসে পড়ল? লাল গরু তার ডাগর ডাগর চোখ দুটি ওর মুখের দিকে তুলে ধরল। ওর চোখ দুটো যেন কথা বলছে। যেন বলছে, তোমার এ কেমন আক্কেল বল তো? আমাকে একা একা কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিলে? আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি? গরু তো মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না। কিন্তু মনে মনে সে এই কথাই বলছিল।

তারপর তাকে নিয়ে বাড়িশুদ্ধ হৈ হৈ পড়ে গেল। ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি মাতামাতি, নাচানাচি সুরু করে দিল। বিশু লাল গরুর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমার গরু। সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত লাল গরুর কথাই চলল। নিধিরাম কিন্তু মাথা নীচু করে চুপ করেই রইল। ভালমন্দ কোন কথা বলল না।

কিন্তু এ আনন্দ যে বেশীক্ষণের জন্য নয়। পরদিন বেলাটা একটু উঠতেই সোনাকান্দা থেকে তিনজন লোক এসে হাজির। বুড়ো লোকটাও তাদের সঙ্গে আছে। ওরা পালিয়ে-যাওয়া গরুটার খোঁজে এসেছে। বিশু তার লাল গরুকে তখন ঘাস খাওয়াচ্ছিল। ওদের দেখেই গরুটার চোখে সে কি আতঙ্ক।

নিধিরামের সঙ্গে দু একটা কথা বলে ওরা গরুটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সে কি যেতে চায়। চারটা পা খুঁটার মত শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। সে হয়তো মনে মনে আশা করছিল, নিধিরাম ওকে এসে সাহায্য করবে। সেই আশায় সে হা করে ডেকে উঠল। কিন্তু কেউ ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। ওরা তিন জন আর সে একা। কতক্ষণ আর ওদের রুখবে। ওরা তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। লাল গরু ফিরে ফিরে পেছন দিকে তাকাচ্ছিল। সবাই পরিষ্কার দেখতে পেল, ওর বড় বড় চোখ দু'টি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। ছেলেমেয়েরা কেঁদে উঠল। ওদের মা মুখ ফিরিয়ে মুখে কাপড় গুঁজল। আর নিধিরাম? নিধিরাম কি করল? সে হন হন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই যে গেল, গেলই, সারাদিন আর ফিরল না। নিধিরামের বউ গরুর চিন্তা ভুলে গিয়ে স্বামীর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল। বলা নেই, কওয়া নেই, গেল কোথায়? এমন তো কোনদিন করে না।

সন্ধ্যা লাগে লাগে ঠিক এমন সময় নিধিরামের বাড়িতে গত দিনের মতই আবার হৈ চৈ পড়ে গেল। নিধিরাম ফিরে এসেছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের এত আনন্দ সেই জন্যই কি? না, তা নয়। নিধিরাম লাল গরুটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

নিধিরামের বউ অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, এ আবার কি? নিধিরাম ঝাঁঝালো সুরে উত্তর দিয়ে বলল, কি করব? তোমাদের জ্বালায় কি আর পারবার উপায় আছে? গরুটা ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। উল্‌টে আরও দশটা টাকা গচ্চা লাগল।

গচ্চা লাগল কি রকম?

টাকা ফেরত দিতে গেলাম, আর ওরাও পেয়ে বসল। বলে, তোমার গরু আমাদের এই ক্ষতি করেছে, ওই ক্ষতি করেছে। ক্ষতির এক লম্বা ফিরিস্তি দিল। কি আর করব, শেষ পর্যন্ত আরও বাড়তি দশটা টাকা আদায় করে ছাড়ল।

নিধিরামের বউএর চোখমুখ খুশীতে হেসে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হাসিটা চাপা দিয়ে সে বলল, বিক্রী করেছিলে করেছিলে, আবার কি দরকার ছিল ফিরিয়ে আনবার? সত্যি কথাই তো, এই অকম্মা গরুটাকে কি দরকার আমাদের?

নিধিরাম এবার হেসে ফেলল। বাবাকে হাসতে দেখে ছেলেমেয়েরাও সবাই তাকে ঘিরে ধরল। এক দিন বাবার উপর মনে মনে কি-যে রাগ হয়েছিল! আজ সবার মন হালকা হয়ে গেছে। বাবাকে যত খারাপ মনে হয়, আসলে বাবা তত খারাপ নয়।
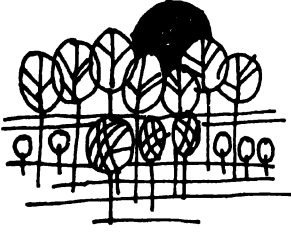
কুঁকড়ো

লীলা মজুমদার

তা অমন সুন্দর পাখি, ঘরে একটু ময়লা করলে কি হয়—কুমু ভেবে পায় না। দেখতে দেখতে শুকিয়ে খরখর করে, কুমু হাতে করে তুলে ফেলে দেয়। হাতও ধোবার দরকার হয় না। কেউ টেরও পায় না। এক যদি না দেখে ফেলে। এত রাগের কোনো মানেই হয় না, কাকীর খোকাটা কি কম নোংরা, যাক্ গে সে কথা।

কাকী নাকি ভারি সুন্দরী, সবাই তাই বলে। শুনে কুমুর হাসি পায়। কুঁকড়োর কাছে ঐ কাকী! কুঁকড়োর মতো সাদা ধবধবে গা, হলদে চকচকে পা, লাল টুকটুকে ঝুঁটি আছে কাকীর ? প্রথমটা ছাড়ে নি কুমু। আড় চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ময়লা করলে তো আমি ফেলি। কুঁকড়োকে রাতে কাঠ-গুদোমে রাখলে, কাকীর মুন্নুকে সেখানে রাখতে হবে।'

কাকী রেগেমেগে মুন্নুকে কোলে তুলে, দুমদুম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল। রাগের চোটে খোঁপা খুলে গেল, এক রাশি কালো কোঁকড়া চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়ল। মুন্নু তার এক মুঠো মুখে পুরে কেশেটেশে একাকার।

তখন বাবা বলল, 'ছিঃ, কাকীকে কড়া কথা বলতে হয় না। ছেলেমানুষ তো।' কুমু শুনে অবাক। ঐ বুড়োধাড়ি নাকি ছেলেমানুষ, বাবা যে কি বলে! কুঁকড়োর গলা জড়িয়ে সে আবার শুয়ে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু কুঁকড়ো থাকলে তবে তো! বাইরে খড়ের গাদায় চড়ে, সে ডানা ঝাপটাতে লাগল। কি ভাল দেখতে কুঁকড়ো। যখন এত্তটুকু তুলোর গুলির মতো ছিল, তখন কাকুই এনে দিয়েছিল। কিন্তু আজকাল ওকে দেখলেই বলে—'ইস্, জিবে জল আসছে যে রে কুমু! দে না আমাকে!' অবিশ্যি দেয় না কুমু। রাতে কুঁকড়ো ঘরের কোণে সেঁদিয়ে চুপচাপ থাকত। ভোর হলেই কুমু দরজা খুলে দিত। তার পর একদিন অন্ধকার একটু ফিকে হতেই, খুদে ঘুলঘুলি দিয়ে মুণ্ডু বের করে কুঁকড়ো বলল, কঁকর—কঁকর—কঁকর–কঁকর কুক্রু-কু! বাবা

রেগে গেল, 'এ্যাই কুঁকড়ো, চোপ!' কুঁকড়ো বলল 'কঁকর কঁকর কঁকর, করবি কি তু? কুক্‌রু-কু!

তারপর চোখ লাল করে বাড়িসুদ্ধু সবাই উঠে এসে কুঁকড়োর গলা ধরে টেনে ঘরের বার করে দিল। কুঁকড়োর অমনি ডানা ঝাপটে, খড়ের গাদায় চড়ে, আকাশের দিকে মুখ তুলে, গলা ছেড়ে ডাক দিল, 'কুক্‌রু কু, আর কত ঘুমুবি তু?' আর এধার থেকে, ওধার থেকে বাঁশ বাগানের ওপার থেকে, শিমলি নদীর ঘাট থেকে, পাহাড়তলির বাট থেকে, পঁচিশ পাখি গলা ছাড়ল, কুক্‌রু কু! আমি মু!' আর ঘুমোয় কার সাধ্যি! গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে সবাই উঠে পড়ল। সবার মুখ গোমড়া, খালি মুন্নু তার ফোকলা মুখের একটা দাঁত বের করে বলল, 'কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্-কঁক্।' কাকী তাকে ধরে দিল ঝাঁকি। মুন্নু অমনি ভ্যাঁ!

সেই দিন থেকে কুঁকড়োর জায়গা হল কাঠ-গুদোমে। সেখানে পাহাড়তলির বন থেকে বাবা কাকা কাঠ টেনে এনে, সারা বছরের জন্য রোদে শুকোয়, শুকিয়ে ঠনঠনে হলে কাঠ-গুদোমে তোলে। সেখানে কুঁকড়ো হয়তো সুখেই থাকে। বেড়ে জায়গাটা, ধুনো-ধুনো মিষ্টি গন্ধ, চেলা-কাঠ থেকে সুবাস ছাড়ে। কিন্তু অন্ধকারে একা থাকে কুঁকড়ো। কুমুর কান্না পায়।

একদিন সকালে ঝমরু এসে বলল, 'মোরগ আগ্‌লে রাখিস্। এ-সময় বন থেকে শ্যাল নামে। শীতকালে সব ছোট জানোয়ার লুকোনো জায়গায় ঘুম দেয়। খিদের চোটে শ্যালরা গাঁয়ে আসে।'

কুমু বলল, 'আমার কুঁকড়ো কাঠ-গুদোমে শিকলি-বন্ধ থাকে।' ঝমরুর কি হাসি। 'গুদোমের দ্যালের আর চালের মধ্যে ফাঁক আছে না? বাইরে খড়ের গাদায় চড়ে সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকতে কতক্ষণ।

'দেখতে পাবে না।' 'গন্ধ পাবে। কুঁকড়োর গায়ে বোঁটকা গন্ধ। তাছাড়া শ্যালরা অন্ধকারে দেখতে পায়, নইলে রাতে বনে শিকার ধরে কি করে।'

কুমুর বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। মুখে বলল, 'ধ্যেৎ! বনের জানোয়ার গাঁয়ের মধ্যিখানে ঢুকবার সাহস পাবে না। গাঁয়ের লোকরা তীর-ধনুক নিয়ে তাড়া করবে না!' কিন্তু এরপর রোজ লোকের হাঁস-মুরগি রাতারাতি উবে যেতে লাগল। চারদিকে শেয়ালের পায়ের ছাপ!

রাতটা ভয়ে ভয়ে কাটত। ভোরে কুঁকড়োর কুক্‌রু-কু শুনে তবে কুমু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোত! এক দিন ঘুম ভাঙতেই মায়ের কাছে শুনল বাসু মামাদের বাড়ির হাঁসের ঘরের চাটাইয়ের দেয়ালে গর্ত করে দুটো হাঁস নিয়ে গেছে আর তিনটে হাঁসকে মেরে রেখে গেছে। তারা নাকি ধুলোর ওপর পা টান করে পড়ে আছে। গলা কামড়ে নিয়েছে, চারদিকে রক্ত-রক্ত!

কুমুর কান্না দেখে মা ঘাবড়ে গেল। 'আরে কি জ্বালা! বাসুরা আজ থেকে তীর-ধনুক নিয়ে পাহাড়তলির পথ পাহারা দেবে। শ্যাল বাছাধনরা কেমন আসে দেখা যাবে!'

সে রাতে মোড়লের বাড়ি থেকে এক-দিন বয়সের দুটো পাঁঠার ছানা চুরি গেল। কেউ বলল মানুষ নিয়েছে, কেউ বলল শ্যাল। বাঁধানো উঠোন, তাই ছাপ পড়েনি। মোড়লের লোকেরাও তীর-ধুনক বের করল। মারাও পড়ল কয়েকটা শেয়াল। তাদের লাসগুলো বাঁশে ঝুলিয়ে গাঁয়ে আনা হল। গায়ে তখনো তীর বেঁধা। মরা শ্যালের গায়ে ছেলে-বুড়ো বাখারির খোঁচা দিতে লাগল। কুমু বাড়ি গিয়ে বমি করে, শুয়ে রইল। দুপুরে ভাত খেল না।

কাকী মহা বিরক্ত। 'এ কি বাড়াবাড়ি বাপু! তোর কুঁকড়ো তো ঘরেই আছে। শ্যালের যা উপদ্রব! মেরেছে বেশ করেছে। তা একটু আনন্দ-ও করবে না?' কুমু বলল, 'ওয়াক্!' কাকী ...স।

সারারাত পড়ে পড়ে ঘুমুল কুমু। পরদিন সকালে কুঁকড়ো চুপ। কাঠ-গুদোমের দরজা খুলে কুমু দেখল চালের কাছে এতটা ফাঁকা, তার নিচে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। কুঁকড়ো নেই।

চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে কুমু ছুটে বেরিয়ে এল। সব শুনে সবাই চুপ। খালি কাকা বলল, 'তখনি বললাম জিবে জল আসে, আমাকে দে। তা তো শুনলি না!' কুমু সেখান থেকে ছুটে পালাল।

এরপর আরো দু-দিন কাটল। আরো দু-দশটা পাখি ম'ল। চারটে শেয়ালও তীর খেয়ে ম'ল। তাদের শরীরগুলো পরদিন সকালে গাঁয়ের মধ্যিখানে, যেখানে পুজোর সময় যাত্রা হয়, সেই মাঠে একটা তেঁতুল-গাছ, তার ডাল থেকে ঝুলিয়ে রাখা হল। গাঁয়ের সবাই দেখতে এল। ছোটরা দূর থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। খুব সাহসীরা কাছে গিয়ে খোঁচাও দিল। কুমুও গেছিল মজা দেখতে। একটা ঢিল-ও ছুঁড়েছিল। তারপর হঠাৎ চোখ পড়ল মরা শ্যালটার জিব ঝুলে আছে, চোখ উল্টে গেছে।

আর কি সেখানে দাঁড়ায় কুমু! এক ছুটে বাড়ি গিয়ে সারাদিন কেঁদে ভাসাল। শ্যাল ম'ল, কিন্তু কুঁকড়ো তো আর ফিরে এল না। বগ্‌ড়ি, ঝমরু, শালিনী এরা তো অবাক! মোরগ গেছে শ্যালের পেটে, সে আবার ফিরবে কি করে! কুমু রেগে বকাবকি করতে লাগল। ওরাও সরে পড়ল।

মোড়লের হুকুম—খিদের চোখে শেয়ালের পাল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, তার যেন একটাও বাকি না থাকে। হয় তাড়াও, নয় মার! গাঁ-সুদ্ধু সবাই খুশি। তীর-ধনুক দা-কুড়ুল নিয়ে সব বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন শ্যাল শিকার চলল।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে কেউ নেই। মা আর কাকী গেছে ঠাকুরবাড়িতে, আনন্দ-নাড়ুর জন্য নারকেল কোরা, চাল কোটা হবে। বাবা, কাকা, বড়দাও দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিকট হৈ-হৈ শোনা যাচ্ছে। শেয়ালের পাল এবার মজা বুঝছে। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে!

এমন সময় কলা-বাগানের মধ্যে দিয়ে কি একটা সাদা রঙের জানোয়ার মাটিতে গা ঘষটাতে ঘষটাতে, লাল চোখ দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে, হাট করে খোলা কাঠ-গুদোমের দরজার কাছে পৌঁছে, মানুষের মতো গোঙাতে গোঙাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার পেটের কাছে দুটো তীর বিঁধে আছে, রক্ত পড়ছে। দূরে, গাঁয়ের লোকদের হো-হো শুনে, জানোয়ারটা নিজের শরীরটাকে টেনে টেনে কোনোমতে গুদোম-ঘরে ঢুকে, আবার পড়ে গেল। কুমুর বুক টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল, গলা শুকিয়ে কাঠ।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দু-চারজন বাইরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। কুমু কাঠ-গুদোমের দরজা বন্ধ করে, বাইরে থেকে শিকলি তুলে, দু-ফোঁটা রক্ত পড়েছিল তার ওপর মাটি ছড়িয়ে দিল। ঠিক কুঁকড়োর রক্তের মতো। বাবা কাকা এসে দেখল বাড়ি চুপচাপ, কুমু চোখ বুজে শুয়ে আছে। 'এখানে নেই, এখানে নেই, এগিয়ে চল! ঐ বুঝি পালায়!' আবার সব চুপচাপ।

পরদিন সকালে কাঠ-গুদোমের দরজা খুলেই মা একেবারে থ'। দোরের সামনে এতখানি জায়গা জুড়ে মা-শেয়ালটা মরে পড়ে আছে আর তার কোল ঘেঁষে এতটুকু একটা বাচ্চা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। দুজনার রঙ প্রায় সাদা। মায়ের বগলের তলা দিয়ে গলে, বাচ্চাটাকে তুলে বুকে জড়িয়ে কুমু আবার গিয়ে শুল। মা দেখল কি দেখল না বোঝা গেল না।

শেয়াল শিকারের কথা শুনে খবরের কাগজের লোকেরা জীপে চড়ে এসেছিল। সাদা শেয়াল শুনে তারা দেখতে এল। কি দুঃখ তাদের! 'আহা! মেরে ফেললেন! সাদা শেয়ালের অনেক দাম! খুব একটা দেখা যায় না। এ জানোয়ার কি মারতে হয় কখনো!' তখন কাকা বলল, 'যিনি এ-কথা বললেন তিনি নাকি পশু-সংরক্ষণের লোক। ওরা নাকি জানোয়ার বাঁচায়, মারে না।' তাই শুনে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে কুমু বেরিয়ে এল। সবাই তো হাঁ!

সেই লোকটির কোলে বাচ্চাটাকে দিয়ে কুমু বলল, 'ওর নাম কুঁকড়ো। ওকে বাঁচাও, মেরো না।' বলে দৌড়ে পালাল।
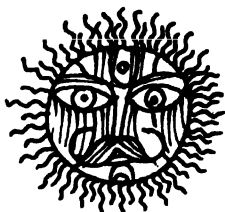
অসহযোগী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেনের বাবা হর্ষনাথ ধনেশগঞ্জের মস্ত আড়তদার।

বছরখানেক আগে রমেনকে সে তার পিসতুতো ভগ্নীপতি সূর্য্যপদর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল—ছেলেটাকে একটু শান্তশিষ্ট ভদ্র বানাবার আশায়। রমেন একেবারে মারাত্মক রকম দুরন্ত হয়ে উঠেছিল, কিছুতেই সে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। দু'তিনবার কোর্টে পর্যন্ত তাকে দৌড়তে হয়েছিল ছেলের জন্য। শেষে রমেন যখন একদিন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বসুর ছেলেকে মেরে রক্তারক্তি করে দিল, তখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারল যে এ ছেলেকে সামলে চলা তার সামর্থ্য নয়। এ ছেলে তার সর্বনাশ করবে। যুদ্ধের বাজারে কতভাবে কত কামাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চটালে রক্ষা আছে!

দামী দামী ভেট নিয়ে সে সটান গিয়ে হাজির হল একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহাবের বাড়িতে, মার-খাওয়া ছেলেটির জন্যই উপহার রইল দু'শো টাকার। লুটিয়ে পড়ল মিসেস্ বসুর পায়ের তলে, প্রার্থনা করল রমেনের নিস্তার। ছেলের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবে আগেই ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল, তাই বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিল যে, ভয় পেয়ে রমেন কোথায় পালিয়ে গেছে, ফিরে এলে খুঁটিতে বেঁধে তাকে চাবকে লাল করে দেবে।

সেইদিনই রমেনকে নিয়ে সে কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেল, ছেলেকে সূর্য্যপদর জিম্মা করে দেবার জন্য।

রমেনের মা একটু আপত্তি করেছিল!

'উনি স্বদেশী-টদেশী করেন শুনেছি, খোকাকে আবার না বিগড়ে দেন।'

হর্ষনাথ বলেছিল, 'স্বদেশী না ছাই! জেলে যেত না স্বদেশী করলে? ওসব টাকা উপায়ের ফিকির। ছেলেদের নিয়ে দলটল সমিতি টমিতি করে চাঁদা তুলবার জন্যে। মাস্টারিতে কি কারও পেট চলে?'

শহরতলিতে সূর্য্যপদর বাড়ি। এক রাত্রির বেশী হর্ষনাথ থাকতে পারে নি। তার কত কাজ ধনেশগঞ্জে। সূর্য্যপদকে সব জানিয়ে অনুরোধ করেছিল, 'ছেলেটাকে তোমার মানুষ করে দিতে হবে ভাই। শুধরে দিতে হবে।'

সূর্য্যপদ হেসে বলেছিল, 'দেব। ছেলেকে তোমার মানুষ করে দেব।'

একটা সর্ত করেছিল সূর্য্যপদ যে, এক বছরের মধ্যে রমেনকে ধনেশগঞ্জে নেওয়া চলবে না আর সোজাসুজি রমেনকে টাকা পাঠানো চলবে না। হর্ষনাথ রাজি হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

রমেনের খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলে সূর্য্যপদ মোটে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি গরিব মাস্টার, তোমার ছেলের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু পঁচিশ টাকার বেশি খরচ ওর লাগবে না।'

পরের মাসে হর্ষনাথ পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিল! কয়েকদিন পরে পঁচিশ টাকা ফেরত আসায় খুশি হয়ে রমেনের মাকে বলেছিল, 'না, লোকটা সত্যি ভালো। ছেলেটাকে শুধরে দিতে পারবে বলে মনে হয়।'

একবছর পরে পূজোর ছুটিতে রমেন বাড়ি এল।

তাব পরিবর্তন দেখে প্রথম ক'দিন হর্ষনাথ পরম খুশি। যেমন চেহারায় কথায় ব্যবহারেও তেমনি সে শান্তশিষ্ট-ভদ্র হয়ে এসেছে। উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা কিন্তু তাও আঁচড়ানো, জামা-কাপড় সস্তা-দামের কিন্তু দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—মুখখানা হাসিখুশি, কথা মিষ্টি, চালচলন নম্র। গুণ্ডার মত চেহারা নিয়ে সারাদিন সে টো টো করে ঘুরে বেড়াত, খেলা আর মারামারি নিয়ে মেতে থাকত এমনি সে চঞ্চল ছিল এক বছর আগে, অকাজের পর অকাজ না করলে তার স্বস্তি ছিল না। একটা কথা কোনদিন সে কারো শুনত না। সে চাপল্য, শয়তানী আর অবাধ্যতা কোথায় উড়ে গেছে!

সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়ায়, এই যা একটু দোষ! কিন্তু কোন অপকর্ম্মের খবর না পেয়ে এবং বাড়ি ফিরলে ছেলের দেহে বা কাপড় জামায় দুরন্তপনার চিহ্ন না দেখে হর্ষনাথ নিশ্চিন্ত হয়। ভাবে এত দিন পরে দেশে এসেছে, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে হয় তো আড্ডা দিচ্ছে সাধ মিটিয়ে। ওতে আর কি আসে যায়?

দিন সাতেক পরেই কিন্তু মনে তার খটকা লাগে!

আড়ত থেকে ভাত খেতে বাড়ি ফিরে দ্যাখে কি, শ'তিনেক দুর্ভিক্ষের কাঙালি মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো বাড়ির পাশে ফাঁকা বটগাছ তলায় পাত পেতে ভাত খাচ্ছে, পরিবেশন করছে রমেন আর তারই বয়সী পঁচিশ-ত্রিশটি ছেলে।

দেখে মুখ হাঁ হয়ে যায় হর্ষনাথের।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে ধপাশ করে বসে পড়ে ছেলেকে সে ডেকে পাঠায়।

'এসব কি হচ্ছে?'

রমেন তখন উৎসাহে ফুটছে।—'ওদের খাওয়াচ্ছি বাবা! কত হিসেব করে খাওয়াতে হচ্ছে জানো? কদ্দিন ধরে খায় না, বেশী খেলেই মরবে। তা কি বোঝে ব্যাটারা? সবাই চেঁচাচ্ছে—আরো দাও, আরো দাও! সামলানো দায়।'

'চাল ডাল সব পেলি কোথা?'

'মা দিয়েছে।'

রমেনের মা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আহা আব্দার ধরেছে, খাওয়াক না। সবাই আশীর্বাদ করছে। ভাল হবে।'

'ভাল হওয়াচ্ছি'।

বাড়ির ভাঁড়ারটাই প্রায় ছোটখাট একটি গুদাম ঘর। আগে হর্ষনাথ রমেনের মার কাছ থেকে ভাঁড়ারের চাবি সংগ্রহ করল তারপর বটতলার খাওয়া শেষ হলে সকলকে হাঁকিয়ে দিল।

আঁধার নেমে এল রমেনের মুখে। সে বলল, 'আমি ওদের সাতদিন রোজ খাওয়ার কথা বলেছি বাবা। তারপর ওরা গাঁয়ে ফিরে যাবে।'

'চুপ কর্, বেয়াদপ কোথাকার! সাতদিন ধরে খাওয়াবে! আমাকে ফতুর করার মতলব!

দিন যায়। প্রতিদিন চারিদিকে অসহায় ক্ষুধিতের কান্না হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে। রমেন আর হাসে না। খেতে বসে ভাত ছড়িয়ে উঠে যায়। দুধ পড়ে থাকে দুধের বাটিতে, সন্দেশ পিঁপড়েয় খায়।

হর্ষনাথ রাগ করে বলে, 'কি জ্বালা বাপু! কেন হয়েছে কি?'

'সবাই না খেয়ে মরে যাবে, তুমি কিছু করবে না বাবা?'

'দিলাম যে কুড়িমণ চাল রিলিফে?'

'কুড়ি মণ! তোমার আড়তে হাজার হাজার মণ চাল রয়েছে। সবাই ছি ছি করছে বাবা। সবাই আমায় ঘেন্না করছে তোমার ছেলে বলে।'

'চুপ কর্! বেয়াদব কোথাকার!'

দুদিন রমেনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রমেনের মা কেঁদে-কেটে অস্থির হয়। মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হলেও হর্ষনাথ বাইরে মুখ গম্ভীর করে থাকে। রাগে ভয়ে দুশ্চিন্তায় তার মেজাজটা যায় বিগড়ে। ভাবে, রমেন ফিরলে মেরে তাকে আস্ত রাখবে না। দুদিন পরে রমেন ফিরলে তার চোখের চাউনি দেখে দুটো ধমক দিতেও কিন্তু তার সাহস হয় না। কেমন এক খাপছাড়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে রমেন আজকাল তার দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছিল, দেখে তার কেমন ভয় ভয় করে।

'কোথা গিয়েছিলি না বলে?'

'অনাথবাবুর সঙ্গে সাত গাঁয়ে।'

অনাথবাবুর সঙ্গে! তার পরম শত্রু অনাথবাবু, এই সেদিন যার জন্য প্রায় হাজার মণ চাল গুদামে তোলার বদলে বাঁধা দামে বিক্রি করে দিতে হয়েছে তাকে।

রমেন আবেদন আর আব্দারের সুরে বলে, 'কি অবস্থা হয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না বাবা। তুমি এক কাজ কর বাবা। যে দামে কিনেছিলে, এক টাকা লাভ রেখে চাল বেচে দাও। তোমার তো লোকসান হবে না, কত লোক বাঁচবে ভাব দিকি!'

'লোকসান হবে না, না? চল্লিশ টাকার জায়গায় চোদ্দ টাকায় বেচলে লোকসান হবে না, কি হিসেব তুই শিখেছিস্?' কথাটা হর্ষনাথ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

তখন রমেন বলে, 'তা হলে তোমার সব চাল আমি বিলিয়ে দেব, বাবা। আগে থেকে বলে রাখলাম। তোমায় আমি মানুষ খুন করতে দেব না।'

'ছোট মুখে বড় কথা বলিসনি, থাবড়া খাবি।'

'বলে রাখলাম। দেখো।'

ছেলেমানুষের হালকা কথা, কে তা মনে রাখে? আড়তে তার কত লোকজন, গুদোম তালাবন্ধ, চাইলেই কি আর চাল বিলিয়ে দিতে পারবে রমেন—পঞ্চাশজন বন্ধু আর অনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এলেও নয়।

সেজন্য হর্ষনাথের ভাবনা হল না। ছেলের পাগলামি দেখে মনটা শুধু খারাপ হয়ে গেল। কি কুক্ষণেই ছেলেকে মানুষ হতে পাঠিয়েছিল সূর্য্যপদর কাছে! এর চেয়ে ছেলেটা শয়তান-গুণ্ডা থাকাও ভাল ছিল—বয়স বাড়লে আপনি শুধরে যেত।

দিন কতক পরে হর্ষনাথ ব্যবসার কাজে তিন দিনের জন্য বাইরে গেল। আড়তে বলে গেল, রমেন এসে গোলমাল করলে যেন ভালভাবে শাসন করে দেওয়া হয় আর অনাথ এসে হাঙ্গামা করলে যেন সোজা পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। একবার থানাটাও ঘুরে গেল, অনাথ কি ভাবে তার ছেলের মাথা বিগড়ে দেবার চেষ্টা করছে জানিয়ে দেবার জন্য।

পরদিন সকালে আড়তে ও আড়তের সামনে হৈ হৈ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। নিতাইচরণ আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী, বাবু নেই বলে আড়ত খুলতে লোক পাঠিয়ে নিজে একটু বেলা করে হেলতে দুলতে এসে দ্যাখে কি, প্রায় শ'পাচেক লোক জমা হয়েছে আড়তের সামনে।

তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে নিতাইচরণের চক্ষুস্থির! আড়তের যে কোণে হাজার টিন তেল ছিল পরশু পর্যন্ত, সেখানে মেঝেতে তেল আর ময়লার পুরু পাঁকের ওপরেই আড়তের সবাই বসে আছে। তফাতে হর্ষনাথের দু'নলা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রমেন। রমেনের সমবয়সী ছেলেতে আড়ত বোঝাই?

'আসুন নিতাই কাকা। গুদোমের চাবিটা দিন তো।'

'চাবি? চাবি কোথা পাব? চাবি তোমার বাবার কাছে।'

'তা হলে ওখানে গিয়ে বসুন। দরজা ভাঙ্গতে হবে।'

রমেনের এক বন্ধু তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তেল গাদায় ধপ্ করে বসিয়ে দেয়।

রমেন বলে, এই বন্দুক নিয়ে একজনের ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছিলাম মনে আছে তো? কেউ কোন ফন্দি-ফিকির-চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। সত্যি সত্যি গুলি করব কিন্তু।'

সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে রমেন ওদের পাহারা দেয় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দেড়শো ছেলে গুদাম থেকে চাল বার করে বিতরণ করে। কাছে ও দূরের অনেকগুলি গাঁ থেকে হাজার হাজার লোক আসে চালের জন্য। রমেন গাঁয়ে গাঁয়ে ঢ্যাঢরা পিটিয়ে দিয়েছিল।

পুলিশ দু'চারজন আসে কিন্তু ঢুকবার চেষ্টা করে না বরং ভিড় আর হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণে কিছু কিছু সাহায্যই করে। ভোরে রমেন নিজে গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছিল, তার বাবা আজ চাল বিতরণ করবেন: এই মর্ম্মে বড় বড় কয়েকটা ইস্তাহারও আড়তের বাহিরে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল।

সন্ধ্যার সময় চাল শেষ হল।

খবর পেয়ে পরদিনই হর্ষনাথ ফিরে এল। ছেলেকে সামনে রেখে গুম্ খেয়ে রইল। তার কান্না পাচ্ছিল!

ডানপিটে টুটুল

মোহাম্মদ মোদাব্বের
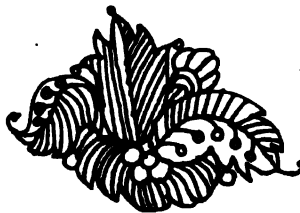
"স্মাগলার—মানে চোরাচালানীরা, আমার মনে হয় এখনও তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। বুঝলে টুটুল, এখনও ওদের দলকে শেষ করতে পারা গেল না।" মাথা চুলকাতে চুলকাতে ইনস্পেকটর রহমান বললেন।

কর্ণফুলি নদীর ঘাটে একটা শানের ওপর টুটুল আর তার ছোট বোন লিলি অবাক হয়ে ইনস্পেকটর রহমানের মুখে চোরাকারবারীদের কাহিনী শুনছিল। রহমান সাহেব দীর্ঘ দিন ধরে নদী-পুলিশে চাকরি করছেন। অনেক জাঁদরেল চোরাচালানী তাঁর হাতে নাজেহাল হয়েছে। এখনো যে অনেক জলদস্যু আর চোরাকারবারী তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে তাঁর আদৌ সন্দেহ নেই। তাই তিনি তাঁর মোটরবোটে যখন তখন কর্ণফুলির এ মোহনা থেকে ও মোহনা ঘূর্ণির মত ঘুরে বেড়ান, কখনও বা বঙ্গোপসাগরের ভিতর অনেকখানি চলে যান। আবার যখন একটু অবসর পান, এই ঘাটটিতে এসে একটু বিশ্রাম করেন। টুটুল ও লিলি প্রায়ই এইখানটায় এসে বসে। ওদের বাড়ি ঘাট থেকে বড় জোর পঞ্চাশ গজ দূরে। তাই রহমান সাহেবের সঙ্গে ওদের পরিচয় হয়েছে। রহমান সাহেবও ওদের সঙ্গে মন খুলে গল্প করেন।

চোরাচালানীরা এখনো তাদের কারবার চালিয়ে যাচ্ছে শুনে টুটুল বলে : ওরা কি দেশের খুব ক্ষতি করে, ইনস্পেকটর সাহেব ?

"তা আবার করে না ? এ দেশের মাল চুরি করে পরের দেশে পাঠায়। আবার পরের দেশের মাল চুরি করে এ দেশে আনে। এতে দেশের শুল্ক আদায়ের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। তাতে কি কম ক্ষতি হয় ? এরা দেশের দুশমন ছাড়া আর কিছু নয়। আমি যদি একবার কোন খোঁজ পাই, তাহলে দুশমনের বংশ ধ্বংস করে ছাড়ব। আর তাহলে আমার নিজেরও গৌরব বাড়বে।

"ওরা কি কি জিনিষ চালান করে, ইনস্পেকটর সাহেব ?" লিলি চোখ বড় বড় করে শুধোয়।

"ধর, বিদেশ থেকে ওরা আনে রেশম, কলম, তামাক, আরো কত কি। এ দেশ থেকে ধান, চাল, পাট, চা ইত্যাদি।" রহমান সাহেব জবাব দেন।

"ওরা কি জাহাজ বোঝাই করে এই সব জিনিষ চালান দেয়?" টুটুল জিজ্ঞাসা করলো।

"না জাহাজ কোথায় পাবে! তবে নৌকা, মোটর লঞ্চ এই সব ওদের সম্বল। ওদের চলাফেরা দেখলে আমরা বুঝতে পারি, ওরা চোর।" রহমান সাহেব বললেন।

বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে। সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত গেল। মনে হল অত বড় সূর্যটা ধীরে কর্ণফুলির পানিতে ডুব মারলো।

টুটুল ও লিলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির পথ ধরলো। কিন্তু বাড়ি গিয়েও টুটুলের স্বস্তি নেই। সে ভাবতে থাকে, চোরাচালানীদের সে যদি খুঁজে বের করতে পারে, তাহলে রহমান সাহেবের খুব উপকার করা হবে আর দেশ থেকে দুশমনদেব শেষ করা যাবে। কিন্তু কেমন করে ওদের ধরা যায়! ভাবতে ভাবতে টুটুল পড়ার কথা ভুলেই যায়।

পরদিন বিকেলে টুটুল লিলিকে সঙ্গে করে আবার নদীর ঘাটে এল। ওরা বসে বসে দেখতে থাকে, কত সামপান ভেসে যায়। জাহাজ ঘাটে কুলীদের হৈ চৈ। ছোট ছোট মোটর লঞ্চ তীরে ভীড় করে আছে। কারুর চোঙা দিয়ে সাদা-কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। মনে হয় অনেক পথ দৌড়ে এসে ধুঁকছে। একটি একচোখো বুড়ো যে তফাৎ থেকে টুটুলদের দিকে তাকিয়ে ছিল, তা ওরা দেখতে পায়নি।

বুড়োটা ধীরে ধীরে ওদের কাছে এসে টুটুলের কাঁধে হাত দেয়। টুটুল ত ভয়ে চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। এ আবার কোথা থেকে এল। তার একটি চোখ দেখে ও ত রীতিমত ঘাবড়ে যায়।

বুড়োটা বলেঃ ভয় পেয়েছ, খোকা? কিচ্ছু ভয় নেই।

টুটুল তেরিয়া হয়ে বলেঃ তুমি কে! কি চাও আমার কাছে!

"না, না, তোমার কাছে আবার কি চাইব। আমি বরং শুধোই, তুমি কি কিছু চাও, খোকা?" বুড়ো লোকটা হাসতে হাসতে বেশ আদর মাখানো সুরে বললো। "হ্যাঁ, তুমি যদি নদীতে বেড়াতে চাও, তাহলে আমি বেড়িয়ে আনতে পারি। আমার মোটর বোট আছে, এক নিমিষে সাগরের ধার থেকে ঘুরিয়ে আবার এখানে পৌছে দেব। যাবে?"

টুটুলের মন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। লঞ্চে চড়ে সাগরের ধার দিয়ে ঘুরে আসার কত আনন্দ। কিন্তু রহমান সাহেব এমন ভীরু, কিছুতেই নিয়ে যেতে চান না। বলেন কিনা, বিপদ হতে পারে। আরে, বিপদ কি আর এত সোজা যে, মনে করলেই এসে যাবে। কিন্তু এখনই সে কোনো জবাব দিতে পারে না। একটু ভেবে দেখতে হবে ত। তাই সে বললোঃ আচ্ছা, আজ আমি কিছু বলতে পারছিনে, কাল এই সময় এখানে এসো। যাই তবে কালই যাবো।

বেশ বেশ, এই ত ভাল ছেলের মত কথা। আচ্ছা কালই আমি আসবো। তুমি যদি বেড়াতে চাও, তবে অনেক দূর থেকে বেড়িয়ে আনবো। আবার ঠিক এইখানটায় দিয়ে যাবো।—লোকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে নদীর ধার দিয়ে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

টুটুল লিলির হাত ধরে বাড়ির পথে চললো। যেতে যেতে সে ভাবে, লোকটা তাকে বেড়িয়ে আনতে চায় কেন! ওরা চোরাকারবারীর দল নয় ত? তা যদি হয়, তাহলে খুব ভাল হয়। আমি ওদের সঙ্গে গিয়ে সব খবর জেনে রহমান সাহেবকে জানিয়ে দেব। এতে দুটো কাজ হবে। কিন্তু এ খবর বাড়িতে কাউকে বলা হবে না। বোনের দিকে চেয়ে বলেঃ বুঝলি লিলি, তুই কাউকে একথা বলবিনে।

লিলি ঘাড় দুলিয়ে বলে ঃ আচ্ছা।

পরদিন টুটুল চললো নদীর ঘাটে। সঙ্গে লিলি। টুটুল চলতে চলতে বলে ঃ বুঝলি লিলি, আজ মোটর লঞ্চের সেই লোকটির সঙ্গে নদীতে বেড়াতে যাবো। তুই কিন্তু কাউকে একথা
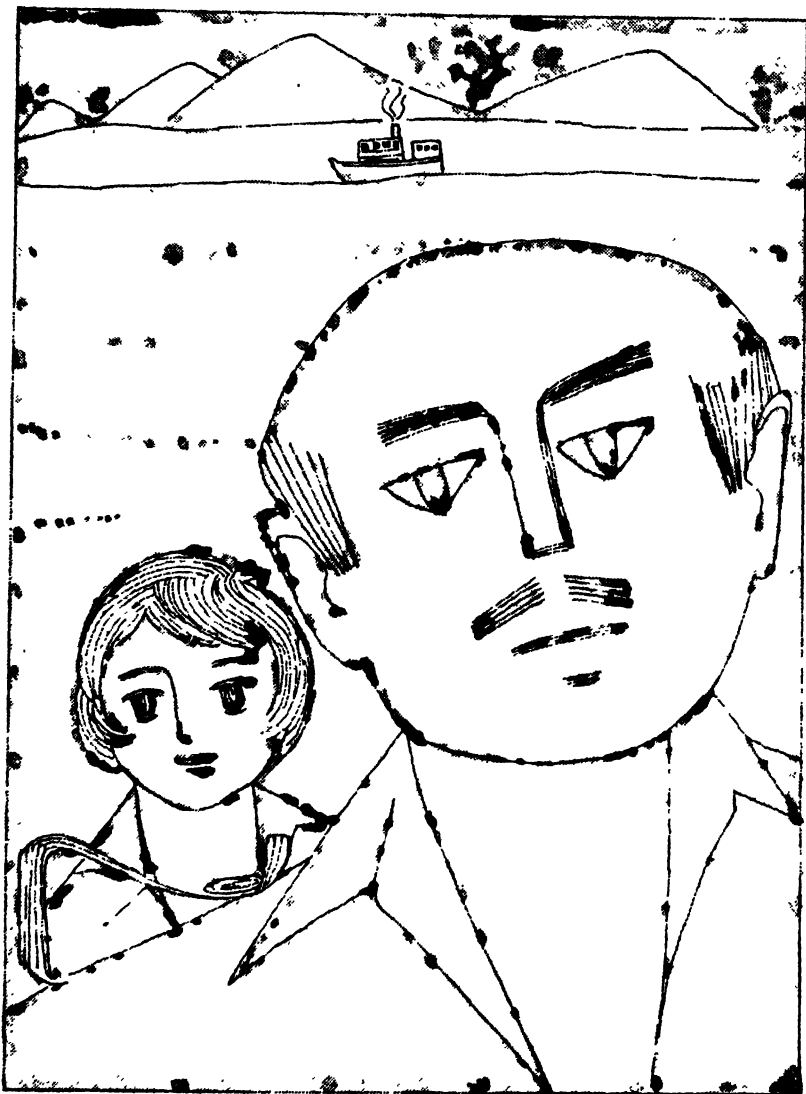
বলিসনে। যদি ফিরতে দেরী হয়, তাহলে রহমান সাহেবকে বলবি, আমি এক অচেনা লঞ্চে করে বেড়াতে গিয়েছি। হয়ত সেটা চোরাকারবারীদের লঞ্চ। তা যদি হয়, তাহলে ঠিক ওদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলবো, তা দেখে নিস।

লিলি বিজ্ঞের মত বলে ঃ ইস, উনি ধরে ফেলবেন। ওরা বুঝি কম চালাক। তোমায় জানতে দেবে কেন?

"জানতে দেবে না বললেই হল। আমি ওদের লঞ্চে উঠে একেবারে কালা সাজবো; ওরা নির্ভাবনায় আলাপ করবে। তাহলেই আমার কাজ হাসিল। কি বলিস, ভাল যুক্তি নয়!"

লিলি মাথা দুলিয়ে বলে ঃ তা বটে।

নদীর ঘাটে এসে টুটুল দেখলো, লোকটা আগে থেকেই ওদের অপেক্ষায় একটা পাথরের উপর বসে আছে। টুটুলকে দেখে ধূর্তের মত হেসে সে বললো ঃ কি গো খোকা, যাবে নাকি বেড়াতে।

টুটুল কালা বনে গিয়েছে ততক্ষণ। সে শুনতে না পাওয়ার ভান করে বললো ঃ কি বলছেন?

লোকটা এবার আরো একটু জোরে বললো ঃ কি মত করলে, বেড়াতে যাবে?

টুটুল এবারও শুনতে পায় না। শুধু চোখ বড় বড় করে বলে ঃ অ্যাঁ, কি বললেন।

লোকটা মনে মনে খানিক গজ গজ করে বলে ঃ হুঁ, দেখছি ছেলেটা বদ্ধ কালা। এবার গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলে ঃ আজ যাবে কি? লঞ্চ যে এখনি ছাড়বো।

টুটুল এবার শুনতে পায়। বলে ঃ হ্যাঁ, আমি তৈরী।

"বেশ বেশ, চল তাহলে।" লোকটি খুশীতে যেন বাগে বাগ।

টুটুল লিলিকে বলে ঃ লিলি তুমি এখন ঘরে ফিরে যাও, আমি এক্ষুণি ফিরে আসবো।

লিলি বেচারী আর কি করে। মুখ কালো করে একা একা বাড়ির দিকে ফিরে চললো।

ওদিকে টুটুল লোকটির সঙ্গে এক ধূসর রংয়ের লঞ্চে গিয়ে উঠলো। লঞ্চে ইঞ্জিনে স্টার্ট দেওয়াই ছিল। এতক্ষণ যেন রাগে গজ গজ করছিল। চলতে শুরু করায় লঞ্চটা ভীষণভাবে গর্জন করে উঠলো। দেখতে দেখতে ধোঁয়ার আড়াল করে সে তীর ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেল। বাইরে তখন ভীষণ কুয়াসা, কিছুই নজরে পড়ে না। টুটুল লঞ্চের জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে সে কি যে ভাবতে থাকে, তা সে-ই জানে।

টুটুলকে দেখে সব মাঝিমাল্লারা ছুটে এসে তার পাশে জড় হয়েছিল। লোকটি তার সঙ্গীদের বললো ঃ এই ছোকরাটাকে নিয়ে এলাম, একে দিয়ে চাকরের কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে, কি বল?

"চমৎকার হবে। এই জন্যই ত সবাই বলি, কানা মংলুর মত বুদ্ধি দুনিয়ার কারুর নেই, কি বলিস চ্যাং।" রহীম বলে উঠলো।

যে লোকটি টুটুলকে এনেছিল, তার নাম মংলু। একটা চোখে দেখতে পায় না বলে ওকে সবাই কানা মংলু বলে। রহীমের কথায় মংলু খেঁকিয়ে ওঠে ঃ বড় ত তামাসা করা হচ্ছে! বলি এতদিনে একটা লোকও আনতে পেরেছিস?

রহীম বলে ঃ চটো কেন, আমি কি আর কিছু খারাপ বলেছি? এই চ্যাং-ই বলুক না।

চ্যাং ওদের দলের সেরা ডাকাত। ও চীনা কি বর্মী, তা চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই। ওদের সবাই চ্যাংকে যেমন ভয় করে, তেমনি ভক্তিও করে। এতক্ষণ চ্যাং চুপ করে ছিল, ওদের তর্কে কান দেয়নি। এবার সে মুখ খুললো ঃ ছেলে ত একটা আনলে, কিন্তু একটু বুঝে সুঝে এনেছ ত।

মংলু বলে ঃ না জেনে কি আর এনেছি। দেখই না পরখ করে। ছেলেটা একে বোকা, তার ওপর আবার কালা। চেঁচিয়ে মরলেও শুনতে পায় না।

চ্যাং টুটুলকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞাসা করেঃ এই ছোকরা, চা বানাতে পারিস ?

টুটুল ওদের পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। ভান করে যে, সে কিছুই শুনতে পায়নি। এবার চ্যাং খুব জোরে চেঁচিয়ে বলেঃ চা করতে পারিস ?

এবার টুটুলকে শুনতে হল। বলল ঃ হ্যাঁ, খুব পারি।

চ্যাং খুশী হয়ে বলেঃ ভালই হল। যা আমরা ওকে শুনতে দিতে চাইনে, ও এমনিতেই তা শুনতে পাবে না। মংলুর বাহাদুরি আছে বলতে হবে।

মংলু এবার খুশিতে ডগমগ করেঃ আমি না বুঝে কোন কাজ করিনে।

মংলু টুটুলের সামনে এসে বলেঃ খোকা, এবার রান্নাঘরে যাও, আমাদের জন্য একটু চা বানিয়ে ফেল।

টুটুল এবারও শুনতে পায় না। মংলু তখন আরও জোরে—এক বিকট চীৎকার করে বলেঃ রান্না ঘরে ঢুকে একটু চা তৈরি কর।

মংলুর কথা এবার যেন টুটুলের কানে গেল। সে আস্তে আস্তে উঠে রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘর থেকেই টুটুল শুনতে পায়, ওরা যুক্তি করছে, রাঙ্গামাটি থেকে কিছু মাল তুলতে হবে আর রেশমী কাপড়ের গাঁটগুলি নামিয়ে নিতে হবে।

সারারাত আর সারাদিন লঞ্চ ছুটে চলেছে নদীর বুক চিরে। এক একবার এক এক ঘাটে লঞ্চ থামে। জিনিস বোঝাই করে আবার ছুটে চলে। লঞ্চের লোকেরা যা বলাবলি করছে, টুটুলের কানে সবই আসে। সে শুনতে পায়, চ্যাং বলছে যে, আজ ভোর হওয়ার আগেই রাঙ্গামাটিতে মাল নামাতে হবে আর চালের বস্তা লঞ্চে বোঝাই করতে হবে। কিন্তু সাবধান, ছোকরাটা যেন দেখতে না পায়, কোথায় আমরা লঞ্চ ভিড়াচ্ছি। জায়গা যদি চিনতে পারে, আর ছোকরা যদি কোথাও বেফাঁস বলে দেয়, তাহলে আমাদের দফারফা হবে।

মংলু বলেঃ সেজন্য ভেবো না। লঞ্চ ঘাটে ভিড়বার আগেই আমরা ওর চোখ বেঁধে কেবিনের মধ্যে ফেলে রাখবো। সেজন্য তোমরা ঘাবড়িও না।

ওদের সব যুক্তিই টুটুলের কানে এল। ওর এখন একমাত্র ভাবনা, কি করে রহমান সাহেবকে খবর দেওয়া যায়। সে এর মধ্যে মতলব ঠিক করে রাখে। রান্নাঘরে একটি খালি বোতল ছিল, পকেট থেকে পেনসিল বের করে একটি ছোট কাগজে লিখলোঃ "চোরাচালানকারীদের সন্ধান পেয়েছি। ধূসর রংয়ের এক স্টীম লঞ্চ মাল নিয়ে রাঙ্গামাটির দিকে চলেছে। ওরা হয়ত বর্মার মধ্যে ঢুকে পড়বে। এই পত্র যার হাতে পড়বে, তিনি যেন জল-পুলিশের কাছে খবর পৌছে দেন।" লেখা শেষ করে ও বোতলের মুখ ছিপি দিয়ে আচ্ছা করে বন্ধ করলো। তারপর তার ওপর একটা ছোট লোহার শিকে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে পতাকা করে নদীর পানিতে ফেলে দিল। নদীর উজান পানিতে বোতল ভাসতে ভাসতে চাটগাঁর দিকে চললো।

পরদিন ভোর বেলা লঞ্চ রাঙ্গামাটিতে পৌছতে পারলো না। ওরা ঠিক করলো, সন্ধ্যার আগে আর ঘাটে লঞ্চ ভিড়াবে না। রাতের অন্ধকারে যা হয় করা যাবে।

এদিকে টুটুলের বোতল ভাসতে ভাসতে চাটগাঁর কাছে এসে যায়। নদীতে জাহাজের খালাসীরা মাছ ধরছিল। তারা বোতল দেখতে পেয়ে ধরে ফেললো। বোতলের ছিপি খুলে কাগজ পেয়ে ওরা পড়ে ত অবাক। তখন মাছ ধরা ছেড়ে পানসি নিয়ে তারা থানার দিকে দৌড় দেয়। কিন্তু থানা পর্যন্ত যেতে হয় না, ঘাটেই রহমান সাহেবকে পেয়ে যায়। তিনি তখন লিলির সঙ্গে টুটুলের ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছিলেন। খালাসীরা ওর কাছে গিয়ে বোতল সমেত চিঠিটা রহমান সাহেবের হাতে তুলে দিল। তিনি চিঠির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে লিলিকে দেখতে

দিলেন ঃ দেখ ত লিলি, হাতের লেখাটা কার ?

লিলি চিঠিটা পড়তেই চেঁচিয়ে ওঠে ঃ এ ত টুটুল ভাইয়ের হাতের লেখা। ঠিক ও ডাকাতের হাতে পড়েছে। কি হবে রহমান সাহেব।—ও কাঁদো কাঁদো মুখে রহমান সাহেবের দিকে তাকায়।

"কিছু ভেবো না, এইবার বাগে পেয়েছি। এখনি আমি সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে স্পীড বোটে ওদের পিছনে ধাওয়া করছি। লঞ্চের চেয়ে চার গুণ বেগে চলে এই স্পীড বোট। কাজেই আজই সব শয়তান ধরা পড়ে যাবে।" রহমান সাহেব আর অপেক্ষা না-করে লিলিকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে থানার দিকে ছুটলেন।

রাতের অন্ধকারে মংলুদের লঞ্চ রাঙ্গামাটির ঘাটে ভিড়লো। একে একে ওদের মাল নামানো সুরু হয়। তার আগে ওরা টুটুলের চোখ বেঁধে কেবিনের মধ্যে ফেলে রেখেছিল। ওরা মনে করেছিল, এখানে ওদের বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। কারণ জায়গাটা খুব নির্জন। পাশে ছোট পাহাড়ের টিলা। সুতরাং ওদের কারুর চোখে পড়বার ভয় নেই। কিন্তু ওদের জন্য কি বিপদ যে অপেক্ষা করছিল, তা ওরা জানবে কেমন করে ?

নিশ্চিত হয়ে ওরা যখন সবাই তীরে নেমে চোরাই মাল কাঁধে তুলতে যাবে, তখন ছোট ছোট টিলার আড়াল থেকে বজ্রকণ্ঠে রহমান সাহেবের হুকম হল ঃ যে যেখানে আছো, চুপ করে দাঁড়াও আর দু'হাত মাথার ওপর ওঠাও। নয়ত কুকুরের মত সবাইকে গুলী করে মারবো।

মংলু ও চ্যাংয়ের দল নিরুপায় হয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ালো। টিলার আড়াল থেকে তখন পুলিশরা বেরিয়ে এসে ওদের সবার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

রহমান সাহেব লঞ্চে উঠে প্রত্যেক কেবিন পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। কেবিনের একটি দরজা খুলে দেখতে পেলেন টুটুল মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি কালবিলম্ব না করে ওর মুখের বাঁধন কেটে দিলেন।

ছাড়া পেয়ে টুটুল বলে ঃ ওদের গ্রেফতার করেছেন ত রহমান সাহেব ?

"হ্যাঁ টুটুল, ওদের সব কটাকে পাকড়াও করেছি, আর ওরা আমাদের দেশের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তুমি এ কি কাণ্ড করে বসেছিলে ? বাপরে বাপ, কি ডানপিটে ছেলে। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে ডাকাতের খপ্পরে।"

"বলে কয়ে এলে কি কেউ আসতে দিতো ? আর না এলে কি ওরা এত সহজে ধরা পড়তো ?" টুটুল বিজ্ঞের মত জওয়াব দেয়।

রহমান সাহেব সেবার বড় রকম পুরস্কার পেলেন আর চাকরিতেও উন্নতি হল। কিন্তু রহমান সাহেব সব সময় বলেন, এতে কি আমার কোন বাহাদুরি আছে! সব বাহাদুরি ত ঐ ডানপিটে ছেলে টুটুল বাবুর।
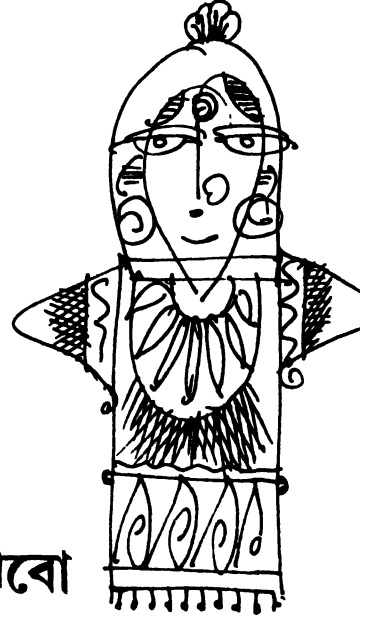
কি করে বুঝবো

আশাপূর্ণা দেবী

ছ' বছরের বুকু বাড়ীর বাইরের রোয়াকে ব'সে খেলা করছিলো। বাড়ীর সামনে একখানা রিকশ-গাড়ী এসে থামলো। রিকশ থেকে নামলেন দু'টি বেজায় মোটাসোটা ভদ্রমহিলা আর একটি বুকুর মতো বয়সেরই ছেলে। সেটিও নেহাত রোগা নয়।

বুকু খেলতে খেলতে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়,—আরে বাবা! রিকশ-গাড়ীর অতোটুকু খোলের মধ্যে এদের জায়গা হয়েছিলো কি ক'রে!

দু'টি মহিলার মধ্যে একটি মহিলা রোয়াকে উঠে একগাল হেসে বলেন—কি খোকা, চিনতে পারছো?

বুকু দুই কোমরে দুই হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের দিকে সোজা তাকিয়ে যেন বেশ তলিয়ে একটু ভেবে নেয়, তারপর গম্ভীরভাবে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দু' দিকে মাথা নাড়ে।

মহিলা দু'টি তো ওর ধরণ দেখে হেসেই খুন!

একজন বলেন—আহা, আমরা এসেছিলাম সে-ই কবে। ওর মনে থাকবে কি ক'রে?

বুকু বিজ্ঞের মতো বলে—তাছাড়া তখন হয়তো এ্যাতো মোটা ছিলেন না আপনারা। এ্যাতো মোটা কাউকে দেখিই-নি কখখনো।

শুনে তো দু'জনের মধ্যে একজনের মুখ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে উঠছিলো, আর একজন কিন্তু হেসে ওঠেন। 'খুক খুক' ক'রে হাসতে হাসতে বলেন—নির্ম্মলার ছেলেটি তো আচ্ছা মজার কথা বলে! তা' তোমার মা বাড়ী আছেন তো খোকা?

—হ্যাঁ!

চলো, ... ব'লে এঁরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েন।

শুধু 'ঢুকে' পড়েন না, একেবারে বসেই পড়েন। .... বাইরের ঘরেই হালকা-হালকা দু'খানা বেতের চেয়ারের মধ্যে নিজেদেরকে বেশ কায়দা ক'রে ঠেসে দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেন—কই, খোকা, তোমার মা?

—মা? মা তো সেই তিন-তলার ছাতে, রান্নাঘরে।

—ওরে বাবা! আঁৎকে ওঠেন এঁরা—তিন-তলায়! সিঁড়ি ভেঙে আর উঠতে পারবো না বাবা, রক্ষে করো! উঃ, বাড়ী থেকে কি আজ বেরিয়েছি? বার দু'তিন বাস বদল, শেষ অবধি রিকশয়! ... যাও দিকিন বাবা, ছুটে, তিন-তলায় গিয়ে খবর দিয়ে এসো তোমার মাকে। বলো গে—উত্তরপাড়া থেকে ছেনুমাসীরা এসেছেন।

বুকু ছুটে ওপরে চলে যায়।

ইত্যবসরে—নূতন-আসা ছেলেটি, যার নাম 'ডাম্বল', চেয়ারে গুছিয়ে বসার বদলে একখানা চেয়ার কনুইয়ের ধাক্কায় উল্টেছে, টেবল-ঢাকাটাকে কুঁচকে টেনে খানিকটা ঝুলিয়ে দিয়েছে, টেবলের ওপরকার খাতা-পত্তরগুলো এলোমেলো করেছে, একেবারে ঘরের ওদিককার দেয়ালে-রাখা বইয়ের আলমারিটার একটা পাল্লা ধ'রে এমন হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে, চাবিবন্ধ কলটা—বন্ধ অবস্থাতেই পাল্লার সঙ্গে খুলে বেরিয়ে এসেছে ... সাজানো-গোছানো বইয়ের সারি থেকে একসঙ্গে তিন-চারখানা বই নামিয়েই—'দূর ছাই, ছবি নেই' ব'লে বইগুলো মাটিতে ফেলে রেখে, অবশেষে জানলার ধাপের ওপর উঠে ব'সে পা দোলাতে সুরু করেছে।

বুকু এসে বললে—মা আসছেন। বললেন যে ... ও কি! কী কাণ্ড করেছো তুমি? আলমারি ভেঙে বই নামিয়েছো?

ডাম্বল অগ্রাহ্যভরে বুকুর দিকে পিট্ পিট্ ক'রে তাকিয়ে উত্তর দেয়—ঈস্! আলমারি ভেঙে! একেবারে গুঁড়িয়ে ছাতু ক'রে ফেলেছি বলো? শুধু তো খুলেছি।

বুকু জোর-গলায় বলে—তা খুলেছোই-বা কেন? ও বই কার তা' জানো? সেজকাকার! সেজকাকার বই মাটিতে? .... ইঃ!

বুকুর কথার ধরণেই বোঝা যায়, 'সেজকাকা' লোকটি বিশেষ মোলায়েম নয়।

ডাম্বল কিন্তু বুকুর ভয়ের ধার ধারে না। ঠোঁট উল্টে বলে—এঃ, ভারী তো বই! হতচ্ছাড়া বই! ছবি নেই!

বুকু গম্ভীরভাবে বলে—ছবি থাকবে কি জন্যে? ও কি ছোটদের বই? ও তো বড়দের বই! যেমন হাতির মতো চেহারা তোমার, তেমনি হাতির মতো বুদ্ধি! আচ্ছা, আসুন না সেজকাকা, মজা দেখিয়ে দেবেন একেবারে! পিঠের ছাল তুলবেন তোমার!

মোটা মহিলা দু'টি, যাঁদের মধ্যে একজনের নাম—'ছেনুমাসী' আর অন্যটির নাম—'বেণুমাসী', তাঁরা চোখ ড্যাবা-ড্যাবা ক'রে বুকুর কথা শুনছিলেন, এইবার রেগে গম্‌গম্ ক'রে ছেলেকে বলেন—ডাম্বল! বই তুলে রাখো! সব জায়গা নিজের বাড়ী নয়, বুঝলে?

এতেই ছেলে শাসন করা হয়ে গেল ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁরা মনে মনে বুকুর মুণ্ডুপাত করেন। ... কি অসভ্য ছেলে বাবা! কথা নয় তো, যেন ইঁট-পাটকেল! ছেলেকে কি শিক্ষাই দিয়েছে নির্ম্মলা।

এইবার ঘরে এসে ঢোকেন বুকুর মা নির্ম্মলা।

আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে ঢোকা দেখেই বোঝা যায়, কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঘরে ঢুকেই

হৈ-হৈ ক'রে অভ্যর্থনা সুরু করে দেন—ও মা, আমার কী ভাগ্যি! ছেনুমাসী-বেণুমাসী যে! এতদিনে বুঝি মনে পড়লো? আমি তো ভেবেছিলাম, ভুলেই গ্যাছো আমাকে। সত্যি, কতকাল পরে দেখা—কী আনন্দ যে হচ্ছে কি ক'রে বলবো! এত ভালো লাগছে ছেনুমাসী—

বুকুর মা যতক্ষণ কথা কইছিলেন, বুকু অবাক হয়ে—ফ্যাল্-ফেলিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। কথা শেষ হতেই বলে ওঠে—ও কি মা? এইমাত্তর যে বললে—'বাবারে, শুনে গা জ্বলে গেল! অসময়ে লোক বেড়াতে আসা! ভালো লাগে না—' এখন আবার 'ভালো লাগছে' বলছো কেন?

ছেলের কথা শুনে বুকুর মা'র মাথায় বজ্রাঘাত!

এ কী সর্ব্বনেশে ছেলে!

তিনি না-হয় বলেই ফেলেছেন দুটো কথা, তাই ব'লে এমনি ক'রে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে?

ওদিকে 'ছেনু' 'বেনু' দুই বোনের দুই দ্বিগুণে চারটি চোখ কপালে উঠে গেছে। তাঁরা বলে কত তোড়জোড় ক'রে সেই উত্তরপাড়া থেকে ভবানীপুরে ছুটে এসেছেন, পাতানো-বোনঝিটির

সঙ্গে দেখা করতে, আর তার কাছে কিনা এই অভ্যর্থনা!

এদিকে বুকুর মা'র যে সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে, তা' তো আর এঁরা জানেন না। সে কথা অবিশ্যি ফাঁস করেন না বুকুর মা, ছেলের কথার ওপর ঝাপটা মেরে বলেন—কি শুনতে কি শুনিস হতভাগা ছেলে, যা হয় বললেই হলো?

ছেনুমাসী 'চালতা-চালতা' গাল ফুলিয়ে তালের মতো ক'রে গম্ভীরভাবে বলেন,—আহা, তা' ছেলেকে গাল দিচ্ছ কেন নির্ম্মলা? সত্যিই তো অসময়ে এসে প'ড়ে কাজের ক্ষতি ক'রে দিলাম—

বুকুর মা ব্যাকুল হয়ে বলেন—কিছু না মাসীমা, কিছু না! এ সময়ে কোনো কাজ থাকে না আমার, এখন বিকেলবেলায় আবার এত কি কাজ? কিন্তু বুকু কথা শেষ করতে দেয় না, টপ্ ক'রে তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে—বাঃ, কাজ নেই কি? এখনই তো গাদা গাদা কাজ! সিনেমার টিকিট কেনা রয়েছে না আমাদের? বাবা এলেই তো চলে যাবো, তাড়াতাড়ি রুটি-টুটি সব ক'রে নেবে না?

এত তাড়াতাড়ি কথা বলে বুকু, তাকে আর কথার মাঝখানে থামানো যায় না।

এরপর যদি বুকুর মা কালো ছেলের কান ম'লে লাল ক'রে ছাড়েন, দোষ দেওয়া যায় তাঁকে?

কান ম'লে দিয়ে মা ধমক দেন—যা, বেরো হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! ভূতে পেয়েছে না কি আজকে? সত্যি, এ ছেলেকে ধরে আছাড় মারলে রাগ যায়? তোমরাই বলো ছেনুমাসী? কেবল বানিয়ে কথা বলে।

বুকু চলে যেতে বুকুর মা ডাম্বলকে নিয়ে পড়েন।

—ওমা, ডাম্বল যে? দেখিনি এতক্ষণে। এত-বড় হয়ে গেছে? আর কী সুন্দর হয়েছে! বেণুমাসী, তোমার এই ছেলেটিই বোধহয় সব থেকে ফর্সা! তাই না?

একেই তো পরের কালো ছেলেকেও 'ফর্সা' বলা, বিচ্ছু ছেলেকে 'সোনা ছেলে' বলা নিয়ম, তাছাড়া আবার নিজের ছেলের বেয়াড়া কথাগুলো ভুলিয়ে দেবার জন্যে বেশী করেই বলতে হয় বুকুর মাকে। নইলে, সত্যি কিছু আর ডাম্বল আহামরি ফর্সা নয়।

বেণুমাসী এবারে একটু প্রসন্ন হয়ে বলেন—না, ডাম্বল ত ছেলে-বেলায় ওই রকমই ছিল! এখন রোদে ঘুরে-ঘুরে—তা' তোমার বুকুও তো কালো হয়ে গেছে।

—আমার বুকু তো কালোই ছেলে। .... তা'পর ডাম্বলবাবু, কি পড়তে-টড়তে শিখলে? ইস্কুলে ভর্তি হয়েছো না কি?

বেণুমাসী কি বলতে যাচ্ছিলেন, ডাম্বল তড়বড় ক'রে ব'লে ওঠে—কাঁচকলা! ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিলে তো? আমার বাবাটি যে হাড়কেপ্পন! বলেন—'সাত বছরের ছেলের ইস্কুলের মাইনে সাত টাকা! পারবো না দিতে। প'ড়ে দরকার নেই, চাষবাস ক'রে খাবে?'

এবারে বেণুমাসীর মুখ চুন!

ছোট ছেলেদের সামনে যথেচ্ছ কথা বলার ফল টের পান। ছোট বোনকে সামলাতে ছেনুমাসী হি-হি ক'রে হেসে ব'লে ওঠেন—তোর ছেলেটা কি পাকা-পাকা কথা শিখেছে বেণু, শুনলে হাসি পায়। বাব্বাঃ, ছেলের মুখে যেন খই ফুটছে!

ইত্যবসরে বেণুমাসী ধাতস্থ হয়ে উঠছেন।

তিনি বলেন—আজকালকার সব ছেলেই ওইরকম দিদি, এই এখখুনি দেখলে না, নির্ম্মলার

ছেলে বুকু, ডাম্বলকে বই দু'খানায় একটু হাত দেওয়ার জন্যে কি রকম শাসালো? বলে কি না, 'যেমন হাতির মতো দেখতে, তেমনি হাতির মতো বুদ্ধি—সেজকাকা তোমার পিঠের ছাল তুলবেন—' এই সব।

টেনে টেনে হাসতে থাকেন বেণুমাসী।

শুনে তো বুকুর মা'র আক্কেল গুড়ুম!

হঠাৎ আজ কি হলো ছেলেটার, সত্যিই ভূতে-টুতে পেলো না কি? কই, এমন অদ্ভুত বেয়াড়া তো ছিলো না! কি আর করেন, প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন—সত্যি, এই ছেলেকে নিয়ে যে আমার কি জ্বালাই হয়েছে ছেনুমাসী, হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। যত বড় হচ্ছে তত যেন যা-তা হয়ে যাচ্ছে। কে জানে, পাগলা-টাগলা হয়ে যাবে না কি!

'পাগলা' বললে যদি দোষ খণ্ডায়।

ছেনুমাসীরা অবিশ্যি তেমন বোকা নয় যে, সহজ ছেলেকে 'পাগল' বললেই তাই বিশ্বাস করবেন। মনে মনে ভাবেন ···· মোটেই নয় তা'—বরং পাগল বানাতে পারে লোককে।

হঠাৎ একটা হুড়মুড় ঝন্‌ঝন্ শব্দে তিনজনেই চমকে ওঠেন।

আর কিছু নয়; সেলফের ওপর থেকে টেবিল-ল্যাম্পটাকে ফেলে ভেঙে শেষ করেছে ডাম্বল।

এবারে আবার ছেনু-বেণু দুই বোনের অপ্রতিভের পালা, কিন্তু বুকুর মা 'হাঁ-হাঁ করে ওঠেন—আহা-হা, থাক্ বেণুমাসী, ছেলেকে আর বকতে হবে না। ছোট ছেলে দুরন্ত হবে না একটু? মাটির পুতুলের মতন চুপ ক'রে থাকবে? ছট্‌ফটে ছেলেই আমার ভালো লাগে।

কাঁচ কুড়োতে-কুড়োতে বুকুর মা আরো বলেন—যে ছেলেরা ছোটবেলায় দুরন্ত থাকে, তারাই নাকি বড়ো হয়ে মহাপুরুষ হয়।

তারপর গল্প চলে।

যত সব মেয়েলি-গল্প আর কি!

'কার মেয়ের কোথায় বিয়ে হলো, কাদের বৌয়ের কি-কি গয়না হলো, শাড়ীর আজকাল কি-রকম জলের দর হয়ে গেছে, ছেনুমাসীরা তো আলমারি বোঝাই ক'রে ফেলেছেন শাড়ী কিনে-কিনে, বুকুর মা রাখছেন না কেন এইবেলা—' এই সব আলোচনা।

গল্প থামাতে হয়, বুকু আর বুকুর সেজখুড়ীমা দু'জনে মিলে অতিথিদের জন্যে চা আর খাবার নিয়ে আসেন। বড়-বড় রাজভোগ, ভালো-ভালো সন্দেশ, সিঙাড়া, নিমকি····

ছেনুমাসীরা 'খাবো না খাবো না' করেন—যেন ভয়ানক একটা কষ্টকর কাজ করছেন এইভাবে খেয়ে ফ্যালেন সবই, ডাম্বল গাঁউ-গাঁউ ক'রে সব-কিছু খেয়ে ফেলে, রেকাবীর থেকে রস চাটে ব'সে-ব'সে।

বুকুর মা বলেন—এই বুকু, তোর বাবা এসেছেন অফিস থেকে? বল্‌গে যা, মাসীমারা এসেছেন।

বুকু পট্ পট্ ক'রে বলে—এসেছেন তা' বাবা খুব জানেন! সেইজন্যেই তো চটে-মটে লাল হয়ে ব'সে আছেন। বললেন—'খুব যা'হোক্ ছেনুমাসীরা বেড়াতে আসার আর দিন পেলেন না আমাদের সিনেমার টিকিটগুলো পচাবার জন্যে—বেছেবেছে আজই আসতে ইচ্ছে হলো?'

হায়! হায়! কী করবেন বুকুর মা!

ছেলেকে চড় কসাবেন, না নিজেরই গালে-মুখে চড়াবেন? এ আবার কী ভীষণ শত্রুতা সু

করেছে আজকে বুকু!

আর কি ব'লে মুখরক্ষে করবেন নিজের!

শুধু মনে ভাবতে থাকেন—এঁরা একবার উঠলে হয়; ছেলের হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই ক'রে ছাড়বেন।

শুধু হাত দিয়ে পেরে উঠবেন, না লাঠি-সোঁটা ধরবেন?

ছেনুমাসীরা বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তিতে বলেন—আচ্ছা, তাহ'লে উঠি নির্ম্মলা, তোমার অনেক ক্ষতি ক'রে গেলাম—

বুকুর মা কোন্‌মুখে আর বলবেন—আবার একদিন এসো ছেনুমাসী। ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন বোকার মতো।

ডাম্বল জুতোর মধ্যে পা গলাতে গলাতে বুকুকে বলে—আমায় তো খুব বলা হচ্ছিল, তুই ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিস্?

বুকু বুকটান ক'রে বলে—নিশ্চয়!

—কোন স্কুলে?

—'আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'!

—ক'খানা বই রে?

— সে অনেক। সব মিলিয়ে সাত-আটটা। .... বাব্বাঃ, আর কত দেরী করবে তোমরা? যাও এবার? রাত্তির হয়ে গেল যে। এখন মা কখনই-বা রান্না করবেন, আর কখনই-বা তোমাদের নিন্দে করবেন?

নিন্দে! ....

ছেনুমাসীরা শুধু হার্টফেল করতে বাকী রাখেন।

আর বুকুর মা?

তাঁর মুখ দেখে মনে হয়, হার্টফেল করেইছেন বুঝি-বা।

এবারে ডাম্বল ঘুঁষি পাকিয়ে আসে—নিন্দে কেন রে? নিন্দে কিসের?

—বাঃ, নিন্দে করা হবে না? ... বুকু যেন অবাক হয়ে গিয়েছে, এইভাবে বলে—বেড়াতে আসা লোকেরা চ'লে গেলে, নিন্দে করতে হয় না তাদের? বলতে হবে না—'ছেলেটা কি অসভ্য হ্যাংলা—মাসীমারা কি অহঙ্কারী—এসে তো মাথা কিনলেন, শুধু-শুধু একগাদা পয়সা খরচ হয়ে গেল—?' .... তাছাড়া—

বুকু এত তাড়াতাড়ি কথা বলে যে, 'ধরলে কথা থামায় কে?' যা বলবার সবই ব'লে নেয় সে। তবু ওর 'তাছাড়া'-কে থামিয়ে দিয়ে ছেনুমাসী বলেন—বলো বাবা, প্রাণ ভ'রে বলো—ব'লে গট্‌গট্ ক'রে চলে যান, পিছন-পিছন বেণুমাসী আর ডাম্বল।

আর ওঁরা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বুকুর মা রণচণ্ডী-মূর্তি নিয়ে সুরু করেন ছেলে ঠেঙাতে। ঠেঙান্ আর চ্যাঁচান্—বল্ শয়তান ছেলে, কেন ও-রকম কথা বল্‌লি? বল্, বল্ শীগগির! মেরে তোকে মেরেই ফেলবো আজ। ... তবু চুপ ক'রে আছিস্? কেন ওসব বল্‌লি যতক্ষণ না বলবি, মার থামাবো না আমি। ... লক্ষ্মীছাড়া পাজী বাঁদর! লোকের সামনে চুনকালি আমার মুখে!

গোলমাল শুনে বুকুর বাবা এসে হাজির।

—কি, হলো কি, ছেলেটাকে বেধড়ক পিটোচ্ছো কেন?

—পিটোবো না? বুকুর মা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেন—পিটিয়ে ওকে তক্তা করবো আমি, জানো—ও কী করেছে আজ? ...

একে একে ছেলের ভুতুড়ে-বুদ্ধির কথা বলতে থাকেন মা, আর শুনতে-শুনতে বুকুর বাবা রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। তখন তিনিও লেগে গেলেন প্রহারে।

সত্যি, যে ছেলে মা-বাপকে এ-ভাবে বাইরের লোকের কাছে অপদস্থ ক'রে ছাড়ে, তাকে মেরে 'তক্তা' ক'রে ফেললেই কি রাগ মেটে?

দু'জনে মিলে চ্যাঁচান্—বল্, বল্, কেন ওসব বল্লি?

বুকু অনেকক্ষণ গোঁ-ভরে চুপ ক'রে মার খাচ্ছিলো, আর পারে না। ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বলে—নিজেই তো দুপুরবেলা একশো বার ক'রে বললে, 'সব-সময় সত্যি কথা বল্‌বি, কারুর কাছে কিছু লুকোচুরি কর্‌বি না' এখন আবার নিজেই মারছো! কি ক'রে বুঝবো, আসলে কি করতে হবে?
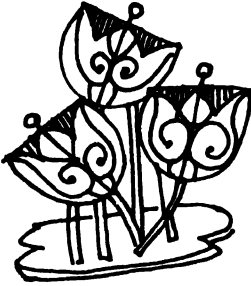
বিটু গোয়েন্দা

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

বিটু যে শেষ পর্যন্ত পুলিশে চাকরি নেবে এ আমরা, ওর বন্ধুরা, কল্পনাও করতে পারি নি। সত্যি কথা বলতে কি, সেই ইংরেজ আমল থেকে পুলিশ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে একটা আতঙ্ক ছিল,—সেই কারণেই হোক আর অকারণেই হোক—তার জের এই এতদিন বাদেও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

যদিও এ ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের কোন দিনই ছিল না বা আজও হয় নি। তা ছাড়া বিটু লেখাপড়ায় অত্যন্ত তুখোড় ছেলে। স্কলারশিপ পেয়ে প্রথম দশ জনের একজন হয়েও ও যখন ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি না নিয়ে বোটানি অর্থাৎ উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়তে লাগল তখনই ওর শুভাকাঙ্ক্ষীদের কেউ কেউ ওকে পরামর্শ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন—এ তুমি করছ কি ?

বিটু হেসে সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল,—ঠিকই করছি।

তারপর যথাসময়ে বি· এস· সি এবং এম· এস· সি দুটি পরীক্ষাতেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বেরিয়ে আসার পর আমরা সকলেই ভেবেছিলাম ও একটা ভালো কলেজের প্রফেসার কিংবা যেমন আজকাল সায়েন্সের ভালো ছেলেরা সুযোগ পেলেই করে,—দেশ বা আত্মীয় স্বজনের তোয়াক্কা না করে বিদেশের কোন নামজাদা ইউনিভার্সিটিতে পাড়ি দেবে রিসার্চ করার জন্য,—ও-ও তাই করবে। কিন্তু বিটু সে ধার দিয়েও গেল না। শেষে যখন শুনলাম ও নাকি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ নিয়েছে,—না, আই· পি· এস্· নয়,—স্রেফ সাদা-মাঠা সাধারণ গোয়েন্দা, তখন অবাক হবার পালা আমাদের।

অবশ্য বিটুর এমন খামখেয়ালিপনা নতুন নয়। খুব ছোটবেলা থেকেই দেখছি। তখন থেকেই ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মনে পড়ে স্কুল থেকে ফিরে যখন আমরা কখন বিকেল

আসবে—ফুটবল নিয়ে হৈ হৈ করে মাঠে নেমে পড়ব এই চিন্তায় ছট্‌ফট্ করছি ও তখন দিব্যি এক বাটি গরম গরম দুধ খেয়ে কাঁচি আর আঠার শিশি আর একরাশ পুরনো বিলিতী ম্যাগাজিন নিয়ে বসে গেছে ইয়া মোটা খাতা সঙ্গে করে। খাতাটার নাম ও দিয়েছিল 'জাব্দা খাতা'। কিন্তু আসলে সে খাতাকে একটা ছোটখাট এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে এবং তার সম্পাদনা পুরোপুরি বিটুর।

কী ছিল তার মধ্যে? নানারকম কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, জীব-জন্তুর ছবি, নানা দেশের নানা ধরণের লোকের ছবি—যাদের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, খেলোয়াড়, অভিনেতা, অভিযাত্রী এরা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ইতিহাসের নানা যুগের নানা মনীষী, যোদ্ধা, ধর্মগুরু—আরও এটা সেটা কত কি! তার ফর্দ দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু কি ছবি? সেই সঙ্গে ছিল তাদের সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য। কাগজের কাটিং—এক কথায় কী ছিল না তার মধ্যে সেটাই জিজ্ঞাস্য।

আর ছিল ওর গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ার শখ। শার্লক হোমস থেকে রবার্ট ব্লেক, হুকাকাশি থেকে ব্যোমকেশ কাউকেই ও ছাড়ত না। সকলেরই কীর্তিকাহিনী ছিল ওর মুখস্থ। বিদেশী কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি. এমন কি এডগার ওয়ালেস পর্যন্ত এবং স্বদেশী হেমেন রায়, মনোরঞ্জন, শরদিন্দু—এদের সকলকেই সে গুলে খেয়েছিল।

সে স্বভাবটা হয়তো বড় হয়েও তার যায় নি এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েও ওর ভিতরে ভিতরে গোয়েন্দাগিরির একটা শখ যে এমনভাবে লুকিয়ে ছিল তা কে জানত? মনোবিজ্ঞানীরা যাকে বলেন অবচেতন মন, এও হয়তো অনেকটা তাই।

তা একপক্ষে ভালোই বলতে হবে। উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও যদি রুজিরোজগারের জন্য এই সব বিচিত্র পথ বেছে নেন তা হলে আর আপত্তির কি থাকতে পারে?

বিটুর সঙ্গে—ভালো কথা বার বার বিটু বিটু করছি, ওর ভালো নামটাই এখন পর্যন্ত বলা হয় নি। বেশ গালভরা নাম—শিখিধ্বজ চক্রবর্তী। সেই মহাভারতে শিখিধ্বজ রাজার নাম পড়েছিলাম. তারপর ও নাম আর কোথাও চোখে পড়েনি।

আমরা তাই বলতাম,—বিটু, নামের দিক থেকে কলিযুগে তুই একক। বিটু শুনে হাসত। জবাব দিত না।

এখন বিটু বড় হয়েছে, এখন তো আর ও নামে ডাকা যায় না। কাজেই এবার থেকে ওকে শিখিধ্বজ বলে ডাকাই সমীচীন হবে। তবে বিটু নামটাও হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে। শুধু বিটু নয়,—বিটু গোয়েন্দা।

শিখিধ্বজ চক্রবর্তী গোয়েন্দা বিভাগে কাজ নিয়েছে খবর পাবার পর আমরা, ওর বন্ধুরা, ওকে একটু এড়িয়ে এড়িয়েই চলতাম। বেশ কিছুদিন ওর আর খোঁজ খবরও নিই নি। যাই হোক দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল।

আমাদের পাড়ায় দুজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক বাস করতেন। আসলে তাঁরা একই জমিদার বংশের দুই শরিক—বড় তরফ আর ছোট তরফ। নাম দুটো বহাল থাকলেও এখন বেশ কয়েক পুরুষ তফাৎ হয়ে গেছে। তাই জ্ঞাতি বললেই ভালো হয়। জ্ঞাতি হলেও চাল-চলনে দু'তরফের মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। ছোট তরফের যিনি এখন কর্তা তাঁর বয়স খুব বেশি নয়। টাকা পয়সা যথেষ্ট আছে, উপার্জনের ভাবনা নেই। তাঁর নেশা হচ্ছে বই কেনা। বাড়িতে উনি একটা

চমৎকার লাইব্রেরী বানিয়েছেন। বিশেষ করে এখন পাওয়া যায় না এমন অনেক পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করা তাঁর একটা বাতিক। কোন হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথির, এমন কি তালপাতারও, সন্ধান পেলে তাও তিনি কিনে নেবার চেষ্টা করেন। এইভাবে ঐ রকম পুঁথিও তাঁর লাইব্রেরীতে

বেশ কিছু জড়ো হয়েছে। অবশ্য সেগুলি তিনি সত্যি নিজে ঘাঁটেন কিনা, নাকি কবির ভাষায় সেই লোক দেখানো গোছের কিছু, তা জানা নেই। তবে পড়ুন কিংবা না-ই পড়ুন, এ নিয়ে গর্ব করে বেড়াতে তিনি খুব ভালোবাসেন।

বড় তরফের কর্তা বয়সেও যেমন অনেকটা বড়, মেজাজটাও তাঁর তেমনি শৌখিন। জমিদারী না থাকলেও সেকালকার সেই জমিদারী মেজাজের রেশ এখনও খানিকটা রয়ে গেছে তাঁর মধ্যে। তাই চাকরের হাতে লাটাই দিয়ে চুড়িদার ফিনফিনে পাঞ্জাবী গায়ে এখনও তাঁকে প্রায়ই বাড়ির বাগানে বা ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে পায়রাও ওড়ান। বন্ধুবান্ধব, মোসাহেব ইত্যাদি নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দেওয়াও তাঁর একটা বিশেষ শখ। সেখানে কখনও বসে তাসের আড্ডা, কখনও গান-বাজনার আসর। রাত্রে তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কতদিন 'লাগাও টেক্কা' চীৎকার শুনে চমকে উঠেছি, কালোয়াতি গানের এক

নাগাড়ে "আ—" শুনে কানে হাত দিয়েছি। এক কথায় বড় তরফ যে সত্যি বনেদী বংশের বংশধর সেটা পাড়ার লোককে মনে করিয়ে দিতে বড় কর্তা কখনও কুণ্ঠিত হন না।

ঢং-ঢং-ঢং-ঢং ঢং॥ দমকলের আওয়াজ। কোথায় আবার আগুন লাগল? দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

এ কি! দমকল যে এসে থামল ঠিক আমাদেরই পাড়ায়, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড কোলাহলও শুনতে পাওয়া গেল।

ছুটে গিয়ে দেখি, ছোট তরফের কর্তা পাগলের মত বাইরে এসে চেঁচাচ্ছেন,—জল—জল, জল।

কিন্তু কোথায় জল? রাস্তার হাইড্রেনগুলো সব শুকনো, আর আগুন লেগেছে ওঁদের বাড়ির ওপরের তলায়। দমকলের কর্মীরা তাঁদের ট্যাঙ্কে যেটুকু জল ছিল তাই ছুঁড়তে লাগলেন হোস্‌পাইপ্ দিয়ে সেই আগুনের দিকে। কেউ কেউ লম্বা মই বার করে তাই বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। সেই সঙ্গে খোঁজ চলতে লাগল কোথায় পাওয়া যায়,—পর্যাপ্ত জল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাওয়া গেল, কিন্তু ততক্ষণে আগুন যা করার করে ফেলেছে। ছোট তরফের বিরাট লাইব্রেরীটি পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে।

ছোট তরফের কর্তার মুখ থম্ থম্ করছে। চোখ টকটকে লাল! এতদিনের চেষ্টায় যা গড়ে উঠেছিল তা কিনা এভাবে নষ্ট হয়ে গেল! পাড়ার অনেকেই তাঁকে প্রবোধ দিচ্ছেন। বড় তরফের বড় কর্তাও এসেছেন। তিনিও ওর মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বলছেন—বিপিন, যা হয়ে গেছে তার জন্য মন খারাপ কর না। এসব পুঁথিপত্র ঘাঁটাঘাটি আমাদের বংশের কাজ তো নয়! আমাদের হল রাজবংশ, এর চালচলন আলাদা। তুমি মানো নি, তাই হয়তো ভগবান এমনি ভাবে দেখিয়ে দিলেন যে এ আমাদের কাজ নয়।

কিন্তু এত সহজেই কি সান্ত্বনা পাওয়া যায়?

যাই হোক, খানিক পরে দমকল চলে গেল। আগুনও ধিকিধিকি করে জ্বলতে জ্বলতে এক সময় নিভে এল। এবার আমরা কয়েকজন ধীরে ধীরে বিপিন বাবুর সঙ্গে ওপরে উঠে এলাম।

চারদিকে কাগজ পোড়া ছাই, আলমারীর পোড়া কাঠ। দেখলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়, বিপিনবাবুর তো হবেই।

কিন্তু আগুনটা লাগল কি করে? বিদ্যুতের তারগুলো নতুন বসানো হয়েছে এবং খুব সুরক্ষিত ভাবেই বসানো হয়েছে বড় কোম্পানীকে দিয়ে। সেখানে যে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লাগবে এ হতেই পারে না। ঘরের আশেপাশে আগুন জ্বালাবার কোন ব্যবস্থাই নেই। তার উপর দিনের বেলা লোডশেডিং হলে এবং রাতের বেলা হলে না হয় মোমবাতি জ্বলতে পারত। তাও তো নয়। বিপিনবাবু সিগারেট—টিগারেট কিছু খান না, তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো ও ঘরে ঢোকাও নিষেধ। তবে? সত্যিই, এটা যেন একটা রহস্যজনক ব্যাপার।

তা রহস্যজনক হোক বিপিনবাবু কিন্তু ব্যাপারটা ভালো করে তদন্ত না করিয়ে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে এ সম্পর্কে আর্জি পেশ করলেন।

এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে পুলিশ হয়তো সব সময়ে তেমন আগ্রহ দেখায় না, কিন্তু শিখিধ্বজের কানে খবরটা পৌঁছতেই সে বড় সাহেবের কাছে গিয়ে বলল,—আমার ওপর ভার দিন, দেখি এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি কিনা।

বড় সাহেব হেসে বললেন,—দেখ, তোমার তো আজব শখের অভাব নেই।

আমি যে ও পাড়ায় থাকি বিটু, থুড়ি শিখিধ্বজ তো তা জানতোই। তদন্ত শুরু করার আগে তাই সে প্রথমেই চলে এল আমার কাছে। উকিলের মত আমাকেও একটু জেরা করল, তারপর চলল ছোট তরফের বাড়িতে। আমাকেও অনুরোধ করল সঙ্গে যেতে।

গেলাম। কৌতূহল আমারও একটু ছিল। দেখলাম ও খুব খুঁটিনাটি করে অনেক কিছু দেখছে, যা দেখবার কোন কারণ আছে বলে আমার মাথায় এল না।

ঘরটা তখনও পরিষ্কার করা হয় নি। পোড়া জঞ্জাল সব ঘরের মধ্যেই তেমনি জড় হয়ে আছে,—অগ্নিকাণ্ডের পর ইচ্ছে করেই সারানো হয়নি। শিখিধ্বজ সেই পোড়ো কাগজ আর পোড়ো কাঠের স্তূপের নানা জায়গায় গিয়ে সাবধানে খানিকটা খানিকটা করে তুলে নিয়ে লেন্স দিয়ে দেখতে লাগল। তারপর, কি মনে করে, তারই খানিকটা নিয়ে অতি সন্তর্পণে একটা ছোট প্লাস্টিকের থলির মধ্যে ভরে নিল। পরীক্ষা শেষ হলে বলল,—আচ্ছা, আজ আসি। এবার ঘরটা সাফ করে ফেলতে পারেন।

পরদিনই শিখিধ্বজ আবার এসে হাজির। আজও আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে এল বিপিন বাবুর বাড়িতে। আমি বললাম,—আরে আমি তো তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট নই, আমি গিয়ে কি করব? ও হেসে বলল, "তবু চল্‌ই না। তুই তো পাড়ার লোক।"

আচ্ছা, আপনার এ ঘরের মেঝেতে কি খড়টড় কিছু বিছিয়ে রেখেছিলেন?—সরাসরি বিপিন বাবুকে প্রশ্ন করল শিখিধ্বজ।

বিপিনবাবু একটু চমকে বললেন,—না, মানে হ্যাঁ, খড় অর্থাৎ গোড়ায় খড়ই বিছোবার ব্যবস্থা করেছিলাম এই শেল্‌ফ্‌টার নীচে খানিকটা। কারণ ওর ওপর কতকগুলো খুব পুরনো পুঁথিপত্তর আছে। ঝাড়-পোছের সময় কোন কারণে হাত ফস্কে পড়ে গেলে মার্বেলের মেঝেতে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে না যায়, পাতাগুলি ভারি মুচমুচে হয়ে গেছে কিনা। কিন্তু বুঝছেন তো, খড় বিছানো দেখতে ভারি বিশ্রী লাগে, এ ঘরের সঙ্গে একদম মানায় না। তাই বড়দা হঠাৎ একদিন এসে বলেছিলেন,—খড় বিছিয়েছিস কেন? খুব ভালো এক রকম ঘাসের মত গাছ আছে, ঠিক রেশমের মত দেখতে। পুরু। পেতে দিলে ঠিক কার্পেট বলে ভুল হয়। তাই এনে পুরু করে বিছিয়ে দে। দেখতেও চমৎকার হবে আর তোর কাজও উদ্ধার হবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম,—কি নাম সে ঘাসের?

দাদা বললেন, নামটা মনে নেই। একটা বিদঘুটে ল্যাটিন নাম। আচ্ছা, আমিই না হয় যোগাড় করে এনে দেব আমার এক বিলিতীবন্ধুর কাছ থেকে। তিনিই এনে দিয়েছিলেন। সত্যি চমৎকার দেখতে। তারই খানিকটা পাতা ছিল। কেউ যেন খানিকটা রেশমী কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে।

—হুঁ। তাছাড়া শুকনো খটখটে নিশ্চয়ই? কিন্তু কতদিন আগে পেতেছিলেন? রঙ চটে যাচ্ছিল না?

—হ্যাঁ, প্রথমে যেমন গাঢ় সবুজ ছিল পরে তা একটু ম্যাটমেটে দেখাচ্ছিল। বড়দার সেই বন্ধু বলে পাঠালেন, মাঝে মাঝে একটু জল ছিটিয়ে ভিজে ভিজে করে রাখতে। তাতে রং জ্বলে যাবে না। দেখলাম ঠিক তাই।

—কিন্তু ভিজে কার্পেটের উপর বই বা পুঁথি পড়লে সে বই বা পুঁথিও তো ভিজে নষ্ট হবে।

—না না, ততটা ভিজে নয়। যাকে বলে একটু স্যাঁৎসেঁতে। ঘাসে শিশির পড়ার খানিকটা পরে যেমন হয়।

—হুঁ। আপনার বড়দা মানে ঐ বড় তরফের মহিমবাবু তো? উনি প্রায়ই আসেন বুঝি?

—না না কচিৎ কখনও আসেন। শুধু জ্ঞাতি তো! তা ছাড়া বুঝতেই তো পারছেন শরিকী সম্পর্ক—

বিপিনবাবু কথাটা শেষ না করলেও যে ইঙ্গিত করলেন তাতেই কথাটা বোঝা গেল। অর্থাৎ মুখে হৃদ্যতা দেখালেও ভেতরে কেউ কাউকে হয়তো পছন্দ করেন না।

মামলা-মোকদ্দমাও চলছে নাকি?—হেসে, চোখটা একটু টেনে শিখিধ্বজ প্রশ্ন করল।

—না, এখন আর নেই। তবে একটা মামলা চলেছিল বেশ কিছুদিন। তাতে উনি—

—হেরে যান, তাই তো?

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। তবে এখন আর উনি সে সব মনে করে রাখেন নি।

—তাই মনে হয়? ঠিক আছে, কাল দেখা হবে। চলি।

পরদিন। অনেক দিন পরে শিখিধ্বজকে পেয়েছি। এই সুযোগে তার কাছে থেকে গোটা কয়েক জরুরি কথা জেনে নেব ভাবছিলাম। তার বাড়ি গিয়ে শুনলাম সে আগেই অফিসে চলে গেছে। তাহলে কি অফিসেই যাব কিন্তু গোয়েন্দা অফিসে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? পরক্ষণেই মনে হল, আমি তো তার সঙ্গে অন্য বিষয়ে দুটো কথা বলতে চাই। দেখা করতে না চায় ফিরে এলেই হবে।

তাই করলাম। একটু পরেই ডাক এল। শিখিধ্বজের ঘরে গিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড! সামনের একটা চেয়ারে বড় তরফের মহিমবাবু দুজন পুলিশ-বেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে অল্প দূরে আর একটা চেয়ারে বসতে বলে শিখিধ্বজ বলল,—একটু বোস্, এর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই। এঁকে চিনিস নিশ্চয়ই?

থতমত খেয়ে ঘাড় নাড়লাম। তারপর গুটিগুটি চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম।

হঠাৎ শিখিধ্বজ সেইরকম পুলিশী ভঙ্গীতে মহিমবাবুকে প্রশ্ন করল,—ঐ রেশমী ঘাসগুলো কোথায় পেয়েছিলেন? আর বিপিনবাবুর ঘরে ওগুলো বিছোবার জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন?

দেখতে ভালো লাগবে বলে? ও তো সম্পর্কে আমার জ্ঞাতি ভাই।

—দেখতে ভালো লাগবে বলে? নাকি মোকদ্দমায় হেরে যাবার প্রতিশোধ নিতে? ঠিক করে বলুন কে এ পরামর্শ দিয়েছিল।

—আমি নিজেই—

—ফের বাজে কথা? আপনি এ গাছের নাম আগে জানতেন? এর চেহারা দেখেছিলেন কখনও? আপনার সেই বিলিতি বন্ধুটি, যিনি এ পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁকেও যে আমরা ধরে এনেছি। পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন তিনি। আপনার সঙ্গে কথা হয়ে গেলে ওঁকে ডাকব।

চোখ ফিরিয়ে দেখি মহিমবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

পরক্ষণেই শিখিধ্বজ যেন গর্জন করে উঠল,—আপনার লজ্জা করল না? একটা লোক এত পরিশ্রম করে এত দুষ্প্রাপ্য বই-এর একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলেছে,—তা সে নিজে পড়ুক আর নাই পড়ুক,—নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সেই লাইব্রেরিতে আগুন লাগিয়ে দিতে!

আগুন! ঘাস বিছিয়ে আগুন!—মহিমবাবু আশ্চর্য হবার ভঙ্গী করলেন।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। গোয়েন্দা হলেও আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, আর ঐ সব গাছপালার বিজ্ঞানই আমার বিশেষ সাবজেক্ট। ঐ ঘাসগুলো এদেশে হয় না। ওগুলো 'হে' জাতীয় একরকম বিশেষ ধরনের ঘাস। দেখতে ঠিক রেশমের মত, বৈজ্ঞানিক নাম

গ্রামিনি ফাইবারিয়া সিল্কিয়া। বাকিটুকু বলব? থাক, আপনার সেই বিলিতী বন্ধুর কাছ থেকে স্বীকারোক্তিটা শোনা যাবে। আপনি ততক্ষণ বরঞ্চ একটু ও ঘরে গিয়ে বসুন।—বলে শিখিধ্বজ পুলিশ দুটিকে ইঙ্গিত জানাল।

মহিমবাবু চলে গেলে শিখিধ্বজের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম,—তুই জেরা কর, আমি না হয় আজ আসি?

শিখিধ্বজ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,—না না, যাস নে। মহিমবাবুর ঐ বিলিতী বন্ধুটিকে একটু জেরা করে নিই, তারপর তোকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। তুই বরং বারান্দার চেয়ারটায় একটু বোস। মিনিট তিন চার। মনে হচ্ছে রহস্যটা ধরে ফেলেছি।

তিন-চার মিনিট পরে শিখিধ্বজের ডাকে আবার ভিতরে চলে এলাম, জেরা শেষ হয়ে গেছে। ঘরে আর কেউ নেই। শিখিধ্বজ দু'কাপ চা আনতে বলল,—ভারি অদ্ভুত কেস্! তোকে একটু বুঝিয়ে বলি। তুই তো আবার গল্প লিখিস। একটা চমৎকার গল্পের প্লট হতে পারে।

গ্রামিনি ফাইবারিয়া সিল্কিয়া হচ্ছে এক রকম বিশেষ জাতের ঘাস, দেখতে ভারি সুন্দর। কিন্তু এগুলির মধ্যে নানা জাতের ব্যাক্‌টিরিয়া খুব সহজেই জন্মাতে পারে—বিশেষ করে যদি এগুলো একটু ভিজে ভিজে থাকে। ব্যাক্‌টিরিয়াগুলো, বলা বাহুল্য, খুবই খুদে—যাকে আমরা বলি অণুবীক্ষণিক। কিন্তু তা হলেও ওরাও তো সজীব অর্থাৎ জ্যান্ত পদার্থ, তাই এদেরকেও শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হয়। এখন তুই তো নিশ্চয়ই জানিস,মোটামুটি দু'জাতের ব্যাক্‌টিরিয়া আছে যাদের একদল বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয়। এদেরকে বলা হয় এরোবিক ব্যাক্‌টিরিয়া। অন্যদলের নিশ্বাস নিতে অক্সিজেন লাগেই না। তাদেরকে বলা হয় অ্যানেরোবিক ব্যাক্‌টিরিয়া। এখন, এই দুই জাতের ব্যাক্‌টিরিয়াই এই জাতের ঘাসে খুব সহজে জন্মায়। শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হলে—তা সে অক্সিজেন নিয়েই হোক আর না নিয়েই হোক,—খানিকটা শক্তি—যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'এনার্জি' তৈরী হবেই। আমরা এগুলিকে বলি রাসায়নিক শক্তি। শুধু রাসায়নিক শক্তি নয়, ও থেকে খানিকটা তাপশক্তিরও সৃষ্টি হয়। এই ঘাসের ব্যাক্‌টিরিয়াগুলোও শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় ঐ তাপশক্তি বার করে দিতে পারে। আর, যদি একটু ভিজে ভিজে—স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া পায়, তাহলে এরা খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। আর ঐ রকম দ্রুত বংশবৃদ্ধি হলে সবাই মিলে যে তাপ বার করতে থাকে তা সময় সময় এত বেশি হয় যে তা থেকে সমস্ত ঘাসগুলোতেই আগুন জ্বলে উঠতে পারে—আপনা আপনিই। অর্থাৎ বাইরে থেকে জ্বালিয়ে দেবার দরকার করে না।

ছোট তরফের কাছে মামলায় হেরে গিয়ে মহিমবাবু যখন কি করে ওদের অনিষ্ট করবেন ভাবছেন তখন তাঁর এই বিলিতী বন্ধুটি, নিশ্চয়ই তিনিও একজন বিজ্ঞানী, তবে বদ্‌-বিজ্ঞানী, তাঁকে এই পরামর্শটি দিয়েছিলেন। বিপিনবাবু যে পুরোনো পুঁথিপত্তর বাঁচাবার জন্য ঘরে খানিকটা খড় পেতে রেখেছেন সে খবর মহিমবাবু জেনেছিলেন এবং ওকেও বলেছিলেন। তারই সুযোগ নিয়েছেন তিনি। ঐ বিশেষ জাতের রেশমী ঘাস বিলিতী বন্ধুটির মারফৎ আনিয়ে তিনি বিপিনবাবুর ঘরে পুরু করে পাতবার ব্যবস্থা করে এলেন। আর তাড়াতাড়ি কার্যসিদ্ধির জন্য ঘাসগুলোকে জল ছিটিয়ে স্যাঁৎসেঁতে করে রাখবার পরামর্শ দিয়ে এলেন। পুরু করে ঐ রকম কোন ঘাস বিছিয়ে দিলে, তা সে যে জাতের ঘাসই হোক না কেন,—তা থেকে যে আপনা আপনি ও-রকম অগ্নিকাণ্ড হতে পারে সাধারণ লোকে তা কল্পনাও করতে পারে না। লেন্স দিয়ে পোড়া ছাই পরীক্ষা করবার সময়ে আমি পোড়া বই আর পোড়া কাঠের মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম সুতোর

মত জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম—যা পুড়ে গেলেও তার স্বাভাবিক আকৃতি বদলায় নি। তাই থেকেই আমার কেমন সন্দেহ হল। তারপর তারই খানিকটা সংগ্রহ করে এনে মাইক্রস্‌কোপের নীচে ফেলতেই আসল রহস্য বেরিয়ে পড়ল। এমন কি কিছু কিছু আধপোড়া ঘাসে তখনও কিছু কিছু ব্যাক্‌টিরিয়া মরে নি। তাদেরকেও চিনে নিতে আমার কষ্ট হল না। তখনই আঁচ করলাম, এ অগ্নিকাণ্ড নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃত এবং কারও কারসাজি—যে নাকি বিপিনবাবুর অনিষ্ট করতে চায়। কথায় কথায় মহিমবাবুর পরামর্শের কথা জেনে নিলাম। তারপরই ডেকে আনবার ব্যবস্থা করলাম মহিমবাবু ও তাঁর পরামর্শদাতা বন্ধুটিকে গোয়েন্দা অফিসে। পুলিশী জেরার চাপে তাঁরা আর আসল কথা চেপে রাখতে পারলেন না। বেচারা বিপিনবাবুর জন্য দুঃখ হচ্ছে। যাই হোক আপাততঃ এই দুই ব্যক্তিকে চালান দেবার ব্যবস্থা করছি।

নে চা-টা খেয়ে নে, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।—কাহিনী শেষ করে বিটু খুড়ি শিখিধ্বজ চায়ের কাপে একটা দীর্ঘ চুমুক লাগাল।
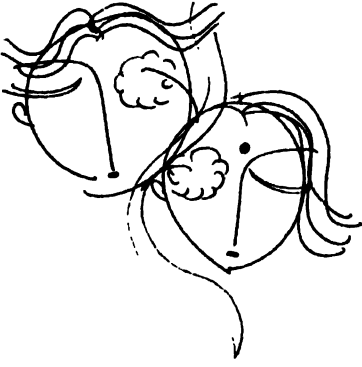
কুকুর ছানার কারবার

মোহাম্মদ নাসির আলী

তোমাদের লেবুমামার ছেলেবেলার কিছুদিন কেটেছে ঢাকা শহরে। লেবুমামা এখন খুব চালাক ; কিন্তু ঢাকায় এক বাট-পাড়ের পাল্লায় পড়ে তাঁকে কি ভাবে নাজেহাল হতে হয়েছিলো সে গল্পটাই আজ তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। এ সব গল্প তাঁরই মুখে শুনেছি।

তখন লেবুমামার ছোটচাচা সাজ্জাদ ছিলেন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। পাড়ার কয়েকজন উৎসাহী যুবক মিলে একটা 'দরিদ্র সেবা সমিতি' করেছে। লেবুমামার চাচা সমিতির ট্রেজারার। প্রতি মাসের পয়লা দিকে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা আদায় করার ভার তাঁর উপর। সেবার তাঁর পরীক্ষার আগে পড়ার চাপ ঝাড়তে বেশি। তাই লেবুকে ডেকে তিনি বললেন,—'তুই একটা কাজ করতে পারিস্ লেবু ? কয়েকটা রশিদ লিখে সই করে দিচ্ছি, তুই গিয়ে রশিদ কেটে দিয়ে চাঁদাটা আদায় করে আনবি। আজকে মাসের তিন তারিখ চলে যাচ্ছে। আর দেরী করলে কিছু আদায় হবার আশা নেই এ মাসে। পারবি তো ?'

পরমোৎসাহে লেবু মামা লাফিয়ে উঠলেন। সমিতির কাজ করার কতো আগ্রহ তাঁর। কিন্তু কিছু একটা করতে গেলেই সবাই বলবে, ছেলে মানুষের কাজ এ-সব নয়। আজকে ছোটচাচার প্রস্তাবটা শুনে তাই লেবুমামা বলে উঠলেন,—'খুব পারবো।'

লেবুমামার মা কিন্তু শুনে বললেন,—'হ্যাঁ, পারবে বই কি। শিয়ালের কাছে মুরগী পুষতে দিচ্ছো আর কি। তিন টাকা আদায় হলে দু'টাকাই খেয়ে আসবে যখন, ক্ষতিপূরণটা তখন কে করবে শুনি ?'

লেবুমামা প্রবল ভাবে প্রতিবাদ করে উঠলেন,—'বারে, আমি কি দরিদ্র যে দরিদ্র সেবা সমিতির টাকা খেতে যাবো ? দেখেই নিও—ঠিক ঠিক আদায় করে আনবো। যদি না পারি তো পুরো একমাস আমি টিফিনের পয়সা চাইবো না—তবেই হবে তো ?'

লেবুমামার চাচা বললেন,—'অতঃপর আর আপত্তি চলে না ভাবী। ঠিক আছে, কাজটা করে আসতে পারিস তো সমিতির মেম্বার করে নেবো তোকে। সঠিক ভাবে করা চাই।'

লেবুর মা কিন্তু তখনও বললেন,—'পাঠাতে হয় পাঠাও গে, তবে তোমার নিজের দায়িত্বে। আমি ভাবছি, আমাকে আবার খেশারত দিয়ে মরতে না হলেই বাঁচি।'

লেবুমামার চাচা সাজ্জাদ সে আপত্তি না শুনে বললেন,—'এতোটুকু কাজ পারবে না কেনো? দু'দিন পরে ওদের ওপরই তো ভার পড়বে সমিতি চালাবার। ও ঠিক পারবে, দেখে নিও ভাবী।'

সাজ্জাদের কথাই অবশেষে ঠিক হলো। কয়েক বাড়ী ঘুরেই লেবুমামা বেশ কিছু চাঁদা আদায় করে ফেললেন। শুধু দু'জায়গায় গিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হলো, কর্তা বাড়ী নেই বলে।

বাড়ী ফিরে আসবার পথে লেবুমামার মনে হলো, মা যেন কি! লেবু যে এমন বড় হয়েছে, ইচ্ছে করলেই একটা কিছু করে আসতে পারে, মা তা বিশ্বাস করতেই চান না। দেখা যাবে আজকে কি বলেন মা। হঠাৎ খেয়াল হলো, হ্যাঁ, রশিদগুলোর সঙ্গে টাকাটা একবার মিলিয়ে দেখা দরকার সব ঠিক আছে কি-না।

তখন প্রায় দশটা বেজে গেছে। পথের পাশে নির্জন বাহাদুরশাহ্ পার্কে লেবুমামা বসলেন হিসেব মিলাতে। সাতটা রশিদ তিনি কেটেছেন। সাত টাকা হতে হবে হিসেবে। পকেটের সবগুলো টাকা বেঞ্চের উপর রেখে গুণে দেখতে লাগলেন। আস্ত টাকা পাঁচ আর দু-টাকার খুচরো,—ঠিকই মিলেছে সাত টাকা।

—'এতো টাকা কোথায় পেলে খোকা?'

টাকাগুলো পকেটে রাখতে রাখতে লেবুমামা হঠাৎ মাথা তুলে দেখলেন, একটা অচেনা লোক এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে তাঁর পেছনে। গায়ে তার বাহারের ডোরাকাটা ধোপ-দোরস্ত শার্ট। পরনে কিন্তু ময়লা পাজামা। মাথার লম্বা চুলে টেরির বাহার। সঙ্গে রয়েছে একটা কুকুর ছানা। তার গলায় সুন্দর বকলেস। কুকুর ছানাটা লেবুমামার সামনে এসে দিব্যি লেজ নাড়ছে। লোকটা টাকাগুলোর দিকে পিট্ পিট্ করে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো,—'ছেলেমানুষ তুমি, এতো টাকা কোথায় কুড়িয়ে পেলে, খোকা?'

—'কুড়িয়ে পেতে যাবো কেনো? আমাদের 'দরিদ্র সেবা সমিতি'-র চাঁদার টাকা।'

—'ওহো গরীবদের জন্যে বুঝি? তা' দাও না আমাকে কয়েকটা টাকা। কাল থেকে কিছু খেতে পাই নি! দেবে?'

—'আমার তো নয়, সমিতির। বেশ তো, গরীব হলে আমাদের সমিতির অফিসে গিয়ে তুমিও দরখাস্ত করতে পারো।'

—'দরখাস্ত? অনাহারে মরলেও লালু শেখ দরখাস্ত-ফরখাস্ত দিয়ে কারো কাছে হাত পাতে না। অমনি দিলে নিতে পারি। আমাদের তিন কূলে কেউ ভিক্ষে করেনি।'

—'কিন্তু টাকা তো আমার নয়, আমার হলে ঠিক দিতাম। এ টাকা যে আমাদের সমিতির।'

কুকুর ছানাটা তখনো পায়ের কাছে ঘোরাফেরা করছিলো আর লেজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করছিলো। লোকটা সেদিকে চেয়ে বললো,—'আনন্দে লাফালে কি হবে? পেটের জ্বালায় তোর মায়া কাটাতে হবে সবার আগে। না-খেয়ে কতদিন তোকে নিয়ে ঘুরবো?'

—'বিক্রি করবে নাকি কুকুর ছানাটা? খেকী কুকুর তো এটা?'

লেবুমামার কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠলো লোকটা,—'খেঁকী কুকুর বলছো তুমি একে? ছেলেমানুষেরা কি-ই-না বলতে পারে—'

লোকটার হাসি আর থামতে চায় না। লেবুমামা অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। অবশেষে সে হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন,—'আফ্রিকার বুলডগ্ এটা—মানে বুলডগের বাচ্চা—মাত্র ক'দিন ওর বয়স। বড় হলে এ জাতের কুকুর উটের মতো হয় আফ্রিকা মহাদেশে। এ দেশে কম করেও একটা ঘোড়ার সমান তো হবেই।'

—'তা'হলে কত দামে বিক্রি করবে।'

–'দামের কথা জানতে চাও? এর দাম ঢাকা শহরে কে দেবে? ভজহরি পালকে জানো? কুকুর বলতে পাগল লোকটা। দেখলাম আফ্রিকার কুকুর চেনে একমাত্র সেই লোকটা। সেই যে নবাবপুরে সিনেমার গায়ের গলিটার ভেতর মস্ত বাড়ীটার মালিক। আজই ভোরে সে পঁচিশ টাকা দাম করেছে, কিন্তু যাকে-তাকে আমার এ আদরের ছানাটাকে দেবো না বলে চলে এসেছি। ভালো লোক পেলে কমেও দিতে পারি। এই ধরো, যদি তোমার মতো লোক পাই, তা'হলে কম দামে দিতে পারি।'

—'পঁচিশের অর্ধেক সাড়ে বারো টাকা। আমার কাছে তো রয়েছে মোটেই সাতটা টাকা। কিন্তু তা-ও তো আমার নয়। আমার হলে—'

—'না-না তোমার নিজের টাকা না হলে কখ্খনো খরচ করা উচিত নয়। অন্যায় কথা কেনো বলতে যাবো।তবে হ্যাঁ, একটা কাজ তুমি করতে পারো, কিনে যদি না-ই রাখতে পারো, অর্থাৎ ওর দামটা পরে যদি যোগাড় না হয়, তবে আবার বিক্রিও করতে পারো স্বচ্ছন্দে। অন্যের টাকা দিয়ে কারবার করতে কোনই দোষ নেই। এই ধরো, ভজহরি পালের মতো অনেক ভালো খরিদ্দার আছে। এক সপ্তাহ পরে যখন এটা একটা বাছুরের সমান উঁচু হবে, তখন চাই কি পঞ্চাশ টাকাই দাম হেঁকে বসবে। আর এক মাস অপেক্ষা করতে পারো তো নির্ঘাৎ একশ' টাকা গ্যারান্টি।' একটু থেমে আবার বলতে লাগলো,—'অবশ্যি, তুমি বলতে পারো আমি কেনো তা' হলে পঁচিশ টাকায় ভজহরি পালকে ওটা দেই নি? শুনেছি ব্যাটা নাকি কোন সার্কাসের জন্যে কুকুর কিনে পাঠায়। সার্কাসের জানোয়ারকে পেটভরে খেতে দেয় না দেখেছি। শুধু সেজন্যে আমি ওকে দেই নি। খুব আদরের জিনিস কিনা।'

লেবুমামা ভাবতে লাগলেন, দোষ কি—যদি ফাঁকতালে কয়েক টাকা লাভ করে বাড়ী ফিরে যাওয়া যায়। এক সপ্তাহ রাখবার দরকার নেই, আজই এটা ভজহরি পালের কাছে বিক্রি করে বাড়ী ফেরা যাবে। পঁচিশ টাকা যদি না-ও দেয়, কুড়ি দিলেই কম কিসে? অনেক কিছু করা যাবে তা দিয়ে। কুকুরটাকে সে কিনে সার্কাসেই দিক—আর নিজের কাছেই রাখুক, কি আসে যায় তাতে?

—'অতো কি ভাবছো খোকা? যদি মনে করো ঠকে যাবে তবে আর কিনতে বলছি না। তা'হলে ভজহরির বরাতেই কুকুরটা আছে। সেখানেই ফিরে যেতে হবে আমাকে। আমার মায়ের ভয়ানক অসুখ। চেয়েছিলাম তাড়াতাড়ি ওষুধ কিনে বাসায় ফিরে যাবো।'

—'কিন্তু আমার কাছে তো রয়েছে মোট সাত টাকা?'

—'তা একটা কথা বটে। তবে হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে যখন এতোটা জানা-চেনা হয়ে গেলো, তখন তোমাকে বিশ্বাস করে ধারেও কেনা-বেচা করতে পারি। তুমি যখন পঁচিশ টাকা পেয়ে যাবে, তখন তোমার বাসায় গিয়ে বাকি টাকাটা আমি নিয়ে নেবো। তোমার ঠিকানাটা আমাকে দাও।'

—'কিন্তু যদি বিক্রি করতে না পারি? ঠিক বলছো তো, ভজহরি পাল এটাকে পঁচিশ টাকা দাম করেছে?'

—'তাজ্জব! এখনো তুমি অবিশ্বাস করেছো আমাকে? থাকগে, তোমার আর কিনে কাজ নেই। গরীব হতে পারি, কিন্তু না-খেয়ে মরে গেলেও মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরুবে না। ছিঃ ছিঃ—এখনো অবিশ্বাস?'

—'না-না বিশ্বাস আমি করছি তোমাকে। এই নাও টাকা। বাকি যখন দিতে চাইছো, তখন আর অবিশ্বাস করবো কেনো?'

অবশেষে সাতটা টাকা আর লেবুমামার বাসার ঠিকানা নিয়ে লোকটা চলে গেলো। যেতে যেতে বললো,—'তোমার ভাগ্যি ভালো। এতো সস্তা দামে এ জিনিস কেউ পেতে পারে না। ঢাকায় এ জাতের কুকুর আর একটাও নেই।'

এদিকে কুকুর ছানাটা বগলে করে বেশ কিছুটা খোঁজাখুঁজির পর লেবুমামা এসে হাজির ভজহরি পালের বাড়ী। মস্ত বড় দোতালা বাড়ী। বাইরের রোয়াকে বসে আছেন ভয়ানক

একটা বুড়ো লোক। গেট পার হয়ে সটান তার কাছে গিয়ে লেবুমামা বললেন,—'এ বাড়ীর ভজহরি্ পাল মশাই বাড়ী আছেন?'

চোখের দৃষ্টিতে লেবুমামার আপাদমস্তক জরীপ করে কুকুর ছানাটার দিকে কটমট করে চেয়ে বুড়ো বললেন,—'কেনো, তাকে কেনো? চাঁদা-ফাঁদা চাই বুঝি? বগলে ওটা আবার কি এনেছো?'

বুড়োর ভাব-সাব দেখে লেবুমামা ভয়ে ভয়ে বললেন,—'তিনি নাকি এই কুকুর ছানাটা পঁচিশ টাকায় কিনতে চেয়েছেন?'

—'আমি কুকুর কিনতে চেয়েছি—আমি? বেরোও-বেরোও এখ্খুনি! বিট্‌লেমীর আর জায়গা পাওনি? রামা, রামা কইরে। দে তো ছোঁড়াটাকে ঘাড় ধরে বের করে—ফাজিল কাঁহাকা।' বলেই বুড়ো তাঁর বিশাল বপু নিয়ে লেবুমামাকে তাড়া করে এলেন। কাছেই পড়েছিলো একটা কলার খোসা। সেটাতে পা পড়তেই ধপাস্ করে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন তিনি। পড়েই চীৎকার, ওরে ব্যাটা রামা, শীগ্‌গীর আমাকে টেনে তোল। রামাকে আর আসতে হলো না। তার আগেই লেবুমামা গেট পার হয়ে রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁকে সে অবস্থায় কুকুর বগলে ছুটে আসতে দেখে পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন,—'কি খোকা, ব্যাপার কি? ও-ভাবে ছুটছো কেনো?'

লেবুমামার মুখে ব্যাপারটা শুনে ভদ্রলোক প্রথমে খুব খানিক হাসলেন। তারপর বললেন,—'তোমাকে নিশ্চয়ই কেউ দুষ্টুমী করে এখানে পাঠিয়েছে। আসল ব্যাপার কি জানো? ঐ বুড়োই ভজহরি পাল। এবার সে মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনে দাঁড়িয়ে মাত্র তিন ভোট পেয়েছে। ওর প্রতীক ছিল 'কুকুর'। ছেলেরা এখন ওকে রাস্তায় দেখলেই কুকুরের নাম করে ক্ষ্যাপায়। কুকুরের নামও করতে হয় না, শুধু একবার 'ঘেউ' করলেই আর কথা নেই—মোটা মানুষ দৌড়োতে পারেন না, কিন্তু হাতের কাছে যা পান তাই ছুঁড়ে মারেন। আর তুমি কিনা তাঁর কাছেই গেছো তোমার কুকুর ছানাটা বিক্রি করতে! শীগগীর পালাও।'

লেবুমামার মুখ শুকিয়ে গেলো। এবার তিনি কী করবেন সেটাই ভাবনার বিষয়। লোকটা নিশ্চয়ই তাঁকে ঠকিয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে চললেন বাহাদুরশাহ্ পার্কের দিকে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। তখন মনে পড়লো, লোকটা গেছে সদরঘাটের দিকে।

সত্যিই তাই, লোকটা তখন নদীর পাড়ে একটা বেঞ্চে বসে দিব্যি আরামে চীনেবাদাম খাচ্ছে। দূর থেকে লেবুমামাকে দেখেই সে বলে উঠলো,—'কি খোকাবাবু, কুকুরটা বেচবে নাকি?'

লেবুমামা বললেন,—'বারে, বেচবো কি? তোমার কুকুর ফেরৎ নিয়ে আমার টাকা ফিরিয়ে দাও। এই নাও তোমার কুকুর।'

ভান করে লোকটা বলে উঠলো,—'কী বললে,—আমার কুকুর? আমি কুকুর পাবো থায়?'

'কেনো, একটু আগে কুকুর ছানাটা দিয়ে তুমি সাত টাকা নাও নি? তোমার কুকুর তুমি নাও, আমার টাকা ফেরৎ দাও।'

'ওহো, এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছি তুমি কোথায় ভুল করছো। আসল কথা কি জানো? এক যমজ ভাই আছে, ঠিক আমার মতই—দেখতে। কে যে আমি—আর কে সে, তা কারো বুঝবার সাধ্যিই নেই। আজ ভোরে ওকে দেখেছি একটা কুকুর ছানা বগলদাবা রাস্তায় বেরোতে। সেই বেল্লিকটারই এ কাজ। নিশ্চয়ই নাম বলেছে, লালু শেখ? মায়ের

অসুখের কথাও নিশ্চয় বলেছে?'

—'হ্যাঁ, তাইতো বলেছে?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলবেই তো! আমি জানি, এ সব কথা বলেই সে লোককে ঠকায় আর তারা এসে আমাকে ধরে। আসল কথা কি জানো? আমার নামই লালু শেখ আর ওর নাম কালু শেখ। কিন্তু কেউ নাম জিজ্ঞেস করলেই দিব্যি আমার নাম বলে আমাকে ফাঁসাবে। ওর জন্যে কতো জায়গায় যে আমাকে অর্থ দণ্ড দিয়ে মরতে হয়েছে তার হিসেব নেই। শত হলেও মায়ের পেটের ভাই তাকে ফেলবো কোথায়? যাক'গে সে সব কথা। হাতে-নাতে ধরা যখন পড়েছে তখন টাকার জন্যে তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই। তুমি আধ ঘন্টা এখানে দাঁড়াও, আমি টাকা শুধ্‌ধু ওকে কান ধরে এনে হাজির করছি। উল্লুক কাঁহাকা, ভদ্রলোকের ছেলেকে কখনো এভাবে ঠকাতে আছে? ছিঃ ছিঃ! চীনেবাদাম খাবে? নাও, বসে বসে তুমি চীনেবাদাম খাও, আমি যাবো—আর আসবো।'

এই বলে লেবুমামা কিছু বলবার আগেই চীনেবাদামের ঠোঙ্গাটা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে লোকটা হন্ হন্ করে নদীর ধার ধরে বাদামতলীর দিকে চলে গেলো। লেবুমামা থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু দুপুরের রোদে কতোক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

আধ ঘন্টার জায়গায় এক ঘন্টা কেটে গেলো, তবু লোকটার দেখা নেই। লেবুমামা হতাশ হয়ে পড়লেন। আসল ব্যাপারটা বুঝতে বাকী রইলো না তাঁর। একই লোক তাঁকে দ্বিতীয়বার ধোঁকা দিয়ে গেলো। তবু তিনি ধরতে পারলেন না! মার কাছে গিয়ে কি করে সে মুখ দেখাবেন সেটাই এখন তাঁর একমাত্র ভাবনা। শীগ্‌গীর বাড়ী ফিরে না গেলে সাজ্জাদ চাচা হয়তো পরীক্ষার পড়া ফেলেই ছাতা নিয়ে বেরোবেন তাঁর খোঁজে।

হঠাৎ তাঁর একটা খেয়াল এলো মাথায়। 'দরিদ্র সেবা সমিতি'-র কথা বলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে কিছু কিছু চাঁদা চাইলে কেমন হয়? পুরো সাতটা টাকা না-পেলেও কিছু তো পাওয়া যেতে পারে। লেবুমামা সেই চেষ্টাই করবেন। চেষ্টা করতে দোষ কি! অচেনা বাড়ীতে ঢুকে কি বলবেন, সে তার একটা মহড়া দিয়ে নিলেন মনে মনে।

এক পা দু'পা করে প্রথম একটা বাড়ীতে ঢুকতেই তাঁরা বললেন,—'কর্তা বাড়ীতে নেই, অন্য দিন এসো।'

আরেক বাড়ীতে যেতে একজন বললেন,—'এই বয়সে একাজ তো ভালো নয় খোকা। বাড়ীতে গিয়ে বরং পড়াশুনো করো। সিনেমা দেখার পয়সা চাই বুঝি?'

তার পাশেই বসেছিলেন আরেকজন লোক। তাঁকে লক্ষ্য করে প্রথম লোকটি অনেক কিছু বলতে লাগলেন। লেবুমামার বুঝতে বাকি রইলো না কথাগুলো তাঁকে নিয়েই বলা হচ্ছে। তিনি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু এ ছাড়া কী-ই বা করবেন? খালি হাতে কি করে বাড়ী ফিরে যাবেন? এদিকে দু'টো বাড়ীতে ঢুকে কোন কিছুই হলো না। গরীবের নামে দান-খয়রাত করবার লোক এরা নয়। তা'ছাড়া বাড়ী ঘর দেখেই মনে হচ্ছে, চাঁদা দেয়ার মতো ক্ষমতা এদের নেই। বড়লোক দেখে দু'একটা বাড়ীতে চেষ্টা করলে কেমন হয় দেখা যাক। হ্যাঁ, এটা সত্যি বড়লোকের বাড়ী! ভাগ্য ভালো হলে এ বাড়ীতে কিছু পাওয়া যেতেও পারে।

গেট পার হয়ে কয়েক পা' এগিয়ে যেতেই কুকুর ছানাটা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে হাত-পা লাগলো। লেবুমামা অগত্যা সেটাকে মাটিতে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়েই কিন্তু কুকুর

এক দৌড়ে অন্দরে গিয়ে ঢুকলো।

বাড়ীর ভেতরে তখন হৈ চৈ কাণ্ড! নিশ্চয়ই তাঁর কুকুর ছানাটা কিছু একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে! হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেবুমামা ভাবতে লাগলেন। কে জানে কি অঘটন ঘটিয়েছে অপয়া কুকুরটা!

ঠিক এমন সময় কুকুর ছানাটা কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন একজন লোক। তাঁর পেছনে বাড়ীর সবাই। লেবুমামাকে অপরাধীর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন বললেন,—'তুমিই পপিকে খুঁজে এনেছো বুঝি?'

লেবুমামা জবাব দেবার আগেই আরেকজন বলে উঠলেন,—'আমি তো আগেই বলেছিলাম, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই পাওয়া যাবে।'

তাঁর পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রমহিলা বললেন,—'ঠিকই বলেছো, আগে বিজ্ঞাপন দিলে আগেই পাওয়া যেতো। পপি পপি করে রোগা ছেলেটা ক'দিন থেকে ভেবে ভেবে আবার অসুখে পড়েছে।'

একজন বৃদ্ধা মহিলা লেবুমামার আপাদ-মস্তক দেখে বললেন,—'ছেলেটির মুখচোখ শুকিয়ে গেছে দেখছিস্ না তোরা? না জানি বাছা কতোদূর থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছে। তোরা একজন কেউ কিছু নাশ্‌তা এনে ওকে খেতে দে।'

তারপর এগিয়ে এসে লেবুমামার মাথায় হাত রেখে তিনি বলতে লাগলেন,—'বেঁচে থাকো বাছা, আমার মাথায় যতো চুল ততো বছর পরমায়ু হোক তোমার। এতো শীগ্‌গীর পপিকে খুঁজে আনবে তুমি, তা ভাবিনি। দশ টাকার জায়গায় পনেরো টাকা পুরস্কার দেবো তোমাকে।'

নাশ্‌তা খাওয়ার পর একজন লোক পনেরোটা টাকা লেবুমামার হাতে দিয়ে বললেন,—'এই নাও তোমার পুরস্কার পনেরো টাকা। কাগজে বোধহয় দেখেছো, দশ টাকা পুরস্কারের উল্লেখ আছে সেখানে। কিন্তু আমার বুড়ো মা খুশী হয়ে পাঁচটা টাকা অতিরিক্ত দিয়েছেন তোমাকে। তা'ছাড়া আজ কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোতে আজই যে হারানো পপিকে পাবো তা ভাবিনি। আমার এক রোগা ছেলের আদরের কুকুর ছানা ওটা। এক দণ্ড ওকে ছেড়ে থাকতে পারে না সে ছেলে। জ্বরের ঘোরে আজ তিন দিন থেকে কেবলই পপি পপি করে প্রলাপ বক্‌ছে ছেলেটা।'

এমনটা যে ঘটতে পারে আধ ঘন্টা আগেও লেবুমামা তা ভাবতে পারেন নি। একেই বলে শাপে বর।

অনেক বেলায় বাড়ী ফিরে আসায় মা অবশ্যি প্রথমে রেগে উঠলেন, কিন্তু সবকিছু শুনে মিটিমিটি হাসি ছাড়া মুখে আর কিছুই বললেন না। সাজ্জাদ চাচা হেসে বললেন,—'কুকুর ছানার কারবারে লাভ হয়েছে অনেক টাকা। তোকে সমিতির বিশিষ্ট সদস্য করে নিলাম আজ থেকে।'
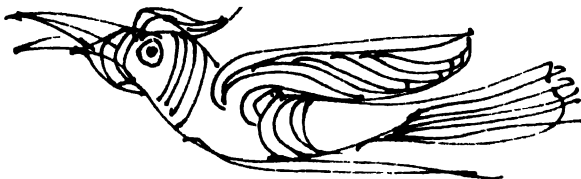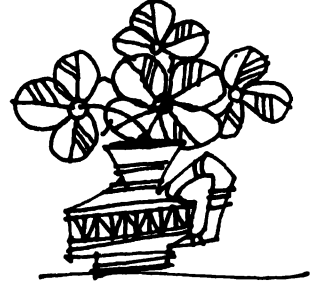
দুয়ে দুয়ে শূন্য

সুকুমার দে সরকার

পাল-তোলা মেঘ নীল সাগর থেকে উঠে নীল আকাশে ভেসে পড়েছে, আমরা পাল্লা দিচ্ছি তার সঙ্গে। কাশবনে ঢেউ তুলে হাওয়া তাড়া করেছে আমাদের পিছনে, দু-পাশে সোনালি সবুজ ধানের ক্ষেত। অনেক দূরে খেলাঘরের রেলগাড়ির মত একটা ট্রেন পাগলা মোষের মত ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলে গেল, ডোবার ওপর একটা শরের ডগায় বসে একটা দোয়েল টুপ টুপ করে ল্যাজ দোলাচ্ছে। আমরা ফিন্ ফিন্ করে ছুটে চলেছি। আমাদের পেছনে পড়ে রইল কত আঁকা-বাঁকা খাল, কত লতা-ঢাকা একশো বছরের বটের ছায়া আমরা পেছনে ফেলে এলাম, কত—হাজার বছরের—বাঁশের গরুর গাড়ি ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে কাঁচা রাস্তায় সবেগ মন্থর গতিতে চলতে চলতে অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমাদের দিকে, কত রাখাল ছেলের মেঠো গান ধুলোয় ঢাকা দিয়ে আমরা এগিয়ে এলাম—হাজার হাজার বছরের শান্ত গ্রাম—আমাদের গতির ঢেউ লাগল না তাদের মনে। হ্যাঁ লেগেছিল—একটা গরুর হঠাৎ কি খেয়াল হল আমাদের দেখে, ল্যাজটা শূন্যে তুলে দিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মারল ছুট পশ্চিমের পানে। পশ্চিম আকাশে তখন কালচে লালের রেখা পড়েছে, তারও নিচে ধূসর।

আমরা সাইকেল-টুরে বেরিয়েছি। পূজোর ছুটি।

পটু বলল—পা-দুটো ঠিক সীসের মত ভারী হয়ে গেছে! কাছাকাছি গাঁ আর কতদূর?

—কাছেই হবে, গরু চরছে দেখতে পাচ্ছিস না? বলল রমি।

রমির দিকে চেয়ে পটু বলল—গরু তো আমার পাশে-পাশেই চলছে অনেকক্ষণ থেকে। পটুর পাশাপাশি যাচ্ছিল রমি।

—চলছে তো বলিনি, চরছে।

—ওই চরতে গেলেই চলতে হয়। তুই দাঁড়িয়ে চরতে পারিস?

ওপাশ থেকে লালমণি বলল—কিন্তু গাঁয়ে পৌঁছলেই বা কী হবে ?

—কেন ?

—আমি সীটের সঙ্গে আটকে গেছি।

—সে কী রে ?

—হ্যাঁ ! তোরা আমাকে নামিয়ে নিয়ে সাইকেল শুদ্ধ শুইয়ে দিস। পটু আমার দিকে চেয়ে বলল, ওই দোলগোবিন্দ তোর সীটের নীচে একটা চাঁট মারলেই, সীট থেকে ছেড়ে ছিটকে পড়বি, দেখতে হবে না।

আমার নাম গোবিন্দ, ছেলেবেলায় মা কোনদিন ভুলিয়েছিল কিনা জানি না, এরা নামের আগে বিশেষণ যোগ করার সময় কেউ সে খোঁজ নিয়েছিল কিনা তাতেও আমার সন্দেহ আছে ; কিন্তু সকলের এক মতে, উপায়ের অভাবে নির্বিবাদে হয়ে গেছি দোলগোবিন্দ। ভবিতব্যকে স্বীকার করাই ভাল।

সামনের মাঠে খানিকটা দূরে একটা ছেলে একপাল গরু নিয়ে ফিরছিল, আমি তাকে ডাকলাম—হুই !

গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই মেঠো ডাকটা আমরা আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম।

ছেলেটা এল মাঠ পার হয়ে পথের ওপর। আমাদেরই বয়সী হবে, কিন্তু চেহারাটা দেখবার মতন। লিকলিকে সরু সরু হাত পা, পরনে একটা নেংটি আর উদরের পরিধিটা বিশাল।

—কী কও কর্তা ?

—সামনের গাঁয়ের নাম কী রে ?

—নাম ? জাননা ?

—জানলে কি মস্করা করছি ?

—সোনারং কয়।

—কয় ?

—উঁ।

—এখান থেকে কতদূর আর ?

—দূর ? জাননা ?

—খুব জানি, তবু একবার চাঁদবদনে বল ?

—এই, এক-পোয়া পথ।

—এক পোয়া !

—উঁ।

পটু বলল—পথ কি দুধ ?

রমি বলল—পথ কি তেল ?

—পথ কি গুড় ? বলল লালমণি।

—আধ-সের নয়ত ? আমি জিগেস করলাম।

পটু বলল—ওরে, ওর ভুঁড়িটা দেখছিস ? রোজ এক-পোয়া পথ খেয়ে-খেয়ে করেছে।

ছেলেটা হঠাৎ মাঠের দিকে টেনে ছুট মারল আর যেতে-যেতে আমাদের উদ্দেশে যে কথাটা বলে গেল সেটা এখানে না বলাই ভাল।

সোনারঙে আমরা যখন ঢুকলাম তখন সূয্যি ডুবে গেছে, পথে অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে আর আকাশের ছায়াপথে অজস্র তারার বাতি জ্বলে উঠেছে। একটা বাড়ির দরজায় এসে

আমরা কড়া নাড়লাম। দূরে একটা ঝোপে অজস্র জোনাকি চিক চিক করছে। ভিতর থেকে সাড়া এল—কে ও?

—আজ্ঞে আমরা।

—আমরা?

—হ্যাঁ আমরা।

—তবে ত ধন্য হয়ে গেলুম, বলতে বলতে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়াল।
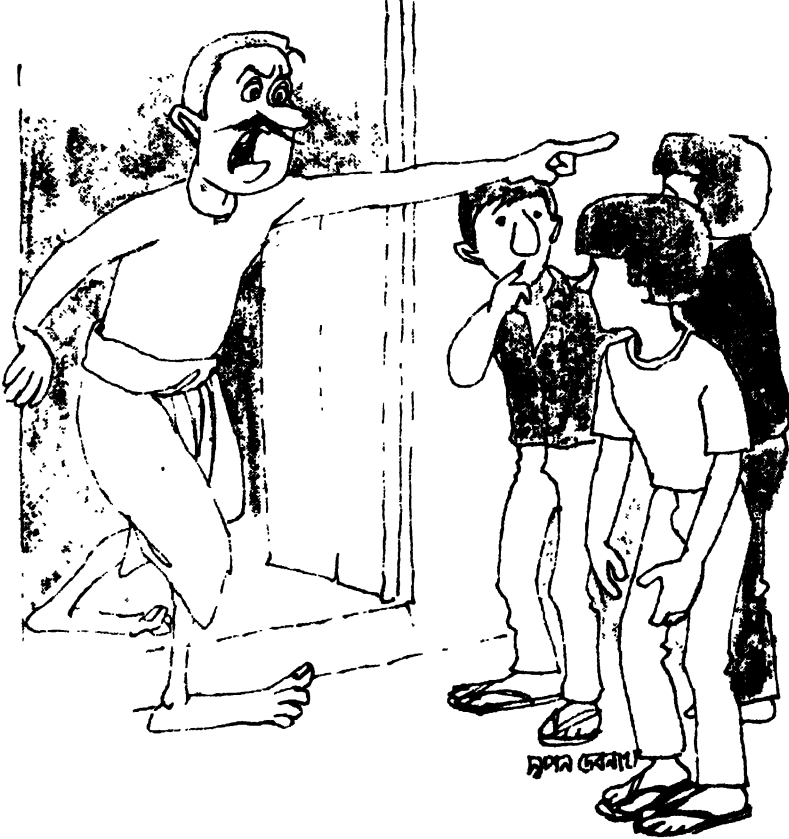
আমাদের সাইকেলের বাতি না থাকলে অন্ধকারে তাকে দেখতেই পেতাম না কারণ বুড়ো অন্ধকারের চেয়েও কালো।

—কী চাই বাপু?

—আজ্ঞে আজকের রাতটা আমরা আপনার এখানে থেকে যেতে চাই।

—ওঃ, এই সামান্য কথা? আর কী চাই? কিছু খাবে-দাবে না?

—নিশ্চয় নিশ্চয়, আমরা সমস্বরে গেয়ে উঠলাম।

—লুচি, পাঁঠা, পুকুরে জাল দিলে দুটো পঁচিশ-সেরী কাৎলাও উঠতে পারে।

পটু বলল—আর নিশ্চয় দই পাওয়া যায়?

—খুব, খুব।

—আর পাত্তয়া কিছু লালমণি বলল, বেশি নয় ছ-টা করে, তা আর বেশী কি ?

—কিচ্ছু না কিচ্ছু না।

রমি আমার কাণে কাণে বলল, বুড়ো খুব মাই-ডিয়ার আছে, না রে ?

আর বুড়ো গর্জে উঠল—তোমরা কে হে বাপু ? হঠাৎ যেন ট্রেন চলতে চলতে হল কলিশন।

আমি জবাব দিলাম—আজ্ঞে আমরা টুরিস্ট।

—কি ?

—টুরিস্ট।

—ডেঁপো ছোকরা ! আবার ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে ?

—কই আমি ত.......

—আমিও টুরিস্ট, বুঝেছ ছোকরা, দুটো রিস্ট আমারও আছে আর আমার রিস্ট দুটো তোমাদের থেকে অনেক চওড়া। আর আমার দুটো রিস্ট ছাড়া আরও দুটো জিনিষ আছে। কুকুর, বুঝেছে ? ভাগো, ভাগো সব স্বদেশী ডাকাত !

বুড়ো সশব্দে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল। বাংলার লোক নাকি অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণ। কিন্তু সোনারঙে আমরা দেখেছিলাম উল্টো। কিন্তু তা-বলে আমরা অন্যান্য গ্রাম সম্বন্ধে হতাশ হইনি। একটা নিয়মের ব্যতিক্রম নিয়মের নিয়মত্বই প্রমাণ করে। সোনারং ছিল একটা ব্যতিক্রম। গ্রামের প্রায় ঘরে-ঘরেই সেই একই ব্যাপার—কেউ থাকতে দিতে রাজি নয় এবং শেষ পর্যন্ত খোঁজ নিয়ে জানা গেল গাঁয়ের জমিদার-বাড়িটা অনেক দিনের পোড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেখানে ইচ্ছে করলে আমরা গিয়ে থাকতে পারি। বাড়িটা সম্বন্ধে যদিও অনেক অপবাদ আছে, তবে স্বদেশী ডাকাতদের আবার প্রাণের মায়া কী ?

সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ ভেঙে পড়েছিল, আমরা নিরুপায় হয়ে ঠিক করলাম, ওই ভূতের বাড়িতেই থাকা যাবে। নেহাৎ একা ত নয় আমরা, চারজন একসঙ্গে আছি ; তার পরে যা থাকে কপালে। মানুষের আতিথেয়তা ত দেখা গেল, এবার দেখা যাক ভূতের।

অন্ধকার ঠেলে জমিদার-বাড়ি এসে যখন আমরা উঠলাম তখন রাত গাঢ় হয়েছে। দূরে কোথায় একদল শেয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির ভাঙা সিংদরজা দিয়ে ভেতরে পা দিয়েই গা-টা ছম-ছম করে উঠল। ঠাণ্ডা একটা শ্যাওলার গন্ধ।

রমি বলল—ও ভাই !

—কী রে ?

—ভয় করছে।

দূর, ভয় কী ? বলতে বলতে আমরা চারজনে আরও গা ঘেঁসাঘেঁসি করে এলাম। সঙ্গে সম্বল চারটে সাইকেলের বাতি।

নিচেটা এত ঠাণ্ডা আর এত অন্ধকার যে প্রতিপদেই যেন মনে হয় ঘরের কোণগুলোতে কারা সব লুকিয়ে আছে অদৃশ্য জীব। আমরা সোজা উপরে উঠে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ি-ঘরগুলো সেকেলে, নিচু-নিচু, তার চারপাশ ঘিরে গাঢ় অন্ধকার নিঃশব্দে গোলমাল শুরু করেছে। আমাদের বাতির আলোর রেখাগুলোকে দেখে সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার যেন অট্টহাসি হেসে উঠল। ক্লান্ত শরীরে সামনে যে ঘরটা পেলাম সেটাতেই ঢুকে পড়লাম—ধূলোয় ভরা নিরাভরণ ঘর। কোনো রকমে মেঝের খানিকটা ধূলো ঝেড়ে আমরা সেখানেই শুয়ে পড়লাম—ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুম এসে আমাদের সব অভিযোগ দূর করে দিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ পটুর চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল—কে আমায় লাথি মারল, ওরে বাবা!

সঙ্গে সঙ্গে লালমণিও চেঁচিয়ে উঠল—আমাকেও, আমাকেও!

রমিও চেঁচাতে শুরু করল—আমাকেও মেরেছে, ও বাবারে!

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। সাইকেলের বাতিগুলো নিভে এসেছে। সেই স্তিমিত অন্ধকারে দেখি, পটু চোখ বুজিয়ে চেঁচাচ্ছে আর দুমদাম করে হাত-পা ছুঁড়ছে। কখনও লাথি পড়ছে রমির গায়ে কখনও লালমণির গায়ে। আমি বললাম—এই পটু, কী হচ্ছে কী?

সোঁ সোঁ করে একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকল, হুড়মুড় করে ঘরের জানলা ভেঙে নিচে পড়ে গেল। সঙ্গীরা তখন উঠে বসেছে। হঠাৎ নিচে থেকে একটা শব্দ হল—হুম্! উঁ!

আমাদের মুখে আর কথা নেই, কাছাকাছি ঘেঁসে বসেছি!

রমি বলল—ও কী?

আবার শব্দ হল—হুম্ হুঁ উঁ! আর মনে হল শব্দটা যেন সিঁড়ি দিয়ে আসছে। সিঁড়িতে কার পায়ের আওয়াজ বেজে উঠল দুম দুম করে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—কে?

কোনো সাড়া নেই।

আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দটা এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা নিস্তরঙ্গ যুগ! আমরা কাঁপছি। ঘরের দরজায় আবির্ভাব হল এক সাদা মূর্তির। অন্ধকারে মূর্তিটার সাদা রেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

—হুম্!

আমার গলা দিয়ে কোন-মতে বার হল—কে?

—ভূত!

—কি করছ তুমি এখানে?

—ভয় দেখাচ্ছি।

—কেন, আমরা কী করেছি?

—কিছু না।

—তবে?

—ভূত ভয় দেখাবে না? হুম। হি হি হি হি!

মূর্তিটা ঘরের মধ্যে এক পা বাড়ালো।

—আর এগিও না। আমি বললাম।

—কেন?

—কামড়ে দেব?

ওদিকে আমার দাঁতে দাঁতে তখন ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

—কামড়ে দেবে?

—হুঁ।

—তোমার দাঁতে ধার আছে?

—ভীষণ!

—তবে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে কেন?

—ও কিছু নয়, ক্ষিধে পেয়েছে বলে।

—ক্ষিধে পেয়েছে? এতক্ষণ বলনি কেন?

মূর্তিটা হঠাৎ যেন উবে গেল। বাইরে ঘন অন্ধকার।

আর পাঁচ মিনিট পরে দুম করে একটা পুঁটলি পড়ল। খুলে দেখি পুঁটলিতে একরাশ মুড়ি আর নারকেল। খাবার দেখে ক্ষিধেয় আমাদের পেট আবার জ্বলে উঠল কিন্তু বুক তখনও দুর দুর করে কাঁপছে। খাব কি না ভাবছি, হঠাৎ দরজার পাশ থেকে গলা শোনা গেল—খেয়ে নাও বলছি! কড়া গলা।

আমরা চটপট খেতে লেগে গেলাম—কি জানি, ভূতকে সন্তুষ্ট করাই ভাল।

মুড়ি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি চুপি চুপি সঙ্গীদের বললাম—বেশ ভাল ভূত, না রে?

পটু বলল—চলে গেল নাকি?

আমাদের তখন একটু সাহস ফিরে এসেছে। যে ভূত খেতে দেয় সে নিশ্চয় কোন অনিষ্ট করবে না। আমি সাড়া দিলাম—ইয়ে! ও ইয়ে .....

সাদা মূর্তিটার একটুখানি দেখা গেল দরজায়।

—ইয়ে কি? চালাকি হচ্ছে আমার সঙ্গে? নাম ধরে ডাকতে পার না?

—নাম কী?

—কী আবার? ভূত।

—ও! তা ভাই ভূত, তুমি কী করছ?

—ছুরি শান দিচ্ছি।

বুকের মধ্যে রক্ত চল্‌কে উঠল।

—ছুরি কেন?

—তোমাদের কাটা হবে না? খাইয়ে-দাইয়ে পাঁঠা মোটা করলাম, এবার বলি দিতে হবে।

কী বলা যায় ভাবছি, কারণ ওর সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলতে পারি ততক্ষণই জীবনের আশা। কোনরকমে পুব আকাশ একবার ফর্সা হলেই জানি ভূত আর থাকতে পারবেনা। কিন্তু এখন ও ছুরি শানাচ্ছে।

পটু হঠাৎ বলে উঠল—ছুরি কেন? ঘাড় মটকাতে ভুলে গেছ বুঝি?

মূর্তিটা বোধহয় এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপরে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে এল—ঘাড় মটকানো বড় গোলমেলে, তার চেয়ে ছোরা দিয়ে গলার নিচে—কুচ্‌! চমৎকার!

রমি বলল—কেন আমরা কী করেছি?

জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগল। আমি পুবের দিকে তাকালাম, ভোর হতে আর দেরি নেই।

মূর্তিটা বলল—কিচ্ছু করনি।

—শুধু-শুধু তুমি আমাদের মারবে?

আমি বললাম—ভেবে দেখ, আমাদের মারলে আমাদের মা কাঁদবে, বাবা কাঁদবে, দাদা কাঁদবে, বৌদি কাঁদবে, বৌদির দিদি কাঁদবে আর শ্বাশুড়ি কাঁদবে, তার ছেলে কাঁদবে তার শালা কাঁদবে ......

পটু শুরু করল—আর ঝণ্টু আমার সাইকেলটা নিয়ে নেবে কাঁদতে কাঁদতে—

—ঝণ্টু কে ?

—আমার ছোট ভাই।

—আর মণ্টু আমার ফাউনটেন পেনটা নিয়ে নেবে, আর—আর—আমি আবার চালালাম—আর আমার কুকুরটা কাঁদবে, তার ছানাগুলো কাঁদবে, আমাদের ফুটবল ক্লাব কাঁদবে, ফুটবলটা কাঁদবে, মাঠ কাঁদবে, কলেজ কাঁদবে ....

হঠাৎ মূর্তিটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—ওরে আমার সোনাতন রে—এ—এ—

কী হল, কী হল ? সোনাতন বুঝি তোমার ছেলে ? মরে গেছে বুঝি ?

—না সোনাতন আমার ছাগল, তাকে খেয়ে ফেলেছি।

—ঘাড় মটকে ?

না, কেটে। ওরে আমার সোনাতন রে—এ—এ—

—দেখ তা হলে, আমাদের কেটে তুমি-শুদ্ধ কাঁদবে।

—হুঁ তাই তো দেখছি।

—তাহলে ভাই ভূত, তুমি আমাদের ছেড়ে দেবে তো ?

—না।

—ছাড়বে না ?

—না।

—কিছুতেই না ?

উঁ, ভূতটা একটু ভেবে বলল, ছাড়তে পারি যদি তোমরা একটা প্রশ্ন বলতে পার।

প্রাণে একটু আশা এল। পূবেও দেখি একটু বুঝি আলোর ছোঁয়া লেগেছে।

—কী প্রশ্ন ?

—দুয়ে দুয়ে কত ?

ওঃ এই ! ভেবেছিলাম না-জানি কি ভূতুড়ে প্রশ্নই না হবে। বেঁচে গেলাম এবার।

বললাম—দুয়ে দুয়ে চার।

ভূতটা মাথা নাড়ল—হল না। আমরা চারজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম—হল না মানে ?

—দুয়ে দুয়ে চার ত সবাই জানে।

—না।

—তবে কত ?

—শূন্য।

—দুয়ে দুয়ে যোগ করলে শূন্য হয় ?

—যোগ করতে বলছে কে ?

তবে কী করতে বলেছ ?

—বিয়োগ। নাও তৈরি হও ; আমার ছোরা শানানো হয়ে গেছে। আমরা এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠলাম—কে আছ বাঁচাও ! মেরে ফেললে ....

কোথায় দূরে একটা মুরগি তারস্বরে চীৎকার করে উঠল, পূব আকাশে ধূসর আলোর ছোঁয়াচ লেগেছে।

—আমি বলে উঠলাম—চুপ, চুপ !

—সবাই জিগেস করল—কেন ? কেন ?

—ভূতটা আর আমাদের মারতে পারবে না।

মূর্তিটা তাড়াতাড়ি জিগেস করল—কেন?

—ভোর হয়ে গেছে, সকাল হলে কি ভূতে কিছু করতে পারে?

—ভোর হয়ে গেছে? ভূত জিগেস করল।

—হ্যাঁ, ওই দেখ না আলো, আর ওই শোন মুরগি ডাকছে।

—তবে বড় বেঁচে গেছ।

ভূতটা তখনও অন্ধকারই ঘরের মধ্যে থেকে দুম দুম করতে করতে নিচে নেমে গেল। আর আমরা প্রায় তার পেছনে মরি-কি-বাঁচি না ভেবে প্রাণপণে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি সামনে সেই সাদা মূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে। বাইরে অনেক লোক জড় হয়েছে, বোধহয় আমাদের চীৎকারে।

আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম—ভূত! ভূত!

একজন লোক জিগেস করল—কই?

—ওই যে সামনে!

—ও তো পাগলা হরিদাস।

অ্যাঁ! পাগল?

—এ কদম!

দেখি, আপাদমস্তক গায়ে কাপড় জড়িয়ে পাগলা হরিদাস গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে—হরি বল মন রসনা .....

সকাল হয়ে গেছে। ধানের ক্ষেতে সোনালী রোদ উঠেছে, আমরা পেছনে ফেলে এসেছি সোনারং। আকাশের মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। পাশের ঝোপের মধ্যে থেকে একটা পাখি ডাকছে—কুক্ কুক্! শঙ্খচিল উড়ছে আকাশে। জলার ধারে ধার্মিক বক নিথর পাথরের মত বসে আছে। চিক চিক করছে সবুজ ঘাসের মধ্যে একটুখানি রূপোলি জল। আমরা সব পেছনে ফেলে চলেছি। সামনে আমাদের ডাকছে সামনের রহস্যময় আবছা মায়া!

যুদ্ধের গল্প

ধীরেন্দ্র লাল ধর

পাকিস্তানের যুদ্ধ।

পূর্ব ও পশ্চিমে বিরোধ। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য মানবে না, তারা বিচ্ছিন্ন হতে চায়। কিন্তু পশ্চিম তার অধিকার ছাড়বে কেন?

নগরে নগরে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

পশ্চিম পাক ফৌজ একটি নগর দখল করেছে।

বহুলোক নগর ছেড়ে পালিয়েছে। অনেকে হাংগামা হুজ্জতের মধ্যে গুলি খেয়ে মরেছে। কিছু ঘর বাড়ী নষ্ট হয়েছে। কোথাও আর মানুষ দেখা যায় না। নগরে শ্মশানের স্তব্ধতা।

ফৌজের সেনানায়ক নাদির খান বেশ খুশি হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে এই অঞ্চলের সবটাই সে দখলে এনেছে বিশেষ ক্ষয় ক্ষতি কিছুই হয়নি। পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে আসার জন্য পঞ্চাশ জনও মরেনি। মরেছে মাত্র বারো জন। তা-ও নিজেদের শেষে মরেছে দুজন, রাতের একা একা বাইরে বেরুবার দরকার কি ছিল?

ছেলে ছোকরার দল—স্বেচ্ছা সৈনিক দল তাদের প্রতিরোধ করেছিল। শিক্ষিত রেগুলার ফৌজের সামনে সাধারণ ভলেনটিয়ার! নাদির তাদের চূর্ণ করে দিয়েছে। এই অঞ্চলে পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের কোন ছেলে নিয়ে নাদিরের ফৌজের সামনে রেহাই পায়নি। নাদিরের সেই রকমই হুকুম ছিল।

এক বাড়ীর বারান্দায় ইজিচেয়ারে নাদির বসেছিল জমাদার এসে স্যালুট করলো।

—কি খবর?

—সব ছোট ছেলেদের ইস্কুল বাড়ীতে জড়ো করেছি হুজুর।

—ঠিক আছে। কাল সকালে সব শেষ করে দোব। এমন করে দেবো, যে এই অঞ্চলে আগামী বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে আর কোন জোয়ান মানুষ পাওয়া যাবে না। বিদ্রোহ করার কি

ফল তা রীতিমত বুঝিয়ে যাবো।

জমাদার এই সেনানায়কের সঙ্গে অনেকদিন আছে। নাদিরের রুক্ষ গাম্ভীর্যকে অন্যান্যরা যত ভয় করে, এই জমাদার রহমৎ তা করে না। নিম্নকণ্ঠে সে বললো—ওই বাচ্চাগুলোকে কি খুন করতে হবে হুজুর ?

নাদির কঠোর দৃষ্টিতে জমাদারের মুখের পানে তাকালে তারপর রুক্ষ স্বরে বললো—যা অর্ডার পাবে তাই করবে, এখন গেট আউট। জমাদার জুতোর গোড়ালি ঠুকে স্যালুট জানিয়ে বিদায় হলো।

সন্ধ্যার দিকে কয়েকজন মাতব্বরকে ধরে আনা হলো নাদির খানের কাছে। নাদির আদেশের সুরে বললো—কাল সকাল থেকে বাজার হাট চালু রাখতে হবে। দোকান বাজার খুলতে হবে। তোমরা এখানকার মাতব্বর, এখানকার সব দায়দায়িত্ব তোমাদের। কাল থেকে আমাদের জন্য নিয়মিত খাসি সরবরাহ করবে। এর কোন রকম অন্যথা হলে চলবে না।

একজন মাতব্বর সাহস করে বললো—অনেক দোকানের মালিক তো পালিয়ে গেছে। সেসব দোকান খুলবে কে? তালা ভেঙে অন্য লোক দিয়ে সেইসব দোকান আপনারা খোলাবেন। আমি কোন কথা শুনবো না। কাল সকাল থেকেই নগরের অবস্থা আমি স্বাভাবিক দেখতে চাই।

বৃদ্ধ আবার বললেন—কালই সব ঠিক হবে না দু-একদিন সময় দিন।

—না। আমি একদিনও সময় দেবো না, কাল সকাল থেকেই সব-কিছু বিলকুল ঠিক ঠিক চলবে। আপনারা এখনি গিয়ে সব ব্যবস্থা করুন গে—

মাতব্বররা সেলাম জানিয়ে বিদায় হচ্ছিল, নাদির বললো—আর একটা কথা। ছেলে ছোকরার দল কোনখানে লুকিয়ে আছে জানলেই আমাকে জানাবেন। ওরা হিন্দুস্থানের হিন্দুদের সঙ্গে সড় করে পাকিস্তান ধ্বংস করতে চায়—ইসলামের সর্বনাশ করতে যায়, এ আমরা কোনমতেই সইব না। এই সব ছেলে-ছোকরার দল পাকিস্তানের দুষমন—ইসলামের শত্রু।

মাতব্বররা কোন জবাব দিল না। বেরিয়ে এলো।

পথে নামতেই সামনে এক মুসাফির। বললো সিপাইসালার সঙ্গে দেখা করবো, তিনি আছেন ?

নাদির পিছনেই ছিল। সামনে এলো, বললো—কী চাই ?

—খোদার নামে আপনার কাছে আমার এক আরজি আছে।

—কি বলবে তাড়াতাড়ি বলল,আমার আর সময় নেই।

—আপনার সিপাইরা অনেক ছোটছোট ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে এসেছে, তাদেরকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিন। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

নাদিরের মুখ লাল হয়ে উঠলো, বললো—তোমার আর কিছু বলার আছে ?

—খোদার নামে আমি আরজি করছি ওদেরকে ছেড়ে দিন।

নাদির হাঁক দিল,—এই কে আছ—আরদালী, এই মুশাফিরকে এখান থেকে হটাও।

কয়েকজন সিপাহী এগিয়ে এলো। নাদির ভিতরে চলে গেল।

সৈনিকরা মুশাফিরকে বললো—হটো হটো, সাহেব বকছেন—চলো—

—মুশাফির তাদের মুখের পানে বারেক তাকালো, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল। সিপাহীরা তার পিছু পিছু খানিকটা এগিয়ে গেল।

সিপাহীরা ফিরছে, এমন সময় মুশাফিরও ফিরলো। একজন সিপাহীকে কাছে ডাকলো। আলখাল্লার ভিতর থেকে একখানি খাম বেড় করে তার হাতে দিয়ে বলল—এই লেফাফাখানা সিপাহসালারকে দিও।

সিপাহী লেফাফা এনে দিল নাদিরকে।
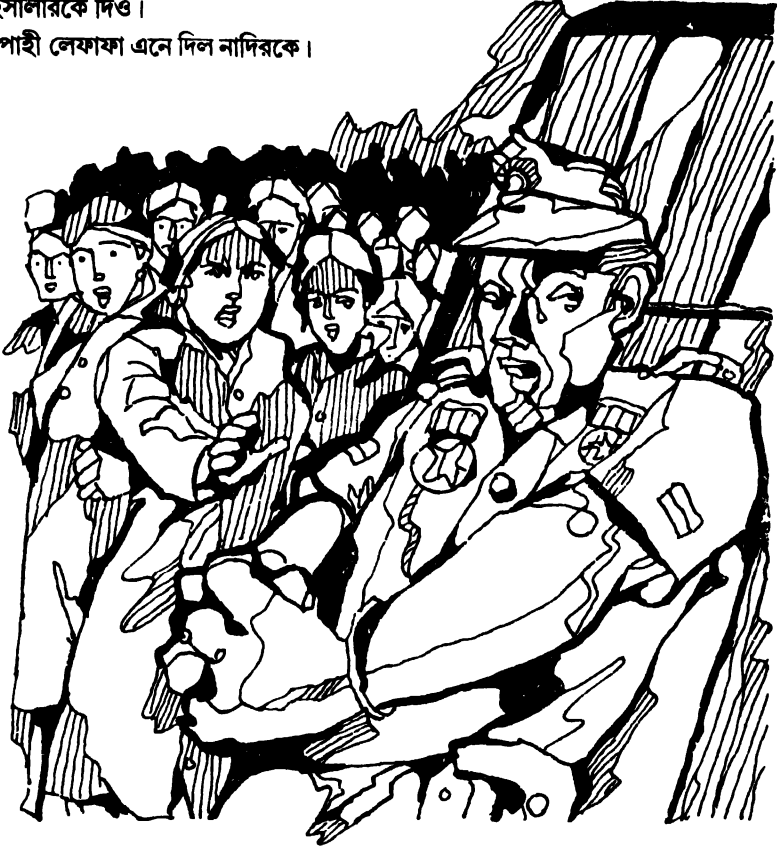
নাদির চিঠি খুলে পড়লোঃ শিশুরা নিষ্পাপ তাদের হত্যা করলে খোদা তোমাকে ক্ষমা করবেন না একথা মনে রেখো।

নাদিরের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, ফর্সা দেহের সবটুকু রক্ত যেন মুখে গিয়ে জমলো। আপন মনেই বলে উঠলো—অলরাইট্ লেট মি সি!

তারপর বাইরে এসে ডাক দিল—আরদালী, দেখ তো ওই মুশাফির কোথায় গেল? দেখতে পেলেই ধরে নিয়ে এসো—

সিপাহীরা ছুটলো।

তারা রীতিমত খানিকটা ঘোরাফেরা করে এলো কিন্তু মুশাফিরকে দেখতে পেল না।

সন্ধ্যার দিকে জমাদার এলো, স্যালুট দিল।

নাদির বললো—কি চাই?

—হুজুর, ওই ছেলেমেয়েগুলো বড় কান্নাকাটি করছে। আমরা সামাল দিতে পারছি না।

—কাঁদুক। মরার আগে কেঁদে নিক। মরার পরে তো আর কাঁদতে পারবে না।

—সব পাঁচসাত বছরের বাচ্চা হুজুর। নেহাৎ ছেলেমানুষ!

—ওরা সাপের বাচ্চা, বড় হয়ে ওরা এক একটা শয়তান হবে।

—ওদের মায়েরা জমায়েত হয়েছে হুজুর, তারা কাঁদছে।

—তাদেরকে আসতে দিলে কে? পাহারা নেই?

—জেনানা হুজুর, কথা শোনে না, পায়ে পড়ে। জেনানাদের মার ধোর করতে পারি না।

—বন্দুক নেই? গোলি চালাবে।

—পাঠান জোয়ানরা জেনানার উপর গোলি চালাবে না।

—যে চালাবে না তার কোর্টমার্শাল করবো। বেয়াদবি সইব না।

—হুজুর আপনি নিজে একবার গেলে ভাল হয়।

—দু-দশটা জেনানাকে কায়দা করতে পারবে না, সে-ও আবার আমাকে দেখতে হবে? বেশ্ চল—

পথে বেরিয়ে কিছুটা গিয়েই নজরে পড়লো, ওদিকে একটা বাড়ীর সামনে অনেকগুলি কালো কালো বোরখা। তাদের সামনে একদল খাঁকি পোষাকী পলটন।

নাদির দাঁড়িয়ে দেখলো, তারপর হুঙ্কার দিল—সব জেনানাকে আটক করো—

সিপাহীরা মেয়েদের ঘিরে ধরলো। তারপর ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে পাশের বাড়ীটার মধ্যে ঢোকাতে লাগলো।

নাদির খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলো।

এই সময় পথের ওদিকে আবার সেই মুশাফিরকে দেখা গেল। সঙ্গে বোরখা-পরা রমণীর দল।

সামনে এসে মুশাফির বললো—এই সব মায়েরা এসেছে আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে।

নাদির কোন জবাব দিলে না। মুশাফির বললো—এদের ছেলেমেয়েরা—

—সব গুলি করে মারা হবে—নাদির গর্জে উঠলো।

—গুলি করে মারবেন? ওরা তো কোন অপরাধ করেনি হুজুর। সব দুধের বাচ্চা!

নাদির হুঙ্কার দিলে—জমাদার!

জমাদার বাঁশীতে ফুঁ দিল। ওদিক থেকে কয়েকজন সিপাহী ছুটে এলো।

জমাদার হুকুম দিলে—এই সব জেনানাদের আটক কর। সিপাহীরা মেয়েদের ঘিরে ফেললো।

সহসা মুশাফির হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—হুঁশিয়ার! জেনানাদের আটক করা চলবে না।

সেই হাঁক শুনে সিপাহীরা চমকে উঠলো।

পরক্ষণেই নাদির কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার টেনে নিয়ে মুশাফিরকে গুলি করলো।

কিন্তু রিভলভারের ট্রিগার টেপার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বোরখা-পরা মেয়েদের দলের প্রথম সারির একটি মেয়ে চকিতে একটা হাতবোমা বের করে ছুঁড়ে মারলো একেবারে নাদিরের বুকের উপরে। বোমা ফাটলো। নাদির পড়ে গেল।

নাদিরের পিস্তল থেকে গুলি ছুটেছিল। কিন্তু সে গুলি মুশাফিরের লাগেনি।

এবার মুশাফির মাথার উপর হাত তুলে চীৎকার করে উঠলো—খতম করো—

মেয়ের দল বোরখা ফেলে দিল। প্রত্যেকের হাতেই এক একটি বোমা। যে ক'জন সৈনিক কাছাকাছি ছিল, সকলের সামনেই বোমা ফাটলো। সবাই ধরাশায়ী হলো। ধোঁয়ায় সব অন্ধকার হয়ে গেল।

সেই ধোঁয়ার মধ্যেই মেয়েরা সিপাহীদের বন্দুকগুলো তুলে নিলে। কার্তুজের বেলট্ খুলে নিলে। তারপর সোজা এগিয়ে গেল যে বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের আটকে রাখা হয়েছিল। সেই বাড়ীর ভিতর।

পাক সিপাহীরা হকচকিয়ে গেল।

আবার দু-তিনটে বোমা। তারপরেই গোটা দুই গুলি। বন্দুকগুলো গুলিভরা ছিল, ছুঁড়তে কোন অসুবিধা হলো না। পাক ফৌজ সাড়া তুললো—জেনানা সিপাই!

সব মেয়েই বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে গেল। সিপাহীরা সাবধান হবার আগেই মেয়ের দল তাদের সবকয়টা বন্দুক কেড়ে নিলে।

এবার সিপাহীরা হৈ হৈ করে উঠলো। কিন্তু তাতে কি হবে? জমাদার খুন হয়ে গেছে। সিপাহসালার খুন হয়েছে, কে হুকুম দেবে?

ওদিক থেকে ক'জন সিপাহী এদিকে ছুটে এলো। সামনের বাড়ীটা থেকে কয়েকটা তীর এসে তাদের ক'জনকে ধরাশায়ী করলো, বাকি সবাই গুলি চালালো সেইদিকে।

ইতিমধ্যে সামনের বাড়ীটা মেয়েরা দখল করে নিয়েছিল। এবার তারা জানলার সামনে এসে গুলি চালাতে সুরু করলো।

অনেক সিপাহী আহত হলো। সবাই বিভ্রান্ত হলো।

আবার এক ঝাঁক তীর এসে পড়লো সিপাহীদের উপর। তারপরেই চীৎকার উঠলো—জয় বাংলা!

কয়েকজন সিপাহী বসে পড়েছিল, এবার তারা ছুটতে সুরু করলো।

যে মেয়ের দল বাড়ীটার মধ্যে ঢুকেছিল তারা এবার বন্দুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো, সাড়া তুললো—জয় বাংলা যে সব সিপাহীরা ছুটছিল তাদের কয়েকজন আহত হয়ে পড়ে গেল। বাকি সবাই ছুটলো।

সামনে এবার আরেকদল ছোকরাকে দেখা গেল। তাদের হাতে বোমা। পরক্ষণের শব্দে ও ধোঁয়ায় জায়গাটা অন্ধকার ও দৃষ্টিহীন হয়ে গেল। তারপরেই শোনা গেল আর্তনাদ।

কয়েক মিনিটে ধোঁয়া সরলো, দেখা গেল পাক সেনার সব ক'জনই মাটিতে পড়ে আছে।

একজন উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো—বন্দুক আর কারট্রিজ বেল্টগুলো নিয়ে নাও—

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি ছেলে সাইকেলে চড়ে দু মাইল দূরে প্রতিরক্ষা কেন্দ্রে খবর দিলে—শহরের উপকণ্ঠে শতাধিক সিপাহী নিহত হয়েছে। শতাধিক আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের নায়ক নাদির খান খতম হয়েছে। প্রায় দুশো বন্দুক আর সেই সঙ্গে কারট্রিজ বেল্ট এসে গেছে, আমাদের হাতে। জয় বাংলা!
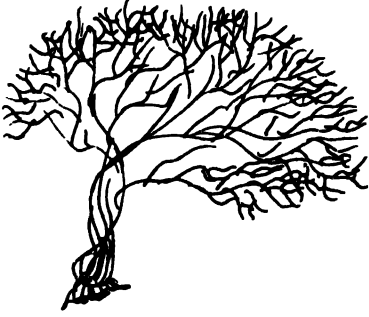
মানিকজোড়

নলিনী দাশ

রোদে ঝলমল করছিল শীতের সকাল। ঘন নীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র ছিল না।

কিন্তু নদীর ধারের নির্জন রাস্তা দিয়ে তের-চোদ্দ বছরের যে ছেলেটি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল, তার মুখে যেন শ্রাবণের ঘনঘটা থমথম করছিল। সে এমনই অন্যমনস্ক ছিল যে আমবাগানের ধারে ঘন্টি না বাজিয়ে বাঁক নিল, আর উল্টো দিক থেকে সাইকেল-চালিয়ে-আসা ছেলেটির সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে কোনোমতে সামলে নিল। থতমত খেয়ে দুটি ছেলেই সাইকেল থেকে নেমে পড়ল, অপ্রস্তুতভাবে পরস্পরের কাছে মাফ চাইল। তারপর অবাক হয়ে এ-ওর দিকে তাকিয়ে রইল—কি আশ্চর্য!! তারা কি স্বপ্ন দেখছে, না আয়নায় নিজেদের ছায়া দেখছে? সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি মানুষের মধ্যে এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকা কেমন করে সম্ভব হল? প্রথম ছেলেটি বলল 'তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি।' 'আমরা অল্পদিন হল এখানে এসেছি', উত্তর দিল দ্বিতীয় ছেলে। 'তোমার নাম কি?'

'অজিত কুমার বোস। তোমার নাম?'

'কি আশ্চর্য!!' আরো অবাক হয়ে প্রথম ছেলেটি বলল 'আমরা দুজনে একরকম দেখতে আবার নামও একরকম! আমার নাম যে অমিত কুমার বোস!!'

আলাপ জমে যেতে দেরী হল না। সাইকল দুটোকে একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দুজনে পাশাপাশি নদীর ধারে একটা পাথরে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পরস্পরের অনেক কথাই জেনে ফেলল। নিজেদের দুঃখকাহিনীও খুলে বলে ফেলল তারা।

অমিতের দাদু রায় বাহাদুর অক্ষয়কুমার বসু ধনী লোক। শহরের বাইরে, মস্ত বড় বাগানের মধ্যে তাঁর বিরাট অট্টালিকা। অনেক বছর আগে নিজের স্ত্রী, দুই ছেলে ও ছেলের বৌ, সকলকে হারিয়ে এখন এই একটি নাতি অমিত ছাড়া তাঁর বিশ্বসংসারে আর কেউ নেই। ঠাকুর চাকর,

মালী, দারোয়ান, ড্রাইভার নিয়ে সেই মস্ত বাড়িতে থাকেন দাদু আর নাতি। সকালে একটি মাস্টারমশাই এসে অমিতকে দুঘণ্টা পড়িয়ে যান আর শনি রবিবারে অন্য মাস্টার আসেন গানবাজনা আর ছবি আঁকা শেখাতে। তারপর সারাদিন তার অখণ্ড অবসর। বিরাট লাইব্রেরিতে ইচ্ছেমতন বই পড়ে, নিজের মনে ছবি এঁকে, গান গেয়ে, বাঁশি বাজিয়ে কবিতা লিখে আর সাইক্‌ল নিয়ে বেড়িয়ে মহা আনন্দে কেটে যাচ্ছিল অমিতের দিনগুলি। হঠাৎ আজ সকালে দাদু পরোয়ানা জারি করেছেন যে সে এখন বড় হয়েছে, তাই এরকম হেসে খেলে বেড়ালে চলবে না, স্কুলে ভর্তি হতে হবে।

অমিত প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল। সেতো আর মূর্খ হয়ে থাকছে না। সে যত বই পড়ে, তার বয়সের কম ছেলেই তত পড়ে। তাকে যেহেতু চাকরি করে খেতে হবে না। ডিগ্রি না থাকলে ক্ষতি কি? কিন্তু তার বাবা আর কাকা নাকি দাদুর কথা শোনেন নি, তার ফলে তাঁদের সর্বনাশ হয়েছিল। অমিতের জীবনে সেরকম ঘটনা আবার ঘটতে দেবেন না তার দাদু!

অমিতের মনে হচ্ছে যেন তার সমস্ত জগৎটাই ভেঙ্গে পড়েছে—তার স্বাধীন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে—এরপরে ভোগ করে চলতে হবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! সে কিছুতেই এই নতুন পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারছে না সহজভাবে! কি করে সে এই সমস্যার সমাধান করবে?

অজিতের সমস্যা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। খুব ছোট বেলায় বাবাকে হারিয়ে সে মার সঙ্গে মামাবাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিল, তারপর মাকেও হারিয়েছিল বেশ কম বয়সে, তবু মামামামীর অভাবের সংসারে, সুখে না থাকলেও, সে সাদরে মানুষ হয়েছিল, স্কুলে ভাল ছাত্র হিসাবে তার সুনাম হয়েছিল। কিন্তু, হঠাৎ মামার মৃত্যুতে তারা নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। নিজের দুটি ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে অজিতকে নিয়ে তার মামী এই শহরে তাঁর দাদার কাছে এলেন। তিনি অজিতকে তাড়িয়ে দিলেন না বটে, কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে পরের ছেলেকে বসিয়ে খাওয়াবার মতন তাঁদের সঙ্গতি নাই। একটা ছোট কোম্পানীর চিঠিপত্র বিলি করবার চাকরি তিনি তাকে জুটিয়ে দিলেন,—সাইক্‌লটা সেই কোম্পানীর। পড়াশুনার রাজ্য থেকে হঠাৎ এই চিঠি বিলি করার কাজে চলে এসে অজিতেরও মনে হচ্ছে যেন তার জগৎসংসার ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। কোথায় সে স্বপ্ন দেখেছিল যে স্কুল ফাইনালে ভাল ফল দেখিয়ে বৃত্তি পাবে, তারপর কলেজে পড়বে! তা না, এখন মনে হচ্ছে যে পিওন হয়েই তাকে জীবনটা কাটাতে হবে!

এত দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলে অমিত বলল 'সারা দিন চার দেয়ালের ভিতর বন্দী হয়ে, একগাদা ছেলের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বসে সংস্কৃত ধাতুরূপ আর এলজেব্রার ফর্মুলা মুখস্থ করার চাইতে তো চিঠি বিলি করার কাজও ভাল। তবু তাতে কিছুটা স্বাধীনতা আছে।'

অজিত বলল, 'তোমার অভ্যাস নেই বলে স্কুলে পড়াটা অত খারাপ মনে হচ্ছে। কদিন গেলেই দেখবে সয়ে গেছে, আরো কদিন পরে দিব্যি ভাল লেগে যাবে! আহা! আমাকে যদি কেউ আবার স্কুলে পড়ার সুযোগ দেয় তাহলে আমি তার কেনা গোলাম হয়ে থাকতে রাজি আছি!'

'এত ভালবাসতে স্কুলে পড়তে? কোন ক্লাসে পড়তে?'

'এবার ক্লাস নাইনে উঠবার কথা ছিল। প্রত্যেক বছর প্রাইজ নিয়ে ক্লাসে উঠেছি আর এবার বার্ষিক পরীক্ষাও দেওয়া হল না—মামা হঠাৎ চলে গেলেন'—

'আরে, আমাকেও তো দাদু ক্লাস নাইনেই ভর্তি করে দিচ্ছেন। আমি ঐ ক্লাসের উপযুক্ত

অঙ্কটঙ্ক পারি না, বিজ্ঞান ভূগোলও বেশি জানি না। কিন্তু ইতিহাস অনেক পড়েছি ইংরেজি-বাংলা ভাল লিখতে পারি, তাই নাইনেই পড়ব।'

'আমার আবার ঠিক উল্টো' বলল অজিত। 'বাংলা তবু ভালই লিখি, ইংরেজিটা তেমন আসে না, ইতিহাস ভাল লাগে না। কিন্তু অঙ্ক, বিজ্ঞান আর ভূগোলে এত বেশি নম্বর তুলতাম যে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়ে যেতাম।'

হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে অমিত অজিতের দুইহাত চেপে ধরে বলল, 'একটা চমৎকার ফন্দী মাথায় এসেছে—তাহলে তোমার আমার দুজনেরই মনের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে। সোমবার থেকে আমার বদলে তুমিই স্কুলে যাও না কেন?'

অজিত আকাশ থেকে পড়ল—'বলছ কি? তোমার দাদুই বা তাতে রাজি হবেন কেন আর হেডমাস্টার মশাই বা অনুমতি দেবেন কেন?'

'দূর বোকা! তাঁদের বলতে যাচ্ছে কে! আমিই স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বেরোব, কিন্তু স্কুলে যাবে তুমি। আর তোমার চিঠি কটা বিলি করা সেরে তারপর আমি সারাদিন যা খুশি করে বেড়াব। বিকেলে আবার আমি তোমার কাছ থেকে বই পত্র নিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতন বাড়ি ফিরব আর তুমি গিয়ে কোম্পনীতে তোমার পিওন বুক জমা দেবে! কেমন—ভাল ফন্দী নয়!'

হতভম্ব হয়ে অজিত বলল 'চিঠি কটা না হয় আমিই সকাল সকাল বিলি করে দেব। কিন্তু স্কুলের পোশাক বই খাতাপত্র এসব পাব কোথায়?'

'সে একটা সমস্যা বটে।' অমিতও স্বীকার করল। অজিত বলল 'তাছাড়া, তুমি না গিয়ে আমি স্কুলে গেলে একদিন ধরা পড়ে যাব, সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার হবে—তার চেয়ে আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হোক—ওসব কাণ্ড করে দরকার নেই ভাই।'

'ইস! ধরা পড়লেই হল? আমি হলফ করে বলতে পারি যে আমরা দুজনে এক রকম পোশাক পরে এসে পাশাপাশি দাঁড়ালে স্বয়ং আমার দাদু বা তোমার মামীও কোনো তফাৎ বুঝতে পারবেন না!"

অজিতও এবার না হেসে পারল না।

অমিত বলে চলল 'দাদু এর মধ্যেই আমার জন্য ডজন দুই স্কুল য়ুনিফর্ম আর গণ্ডা দুই করে জুতো মোজা করিয়ে ফেলেছেন—অর্ধেক তোমায় দিয়ে দেব।'

'পোশাকের ব্যবস্থা না হয় হলো, কিন্তু বাড়িতে বসে আমি পড়ব কি করে? হোমটাস্কই বা কি করে করব?'

'বই খাতা সব তোমাকে দিয়ে দেব।'

'ওমা—আমি সে সব রাখব কোথায়? বাড়িতে বসে পড়বার জায়গাই নেই আমার। আর পড়তে গেলেই ধরা পড়ে যাব।'

'ভেবে দেখি কি করা যায়'—

অজিত বলে চলল 'তোমার দাদু কি একদিনও তোমার পড়া কেমন হচ্ছে দেখতে চাইবেন না? তখন'—বাধা দিয়ে অমিত রেগে বলল 'তুমি একটা হোপলেস—সব ব্যাপারে প্রথমেই বাধার কথা ভেবে নিয়ে হতাশ হচ্ছ—তার চেয়ে এসো না দুই মাথা এক করে বাধা কাটাবার ফন্দী বার করি। তুমি চাওনা আবার স্কুলে পড়তে?'

'চাই না বুঝি! স্কুলে পড়তে পেলে আর কিচ্ছু চাই না।'

অমিত বলল, বে, বুদ্ধি দাও কি করে কি করা যায়। দাদু আমার পড়া দেখতে চাইলে সকালে দেখবেন, বিকালে তো উনি ক্লাবে যান, অনেক রাতে ফেরেন। তুমি আমার ঘরে বসে পড়াশুনা করবে ভাই।'

'বাড়ির আর কেউ যদি দেখে ফেলে?'

বাড়িতে আছে কে যে দেখবে? ঠাকুর আফিম খেয়ে বিকেলে ঝিমোতে থাকে, বনমালীদা

বুড়ো হয়েছে, চোখে ভাল দেখে না, আর মালী-দারোয়ান তো এদিকে আসেই না। সদর দরজা দিয়ে না এসে, বাড়ির পাশের বাগান দিয়ে আমার ঘরের বাইরের দরজায় এলে কেউ টেরই পাবে না।'

'কিন্তু, তুমি একদিনও স্কুলে না গেলে যে ছেলেদের টিচারদের কাউকে চিনবেই না? দাদু যদি কোনো দিন তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান, বিপদে পড়ে যাব।'

দুজনে মিলে অনেক পরামর্শ করে স্থির হল যে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন অজিত স্কুলে যাবে আর বাকি তিনদিন যাবে অমিত। রোজ সন্ধ্যাবেলা অজিত চুপি চুপি অমিতের ঘরে এসে তার খাতা-বই নিয়ে পড়াশুনা আর হোমটাস্ক করবে। অমিতও এক-আধটু পড়বে। যেদিন ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস এইসব ক্লাস বেশি থাকবে সেদিন অমিত স্কুলে যাবে। আর অঙ্ক-বিজ্ঞান-ভূগোল প্রভৃতি বেশি থাকলে যাবে অজিত।

সৌভাগ্যক্রমে তাদের দুজনের হাতের লেখা প্রায় একইরকম। মনে হল, ধরে ধরে লিখলে কোনো প্রভেদ বোঝা যাবে না। নাম অবশ্য দুজনকেই অমিত লিখতে হবে।

দেখতে দেখতে সপ্তাহটা কেটে গেল। রোজ সন্ধ্যেবেলা অজিত এসে চুপি চুপি অমিতের সঙ্গে পরামর্শ করত, কেউ টেরও পেত না। আবার দিনের বেলা, কাজটা শিখবার জন্য, অমিতও কিছু কিছু চিঠি বিলি করত।

প্রথমদিন রায় বাহাদুর নিজেই গাড়ি করে নাতিকে স্কুলে নিয়ে যাবেন বললেন। তিনি অবশ্য রোজই পৌঁছতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অমিত তুমুল আপত্তি জানাল—তাহলে সে স্কুলে যাবেই না! সে এত বড় হয়েছে, সাইক্‌ল চালিয়ে অভ্যস্ত। শুধু শুধু কেন দাদু নিজের কাজ ফেলে তাকে পৌঁছতে যাবেন?

সোমবার সন্ধ্যায় অজিত এসে দেখে যে অমিত লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে! বন্ধুকে দেখে সে হাঁউমাউ করে উঠল, 'বাপরে বাপ! কি গাদা গাদা ছেলে, আর কি তাদের গায় পড়া ভাব! আমি তো একদিনেই হাঁফিয়ে উঠেছি রে। বনমালীদাকে বলেছি ভী-ষ-ণ খিদে পেয়েছে, সে খুশি হয়ে দ্বিগুণ জলখাবার দিয়ে গেছে। নে হাত লাগা!'

সে কথায় কান না দিয়ে অজিত বলল 'সর্বনাশ! আজ যারা তোর সঙ্গে গায় পড়ে ভাব করল, তাদের তো আমি কাল একজনকেও চিনতে পারব না! কি হবে!' নিশ্চিন্তভাবে অমিত বলল, 'চিনতে না পারবি তো পারবি না—একটু না হয় গুলিয়েই ফেলবি! বলবি যে কোনোদিন স্কুলে না পড়ে থাকলে সেটাই স্বাভাবিক!'

নতুন ক্লাসের বইপত্তর দুজনে বুঝে নিয়ে স্থির করল যে সোম, বুধ আর বৃহস্পতিবারে অমিত স্কুলে যাবে, আর মঙ্গল, শুক্র ও শনিবারে যাবে অজিত।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্কুল থেকে এসে অজিত ভয়ে ভয়ে বল্ল 'এইভাবে চালানো যাবে তো রে? নাকি কাল থেকে তুইই রোজ স্কুলে যাবি? ভেবে দেখ!'

দুজন টিচার তাকে বকেছেন যে আগের দিন দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে ঠিকভাবে পড়া লিখতে পারে নি। কয়েকটি ছেলেও অনুযোগ করেছে, সোমবার অনেকক্ষণ গল্প করা সত্ত্বেও মঙ্গলবার অজিত তাদের চিনতে পারেনি! অবশ্য, স্কুলে কোনোদিন না পড়ার অজুহাতে অজিত সকলের সব অভিযোগ এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও, আবার স্কুলে যেতে পেরে যে তার খুব ভাল লেগেছে, সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

অমিতেরও দিনটা খুব ভাল কেটেছে। কয়েকটা চিঠি অজিত স্কুলে যাবার আগেই বিলি

করেছিল। বাকি কটা চিঠি দিতে অমিতের দুঘণ্টাও লাগেনি। তারপরে সমস্ত দিন সে নদীর ধারে, গাছের তলায় শুয়ে, বসে, ছবি এঁকে, কবিতা পড়ে মহানন্দে কাটিয়েছে।

'আবার কাল-পরশু স্কুলে যেতে হবে ভেবে আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে রে—তুইই চালিয়ে দে না!'

আঁৎকে উঠে অজিত বলল, 'সর্বনাশ!! কাল যে একটা ছবি আঁকার ক্লাস আছে আর পরশু আছে গানের ক্লাস। আমাদের আগের স্কুলে এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাত না—এখানে দেখেছি এগুলোতে খুব জোর দেয়।'

'একদিন স্কুলে না গিয়ে যে সব টিচার আর ছেলের নাম, চেহারা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি—কি হবে?' করুণভাবে জানালো অমিত।

'স্কুলে না গেলে তো কোনোদিনই কাউকে চিনতে শিখবি না—দেখিস কয়েকদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।'

সত্যি-সত্যিই দেখা গেল যে এক সপ্তাহের মধ্যে অমিত আর অজিত ক্লাসের সব ছেলে আর টিচারদের চিনে ফেলল। রোজ সন্ধ্যেবেলা অমিতের বাড়িতে বসে যখন তারা পরদিনের পড়া তৈরি করত, তখন সারাদিন ক্লাসে কি কি ঘটেছে, কে-কি বলেছে তাও আলোচনা করত, যাতে পরদিন অসুবিধা না হয়।

তবু কিন্তু, প্রায় রোজই নতুন নতুন অপ্রত্যাশিত সমস্যা দেখা দিতে লাগল।

প্রথম গণ্ডগোল দেখা গেল ক্রিকেট টিম নিয়ে। প্রত্যেক ক্লাসের দুটো করে টিম তৈরি করে প্রথমে ক্লাসের এ-টিম ও বি-টিমের মধ্যে খেলা হবে, তারপর বিভিন্ন ক্লাসের মধ্যে ম্যাচ হবে, সবশেষে, ভাল খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরি হবে স্কুল টিম। ছেলেরা দারুণ উত্তেজিত, সারাদিন এই ছাড়া আর কথা নেই! গেম্‌স টিচার রাখালবাবু ক্লাস টিচারদের সঙ্গে ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে ছেলেদের নাম নিয়ে টিম তৈরি করছেন।

অজিত হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল যে সে 'বোলিং' তেমন পারে না, কিন্তু 'ব্যাটিং' খুব ভাল লাগে!

প্রশান্ত নামে তার পাশে-বসা ছেলেটি তখনই তাকে চেপে ধরল, 'সে কিরে? সেদিন বললি যে কোনো জন্মে খেলিস নি, খেলতে চাসনা, কোনো আগ্রহই নেই?'

অপ্রস্তুত হয়ে অজিত বলল 'না—ইয়ে আর কি—মানে খেলার গল্প-টল্প পড়ে, তোদের কথা শুনে-টুনে মনে হচ্ছে বোধহয় ব্যাটিংটাই ভাল।'

তার কথা শুনে পিছনের বেঞ্চি থেকে শ্যামলেন্দু আর অভিজিৎ এমন খিকখিক করে হাসল যে রাখালবাবু তাদের চারজনকেই ধমক দিলেন।

ওদের ক্লাসে দুটো টিম গড়তে অসুবিধা হচ্ছিল বলে তিনি অজিতের প্রবল আপত্তি না শুনে তার নাম লিখে নিলেন, বললেন 'তুমি ভাল খেল কি না খেল সে বিচার আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। প্রথম দিন তোমাকে খেলতেই হবে।'

মনে মনে প্রমাদ গণে অজিত স্থির করল যে সে ইচ্ছে করে এত খারাপ খেলবে যে পরের দিন আর তাকে খেলতে ডাকা হবে না। সব ক্যাচ ফেলে দেবে, ইচ্ছে করে তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাবে, সব ভণ্ডুল করে দেবে। কিন্তু যারা ভাল খেলোয়াড়, খেলতে ভালবাসে তারা কি আর ইচ্ছে করলেই খারাপ খেলতে পারে? সেদিন ক্লাস নাইনের এ-টিম-বনাম-বি-টিমের খেলায়, অজিত নিজেরই অজ্ঞাতসারে এমন ভাল খেলল যে, সবচেয়েবেশি রান তুলে নিজের টিমকে জিতিয়ে দিল।

খেলার পর রাখালবাবু তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন 'বাঃ, তোমার তো চমৎকার স্টাইল, যদি চেষ্টা কর তাহলে তুমি ভাল খেলোয়াড় হতে পারবে। স্কুল টিমে তো খেলবার সুযোগ পাবেই।'

ক্লাসের ছেলেরাও তাকে চেপে ধরল। শ্যামলেন্দু বলল 'তুই তো আচ্ছা গুলবাজ দেখি। কিন্তু তোর গুলটা বড় অদ্ভুত ধরনের। অন্য লোকে নিজের খারাপ জিনিসকে ভাল বলে চালায় আর তুই গুণগুলো কিনা লুকিয়ে রাখতে চাস!'

পার্থ বলল 'নিশ্চয় তুই আগে কোনো স্কুলে বা ক্লাবে ক্রিকেট খেলেছিস—এখন সেকথা চেপে যাচ্ছিস!'

সন্ধ্যেবেলা খবর শুনে অমিত বলল, 'সর্বনাশ! আমি যে ব্যাটটাও সোজা করে ধরতে জানি না—আমার যাবার দিনে যদি কোনো খেলা হয় তাহলে কি হবে? তুই ভাই ক্রিকেট খেলে তো আমাকে আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললি দেখি!'

অজিত বলল 'আর তুই যে পদ্য লিখে আমাকে বিপদে ফেলেছিলি? ইংরেজি-স্যর প্রতুলবাবুর ফেয়ারওয়েলে যে ইংরেজি কবিতা ঝেড়ে সবার তাক লাগিয়েছিলি! আজ ইন্দ্রনীল ক্লাসে আমাকে চেপে ধরেছে, তার দিদির বিয়ের জন্য ইংরেজি কবিতা লিখে দিতে হবে'—

'তুই কেন বললি না যে কাল লিখে নিয়ে যাবি?'

'তাই তো বলেছিলাম, কিন্তু কালই যে দিদির বিয়ে সে তো স্কুলে আসবেই না। যেদিন আসবে, এক হাত নেবে!'

'সে ম্যানেজ করা যাবে! কবিরা কি চব্বিশ ঘণ্টাই পদ্য লিখতে পারে? মুড না আসলে কবিতা বেরোবে কেন?'

তৃতীয় সমস্যা দেখা দিল অঙ্ক নিয়ে। অবশ্য যেদিন অঙ্কের বেশি ক্লাস থাকত, সেদিন অজিত স্কুলে যেত আর সব কটা অঙ্ক চটপট করে ফেলে পুরো নম্বর পেত। কিন্তু অমিতের দিনে যে দু একটা অঙ্কের ঘণ্টা থাকত সে এমন আনাড়ির মতন ভুল করত যে টিচাররা তাকে বকতেন আর ছেলেরা হাসাহাসি করত!

আর একটা সমস্যা হল ক্লাসের ছেলেদের অতিরিক্ত কৌতূহল। প্রায় রোজই কেউ না কেউ তাদের সঙ্গে তাদের বাড়ির পথে যেতে চায়, রাজি না হলে তাদের অভদ্র মনে করে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আরো বেশি কৌতূহলী হয়ে পড়ে।

প্রশান্ত একদিন, প্রায় জোর করেই, সাইক্লে অজিতের সঙ্গ নিয়েছিল। 'দূর থেকে অমিতকে দেখতে পেয়ে অজিত তাড়াতাড়ি প্রশান্তকে প্রায় টেনে নিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। চা খাইয়ে, একটু গল্প করে, তারপর তাকে বলল কিছু মনে করিস না ভাই, আমার অন্য কাজ রয়েছে, এখন বাড়ি ফিরতে পারব না।'

আর একদিন শ্যামলেন্দু আর অভিজিৎ অমিতের সঙ্গে তার বাড়ি চলেই এল! অমিত আর কি করে, তাদের বাগান, লাইব্রেরি সব দেখাল, চা-টা খাওয়াল। অজিত তার সময়মতন আসতে গিয়ে দূর থেকেই দেখতে পেল যে তারা তিনজন বারান্দায় বসে গল্প করছে। তাড়াতাড়ি সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল কিন্তু শ্যামলেন্দু বলে উঠল, 'ঐ দেখ অমিত, কে একটি ছেলে—পোশাক দেখে মনে হচ্ছে আমাদের স্কুলেরই ছেলে,—তোর কাছে এসেছিল বোধহয়—আবার চলে যাচ্ছে কেন?' ভাগ্যিস তারা তার মুখ দেখতে পায় নি, আর ভাগ্যিস অমিত ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল, তাই সে কোনোমতে 'ম্যানেজ' করে নিল।

কিন্তু, বন্ধুরা যে বাড়ি চিনে ফেলল, এরপর যদি তারা যখন তখন উপস্থিত হয় তাহলে কি হবে? যদি কোনোদিন তারা দুইজনকে একসঙ্গে দেখে ফেলে, তাহলে তো সর্বনাশ!

এমনিতেই সেদিন পড়া শিখতে তাদের রাত হয়ে গেল, বাড়ি ফিরে অজিত মামীর কাছে বকুনি খেল।

একদিন বায়োলজি প্র্যাকটিকাল ক্লাসে অজিত একমনে 'সেকশন' কাটছে। এমন সময়ে হঠাৎ নোটিস এল যে শেষ দুটো ঘণ্টায় ক্লাস হবে না, তার বদলে একটা 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা হবে। অজিত এমনই চমকে গেল যে তার সেকশনটা একদম খারাপ হয়ে গেল, আর একটু হাতও কেটে গেল।

'তোর কি মজারে অমিত তুই তো ফার্স্ট হবিই' বলল পার্থ, শ্যামলেন্দু বলল, 'সারা স্কুলের মধ্যে ফার্স্ট হলে চমৎকার প্রাইজ পাবি' প্রশান্ত বলে উঠল, 'একি? তোর হাত কেটে রক্ত পড়ছে যে!' —অন্য ছেলেরাও কলরব করে উঠল, 'এমন দিনে তোর হাত কাটল!' 'আবার বেছে বেছে ডান হাত—ছবি আঁকবি কি করে?' যদিও অজিতের হাতে খুব সামান্যই কেটেছিল, সে যদি ছবি আঁকতে জানত, অনায়াসেই আঁকতে পারত, তবু এমন সুযোগ সে ছেড়ে দিল না—তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে ডান হাতটা জড়িয়ে ফেলে আক্ষেপ করে উঠল, 'হায়রে! বেছে বেছে আজই কিনা আমার হাত কাটল!'

বন্ধুরা বলল, 'রাখালদার কাছে ফার্স্ট এডের সব জিনিসপত্র আছে, ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে হয়তো তুই ছবি আঁকতে পারবি।'

রাখালবাবু তার হাতে ওষুধ লাগিয়ে, ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। বললেন যে তার ছবি আঁকতে বাধা নেই, তবে, সাবধান থাকতে হবে যেন ব্যাণ্ডেজে রং না লাগে। 'খুব সাবধানে কদিন থেকো অমিত, সামনের সপ্তাহে স্কুলের এ-টিমের সঙ্গে বি-টিমের ম্যাচ হবে—তার মধ্যে তোমার হাত সম্পূর্ণ সারিয়ে ফেলা চাই কিন্তু।'

উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে আনন্দ হলেও, বড় ম্যাচে না খেলতে পারলে অজিতেব দুঃখ হবে, তাই সেও কথা দিল যে সাবধানে থেকে তাড়াতাড়ি হাতের ঘা সারিয়ে ফেলতে চেষ্টা করবে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ আর একটা সোরগোল শোনা গেল—হেডমাস্টার মশাইর ঘরের দিক থেকে ঘুরে এসে পার্থ বলল 'খবর শুনেছিস? এই বসে-আঁকো প্রতিযোগিতায় যে ফার্স্ট হবে, রায় বাহাদুর অক্ষয় বোস তাকে একটা বড় শিল্ড দেবেন।—এখন তিনি হেড স্যারের ঘরে বসে গল্প করছেন, ছবি আঁকার সময়ে নাকি ঘুরে দেখবেন।'

'আরে, অক্ষয় বোস তো আমাদের অমিতের দাদু'—বলল শ্যামলেন্দু।

প্রশান্ত বলল, 'তাহলে দাদুর দেওয়া শিল্ডটাও নাতিই পাবে।'

এবারে অজিত সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে গেল। অন্যদের চোখকে যতই ফাঁকি দিক, রায় বাহাদুরের সামনে সে অমিত সেজে অভিনয় করতে পারবে কি করে? তুলির একটা টান দিতে গেলেই তো সে ধরা পড়ে যাবে! তখন কি হবে?

হেডমাস্টার মশাইর ঘরের দিক থেকে কারা যেন ডাকছিল 'অমিত কোথায়? অমিতকুমার বোসকে হেডস্যর ডাকছেন।' 'যাচ্ছি' বলে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে অমিত বন্ধুদের এড়াল, তারপর, হেডমাস্টার মশাইর ঘরের দিকে না গিয়ে, সাইক্‌ল শেড থেকে সাইক্‌ল বার করে সোজা পনপন করে চালিয়ে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কারা যেন তখনও ডাকাডাকি করছিল, 'অমিত! অমিতকুমার বোস কোথায়? হেডস্যর

ডাকছেন। জলদি।' কোনো কথায় কর্ণপাত না করে, কোনোদিকে না তাকিয়ে অমিত সোজা নদীর ধারে আম বাগানের মধ্যে, তাদের গোপন জায়গায় গিয়ে হাজির হল। সৌভাগ্যক্রমে অজিত সেখানেই বসে নিবিষ্টমনে ছবি আঁকছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে অজিত বলল 'সর্বনাশের হাত থেকে আজ কোনো মতে রক্ষা পেয়েছি রে! কিন্তু কাল নিস্তার নেই। এবার আমাদের এই সাংঘাতিক খেলা বন্ধ করতেই হবে!!'

অজিতের মুখে সব কথা শুনে অমিত প্রথমেই হেসে উঠল, 'আঁকবার নামেই হাত কেটে ফেললি? বেশ তো কায়দা করে প্রতিযোগিতাটা এড়িয়ে গেছিস।'

'আমি বুঝি ইচ্ছে করে হাত কেটেছি! আর প্রতিযোগিতাই না হয় এড়ালাম, কিন্তু শাস্তি এড়াব কি করে? হেড স্যার ডেকে পাঠিয়েছেন শুনেও যাইনি, বিনা অনুমতিতে স্কুল ছেড়ে চলে এসেছি'—

অমিত সাহস দেখিয়ে বলল 'কাল তো আমার স্কুলে যাওয়া, অক্ষত হাতে একটা ঢাউস ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, হেড স্যার ডেকে পাঠাবার আগেই নিজে গিয়ে তাঁর কাছে মাফ চেয়ে নেব।'

'ওরে বাবা! ভয় করবে না তোর?'

'তা একটু করবে, কিন্তু আর কি উপায় আছে বল? তার চেয়ে বেশি মুস্কিল হবে দাদুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে,—দাদু স্কুলে এসেছেন শুনেও পালিয়ে এসেছি, এতে তো তাঁর অপমান কবা হয়েছে,—খুব বকুনি দেবেন।'

বাড়ি ফিরে প্রথমেই অমিত তার ডান হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিল। দুই বন্ধুতে কথা বলছে, এমন সময় সদর দরজার কাছে থেকে অক্ষয় বাবুর হাঁকডাক শোনা গেল। অমিতের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তিনি এত তাড়াতাড়ি তার ঘরে এসে পড়লেন যে, অজিত পালাবার সময় পেল না, কোনোমতে আলমারির পিছনে লুকিয়ে পড়ল। তার বুক এমনই ধড়াসধড়াস করছিল যে তার মনে হচ্ছিল সবাই সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে!

ভীষণ রেগে বকতে বকতে ঘরে ঢুকলেন অক্ষয়বাবু কিন্তু অমিত যখন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল 'লক্ষ্মীটি রাগ কর না দাদু, এমন হাত ব্যথা করছিল যে আর একটুক্ষণও স্কুলে থাকতে পাবলাম না!' তখন তিনি গলে জল হয়ে গেলেন।

'কই দেখি? কেমন হাত কেটেছে?'

আলমারির পিছনে দাঁড়িয়ে অজিতের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল—যদি দাদু ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখতে চান!!!

অমিত কিন্তু এবারেও বেশ কায়দা করে এড়িয়ে গেল—দূর থেকে ব্যাণ্ডেজ শুদ্ধ হাত দেখিয়ে বলে উঠল—'না—না না—বড্ড ব্যথা আছে এখনও। আমি আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব, তুমি বরং বনমালীদাকে বল আমাকে একটা নোভালজিনের বড়ি দিতে!'

তখনকার মতন নিরস্ত হলেও দাদু ঘর থেকে বেরোবার সময়ে বলে গেলেন যে পরদিন সকালে ভাল করে দেখবেন, দরকার হলে ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাবেন।

'তুমি নিশ্চিন্তমনে ক্লাবে যাও দাদু, সকালে আমি একেবারে ভাল হয়ে যাব। ডাক্তার-টাক্তার লাগবে না!'

'সে দেখা যাবে।' বলে দাদু চলে গেলেন। অমিত দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিল, তবে অজিত সাহস করে আলমারির পিছন থেকে বেরোল।

'বাব্বা! তুই তো দারুণ অভিনয় করতে পারিসরে!' এক গাল হেসে অমিত বলল 'পারতেই হয়! আয় এবার তাড়াতাড়ি পড়াগুলো সেরে ফেলি। দাদু যদি আজ একটু আগেই ক্লাব থেকে

ফেরেন—তার আগেই আমার ঘুমিয়ে পড়া চাই, নইলে আবার হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

অজিত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল বাব্বা। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হাওয়া গেল!'

কিন্তু, নিশ্চিন্ত হওয়া তাদের ভাগ্যে লেখা ছিল না। সেদিন হঠাৎ দারোয়ান বিচিত্র ভাষায় হাঁকডাক শুরু করল 'খোকাবাবু আপকো দুটো বন্ধু আয়া। দরজা খুলিয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের কথাও শোনা গেল, 'দরজা বন্ধ করে কি করছিস রে অমিত?' জিগ্যেস করল প্রশান্ত। শ্যামলেন্দু প্রশ্ন করল 'কার সঙ্গে কথা বলছিস?' 'খুলছি,' বলে অমিত আগে পিছনের দরজা দিয়ে অজিতকে বের করে দিল, তারপর ভিতরের দরজা খুলল। 'আজ কি একটা কাণ্ড করে এলি বল তো!' বলল প্রশান্ত। শ্যামলেন্দু আবার জিগ্যেস করল 'কার সঙ্গে গুজগুজ করছিলি?' অমিত বলল, 'কই? কারো সঙ্গে কথা বলিনি তো—আমি তো একাই রয়েছি ঘরে।'

'বারে আমরা যে ঘরে ঢুকবার আগে তোর বিড়বিড় কথাবার্তা শুনতে পেলাম'—

'সে আমি একা একাই বিড়বিড় করছিলাম। এতদিন তো একা একা ঘুরতাম—অভ্যেস হয়ে গেছে'—

অমিত আর অজিতের সেদিন পড়া শেখা হল না পরদিন অমিত তার কথা মতন স্কুলে গিয়েই হেডমাস্টার মশাইর সঙ্গে দেখা করে এমন করুণভাবে মাফ চাইল যে রাগ করতে গিয়েও তিনি বেশি রাগতে পারলেন না, কেবল তার দায়িত্বজ্ঞানের অভাবের জন্য কিছুটা 'লেকচার' দিলেন।

সেদিনই আবার এক বিপত্তি—হঠাৎ বিকেলে একটা ক্রিকেট ম্যাচের ব্যবস্থা করা হল। হাত কাটার দোহাই দিয়ে অমিত অবশ্য খেলাটা এড়াতে পারল, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে বসে খেলা দেখা থেকে রেহাই পেল না। দেখার বিপদও কম নয়। খেলা যেমন জমে উঠতে লাগল, সকলে নানা মন্তব্য করতে লাগল। অমিত নিজে কিছু না বললেও বন্ধুদের প্রশ্নের জবাবে এমন সব আনাড়ির মতন কথা বলে ফেলল যে কেউ রেগে গেল কেউ হেসে অস্থির! প্রশান্ত বলল 'তুই ন্যাকা, না বোকা না খোকা? ক্লাস টেনের মন্মথ অমন সোজা ক্যাচটা ফেলে দিল আর তুই কিনা বাহবা দিলি?'

সন্ধেবেলা অজিতের কাছে সব ঘটনা বলতে গিয়ে অমিত বলল 'যত আমি এড়িয়ে যাই, তত সবাই আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে—বোকার মতন কথা বলব না তো কি? আমি কি খেলা একটুও বুঝি?'

অজিত জিগ্যেস করল 'আর কোনো মুস্কিল হয়নি ত? পড়া শিখে না যাবার জন্য কেউ বকে নি?'

'স্কুলে বিপদ হয়নি, হাত কাটার দোহাই দিয়ে সাত খুন মাপ হয়েছিল। কিন্তু, বিপদ হল বাড়িতে—সাংঘাতিক বিপদ!'

'কেন? দাদুকে তো তুই দিব্যি ম্যানেজ করে নিলি দেখলাম।' 'সে তখনকার মতন। বুড়োকে ম্যানেজ করা অত সহজ নয়রে! আর, দাদুকে যদি বা ঠেকাতে পারতাম, ডাক্তারবাবুকে ঠকাব কি করে? কাটা-ঘা দেখলেন, তবে ছাড়লেন!' 'তোর হাতে আবার কাটা ঘা এল কোথা থেকে? মিছিমিছি তো একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রেখেছিলি!'

'মিছিমিছি ব্যাণ্ডেজে দাদুদের ধোঁকা দেওয়া যেতে পারে, ডাক্তারদের যায় না। সত্যি সত্যি কাটা-ঘা দেখাতে হল।'

অজিত স্তম্ভিত, 'সত্যি কাটা-ঘা পেলি কোথায় ?'

'কেন, ব্লেড দিয়ে বানালাম—তোর হাত তো ব্লেডেই কেটেছিল।'

'কি সাংঘাতিক !' আঁৎকে উঠল অজিত।

অমিত কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছিল, বলল, 'তাও কি সহজে ঠকাতে পারি ? বলেন যে এতো টাটকা কাটা। আমি বললাম সকালেই যে আবার রক্ত পড়েছে !'

অজিত-অমিত দুজনেরই কাটা হাত অল্পদিনেই সেরে গেল। রাখালবাবু বললেন এখন তারা খেলতে পারে, কোনো ক্ষতি হবে না।

সেদিন অমিত স্কুলে এসে শুনল যে দুজন টিচার অনুপস্থিত সেই সুযোগে রাখালবাবু টিফিনের পরে একটা বিশেষ ক্রিকেট ম্যাচের ব্যবস্থা করেছেন। এবার সে প্রমাদ গুণল !

ক্লাস থেকে বেরিয়ে ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, এমন সময়ে হঠাৎ 'ওরে বাবা' বলে চিৎকার করে অমিত 'পড়ে গেল'। বন্ধুরা তাকে তুলতে এলে সে 'উহু-হু-হু' করে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভীষণভাবে পা মচকেছে, হাঁটতে পারছি না !'

এ অবস্থায় অবশ্য তাকে কেউ খেলতে বলল না, কিন্তু খেলা দেখতে যেতেই হল বন্ধুদের সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। প্রশান্ত বলল, 'তোর ব্যাপারটা কি বল্ তো অমিত ? হাত কেটে ছবি আঁকা এড়ালি, আবার পা মচকে খেলা ফাঁকি দিলি !'

'আমি কি ইচ্ছে করে পা মচকেছি ?'

'লোকে তো তাই সন্দেহ করছে,' বলল পার্থ। কপট রাগে অমিত বলল, 'আমাকে মিথ্যেবাদী বলছিস ?' 'বলব না ? তুই আমাদের বললি যে তোর ডান-পা মচকেছে আর রাখালদাকে বললি বাঁ-পা।'

করুণ মুখ করে অমিত বলল, 'দুটো পাই মচকেছে রে—কোনটা যে বেশি ঠিক বুঝতে পারছি না !'

'হামবাগ কোথাকার !' ধমক দিল শ্যামলেন্দু।

'যখন কেউ দেখছে না ভেবেছিলি, তখন দিব্যি না খুঁড়িয়ে হাঁটছিলি !'

'না খোঁড়ালেও, পায় খুব ব্যথা করছিল !' বলে অমিত কোনো মতে বন্ধুদের জেরা এড়িয়ে গেল।

সবাই যখন ম্যাচ দেখতে ব্যস্ত, সে জল খাবার নাম করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছেড়ে সোজা সাইক্ল শেডে চলে গেল, তারপর সাইক্ল চালিয়ে বাড়ি। কি ভাগ্যি আর কেউ তাকে লক্ষ্য করল না।

সন্ধ্যায় সব কথা শুনে অজিত বলল, 'আপাততঃ ফাঁড়া কাটল, বাঁচা গেল, কিন্তু আমার সাধের ম্যাচ খেলাটা বোধহয় ভেস্তে দিলি !'

দুষ্টু হাসি হেসে অমিত বলল 'যেমন তুই আমার আঁকার প্রাইজ আর শিল্ড পাওয়া ভেস্তে দিয়েছিলি !' অজিতও তার হাসিতে যোগ দিল; কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে, ক্রমেই যেন একটা জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি, দম বন্ধ হয়ে আসছে—মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ ধরা পড়ে যাব, একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারি হবে তখন !'

কথাবার্তায় তারা এমনই মশগুল ছিল যে কখন দাদুর গাড়ি এসে ফটকে ঢুকেছে টেরই পায় নি। হঠাৎ একেবারে ঘরের দরজায় দাদুর পায়ের শব্দ শুনে অজিত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, বাইরের দরজা দিয়ে চোঁচা দৌড় মেরে পালিয়ে গেল।

খুব অবাক হয়ে দাদু জিজ্ঞেস করলেন 'ছেলেটি অমন চোরের মতন পালাল কেন ? কে রে ?'

অমিত থতমত খেয়ে বলল 'আমাদের ক্লাসে পড়ে। বলছিল যে সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে,—বাড়ি গিয়ে পাছে বকুনি খেতে হয়, তাই তাড়াতাড়ি পালাল।'

দাদু বসে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করলেন সেদিনও ওদের পড়া শেখা হল না। পা মচকানোর অজুহাতে কি টিচাররা ক্ষমা করবেন ?

পরদিন অজিত স্কুলের পর ,খুব তাড়াতাড়ি অমিতের কাছে এল। সারাদিন তাকে একটু খোঁড়াতে হয়েছে। মাঝে মাঝে ভুলেও গেছে, খেয়াল হলেই আবার খুঁড়িয়েছে।

সমস্তদিন আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে হয়েছিল বিকেলের আগে ঘন মেঘ ঘনিয়েছিল আকাশে, দারুণ ঝড় আসবে বলে মনে হচ্ছিল।

অজিত বলল 'তাড়াতাড়ি পড়া তৈরি ক'রে নে নইলে ঝড়ে আটকা পড়ে যাব।

কিন্তু তারা পড়তে বসতে না বসতেই তুমুল ঝড় এসে গেল, বাগানের বড় বড় গাছগুলো প্রচণ্ড বাতাসের দাপটে নুয়ে পড়তে লাগল, কড় কড় কড় মেঘ ডাকার শব্দ। অজিতের মুখ শুকিয়ে গেল, 'বাড়ি ফিরব কেমন করে ?' অমিত বলল, 'ভাবিস না, ফিরতে না পারলে আমি তোকে লুকিয়ে রেখে দেব, কেউ টেরও পাবে না !'

দুজনে নিবিষ্টমনে পড়া তৈরি করছে। হঠাৎ দরজা খুলে দাদু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বললেন 'তোমার বন্ধুকে আজ এখানেই রেখে দাও অমিত, ঝড় মাথায় করে আর বাড়ি গিয়ে দরকার নেই।'

দাদু ঘরে ঢুকতেই অজিত মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল, যাতে তিনি তার মুখ দেখতে না পান। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সে দরজা খুলে ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লো।দাদু ভীষণ ব্যস্ত হয়ে 'পাগল হলে নাকি ?' বলে তার পিছন পিছন বেরোলেন। তখনই প্রবল বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল।

অমিত ছুটে বেরোল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ দাদু ?, বুড়োমানুষ, শেষে,'—তার কথা শেষ হবার আগেই সামনের আমগাছটার একটা বড় ডাল ভেঙ্গে পড়ল সশব্দে আর দাদুকে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখা গেল।অমিত আর্তনাদ করে উঠল, 'দাদুর কি হল! অজিত কোথায় গেলি ? তাড়াতাড়ি আয়'—

বেশি দূরে যেতে পারে নি অজিত। অমিতের ডাকে তখনই ছুটে এল। দুই বন্ধুতে মিলে ধরাধরি করে অক্ষয় বাবুকে টেনে তুলল। ঘরে নিয়ে এসে ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে শুকনো কাপড় পরাল। নিজেদের সমস্যার কথা তখন তারা ভুলেই গিয়েছিল !

সৌভাগ্যক্রমে দাদুর কোনো চোট লাগে নি, কেবল আচমকা হোঁচট খেয়ে পড়ার ফলে তিনি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন, স্থান-কাল-পাত্র গুলিয়ে ফেলেছিলেন। অজিতের হাত চেপে ধরে অক্ষয়বাবু বলছিলেন, 'অজয়, ফিরে এসেছ বাবা? অভয়, অজয় ফিরে এসেছে—তুমি কিছু বলছ না কেন ?'

অজিত অবাক হয়ে বলল, 'দাদু কি বলছেন বুঝতে পারছি না তো ? আমার বাবার নাম ছিল অজয়—অজয় কুমার বসু।'

'আর আমার বাবার নাম ছিল অভয় কুমার বসু' বলল অমিত, 'দাদু আমাকে চিনতে পারছ না ? আমি তো অমিত।' ততক্ষণে অক্ষয়বাবু সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন। বললেন 'ঠিক কথা, তুমি তো আমার দাদুভাই, অভয়ের ছেলে অমিত। আর তুমি কে গো নতুন দাদুভাই ? ঠিক যেন আমার অজয়ের মতন দেখতে ? তুমি যদি আমার অজয়ের ছেলে হতে! তুমি কি অজয়ের ছেলে ?বল, বল—তুমি কি সত্যিই আমার অজয়ের ছেলে ? অজয় কি বিয়ে করেছিল ? তার

ছেলে ছিল ? আমি তো কোনো খবর পাইনি দাদু ভাই'—

এরপরে যা ঘটল, সেটা ঠিক একটা রূপকথার কাহিনীর মতন, কিন্তু, তবু তা সত্যি সত্যিই ঘটল।

ঝড় বৃষ্টি যেমন আচমকা এসেছিল, তেমনি আচমকা থেমে গেল হঠাৎ। ফুট ফুটে জ্যোৎস্না ফুটল।

কারো কোনো আপত্তি না শুনে দাদু সেই রাত্রেই ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি বার করালেন, অমিত আর অজিতকে সঙ্গে নিয়ে অজিতের মামীব কাছে চললেন, নিজের দুই হাতে তিনি ওদের দুজনের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন।

অজিতের মামী সযত্নে-তুলে-রাখা অজিতের বাবা-মার ফোটো দেখালেন। আর দেখালেন একটা আংটি আর একটা ঘড়ি, শত অভাবে পড়েও এদুটো তিনি বিক্রি করতে পারেন নি!

'আমিই তাকে এই আংটি আর ঘড়ি দিয়েছিলাম! বললেন অক্ষয়বাবু। 'তুচ্ছ কারণে রাগারাগি করে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। একবছরের ওপর কোনো খবর পাইনি, তারপর হঠাৎ পেলাম তার মৃত্যু সংবাদ! সে যে বিয়ে করেছিল, তার ছেলে হয়েছিল, সে সব কথা তো আমাকে কেউ জানায় নি! অমিত উল্লসিত হয়ে বলে উঠল 'তাহলে অজিত আমার ভাই, তাই আমরা এক রকম দেখতে ? কিন্তু, জাঠতুতো খুড়তুতো ভাই এর চেহারায় কি এত মিল হতে পারে ?'

'তোদের বাবারা যে যমজ ভাই ছিল, অভয় মাত্র আধ ঘণ্টার বড় ছিল, সবাই বলত মানিকজোড় আর তোরাও দুটিতে ঠিক, যমজ ভাই-এর মতনই দেখতে হয়েছিস! ঠিক সেই মানিকজোড়।' অজিতের মামী আর তাঁর দাদাকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন অক্ষয়বাবু। কিন্তু তাঁদের কোনো আপত্তি না শুনে তিনি তখনই অজিতকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন।পরদিন সকালে অমিত অজিতের কীর্তিকাহিনী শুনে রাগতে গিয়েও হেসে ফেললেন দাদু।

'দাঁড়া তো দেখি! আমাকে বুড়ো মানুষ পেয়ে তোরা এমন করে ঠকিয়েছিস ? এবার সোজা দুজনকে এক সঙ্গে হেড স্যারের কাছে উপস্থিত করে সব ফাঁস করে দিচ্ছি, আচ্ছা শাস্তি পাওয়াচ্ছি। দুজনকেই রোজ স্কুলে যেতে হবে আর সব পড়া করতে হবে।' আনন্দে অজিতের মুখে কথা সরল না। অমিত বলল, 'বা-রে, আমরা দুষ্টুমি করেছিলাম বলেই তো তুমি তোমার দ্বিতীয় নাতিকে খুঁজে পেলে। এবার হেডস্যারকে বলে ওকেও স্কুলে ভর্তি করে দাও,—তাহলে আমরা খুশি হয়ে রোজ স্কুলে যাব, সারাদিন ক্লাস করব আর সব পড়া করব, সত্যি, সত্যি মানিকজোড় হয়ে যাব!'
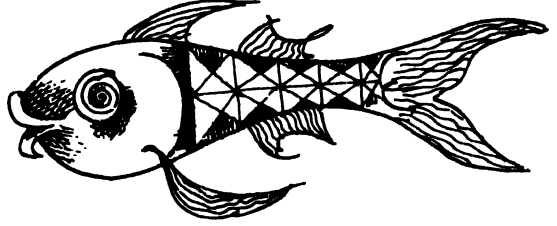
বাটি চালান

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সেবার খুব জাঁকজমকের সঙ্গে আমার ভাইপো পশুর অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। ঢুলীরা ঢোল আর সানাই নিয়ে এল। আমাদের রায়বাড়ির উঠোনে দক্ষিণের চালাঘরে তারা মাদুর বিছিয়ে আস্তানা গেড়ে বসল। দুটো ঢোল বাজতে লাগল। সানাইতে পোঁ ধরল।

আর একটু বাদে পালকি নিয়ে এল বেয়ারারা। সেই পালকিতে করে দু মাসের পশু গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। কাছাকাছি যে শিবমন্দিরটি আছে সেই মন্দিরে প্রণাম করে আসবে।

অন্নপ্রাশন তো নয় যেন বিয়েরই একটি ছোটখাট পকেট সংস্করণ। কনেটি বাদে আর সবই আছে।

আমি দাবি করতে লাগলাম, 'ওই পালকিতে আমিও উঠব।'

দিদিভাই ধমক দিয়ে বললেন, 'ছি ছি ছি! অত বড় ছেলে আবার পালকিতে ওঠে নাকি? অন্নপ্রাশনের সময় পালকিতে তো তুইও উঠেছিলি। আবার বিয়ের সময় উঠিস।'

আমি বললাম, 'হুঁ বিয়ে শিগগির হচ্ছে কিনা।'

মা জেঠীমা কাকীমারা হেসে উঠলেন, 'সেই ভালো। দশ বছর বয়সেই ওর বিয়ে দিয়ে দাও। দেরি যখন ওর সইছে না।'

শেষ পর্যন্ত আমার দাবি গ্রাহ্য হয়। চন্দনে কাজলে সাজানো লাল জাঙ্গিয়াপরা পশুকে কোলে নিয়ে আমিই বসলাম পালকিতে। দিদিভাই অবশ্য সঙ্গে রইলেন পাহারা দিতে।

মা বললেন, 'দেখিস যেন পড়েটড়ে না যায়।'

আমি বললাম, 'পড়বে কেন। ভাল করে ধরে থাকব।'

পরামানিক পরাণ শীল দর্পণ নিয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে হেসে বলল, 'তোমার ধরার চোটে চিঁড়েচ্যাপটা না হয়ে যায় তাও দেখো।'

আমার মনে একটু দুঃখ হল। পরাণ শীল যদিও আমার চেয়ে বিশ বছরের বড়; সে আমাকে

দোস্ত বলে ডাকে, আমিও তাকে দোস্ত বলি। কিন্তু এই কি বন্ধুর মত ব্যবহার! কথায় কথায় ঠাট্টা টিটকিরি!

যে যাই বলুক, যে যতই বাধা দিক, সেদিন পশুকে কোলে নিয়ে দুই বেহারার কাঁধে চড়ে পালকিতে করে বেশ ভালোভাবেই বেড়িয়ে এসেছিলাম। পশুর অন্নপ্রাশনের স্মৃতিটা এজন্যেও বিশেষ করে মনে আছে।

কিন্তু আজকের গল্প পালকি চড়া নিয়ে নয়। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আরও যে একটা কাণ্ড ঘটেছিল সেই ব্যাপারটার কথা তোমাদের আগে বলি!

অন্নপ্রাশনের সময় শুধু যে ঢুলী মালী পালকি বেহারারাই এল তা নয়, প্রচুর লোকজন আত্মীয়স্বজনরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। লুচি তরকারি মাছ মাংস দই মিষ্টি আর পায়েসের ব্যবস্থা হয়েছিল।

নিমন্ত্রণের পরদিন আমাদের পুবদিকের পুকুরটার পারে গিয়ে দেখলাম সেটা তেলের পুকুর হয়ে রয়েছে। পিতলের বড় বড় হাঁড়ি গামলা, কাঁসার বাসনকোসন সব জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল। সেগুলো মেজে ঘরে তোলা হচ্ছে। আরও খানিকটা দূরে উত্তর দিকে একটা খানার মধ্যে রাশ রাশ এঁটো কলাপাতা আর মাটির গ্লাস স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। দু-তিনটে নেড়ী কুকুর সেই এঁটোকাটা নিয়ে মারামারি করছে। আমি উদাস মনে ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলাম।

হঠাৎ মণিকাকা এসে বললেন, 'এই পল্টু কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছিস রে। পড়াশুনো নেই?'

আমি বললাম, 'বাঃ রে, কাল অন্নপ্রাশন গেল না?'

মণিকাকা বললেন, 'অন্নপ্রাশন তো কালই হয়ে গেছে। তার জন্যে আজও বুঝি পড়া বন্ধ?'

না, মণিকাকাকে নিয়ে আর পারা গেল না। দিনরাত কেবল পড়া আর পড়া।

পড়া ছাড়া আর যেন কোন কথা নেই ওঁর মুখে। কত রকম জল-পড়া, তেল-পড়া, চাল-পড়া আছে শুনি। তার কোন একটা কিছু দিয়ে মণিকাকাকে ওই পড়া কথাটা ভুলিয়ে দেওয়া যায় না?

পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় জানালার ধারে ছোট একখানা টেবিল পাতা। মনেমনে গজগজ করতে করতে আমি বই নিয়ে পড়তে বসলাম। কিন্তু মন কি বসতে আর চায়? বাড়িতে এখনো সেই অন্নপ্রাশনের জের চলছে। ধোয়া মোছা সারা তাড়ার নানা রকমের শব্দ। দুটি উঠোনে শামিয়ানা টাঙ্গানো হয়েছিল সেগুলি খুলে ফেলা হচ্ছে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কাল যারা যেতে পারেন নি আজ তাঁরা যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। নৌকোর মাঝিরা এসে তাঁদেব মালপত্তর তুলছে। মাথায় লাল গামছার বিড়ে। 'চাইল্ডস্ ইজি গ্রামার' সামনে খোলা পড়ে রইল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে এই সব নয়নমনোহর দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ কানে এল বড় একখানা কাঁসার থালা পাওয়া যাচ্ছে না। আর সব বাসনকোসনই মেজে ধুয়ে ঘরে তোলা হয়েছে, কিন্তু একখানা থালার মিল হচ্ছে না।

থালাখানা দিদিভাইয়ের নিজের। মাঝখানে একটি পদ্ম আঁকা।

বাবা বললেন, 'তোমার ও পুরনো থালা কে আর নেবে পিসীমা। দেখ কোথাও পড়ে টড়ে আছে।'

দিদিভাই বললেন, 'কোথাও নেই। আমি সব জায়গায় খোঁজ করিয়েছি। আনাচেকানাচে কোথাও নেই। থালাখানা তো একটা সূচ নয় বাপ যে লুকিয়ে থাকবে—'

বাবা বললেন, 'তা হলে গেছে যাক। ভারী তো পুরনো একখানা থালা—'

দিদিভাই বললেন, 'তোমার গায়ে না লাগলে কি হবে বাপু। এ আমার বাবার হাতের থালা। সেবার আমরা যখন গয়া কাশীতে গিয়েছিলাম তীর্থ করতে তখন তিনি ওই থালাখানা কিনে

ছিলেন। স্বর্গে যাওয়ার আগে তোমাদের নিয়ে তিনি এই থালায় বসে ভাতও খেয়েছিলেন। এ থালার দাম তুমি কি বুঝবে বাপু?'

দিদিভাইয়ের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে তিনি আমাদের সংসারে এসেছেন। আমার বাবা কাকাদের নিজের হাতে মানুষ করেছেন। এ বাড়িতে তাঁর আলাদা মর্যাদা।

বাবা বললেন, 'তুমি কেঁদ না পিসীমা। আমি তোমাব থালা খোঁজ করাচ্ছি।'

কর্তার হুকুমে ফের লোকজন লেগে গেল থালার খোঁজে।

বইখাতা তুলে রেখে আমিও সেই খোঁজারুদের দলে ভিড়ে পড়লাম।

মণিকাকা নিরুপায় হয়ে বললেন, 'ফাঁকিবাজ।' তা বলুন গিয়ে। দিদিভাইয়ের বাবার হাতের থালা হারিয়েছে এ কি একটা যে সে ব্যাপার? এখন তো সাধারণ-স্কুলের পড়া। আজ বাদে কাল যদি পরীক্ষাও হত তাহলেও বই নিয়ে বসে থাকতে পারতাম কিনা সন্দেহ!

সেই সন্ধানকার্যে আমার ছোট ভাই কান্দু বাপ্পুও যোগ দিল। আমরা এক নতুন খেলা পেলাম। ভাগ্যে দিদিভাইয়ের থালাখানা হারিয়েছিল। নইলে এমন মজার খেলা চট করে আমরা মাথা থেকে বের করতে পারতাম না।

বাড়িতে ঘরই ছোট বড় পানের ষোলখানা।

মাঝখানের উঠোনে চারখানা বড় বড় ঘর। বার বাড়ির উঠোনে তিনখানা। পেছনের উঠোনে আছে রান্নাঘর, একখানায় মাছ মাংস রান্না হয় আর একখানায় নিরামিষ। এ ছাড়া ঢেঁকিশাল আছে, গোয়ালঘর আছে, দুখানা মণ্ডপঘর আছে। সব ঘর আমরা আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখলাম। কোথাও থালার থ টুকুও পেলাম না।

বাবা বললেন, 'এবার পুকুরটা দেখ। হয়তো ঘাটের কাছে ভেজানো ছিল। কেউ আর তোলে নি। গড়িয়ে গড়িয়ে পুকুরের ভেতরে চলে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে রংবেরঙের গামছা পরে পুকুরে লোকজন নেমে পড়ল। আমাদের বাড়ির পুরনো চাকর অনাথ. আমাদের বাড়িতে থেকে ভাঙ্গার হাইস্কুলে পড়ে, নমু ভাগনে সেও নামল। এই সুযোগে ওরা জলে সাঁতার কাটবে, যত খুশী ডুব দেবে। কী মজা ওদের! পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিংসায় আমার বুক জ্বলতে লাগল। সাঁতার তো আমিও একটু আধটু জানি। আমাকে বুঝি একবার জলে নামতে দেওয়া যেত না।

কিন্তু বাবা শুধু অনাথ নমুকে পুকুরে নামিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। জেলেবাড়ির রাজমোহন আর লালমোহনকেও জাল ফেলতে বললেন। তাদের জালে একটা ভাঙা গাড়ু উঠল, একটি চার পাঁচ জায়গায় টোল-পড়া পুরনো পিতলের ঘটি। কিন্তু থালার নামগন্ধ নেই। আধমন একটা রুইমাছ উঠল। ছোট আর মাঝারি কাতলা পোনার তো কথাই নেই। সবাই থালার কথা ভুলে সেই মাছগুলির দিকে ঝুঁকে পড়ল। লালু আর রাজুর তো আনন্দের অবধি নেই।

অনেক পরিশ্রম করেছে তারা। তাদের কিছু মাছ ধরে দেওয়া হল মজুরীবাবদ।

সবাই থালার কথা তখনকার মত ভুলে গেলেও দিদিভাই ভুললেন না।

তিনি বলতে লাগলেন, 'থালা পুকুরের মধ্যে পড়ে নি। নিশ্চয়ই কারো হাতে পড়েছে।'

কিন্তু নিজেদের বাড়িঘর ভালো করে না দেখে আগে থেকে কাউকে তো সন্দেহ করা যায় না। বাবা ভাবতে লাগলেন আর কোথায় খোঁজা বাকী আছে!

পরাণ শীল সঙ্গে সঙ্গে ছিল। বেঁটে খাটো শক্ত মজবুত চেহারা। ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। দুটি চোখ যেন ক্ষুরের ফলা। চকচক করছে। মাঝে মাঝে তামাক সেজে আনছে। হুঁকোটা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছে, 'নিন মেজোকর্তা!'

পরাণ এক সময় বলল, 'একবার কুয়োটাও দেখলে পারতে। বলা তো যায় না, কেউ অসাবধানে ফেলে টেলে দিতে পারে। এখন ভয়ে মুখ খুলছে না।'

পেছনের উঠোনের বড় একটা কুয়ো আছে আমাদের। তার পাড় বেশ উঁচু। পোড়ামাটির চাক দিয়ে সেই কুয়ো তৈরী।

বাবা বললেন, 'অত উঁচু কুয়োর মধ্যে থালাটা কে ফেলতে যাবে! তবু একবার দেখা ভালো।'

কুয়োর মধ্যে যে সে লোক নামতে পারে না। যারা কুয়ো কাটে সেই কুয়োতীরাই বছর বছর এসে কুয়ো পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। কুয়োতীদের গ্রাম আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে। খবর দিলে দু-তিন দিনের আগে তারা কেউ আসতে পারবে না।

পরাণ শীল আমাকে ঠাট্টা করে বলল, 'কী দোস্ত নামবে নাকি?'

আমি বললুম, 'তুমি নামো না।'

অনাথ নামতে চেয়েছিল। সে বলল, 'আপনি হুকুম দিলে মই বেয়ে আমি নেমে যেতে পারি মেজোকর্তা।'

বাবা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই থাম তো। পুকুরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে চোখ দুটো তো

জবাফুল করে তুলেছিস। এরপর যদি কুয়োর মধ্যে তোকে নামিয়ে দিই তুই কি আর ফের উঠে আসতে পারবি ? যা তামাক সেজে নিয়ে আয় এক ছিলিম। তোর যা কাজ তাই কর।'

বাড়ির চাকর হলেও বাবা ওকে ছেলের মতই ভালোবাসতেন। কতই বা ওর বয়স। আমার চেয়ে বছর সাত আটের বড় হবে বড় জোর।

অনাথ তামাক সাজতে গেল তো শুকচাঁদ মণ্ডল এল এগিয়ে। কাছেই তার বাড়ি। রোগা লম্বা ছিপছিপে চেহারা। কালো কুচকুচে গায়ের রং। নাক মুখের শ্রী ছাঁদ ভারী সুন্দর। মাথায় বাবরি চুল।

বাবা বললেন, 'তুই পারবি তো সত্যি ? নাকি আমি শেষে থানা পুলিসের দায়ে পড়ব ?'

শুকচাঁদ হেসে বলল, 'না মেজোকর্তা, আপনার ভয় নেই। আমি সত্যিই পারব। যাদব কুয়োতীর মেয়েকে বিয়ে করেছি। শ্বশুরের কাছে কাজকর্ম শিখতে হয়েছে।'

ঠিক ঠিক। সবাইয়ের এবার সে কথা মনে পড়ল। সত্যিই তো তাই।

ওতো যাদব কুয়োতীর জামাই।

পরাণ বলল, 'নগরকানার যাদব তোমাকে মেয়ে দিয়েছে তাইতো জানতাম। কুয়োয় নামবার বিদ্যেটুকু আবার কবে দিল ?'

খুব বড় একখানা মই ছিল আমাদের। বাঁশের তৈরী মই। পুবের ঘরের বারান্দায় সে মই দড়ি বেঁধে আড়আড়ি ভাবে সারা বছর ঝুলিয়ে রাখা হত। দরকার টরকার পড়লে নামানো হত। একবার ঘোষেদের বাড়িতে যখন আগুন লাগে সেই মই ওরা নিয়ে গিয়েছিলেন।

আজ সেই লম্বা মইখানা খুলে নিয়ে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। আর তলতা বাঁশের মতই লম্বা ছিপছিপে শুকচাঁদ মই বেয়ে কুয়োর ভেতরে নেমে গেল।

প্রথম প্রথম অবশ্য ওপর থেকে বালতি নামিয়ে দিয়ে থালা খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু অত বড় থালাখানা বালতিতে উঠবে কী করে ? তাই মই বেয়ে শুকচাঁদ নিজেই নেমে গেল। নেমে গিয়ে কুয়োর তলায় যা আছে সব বালতিতে ভরে পাঠাতে লাগল। অনাথ সেই বালতি টেনে তুলতে লাগল। এক একবার জলকাদা ভরা বালতিটা ওপরে ওঠে আর আমরা সবাই মিলে তার ওপর গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ি। কলাই করা একটা গ্লাস উঠল, একটা তেলের বাটি উঠল । কিন্তু থালার দেখা নেই। পিতলের দোয়াত উঠল একটা। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আমি তার দোয়াতটা কুয়োর মধ্যে লুকিয়ে ফেলে দিয়েছিলুম। রাগ পড়ে গেলে পরে অবশ্য মনে দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু দোয়াতটা আর তোলবার উপায় ছিল না। মুখ ফুটে কাউকে বলবারও জো ছিল না! সেই দোয়াত উঠে এল। কান্দু সেই কাদামাখা দোয়াতটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'এই তো আমার দোয়াত।'

মণিকাকা আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'দোয়াতটা কুয়োর মধ্যে পড়ল কী করে ? এ কার কীর্তি ?'

আমি যেন কিছু শুনতে পাই নি তেমনি ভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম। কী যে স্বভাব মণিকাকার। পুরনো কথা কেউ আবার তোলে নাকি ?

খানিক বাদে মই বেয়ে শুকচাঁদ খালি হাতে উঠে এল। না, কুয়োর মধ্যে আর কিছু নেই। শুকচাঁদের পরনের কাপড় আর মাথায় বাঁধা গামছা কাদামাখা হয়ে গেছে। পাতাল থেকে যেন এক প্রেতমূর্তি উঠে এসেছে।

বাবা তার হাতে একটা টাকা দিলেন।

শুকচাঁদ বলল, 'আপনার কাজ তো হল না মেজোকর্তা—'

বাবা বললেন, 'তাই বলে তোমার কষ্ট তো আর কম হয় নি।'

মণিকাকা একসময় বললেন, 'আচ্ছা পিসীমা, তুমি থালাখানা সত্যিই বার করেছিলে তো? নাকি মনের ভুলে যেখানে ছিল থালা সেখানেই রেখে দিয়েছ!'

দিদিভাই চটে উঠে বললেন, 'আমার এখনও অত ভুল হয় নি বাপু। বিশ্বাস না হয় চল তোমাদের দেখাচ্ছি।'

দিদিভাইয়ের পেছনে পেছনে আমরা দক্ষিণের ঘরে ঢুকলাম। শণের আটচালা ঘর। মাটির ভিত, বাঁশের বাখারির বেড়া। তবু দেখতে ভারী সুন্দর।

নিকষ কালো বড় একটা কাঠের সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়ালেন দিদিভাই। এই সিন্দুকটাকে কেন যেন আমার ভুতুড়ে সিন্দুক বলে মনে হত। গায়ে সিঁদুরের আঁকা পঞ্চ পুত্তলী। সেই পুতুলগুলোর হাত পা আছে কিন্তু হাতে পায়ে কোন আঙুল নেই। মাথা আছে—শুকনো সরু সরু মাথা। কিন্তু মুখ চোখের কোন চিহ্ন নেই। তাদের পায়ের কাছে বড় একটা পেতলের তালা ঝুলছে। একা একা সেই পুতুল আঁকা কালো সিন্দুকটার সামনে দাঁড়ালে আমার কেন যেন গা ছমছম করত। অথচ ওই সিন্দুকে কী সব জিনিস লুকোন আছে তা দেখবার কৌতূহলও কিছুতেই চেপে রাখতে পারিনে!

চারটি পায়ার ওপর দাঁড়ানো বেশখানিকটা উঁচু মত সিন্দুক। তার ওপরে একজন লোক বেশ শুয়ে থাকতে পারে। খাটের মতই পায়াগুলি ওপরে উঠে গোল হয়ে গেছে। ঘোর কালো তাদের রং। যেন চারটি ভুতুড়ে মাথা। এক এক সময় আমার মনে হত।

দিদিভাইয়ের আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা। সেই গোছা থেকে চাবি নিয়ে তিনি সেই বড় তালাটি খুলে ফেললেন। মণিকাকা নিজে গিয়ে সিন্দুকের ভারি ডালাটি তুলে ধরলেন।

সিন্দুক তো নয় আস্ত একটা মিউজিয়াম। ভেতর থেকে দিদিভাইয়ের বাবার ব্যবহার করা অনেক জিনিসপত্র বেরোল। চশমা, দোয়াত, কলম, পুরনো পাঁজিই বিশ পঁচিশখানা, জমাখরচের খাতা আর একদিকে বাসনকোসন। ছোট একখানা খাঁড়া। এই খাঁড়া দিয়ে তিনি এক হাতে পাঁঠা কাটতেন গল্প শুনেছি। সবই আছে কিন্তু সেই থালাখানা নেই।

দিদিভাই সবাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখলে তো? আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। দেখলে তো সবাই?'

কেউ কোন কথা বলল না।

সিন্দুকের পেছনের বেড়ায় খানিকটা উঁচুতে ছোট একখানা বাঁধানো ফোটো। সে ফোটো যে কার তা আমরা সবাই জানি। তাউইমশাইয়ের। বাবার ঠাকুরদা—দিদিভাইয়ের বাবার। তিনি একশ দশ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। এ ছবি তাঁর অতি বৃদ্ধ বয়সের ছবি। তোলাটাও তেমন ভালো হয় নি। আবছা আবছা দেখা যায়। দেহের শুধু কাঠামোটুকু আছে। আজানুলম্বিত বাহু, লম্বা নাক আর তার দুপাশে কোটরে ঢোকা কিন্তু উজ্জ্বল দুটো চোখের স্মৃতি এখনো মনে আছে।

সবাই যেন ব্যাকুল হয়ে সেই কুলপুরুষের দিকে তাকালেন। যেন তাঁর থালা তিনিই তার সন্ধান দেবেন। কিন্তু সেই গালভরা চোয়ালের হাড় জাগা সেই মুখচ্ছবির কাছ থেকে আমরা কেউ কোন ইশারার ইঙ্গিত পেলাম না।

খানিক বাদে আমরা সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে ভরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাবা বললেন, 'মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি। পুরনো একখানা থালার জন্যে তো আর থানা পুলিস করতে পারিনে।'

দিদিভাই বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন, 'কেবল পুরনো আর পুরনো। পুরনো জিনিস হারানো কি

ভালো ? তাতে অকল্যাণ হয় সংসারের। তাছাড়া মরা মানুষের হাতের জিনিস। দেখলি না বাবার মূর্তির দিকে তাকিয়ে ? কেমন রাগ রাগ ভাব !'

বাবা হেসে বললেন, 'রাগ রাগ ভাব তো মুখ ফুটে বলে দিলেই হয় কোথায় আছে থালাখানা ? তোমার বাবাকে গিয়ে বল না পিসীমা। আমরা কেউ থাকব না সেখানে। শুধু তুমি থাকবে। দেখ যদি কোন আদেশ টাদেশ—'

দিদিভাই বললেন, 'তুই আর হাসিসনে মহিন্দির ! তোর হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে।'

আরও কিছুক্ষণ থালার খোঁজ খবর চলল। ওই থালায় কাউকে ভাত বেড়ে দেওয়া হয়েছে কিনা কেউ ভাত তরকারিসুদ্ধু থালাখানা নিয়ে গেছে কিনা পাড়াপড়শীদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞেসা করা হল। কিন্তু না, কেউ সে থালা নেয় নি।

সন্ধ্যার আগে আগে খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে দেখি গুপী গুণিন এসে উত্তরের ঘরে বারান্দায় বসে ছোট হুঁকোটিতে তামাক খাচ্ছে। তার মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত নামানো। বেশির ভাগ চুলই পেকে গেছে। গলায় ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। মুখখানা যেন একটি শুকনো ঝুনো নারকেল। গোল গোল চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। দেখলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে।

'দিদিভাই কিন্তু তার সামনে বসে অসংকোচে তার সঙ্গে কথা বলছেন।

দিদিভাই বললেন, 'গুপী আমার থালাখানা কিন্তু চাই। শুনেছ বোধহয় আমার বাবার হাতের জিনিস। এর দাম আমার কাছে আলাদা। এই একখানা থালার বদলে যদি পাঁচখানা থালাও যেত আমি কিচ্ছু বলতাম না।'

গুপী অভয় দিয়ে বলল, 'আপনি ভাববেন না পিসীমা। থালা আপনার ধারে কাছেই আছে। বেশীদূর যায়নি। চেনা জানা মানুষই নিয়েছে। অচেনা কারো হাতে পড়ে নি। কী চান বুলন। চাল-পড়া আছে, চটা চালান আছে, বাটি চালান আছে।'

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলি গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম।

কোন্ জিনিসের যে কি মাহাত্ম্য দিদিভাইয়ের কাছে তা আমি আগেই শুনেছি।

চাল-পড়ার ব্যাপারটা হল এই। মন্ত্র-পড়া চাল এক মুঠো করে সবাইকে খেতে দেওয়া হবে। খেয়ে প্রত্যেকে থুথু ফেলবে মাটিতে। যে নির্দোষ তার কিছু হবে না। কিন্তু জিনিস যে চুরি করেছে তার গলা দিয়ে রক্ত বেরোবে। সেই রক্ত থুথুর সঙ্গে উঠে আসবে। গোপন করবার জো থাকবে না।

চটা চালানোটা আরো ভয়ংকর ব্যাপার। লম্বা আর বেশ শক্ত বাঁশের দুখানি বাখারি কাঁধে নিয়ে দাঁড়াবে। গুণিন তার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়বেন। আর মন্ত্রের তেজে চটাসুদ্ধ লোকটিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে। যে আসল চোর দুদিক থেকে দুখানি চটা গিয়ে তার গলা চেপে ধরবে। যতক্ষণ না চোর স্বীকার করে 'হ্যাঁ নিয়েছি' ততক্ষণ সেই চটা তার গলার দুদিক থেকে চাপতেই থাকবে চাপতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত তার জিভ বেরিয়ে আসবে। এর পরেও কি আর চুরি যাওয়া জিনিস না বেরিয়ে পারে ?

দিদিভাই বললেন, 'না, ওসব চালপড়া টালপড়ার কাজ নয়। সবাই কি আর চালপড়া খেতে আসবে ? আসল যে চোর সে কি আর সাধ করে তোমার চাল চিবুতে আসবে ? মিছিমিছি সের খানেক সের দেড়েক চালই নষ্ট।'

গুপী গুণিন বলল, 'তাহলে চটা চালান দিই পিসীমা। চোর যেখানেই থাকুক আমার দুখানি চটা গিয়ে চিমটের মত তার গলা চেপে ধরবে।'

দিদিভাই বললেন, 'না বাপু ও সব চটা ফটায় কাজ নেই। এই নিয়ে নাকি সেবার পুলিসে

গোলমাল করেছিল। আইন করে এসব নাকি নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। দরকার কি হাঙ্গামা হুজ্জত বাড়িয়ে। তার চেয়ে তুই বাপু বাটিই চালা। জিনিস ফেরত পাই কিনা পাই আমি শুধু লোকটিকে চিনে রাখতে চাই।'

গুপী বলল, 'আপনি লোকটিকেও চিনবেন, জিনিসও পাবেন। তাহলে কাজটা কবে হবে বলে দিন, আমি সেইদিন আসি।'

দিদিভাই বললেন, 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার করে দরকার কি। আজই করে ফেল না। আজ শনিবার। এ সব কাজের পক্ষে আজই ভাল দিন।'

তন্ত্রমন্ত্রের পক্ষে শনিবার আর মঙ্গলবারই প্রশস্ত। আজই এসব চালান টালানের ব্যবস্থা হচ্ছে। শুনে খুব আনন্দ হল। চটা চালান দেখতে পারলে আরও খুশী হতাম। তা যখন হবেই না বাটি চালানটাই দেখি।

বাবা তাঁর প্রতিবেশী বন্ধুদের নিয়ে পাশা খেলছিলেন। তাদের মধ্যে পরাণ শীলও ছিল। বাটি চালানের ব্যবস্থা হচ্ছে শুনে খেলাটেলা ফেলে উঠে এলেন।

দিদিভাইকে একটু ধমক দিয়ে বললেন, 'এসব কী হচ্ছে পিসীমা?'

দিদিভাই বললেন, 'তুমি চুপ কর বাপু। আমার বাবার থালা আমি খুঁজে বার করবই। যে ভাবে পারি। তুমি খেলা নিয়ে আছ খেল গিয়ে।'

কিন্তু বাটি চালান কি কোন কিছুর চেয়ে কম খেলা নাকি? পাশার আসর ভেঙে গেল। চারদিক থেকে সবাই এসে ঘিরে ধরল গুণিনকে।

আমাদের মাঝখানের উঠোনে গুণিন উঠে এসে বসল। হাতের ইশারায় লোকজনকে দূরে সরে যেতে বলল।

দিদিভাই বেশ বড় এক কাঁসার বাটি গুণিনের সামনে এনে রাখলেন।

গুণিন সেই বাটিটাকে একবার দেখে নিল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ এতেই হবে।'

যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে।

গুণিন সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে লুঙ্গি পরা রোগাটে একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই যে মরা হাতেম তুই আছিস। আয় চলে আয়। তুই তুলা রাশি আমি জানি। তোকে দিয়েই হবে।'

হাতেমের নাম মরা হাতেম। মানে বেঁচে থেকেও যে মরে আছে। সারা বছর ম্যালেরিয়ায় ভোগে। কাঠির মত চেহারা। চিঁচিঁ করা গলা। আমাদের গাঁয়ে আরও একজন হাতেম ছিল। সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান ছেলে। তার থেকে আলাদা করে চেনাবার জন্যে রোগা হাতেমকে সবাই মরা হাতেম বলত।

মরা হাতেম ভয়ে যেন আরও মরে গেল।

চিঁচিঁ করে বলল, 'গুণিন দাদা, আমার গায়ে যে এখনো জ্বর।'

গুণিন বলল, 'তোর জ্বর তো পোষা জ্বর। বারমাসই জ্বর লেগে আছে। আয় বাটিতে এসে হাত দে জ্বর সেরে যাবে।'

গুণিনের কথার মধ্যে কি ছিল কে জানে। মরা হাতেমের তা অমান্য করবার সাধ্য হল না। কাঁপতে কাঁপতে এসে বাটির সামনে বসল।

গুণিন বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। খানিকক্ষণ মন্ত্র পড়বার পর ফুঁ দিল বাটিটায়। তারপর আবার মন্ত্র পড়তে লাগল। সেই মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে ফুঁ দিল হাতেমের গায়ে।

তারপর তার দিকে চেয়ে বলল, 'আবার একটা চাদর গায়ে জড়িয়েছিস কেন। ওটা কষে মাথায় বেঁধে নে।'

হাতেম ভয়ে ভয়ে বলল, 'শীত করবে না গুণিনদা! আমার গায়ে যে জ্বর।'

গুণিন বলল, 'জ্বর ফর কিচ্ছু থাকবে না। হ্যাঁ, বাটির মধ্যে এবার হাতটা রাখ।'

মরা হাতেম তার শুকনো হাতখানা বাটির মধ্যে রাখল।

গুণিন একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'থালাখানা কে নিয়েছ এখনো বলো। নইলে বাটি কিন্তু কোন চক্ষুলজ্জার ধার ধারবে না। চোরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে। যেখানে থালাখানা আছে তার ওপরে গিয়ে বাটিটা উঠে বসবে। নদীনালা বনজঙ্গল পাহাড় পর্বত কিছু মানবে না। ওই মরা হাতেম তাজা ঘোড়ার মত কিভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে দেখতে পাবেন কর্তারা।'

বলে গুণিন ফের মন্ত্র পড়তে লাগল।

হাতেমের নীচে বাটিটা স্থির হয়ে ছিল, এবার আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল।

তারপর চলতে লাগল বাটি। হাতেমের হাত সেই বাটির মধ্যে। শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে বসেছে হাতেম। আর সেই মন্ত্রপড়া বাটিটা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে গেল আমাদের রান্নাঘরের সামনে। তারপর বাড়ির চারপাশে একবার ঘুরপাক খেল। চোর যেন মনস্থির করতে পারছে না। জিনিস নিয়ে কোন্ পথ দিয়ে পালাবে। তারপর বাটিটা ফের ফিরে এল বাড়ির পশ্চিম দিকে।

উঁচু করে বাঁধা ভিটে। নীচে পথ। এই পথ বর্ষার সময় জলে ডুবে থাকে। তখন থই পাওয়া যায় না। অন্য সময় শুকনো খটখট করে। সেই পথে নামবার জন্যে কতকগুলি তালগাছের গুঁড়ির পইঠা আছে। বাটিসুদ্ধ মরা হাতেমকে সেই পইঠাগুলোর ওপর দিয়ে কে যেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। গোটা তিন চার হ্যারিকেন লণ্ঠন জোনাকির মত মিটমিট করতে করতে সেই বাটির পেছনে পেছনে আসতে লাগল। হাতেমকে নিয়ে সেই বাটিটা আগে আগে ছুটে চলল। তার পেছনে গুণিন। তারও পেছনে অন্য সবাই। সঙ্গে কে কে ছিলেন এখন আর ভালো করে মনে নেই। বাবা বেশি লোককে আসতে দেন নি। তবে আমি ছিলুম। আমি যেন কী করে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলুম।

দিদিভাই আসেন নি। তিনি থালার খোঁজে বাটি পাঠিয়ে চুপচাপ বাড়িতেই বসে ছিলেন।

পথ ছেড়ে বাটি উঠে পড়ল জংলা বৈরাগীর ভিটেয়। চোর যে পথ দিয়ে গিয়েছে বাটি সেই পথ দিয়েই এগোচ্ছে। চোরের রাস্তা তো সোজা রাস্তা নয়।

বৈরাগী ভিটে থেকে বৈরাগীরা অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। এখন সেখানে শেয়াল খরগোশ সাপখোপের বাস। সারা ভিটেটা আগাছার জঙ্গলে ভরা। কাঁটা গাছের অভাব নেই। বাটি সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ কেটে নিয়ে এগিয়ে চলল। গুণিন যেন শুধু মরা হাতেমকেই ঘোড়ার মত ছোটাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটছি। আমরাও যেন তার মন্ত্র-পড়া, বশ-করা মানুষ।

উঁচু ভিটা থেকে আবার নীচুতে নামল হাতেম। উঠল আর একটা বাড়িতে। আমার বন্ধু বিনোদ দাসের বাড়ি। আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। বাটিটা এ বাড়ির কোন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে না তো?

না, তা ঢুকল না। বাটি সে বাড়ি ছাড়িয়ে কুলগাছ আর কামরাঙ্গা গাছের ভিতর দিয়ে ঠিক একেবারে পরাণ শীলের উঠোনের ওপর এসে দাঁড়াল। বাটি আর নড়ে না। দাঁড়িয়েই আছে। তার ভেতরে হাত রেখে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে হাতেম।

বাবা হঠাৎ এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'থাক থাক। আর দরকার নেই। গুপী, তোমার বাটি তুলে নাও।'

পরাণ আসছিল পেছনে। সে তড়াক করে এক লাফে সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর গুণিনের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, 'না, তোলার দরকার নেই। ঢুকুক, আমার ঘরে ঢুকুক দেখি বাটি। বার করুক থালা। দেখব গুণিনের গুণিনগিরি। যদি না বেরোয় তাহলে আমার হাতে ক্ষুর আছে। সেই ক্ষুর দিয়ে তোর ওই বাবরি চুলের মাথা মুড়িয়ে গাঁয়ে বার করে দেব। শত্রুতার আর জায়গা পাও নি। মাঠে জমিজমা নিয়ে বিরোধ, সেই আক্রোশে তুমি বাটি নিয়ে এসেছ আমার বাড়িতে।'

গুপী কিন্তু ভয় পেল না। চোটপাটও করল না। মৃদু হেসে বলল, 'অত হম্বিতম্বি করছ কেন পরাণ। বাটি যেখানে আসবার সেখানেই এসেছে। যতই ফোঁসফোঁস কর তোমার বিষ ঢোঁড়া সাপের বিষ। তোমার ষোল চোঙ্গা বুদ্ধি। তার ওপরও আমার আর এক চোঙ্গা আছে।'

বাবা কিন্তু নাটকটা আর জমতে দিলেন না। ব্যাপারটার শেষ আমরা দেখতে পেলাম না। বড় বেরসিকের কাজ করলেন। হাতেমের হাত থেকে কেড়ে নিলেন বাটিটা।

গুপী গুণিন যেমন তাঁর বাধ্য, পরাণ শীল তেমনি আরও অনুগত। কেউ আর কথাটি বলল না।

পরদিনের ঘটনা।

ঢেঁকিশালের চালের ওপর একখানা সুপুরির খোলা ভেঙে পড়েছে।

আমি অনাথকে সেই খোলাখানা পেড়ে দিতে বললাম। সেই খোলার মধ্যে কান্দু কি বাঞ্ছু দুজনের একজনকে বসিয়ে টেনে নিয়ে যাব। গাড়ি গাড়ি খেলব। তারপর আমি বসব ওরা টানবে।

অনাথ সেই খোলাখানা পেড়ে আনার জন্যে চালার ওপরে উঠল। তারপর সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল, 'বুড়ো ঠাকরুন, এই যে থালা। এই তো আপনার থালা।'

থালা ওখানে গেল কী করে?

কে জানে কী করে গেল। মন্ত্রের জোরে বাটি যদি মাটির ওপর দিয়ে ছুটে চলতে পারে থালা কি লাফিয়ে চালের ওপর উঠতে পারে না?

অনাথ বলল, 'যে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই লুকিয়ে ফেরত দিয়ে গেছে। কে চোর তা কিন্তু জানা গেল না।'

দিদিভাই বললেন, 'দরকার কি? আমার জিনিস ফেরত পেলেই হল।'

আহাহা! শুধু জিনিসই যেন সব। দিদিভাইয়ের এ কথায় আমি মোটেই খুশী হতে পারলাম না।

তোমরাই কি পারবে?
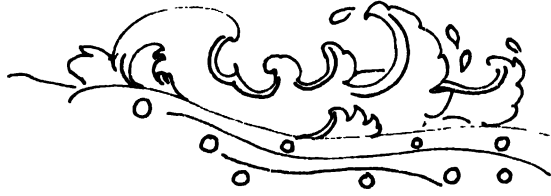
হাট্টিম আর টিমটিম

আহসান হাবীব

সবাই, হ্যাঁ সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ জেগে নেই, জেগে আছে কেবল টেবিলের ওপরে নতুন কেনা চীনা টেবিল ঘড়িটা। এই ক'দিন ধরেই দেখছে হাট্টিম, ওর চোখে ঘুম নেই। দিন বলো রাত বলো, জেগে জেগে সবাইকে পাহারা দেওয়াই ওর কাজ যেন। আর চুপ করে জেগে থাকা না কি? চৌকিদারী হাঁকটাও চলছে সমানে। তবে হৈ হৈ রবে পাড়া মাতিয়ে ও হাঁকে না। খুব শান্ত আর খুব ভদ্র, বেশ ছন্দোময় ওর হাঁক: টিক টিক টিক! টিক টিক টিক! তেমনি টিক টিক আওয়াজ নিয়েই জেগে আছে এখনো ঘড়িটা। আর, আর জেগে আছে ও নিজে; হাট্টিম নিজে জেগে আছে মন ভরা অশান্তি আর দুঃখ নিয়ে। সেই যে কবে সন্ধ্যেবেলা পাবলো মুখ গোমরা করে ফিরে এলো মাঠ থেকে আর এসেই ঘরে ঢুকে হাট্টিমকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে দিলে একেবারে, এই বড় খাটটার তলায়, সে দিনটি কি ভোলা যায়! ছুঁড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পাবলো বলছিলো আপন মনে, চাই নে আমি, চাই নে। এমন পুরনো কাদা ময়লার চট মাখা এমন বল আমি চাই নে। সব্বাই খালি ক্ষেপায়, বলে, পুরনো বাজে বল তোর, ও আবার কেউ ছোঁয় না কি?—চাই নে চাই নে চাই নে। বলতে বলতে পাবলো উপুড় হয়ে পড়লো খাটের সামনের পাশটায়! ওর আপা তখন জোর করে কোলের কাছে টেনে নিলে ওকে, আর আম্মীকে বলে কয়ে কথা নিলে, কাল ওকে একটা নতুন বল খুব সুন্দর দেখে কিনে দিতে হবে। পাবলো একটু শান্ত হলো। আপা মণি আর আম্মী কখনো কথার খেলাফ করে না কিনা তাই, চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে পাবলো এবার সোজা হয়ে বসলো উঠে।

পরের দিন সত্যিই একটা বল এলো আবার। হাট্টিমের সমান বড়, আর রঙটা একেবারে লাল টুকটুকে। দেখলে দু'চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়। এখন এই এমন সুন্দর টুকটুকে বলটার নাম কি রাখা যায়? হাট্টিম নামটা রেখে দিয়েছিলো ছোট আপা, ভারি ভালো লেগেছিলো এই নামটা। কিন্তু এখন, এখন যে ওটা পুরনো, ময়লা আর ফেলে দেওয়া একটা বলের নাম। ও

নামটি আর মনেও আনতে চায় না পাবলো। বলটা যেমন নতুন আর সুন্দর, তেমনি নতুন আর খুবই সুন্দর একটা নাম চাই এই নতুন বলটির। আপামণি, ছোট আপা, বড় ভাইয়া, আম্মী, এমনকি আব্বা, সবাই একটা করে নাম বললেন, কিন্তু পাবলোর তার একটাও পছন্দ নয়। এক একটা নাম শোনে আর পাবলো তার সরু চিবুকটা কেবল ডান বাঁয়ে নেড়ে নেড়ে দেয়। তার মানে, উঁহু, হলো না। অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে থাকলো। তারপর হঠাৎ ছটফট করে উঠে দাঁড়ালো পাবলো। বললে, টিমটিম, টিমটিম ···· ওর নাম রাখবো আমি টিমটিম। ছোট আপা মুখ বাঁকিয়ে হাসলো। বললে, সেই আগেরটার মতই হলো ত বোকা!

পাবলো চিবুক উঁচু করে পানুদের মাস্টার সাহেবের মত খুব বিজ্ঞের মত একটু হাসলো। ক্ষেপা গলায় বললে, তুই বুকি, আগেরটার মত কোথায় হলো? ওটা কি রকম শক্ত শক্ত ছিলো, আর এটা কেমন নরম নরম। কি সুন্দর নাম ঃ টিমটিম টিমটিম! টিমটিম নামটাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেলো। কেউ আর কোন আপত্তি করলে না। কেবল ছোট আপাই মুখ বাঁকিয়ে তেমনি হাসতে হাসতে আসর থেকে উঠে গেলো। তা যাক, পাবলোর বল, পাবলো তার নাম হোঁদলকুৎকুৎ রাখলেও সেটাই হবে দুনিয়ার সব সেরা নাম।

টিমটিম। হ্যাঁ টিমটিমকে নিয়ে মেতে উঠলো পাবলো। সকালে মাঠে, দুপুরে মাঠে, বিকেলে মাঠে। খেলার সঙ্গীও জুটেছে অনেক। একটা বল, ছাব্বিশটা পা। টিমটিমের জান নিয়ে এখন টানাটানি। তবে পাবলো খুব হুশিয়ার। কাদা মাখা পা চলবে না, জুতো পরা পা চলবে না, আরো অনেক কিছু চলবে না।

খাটের তলায় গায়ে মুখে ঝুলময়লা মাখা হাট্রিম সবই দেখে। দেখে পাবলোর মাতামাতি, আব্বা আম্মা আপাদের আর বড় ভাইয়ার খুশী খুশী ভাবটা তাকে প্রায় কাঁদিয়ে ফেলে। ময়লা অন্ধকার মেঝেতে শুয়ে শুয়ে হাট্রিম দিনে দু'বার করে ঝাঁটার বাড়ি খায় আর টিমটিম আছে রাজপুত্রের মত তেপায়াটার ওপরে। আর কতবার যে তাকে ধোয়া মোছা হয় তার হিসাব রাখে কে!

তবু হাট্রিমের মনে একদিক থেকে সুখের অন্ত নেই। পাবলো ভারি খুশী এখন, তাই তারো মনে খুশী আর ধরে না। রোজ টিমটিমকে নিয়ে পাবলোর মাতামাতি দেখে, আর হাট্রিম ভাবে, আহা এমনি যেন থাকে। পাবলো যেন এমনি হেসে খেলেই বেড়াতে পারে সারাটা জীবন। একদিন ত ওকেও সে আদর করতো। সে আদর কি ভোলা যায়! ওকে যে এমন করে ফেলে রেখেছে, তাতে ওর কি দোষ! পুরনোকে কেউ নেয় নাকি! আর তাছাড়া ঐ ডেপো ছোঁড়াগুলোই ত ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো। পাবলোর কিছু দোষ নেই। ও ত সোনার ছেলে। এমন সোনার ছেলেকে যে ভালো বাসবে না, সে নিজেই একটা হতভাগা।

বেশ দিন যাচ্ছিলো পাবলোর হেসে খেলে। আর তাই দেখে দেখে হাট্রিমেরও মনে আর কোনো দুঃখ ছিলো না। কিন্তু আজ সন্ধ্যেবেলা, হাঁ আজ সন্ধ্যেবেলা থেকেই সবকিছু গোলমাল হয়ে গেলো।

ঠিক যেমন ওর বেলায় হয়েছিলো, তেমনি মুখ গোমরা করে পাবলো ফিরে এলো গেট থেকে আজ সন্ধ্যেবেলা। বুক ঠেলে যে কান্না বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলো, তা যেন অতি কষ্টে চেপে রেখেছিলো এতক্ষণ। ঘরে ঢুকেই ভেঙে লুটিয়ে পড়লো কান্নায় আম্মীর কোলের মধ্যে। সেদিন পুরনো আর ময়লা বলে হাট্রিমকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো পাবলো খাটের তলায়। আজ আর তা নয়। টিমটিম নেই। টিমটিমকে দেখা যাচ্ছে না। টিমটিমকে হারিয়ে এসেছে পাবলো।

লাল টুকটুকে টিমটিমকে হারিয়ে পাবলোর বুকে কেবল কান্নার ঢেউ উঠছে। আর তাই না দেখে, দেখে খাটের তলায় ময়লা মেঝের ওপর শুয়ে শুয়ে হাট্টিমেরও বুকটা ভেঙে যাচ্ছে যেন।

রাত বাড়লো। আব্বা বাড়ী ফিরলেন। আমাদের আপা চলে গেলেন, চলে গেলেন ভাইয়ার মাস্টার সাহেব। খাওয়া-দাওয়া সুরু হলো। সবাই খেলো। খেলো না পাবলো। কিছু খেলো না। আম্মী বললেন, এবার আমি খেতে বসবো। চলো, আমার সঙ্গে খাবে। ঘি দিয়ে আলু মাখা আছে, গোশ্‌তের কাবাব আছে আর আছে বেগুনের দোলমা—যা তোমার যত খুশী, খেয়ো।

পাবলো বললে, না না না ওসব আমি খাই নে, কোনদিন খাই নে। আমি টিমটিম খাবো, আমার টিমটিমকে এনে দাও। টিমটিম কেন হারালো? কেন সবাই মিলে এত খুঁজে খুঁজেও পেলাম না ওকে? কেন কেন কেন? আর, জানো, শেমিমকে আমি কেটে ফেলবো। কেটে দু'ভাগ—ন'ভাগ করে ফেলবো।

ঃ ছিঃ, অমন কথা বলে না। বললেন আম্মী।

পাবলো ক্ষেপে গিয়ে বললে, না, বলে না আবার। অত জোরে ও শট্ দিলে কেন তবে? তা নইলে ত আর টিমটিম গিয়ে ঐ জঙ্গলের মধ্যে পড়তো না। বলতে বলতে পাবলো এবার কোল ছেড়ে নেমে বিছানার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। তাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না।

ঃ আহা, বেচারা না খেয়েই শুয়ে পড়লো! ভাবতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাট্টিমের বুক জুড়ে আবার কান্নার ঢেউ উঠলো। কান্নার ধমকে সারাটা শরীর ওর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। রাত বাড়তে থাকলো। পাবলো ঘুমালো, আপার, ভাইয়া, আব্বা, আম্মী সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। জেগে থাকলো কেবল ঘড়িটা, টেবিল ঘড়িটা ···টিক টিক টিক, টিক টিক টিক! আর, আর জেগে আছে হাট্টিম। হাট্টিমের চোখেও এক ফোঁটা ঘুম নেই। এখন ত পাবলো ঘুমোচ্ছে অঘোরে। কিন্তু কাল সকালে, সকালে ঘুম থেকে জেগে আবার ত শুরু হবে সেই বুকভাঙা কান্না আর দাপাদাপি। নতুন বল যদি একটা আসেও, পাবলো কি ভুলতে পারবে টিমটিমকে! টিমটিমকে যে বড় বেশী ভালোবাসতো পাবলো। আহা বেচারা!

যতই ভাবছে হাট্টিম ততই তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে বেরিয়ে যেতে। বেরিয়ে গিয়ে সেই খেলার মাঠটা পেরিয়ে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে ওপাশের ঘন আর বড় সেই জঙ্গলটার মধ্যে। হয়ত টিমটিম বেচারীও এখন জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে ভয়ে ভীষণ কাঁপছে আর মনের দুঃখে ফেলছে চোখের পানি। বাড়ী ফেরার জন্যে ভীষণ মন কাঁদছে তার কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না পথঘাট। হাট্টিম যদি যেতে পারতো ছুটে, ওকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারতো। টিমটিম তখন ভারী খুশি, আর পাবলোত সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই তেপায়াটার ওপর তাকিয়ে কি অবাক! খুশীতে দুটি চোখ তার চক্চক্ করে উঠতো। জীবন সার্থক হতো হাট্টিমের।

যতই ভাবছে হাট্টিম ততই তার সারা শরীর দুলে দুলে উঠছে। দুলতে দুলতে দুলতে, হঠাৎ সে টের পেলো, সে গড়াচ্ছে। গড়াচ্ছে আর এগোচ্ছে। দেখতে দেখতে শোবার ঘরটা সে পার হয়ে গেলো। গিয়ে পড়লো বসবার ঘরে। মাঝখানের দরজাটা খোলাই ছিলো। কিন্তু বসবার ঘর থেকে বাইরে যাবার যে দরজা, সেটায় যে খিল লাগানো। এখন উপায়! ভাবতে বসলো হাট্টিম। দরজা ত খুলতে হবে। কিন্তু উপায় কি তার! অসহায়ের মত ভাবতে ভাবতে মাথা বুক হাত পা সব যেন গরম হয়ে উঠলো। গরম হয়ে তেতে গেলো একেবারে। কপালের রগ্‌গুলো দপ্‌দপ্ করে লাফাতে লাফাতে হঠাৎ যেন ওকে শুদ্ধই তারা লাফিয়ে উঠলো। তারপরই এক দুই তিন চার, ···কেবল একটার পর একটা লাফ। মেঝে থেকে বারবার লাফিয়ে উঠে দড়াম করে এক একটা ঘা মারছে খিলটার মুখের দিকে, আর খিলটা পেছন দিকে সরে যাচ্ছে একটু একটু করে। তারপর আর পায় কে হাট্টিমকে। বারান্দা পেরিয়ে, সিঁড়ির ধাপগুলো গড়িয়ে গড়াতে গড়াতে কখন যে একেবারে খোলা সেই খেলার মাঠে, তা কি সে নিজেই টের পেলো! মাঠটা পার হলো যেন দৌড়ে দৌড়ে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে বুকটা একটু ছ্যাত করে উঠলো। কিন্তু ভয় করলে ত চলবে না। টিমটিমকে উদ্ধার করতে গিয়ে জীবন যদি চলেও যায়, তাও যাক না। তার আর দাম কি জীবনের। সে কেবল পাবলোর খুশী চায়, পাবলো মুখে হাসি দেখতে চায়।

ঝোপঝাড় ঠেলে ঠেলে, কাঁটায় কাঁটায় সারা গা ছিড়েকেটে শেষ পর্যন্ত একটা বৈচি গাছের ঝোপের নিচে সে থমকে দাঁড়ালো। এইত টিমটিম। আহা বেচারার মুখখানা কি শুকনো। আর সারা মুখে কি ভীষণ ভয়ের ছাপ। আজ ত আর কেউ তাকে ধুয়ে মুছে তেপায়ার ওপর তুলে রাখে নি।

সে যাক, কোনো রকম কথা না বাড়িয়ে হাট্টিম তার সামনে দাঁড়িয়ে সোজা বললে, চলো, বাড়ী চলো।

ভীষণ চমকে উঠে টিমটিম বললে, তুমি কে ? কার বাড়ী যাবো ?

হেসে ফেললো হাট্টিম। বললে, কার বাড়ী আবার ? তোমার বাড়ী। পাবলোর বাড়ী। জানো, পাবলো ভীষণ কান্নাকাটি করেছে, আর না খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠেই ত আবার সুরু হবে সেই কান্নাকাটি। চলো বাপু।

টিমটিম তবু বললে, তা তুমি কে, বললে না ত।

ঃ আরে, আমি হচ্ছি পাবলোর পুরনো বন্ধু। তুমি থাকো তেপায়ার ওপর, আমি থাকি খাটের তলায়। তা থাকি ঐ এক ঘরেই। দেখা শোনা ছিলো না, তাই চিনতে পারছো না। কথা বাড়িও না। চলো আমার সঙ্গে। রাত ফুরিয়ে গেলে, পথ চলতে অসুবিধে হবে। দস্যি ছেলেরা নেমে পড়বে মাঠে। পায়ে পায়ে আবার কে কোথায় ছুঁড়ে ফেলবে তার ঠিক ঠিকানা থাকবে না। চলো এগোই।

এগোলো এবার। হাট্টিম আগে আগে ; পেছনে টিমটিম।

মাঝপথে এসে হাট্টিম একবার ধমকে উঠলো। অত টিমটিম করে আসছো কেন বাপু ! মাঠের দস্যিরা যখন লাথির পর লাথি মারে, তখন ত বেশ আকাশ পাতাল করতে পারো ! নাও, পা চালাও।

পা চালালো টিমটিম। হাট্টিমের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো টিমটিম। বাড়ীর দরজার কাছাকাছি এসে পৌছেছে কেবল, হঠাৎ দেখে অনেক লোকে জটলা, আর কি হৈ চৈ ! খালি ধরোধরো, মারোমারো, কিন্তু কেউ কাউকে মারছে-ধরছে না।

হাট্টিম বললে, ভয় কোর না।

টিমটিম বললে, ভয় কোরব না মানে ? শুনছো না, মারতে বলছে, ধরতে বলছে।

ঃ থামো তুমি ! ধমকে উঠলো হাট্টিম। ...আমার বলে মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। পাবলো আর তোমার জন্যেই ত এসব ঘটলো। তোমাকে বা আমাকে ধরতে বলছে না। আমি বেরুতে গিয়ে সামনের দরজা খুলে রেখে গেছি ত ; চোর ঢুকেছে সেই খোলা দরজা দিয়ে। নিশ্চয় চোর ; নইলে মার-ধরের কথা উঠবে কেন এই ভর রাতে ? কি যে করেছি আমি ! তা ভাগ্যিস ওরা টের পেয়ে গেছলো। নইলে ত ... আচ্ছা, চলো ত এগোই দেখি। আস্তে আসবে। খবরদার ফিস্‌ফিস্‌ করবে না। টু শব্দটিও নয়। লোকজন অনেক। পায়ে পায়ে জোড়া। ফাঁক দেখে দেখে এগিয়ে এসো।

সিঁড়ির ধাপে এসে উঠলো ওরা। এক এক করে ধাপ ডিঙিয়ে উঠতে লাগলো। হঠাৎ মাঝপথে হাট্টিম টের পেলো, ওর পিঠের ওপর একটা পাহাড় ভেঙে পড়লো। তারপরেই হুড়মুড় করে দুটো লোক দলা পাকিয়ে গেলো দু'তিনটা ধাপের ওপর। হাট্টিম অমনি এক গুঁতোয় টিমটিমকে সরিয়ে দিলে ধাপের একপাশে দেয়াল ঘেঁষে। দু'জনেই দেয়াল চেপে পড়ে থাকলো মরার মত।

ধরধর করতে করতে ক'টা লোক ছুটে এসে হুমড়ি খাওয়া লোক দু'টোকে চেপে ধরলো। দু'জনের মুখেই কালো মুখোশ।

হাট্টিম বললে, চলো, এগোই এবার।

টিমটিম চোখ কপালে তুলে বললে, ও মা, কোথায় ? এই ধরপাকড় আর মার-ধরের মধ্যে কোথায় এগোবো ?

হাট্টিম এবারও এক ধমক দিলে, অবশ্য ফিস্ ফিস্ করেঃ তোমার ঘটে কি বুদ্ধি বলে কিছুই নেই? এই মার-ধরের মধ্যিখানে এমন ঠায় বসে থাকলে পায়ের নিচে চেপ্টা হয়ে যাবো না? চলো, দেয়াল ঘেঁষে সুড় সুড় করে ওপরে উঠে যাই।

উঠছে উঠছে উঠছে * * * *

হঠাৎ ওপর তলায় একটা আওয়াজ হলো। দড়াম করে দরজা খোলার আওয়াজ। পাবলোর আম্মীর ঘুম ভেঙে গেলো সেই আওয়াজে। তিনি ভাবলেন, চোর ঢুকেছে ঘরে। ছুটে এসে দরজা পার হয়ে বারান্দায় পড়তেই দেখেনঃ পাবলো সেই শেষ রাত্রের অন্ধকারে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আম্মী বললেন, কি রে হতভাগা, এ কি ব্যাপার, অ্যাঁ?

ভ্যা করে কেঁদে ফেললো পাবলো। বললে, কি সব স্বপ্ন আম্মী, তুমি বিশ্বাস করবে না কিছুতেই। আমার ভীষণ ভয় করছে, চলো ঘরে যাই।

আব্বাও এর মধ্যে এসে গেছেন। বললেন, ছি ছি কি সব্বনাশ, পাগোলটা বাইরেই যদি বেরিয়ে যেত—এই অন্ধকারে; ইস্!

পাবলো বললে, ইস্, বাইরে যাবো না, হাতী! হ্যাঁ, আম্মী, কাল কিন্তু আমার সেই পুরনো বলটা বের করে দিও খাটের তলা থেকে, হ্যাঁ?

ঃ দেবো। এখন চলো, শোবে।
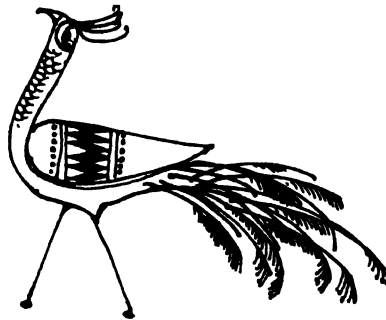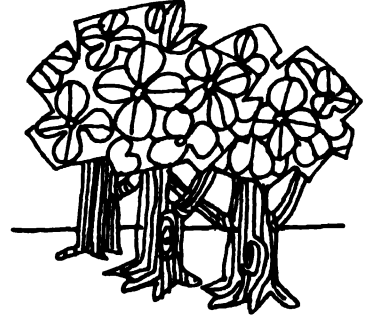
প্রাইজ

শওকত ওসমান

এই কাহিনী শুরুর আগে তোমাদের কাছে কয়েকটা বাড়তি কথা আছে। বাড়তি কেন জানো ? অনেকেই হয়ত ব্যাপারটা জানো, তবু দু' একজন নাও জানতে পারে। তাই কথা একটু বাড়াতে হোলো। এই বাচালতা তোমরা সহ্য করে নেবে, সে ভরসা আমার আছে।

স্পোর্টসের সময় তোমাদের স্কুলে কি 'ড্রেস এ্যাজ ইউ লাইক বা ফ্যান্সি ড্রেস প্রতিযোগিতা' হয় ? তখন দেখে থাকবে তোমার সহপাঠিরা এমন কি তুমি নিজেই হয়ত কিছু সেজে বসে আছো। কেউ হয়ত চানাচুরওয়ালা, কেউ মুচি ইত্যাদি। একেই বলে, ড্রেস এ্যাজ ইউ লাইক। কথাটা ইংরেজি। বাংলা করলে দাঁড়ায়, যার যা খুশী বেশ, বা ইচ্ছে-মত লেবাস। সকলের বোঝার জন্যে এটুকু বলা দরকার ছিল। আর মনে রেখো, শুধু স্কুলে নয়, বাইরেও ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই জাতীয় কম্পিটিশান বা প্রতিযোগিতা হোয়ে থাকে।

এবার গল্প শুরু করি। কেমন ?

॥ দুই ॥

এই পার্কে কয়েকটা সেগুন গাছ সুন্দর বীথি বানিয়ে রেখেছে। গরমের দিনে ইচ্ছা করলে স্কুল পালিয়ে এসে রীতিমত মার্বেল খেলা যায় বা ঘুমোনো চলে। এখানে একদিকে ছোট ছেলে-মেয়েদের ছুটাছুটির বন্দোবস্ত আছে। অনেক সময় জায়গাটা ঘিরে ছোট ছেলে-মেয়েদের ফ্যান্সি ড্রেসের প্রতিযোগিতা হয়।

সেদিন সেগুন গাছের গুঁড়ির উপর বসে বসে ইজাদের বেশ ঘুম ধরে গিয়েছিল। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। এখানে কত ঠাণ্ডা সেই তুলনায়। ঘুম ধরে যাওয়া খুব স্বাভাবিক।

যখন ইজাদের ঘুম ভাঙল, তখন বিকেল। ইতিমধ্যে সেগুন বীথির চেহারা বদলে গেছে। অথচ ইজাদের মা বলেছিল, হাতে বেশ সময় আছে। পরে সে এসে জুটবে। দুপুরে আর তার

কোথাও গিয়ে কাজ নেই। আরো ছেলেপুলে আসবে পার্কে, তাদের সংগে খেলা করে সময় কাটিয়ে সহজেই সে দিতে পারবে। কিন্তু মা এখনও এলো না।

সেগুন বীথির চেহারা সত্যি বদলে গেছে। গাছের আড়াল থেকে ইজাদ দেখতে পায়, পার্কে ঝোপ্‌ঝোপ ফুল বাগানের পাশে চেয়ার টেবিল সাজানো। রঙীন শাড়ী পরে কত না ভদ্রমহিলারা এসেছেন। আর অনেক কুঁচো ছেলেমেয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছে। ইজাদেরও তাই ইচ্ছে করে। কিন্তু কেমন ভয়-ভয় লাগে। মা সংগে থাকলে কোন চিন্তা থাকে না।

তবু সাহসের উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ইজাদ এগোতে থাকে।

হার্মনিয়াম, বাঁশির আওয়াজ শোনা যায়। হল্লাও বেশ শুরু হোয়ে গেছে।

আরো একটু এগিয়েই ইজাদ দেখলে তার সম-বয়সী কত ছেলেমেয়ে। মা কাছে থাকলে সে এখনই অমনই ছুটাছুটি শুরু করে দিত না?

আ রে, কত রকম সব সেজেছে দ্যাখো। একটা মেয়ে পরেছে ঠিক চীনাদের ড্রেস। আর একজন দেখতে ঠিক যেন সাঁওতাল মেয়ে। একজনের মুখে বিড়াল-মুখোশ। আর একজন ডাকাতের মত। ও বাবা, কোমরে পিস্তল ঝুলিয়েছে। সবাই এমন সেজেছে। মা একটু ভাল করে তাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে দিলেই পারত।

ধীরে ধীরে ইজাদ এগিয়ে যায়। তার মনে পড়ে, সেদিন কলেজের মাঠে ধেড়েধেড়ে ছেলেরা কত কী সেজেছিল। একে বলে, "যা-খুশী সাজো।"

ইজাদের খুব মজা লাগে। কিন্তু মন থেকে ভয় একেবারে যায় না। তাই ধীরে ধীরে এগোতে থাকে সে।

আ রে দ্যাখো, একজন শিকারী সেজেছে। হাতে বন্দুক, কয়েকটা পাখী পর্যন্ত ঝুলছে। জ্যান্ত চড়াই পাখী, পালক-বাঁধা।

ইজাদ বড় মজা পায়। সে আরো এগিয়ে আসে। আহ্, মা থাকলে কী মজাই না হোত।

ফুলগাছের ধারে ধারে রাখা টেবিলগুলো খালি নয়। উপরে কত রকমের খাবার। কেক্, সিঙাড়া, বাদাম-ভাজা, রসগোল্লা। আরো কত কী।

সমস্ত পার্কে রং-বেরঙের পোশাক আর মানুষের মুখ। কি জলসাই না বসেছে।

কেয়ারির পাশে সুন্দর সুন্দর ছিটের জামাপরা ছেলে-মেয়েরা ঠিক যেন প্রজাপতি। গুনগুন করছে, গান গাইছে, কেবল উড়ছে না। কারণ, ওদের ডানা নেই। একটা মেয়ে, লতাপাতা আঁকা রেশমের ফ্রকপরা, মাউথ-অর্গ্যান বাজিয়ে ফুলঝোপের দিকে দৌড়ে গেল। কি সুন্দর দেখতে।

ইজাদের সংকোচ কিছুটা কেটে গেছে। তাই আরো এগোতে থাকে সে।

শিকারী ছেলেটা বন্দুক নিয়ে সংগীদের তাড়া করছে। সাঁওতাল মেয়েটার কী দুষ্টুমিভরা চোখ। সে মাথায় কৃষ্ণচূড়ার ফুল গুঁজেছে। ফ্রকের উপর সবুজ পাতা আঁকা। হাতে ফুলের গহনা। হঠাৎ মেয়েটা নাচতে শুরু করল। পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। নাচের তালে তালে একজন বাঁশি বাজাতে লাগল।

অনেক টেবিলের পাশে চেয়ারে রঙীন রঙীন শাড়ীপরা বয়সী মেয়েরা বসে আছে। এরা অভিভাবিকা, বোঝা কঠিন নয়।

কখন ইজাদ জলসার মাঝখানে এসে পড়েছিল, তার খেয়াল নেই। একদল ছেলে-মেয়ে তখন তার আশেপাশে এসে ভিড় জমায় আর বলাবলি করে, কী চমৎকার সেজেছে দ্যাখো। ইজাদ থমকে দাঁড়ায়। কেমন আসোয়াস্তি লাগে তার। কিন্তু ভয় পায় না সে। ছোট ছেলে-মেয়ে, ওদের ভয় কী?

এই সময় সাঁওতালবেশী মেয়েটা ফিকফিক হাসে আর তাকায়।

ইজাদও তখন মুচকি হাসি হেসে ফেললে।

হঠাৎ ছেলে-মেয়েদের স্রোত থমকে গেছে। বড়দের সেদিকে চোখ পড়ে। ছুটে এলেন সবাই চেয়ার ছেড়ে। মিসেস মজুমদার, রুবি চৌধুরী, লিলি খান, হাজেরা তালুকদার ও অন্যান্য গণ্যমান্য জনেরা।

মিসেস মজুমদার বলে ওঠেন, "রিয়েলি, হাউ নাইস।" তিনি ইংরেজী ফোড়ন দিতে ভালবাসেন। তারপর দাঁত চেপে চেপে আধা ঘৃণা, আধা অবহেলায় মিহি গলায় বাংলা উচ্চারণ করেন, "কার ছেলে? বড় সুন্দর মেক্-আপ, বড় ভাল সাজিয়েছে ত।"

"আমাদের ফ্যান্সি ড্রেস কম্পিটিশান খুব জোর জমবে।" সায় দিলেন আর একজন।

মিসেস করিমা তালুকদার নিজের মেয়েকে আরবী পোশাকে সাজিয়ে এনেছেন। তিনি মন্তব্য করেন, "এই ছেলেটাই ফার্স্ট প্রাইজ পাবে মনে হচ্ছে। এর কপালেই আড়াই শ' টাকা ঝুলছে।"

রুবি চৌধুরী খুব বেশী তারিফ করে ফেললেন, "দ্যাখেন, দ্যাখেন, কি চমৎকার পাউডার দিয়েছে। ঠিক ধূলোর মত। আরো দ্যাখেন, ধূলোলাগা ময়লা গালে ভিখিরী ছেলেরা কাঁদলে চোখের পানীর যে শুক্না দাগ থাকে, তাও মেক-আপ থেকে বাদ যায় নি। বাহাদুরি আছে বটে।"

লিলি খান স্কুলে নতুন মাস্টারি নিয়েছেন। তিনি একটু মাস্টারি চাল দিলেন, "আপনি যা-ই বলেন, মিসেস চৌধুরী, ছোট ছেলে-মেয়েদের এমন ভিখিরী করে সাজাতে নেই। ওদের মনের উপর খারাপ ধারণা চেপে বসে। এমন কালো রঙ দেওয়া উচিত নয়।"

রেবা সরকার দৌড়ালেন তাঁর ক্যামেরা আনতে, বেশী দেরী হোল না।

করিমা তালুকদার জিজ্ঞেস করেন, "কি করবে শুনি ?"

"একটা স্ন্যাপ (ছবি) নিই। কাগজে পাঠাব। দেখেছেন কী পোজ্ ? এ ফার্স্ট না হোক সেকেণ্ড প্রাইজ পাবেই। তাও দু শ' টাকা।"

"দাঁড়াও আরো কম্পিটিটর (প্রতিযোগী) আসুক।" মিসেস মজুমদারের মনে ঈষৎ সন্দেহ আছে।

রেবা সরকার কয়েক দিক থেকে ইজাদের কয়েকটা ফটো নিলেন।

গোটা পার্ক গুলজার কয়েক মিনিটে। আরো বড় মা-বোনেরা ভিড় করেন। আরো নানা মন্তব্য ছোটে।

রোজেনা মল্লিকের বয়স চল্লিশের বেশী। দলে গণ্যমান্য।

তিনি বাধা দিলেন, "একজনকে ঘিরে থাকলে চলবে নাকি ? প্রাইজ যার হয় হবে। এখন ছেলে-মেয়েদের খেলতে দিন।"

তবু লিলি খান এগিয়ে এসে ইজাদকে জিজ্ঞেস করেন, "খোকা, তোমার নাম কী ?"

"ইজাদ।"

"বাপের নাম ?" লিলি মিটিমিটি হাসেন। ইজাদের ঠোঁটেও তার ছোঁয়াচ্।

ইজাদ পিতার নাম বলে না। ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

তখন রোজেনা মল্লিক এগিয়ে আসেন তার ঘাবড়ানি দূর করতে এবং বলেন, "রেবা, চলো। এখন আর দারোগার ইন্‌কোয়ারী নয়। ওসব পরে হবে প্রাইজের সময়। ওদের এখন খেলতে দাও।"

লিলি খান খুব আদরের সঙ্গে ইজাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "যাও খোকা, ওদের সঙ্গে খেলা কর গে।"

ইজাদ যেন অভয় মন্ত্র পেয়েছে। সে অবিশ্যি ছুটাছুটি করতে গেল না। একটা কেয়ারির পাশে ঘাসের উপর বসে চারদিকে তাকাতে লাগল।

জলসা জোর জমে উঠছে। ইজাদ এক কেয়ারির পাশ থেকে আর একদিকে যায়। খুব মজা পায় সে। মনে মনে গণতে থাকে আড়াই শ' বা দু শ' টাকা ত অনেক টাকা। এত টাকা নিয়ে মানুষ করে কী। সে যদি পায়, কী মজা না হবে।

আরো ছেলে-মেয়ে, মা-বোন, অভিভাবিকা দলে দলে পার্কে জুটতে থাকে।

আকাশে রঙীন মেঘ ভেসে চলছে। নীচে রঙের জোয়ার, হাসির জোয়ার।

একটি মেয়ে, বয়স তিরিশ হবে, সব ছেলে-মেয়েদের ডেকে নিয়ে কেক বিস্কুট ইত্যাদি পরিবেশন করলে। ইজাদ মাত্র এক পিস কেক নিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। ছুটাছুটিতে তার মন নেই। বুড়োদের মত সেও যেন দর্শক সাজতেই ভালবাসে।

দুই কেয়ারির মাঝখানে সবুজ ঘাসের উপর কয়েকটি ছোট মেয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিয়েছে। ইজাদ কাছাকাছি বসে বোবার মত দেখে আর শোনে।

ছোট্ট বই হাতে ছ'বছরের ছোট্ট মেয়েটা হাত-পা নেড়ে কী সুন্দর না পড়েঃ

আকাশে তারারা
বাজে ঝুমঝুম
ঝুম্‌ঝুমি
খোকন খোকন
এখনও এখনও
ঘুমোও তুমি ?

তারপর আর একজন বয়সী মেয়ে অন্য একটি ছেলেকে বলেন, "এবার তোমার আবৃত্তি কর, খোকন।"

সেও কী মজার কথা পড়েঃ

আমাদের বাবা ভেরি গুড্ বয়
তা-তে আর নাইক সংশয়।
যা-ই চাই তা-ই পাই
সন্দেশ জিলাপী বিস্কুট
চকলেট টফি ডাল্‌মুট
লেবু বাদাম আখ্‌রোট
পুরী রসগোল্লা রসময়
আমাদের বাবা ভেরি গুড্ বয়।

সব ছেলে-মেয়েরা কি হাসি হাসে তারপর। ইজাদও তখন মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে।

আবার কয়েকটি ছোট মেয়ে নাচতে লাগল। ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুরের শব্দ হোতে থাকে।

তখন ওদিকে গবেষণা শুরু হোয়ে গেছে, ওই ছেলেটা কার ?

হাজেরা তালুকদার বললেন, "রেবা, তুমি লিস্ট দেখো ত। ছেলেটা কার ? সাজিয়েছে বটে। একদম অবিকল ভিখিরী। আমার মতে ওকেই ফার্স্ট প্রাইজ দেওয়া উচিত। দেখা যাক, আমাদের জজ, বিচারকেরা কি রায় দেন।"

মিসেস মজুমদার ঘাড় বাঁকিয়ে আড়চোখে জবাব দিলেন, "আমারও তা-ই মনে হয় তবে—।"

রেবা সরকার তাঁর কথা লুফে নিলেন, "তবে, জজ যাঁরা প্রাইজের হর্তাকর্তা, তাঁরা কি করেন দেখা যাক। এ ছেলেটা কার ?"

"রেবা, লিষ্ট দেখো।" তাড়া দিলেন মিসেস তালুকদার।

রেবা সরকার নিজের ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে দেখতে দেখতে বললেন, "সবাই নাম পাঠায় নি। তবে আমি ত প্রায় ছেলে-মেয়েকে চিনি। এ বোধ হয়, ফিরোজা বানুর ছেলে।"

"আমারও তা-ই মনে হয়।" ভিড়ের মধ্যে কে একজন সায় দিলে।

লিলি খানের কথাটা বিশ্বাস হয় না। তাই বললেন, "অতটুকু ছেলে, একলা পাঠিয়েছেন ?"

মিসেস মজুমদারের মন্তব্যে সব সন্দেহ দূর হোয়ে গেল। তিনি বললেন, "ফিরোজা বানুর এক গাদা ছেলে-মেয়ে। কে কার খোঁজ রাখে। আমার কোন সন্দেহ নেই। এ ফিরোজা বেগমের ছেলে।"

আপাতত সবাই তা মেনে নিলেন।

ওদিকে ইজাদ বেশ জমে গেছে। এতক্ষণ মজার নাচ দেখা গেল। তারপরই এক কিশোরী মেয়ে ডাক দিলে, "আয়া, আয়া, বাব্‌লুকে নিয়ে এসো ...।"

ইজাদ তখন তাকিয়ে দেখে পার্কের দক্ষিণ কোণে আরো কতগুলো মেয়ে বসে আছে। সবাই প্রায় মাঝ-বয়সী। দু'একজন বুড়ি। এদের বেশীর ভাগ মেয়ে সাদা থানকাপড় পরে রয়েছে। ওদের সামনে তিন-চারটে প্যারাম্বুলেটর বা শিশুদের নিয়ে বেড়ানোর গাড়ী । একটা গাড়ীতে এখনও একটি বাচ্চা চুষ্‌নী চুষ্‌ছে হাত-পা নেড়ে। অন্যান্য গাড়ী খালি। কয়েকটি তিন সাড়ে তিন, কি তার চেয়ে কম-বয়সী শিশু ধীরে ধীরে এদিক ওদিক হাঁটছে, আছাড় খাচ্ছে।

এই দল থেকে একটি বুড়ি আয়া বছর তিন বয়সের একটি ছেলেকে কোলে করে নিয়ে এলো।

কিশোরী তখন বড় আদরের সঙ্গে বলে, "বাবলু-মনি, একটা ছড়া বলো ত।"

বাব্‌লুর পরণে রঙীন নীকার। পায়ে লাল রঙের জুতো। বেশ সটান দাঁড়ায় সে। তারপর আধ ফোটা বোলে আউড়ে চলে:

বাবুলাম থাপুলে
কোথায় দাস পা তুলে
আয় বাবা লেখে দা'
দুতো হাপ দিয়ে দা' ....

তখন জমায়েৎ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কী হাসির হররা বয়। তারি মধ্যে বাব্‌লুর আবৃত্তি শেষ। সে আবার আয়ার কাছে ফিরে যায়।

এই সময় তাদের আর এক চোট খাওয়া হোলো। ইজাদ খুব খুশী। বিলাতী পানী, যা গলার মধ্যে গেলে চিন্‌চিন্ করে, তাও ইজাদ ঢকঢক করে গিলে ফেললে এক গেলাস।

গরম কাল। বেলা পাঁচটা। পার্কময় গাছের লম্বা ছায়া পড়েছে। প্রায় মুছে যেতে শুরু করেছে রোদ্দুরের নিশানা।

এমন সময় কয়েকজন বয়সী মেয়ে এসে হাজির হোলেন। তখন বড়দের টেবিলে বেশ হুল্লোড় পড়ে যায়। কয়েকজন ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "জজ সাহেবেরা এসে গেছেন।"

পাঁচ জন প্রৌঢ়া মহিলা এখানে হাজির হোলেন। কি খাতির করে সবাই তাঁদের। বোঝা গেল, এঁরাই ফ্যান্সি ড্রেস প্রতিযোগিতার বিচারক।

এক জজ জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলে-মেয়েরা সেজেছে কেমন?"

সে ত সবই দেখবেন। তার আগে, চলেন আপনারা চা খেয়ে নেন।"

"চলো। তা-ই হোক।"

জজদের চা খেতে এক টেবিলে নিয়ে যাওয়া হোলো। ইন্তেজাম খুব জোর।

আরো হৈ চৈ পড়ে যায়। দু'জন কর্মকর্ত্রী একটা টেবিল সরিয়ে নিয়ে এলেন। তার উপর কত রকমের খেল্‌না সাজানো।

ইজাদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর অবাক হয়। তার নিকটেই ছিল আরবী পোশাক পরা মেয়েটা। সে সংগী আর এক ছেলেকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, "ওখানে সব প্রাইজ রাখা।

কত্তো খেল্‌না দ্যাখো। আবার টাকাও দেবে।"

"আমি যদি প্রাইজ না পাই, তাহলে গুলি ছুঁড়ব"—বললে শিকারীর পোশাক পরা ছেলেটা। সে তার খেল্‌না বন্দুক নিয়ে গুলি-ছোঁড়ার ভংগী করলে।

যে মেয়েটি আবৃত্তির তদারক করছিল, সেই আবার ছোটদের জোর গলায় তাড়া দিলে, "খোকা-খুকীরা, তোমরা সবাই ওই ফাঁকা জায়গায় লাইন করে বসে পড়ো এবার।"

হুকুম তামিল হোতে দেরী হয় না।

ছোটদের নাচ্‌-কুদে পার্ক তোলপাড়। সবাই ঘাসের উপর বসে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তাদের কৌতূহল তখন উপচে পড়ছে।

রেবা সরকার প্রতিযোগী ছেলে-মেয়েদের নাম লিখতে লাগলেন। ইজাদ এবারও নাম বলে। কিন্তু বাবার নাম বলতে পারে না।

হাজেরা মল্লিক তার পাশেই ছিলেন, বললেন, "আসুক না ওর মা। ছোট ছেলে নাম ছাড়া আর কি বলবে ?"

বেলা পড়ে আসছে। তাই আর দেরী করা চলে না। একজন জজ বা বিচারক বললেন, "মিস সরকার, আর দেরী করতে পারব না। সন্ধ্যায় আমার অন্য কাজ আছে।"

"আর বেশী দেরী নেই। প্রতিযোগীদের সব বসিয়ে দিয়েছি। একবার দেখে নিলেই হবে।"

কিন্তু কয়েকজন বলাবলি করতে লাগলেন, "মিসেস বানু মজুমদার এখনও এলেন না।" তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতেই হয়। তিনি দু শ' টাকার কম কখনও চাঁদা দেন না। সব কাজেই বানু মজুমদারের সাহায্য লাগে। তাই সবুর করতে হচ্ছে।

কিন্তু ওদিকে জজেরা তাড়া দিতে লাগলেন। তাঁরা আর বিলম্ব করতে নারাজ।

মিসেস তালুকদার চটে উঠলেন, "একজনের জন্যে—না এ বড় অন্যায়। আমি ত জানি ওঁর আঠার মাসে বছর।"

"সত্যি দিস্‌ ইজ ব্যাড," সায় দিলেন মিসেস মল্লিক।

"অথচ বুড়ি-ছোঁয়ার মত ছেলে ঠিক পাঠিয়ে বসে আছেন।" ফুট কাট্‌লেন অন্য একজন।

কেউ আর দেরী করতে রাজী নয়। ওদিকে বেলা প্রায় শেষ।

এমন সময় হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে যেন পার্কে দেখা দিলেন মিসেস ফিরোজা বানু মজুমদার। চল্লিশের কিছু বেশী বয়স। চলনে বলনে বেশ ভারিক্কি ভাব। ধনী বেগম সাহেবাদের আক্‌সার যা হয়ে থাকে।

তিনি কাছাকাছি আসা মাত্র কয়েকজন তাঁর সম্মানে এগিয়ে গেল।

"এত দেরী কেন, আপা ?" সকলের মুখে এই জিজ্ঞাসা। সকলের গলায় কিন্তু ক্ষমা-চাওয়া সুর।

মিসেস মজুমদারকে কিন্তু আর কেউ কথা বলতে দেয় না। সকলেই নিজের কথা আগে বলে একটা বাহ্‌বা নিতে ব্যস্ত এবং উদ্‌গ্রীব।

রেবা সরকার বললেন, "আপা, আপনার ছেলে ফার্স্ট হবে ব'লে কি আপনার একটু আগে আসতে নেই ? আপনি ছাড়া কোন ফাংশান জমে নাকি ?"

"হুবহু ছেলেটাকে সাজিয়েছেন বটে।" কে একজন বলে উঠল।

"তবে আপনার ছেলে—এখন তা আর কেউ বলবে না।" মিসেস মল্লিক ফোড়ন দিলেন।

ইজাদকে একজন ইতিমধ্যে এখানে হাজির করে রেখেছে। এক অভিভাবিকা, মিসেস ।। তিনি ইজাদের কাঁধে হাত দিয়ে চুলে আল্‌তো হাত বুলোতে বুলোতে বলেন,

"মজুমদার আপা, আপনার মধ্যে এমন শিল্পী লুকিয়ে ছিল তা কি আমরা জানতাম ? আপনি এত চাপা মানুষ ? ও আল্লাহ্। কি যে মেক-আপ দিতে পারেন।"

এই ধারায় কথার খই ফুটতে থাকে চারপাশ থেকে। মিসেস বানু মজুমদার নিজে আর কথা বলার সুযোগ পান না। সকলের দৃষ্টি যায় মায়ের উপর, নয় ছেলের উপর। যারা কথা বলছে না, তারা ইজাদের চুলে আলগোছে হাত বুলায়, কেউ পিঠ থাপড়ায়।

চারদিক থেকে খালি বানু মজুমদারের গুণের কীর্তন। হাঁপিয়ে ওঠেন মিসেস মজুমদার। শেষে এই মসিবত থেকে রেহাই পেতে ধমকের সুরে নিজের খন্‌খনে গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, "দোহাই, আপনারা থামুন ত। আমাকে কথা বলতে দিন।"

দাওয়াই বিফলে গেল না।

হল্লা একদম ঠাণ্ডা।

মিসেস বানু মজুমদার এবার জিজ্ঞেস করেন, "এক এক করে বলুন, কি ব্যাপার। আমি কিছু বুঝতে পারছি নে আপনাদের এই অতি তড়পানির চোটে।"

রুবি চৌধুরী জবাব দিলেন, "ছেলে ফার্স্ট প্রাইজ পাবে বলে কি এত দেরি করে এলেন, আপা ?"

"আমার ছেলে ?" বেশ অবাক হোয়েই পাল্‌টা দেন মিসেস মজুমদার।

"কেন আর বিনয় দেখান, আপা ?" বললেন মিসেস মল্লিক।

"ছেলেপুলে নিয়ে আমাকে কোন ফাংশানে যেতে দেখেছো, রেবা ?" মিসেস বানু মজুমদারের খন্‌খনে গলা এবার ফেটে পড়তে চায়।

"কিন্তু এটা ছোটদের ফাংশান। আর দেরি করবেন না। আপনার জন্যেই আমরা বসে।"

কথা লুফে নিলে আর একজন, "আপনি যে এমন আঁকতে পারেন তা কে জানত। আপনার শিল্পী মনের—।"

মিসেস মজুমদার এমন বিরক্ত হোয়ে উঠেছিলেন যে, আর কোন কথাই তাঁর কানে বিষ। তাই মাঝ পথেই চেঁচিয়ে ঘা দিলেন, "কোন্ ছেলে দেখি ?"

সেখানেও প্রতিযোগিতা। অতি আদরের ছাপ দিতে সবাই তৎপর। তারা ইজাদকে এগিয়ে দিলে মায়ের সম্মুখে।

"এ আমার ছেলে নয়। কার ছেলে ?" বানু মজুমদার যেন ছোবল দিয়ে উঠলেন।

"আপনার ছেলে নয় ?"

মিসেস মজুমদারের জবাবে কেউ সন্তুষ্ট নয়। কথাটা কেউ বিশ্বাস করতে পারেন না।

তখন মিসেস বানু মজুমদার নিজের কর্কশ গলায় শেষ তোপ দাগলেন, "তোমরা পেয়েছ কী ? ফ্যান্সি ড্রেস বলে কি আমি ছেলেকে ভিখিরী সাজিয়ে পাঠাব ? আমার টাকা পয়সা নেই ?"

যাঁর শহরে পাঁচখানা বাড়ী এবং চারখানা মটোর আছে, তাঁকে টাকা পয়সাহীন সত্যিই বলা চলে না।

"আপনার ছেলে নয় ? আমরা ভাবলাম—" এই কথা বলেই লিস্টি হাতে মিসেস করিম তালুকদার ইজাদকে জিজ্ঞেস করেন, "এই ছেলে, তোর বাপের নাম কী ?"

ইজাদ ঘাবড়ে যায়। তবে জবাব দিতে বেশী দেরী হয় না তার।

"তোর বাপের নাম কী ?

"আমার বাপ নেই।"

"কি হোয়েছে ?"

"মরে গেছে।"

"তোর মা ?"

"মরে গেছে ?"

"তবে তুই কার ছেলে ?"

"আজ সকালে একজনকে মা ডেকেছিলাম, সে নিয়ে যাবে বলেছিল। এখনও আসে নি।"

ইজাদের জবাবে কয়েকজন এক চোট হেসে নিলে, প্রাণ যদ্দূর চায়। তারপর একজন জিজ্ঞেস করে। "তোর নতুন মা কে ?"

"সে একজন ভিখিরিণী।"—বল্‌লে ইজাদ।

কিন্তু করিমা তালুকদারের মেজাজ চড়ে গেছে এতক্ষণে। তিনি আবার প্রশ্ন চালান।

"তুই থাকিস কোথা ?"

"যেখানে সেখানে।"

"তুই তবে কে ?"

"আমি ভিখিরী ছেলে।"

ভিখিরী ! ? ? ! ? ? ! ! ? !

যারা ইজাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল তারা এক লাফে দুই গজ পেছনে ছিট্‌কে পড়ল।

কর্কশ আওয়াজে করিমা তালুকদার তবু জিজ্ঞেস করেন সন্দেহ-ভঞ্জনে, "সত্যি ভিখিরী ছেলে ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে রে শূয়োরের বাচ্চা, তুই যে এখানে ঢুকেছিস—।" কথা শেষ হয় না। তিনি ইজাদের গালে দুই থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন।

হৈ চৈ শুরু হোয়ে যায় তখনই। চেঁচিয়ে উঠলেন রোজেনা মল্লিক, "ছিঃ, একদম স্ট্রিট বেগার (ভিখারী)। তোমরা ভাবলে পেন্ট করেছে রঙ দিয়ে। হারামজাদার গায়ে কত রাজ্যের আবর্জনা।"

রেবা সরকার ওদিকে দেদার চড় চালাচ্ছেন। মিসেস খন্দকার আর হাতে নেই। তিনি হাই-হীল তুলে জুতো দিয়ে ইজাদের পিঠে মারলেন এক লাথি। মা গো—শব্দে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ইজাদ।

মিসেস মল্লিক তখন হিন্দী চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন, "আয়া, আয়া,—সাবুন লাও, পানী লাও—আয়া আয়া ...।"

ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হুলুস্থূল দেখে অনেকে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

তেজী ছেলে বলতে হয় ইজাদকে। ধরাশায়ী অবস্থায় আরো কয়েকটা লাথি খাওয়ার পরও সে চট করে উঠে ব্যূহ ভেদ করে প্রাণপণ দৌড়াতে লাগল। কয়েকটা জুতোর গোড়ালি তখনও শূন্যে, নীচে পড়বে আর কী। কিন্তু শিকার নেই নীচে।

ঊর্ধ্বশ্বাস ইজাদ দৌড়াতে লাগল পার্ক থেকে পালিয়ে যেতে।

তার মনে হয়, শত শত রাক্ষসী যেন হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে আসছে।

ইজাদের কানে ভেসে আসে তখনও হিন্দী চীৎকার-রতা মিসেস খন্দকারের গলা : আয়া, সাবুন লাও, পানী লাও, সাবুন—সাবুন।

তাপ্পিদার সাপ শিকার

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

তাপ্পিদা চেয়ারের ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে বলল, "দূর, বাঘ-ভালুক শিকার আবার শিকার নাকি? ও তো বাচ্চারাও পারে। ভালুকের বিরাট চেহারা। গুলি করলে ফসকাবার উপায় আছে? ঠিক গায়ে গিয়ে লাগবে। আর বাঘ শিকার? গাছের তলায় ছাগল বেঁধে বাবুরা গাছের মগডালে গিয়ে উঠলেন। বেচারি বাঘ যখন ছাগল চিবোতে ব্যস্ত, তখন পাতার আড়াল থেকে দড়াম করে গুলি। কী বীরত্ব!"

"সেরা শিকার হচ্ছে সাপ শিকার। সাপের অগম্য জায়গা নেই। জলে, স্থলে, হাফ-অন্তরীক্ষে এদের অবাধ বিচরণ। হাফ-অন্তরীক্ষ মানে গাছের উঁচু ডাল পর্যন্ত। বহু সরু জাতের সাপ আছে, চোখ একটু খারাপ থাকলে তাদের দেখাই যায় না। গাছের ডালের সঙ্গে এমন বেমালুম মিশে থাকে যে তাদের গায়ের ওপরই বন্দুক রেখে তুমি বসে আছ। আর বিরাট আকারের পাইথন সাপও আছে। তাদের আবার গুলিতে ঘায়েল করা যায় না। তুমি গুলি ছুঁড়লে, আর দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়ের মতন ফণা দিয়ে হেড করে সেই গুলি তোমার দিকেই ফেরত পাঠাল।"

"পাইথন মারার নিয়ম হচ্ছে," তাপ্পিদা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "না থাক এসব মন্ত্রগুপ্তি সকলকে জানানো ঠিক হবে না।"

পাড়ার ছেলেরা নাছোড়বান্দা। তাপ্পিদাকে ঘিরে ধরল, "তাপ্পিদা তোমার সাপ শিকারের দু-একটা কাহিনী বলো।"

"বলব? তাহলে গোকুলকে বল, এক কাপ চা আর দুটো টোস্ট দিতে।"

চা আর টোস্ট এল। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে তাপ্পিদা বলতে শুরু করল।

"বছর পাঁচেক আগের কথা। রাজস্থানে গিয়েছি সাপের সন্ধানে। মরুভূমিতে একরকম সাপ আছে, তার রং একেবারে বালির মতো। কিছু তফাৎ টের পাওয়া যায় না। কোন রকমে

নাগালের মধ্যে গেলে আর দেখতে হবে না, এক ছোবলেই মাথায় বিষ উঠে যাবে। ওঝা, ডাক্তার কেউ কিছু করতে পারবে না।"

"তাই খুব সাবধানে বালির দিকে চোখ রেখে চলেছি। হাতে বন্দুক। মাথার ওপর কড়া রোদ, পায়ের নীচে গরম বালি। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। তেষ্টায় তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। আর চলতে পারছি না। একটু জল না পেলে প্রাণে বাঁচব না। হঠাৎ দেখতে পেলাম খেজুর গাছে ঢাকা একটা ডোবা, চারপাশে কিছু সবুজ ঘাসও রয়েছে। তার মানে, 'ওয়েসিস', বাংলায় যাকে বলে মরূদ্যান।

"ডোবা দেখে আর জ্ঞান ছিল না, ছুটে সেখানে গেলাম। বন্দুকটা ঘাসের ওপর রেখে দেখলাম, বিরাট একটা তালগাছের কিছুটা ডাঙা থেকে জলের মধ্যে ডোবানো।"

"বোধহয় গ্রামবাসীরা জল নেবার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে। ডোবার জল একটু সবুজ, কিন্তু আমার তখন এত তেষ্টা পেয়েছিল যে কাদাগোলা জল খেতেও আমি রাজী ছিলাম। কোমরের ছোরাটা তালগাছের মধ্যে গেঁথে সাবধানে নেমে গেলাম। রুমাল ভিজিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জল খেলাম। আঃ প্রাণটা যেন বাঁচল।"

"আবার পা টিপে টিপে এসে ছোরাটা উঠিয়ে নিয়েই চমকে উঠলাম। ছোরার মুখটা রক্তে লাল আর একটু একটু করে তালগাছটা ডোবার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ওটা তালগাছ নয় পাহাড়ী অজগর। ছুটে ওপরে এসে প্রাণপণ শক্তিতে ছোরার ঘা বসালাম বোধহয় বার সাতেক। ডোবার জলে যেন সমুদ্রের ঢেউ উঠল। জলের ছিটে খেজুর গাছের মাথায়। চারপাশের মাটি কেঁপে উঠল। অজগর ডোবার জলে ডুবে গেল।"

শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল।

"বলো কি তাপ্পিদা, এই সাইজের অজগর আছে?"

তাপ্পিদা মুচকি হেসে বলল, "এ পৃথিবীর কতটুকুই আমরা জানি।"

সবাই আবার চেঁচাল, "আরো একটা, এরকম বিপদের কাহিনী বল তাপ্পিদা।"

তাপ্পিদা অমায়িক হাসল, "আমার জীবনটাই তো বিপদের সঙ্গে কোলাকুলি ভাই। শোনো তবে একটা ঘটনা। তার আগে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে। দরকার এক কাপ চায়ের।"

চা এল।

কাপে চুমুক দিতে দিতে তাপ্পিদা শুরু করল, "সেটা বোধহয় ঘাটশীলা কিংবা ঝাড়গ্রাম হবে ঝাড়গ্রামই বোধহয়। বন্দুক ঘাড়ে সাপের খোঁজে চলেছি। তিনদিন ধরে জঙ্গলে ঘুরছি, সাপের খোলসের দেখা নেই।"

"আমি যে এখানে আসব সেটা কাকপক্ষীরও জানা ছিল না, সাপেরা টের পেল কি করে। সব সরে পড়েছে। ঘন কাঁটা বন। পাতার ফাঁকে ফাঁকে শজারুর মতন কাঁটা। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে কাঁটা ঝোপের ওপর গিয়ে পড়লাম। মুখটা বেঁচে গেল, কিন্তু একটা পা কাঁটার ঘায়ে রক্তাক্ত। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল।

"একবার ভাবলাম, রুমালটা দিয়ে পা-টা বাঁধি, কিন্তু তাহলে রুমালটা যাবে। বনের মধ্যে খুঁজতে লাগলাম যদি চওড়া কোন পাতা কিংবা গাছের ছাল পাই। বরাত ভাল, হলদে রঙের একটা কাপড়ের পাড় পেয়ে গেলাম। বোধহয় বনভোজনের জন্য কেউ হাঁড়িকুড়ি বেঁধে এনেছিল। যাবার সময় ফেলে গেছে।"

"রক্ত পড়া বন্ধ হল। একটা গাছতলায় বসে কৌটা খুলে লুচি আর তরকারি খাচ্ছি। হঠাৎ

পা-টা শিরশির করে উঠল।"

"ভাবলাম আবার বুঝি রক্ত পড়ছে। চোখ ফিরিয়ে দেখেই চক্ষুস্থির। পাড়ের একটা কোণ থেকে চেরা জিভ দেখা যাচ্ছে। বাঁধনটা মোক্ষম হয়েছে বলে ছোবল দেবার সুবিধা পাচ্ছে না। একটু একটু করে পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে আসতে বুঝতে পারলাম। এবার বিপদে পড়ব।"

"চিতি সাপ। নিশ্বাসে মৃত্যু। কিছু একটা আমায় করতেই হবে। আস্তে আস্তে কোমর থেকে ছোরাটা বের করে চট করে সাপের মাথাটা দুখণ্ড করে ফেললাম। মাথা কাটা যাবার পরও দেহটা নড়তে লাগল। পায়ে জড়ান বাঁধনটা খুলে ফেলে তবে নিষ্কৃতি পেলাম।"

তাম্নিদা চেয়ারে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল। সেদিনের বীভৎস অবস্থাটা যেন নতুন করে অনুভব করছে।

ছোটন বলল, "আচ্ছা, তাম্নিদা, এটাই বোধহয় তোমার সবচেয়ে মারাত্মক অভিজ্ঞতা সাপ সম্বন্ধে, তাই না?"
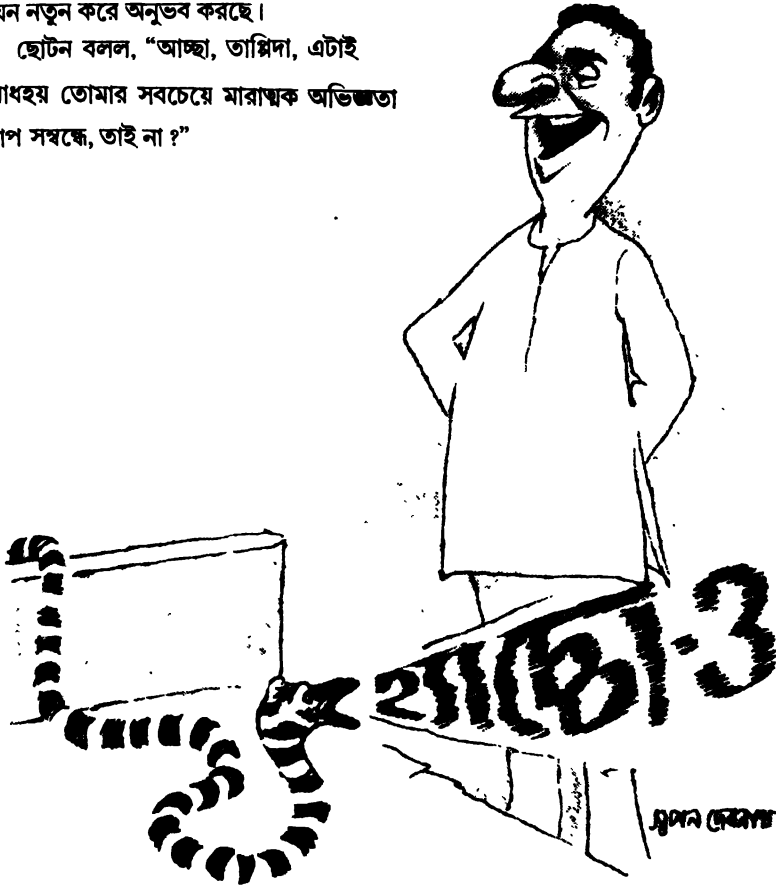
তাম্নিদা মাথা নাড়ল, "মারাত্মক অভিজ্ঞতার কথা যদি তুললে, তাহলে বলব সেরাইকেল্লার ডাকবাংলোয় যা হয়েছিল তার তুলনায় এসব তো ছেলেখেলা।"

"কি রকম? কি রকম" সবাই ঘিরে ধরল।

"সে আর একদিন বলব।" তাম্নিদা ওঠবার চেষ্টা করল।

"আরে না, না, আর একদিন কেন। আজই হোক। বরং আর এক কাপ চা আর টোস্ট দিতে বলি।"

চায়ের কাপ সামনে নিয়ে তাম্রিদা কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, "ঘটনাটা মনে হলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। রাউরকেল্লা হয়ে সেরাইকেল্লা গেছি। ওই সাপের সন্ধানে। চারিদিকে ঘন বন। সূর্যের আলো পর্যন্ত আসে না। সন্ধ্যা ছটা বাজলেই নানারকম পশুপাখির ডাক শোনা যায়।"

দারোয়ানটা বলেছিল, "সাব, রাতে আলো নেভাবেন না, আর মশারি ফেলে শোবেন।"

"আলোটা জ্বালিয়েই শুই, কিন্তু মশারি ফেলে শুতে পারি না। দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই মশারিটা তোলাই থাকে।

"মাঝরাতে হঠাৎ দেহে একটা শীতল স্পর্শ লাগতেই চমকে জেগে উঠেছিলাম। চোখ খুলেই দেখি পাশে একেবারে স্বয়ং যম। চন্দ্রবোড়া। বিরাট ফণা তুলে আমার বিছানার ওপর। জানালা দরজা বন্ধ। নিশ্চয় নর্দমার গর্ত দিয়ে ঢুকেছে।"

"আমার বন্দুকটা দেয়ালে ঝোলানো। ছোরা টেবিলের ড্রয়ারে। নখ ছাড়া সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। উপায় ? উঠে ছোরা কিংবা বন্দুক আনতে গেলেই খতম হয়ে যাব। চুপচাপ মড়ার মতন পড়ে থাকতে হবে। সেভাবেই বা কতক্ষণ বাঁচব জানি না। চন্দ্রবোড়ার মার্বেলের মতন চোখ দুটি মনে হল আমার ওপর। ফণাটা এদিক থেকে ওদিকে দুলছে। ছোবল মারার আগের অবস্থা।"

"মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে নস্যির কৌটোটা বের করে নিলাম। দারুণ কড়া নস্যি।"

"আচমকা কৌটোটা খুলে সব নস্যি উপুড় করে দিলাম চন্দ্রবোড়ার মুখের ওপর। অনেকে বলে, সাপের নাক নেই। একেবারে বাজে কথা। নস্যি উপুড় করার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রবোড়ার হাঁচি শুরু হল। গুনে গুনে একত্রিশটা হাঁচি। প্রত্যেকটি হাঁচির সঙ্গে চন্দ্রবোড়ার মুখ থেকে তরল বিষ বের হতে লাগল।"

"প্রথমে গাঢ় নীল রঙেব। তারপর ক্রমে ফিকে হতে লাগল। শেষদিকে জলের মতন রঙ। তার মানে বিষ শেষ। এবার শ্লেষ্মা উঠছে।"

"আর দেরি করিনি। চন্দ্রবোড়ার মাথাটা মুঠোর মধ্যে ধরে আছাড়ের পর আছাড়। বার কয়েক আছাড় মারতেই দড়ির মতন সোজা হয়ে গেল।"

হঠাৎ তাম্রিদা হাতঘড়ির দিকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "সর্বনাশ, বারোটা বেজে গেছে। আজ খাওয়া মিললে হয়।"

তাম্রিদা পাশে রাখা সাইকেলে উঠে পড়ল।
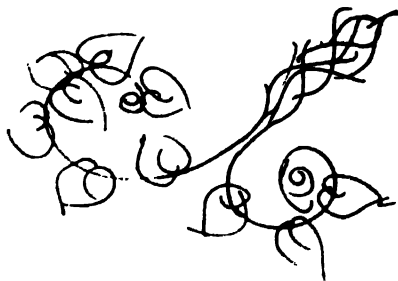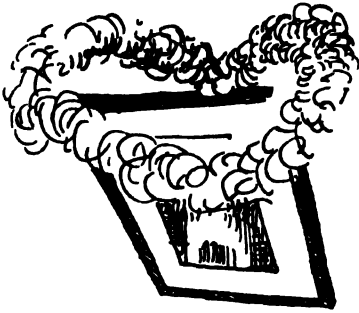
চেরাপুঞ্জী পলিটিক্স

সাজেদুল করিম

ওপরের শিরোনামা-টা দেখে হয়তো মনে মনে ভাবছ: এ আবার কী আপদ্। —ঢাকার পলিটিক্সে বাঁচি নে, তায় আবার চেরাপুঞ্জী! কিন্তু তা' নয়। এ হচ্ছে আমাদের ব্যেবীর চরিত্র-বিচিত্রা, ফুফু আম্মা আদর করে যার নাম রেখেছেন: 'চেরাপুঞ্জী'। ব্যেবীর বয়েস আর কত? বড়ো-জোর পাঁচ কি ছয়, কিন্তু এরি মধ্যে ও হয়ে উঠেছে রীতিমতো এক বিভীষিকা।

ধরো, ব্যেবীর স্বাস্থ্যের উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন। ডাক্তার প্রেসক্রিপ্শান করেছেন: 'হরলিক্স'। কিন্তু খেতে বল্লেই যে ব্যেবী খাবে [তা' হরলিক্স যত স্বাদু বস্তুই হোক না কেন], সে আশা বাতুলতা! অষুধ পথ্য খাওয়া না খাওয়া নির্ভর করে ব্যেবীর মেজাজ-মিটারের ওপর। এ মেজাজ-মিটারখানি অনেকটা ব্যারোমিটারের মতোন। অর্থাৎ তোমাকে দেখতে হবে, এখন মেজাজ-মিটারে তাপ কত ডিগ্রী বিরাজমান; এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং এ জন্যেই ফুফু-আম্মা এ মিটারখানির নামকরণ করেছেন: 'চেরাপুঞ্জী'। কারণ, ঝর ঝর করে ও যখন ঝরে পড়বে চেরাপুঞ্জীর বারিধারায়, সাধ্য কী তুমি সামলাও—

সুতরাং কাঁদিয়ে নয়,—কায়দায়, বুঝলে কিনা। ধরো, ব্যেবীকে দিয়ে কিছু একটা কডলিভার অয়েল কিংবা লিভার এক্সট্রাক্টস্ গলাধঃকরানো তোমার মনে মনে ইচ্ছে। অম্নি চেপে বলবে: "ছি, ব্যেবী, মল্টেড্ কড্ কি মানুষে খায়? ছেলে-মানুষেরা না এ সব গিলে!"— আর কী, তোমার উদ্দেশ্য হাসিল। পৃথিবীতে এখন দ্বিতীয় কোন শক্তি নেই,—যে ব্যেবীর মল্টেড্ কড্ অভিলাস রুখতে পারে! এম্নি করে বুদ্ধি খাটিয়ে পলিটিসিয়ান ব্যেবীর সাথে পাল্টা পলিটিক্স খেলে তোমাকে কাজ আদায় করে নিতে হবে। সোজাসুজিতে হয় না।—উল্টোমি-ই ব্যেবীর ধাত। ছেলেবেলা থেকেই ও উল্টো-স্বভাবের।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে এলেন মামী-মা, খালা-আম্মা, আর এক রাজ্যের ছেলে-মেয়ের দল। উঃ, কী আনন্দেই না কাটলো ছুটিটা। সারাদিন ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, পুকুরের পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি। গুরুজনদের চোখ রাঙানো শাসন নেই। ফের মজা কি

জানো?—লেখাপড়ার নামগন্ধও নেই। সন্ধ্যেবেলা যা একটুখানি বিদ্যেঅভ্যাস, সেও ব্যেবীর কল্যাণে হবার যোটি নেই। "ফুফু-আম্মা। ফুফু-আম্মা—ব্যেবীকে সরান।" "কেন রে, কী হয়েছে?" "হবে আবার কী?—বই-পত্তর সব তচনচ করে দিচ্ছে।" ফুফু আম্মার বড্ড আদুরে নাতি ব্যেবী। ব্যেবী-কে কেউ ঘাঁটাক, এ তিনি চান না। এদিকে বিছানা ছেড়ে যে উঠে এসে শাসন করবেন সে সামর্থ্যও নেই। বাতের ব্যথায় বেচারী পঙ্গু। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে বলতে হয়: "তা'হলে এক কাজ কর্, বাপু। গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার কিসের লেখাপড়া? তার চেয়ে তোরা বরং 'ওয়ার্ড-বিল্ডিং' খেল্।"

"বা, কী মজা! কী মজা!" ফুফু-আম্মার আদেশ!—আমাদের আর পায় কে? বইপত্তর শিকেয় তুলে আমরা লেগে গেলুম ওয়ার্ড-বিল্ডিং খেলায়। কিন্তু এখানেও এক বিপত্তি,—ব্যেবীও খেলতে চায়। কিন্তু নেবো কি করে খেলায়, বলো? হতভাগাটার যে এখনো ভালো করে' শব্দ পরিচয়-ই হয় নি। অথচ, খেলার সখ ষোল আনা। অগত্যা কি আর করি। আমি রায় দিলাম,—ব্যেবীও থাকবে এ খেলায়। তবে কিনা ওর কাজ হবে 'খেলা' নয়,—খেলায় সাহায্য করা।

সুতরাং ওরা অক্ষরের চাকতিগুলো সাজিয়ে এক একটা ইংরাজী শব্দ তৈরী করে' একখানা পিজবোর্ড-এর ওপর রাখে। আর ব্যেবীর কাজ হলো, পিজবোর্ড সমেত সাজানো অক্ষরগুলো আমার টেবিলে নিয়ে আসা। তারপর, দেখেশুনে আমি রায় দিতাম: কোন্ শব্দটা গ্রাহ্য, কোন্টা অগ্রাহ্য, কোন্টার কী মানে ইত্যাদি যেমন নাকি তোমরা দেখে থাকবে, [যে-কোনো ওয়ার্ড-বিল্ডিং খেলায়] ফুফু-আম্মা মনে মনে হাসেন: না হোক লেখাপড়া,—অন্ততঃ অক্ষরগুলো তো নাড়াচাড়া হচ্ছে। আর এতে করে যদি ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু শব্দ-পরিচয়ও হয়, সে ও বা মন্দ কি? সুতরাং বেশ চল্ল কদ্দিন ফূর্তিসে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ভেস্তে গেলো।

কেন জানো? বুলু নাকি কানে কানে বলে দিয়েছিল, "হ্যাঁরে, ব্যেবী, তুই যে এত সব খেলছিস্, জানিস? এ সব্ কি হচ্ছে?" "—কী? কী রে, বুলু?" "আরে এ সব খেলা নয়,—'লেখাপড়া'!! বুঝেছিস্? তোকে বোকা পেয়ে ওরা পড়িয়ে নিচ্ছে।" আর যায় কোথা? —তুবড়ীতে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ল। অম্নি ব্যেবী বেঁকে বসলো।—কিছুতেই সে খেলবে না, এবং কাউকে খেলতে দেবেও না। কেননা, ওয়ার্ড বিল্ডিং যে লেখাপড়া। সুতরাং যেই খেলতে বসুক অক্ষরের চাকতিগুলোকে সে এলোমেলো করে ফেলে দেয়। এবং কিছুতেই তাকে সাম্লানো যায় না। আর মারতে গেলেই ভ্যা—! আর অম্নি ব্যেবীর হয়ে ফুফু আম্মার শাসন ছুটে আসে। আবার বজ্জাতটা এমনি পলিটিশিয়ান যে, ক্ষুদে হলেও বিলক্ষণ টের পেয়েছে,—যদ্দিন ফুফু আম্মা কাছে আছেন, কেউ তার গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারবে না। সুতরাং দেখলে তো,—একমাত্র ব্যেবীরই কারণে অমন মজার ছুটি-টা আমাদের একদম মাঠে মারা গেলো।—খেলাটেলা ফেলে আমরা পড়ে রইলাম মন মরার মতোন।

* * * * *

এমন সময় এক কাণ্ড।

সে দিনটা ছিল ঝড়ের রাত্তির।

বাইরে দম্কা হাওয়ার ঝট্কা। আর ভেতরে গুটি সুটি মেরে আমরা বসে আছি গুটি কয়েক নিকর্মার দল।—হাতে কোনো কাজ নেই। হঠাৎ দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ।

কে—?

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলতেই হুড়মুড় করে পিয়ারী, আরেফ, কেটি আরো অনেকে এক সঙ্গে এসে ঢুকলো। আরে, আরে! সবার অগ্রে দলপতি হিসেবে জেঠীও যে এসেছেন! এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার : আমাদের জেঠী আম্মা স্থানীয় মেয়ে ইস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বটেন; কিন্তু অমন আমুদে মানুষ সচরাচর বড়ো একটা হয় না। মনে হলো, জেঠী যেন দলবল বেঁধে কোথাও রওনা হচ্ছিলেন। পথে বাধা পেয়ে আমাদের এখানে এসে

উঠেছেন। তাড়াতাড়ি দিদিকে ডেকে বল্লাম, "দিদি। দিদি। চা দিয়ে যেও। সেই সাথে পাউডারের কৌটোটা আর তেলের শিশিটিও এনো। জেঠী যে ভিজে জবজবে হয়ে এসেছেন।" জেঠী কিন্তু সব ধারণা পাল্টে দিয়ে উল্টো বল্লেন, "না রে, সাজেদ, ব্যেবীর জন্মদিনে তোদেরি এখানে আমাদের আগমন।" জেঠীর কথার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খেয়াল হয় : আরে সত্যিই তো! কালকেই তো ব্যেবীর জন্মদিন। অথচ, আমরা বেমালুম ভুলে বসে আছি। এরপর এক এক করে ঝোলা থেকে বার হতে লাগলো উপহারগুলো। আমরা উদগ্রীব হয়ে বসে গেলাম দেখতে। প্রথমেই মস্ত বড়ো একটা কেক। কেকের গায়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা: HAPPY BIRTH DAY ! দ্বিতীয় দফা বের হলো : একটা বিচিত্র ওয়ার্ড বিল্ডিং সেট্। উঃ, কী সুন্দর অক্ষরের চাকতিগুলো। ঝকঝকে চকচকে মসৃণ। আমাদের কাগজের চাকতিগুলোর চেয়ে বহু শতগুণে লোভনীয় এবং দামী। আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরে জেঠী বল্লেন, "হ্যাঁ,

এটিও তোদেরি প্রাপ্য। তবে কিনা একটা মাত্র তো সেট্। তোদের মধ্যে এখ্খুনি একটা খেলা হবে, প্রতিযোগিতায় যে জিতবে তাকেই দেয়া হবে।" বলেই তিনি তার খেলার নিয়মগুলো বাৎলে দিতে সুরু করলেন। "জানো তো, ব্যেবীর জন্মদিন সেই কালকে। তার মানে কিন্তু আর দেড় ঘণ্টা মাত্তর বাকী। কেননা, এখন রাত স্যাড়ে দশটা। আর ঘড়িতে বারোটা বাজা'র সঙ্গে সঙ্গে 'আগামী কাল' অর্থাৎ ব্যেবীর জন্মদিনের সুরু। সুতরাং এ দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সব কিছু সেরে ফেলতে হবে। এখন, আমার প্রথম শর্তটা হচ্ছে: এই যে প্লাস্টিকের অক্ষরগুলো দেখছ, এদেরকে নাড়াচাড়া করে এমন কতগুলো শব্দ বসাও, য'তে করে আজকের এ ঝড়ের রাত্তিরের যে-কোনো একটা দিক হুবহু ভাষায় ফুটে ওঠে। অবশ্য বুঝতেই তো পারছ কথাগুলোকে হতে হবে সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামের ভাষায়,—কারণ ঝোলায় তো আর ভূরি ভূরি অক্ষরের চাক্‌তি নেই।"

ওঃ, এ আর শক্ত কী ?

আমরা চটপট চাকতিগুলো সাজাতে লেগে গেলুম। জেঠী বাধা দিয়ে বল্লেন, "কিন্তু আরো একটা কথা।" আমরা বল্লুম, "কী— ?" "রচনাগুলোকে আসতে হবে আমার টেবিলে,—ব্যেবীর হাত হয়ে।"

"এ-ও বা আর এমন কী শক্ত।" আমরা মনে মনে ভাবলেম। খুব কঠিন কঠিন শব্দ চয়ন করে সাজালে, সাধ্য কি ব্যেবী মানে বুঝতে পারে। আর মানে বুঝতে না পারলে, লেখাপড়ার বিষয় নয় ভেবে, ও নিশ্চয় 'পাস' দেবে। ব্যেবীর হাবে ভাবেও তাই মনে হলো। সুতরাং চটপট আমরা কাজে লেগে গেলাম। যেমন কাঞ্চন সাজালো: "Lightning ! Thunder ! Baby's Birthday ! A Lovely Cold Day !" কানিজ সাজালো: "A Happy Sweety Dark Night ! Rains Roaring Outside !" এম্নি কত কী? কেউ কেউ আবার লিখলো: "Who calls at the door ? Auntie with a bag of stores !" খুব অল্প অল্প কথায় রসালো রচনাগুলো। জেঠীর খুব মনঃপূত হলো: হ্যাঁ, যেমনটি চেয়েছিলেম, ঠিক তেম্নিই হয়েছে। কিন্তু কৈ— ? একটা লেখাও তো ব্যেবীর হাত হয়ে আমার হাতে এসে পৌঁছল না।"

ব্যাপার কী— ?

এবার আমরা অনুসন্ধানে লেগে গেলাম। দেখি কী,—লেখাগুলো পড়ে পড়ে ব্যেবী এলোমেলো করে ফেলে দিচ্ছে, আর বল্‌ছে, "এগুলো লেখাপড়া। এগুলো দেবো না।" বোঝা গেলো কোন্‌টা অর্থপূর্ণ রচনা, কোন্‌টা অর্থপূর্ণ নয়, এ পার্থক্যটুকু ব্যেবী আজকাল বেশ বোঝে। এ ক'দিনের অক্ষর নাড়াচাড়ায় আর কিছু হোক্ না হোক্, এ অভিজ্ঞতাটুকু অন্ততঃ তার হয়েছে। সুতরাং রচনা অর্থপূর্ণ হলেই সে আর 'পাস্' দেয় না। আবার মজা কী জানো ?—ইংরেজী হরফে লেখা আসলে কিন্তু বাংলা কথা, যেমন পিক্‌লু লিখেছে: "AJI JHARERRAETE AJAB ABHIJAN! VIJE JETHIR ABAK AGAMAN!" [আজি ঝড়ের রাতে আজব অভিযান। ভিজে জেঠীর অবাক আগমন!] কী আশ্চর্য! ব্যেবী কিন্তু উচ্চারণ করে' করে' সম্পূর্ণ কথাটা উদ্ধার করে ফেল্ল। সুতরাং আর 'পাস' দেয় না।

* * * * *

এতোক্ষণে প্রব্লেমটা আমাদের কাছে খোলাসা হয়ে গেলো: ওঃ, তা' হলে জেঠী বোঝাতে চাচ্ছেন, ইংরেজী হোক, বাংলা হোক,—ইংরেজী হরফে অর্থপূর্ণ রচনা হলেই হলো। কিন্তু আসল কথাটা, লেখাটাকে এমন ধূর্ত ধরণের হতে হবে, যাতে জেঠী টের পেলেও ব্যেবীটা যেন বিন্দু বিসর্গও মানে বুঝতে না পারে। ব্যেবী-চরিত্র বিলক্ষণ জানা ছিল বলেই যে জেঠী ও শর্তটা

দিয়েছেন, এ বুঝতে আমাদের আর দেরী হয় না। কিন্তু ব্যেবীকে ফাঁকি দিয়ে ছদ্মবেশী অর্থপূর্ণ রচনা ব্যেবীর হাত হয়ে জেঠীর টেবিলে পৌঁছানো সহজ কম্মো নয়। অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও আমরা পারলাম না।

জেঠী এবার ঘড়ির দিকে তাকান।

আমরা আঁৎকে উঠি ঃ বারোটা যে বাজে প্রায়। কেননা, রাত বারোটা বাজা'র সাথে সাথেই খেলার সমাপ্তি ঘোষণা। আর সবাই মিলে ব্যেবীকে ঘিরে ওই জন্মদিনের কেকটার সদ্ব্যবহার। বলা বাহুল্য, কেকটার সুগোল চেহারা ইতিমধ্যেই আমাদের স-জিভ বিচলিত করে তুলেছিল। এমন সময়, মেজো চাচীর ছোট মেয়ে আইভি'র রচনা করা একখানা লেখা ব্যেবীর হাত হয়ে জেঠীর হাতে এসে ঠেকলো। লেখাটা নিম্নরূপ ঃ

"K— ? K LO? O, RF R KT SSO ? R K LO! AJ PRE O SSA. O DR PRE-BB/ SO SO. RA, RA ! JTO J SSN. O DD DD. A DK SO. 'T' DA JO, R CCTO NO. JT J VJ LOKC !"—ET IV.

লেখাটার অর্থ মাথামুণ্ডু কিছুই হয় না। আর সে জন্যেই পাওয়া মাত্রই ব্যেবী ওটা 'পাস্' দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িতে বারোটা বাজা'র শব্দ। আমরা হায় হায় করে উঠলাম ঃ আঃ, এমন সুন্দর সেট্‌টা বুঝি শেষমেষ হাত ছাড়া হতে চল্লো।

কিন্তু রচনাটা পড়ে হঠাৎ জেঠীর মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঃ "নাঃ। শেষটা দেখ্‌ছি, আইভি, তুমিই বাজিমাৎ করলে। এই নাও—।" বলে জেঠী এগিয়ে এসে সেট্‌টা আইভি'র হাতে তুলে দিলেন।

একটা প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেলো।—

"আইভি পাবে কেন ? মাত্র তো হিজিবিজি গুটি কয়েক অক্ষরের সমষ্টি।— তবে আমরা কী দোষ করলাম ?" এবার জেঠী উঠে দাঁড়ালেন, মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, "এক মাত্র এ মেয়েটিই পলিটিসিয়ান ব্যেবীর জন্মদিনে ব্যেবীর ওপর এক হাত নিয়েছে। তোমরা কেউ পারলে না। বড় হলে, দেখে নিও, ওটা একটা জাঁদরেল ডিটেকটিভ্ হবে। এ লেখা এ ভাবে পড়তে হয় না। অক্ষরগুলোকে আলাদা আলাদা উচ্চারণ করে করে পড়,—দেখবে আজকে রাতের কি বিচিত্র একটা দিক এ সামান্য ক'টি অক্ষরে ফুটে উঠেছে।" বলেই জেঠী আইভি'র রচনা করা ইংরেজী অক্ষরগুলো কে আলাদা আলাদা করে পড়ে যেতে লাগলেন ঃ

K— ? K LO ? O, RF R KT SSO ? R K LO ? A J PRE-O

কে— ? কে এলো ? ও, আরেফ আর কেটি এসেছো ? আর কে এলো ? এ যে পিয়ারী ও

SSA. O DR PRE BB, SO SO. RA RA ! JTO J SSN. O DD

DD. এসেছে। ও ডিয়ার পিয়ারী বিবি, এসো এসো। আরে আরে। জেঠিও যে এসেছেন। ও

দিদি। A DK SO. T DA JO, R CCTO NO. JT J VJ

LOKC !" —ET IV. এদিকে এসো। 'টী' দিয়ে যেও, আর শিশিটিও এনো। জেঠী যে

এলোকেশী।" —ইতি আইভি।
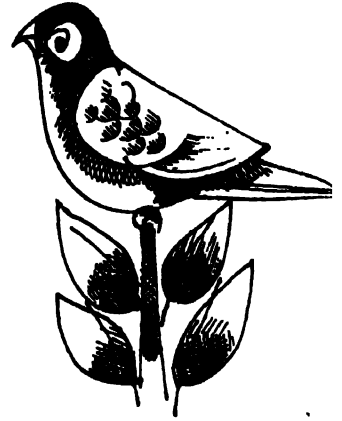
হরিদাস আর নীলমাছি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাড়িতে কেউ নেই, টালিগঞ্জের পিসীমা কলতলায় আছাড় খেয়ে হাঁটু ভেঙেছেন—এই খব পেয়ে সবাই দেখতে গেছেন তাঁকে। শুধু বাড়ি পাহারা দিচ্ছে হরিদাস। আনন্দের সঙ্গেই রাজ হয়েছে সে।

কারণ, আজই পাটনা থেকে মেজোমামা দু ঝুড়ি বাছাই ল্যাংড়া আম পাঠিয়েছেন। তাদে গন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করছে। তা ছাড়া গোটা চারেক কাঁটালও পেকেছে ভাঁড়ার ঘরে। কা থেকে ঠাকুমার অম্বুবাচী, সেইজন্যেই তোলা আছে সব।

মা-র মনে একটু সন্দেহ ছিলই। যাওয়ার আগে পইপই করে বলে গেছেন, এই হরে আম-কাঁটালগুলোর দিকে যেন নজর দিসনি। ওগুলো অম্বুবাচীর জিনিস—খেয়াল থাকে যেন।

হরিদাস একটা টেকুর তুলে বলেছে, তুমি আমাকে যে কী ভাবো মা! এই এক্ষুনি তো চিংড়ি কালিয়া আর মুড়িঘণ্ট দিয়ে গাণ্ডেপিণ্ডে খেলাম। এর ওপর আবার আম-কাঁটাল খাবো? কী বলো তার ঠিক নেই।

—তোমায় বিশ্বাস নেই বাপু—তুমি সব পারো।

—না মা, পারি না। তুমি নির্ভয়ে চলে যাও।

মা গেছেন। কিন্তু খুব যে নির্ভয়ে গেছেন তাঁর মুখ দেখে সে কথা মনে হয়নি।

এইখানে হরিদাসের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীর ঘরের ছেলে। সব চাইতে ছোট বলে আর ছেলেবেলায় খুব পেটের অসুখে ভুগত বলে, শাসন তো পায়ইনি, প্রশ্রয় পেয়েছে অতিরিক্ত। ফলে চার বারের চেষ্টাতেও স্কুল-ফাইনাল ডিঙোতে পারেনি। বিরক্ত হয়ে বাবা বলেছেন, আর ওর পড়বার দরকার নেই—এবার ব্যবসাতেই ঢুকিয়ে দেব।

কিন্তু জাঁদরেল তিন-তিনটে দাদা থাকতে হরিদাসের বয়ে গেছে ওসব করতে। এখন সে পাড়ার জিম্‌নাস্টিক ক্লাবের পাণ্ডা—ইয়া তাগড়া জোয়ান। পেটরোগা তো নয়ই—বরং সাধারণ মানুষের পাঁচগুণ না খেলে তার পেট ভরে না। শেষ রাতে উঠে একটা হারমোনিয়াম নিয়ে দরাজ গলায় কালীকীর্তন গাইবার চেষ্টা করে। তাতে করে এই হয়েছে যে কলকাতার এমন ভিড়ের দিনেও সামনের দিকের দো-তলা বাড়িটা আজ বছরখানেক ধরে প্রায় খালিই পড়ে থাকে। ভাড়াটে আসে না তা নয়, কিন্তু তেরাত্তিরের বেশী কেউ টিকতে পারেনি, বাক্স-বিছানা ঘাড়ে তুলে যেদিকে পারে দৌড় মেরেছে। শুধু এক লম্বা চুলওলা কবি-কবি ভদ্রলোক দিন দশেক কাটিয়েছিলেন, এগারো দিনের দিন যখন তিনি দুটো লাল লাল চোখ পাকিয়ে পাড়ার হিন্দুস্থানী গয়লা দেওলালকে জাপটে ধরে সমানে ইংরেজী গান শোনাতে লাগলেন, সেদিন সবাই মিলে চাঁদা করে তাঁকে রাঁচীর ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।

যাই হোক, বাড়ি যখন খালি আর ঠাকুর-চাকরেরা বিকেল চারটে পর্যন্ত আড্ডা দিতে বেরিয়েছে, তখন এক পেট গিলে হরিদাস তেতলার ঘরের মেজেয় একটা শীতল পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, প্রচুর পরিমাণে চিংড়ির কালিয়া আর মুড়িঘণ্ট খেয়ে মেজাজটাও বেশ খুশীই আছে, ঝিমঝিম করছে দুপুর—হরিদাসের ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু পাটনাই ল্যাংড়া আর পাকা কাঁটালের গন্ধ এমন বেয়াড়াভাবে এসে নাক দিয়ে ঢুকে তার পেটের মধ্যে সুড়সুড়ি দিতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত হরিদাস 'দুত্তোর' বলে উঠে বসল।

তখন হরিদাসের মনে হল, খেয়ে নিশ্চয় তার পেট ভরেনি—নইলে আম-কাঁটালের গন্ধে তার প্রাণ এমন উদাস হয়ে যাচ্ছে কেন? আর কে না জানে, কম করে খেলে শরীর টেঁকে না—এমনকি হাতি পর্যন্ত চিৎপাত হয়ে পড়ে?

মা-কে অবিশ্যি কথা দিয়েছে—মনটা প্রথমে খুঁতখুঁত করতে লাগল। তারপরে আরো নিবিষ্টমনে চিন্তা করে দেখল, প্রাণটাই যদি অনাহারে গেল, তা হলে কথা দিয়ে আর কি হবে! আর সে মারা গেলে মা-ই তো সব চাইতে কান্নাকাটি করবেন। মিছিমিছি অকালে মারা গিয়ে মা-কে কষ্ট দিয়ে লাভ কী।

অতএব মাতৃভক্ত হরিদাস উঠে পড়ল, দোতলার ভাঁড়ারে গিয়ে ঢুকল, বেছে বেছে পঁচিশটা বড়ো বড়ো ল্যাংড়া আম আর একটা গোটা কাঁটাল খেয়ে অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচালো। তারপর আবার নিজের ঘরে ফিরে এসে শীতল-পাটিতে লম্বা হল। হ্যাঁ—এইবারে ঘুম আসছে—বেশ জমাট ঘুম একখানা।

তিন মিনিটের মধ্যেই ঘর কাঁপিয়ে হরিদাসের নাক ডাকতে লাগল। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নির্ব্বিঘ্নেই এই নাকের ডাক চলতে পারত, কিন্তু গোল বাধল আরো মিনিট দশেক পরেই। আম-কাঁটালের গন্ধে একটা নীল মাছি অনেকক্ষণ ধরেই ঘোরাঘুরি করছিল, সেটা এবার হরিদাসের ঘরে এসে ঢুকল। এই তো—এখানেও যে সেই প্রাণকাড়া গন্ধ! কিন্তু কোথায় সেই মন হরা কাঁটাল—আর হৃদয় হরা ল্যাংড়া আম?

কই—কোথায়?

হরিদাসের হাঁ-করা মুখ থেকে 'ফাঁ—ফর্‌র্‌' আওয়াজটা যেন মাছিকে ডাক দিয়ে বললে, কেন, এই এখানে?

হরিদাস ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল, তার মাথার সামনে কে যেন একটা মনখানেক ওজনের বিরাট কাঁটাল ঝুলিয়ে রেখেছে আর সে হাঁ করে তাতে কামড় দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ কাঁটালটা থেকে কাঠবেড়ালির মতো একটা ল্যাজ বেরিয়ে এল আর সেটা হরিদাসের মুখে সমানে সুড়সুড়ি

দিতে লাগল। হরিদাস ভীষণ বিরক্ত হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আরে খেলে যা! কাঁটালের ল্যাজ আছে একথা তো কখনো শুনিনি।

আর বলতেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

আরে ঃ রামো—এ যে একটা নীল মাছি! দিব্যি গুড়গুড়িয়ে তার মুখ আর নাকের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেন ইডেন গার্ডেন-এ হাওয়া খাচ্ছে।

হাত নেড়ে হরিদাস মাছিটাকে তাড়িয়ে আবার ঘুমোবার উদ্যোগ করল।

কিন্তু মাছিদের মতো এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রাণী সংসারে আর নেই। যতবার তাড়াও—ততবার ঠিক ঘুরে ফিরে সেইখানটিতেই এসে বসবে। যদি একবার তার মনে হয় যে তোমার কানের মতো উৎকৃষ্ট বসবার জায়গা দুর্লভ, তা হলে তুমি যতই চেষ্টা করো—বার বার তোমার কর্ণটি প্রদেশই আক্রমণ করতে থাকবে, ভুলেও নাসিকের দিকে পা বাড়াবে না।

তার ওপর আবার নীল মাছি! যেমন তার বোঁ করে আওয়াজ—তেমনি তার শুয়োরের মতন গোঁ। লম্বমান হরিদাসের নাক মুখ থেকে সমানে আম-কাঁটালের যে আকুল করা গন্ধ আসছে—সেখান থেকে তাকে নড়ায় কার সাধ্যি!

অতএব একটুখানি ঘুরপাক খেয়েই আবার মাছিটা এসে তার নাকের ডগায় বসল। একটুখানি কাঁটালের রস শুকিয়ে ছিল সেখানে, কুটুস করে ছোট্ট একটি কামড় বসিয়ে দিলে।

—আঃ, জ্বালালে!

হরিদাসের হাতখানা তীরের বেগে তার দিকে এগিয়ে আসতে সে বীরের মতো রণে ভঙ্গ দিয়ে একটা জলের গ্লাসের কানায় গিয়ে বসল। এবং এক মিনিট পরে হরিদাস যেই আবার হাঁ করে 'ফর্‌র্‌ ফোঁ' বলে আওয়াজ ছেড়েছে, অমনি উড়ে এসে তার ঠোঁটে বসল আর শুঁড় নেড়ে নেড়ে ল্যাংড়া আমের সন্ধান করতে লাগল।

—তবে রে রাস্কেল মাছি!

এক লাফে হরিদাস উঠে বসল আর নীল মাছিও সঙ্গে সঙ্গে পাশের টিপয়ে সেই কাঁচের গ্লাসে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

—তোমার ভিরকুট্টি আমি ভাঙছি—বলেই হরিদাস ধাঁ করে একটা চড় হাঁকড়ে দিলে গ্লাসটার দিকে। মাছি অক্ষত শরীরে উড়ে পাখার রেগুলেটারে গিয়ে বসল, আর ঝনাৎ! গ্লাসটা টিপয় থেকে মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল—জলের স্রোত বইল ঘরময়।

—আরে ছি-ছি, একি হল!

গেলাসটা গেল, বড়দার শখ করে কেনা বিলিতী কাচের গ্লাস—বিস্তর দাম! ওদিকে ঘর জলে থইথই। শীতলপাটিটাও ভিজে একাকার। কোথায় পঁচিশটা আম আর একটা কাঁটাল খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো—তার বদলে এখন কাচ কুড়োও, ঘর পরিষ্কার করো বসে বসে।

—স্টুপিড্‌, ইডিয়ট মাছি!

হরিদাস যতক্ষণ গৃহকর্ম করতে লাগল, ততক্ষণ রেগুলেটারে বসে দুটো বড়ো বড়ো গোল চোখ মেলে মাছি তাকে পর্যবেক্ষণ করে চলল। বেশ ভালোই লাগছিল তার—বেশ করে হাত-পা চেটে নিয়ে আবার নতুনভাবে আক্রমণের মতলব আঁটতে লাগল।

ঘর সাফ করে হরিদাস এবার খাটে এসে শুয়ে পড়ল। অতগুলো আম আর একটা গোটা কাঁটাল—পেটটা যেন ফুলে ফুলে উঠতে চাইছে। তার ভেতর আবার এই পণ্ডশ্রম—ওঃ! হরিদাস একটা হাই তুলল, আবার চোখ বুজল তারপরে।

তৎক্ষণাৎ আবার বোঁ-ও-ও এবং—

এবং জেট বিমানের মতো নীল মাছিটা এসে অবতীর্ণ হল তার গালে।

—তবে রে—

হরিদাস এবার ধাঁ করে একটা পেল্লায় চাঁটি হাঁকড়ালো। হাতের ফাঁক দিয়ে নীল মাছি নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গেল আর চড়টা এসে বাজের মতো নামল তার নিজেরই গালে। জিম্‌নাস্টিক করা হাতের চড়, চোয়ালের দুটো দাঁত নড়েই গেল বলে বোধ হল। আর পাক্কা তিন মিনিট ধরে মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল হরিদাসের।

উঠে বসে হরিদাস মাছিটাকে লক্ষ্য করতে লাগল। ওই যে—ওই তো! ঘরের আলোটার নীল রঙের শেড্‌টার ওপর বেশ করে জাঁকিয়ে বসেছে।

—দাঁড়া, দেখাচ্ছি!

দেওয়ালের পাশ থেকে খন্তাটা তুলে নিয়ে ধপাস করে এক ঘা?

—বাপরে মা-রে, একটুর জন্যে বেঁচে গেছি রে—মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠে মাছিটা। বোঁ করে একেবারে ছাত বরাবর পৌঁছে গেল। আর গা করে লাগানো শেড্‌টা দু টুকরো হয়ে খসে পড়ল নীচে। একটা মেজেতে পড়ল ঝনাৎ করে আর একটা হরিদাসের মাথায় পড়ল ঠনাত করে!

ভাগ্যিস এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ছিল—নইলে কেটে রক্ত গঙ্গাই হয়ে যেত।

হরিদাস লাফাতে লাগল। আচ্ছা ধড়িবাজ তো এই মাছিটা! ওর জন্যে কাচের গেলাসটা গেল, আলোর শেড্ ভাঙল, নিজের গালে একটা নিদারুণ চড় পড়ল আর অল্পের জন্যে রক্তারক্তির হাত থেকে রেহাই পেল মাথাটা। দাঁতে দাঁত ঘষে হরিদাস বললে, দাঁড়াও, একবার যদি ধরতে পারি—

ধরা দেবার জন্যেই যেন মাছিটা সাঁ করে নেমে এল আর হরিদাসের কানের পাশ দিয়ে বাঁই করে বেরিয়ে গেল। তক্ষুনি আঁইআঁই করে হরিদাস তাকে ধরবার জন্যে শূন্যে লাফিয়ে উঠল।

লাফিয়ে উঠল এবং মেজেয় নামল। কিন্তু মেজেতে ঠিক সোজা হয়ে নামল না। গ্লাসের জলে চকচকে মেজেটা খানিক পিছল হয়ে ছিলই, সুতরাং পা হড়কে একেবারে চিতপটাং! পায়ের লাথি গিয়ে লাগল ঘরের কোণের আলনাটায়, সেটা এসে হরিদাসের ঘাড়ে পড়ল। সেই সঙ্গে পড়ল মণখানেক শাড়ি-জামা-বর্ষাতি-ছাতা-লাঠি—সব মিলে হরিদাসের মনে হল গোটা বাড়িটাই তার পিঠের ওপর নেমে এসেছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধস্তাধস্তি করে জামা-কাপড়-লাঠি-ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে এল হরিদাস। তখন তার মাথার ওপর জয়ধ্বজার মতো একটা মোজা ঠায় বসে আছে।

আর মাছিটা?

সে এতক্ষণ রুম-এরিয়ালে বসে পরম পুলকে হরিদাসকে দেখছিল আর মনের আনন্দে অনেকগুলো পা চেটে নিচ্ছিল পর পর।

হরিদাসও তাকে দেখতে পেলো এবং খন্তাটা তুলে নিয়ে আবার ভীম বেগে এক ঘা বসিয়ে দিলে।

খন্তার মাথাটা অনেকখানি চওড়া এবং সেটা যে দস্তুরমতো বিপজ্জনক, প্রথম বারের অভিজ্ঞতাতেই মাছি সেটা বুঝে নিয়েছিল। কাজেই হরিদাস খন্তা তুলতেই সে বোঁ করে একটা গোঁত্ খেলো। আর খোন্তার ঘায়ে এরিয়ালটার একদিক খুলে গিয়ে সেটা চাবুকের মতো হরিদাসের পিঠে এসে পড়ল!

—উঃ, গেছি গেছি—

পুরো দু মিনিট হাহাকার করে হরিদাস যখন ধাতস্থ হল, তখন তার মাথায় দস্তুরমতো খুন চেপেছে। এবার যা হোক একটা কিছু ঘটে যাবে। এসপার কিংবা ওসপার! এই দিল্লীর সিংহাসনে—অর্থাৎ এই ঘরে দুজনের জায়গা হতে পারে না। হয় আমি থাকব, নইলে ওই নীল মাছিটা। কিন্তু যে-হেতু এটা আমার পৈতৃক ঘর সেজন্যে আমাকেই থাকতে হবে এখানে। আলবাত্!

কানের কাছ দিয়ে আবার বোঁ করে বেরিয়ে গেল মাছিটা। যেন ঠাট্টা করেই গেল ওকে।

বটে—বটে !

এবার আর ঊর্ধ্বলোকে নয়—খন্তাটা ভারী বিপজ্জনক জিনিস। মাছি এবারে সোজা গিয়ে খাটের তলায় ঢুকল।

—আচ্ছা—আচ্ছা আমিও আসছি—

হামাগুড়ি দিয়ে নীচু খাটটার তলায় ঢুকে পড়ল হরিদাস। আর অমনি কোত্থেকে মাছি এসে তার মুখে উড়ে পড়ল।

—এত বড় সাহস ! এমন ধাষ্টামো !

উত্তেজিত হয়ে হরিদাস মাছিকে থাবা বসাতে গেল। কিন্তু জায়গাটা যে নিতান্তই খাটের তলা এবং সেখানে যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়, এই কথাটাই তাব খেয়াল ছিল না। মাছি সোঁ করে চম্পট দিল আর হরিদাসের মাথাটা দড়াম করে ঠুকে গেল খাটের সঙ্গে। যেন দেড়মণ একটা হাতুড়ি দিয়ে কে তার মাথায় ঘা বসিয়ে দিল।

—উরে ঃ বাপ্—

চোখে বাশি রাশি সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে হরিদাস খাটের তলায় ভিরমি গেল।

যখন বেরিয়ে এল, তখন মুখে ঝুল, চুল ভরতি জাজিমের ধুলো আর তালুর ওপর ঠিক একটা বেলের মতো ফুলে উঠেছে। রণক্ষেত্রে আহত সৈনিকের মতো উলটে-পড়া আলনার জামা-কাপড়ের গাদার ওপর সে বিমর্ষ মুখে বসে রইল।

মাছিটাকে আর দেখা যাচ্ছে না—বোধ হয় পালিয়েছে। হতচ্ছাড়া—নচ্ছার—উল্লুক—

বোঁ-ও-ও—

আবার—আবার সেই কামান গর্জন। শত্রুপক্ষ হরিদাসের ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল এবং ঠাকুরদার মস্ত ছবিখানার উপর আশ্রয় নিয়ে এক মনে পরিস্থিতিটা লক্ষ্য করতে লাগল।

—ওরে রে পামর !

হরিদাস আবার খন্তা বাগিয়ে হাঁকড়াতে গেল, কিন্তু মাথায় খাটের ঠোক্কর লেগে কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি গজিয়ে উঠেছে তার। মাছিটা যে রকম শয়তান তাতে খন্তা চালিয়ে তাকে বধ করা যাবে কিনা ঘোর সন্দেহ এবং ঘা লেগে ওই পেল্লায় ছবিখানা এসে মেজেয় পড়বে, তা-ও নিঃসন্দেহ। অতএব—

তখন মনে হল মাছি মারার সব চেয়ে সোজা এবং নির্ভুল উপায় হচ্ছে স্প্রে। আর বাইরের বারান্দাতেই তো স্প্রেটা পড়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য, এতক্ষণ তার খেয়ালই হয়নি ?

এক লাফে হরিদাস বারান্দায় বেরিয়ে এল। কিন্তু হায়—স্প্রেটা শুকনো। পাশেই মারকিটের টিনটা—সেটাও ঠনঠন করছে।

দুত্তোর !

তেল কিনে আনতে হবে—এবং এক্ষুনি। এর মধ্যে মাছিটা যদি পালিয়ে বাঁচে সে ওর সাত পুরুষের ভাগ্যি। কিন্তু মাছির রকম-সকম দেখে মনে হল, অধিকার করা দুর্গ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কোনো বাসনা আপাতত তার নেই।

—দাঁড়া দুরাত্মা, আমি আসছি—

বাড়ি থেকে বেরিয়েই ডাক্তার গড়গড়ির ফার্মাসিউটিক্যাল স্টোর্স। এখানেই ফ্লিট-মারকিট-শেলটক্স—অর্থাৎ মশা-মাছি বধের সব রকম অগ্নিবাণ কিনতে পাওয়া যায়। হরিদাস দোকানে ঢুকে পড়ল।

গ্রীষ্মের দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। রাস্তায় একটি লোক নেই—শুধু একটা হাইড্রান্টের মুখ দিয়ে যেখানে ঘোলা জল উঠছে, একটা সাদা-কালো নেড়ীকুকুর পেট পেতে শুয়ে আছে তার ভেতরে। গড়গড়ির দোকানও ফাঁকা। আর গড়গড়ির কম্পাউণ্ডার জগু কাউন্টারের ওপর একটা তেল চিটচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

জগুকে দেখলেই হরিদাসের মেজাজ খিঁচড়ে যায়। জগুও তাদের জিম্‌নাস্টিক ক্লাবের মেম্বার এবং হরিদাসের চাইতেও জোয়ান। দু বার দুজনে কুস্তি লড়েছে আর দু বারই জগু হরিদাসকে পটকে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু আসল কারণ সেখানে নয়। হরিদাস মোহনবাগানের ভক্ত, জগু ইস্টবেঙ্গলের। এই নিয়ে দুজনে যে কতবার হাতাহাতির জো হয়েছে, তার ঠিকানা নেই।

হরিদাস কড়া গলায় ডাকল ঃ এই জগা, একটা মারকিট দে শিগগির।

জগু বোধ হয় তখন ইস্টবেঙ্গল আই-এফ-এ শীল্ড্ পেয়েছে এই রকমের একটা মনোরম স্বপ্ন দেখছিল। সে জাগল না।

—এই জগা, এই হতচ্ছাড়া—

জগু সাড়া দিল না।

—জগা শুনছিস ?—হরিদাস জগুকে ধরে নাড়া দিলে।

উত্তরে কী যেন বিড়বিড় করে বকতে বকতে জগু পাশ ফিরল।

আর তো পারা যায় না! এ তো দেখা যাচ্ছে কুম্ভকর্ণের চাইতেও সরেশ। ঝুঁটি ধরে হ্যাঁচ্‌কা মারলে হয়তো জাগতে পারে কিন্তু জগার গায়ে জোর বেশী আর কিল চড়টাও তার ভালই চলে। কাজেই ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে লাভ নেই। সামনেই তো সারি সারি মারকিটের টিন রয়েছে। একটা আপাতত নিয়ে যাওয়া যাক—বিকেলে এসে ডাক্তার গড়গড়িকে দামটা দিয়ে দিলেই চলবে।

হরিদাস একটা টিন ধরে টান মারল।

তক্ষুনি কয়েকটা শিশি-বোতল ছটকে পড়ল মেজেয়—বিরাট আওয়াজ হল, আর তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল জগু। তারপরেই 'চোর—চোর' বলে একটা আকাশ ফাটানো হাঁক ছেড়ে সোজা এসে পড়ল হরিদাসের ঘাড়ে।

হরিদাস বলতে গেল, জগা—আমি—আমি—

—তুমি? তুমি? অরে চোরা—আইজ্ঞ তো তোরে কিলাইয়া কাঠাল পাকাইমু। আমি জগু বোস—আমারে তুই চিনস নাই! আর সে কি কিলের বৃষ্টি! জগা সমানে বলতে লাগল ঃ তরে আমি খাইছি—তরে আমি খাইছি—

একটা পুলিসের গাড়ি তখন রাউণ্ড্ দিতে বেরিয়েছিল। সেটা দোকানের সামনে এসে থামল সেই সময়! তারপর—

তারপর থানা থেকে টেলিফোন পেয়ে টালিগঞ্জ থেকে বড়দা ছুটে এসেছেন এবং হাজত থেকে খালাস করে কানে ধরে হরিদাসকে বাড়ি নিয়ে এসেছেন। মা কাঁদতে কাঁদতে এসেছেন—সবাই এসেছে, এমন কি পিসীমা পর্যন্ত ভাঙা পা নিয়ে আসতে চাইছিলেন, অনেক কষ্টে ঠেকানো হয়েছে তাঁকে।

পরের ব্যাপারটা না বলাই ভালো।

কিন্তু আরো একটু বাকী আছে।

বিকেলের ছায়া নেমেছে ঘরে—হরিদাস উদাস হয়ে বসে রয়েছে। ঠাকুরদার ছবির ফ্রেমে আলেকজাণ্ডারের মতো সেই নীল মাছিটা বসে—রাতের জন্যে আশ্রয় নিয়েছে মনে হয়।

থাকুক বসে—ওর ওপরে হরিদাসের আর রাগ নেই। অনেক দুঃখে সে বুঝেছে ক্ষমাই পরম ধর্ম। এবং জীবে প্রেম করার মতো মহৎ কাজ আর কিছু হতেই পারে না।

হরিদাসের মন ভাবুক ভাবুক হয়ে গেল। হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে সে গান ধরল—সেই বিখ্যাত কালীকীর্তন।

হাঁ করে একটিমাত্র টান—এবং—

এবং টপাত্!

গানের প্রথম ধাক্কাতেই দিগ্বিজয়ী মাছি ফ্রেম ছেড়ে শূন্যে উঠল, তারপরেই বোঁ করে পড়ল হরিদাসের হারমোনিয়মের ওপর। পড়েই মরল না মরেই পড়ল—মাছিটার কাছ থেকে পাকাপাকি কিছু জানা গেল না।

ব্রহ্মাস্ত্র আর কাকে বলে।
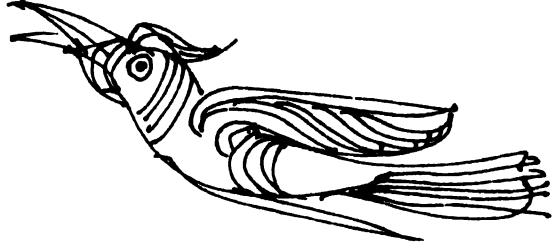
মিছেমিছির অসুখ

সরদার জয়েন উদ্দীন

সে অনেক অনে-ক কাল আগের কথা। এই আমাদের ঢাকা শহর ছাড়িয়ে, এ-গাঁ ও-গাঁ পেরিয়ে পেলে আরো দূরের গাঁ, সে-গাঁ বাঁয় ফেলে সামনে চলো, তারপর ডাইনে ঝুঁকে মেঠো পথ। সে পথ ধরে আরো দু'দিন এগোও, এ-গাঁ ও-গাঁ ছাড়াও, তারপর পাবে এক রাজ্য। নাম কি তার জানো? জানো না।

তাহলে শোন। কিন্তু বলতে কেমন বাধ বাধ লাগছে আমার, কেননা, তুমি হয়তো কথাটা বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কিন্তু বিশ্বাস কর আর না কর; এমন রাজ্য সত্যি একটা ছিল, আর তা ছিল এই আমাদেরই দেশে। ঐ যে বললাম না? এ-গাঁ সে-গাঁ পেরিয়ে, ও-গাঁ সে-গাঁ ছাড়িয়ে, অনেক অনে-ক দূরের গাঁয়ের শেষে।

তাহলে এখন সেই রাজ্যটার নাম বলি, কেমন?

নাম ছিল তার নেই রাজ্য অর্থাৎ কিনা, নেই রাজার রাজ্য। তোমরা হয়তো ভাবছো, যে রাজা নেই তার আবার রাজ্য! সে আবার কেমন ধরনের আজব কথা?

কিছুটা আজব তো বটেই। কিন্তু আজব হলে হবে কি, যা সত্যি তা সত্যিই। তাই আমি যা বলছি তা সত্যি বলেই মান।

হয়তো তুমি ভাবছো, বেশ তো অবাক কথা; যা নেই তা সত্যি বলে মানি কি করে?

কি করে মানবে তাহলে শোন।

ভূত নেই। অথচ ভূত বলে তুমি ভয় কর, ভূত কথাটা মানো। এই ভূত কথাটার মতই সত্যি ছিল আমার গল্পের সেই নেই রাজার রাজ্য।

সেই নেই রাজার নাম ছিল কি জানো? মিছে রাজা। মিছে রাজার ছিল এক ছেলে, সেই

রাজকুমারের নাম ছিল মিছেমিছি। তাহলে এখন মোদ্দা কথাটা হলো, এক যে ছিল নেই রাজার বাজ্য, সেই রাজ্য শাসন করতো মিছে এক রাজা, আর তার ছিল রাজকুমার, নাম ছিল তার মিছেমিছি।

সেই মিছেমিছি রাজকুমারের একদিন হলো ভয়ানক এক অসুখ। কুমার খায় না, শোয় না, ওঠে না, বসে না, দাঁড়াতে তো পারেই না। তোমরা হয়তো ভাবছো, তবে সে কি করে? কিন্তু কিছু সে করতেই পারবে না, করলেই মারা যাবে। এখন বোঝ অবস্থা। তাই সারা রাজ্য জুড়ে হুলুস্থুল। কি হবে, কি হবে?

অন্দরে রাণীমার সাথে কাঁদে সাত শত দাসী বাঁদী। বাইরে রাজার সাথে কাঁদে উজির, নাজির, কোতোয়াল; কাঁদে রাজার হাজার হাজার সিপাই শাস্ত্রী, কাঁদে নেই রাজ্যের লোকজন—কি হবে, কি হবে?

তারপর সবাই ভাবতে লাগলো; কি করা যায়, কি করে রাজপুত্তুরকে বাঁচান যায়। ভাবছে তো ভাবছে, মাথায় হাত দিয়ে, উবু হয়ে বসে রাজা উজির নাজির কোতোয়াল, হাজার হাজার সিপাই শাস্ত্রী, যে যেখানে ছিল, সেখানে বসে কেবল ভাবছে—এখন কি করা যায়, রাজপুত্তুরকে কি করে বাঁচান যায়।

দিন যায় মাস যায়। মাসের পর মাস যায়, মাস গিয়ে গিয়ে বছর হয়, মিছে রাজার রাজ্যশুদ্ধ লোক নিঝঝুম, নিশ্চুপ, কেবল ভেবেই চলেছে।

তারপর হঠাৎ একদিন জ্ঞানী উজির কথা বলে উঠলো, বাদশা আলম্পনা, দৈবক ডাকান, সে এসে গুণে পড়ে যা হয় একটা কিছু হদিস বলবে। মিছে রাজা খুশী হয়ে হেসে উঠে বললো, এইবার বালা মুছিবত দূব হবে। তার জন্য উজির তোমায় আমি হাজার একটা মোহর দান করলাম।

সকলে বললো, মারহাবা মারহাবা।

মিছে রাজা বললো, তবে একটা কথা। এই সামান্য একটা পরামর্শের কথাটা ভাবতে তোমার এতদিন লেগেছে, সে জন্যে আমি তোমায় হাজার একটা মোহর জরিমানাও করলাম।

এই না বলে মিছে রাজা খালি হাত মুঠো করে উজিরের দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনার ভঙ্গি করে বললো, এই দিলাম আর এই নিলাম।

সবাই মিছে রাজার বুদ্ধিকে তারিফ করে বললো, মারহাবা, মারহাবা।

রাজার হুকুম, তাই সাথে সাথে এল দৈবক।

উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব দিক গুণে পড়ে দৈবক বললো, হুজুর! দক্ষিণ দেশে আছে এক নাম না জানা গাঁ। সেই গাঁয়ে আছে অচেনা এক বদ্যি, তার ওষুধে রাজকুমার ভালো হবে।

সাথে সাথে হুকুম হলো, নাম না জানা গাঁয়ের সেই অচেনা বদ্যি যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় সাঁই সাঁই করে নিয়ে এসো।

ছুটলো রাজার হাতী ঘোড়া, ছুটলো রাজার পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ আর সিপাই লস্কর দক্ষিণ দিকে। সবার মুখে এক কথা, কোথায় আছে নাম না জানা গাঁ, নাম অচেনা সেই বদ্যি কোথায়?

চলছে তো চলছে, দিন চলছে, মাস চলছে, বছর ধরে চলে তবে তারা পেল এক পথিক। তাকে জিজ্ঞেস করলো, ওহে গ্রামবাসী, এ গাঁয়ের নাম কি?

সেও বিদেশী পথিক। তাই জবাব দিল—নাম জানা নেই।

ওরা ভাবলো, এই তো, এইতো পেয়েছি। তারপর তারা গাঁয়ের লোকজনকে তাই জিজ্ঞেস করলো, ওহে লোকজন, কোথায় আছে সেই অচেনা বদ্যি ; রাজার হুকুম, তাকে যেতে হবে রাজ দরবারে, রাজার ছেলের ব্যামো হয়েছে।

সে গাঁয়ের লোকজন তো এ কথা শুনে অবাক। অচেনা বদ্যি, তাকে আবার চিনবে কি করে, পাবেই বা কি করে? তাই বললো, দেখ দেখ সব সিপাই মহারাজ, অচেনা বদ্যিকে আবার চিনবো কি করে ?
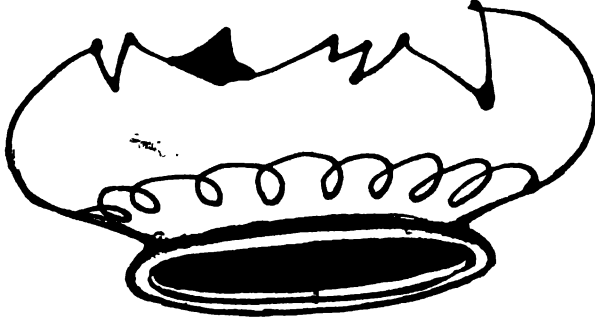
সিপাই শান্ত্রী বললো, এত কথার ধার ধারি নে, আমরা মিছে রাজার লোক, তোমাদের অচেনা সেই বদ্যিকে কোথায় রেখেছ, শীগগির বের করে দাও।

তারা তখন আর কি করে, ভয়ে ভয়ে বললো, সে তো মারা গেছে।

সিপাই শান্ত্রী বললো, এই তো এখন চিনে ফেলেছ। ঠ্যালার নাম বাবাজী, জুলুম না করলে তোমরা কিছু বলতে চাও না। যাক, আমরা এখন তাকে চাই। ডেকে আনো তাকে, না আসে যেমন ভাবে থাকে তেমনি তাকে বেঁধে নিয়ে এস।

তারা আবার অবাক চোখে চেয়ে বললো, সে আবার কিরে বাবা! বললাম তো মারা গেছে, তাকে আবার আনবো কোথা থেকে!

রাজার সিপাই শান্ত্রী তলোয়ার ঝন ঝন করে উঁচিয়ে বললো, এখন তামাশা রাখ। সে মারাই যাক, আর গোল্লায়ই যাক, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। তাকে আমরা চাই-ই চাই। জানো না, রাজার ছেলের ব্যামো ?

তারা সবাই ভাবতে লাগলো, কি করা যায়। তারপর একজন বললো, ঠিক আছে। এই না বলে গোরস্তানে গিয়ে একটা লাশ চেয়ে এনে বললো, এই যে অচেনা বদ্যি।

সিপাই শান্ত্রী সব তখন অচেনা সেই বদ্যি নিয়ে ফিরে চললো নেই রাজার রাজ্যে।

রাজা তো বদ্যি পেয়ে মহাখুশী। ভাবলো, এখন রাজকুমার নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। বললো, ওহে বদ্যি! কি করলে রাজকুমার তাড়াতাড়ি ভালো হবে বলো!

বদ্যি স্টেথিসকোপ, থার্মোমিটার ইত্যাদি লাগিয়ে, জিভ দেখে, নাড়ি টিপে, কিছু সময় চুপ করে বসে থাকলো, তারপর বললো, এমন কিছু হয় নাই। এই ঝট করে সেরে যাবে, তবে কিনা মাটির গড়া নতুন পাতিলে করে রাঁধা একটু মাছের ঝোল খেতে হবে।

মিছে রাজা তো আনন্দে হৈ হৈ করে উঠে বললো, এ আর এমন কি, যাও শীগগির জেলে-পাড়া যাও, মাছ নিয়ে এস।

ছুটলো সিপাই শাস্ত্রী। যেতে যেতে ভাবলো; তাইতো, তাইতো তিনটি তো আছে জেলে-পাড়া, তার দু'পাড়া তো ফাঁকা, এক পাড়ায় লোকই নেই। এখন যাই কোন পাড়ায়? অনেক ভেবে চিন্তে, ঠিক করলো, আচ্ছা যে পাড়ায় লোক নেই সে পাড়ায়ই প্রথমে যাওয়া যাক না।

তারপর তারা যে পাড়ায় লোক নেই, সে পাড়ায় গিয়ে পেল তিন জেলে। তার দু'জন মরা, একজনের দেহে প্রাণই নেই।

যার দেহে প্রাণ নেই তাকে বললো, ওহে জেলে! রাজার ছেলের ব্যামো, মাছের ঝোল খেতে হবে, শীগগির মাছ মেরে দাও।

সে আর কি করে। তাড়াতাড়ি জাল আনতে গেল। কিন্তু তার ছিল তিনগাছা জাল। দু'গাছা একেবারে ছেঁড়া, একগাছায় সূতোই নেই। সে সেই সূতো নেই জালগাছা নিয়ে চললো পুকুর পানে।

এদিকে হয়েছে কি, দুটো পুকুর শুকিয়ে গেছে, একটায় তো পানিই নেই। তা দেখে জেলে থ মেরে রইলো,—এখন কি করে।

সিপাই শাস্ত্রী বললো, এমন চুপ করে থাকলে চলবে না বাপু, জাল ফেল। না হলে দেখছো তো এই—এই না বলে তলোয়ার ঝনঝনিয়ে দিল।

জেলে ভয়ে ভয়ে ফেললো জাল সেই পুকুরে, যে পুকুরে একেবারে পানি নেই। তারপর জাল টেনে তুলে দেখে মাছ উঠেছে তিনটি। সে মাছের দুটো শুক্‌নো, আর একটার গায় কেবল। আছে।

তাতে আর কি, জেলে বললো। যে কোন একটা নিয়ে যাও।

তারা খুশী হয়ে যেটার গায় কেবল কাঁটা আছে, সেটা ধরে নিয়ে চলে গেল।

রাজা তো মাছ পেয়ে মহা খুশী। মাছ খেলেই তো মিছেমিছি রাজকুমার ভালো হয়ে যাবে।

এখন দরকার নতুন পাতিল। রাজার হুকুম হলো, যাও যাও, কুমোর বাড়ি যাও, পাতিল নিয়ে এসো।

ছুটলো সবাই কুমোর বাড়ি।

এদিকে হয়েছে কি, গাঁয়ে ছিল তিন-ঘর কুমোর। তার দু'ঘর কোথায় চলে গেছে, এক ঘর তো পলাতক।

সিপাই শাস্ত্রী অনেক ভেবে চিন্তে পলাতক ঘরে গিয়ে বললো, ওহে! কে আছ, একটা পাতিল ই।

পাতিল, পাতিল আসবে কোথা থেকে? মাটির পাতিল আজ কাল চলে না, তাই আমরা সে গড়া ছেড়ে দিয়েছি। তবে কিনা ঐ ঝুপড়ি ঘরে গিয়ে দেখ দু'একটা থাকলেও থাকতে র।

তারা ছুটে গিয়ে দেখে, তিনটি পাতিল আছে সত্যি, তার দুটো ভাঙ্গা, আর একটার তলা

এ অবস্থায় কি আর করা যায়। তারা সেই তলা-নেই পাতিলটি নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল।

মিছে রাজা পাতিল দেখে মহা খুশী। এইবার মাছ রান্না হবে, মিছেমিছি রাজকুমার মাছের ঝোল খাবে আর তার ব্যামো সেরে যাবে।

রাজার বাড়ির সাতশো রাঁধুনী রাঁধার জন্যে তৈরী হয়ে ছিল। তারা মাছটা কুটে নিয়ে, পানি দিয়ে, মসলা দিয়ে সেই পাতিলে দিল তুলে।

তোমরা তো জানো, সে পাতিলটার তলা ছিল না, তাই ঝোল সব পড়ে গেল, আর মাছটা রয়ে গেল।

কিন্তু কি আর করা যায়, অনেক ভেবে সেই পড়ে-যাওয়া ঝোল তুলে মিছেমিছিকে খাওয়ানো হলো। আর তাতেই রাজকুমার ভালো হয়ে গেল।

নেই রাজ্যের রাজা মিছে আর তার মিছেমিছি রাজকুমারের গল্প আমার এখানেই ফুরুলো।
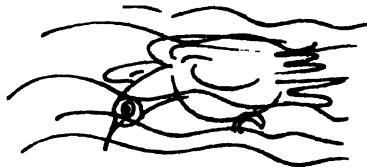
কালের চাকা

শিশির কুমার মজুমদার

কামতাপ্রসাদ বলল, 'সব পোড়োবাড়িতেইতো ভূত থাকে হুজুর। এবাড়িতেও আছে হয়ত। ;বে তা আমি তো কখনও দেখিনি। তাই বলছিলাম, বাড়িটা কিনে আপনি তেমন ভুল ;রেননি।'

একথা বলে বুড়ো কামতাপ্রসাদ গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বেশ বুঝতে ্যারলাম, বাড়িটার ভবিষ্যত ভেবেই ও বেশ চিন্তায় পড়েছে।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে মোহনপুরের রাজবাড়িটা আমি জলের দরে কিনেছি। রাজবাড়ি লতে যা বোঝায়; এবাড়ি সত্যিই তাই। এখন ভেঙ্গেচুরে একাকার। অনেক অংশ ধ্বসে গেছে। াকী অংশে মোহনপুরের রাজবংশের শেষ পুরুষ ত্রিবিক্রমনারায়ণ প্রায় নব্বই বছর অবধি রাজত্ব ্রে, কয়েক বছর হল দেহ রেখেছেন।

এরপর বেশ কিছুদিন জায়গা জমি নিয়ে পরের ওয়ারিশানদের মধ্যে মামলা চলার পর, ত্রবিক্রমের মেয়ের বংশের একজনের কাছ থেকেই এবাড়িটা আমি কিনেছি। মাইনসিদ্ধভাবেই।

নামী সিভিল ইনজিনিয়ার বাড়িটা দেখে বলেছেন, ওর ধ্বসে যাওয়া অংশের ইঁট কাঠ লোহালক্কড় আর মার্বেল বেচেই যে টাকা পাব, তা দিয়ে বাকী অংশটা ভাল করে মেরামত করে । রাজার হালেই বাস করতে পারব।

আজ চলেছি আমি সেই বাড়ি দখল নিতে।

কামতাপ্রসাদ ত্রিবিক্রমের আমলের লোক। মামলা মকদ্দমা চলার সময় বাড়ির দেখাশোনা রি হুকুমে ও-ই করেছে। পরে যিনি মালিক হয়েছিলেন, তিনিও ওকেই ওকাজে বহাল ।। এবাড়ির বর্তমানের মালিক হবার পর আমিও ওকেই ওর কাজে বহাল রেখেছি। কে ছাড়া এবাড়িতে থাকা চলবে না।

মোহনপুর অজ পাড়াগাঁ। পাশের গ্রাম উদয়পুরে লোক পাঠিয়ে কামতাপ্রসাদ আমার জন্যে ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। স্টেশন থেকে সে গাড়িতেই চলেছি মোহনপুরে। স্টেশন থেকে বাড়ির দূরত্ব হবে চার কিলোমিটারের মত।

গ্রাম ছাড়িয়ে গাড়ি রাস্তায় পড়তেই কামতাপ্রসাদ বলল, 'আপনার জন্য বড়বাবুর ঘরটাই সাফ করে রেখেছি। দোতলার ওই ঘরটাই এখনও ভাল আছে। বাড়ি মেরামতের ঠিকাদারবাবু এলে তাকে দেব পাশের বড়মার ঘরটা। সেটাও ভাল আছে। তবে হুজুর রাতে বেশী বারটার হবেন না। পুরোনো বাড়ি, চারদিকই ভাঙ্গাচোরা, বিপদ ঘটাতে পারে।"

ওর কথা শুনে আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, ও বাড়িতে ভূতের ভয় আছে নাকি ?'

একথা জিজ্ঞাসা করার কারণ, বাড়ি কেনা ঠিক করার পর বেশ কখানা উড়ো চিঠি আমি পাই। কার লেখা কে জানে, তাতেই জানতে পারি, ও বাড়ি নাকি ভূতুড়ে বাড়ি।

সে সব চিঠি পেয়ে আমি অবশ্য হেসেই ছিলাম। বুঝেছিলাম, এ কোনও শরিকের কাজ। যে কারণেই হোক না কেন, তিনি চাননা যে এবাড়িটা আমি কিনি।

কিন্তু তারাতো জানেনা এবাড়িটা আমার কাছে কী ?

আমি এ যুগের লোক হলেও বয়স আমার অনেক হয়েছে। সামান্য কেরানীর চাকরি করতাম। তা এতই সামান্য যে বিয়ে করে সংসারী হতে পারিনি। হতে পারিনি, কারণ, আমার সামান্য রোজগারের প্রায় সবটুকুই আমি তিল তিল করে সঞ্চয় করেছিলাম একটা অদ্ভুত স্বপ্নকে সম্ভব করার নেশায়। সে ছিল আমার দুরাশা, অসম্ভবের সাধনা !

একদিন একদিন করে চল্লিশটা বছর পার হয়েছে তারপর। আজ সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে আমার জীবনে। আমিই এখন মোহনপুরের রাজা ! না, না, রাজবাড়ি কিনে জীবনের বাকী দিনগুলো নকল রাজা সাজার সখ হয়েছে আমার।

কামতাপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভূতটুত জানিনা হুজুর। তিনকুলে কেউ নেই আমার। যাওয়ারও আর কোনও জায়গা নেই। তাই ও বাড়িতে থেকে থেকে আমিই তো ও বাড়ির ভূত বনে গেছি। এবাড়িতে আমার বহুত দিন হল হুজুর। সে কি আজকের কথা, তখন আমার বয়স দশ কি বারো। কাকা আনল আমাকে এখানে, নয়াখোকাবাবুর দেখ ভাল করার জন্য। তখন বাড়ির হাল এত খারাপ ছিল না। নায়েব গোমস্তাবাবুরা ছিল, নোকর চাকর ঝি দাসী দারোয়ান ছিল। ঠাকুর পূজা হত, বলি হত। তা হবে হুজুর ষাট বাষট বছর আগেকার কথা। আমি তো এখন বুড়োই হয়ে গেছি।'

ওর কথা শুনে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম আমি।

কামতাপ্রসাদ বলেই চলল, 'সে সব অনেক কথা হুজুর। আমি পরে আপনাকে বলব। যে খোকাবাবুর জন্য আমার নোকরি হল, সে খোকাবাবু থাকল না। বড়বাবু কিরিয়া-করম করে আপন করতে চেয়েছিলেন। বহুত কান্না কেঁদে সে চলে গেল। তারপর থেকেই ও বাড়ির হালচাল খারাপ হয়ে গেল। আজ আর কিছু নেই বাবু ও বাড়ির।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তা বোধহয় কামতাপ্রসাদের নজরে পড়ল না। ও ফের বলল, 'চারদিকে ভাঙ্গন ধরেছে বাড়ির। বৃষ্টি হলে ঘরে ঘরে জল পড়ে। দেওয়ালের পঙ্খের কাজ, নক্সা অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁদিকে বড় বারান্দার অনেকটা ধ্বসে গেছে। রাতে তাই আলো ছাড়া চলাফেরা করবেন না হুজুর।'

আমি বললাম, 'বেশ, সাবধানেই চলাফেরা করব। কিন্তু তুমি যে বললে, খোকাবাবু না, ওই কথাটার মানে তো বুঝলাম না ?'

চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বার করে কামতাপ্রসাদ কোচম্যানকে ধমকে বলল, 'ঘোড়াকে দানাপানি ঠিকমত দাও তো কাশেম আলি? এই সামান্য পথ পাড়ি দিতে তুমি তো দেখছি দিনকাবার করবে!'

ঘোড়ার গাড়ির ঝাঁকানিতে তখন আমার গায়ে ব্যথা ধরে গেছে। এদিকে রাস্তাঘাট সারান হয়না বোধহয় বহুদিন। এপথের আশপাশে যে সব গ্রাম সহরতলি আছে, সেখানকার মানুষদের এনিয়ে তেমন মাথা ব্যথা নেই। ঘোড়ার গাড়ি জমিদারী আমলে চলত এপথে। এখন তো গরুর গাড়ি চড়ার অবস্থাও অনেকেরই নেই।

গ্রাম গঞ্জের মাঝে মাঝে পথের দুপাশে ধানক্ষেত। তারই মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দু'একটা বিশাল গাছ আকাশে মাথা তুলে আছে। পথ দিয়ে হাটুরেরা চলেছে, কারও মাথায় বোঝা, কারও হাতে থলি। সবাই অবাক হয়ে আমাদের গাড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

পরপর কটা গ্রাম ছাড়াতেই কামতাপ্রসাদ বলল, 'আমরা হুজুর রাজবাড়ির কাছে এসে গিয়েছি। বাইরে তাকিয়ে দেখুন, বাঁদিকে রাণীসায়র। এত বড় দিঘি এদিকে আর নেই। এসব সরকারি খাসে চলে গেছে।'

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম আমি। সামনেই দিঘি। দিঘির কালো জলে ঢেউ উঠছে বাতাসে। জল পেরিয়ে নজর আমার থমকে গেল। আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে

রাজপ্রাসাদ, মোহনপুরের রাজবাড়ি। কী বিশাল তার রূপ! কী যেন এক রহস্যে ভরা!

'ওই দিঘিতে দশেরার দিন দেবীর ভাসান হত। তারপর নৌকা বাইচ হত।' বলল কামতাপ্রসাদ, 'দূর দূর থেকেও কতলোক তা দেখতে আসত হুজুর! একবার তো পিতম মাঝির নৌকোর সঙ্গে বাদল মাঝির নৌকোর টক্কর হয়ে গেল! দুটোই উল্টাল। সবাই পড়ল জলে। সাঁতরে সবাই পারে উঠল, মেজবাবু তো রাগে বন্দুক তুলে বললেন, 'সব কটাকে গুলি করে দেব। আগে হালে যে ছিল তাকে, এমন বাইচটা মাটি করে দিলে!' বড়বাবু বললেন, 'যা, যাঃ, গা হাত মুছে খেয়েদেয়ে ঘরে যা, বকশিস সবাই একটা পয়সা করে কম পাবি। তাতে যদি তোদের আক্কেল হয়।' সে কী দিন ছিল হুজুর।'

বিশাল দিঘির জলে বিকালের রোদের আলো পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। চার কোণে চারটে শিবমন্দির ছিল। তিনটেই তার ধ্বসে পড়েছে। অন্যটা বট অশ্বথের শিকড়ে এমনই বাঁধা পড়েছে যে এখনও ধ্বসে পড়তে পারেনি। দীঘির পারেই আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রাজপ্রাসাদ। ওই রাজপ্রাসাদ দেখেই আজ থেকে একযুগ আগে একটা নেহাতই শিশু কী যেন কী এক ভয়ে সিঁটিয়ে গেছিল। সেদিন সে যদি না ভয় পেত, হয়ত এবাড়ির মালিক সে আজ এমনিই হতে পারত। মনের কোথায় যেন আমার হঠাৎ কেমন করে উঠল। ঠিক তেমনি আছে গোটা প্রাসাদটা শুধু কালের কঠিন ছোঁয়ায় কী ভীষণ জীর্ণদশা আজ ওর!

আজ আমার জীবনের সব সঞ্চয়ের বদলে, আমিই এর মালিক! কামতাপ্রসাদ বলল, 'কাকাজীর হাত ধরে যখন এবাড়িতে আসি, তখন বড়বাবু মেজবাবু দুজনেই বেঁচে, অন্দরে বড়মা আর ছোটমা। মেজমা আর ছোটবাবুকে আমি কখনও দেখিনি হুজুর। তাঁরা আগেই গেছিলেন। তখনও এবাড়ির এ হাল হয়নি। পিছমহলে কিছু ফাটল ধরলেও, অন্দরমহল, বারমহল খাড়া ছিল পিছমহলে বাদুড়, চামচিকে বাসা বাঁধলেও অন্দরমহলে বড়মা ছোটমা থাকতেন। বড়বাবু তাঁর খাস কামরায় বসে সারাদিন তামাক খেতেন। পাশের ঘরে খাটে শুয়ে বড়মা কিতাব পড়তেন। আর ছোটমা রাতদিন ঠাকুর ঘরে থাকতেন। ছোটবাবু বন্দুক হাতে জঙ্গলে ফিরতেন। তখন আশে পাশের জঙ্গলে শের থাকত হুজুর।'

আমি থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ বাড়ির এমন হাল হল কখন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামতাপ্রসাদ বলল, 'রাজাবাবুদের জীবনভরা পাপ। বড়বাবু মেজবাবু ভাল হলে কী হবে, এ রাজবাড়ি সেই পাপেই গড়া। শুনেছি, এবাড়ির প্রথম রাজা ডাকাইত বদমাস ছিল। কোম্পানী বাহাদুর যখন দেশ কব্জা করল, সালানা মোটা খাজনা কবুল করে তিনি রাজা বনে গেলেন। আশেপাশের প্রজাদের জুলুম করে জানে মেরে খাজনা আদায় করতেন তিনি। এ বাড়ির পত্তন তিনিই করেন। এ বাড়ির ইঁট তো হুজুর রক্তে গাঁথা। এবাড়ির এ-ইতো হাল হবে।'

আমি বললাম, 'ওকথা থাক, বাড়ির এদশা কবে হল, তা তো বললে না?'

ও কোনও উত্তর দেবার আগেই গাড়িটা বাড়ির চৌহদ্দির বাঁধানো জায়গায় পৌঁছে গেল। খটবট খটবট করে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ উঠল। গাড়ির গতি কমে এল। কামতাপ্রসাদ বলল, 'হুজুর, আমরা এসে গিয়েছি।'

জানালা দিয়ে গলা বার করে দেখলাম, বিশাল ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকছে। নিচের বাঁধানো পথ বেঁকে চলে গেছে বাড়ির দিকে। একপাশে বাগানে ফুলের কেয়ারি, ফোয়ারা আর পরীর মূর্তির সার। কেয়ারিতে ফুলগাছ নেই, এখানে ওখানে দুচারটে বুনো ঝোপঝাড়। ফোয়ারার জল কবেই শুকিয়েছে। পরীর মূর্তিগুলো হাত, পা, মাথা, ডানাভাঙ্গা হয়ে এখানে ওখানে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা গাড়িবারান্দার তলায় এসে থামল।

কোচম্যান নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে নিল। আমি নিচে নেমে দাঁড়ালাম।

সামনে থাকে থাকে সিঁড়ি উঠে গেছে, আটদশ ধাপ সিঁড়ির শেষে বিশাল দালান। বড়বড় খিলান আঁটা থাম উপরের ছাদ ধরে রেখেছে। থামে নক্সা কাটা। দালানের মাঝখানে বিশাল এক দরজা হাঁ করে খোলা।

সেদিক দেখিয়ে কামতাপ্রসাদ বলল, 'আসনু হুজুর ভিতরে।'

এগোতে গিয়েও আমি থমকে দাঁড়ালাম।

কামতাপ্রসাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'থামলেন কেন হুজুর? আপনি দোতলার ডানদিকের ঘরে গিয়ে বসুন। আমি আপনার মালপত্র এক এক করে উপরে তুলে দেব। ঘরের লাগোয়া বাথরুম, জল দেওয়া আছে, হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

কোচম্যান ভাড়া নিয়ে চলে গেল। আমি বললাম, 'একা তুমি সব মাল তুলতে পারবে কেন? এখানে আর কোনও লোক নেই?'

হেসে কামতাপ্রসাদ বলল, 'এখানে আর কাকে পাব হুজুর। বড়বাবুর সময় লোকজন ছিল। তারপর মামলা চলল চার-পাঁচ বছর। তখন কে যে এর মালিক কে জানে? সবাই এক এক করে চলে গেল। আমার তো কোথাও যাবার জায়গা ছিল না, আমি রয়ে গেলাম। সরকার থেকে মাসে কিছু দিত। সে আমার ভীষণ দিন গেছে হুজুর। নতুন মালিক মাসে ষাট টাকা তংখা দিত হুজুর। এখন আপনি হুজুর মালিক, সব কিছু বুঝে নিন। তারপর আমার ছুটি।'

আমি বললাম, 'তোমাকে ছুটি দিচ্ছে কে কামতাপ্রসাদ। আর কদিন পরে এখানে লোক লাগবে কাজে। ভাঙ্গা বাড়ির চেহারা বদলে দেব আমি। আবার লোকজন আসবে এখানে, আলো জ্বলবে, ঘরে ঘরে মানুষজন থাকবে। তাদের দেখাশোনা তোমাকেই করতে হবে। ছুটি পেতে তোমার এখনও অনেক দেরী।'

আমার কথা শুনে চোখেমুখে খুশির ছোঁয়া লাগল কামতাপ্রসাদের। বলল, 'সে খুব ভাল হবে হুজুর। কিন্তু এখন তো ভিতরে চলুন। দোতলার ডানদিকেই আপনার ঘর। আপনি যান, আমি মাল নিয়ে আসছি।'

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভিতর বাড়িতে আবছা আলো। বড় দরজাটা পার হয়ে আমি ভিতরে ঢুকলাম। দরজার সামনেই সেই বিশাল গোল শ্বেতপাথরের টেবিলটা পাতা। তার পাশ দিয়েই বিশাল চওড়া সিঁড়ি দেওয়াল ঘেঁষে পাক খেয়ে উপরে উঠে গেছে। সামনেই রেলিংয়ের থামের উপর পরীর মূর্তিটা হাত বাড়িয়ে উপরের দিক দেখাচ্ছে। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ মার্বেলে তৈরি।

দু এক ধাপ উঠেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির দেওয়ালে কিছু দূর দূর বিশাল সব ছবি টাঙান। ধাপের সঙ্গে সঙ্গে সে ছবিগুলো ক্রমশঃ উঠে গেছে উপরের দিকে। ধুলো ময়লা পড়লেও বেশ বোঝা যাচ্ছে ওগুলো সবই রঙীন ছবি। তেল রঙে আঁকা। এঁকেছেন অতীত যুগের বিদেশী নামী শিল্পীরা। প্রতিটি ছবিই উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়ান পুরুষদের। পোষাকের বাহারেই বোঝা যায় এ ছবিগুলো মোহনপুরের রাজাদের ছবি। একদিন যাঁরা এই রাজপ্রাসাদ জুড়ে বীরদর্পে ঘুরে বেড়াতেন। আজ তাঁরাই ধূলোমাখা হয়ে অসহায়ের মত আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঠিক সেই বহুদিন আগের মতই।

সিঁড়ির শেষে বারান্দায় পৌঁছাতেই ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল গায়ে। কেউ না বুঝুক, আমি তো জানি, ওই ছবিগুলো আমার মনে কেমন যেন একটা ভয় মেশান অসহায় ভাব জাগিয়ে

তুলেছে। যে অতীত এবাড়ির চার দেওয়ালের মাঝে মাথা খুঁড়ে কবেই মরে গেছে, কেন আমি আজ আবার তাকে জাগিয়ে তুলতে এলাম! সস্তায় পুরোনো বাড়িতো আরও কতই কেনা যেত। কেন তবে আমি এই বাড়িটাই কিনতে গেলাম, কেন, কেন ··· !

ঠাণ্ডা বাতাস আমার বেশ ভাল লাগতে লাগল। ভাল লাগতে লাগল এই বাড়ির মাঝখানে এমন করে দাঁড়িয়ে কোন অতীতে ফেলে আসা কী যেন একটা অনুভূতির রেশ মনের গভীরে হাতড়ে খোঁজার এই চেষ্টা করাটা।

অন্য আর কোন বাড়িই আমি কিনতাম না। আমি, মুকুন্দ গোমস্তার নাতি রাখাল রায়, কলকাতার সওদাগরী অফিসের এক পুরানো ঘাঘু কর্মচারী। হঠাৎ লটারীতে টাকা পেয়েছি ভেবেছে সবাই। তা নয়, প্রায় উপোষ করে, কঞ্জুষের মত এক একটা করে পয়সা জমিয়ে সারা জীবনে যে টাকা জমিয়েছি, তা দিয়ে একটা কাজই করার স্বপ্ন দেখেছি শুধু। ভাবিনি, এমন করে একদিন সে স্বপ্ন সত্যি হয়ে উঠবে। তবুও এ যা হবার নয়, তা—ই ঘটেছে আমার ভাগ্যে। মোহনপুরের রাজবাড়ি বিক্রি হল জলের দরে। কিনলাম আমি!

বারান্দার সামনের দরজাটা ভেজানো, আস্তে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম ভিতরে কোনও শব্দ উঠছে নাকি। হাসি পেল আমার। পাগল হলাম নাকি! জনমানবশূন্য এই বাড়ির এই ঘরে আজ আর কী করে সেই শব্দ উঠবে? পঞ্চাশ বছর আগে এদিক থেকে ওদিকে যেতে গিয়ে এতবড় বাড়ির মাঝে পথ হারিয়ে এই ঘরের সামনে পৌঁছে যে শব্দ শুনতে পেত একটা পাঁচ বছরের বাপ-মা মরা ছেলে, ওর তখন একটাই চিন্তা থাকত মনে, ভিতর বাড়ির সবার আদর যত্ন এড়িয়ে কী করে ও পালিয়ে যাবে কাকার কাছে। যে কাকাও ওর নিচের অন্ধকার ঘরে বসে মোটা মোটা খাতা লেখে। ও বাড়ি যাবে, বাড়ি, এত বড় বাড়িতে যে ওর সারাক্ষণ ভয় ভয় করে। অচেনা অজানা লোকের ভয়। বড় বাড়ির এদিকে ওদিকে জমে থাকা অন্ধকারের ভয়। আর ভয়, এই ঘরের ভিতরের না দেখা দৈত্যটাকে। কাকাই তো বলেছে ওকে, এ ঘরে ভুলেও ঢুকিসনা বাবা, এঘরে থাকে এক দৈত্য, ওই শোন তার নাক ডাকার শব্দ, ফর ফর ফরাৎ!

কাকার যেন কী একটা ইচ্ছা ছিল মনে। কিন্তু তিনি ভয় পাওয়া ওই ছোট্ট ছেলেটার মনে না বুঝেই একটা ভয় আরও ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যা তার ইচ্ছাকে আর কাজে পরিণত হতে দেয়নি।

কী বোকাই না ছিল সেই ছেলেটা। বিশাল বাড়িটার ভয় ওর মনে চেপে বসে থাকলেও, ও বাড়ির মানুষগুলোকে তার বড় ভাল লেগেছিল। তারাও ওকে পেয়ে কী যেন পাওয়ার আনন্দে মশগুল হয়ে গেছিল। ছেলেটা শুধুই ভাবত, কেন ওরা ওর সঙ্গে ওর কাকীমার বাড়ি গিয়ে থাকেনা? তাহলে তো ও ওর ওই ছোট্ট জীবনে এমন অনেক কিছু পেত, যা কোনদিনও পায়নি!

বড়বাড়িটা বড় ভয়ের জায়গা। এত বড় বাড়িতে দুজন তিনজন লোক, তারা ভীষণ ভাল, কিন্তু বাড়িটা ভীষণ খারাপ, এ বাড়িতে ছেলেটা কখনই থাকবে না। তাছাড়াও তো কাকার কথা বিশ্বাসই করেছে, ঘরের মধ্যে একটা বড় দৈত্য ঘুমাচ্ছে বাবারে, ঐ তার নাক ডাকছে থেকে থেকে, ফর ফর ফরাৎ।

আস্তে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা আমি খুলে ফেললাম। সারা বাড়ি কাঁপিয়ে গর্জন উঠল, 'কে, কে, কেরে তুই? কী চাস এখানে? হরিয়া, রঘু, কামতাপ্রসাদ, সবাই মরল নাকি? থাকিস কোথায় সব? কে এই ছেলেটা? নিয়ে যা, নিয়ে যা ওকে এখান থেকে, এ আপদ আবার এখানে জুটল কোথা থেকে? কার ছেলে ও?'

'আজ্ঞে আমাদের গোমস্তাবাবুর ভাইপো, সেই যে ক'সন আগে যার বাড়িতে আগুন

লেগেছিল। সে আগুনে ওর বাপ মা দুজনেই মরেছে। তখন কতই বা হবে ওর বয়স। বড়মা কদিন আগে ওকে এখানে আনতে বলেছেন বলে গোমস্তাবাবু বাড়ি গিয়ে ওকে নিয়ে এসেছে। চল রাখু, তুমি ভেতর বাড়িতে চল।

বড়মা তোমাকে ডাকছেন যে।'

'কী নাম বললি ওর ?'

'আজ্ঞে রাখাল, সবাই ডাকে রাখু বলে।'

'তা অমন করে তাড়িয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ওকে ?'

'আজ্ঞে, এই যে বললেন আপনি, ওকে সরিয়ে নিয়ে যেতে।'

'হতভাগা, বুদ্ধি হবে তোর কবে বলতে পারিস ?'

ঘরের মধ্যে ঢুকে দাঁড়ালাম আমি। নাকে যেন সেই বহুযুগ আগের হারিয়ে যাওয়া গন্ধটা এসে লাগল। বালাখানার দাকাটা তামাকের গন্ধ। ইজিচেয়ারে আয়েশ করে হেলান দিয়ে বসে বড়বাবু আলবোলায় তামাক খেতেন, ফর ফর ফরাৎ। ঘুমন্ত দৈত্যের নাক ডাকার শব্দ উঠত।

সেদিন কিন্তু ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল সেই অবুঝ পাঁচ বছরের ছেলেটার ! ওর কাছে তখন সেই কাকার বলা বিশালদেহ দৈত্যটাই জেগে উঠেছিল যেন। ও তখন তাই পালাতে চাইছিল।

'ভয় কিরে, আয় কাছে আয।' ডাক দিল সেই দৈত্য।

'না, যাবনা, যাবনা, ভয়, ভয়।' কাঁদ কাঁদ ছেলেটা বলেছিল।

হা হা করে হেসে উঠেছিল সেই দৈত্যটা। ভয়ে কঁকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল সেই ছেলেটা, 'মার কাছে যাব। কাকীর কাছে যাব। এঁ্যা এঁ্যা।'

ওদিকের দরজা খুলে গেছিল। ঘরে ঢুকেছিল যে, তাকে দেখে কান্না ভুলেছিল ছেলেটা। সকালবেলা দাসীর ঘর থেকে, ওর ঘরেই তো যেতে গিয়ে ভুল করে ও এখানে চলে এসেছে। ওতো ভাল, খুউব ভাল। ওর কাছে ও থাকতে পারে সারাক্ষণ।

দৈত্য বলল, 'আমাদের গোমস্তার ভাইপো শুনছি। হাওয়ায় দরজাটা খুলে যেতে দেখি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে নাকি ওর খুব ভয়। তাই কাঁদছে।'

সেই যে মায়ের মত যে, তিনি বললেন, 'ওর কেউ নেই গো, মা, বাবা। গোমস্তাবাবু আমাদের স্বজাতি। একটু খবর টবর নেবে ছেলেটার ?'

একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস সারা ঘরের বাতাস কাঁপিয়ে তুলল ! কার দীর্ঘশ্বাস ? আমার নাকি ?

তারপর সেই পাঁচ বছরের ছেলেটার চারপাশ ঘিরে কী যেন সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। জরীর জামা কাপড় এল। একতলার গোমস্তাদের অন্ধকার ঘর থেকে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল সেই মার মত বড়মার ঘরে। বিশাল খাট পাতা সেখানে। সেই মায়ের মত মা বলল, 'আজ থেকে তুই আমাকে মা বলে ডাকিস খোকা। আমি তোর সত্যিকারের মা হলাম। বুঝলি ?'

খুব খুশি হয়ে ছেলেটা বলল, 'আচ্ছা। কাকী আসবে না ?'

সাদা কাপড় পরা আর একজন তখন ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'এই তো আমি তোর কাকী। আজ থেকে আমাকেই তুই কাকী বলে ডাকবি। বুঝলি ?'

ওর বেশ ভালই লাগছিল। তবুও মাথা নেড়ে বলল, 'না, তুমি কাকী না। কাকী কই ?' হাসির ধুম পড়ে গেছিল ঘরে।

কত কী সব খেতে দিল ওরা। কত খাবার, কী ভালই না খেতে। বেশ ঘুমাল ও। বিকালবেলা সারা বাড়িতে কত আলো জ্বলে উঠল। কত লোকজন এল। জরীর পোষাক পরিয়ে ওকে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল একটা ছেলেমানুষ ছেলে। সে বলল, 'খোকাবাবু, আমি তুমার সঙ্গে খেলব।

আমার নাম আছে কামতাপোসাদ।'

নিচে আলোর সামনে লোকজনের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটা ভয়ে সিটিয়ে উঠল ; সেই বড় দৈত্যটা হাসি মুখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই হাত বাড়িয়ে বলল, 'আয় বাবা, কোলে আয়।'

আতঙ্কে কঁকিয়ে উঠল ছেলেটা, 'এঁ্যা-এঁ্যা-এঁ্যা।'

আলো নিভে গেল। বাজনা থেমে গেল। লোকজনরা একে একে চলে গেল। প্রায় অন্ধকার বাড়িতে দৈত্যটা দালানে একা পাইচারি করতে লাগল। মায়ের মত মা বলল, 'হ্যাঁরে খোকা, অমন করে চেঁচিয়ে উঠলি কেনরে ? ওতো তোর বাবা। ও দেখিস, তোকে না খুব ভালবাসবে।'

ছেলেটা ফুঁপিয়ে বলল,'কাকার কাছে যাব।কাকীর কাছে যাব। বাড়ি যাব।' ওর ছোট্ট মনে তখন শুধু একটা কথাই ঘুরছে, মা ভাল, কাকীর মত কাকীটাও ভাল, সবাই ভাল। শুধু ভীষণ ভয় ওই দৈত্যটাকে। ও ভালনা, ও ভালনা, ও ভয়, ভয়।

কী জানি বোধহয় ভুল করল সেই দৈত্যটা। হয়ত ওঁর মনের কোথায় যেন একটা কিসের হাহাকার ছিল। তাড়াতাড়ি পাবার লোভে, দুহাত বাড়িয়ে বেশী করে তাই ছেলেটাকে আরও কাছে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন তিনি। ছেলেটার মনের ভয় জয় না করেই তাকে পেতে গিয়ে, তার ছোট্ট মনে একটা বীভৎস আতঙ্ক জাগিয়ে তুললেন তিনি। গরীব ঘরের বোকা ছেলেটার মন আর তাই কিছুতেই ভরল না।

মেজবাবু টাট্টু ঘোড়া কিনে দিলেন। বললেন, 'তোকে বড় শিকারী বানাব। সব বন্দুকগুলো তুই পাবি।'

সেই কাকীর মত কাকী ওকে কত কী দিল। বললে,'কাকী না বলিস, ছোটমা বলবি তো রে ?'

ও খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ বলব, ছোটমা।'

সবাই সব করল। সবাই সব দিল। আর তাই দেখে বারবার সব সময়ে সেই দৈত্যটাও ওকে কত কী দিতে আসত। আসত, আসত আর আসত। সেই ভয়ে ভয়ে ছেলেটা যেন কেমন হয়ে গেল। সব কিছু পেয়েও ও হাসা ভুলে গেল। সারাক্ষণ কী যেন এক আতঙ্কে ও সিটিয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত অসুখে পড়ল ছেলেটা। খাওয়া ছাড়ল। কবিরাজ মশাই ভয় পেলেন।

মায়ের মত মা একদিন রাতে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, খোকা তুই বাড়ি যাবি ?'

খুশি হয়ে ছেলেটা বলল, 'হ্যাঁ কাকীর কাছে যাব, আমি যাব, তুমি যাবে। ছোটমা যাবে। ও যাবেনা, ও যাবেনা, ও ভয়।'

টপটপ করে ওর দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছিল।

ওর কাকা ওকে ফেলে কোথায় যেন চলে গেছিল। ফিরে এল। তারপর একদিন আবার ঘোড়ার গাড়িতে চেপে বসল ও। কাকা বলল,'বাড়ি চল বাবা। ভাগ্যে না থাকলে হবে কী ?'

গাড়িতে জরীর পোষাক, খেলনা, সব কিছু তুলে দেওয়া হ'ল। ও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ছোটমা আসবে না ?'

কেউই ওর সে কথার উত্তর দিলনা। গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ির মধ্যে ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'মা, ছোটমা কই ?'

কাকা বললেন, এখন আর কেঁদে কী করবি বল ?'

হু হু করে দিন কেটে গেল তারপর। গাঁয়ের স্কুলে ভর্তি হল ছেলেটা। একটু একটু করে বড় হতে লাগল। মনের কোথায় যেন একটা কিসের ব্যথা আর অভিমান জমা হয়ে রইল

ছেলেটার। মা, ছোটমা তো কই এলনা। তবে কি ওদের অত ভালবাসা সব মিথ্যে! কাকা কতবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'রাখু, বড়মা, ছোটমা তো তোকে খুব ভালবাসতেন, যাবি বাবা তাদের কাছে আবার ফিরে ?'

ভীষণ অভিমানে স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিল সেই ছেলেটা, 'না যাবনা কাকা।'

কাকীমা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'পেট ভরে খেতে দিতে পারিনা তোকে। বড়মা তো কত ভাল ভাল খাবার খেতে দেবে তোকে। যা বাবা, বড়মার কাছে গিয়ে থাক।'

ভীষণ অভিমানে, ভীষণ দুঃখে ছেলেটা বলেছিল, 'না যাবনা, কখনো যাবনা।'

ওর তখন একটাই চিন্তা মনে, ওরা তো আসতে পারতো। এলো কই ওর কাছে। তবে ও কেন যাবে ?

কী ভীষণ বোকা ছিল সেই ছেলেটা। এই পৃথিবীর কোন কিছুর হিসাবই জানতনা। বুঝতোও না কিছুই।

কাকার ছুটি হয়ে গেল রাজবাড়ি থেকে। ব্যস, ও বাড়ির কথাও মুছে গেল ছেলেটার সামনে থেকে।

ভীষণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে ছেলেটা ক্রমে বড় হল। স্কুলে পড়াশুনা শেষ করল। কাকা মারা গেলেন। খুড়তুতো ছোটভাইটার স্কুলের পড়া তখনও শেষ হয়নি। দেশের জমিজমা থেকে যা আয় তাতে সারা বছরের খোরাক হয়না। কলেজে পড়ার কথা ভুলে, বাক্স বিছানা বেঁধে এক দিন ছেলেটা এসে নামল শেয়ালদায়।

এরপর একযুগ কেটে গেছে। দেশের বাড়ি জমি সব ও ভাইয়ের নামে লিখে দিয়েছে। ভাই স্কুলের মাস্টার। তার চিন্তা আর ওকে করতে হয়না। এখন শুধু একটাই চিন্তা ওর। বড় হয়ে একটু একটু করে ভাবতে শিখেছে ও! ওকে আর সেই বিশাল বাড়িটাকে নিয়ে যে নাটকের অবুঝ নায়ক হয়েছিল ও, তার চিন্তা ক্রমে ক্রমে মনের গভীরে এক অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল ওর। সে অনুভূতি বড়ই ব্যথার, বড়ই করুণ, ভীষণ মধুর সেই ব্যথা!

ভীষণ বোকা ছিলাম আমি, না, না, ভীষণ ছোট ছিলাম, মাত্র পাঁচ বছর বয়স। ভয় আর ভাললাগা এ দুটোই ছিল তখন আমার একমাত্র অনুভূতি। দুটোই আমাকে ছিড়ে খেয়েছে সেই সময়ে। আজ আমার মনে কোনও অবুঝ অনুভূতি নেই। আজ আমি ফিরে এসেছি তোমাদেরই টানে, বাবা, মা ছোটমা। এই দেখ আমি ফিরে এসেছি।

পিছনে আওয়াজ হতেই ফিরে তাকালাম। কামতাপ্রসাদ একটা বোঝা এনে নামিয়ে রাখল নিচে। অবাক হয়ে বলল, 'এ কি হুজুর, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে ? মুখ হাত ধুয়ে নিন। আমি চা দেব তারপর। তেলের যোগাড় বেশী করতে পারিনি। বাতি বেশীক্ষণ জ্বালান যাবেনা। রাতে আপনার পাশেই শোব আমি। তখন শোনাব এ বাড়ির খবর। জানেন, বড়বাবু একটা খোকাবাবুকে পূজাপাঠ করে আপন মেনেছিলেন। সে কিন্তু থাকল না। সে চলে যেতেই বড়মার মন ভেঙ্গে গেল। এবাড়ির সুখও গেল সেই সঙ্গে। জানেন, হুজুর, সে খোকাবাবুর দেখভাল আমিই করতাম। সে খোকাবাবু কোথায় চলে গেল, আমি রয়ে গেলাম। এখন আপনি এলেন, সব দেখে বুঝে নিন, আমার ছুটি।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'যাও চা-ই নিয়ে এস। তবে কি জান, পূজা পাঠ করে যা মানা হয়েছিল, তা কি আর তত মিথ্যা হতে পারে ? দেখ এখন কী হয়।'

ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সনা

মহাশ্বেতা দেবী

১৮৫৫-৫৬ সালে হয় সাঁওতালবিদ্রোহ। রাজমহল থেকে উত্তর পশ্চিমে সংগ্রামপুরে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে সাঁওতালবিদ্রোহের সবচেয়ে নামকরা দুই নেতা সিদু আর কান্‌হু দুজনেই বেজায় জখম হয়েছিলেন। সে সময়কার সব ইতিহাস তো লেখা হয়নি। তাই বীর সনা কিসকুর কথাও তোমরা জানতে পারনি।

সনা কিসকুর বাড়ি ছিল ছোট্ট মহুলা গ্রামে। গ্রামটি পাহাড়ের গায়ে। যাদব বা গোয়ালাদের গ্রাম। যাদবদের অনেক মোষ। সাঁওতাল ছেলে সনা কিসকু একজন গাইচরি।

এমন অনেক ছেলেই গাইচরি। তারা মোষ চরায়। যাদবরা ঘি আর দই বাঁকে বসিয়ে বেচতে যায় দূরে দূরে।

সাঁওতালী ভাষায় সাঁওতালবিদ্রোহের নাম হুল্। তা সিদু কানহুর্ হুল যখন জমে উঠল, যাদব পুরুষরাও যোগ দিল সাঁওতালদের সঙ্গে। তারা গেল সনার মনিব বুড়ো পরতাপ যাদবের কাছে। পরতাপ একটা জ্ঞানীমানী লোক। ও ভাগলপুরে সাহেব দেখেছে। কহলগাঁওয়ে দেখে এসেছে এক ঠেঙো সাধু। রাজমহলে গিয়ে খাসা মতিচুর লাড্ডু খেয়েছে।

পরতাপ বলল, কি রে, সবাই এলি ?

যাদবরা বলল, হুল্‌টা বেশ জমেছে।

তাতে কি ?

আমরা কি বসে বসে দেখব ?

এ একটা কথা বটে। ভেবে দেখি।—বলে চোখ বুজল পরতাপ। তারপর চোখ বুজেই বলল, হুল্। লড়াই। মখ্‌খন সড়কিগুলো আছে তোদের ?

আছে।

অর্জুনের ঘোড়াটা ?

আছে।

পরতাপ চোখ খুলে রেগে চেঁচিয়ে বলল, পঞ্চাশ জন যাদব আছিস পঞ্চাশটা সড়কি আছে। তবে গ্রামে বসে আছিস কেন ? ফুরিয়ে যাবে না হুল্ ? সনার সঙ্গে চলে যা এখনি।

সনার সঙ্গে ?

পরতাপ যাদব নিজেই যাদব। আর তবুও সে বলল। এই জন্যে কথায় বলে যাদবদের বুদ্ধি নেই।"সনা তোদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। হুল্ করতে হলে কোন সাঁওতাল নেতার কাছে তো যেতে হয় ?

তাই হবে। কার কাছে যাব ?

পরতাপ যাদব বড় বড় গোঁফে চাড়া দিয়ে বলল, সনা যার কাছে নিয়ে যাবে তার কাছে।

সনা তো ছোট ছেলে।

তা বললে তো হবে না। হুল্ শুরু করেছে যারা, তাদের কথা মেনেই চলতে হবে আমাদের। কামারবাগদী-ডোম সবাই নেমেছে আর সবাই সাঁওতাল নেতার কথা মেনে চলছে।

সনা বলল, আগে আমি খবর দিয়ে আসি। বলেই সনা বনের দিকে ছুট মারল। যাদবরা তো অবাক। মনে হচ্ছে হুল্ করনেবালা লোকদের সঙ্গে সনার যোগাযোগ ভালমতই আছে আর পরতাপ যাদব সবই জানে।

সনা ফিরল বিকেলে। বলল, আজ রাত পোহাবে, কাল কাকভোরে যেতে হবে। তোরা যে যার হাতিয়ার নিয়ে যাবি।

সনা "তুই" বলল বলে তোমরা অবাক হোয়ো না। "তুই" ওদের মুখে সবচেয়ে সহজে বেরোয়। "তুই" বললে অপমান, "তুমি" বললে আপনজন, "আপনি" বললে সম্মান. এ সব ঘোরপ্যাঁচ ওরা বোঝে না। এখন সবগুলোই বলে, তবে প্রাণের কথা "তুই"।

কাকভোরে যাদবদের নিয়ে সনা চলল। বনের মধ্যে পথ চোখে পড়ে না সহজে, সনা দেখে গাছের গায়ে তীরের ফলার চিহ্ন, কোথায় চারা গাছের মাথা মুড়ে ভাঙা, কোথায় পাথরের ওপর ছোট একটা গাছের ডাল পুব মুখো করে রাখা। নিশানা দেখে ও ছায়ার মতো নিঃসাড়ে হরিণের মত তীর বেগে নেচে নেচে চলে। বনের ঢালুতে পাথরের উঠোন, বড় বড় ঝুঁকে পড়া পাথরের ফাঁকে গহ্বর। কোমরে কপ্নি, এক হাতে শাল গাছের ডাল, অন্য হাতে ধনুক, খুন খুনে বুড়ো ঠাকুরদা কিনুচাঁদ বসে আছে। রাজার মত।

কিনুচাঁদ বলে। এই পাথরের পিছনে গুহা। যে যার ঘর থেকে এখানে চাল ছাতু গুড় লবণ বয়ে এনে রেখে যা আগে। সাহেবরা যদি তাড়া করে, যুদ্ধ থেকে পালাতে হয়, এখানে আসবি। জখম হলে এখানে আসবি। এইসব কাজ সেরে চলে যা জঙ্গল ডাইনে রেখে পুব দিকে। মধু হেমব্রম ফৌজ নিয়ে বসে আছে ডেকে নিবে। হাতে যেন শাল গাছের ডাল থাকে। হুল্-এর নিশানী। নিশানী না থাকলে ওরা চিনবে না। জমিদারের ফৌজ বলে মেরে দিবে।

যাদবের আসল সম্পত্তি মোষ। তারা বলল, মোষের কি হবে ?

উঠে আয় উপরে, দেখ।

উপরে উঠে দেখা গেল, নিচু পাহাড় ঘেরা এতটুকু এক ঘাসে সবুজ জমি।গুহা থেকে ঝর ঝর করে নেমে যাচ্ছে, বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণা।

কিসের বাথান গড়িস তোরা ? আমাদের তিন দেবতা মঁড়েকো মারাংবুরু আর জাহের এরা কেমন বাথান গড়ে রেখেছে দেখ। সাহেব এলে তোদের আর আমাদের মেয়েরা, ছোটরা, মোষ ছাগল সব এখানে থাকবে। সনার সব জানে।

যাদবরা কিনুচাঁদের কথা মতো কাজ করতে ছুটল। আর কিনুচাঁদ মনের খুশিতে গান ধরল,

খাঁটি গেবোন হুল্ গেয়া হো
খাঁটি গেবোন হুল্ গেয়া হো
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব—

যাদবরা যখন চাল-আটার বস্তা নিয়ে যাচ্ছে, তখন পরতাপ যাদবও চাল-আটার বস্তা নিয়ে রওনা হল। যাদবরা তো বেজায় অবাক।

তুমিও চললে না কি?
কিনুচাঁদ যা বলে।
দূর থেকে কিনুচাঁদকে দেখে পরতাপ হাঁকল, হো! শুনতে পাচ্ছিস?
হো! পরতাপ যাদব হো! শুনতে পাচ্ছি।
কথা ছিল।
উঠে আয়।
হাঁপাতে হাঁপাতে উঠল পরতাপ। বলল, আমার কি কাজ? ওরা তো চলল।

আমি বনে, তুই গ্রামে। তোর এই কাজ। যদি হুল-এ জিতি তাহলে দুজনে আনন্দে নাচব যদি এই হার জিত চলে, যদি হারি, তখন দুশমন ঢুকে যাবে গ্রামে। তুই গ্রামের মানুষদের প্রা

বাঁচাতে বনে পাঠাবি আগে—তারপর চলে আসবি। এদের বাঁচানো আমাদের কাজ। জখম হবে যারা তাদের বাঁচানো আমাদের কাজ। হুকুম মতো কাজ করতে হবে তো?

বেশ।

আজ তিন চার জনের খাবার পাঠাস। খবর পেলাম, জখম হয়েছে তারা, এসে যাবে।

পাঠাব। না, সন্ধে করে সনাকে পাঠাব না, আমিই আসব। এখন চলি।

পরতাপের কাণ্ড দেখে অন্য যাদবরা মাথা নেড়ে হুল্‌-এ যোগ দিতে চলে গেল। কি চালাক আর চাপা ওই পরতাপ যাদব। নিজে দিব্যি হুল্‌-এর কাজ করছে, কিচ্ছু বলেনি ওদের। পরতাপ আর সনা ফিরে এল।

হুল্ এর খবর চলে শাল পাতার নিশানায়, পাথরের উপর রাখা ডালপালার চিহ্নে।

যাদবরা যাবার চারদিন বাদেই সংগ্রামপুরে হল সেই ভীষণ যুদ্ধ। সে যুদ্ধের কথা আমি আর কি বলব, সাঁওতাল সমাজ গানে গানে যে কথা ধরে রেখেছেন।

পিয়ালাপুরে ইংরেজ হেরে গিয়েছিল। সংগ্রামপুরে ইংরেজ এল কামান-বন্দুক-গোলাবারুদ নিয়ে। সাঁওতালরা পাহাড়ে ইংরেজরা নিচে। তীর-ধনুক টাঙি নিয়ে তিনশো সাঁওতাল, সঙ্গে যত যাদব কামার-কুমোর, নেতা তাদের সিদু-কান্‌হুর ছোট ভাই চাঁদরাই। হুল্! হুল্! বলে চাঁদরাই সৈন্য নিয়ে নামছেন। কৌশলী ইংরেজ প্রথমে ছুঁড়ছে ফাঁকা বন্দুক। চাঁদরাই সাঁওতাল, ছলনা জানেন না। তিনি বলছেন, ওরা পারবে না, ওদের গুলি নেই।

তারপর গুলি আর গোলা ঝাঁকে ঝাঁকে। চাঁদরাই পড়ে গেছেন। হাজার হাজার সাঁওতাল নিয়ে নাগারা ধাম্‌সা বাজিয়ে নামছেন সিদু কান্‌হু, ঝাঁকে ঝাঁকে তীর, ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাগুলি, জখম সিদু, জখম কান্‌হু। সংগ্রামপুরের মাটি রক্তে লাল।

কবেকার, কবেকার সে কথা? এখন সে কথা শুধু গান।

সিদু, তুমি কেন রক্তে মাখামাখি?

কান্‌হু, তুমি কেন বলছ হুল্! হুল্?

আমাদের ভাইদের জন্যে রক্তে স্নান করেছি আজ

বেনিয়া চোরের দল

আমাদের জমি জমা কেড়ে নিয়েছে বলে।

কোথায় সিদু, কান্‌হু কোথায়? তাদের ধরলে পরে বখশিস্। কিন্তু তাদের খোঁজ মিলল না।

যাদবরা যারা বেঁচেছিল, সাঁওতালরা, সিদু-কান্‌হুকে আর যত জনকে পারে বয়ে এনেছিল মহুলা জঙ্গলের গুহায়।

পরতাপ যাদব যাদবপাড়া, সাঁওতালপাড়ার সকলকে নিয়ে চলে গিয়েছিল জঙ্গলের আরো ভেতরে। গুহাতে আছেন সিদু-কান্‌হু। আছে জখম হয়েছে যারা। যদি ছোট ছেলে কাঁদে তবে তো গুহাতে হাজির হবে ইংরেজ। তাই গুহায় রাখা চলবে না গ্রামের লোকদের।

জঙ্গলের ভেতরে, অনেক ভেতরে চলল পরতাপ যাদব। যাবার আগে ফিস ফিস করে সিদু কান্‌হুকে বলে গেল। কোনো চিন্তা নেই। তোরা ভালো হয়ে উঠলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কার্তিক মাস। গাছের পাতায় টুপ টুপ হিম ঝরে। পরতাপ গ্রামের লোকদের ভরসা দিয়ে নিয়ে চলল।

সনা আর অন্য গাইচরিদের ওপর পড়ল মস্ত ভার। মোষগুলিকে তাড়িয়ে জঙ্গলে নেওয়া মস্ত কাজ। সুবিধে হল, একেক ছেলে বিশ তিরিশটা মোষ চরায়। মোষগুলি নিজের গাইচরিকে চেনে। মোষ বড় ভালো। বাঘ এলে তারা দল বেঁধে শিং বাগিয়ে তেড়ে যায় এমনও ঘটেছে।

গ্রামে আসার আগে সনা কিনুচাঁদকে জিগ্যেস করল, ঠাকুরদাদা, হুল্ আর হবে না?

কিনুচাঁদ আর জগন্নাথ মালবৈদ্য এখন শিকড় বাকড় বেটে জখম লোকদের চিকিৎসায় ব্যস্ত

ওই গুহায় সিদু আর কানহু আছেন। একটি বার তাঁদের দেখার জন্যে প্রাণটা কেমন ক সনার। সোজা কথা! দুজন লোকের নাম আজ সকলের মুখে মুখে আর সেই দুজন ওই গুহা অন্ধকারে শুয়ে আছেন খড়ের বিছানায়। গুহার ভেতরে মানুষ আছে তা বোঝে সাধ্যি কার একটু টুঁ শব্দ আসছে না।

সনার কথা শুনে কিনুচাঁদ বলল, পরে হবে, পরে। চলে যা তুই। সে সব কথা পরে হবে।

সনা বলল, ঠাকুরদাদা মড়েকোঁকে মানত করলে হয় না? তুই যে বলিস ঠাকুর সব কথ শোনে।

পরে হবে সে কথা।

সনা মন খারাপ করে গ্রামে ফেরে। সিদু-কানহু কি ভালো হবে না? হুল্ কি আবার হবে না খুব মন খারাপ করে ও অন্য গাইচরিদের বলে, তোরা চলে যা ভাই। মোষের পিঠে নিয়ে যা ঘর ঘর থেকে কাঁথা মাদুব, চাল ডাল। বয়ে নিয়ে দিস ভিতরে। কোথায় আছে পরতাপ যাদ আর গ্রামের মানুষ, তাদের দিস।

তুই কি করবি?

যাব, পরে যাব।

সনা এখন পদমর্যাদায় ওদের নেতা বিশেষ। গাইচরিরা চলে যায়। সনা বলে, মোষগুলে তো ঢোকালি, তারপর দু পাঁচ জন পাহারা দিস সেখানে। বাকিরা থাকিস গাছের ডালে মগডালে। পালা করে।

কেন?

যদি গ্রামে সেপাই ঢোকে, যেমন করে হোক আমি নিশানা দেব।

তুই একা?

যদি মারে তো একা মরলে ভাল। তা কি জন্যে বলি? এখন লোক দরকার।

সবাই চলে গেল। হঠাৎ গ্রাম শুনশান্। ভূতে পাওয়া যেন। শরতে বন শিউলির গন্ধ। রাতে ফুটফুটে জ্যোছনা। দিনে আকাশ গাঢ় নীল, মেঘের চিহ্ন নেই। সব ঠিক ঠাক থাকলে কত ঢাক ঢোল বাজত, কত পূজো পরব হত! কালীপূজোর দিন বাজি পোড়াত পরতাপ।

পরতাপের কথা মনে হতে সনার হাসি গেল। গত বছর ধরে মালাকরের কাছ থেকে মশল এনে পরতাপ বাজি তৈরি করে, সনা সাহায্য করে।

ছেলেমানুষ, বেজায় ছেলে মানুষ পরতাপ যাদব। কালীপূজোর পরের দিন যাদবদে "গাইখিলান" উৎসবে মোষগুলির শিঙে জড়িয়ে দেয় ফুলের মালা।

বাজি দেখত সবাই। এবার আর সে সব হবে না। সনা ভাবতে থাকল। ভাবতে ভাবতে ও মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি গজাল। হ্যাঁ, সেই ঠিক হবে। খড়ের মাচানের পিছনে। খড়ের উঁচু মাচা পরতাপের গোয়াল ঘরে। বাজির মালমশলা পরতাপের ঘরে।

তিন দিনের দিন বিকেলের সূর্যকে পশ্চিমে হেলিয়ে তবে বিশ বন্দুকবাজ সেপাই নিে ছোকরা সাহেব হিউ ঢুকেছিল গ্রামে।

যেই ঢোকা, অমনি খড়ের দড়িতে আগুন দিয়ে সনা দু হাত মাথার ওপর তুলে ওদের দিকে ছুটেছিল। এসো না সাহেব, এসো না, ওই বাড়িতে শত শত সাঁওতাল অপেক্ষা করছে। কি ভীষ মূর্তি তাদের। গ্রাম ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। আর এসো না।

সাঁওতাল ? শত শত ? কোত্থেকে এল ?

কিছু জানি না সাহেব।

বলতে না বলতে হঠাৎ দুম দাম করে ভীষণ শব্দে কি ফেটেছিল, টলে উঠেছিল খড়ের মাচান, জ্বলে উঠেছিল দাউদাউ করে, ফটাস ফটাস ফাটছিল কাঁচা বাঁশের টুকরো। তার পাবে বাজির মশলা ঠাসা।

সান্থাল কামিং। বলে হিউ ঘোড়ার মুখ ঘোরায় আর সেপাইর ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছুটেছিল। তখন আগুন জ্বলছে।

ফটাস ফটাস বাঁশ ফাটছে। দাউ দাউ আগুন প্রথমে সন্ধ্যার লাল আকাশে, তারপর অন্ধকারে।

যার গোহাল আর ঘর পুড়ল সেই পরতাপই হেসেছিল সবচেয়ে বেশি। তারপর বলেছিল কবে ফিরব জানি না। ফিরব যখন তখন ঘরটা আর গোহালটা তোরা সবাই তুলে দিবি। বুঝেছিস ?

কাঠ জ্বেলে পাথরের উনোনে রান্না চাপিয়েছিল মেয়েরা। সনাকে সবাই বলছিল, বাহাদুর বটে তুই।

সনা গিয়েছিল গুহাতে। গুহা ছেড়ে তখন চলে যাচ্ছে সবাই। দুজন মানুষকে সবাই নীরবে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল।

সনা !—কান্হু ডাকলেন।

সনা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কান্হু তার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, কিনুচাঁদ ! হুলটা তো চালাতেই হয়। কি বলিস সনা ?

সনা মুখ তুলল। ও মা ! কান্হুর মুখে হাসি, হাসি সিদুর মুখে। চোখ বুজল ও। বিশ্বাস হয় না এত বড় সৌভাগ্য। আবার চোখ খুলল। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। যেন কেউ ছিল না এখানে শুধু ছিল শাল বন আর শাল বন আর শাল বন।

সনা উঠে দাঁড়াল। কিনুচাঁদ বলল, একটা হরিণ দেখ সনা। শাল গাছের ছালে জড়িয়ে হরিণের মাংস ধিমা আঁচে পুড়ালে খেতে ভাল লাগবে খুব। অনেক দিন খাই না।

সনা ঘাড় হেলান, ধনুক নিল।
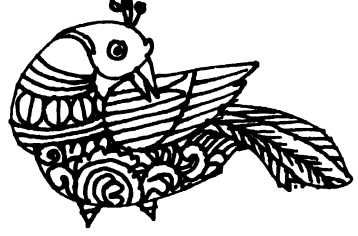
ঘুম তাড়ানোর গল্প

হাবীবুর রহমান

কী যে মুশকিল!

সন্ধ্যে বেলায় পড়ার টেবিলে বই খুলে বসলেই ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখ দুটি। ঢুলতে ঢুলতে কখন যে, একেবারেই ঢলে পড়ে বইয়ের ওপর, টের করতেও পারে না বাবলু।

তারপর এক-একটা ঘণ্টা যেন এক-একটা মিনিট। তরতর করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে ছয় থেকে নয়ে। আপার চুলটানা কিংবা আম্মার বকুনির ধাক্কা খেয়ে কোন মতে মাথাটাকে টেনে তোলে বাবলু বইয়ের ওপর থেকে—দুই হাত দিয়ে কচলাতে থাকে চোখ। কাঁদো কাঁদো স্বরে জবাব দেয়, অমি ঘুমিয়েছি নাকি!

কিন্তু 'ঘুমিয়েছি নাকি' বলে এড়িয়ে যাওয়া কি এতোই সহজ। পরের দিন ইস্কুলে পড়া-না-পারার দরুন রীতিমতো বাইশ বার কান ধরে উঠ-বস করে তবে রেহাই পাওয়া যায়।

দিনের পর দিন এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না বাবলুর—ঘুম-তাড়ানোর একটা মোক্ষম কোন ব্যবস্থা করতে হবেই ওকে।

শেষ পর্যন্ত ও গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়লো লাভলুর কাছে। লাভলু ওর সহপাঠী বন্ধু—পড়া-শুনোয় একেবারে ইস্পাৎ—এতো ধার যে গায়ে হাত দেওয়া যায় না। প্রশ্ন করার আগেই জবাব দিয়ে বসে থাকে।

সেই লাভলুকে ও ধরে বসলো, 'ভাই লাভলু বাঁচাও আমাকে। এ লাঞ্ছনা আর সইতে পারি না।'

লাঞ্ছনা! তা লাঞ্ছনা বই কি! বাবলুর কান ধরে উঠ-বস করার সেই দৃশ্যটা হুবহু ভেসে উঠলো লাভলুর চোখে। উঠ-বস করতে করতে বেচারার মুখ চোখ একেবারে জবা ফুলের মতো লাল টক-টকে হয়ে ওঠে। কান দুটো কালো হয়ে ওঠে কচ্‌লানো নেবুর মতো। আহা বেচারা।

মাথা চুলকে লাভলু বললো, তা পড়াশুনো করলেই তো হয়—অমন লাঞ্ছনা আর পোয়াতে হয় না!

পড়াশুনো করতে তো চাই—কিন্তু ঘুমের জ্বালাতেই সব পণ্ড হয়ে যায়।

ও ঘুমের জ্বালা। তার তো ফাইন ওষুধ রয়েছে—কাগজী লেবু।

কাগজী লেবু ? ওতে কি হবে ?

আরে বুঝলি না। ঘুম পেলে একটু কাগজী লেবুর রস চোখের পাশে টিপে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। সারা রাতের মতো ঘুম একেবারে লেজ তুলে দৌড় মারবে!

আইডিয়াটা মন্দ নয়। এই না হলে লাভলু পড়াশুনোয় অমন ইস্পাৎ হতে পারে।

ঠিক বলেছ ভাই লাভলু। আজই কাগজী লেবুর ব্যবস্থা করা চাই। এতো মাথা ঠুকেও বুদ্ধিটা তো মাথায় আসেনি এতোদিন।

আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে যায় বাবলু। আম্মার হেঁসেল থেকে যা করে হোক একটা কাগজী লেবু হাতাতে হবে। কিন্তু যতো ভয় ঐ আপাটাকে। ওটা যেন শত্তুর। বলা-নাই, কওয়া নাই একেবারে সামনের চুলগুলোকে টেনে ধরে। আর যা লাগে—ওরে বাবা, চোখ ফেটে দরদর করে পানি বেরিয়ে আসে। যা কিছুই করুক না কেন, ওর চোখ এড়িয়ে করতে হবে। বাবলু তাই সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

শেষ-মেষ আপার চোখ এড়িয়েই এক ফাঁকে বাগিয়ে ফেললো একটি কাগজী লেবু—তারপর আঁশবটিতে কয়েকটা ফালি করে পুরে ফেললো পকেটে।

সন্ধ্যে বেলায় পড়ার টেবিলে ঢুলুনির সংগে সংগে বাবলু এবার প্রয়োগ করলো ওষুধ। ওরে বাবা, সেকি জ্বালা। জ্বালার চোটে পড়ার টেবিল ছেড়ে একেবারে তিড়িং-বিড়িং করে লাফানি সুরু করে দিলো বাবলু।

ব্যাপার দেখে ছুটে এলেন আম্মা ও-ঘর থেকে—আর ছুটে এলো সবচেয়ে বেশী ভয় যাকে, সেই-আপা!

আরে হোলো কি—এমন চেঁচামেচি আর লাফালাফি কেন। আম্মা আর আপার প্রায় একই প্রশ্ন।

কিন্তু জবাব দেবে কে ? বাবলু কি আর এ জগতে আছে! চোখে যেন কে বিছুটী বুলিয়ে দিয়েছে। তিড়িং-বিড়িং লাফানি—আর মাগো মলাম গো, গেলাম গো ছাড়া আর কিছুই নাই।

আম্মা তাড়াতাড়ি ধরে নিয়ে গিয়ে চোখ ধুইয়ে দিলেন—বাবা, এমন দুরন্ত ছেলে কি আর দুনিয়া জাহানে আছে ? চোখে যে কী এমন করে লাগিয়েছে! এখন চোখ দুটো ফিরলে হয়!

কিন্তু কে শোনে আম্মার বকবকানি! জ্বালার চোটে বাবলু প্রায় নীল হয়ে উঠেছে! তা হলে কি হয়, ঐ যে বলেছিলাম যতো ভয় আপাটাকে নিয়ে—ওর চোখ এড়ানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! কখন যে পড়ার ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর থেকে কাগজী লেবুর একটা ফালি উদ্ধার করে এনেছে, তা কেউ টেরই পায়নি। আম্মার কাছে সোজা এসে সেই ফালিটা ফেলে দিয়ে বলে বসলো, ঘাবড়ানোর কিছুই নাই আম্মা, সাহেব ঘুম তাড়ানোর জন্য চোখে কাগজী লেবুর রস দিয়েছেন। এই দ্যাখো ব্যাপার।

বাবলু তখনো আম্মার কোলে বসে। চোখ ধুয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে, এখন পাখার পরে পাখা চলছে শুধু। আগের চেয়ে অনেকটা ধাতস্থও হয়েছে বেচারী। মায়ের বুকের ওপর হেলে পড়েছে একেবারে।

এমন সময় আপার এই কথা শুনে, লেবুর রস দেওয়া চোখের মতন আম্মাও জ্বলে উঠলেন। বাবলুকে কোল থেকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, বোকা ভোঁদড় কোথাকার, কে এ বুদ্ধি দিলে বল ? লেবুর রস দিয়ে ঘুম তাড়ানো হয়েছে ? আর করবি কখনো, বল আর করবি কখনো ?

কি থেকে কি!—তিল থেকে যেন তাল হয়ে উঠলো ব্যাপারটা। এতো সব এলাজ-আপ্যায়ন, তার ওপর আম্মার কোলে চড়ার এতো বড় চান্সটা একেবারেই ভেস্তে গেল!

বাবলু দূরে দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো চোখ কচলাতে লাগলে।

আম্মা আবার বকে উঠলেন, চোখ কচলাচ্ছিস্ কেন অমন করে? চোখ দুটোর মাথা না-খেয়ে ছাড়বি না, নাকি।

হ্যাঁ মাথা খাওয়াই বটে! কিন্তু আপাটা কি কম শয়তান। ওর না হয় ঘুম পায় না! ও বুঝবে কি করে? বাবলু তো যা কিছু করেছে, সবই সরল বিশ্বাসেই করেছে—এমন যে হিতে বিপরীত হবে, তা কি আর ও জানতো?

তবু ব্যাপারটা যদি এখানেই থামতো। কিন্তু তার কি আর যো আছে? আপাটা যে এখনো জ্বল-জ্যান্ত দাঁড়িয়ে।

আম্মার তিরিক্ষি ব্যাপার দেখে ও আবার ফোঁড়ন কাটলো, কিন্তু কাগজী লেবু ও পেলো কোত্থেকে—নিশ্চয়ই হেঁসেল থেকে চুরি করেছে! অইটুকু ছেলের পেটে পেটে বুদ্ধি দ্যাখো দেখি!

লাঞ্ছনার ওপরে লাঞ্ছনা! বাবলু সেই আগের মতোই চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলো।

বল্, কোথায় পেলি লেবু—চুরি করেছিস্? আম্মা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন?

বাবলুর মুখে রা নাই।

রা কাড়ছো না কেন? আপা লাফ মেরে এসে এবার বাবলুর মাথার সামনের চুলগুলো টেনে ধরলো। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছিল বাবলুর—কিন্তু আজ আর কেঁদেও পার পাবার যো নাই!

শেষ পর্যন্ত আব্বা এসে শেষ রক্ষা করলেন। ব্যাপারটা সব শুনে বললেন, ভুল করে দোষ করে ফেলেছে—আর কখনো করবে না যা, তার জন্য অত শাসনের কী আছে?

আজ থেকে আব্বার বসবার ঘরে পড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল বাবলুর। গায়ে যেন বাতাস লাগল ওর। ওখানে আপার শাসনও চলবে না—আর আম্মার বকুনিও শুনতে হবে না। তাছাড়া আব্বাও বাড়ী থাকেন না প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত। ও ঘরে বাবলুই হবে সর্বেসর্বা—ঘুম পেলে ঘুমুবে—ঘুম না পেলে আপন মনে পড়া করবে! তারপর আব্বা ফিরলে তাঁর সাথে খেয়ে দেয়ে শুতে যাবে। বাবলুর মনটা খুশী হয়ে উঠলো।

কিন্তু খুশী হলে কি হয়? ইস্কুলের কথাটা মনে পড়তেই আঁতকে উঠলো বাবলু—কান ধরে বাইশবার উঠ-বস্ করা, সে কি সোজা ব্যাপার! তার থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কি করে? ভেবে-চিন্তে কূল-কিনারা পায়না বাবলু! না, পড়া তৈরী করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আর ঘুম তাড়াতে না পারলে পড়া তৈরী করাও অসম্ভব!

পরদিন ইস্কুলে সেই একই অবস্থা! কান ধরে বাইশবার উঠ-বস করা, সেই জবা ফুলের মতো মুখ লাল হয়ে ওঠা, শুকনো চোখ ফেটে পানি পড়া—সবই ঘটলো ঠিক ঠিক আগের দিনের মতো।

ছুটির পরে লাভলু এসে বললো, কিরে চোখে লেবুর রস দিস্‌নি।

দিইনি আবার। খু—ব শিক্ষা হয়েছে, আর নয়!

সে কি কথা! লেবুর রস দিলে তো ঘুম একেবারে লেজ তুলে ভাগে সারা রাতের মতো! তুই তাহলে ঠিক মতো দিতে পারিসনি!

কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে! বাবলু প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো—খুব ভালো করে দিয়েছি। আর তার বদলে চুলটানা, কানমলা, বকুনি সবই খেয়েছি, বুঝলে?

য়্যাঁ, ব্যাপার কি খুলে বল দেখি—লেবুর রসের জন্যে চুলটানা, কানমলা, বকুনি ....

ব্যাপারটা বলতে গিয়ে বাবলু প্রায় কেঁদেই ফেললো! তোমার মতো ছেলের মাথা থেকে এমন একটা কুবুদ্ধি বেরুবে এ-আমি ভাবতেই পারিনি!

লাভলু ওর অবস্থা দেখে মাথা চুলকে বললো, যাক যা হবার তা হয়েই গ্যাছে-—শোন, তোকে একটা ভালো বুদ্ধি দেই—এতে চোখও জ্বলবে না, ঘুমও পাবে না—তারওপর মনটাও ভরে থাকবে!

এতোক্ষণে বাবলুর আগ্রহ ফিরে এলো! যতোই হোক লাভলু পড়াশুনায় একেবারে ইস্পাৎ। এতো ধার যে গায়ে হাত দেওয়া যায় না!

বেশ বলো, করে দেখি আর একবার।

আচ্ছা তুই কি খেতে সবচেয়ে ভালোবাসিস বল দেখি!

কেন, রসগোল্লা!

ব্যস, ঠিক হয়েছে।

বাবলু হাঁ করে চেয়ে থাকে তার মুখের পানে?

দ্যাখ, যা করে হোক তোকে কিছু পয়সা যোগাড় করতে হবে। তারপর সেই পয়সা দিয়ে রসগোল্লা কিনবি। একটা কাপড়ে সেই রসগোল্লা বেঁধে পড়ার টেবিলের ঠিক ওপরে ঝুলিয়ে রাখবি। তোর চোখের সামনে টপ্‌টপ্ করে ঝরবে রসগোল্লার রস—সেই দিকে মাঝে মাঝে চাইলেই ব্যস—যতো খেতে মন চাইবে, ঘুমও ততো দূরে ভেগে যাবে।

আইডিয়াটা চমৎকার। এতে হাঙ্গামা নাই তেমন কিছু—আর চোখ জ্বলারও ভয় নাই

একেবারে।

যতো ফ্যাসাদ ঐ পয়সা যোগাড় করা নিয়ে। আব্বার কাছে চাইলে সোজা বলে দেবেন, কী জিনিষের দরকার বলো, কিনে দেবো। আম্মার কাছে চাইলেই হাজার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হতে হবে। আর আপার তো কথাই নাই! নিজেরা যা-মন-তাই কাজে ঝুড়ি ঝুড়ি পয়সা খরচ করবে—কেবল বাবলুর ব্যাপারেই হাজার রকমের কৈফিয়ৎ তলব!

তবে? পয়সা যোগাড় না করা গেলে আইডিয়াটা কাজে লাগানোই যাবে না। আর কান ধরে উঠ-বস করতে করতেই জানটা যাবে।

ভেবে ভেবে বাবলুর কান গরম হয়ে উঠলো। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফেরার সারা পথটাই ঐ এক ভাবনা তাকে ব্যাকুল করে রাখলো। ব্যবস্থা একটা না করলেই নয়—কিন্তু কি ব্যবস্থা করবে সে। বুদ্ধি আঁটতে আঁটতেই কেটে গেল দু'তিনটে দিন। ঘুম তাড়ানোর এলাজটা হাতের পাশে এসেও ফসকে যাবে বোধ হয়।

সেদিন পা টিপে টিপে বাড়ী এলো বাবলু। মাথার ওপর কাঠ ফাটা দুপুর খাঁ খাঁ করছে! পুরো বাড়ীটায় কারো কোন সাড়াশব্দ নাই। আব্বা গেছেন আপিসে। আম্মা বোধ হয় খেয়ে দেয়ে গা গড়াচ্ছেন একটু। আর আপা? ঠিক তো। আপা এখন কলেজে! চট্ করে আইডিয়াটা খেলে গেল বাবলুর মাথায়! অমনি সোজা গিয়ে ঢুকলো আপার ঘরে। আর আপার পার্সটা খুলে করে ফেললো রসগোল্লা কেনার ব্যবস্থাটা।

আপার ঘর থেকে পকেটে হাত পুরে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এসে সে ঢুকলো মায়ের ঘরে। আম্মা জেগে আছেন তখন। বললেন, কিরে এতো দেরী করলি যে আজ!

আম্মা, আজ ছুটির পরেও আমাদের পড়া হয়েছে…পুরোনো পড়াগুলো আবার ঘুরিয়ে পড়ানো হচ্ছে কিনা! সামনে পরীক্ষা .....

বেশ বেশ..... ছুটির পরে ইস্কুলে খানিক-খানিক যদি পড়ে আসিস, তাহলে আর ভাবনা থাকে না, বাবা!

আম্মা খুশী হয়ে ওঠেন। তারপর খেতে দেন বাবলুকে। বলেন, খেয়ে দেয়ে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াসনা—ওঘরে গিয়ে একটু ঘুমুবি, তাহলে সন্ধ্যে বেলায় আর ঘুম পাবে না।

না, আম্মা। আব্বার ঘরে যাওয়ার পর থেকে আর ঘুম পায় না একেবারেই। আম্মার সামনে চট করে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলে কেমন যেন কাঁচুমাচু হয়ে গেল বাবলু। কথাটা তার নিজের কানেও বাজলো খট্ করে। এর আগে আর কখনো আম্মার কাছে মিথ্যে বলে নাই সে।

তোর আব্বা তো সন্ধ্যেবেলায় থাকেন না বোধ হয়। তবে…

নাই-বা থাকলো আম্মা—কখন এসে পড়বে সেই ভয় থাকে বলেই তো ঘুম পায় না। দ্যাখো না ঠিক ন'টায় খেতে আসি। বাবলু স্টেডি হয়ে গেল এখন।

হ্যাঁ তা ঠিক—এই দু'-তিনদিন থেকে বাবলুকে আর খাওয়ার জন্যে ন'টার সময় ঘুম থেকে ডেকে দিতে হয় না। কথাটা আম্মার বিশ্বাস হয়ে যায়। তিনি বাবলুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

ভাগ্যিস আপাটা নাই এখানে—থাকলে হয়তো লাগিয়ে দিতো আম্মাকে সাত-পাঁচ করে। ওকে তো আর বিশ্বাস নাই! ও যে শত্তুর! হয়তো জানলার খড়খড়ি সরিয়ে দেখে থাকবে এলার্ম-ঘড়িতে চাবি দিয়ে রেখে বাবলু ঘুমে ঢলে পড়েছে বইয়ের ওপর মাথা রেখে।

যাক্ বাবা, বাঁচা গেল। ওঘরে গিয়ে ঘুমটা তোর ঘাড় থেকে নেমেছে। রোজ রোজ বকাবকি, ওসব কি আর ভালো লাগে!

হাসিহাসি মুখে মা মাছের মুড়োটা তুলে দেন বাবলুর পাতে।

আর খেতে পাচ্ছি না, মা।

খেতে পাচ্ছি না কি রে? বেশী করে না খেলে ভালো পড়াশুনো করা যায় কখনো!

বাবলুর মনে হলো কতোকাল যেন আম্মা এমন করে আদর করেননি তাকে। বড় ভালো লাগে আজ আম্মাকে। মনে হলো আম্মা তাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন।

তবুও আসল কথাটা কোন মতেই বলতে পারলো না সে। যদি আবার চটে ওঠেন! এই একটু আগে আপার ঘরে ঢুকে যে কাণ্ডটা করে এসেছে, সেটাও ফাঁস করতে সাহস পেলো না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠে পড়লো সে। বললো ঃ আম্মা, আমি আব্বার বসার ঘরে যাচ্ছি।

বেশ, যাও—রোদে রোদে আর কোথাও ঘুরতে যেও না কিন্তু।

না, রোদে রোদে ঘুরতে গেলোও না বাবলু।

খানিক পরে বাবলু এসে উঁকি মারলো আম্মার ঘরে। আম্মা ঘুমিয়েছেন নিশ্চিন্তে। পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলো এখন সে বাড়ী থেকে। একটা ঠোঙায় করে রসগোল্লা নিয়ে এসে আব্বার পানি-খাওয়ার গ্লাসটায় ভরে যত্ন করে লুকিয়ে রাখলো আলমারীর তলায়। সেই ফাঁকে আপার একটা শাড়ী এনে রেখে দিলো আলমারীর ফাঁকে। সাবধানের মার নাই। আপা কলেজ থেকে ফিরে এলে শাড়ী যদি না পাওয়া যায় আবার!

আজও সন্ধ্যে হলো অন্য সব দিনের মতো। মায়ের পাশে ঘুরঘুর করছে বাবলু এখনো। মিছেমিছি খোঁজাখুঁজি করছে বই-খাতা। মনটা তার আজ খুশীতে ভরা। মায়ের বকা, আপার চুলটানা আর ইস্কুলে কান ধরে উঠ-বস করার হাত থেকে রেহাই পাবার একটা চমৎকার ব্যবস্থা করে ফেলছে সে। ভালোয়-ভালোয় সব কিছু চলে গেলে হয় এখন।

মনে মনে ইস্কুলের একটা চমৎকার ছবি দেখতে পাচ্ছে সে। স্যার প্রশ্ন করার আগেই জবাব দিয়ে ফেলেছে—ঠিক লাভলুর মতন। বাবা, ঠিকমতো পড়া তৈরী করতে পারলে কে আর ঠেকাতে পারে! বুদ্ধি তো তার কম নয়—লাভলুর সংগে তফাৎ কোথায় তার? সে কি আর কম জানে কিছু। বাবলু যেন তলিয়ে যায় তার নিজের মনের মধ্যে।

হঠাৎ আম্মা বলে ওঠেন, কিরে বাবলু পড়তে যাবি না আজ!

হ্যাঁ, ঠিক তো, বেশ আঁধার হয়ে আসছে। আর দেরী করা চলে না।

এই যাচ্ছি আম্মা। বলেই চট্‌পট বই খাতা নিয়ে চলে যায় সে আব্বার ঘরের দিকে।

একদম আইডিয়া মতো কাজ। নড়চড় হবার কোন উপায় নাই। আজ আর ঘড়িতে এলার্ম দিলোনা বাবলু। তার বদলে আপার শাড়ীর কোনায় রসগোল্লার থোকা বেঁধে টেবিলের ঠিক ওপরে ঝুলে-থাকা ইলেকট্রিক পাখার একটি ব্লেডের সঙ্গে বহু কষ্টে শাড়ীর একটা প্রান্ত আটকে দিলো। একদম ক্যাপিট্যাল! শাড়ীর সূতোর ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে রস ঝরে পড়তে লাগলো টপটপ করে সোজা টেবিলের ওপরে।

বাবলু এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো সেই দিকে, আর মনে মনে খাই-খাই করতে লাগলে। চমৎকার ওষুধ। ঘুম তো ঘুম, ঘুমের বাপ পর্যন্ত ভেগেছে তার চোখের ত্রিসীমানা ছেড়ে। ....পড়ার কথা ভুলে গিয়ে বাবলু মনে মনে শুধু রসগোল্লা গিলতে লাগলো।

সামনে বিরাট একটা রসগোল্লার রাজ্য। ছোট-বড়, লাল-কালো হরেক রকমের। —গাছে-পাতায় থরে থরে ঝুলছে গোলগোল হয়ে। বাঁধানো রাস্তার পাশে পাশে থাকে থাকে সাজানো। সে আর গুণে শেষ করা যায় না। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে সব দিকেই রসগোল্লা। শুধুই রসগোল্লা!

কোনোকোনোটা ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে আছে—কোনো-কোনোটা আবার মিটি-মিটি হাসছে

বাবলুকে দেখে। ব্যাপার দেখে বাবলুর একেবারে চোখ জুড়িয়ে গেল—কাকে থুয়ে কাকে ধরবে। ক্রমেই এগিয়ে চলতে লাগলো সে, সামনের আরো সামনে। কারো নরম গালটা একটু টিপে দিয়ে, কারো তেলতেলে মাথায় ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে চিট্‌চিটে হাত নিয়ে বাবলু এগিয়ে চলতে লাগলো সামনে দিকে! গাছের পাতা থেকে টুপ্ করে দু-একটা পেড়ে নিয়ে মুখেও পুরতে লাগলো মাঝে মাঝে। কারো পানে চেয়ে আবার শাসনের সুরে বললো, দেখেছো বেশী হেসেচ কি ব্যস, টপ করে মুখে পুরে দেবো।

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে দ্যাখে, বাঃ বেড়ে কাণ্ড। রসগোল্লারা সব একজোট হয়ে রীতিমতো আতশবাজী পুড়িয়ে খেলা জুড়ে দিয়েছে…হুস করে হাওয়াই উঠছে উপরের দিকে… তারপর ঐ তারার কোলে গিয়ে গুড়ুম করে ফেটে পড়ছে… শোঁ-ও-ও করে শব্দ তুলে তুবড়ীবাজী আলোর গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে…. আর রসগোল্লাদের তাই নিয়ে সে কি লুটোপুটি! হাতে হাতে সব রঙবাতি, তারাবাতি, ফুলঝুরি নিয়ে সে কি সব নাচানাচি!

বাবলু থমকে দাঁড়িয়ে গেল… অমনি সেই সব তুবড়ী আর তারাবাতির জ্বলেজ্বলে আগুনের ছিটে এসে লাগতে লাগলো তার ঘাড়ে মাথায়…আর শুরু হয়ে গেল চিট পটে জ্বালা। মাথার চুলের ফাঁকে ফাঁকে, ঘাড়ের কাঁধের চামড়ার ওপরে সে কি জ্বালা …কে যেন, কারা যেন, কামড়াচ্ছে এক ধার থেকে… চুলকানির চোটে ঘাড়ের গোস্ত ফুলে দাগড়া দাগড়া হয়ে যেতে শুরু হলো।

আমোদ করতে এসে এ-তো ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল। কিন্তু তবুও নড়বার উপায় নাই—ততোক্ষণে রসগোল্লার চিটচিটে রসে একেবারে সেঁটে গেছে বাব্‌লু!

মাথা-ঘাড়-কাঁধ সব জায়গাতে খসড়-খসড় করে চুলকাতে চুলকাতে বাবলু ভাবতে লাগলো কি করা যাবে এখন—পালাতে না-পারলে তো আর উপায় নাই, জ্বালার চোটে প্রাণ যায় যায়! কি করে, কি করে—অমনি আবার ফ্যাসাদের উপর ফ্যাসাদ বেধে গেল! একটা মোটা কেঁদো ধরনের রসগোল্লা এক গোছা জ্বলন্ত তারাবাতি নিয়ে একেবারে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লো বাবলুর ডান কানের ওপর, তারপর সেকি জ্বালা, আর সেকি টান! ইস্কুলে একটানা কানধরে বাইশ বার উঠ-বস করতেও কোনদিন তার কানে এমন টান লাগেনি।

বাবলু অস্থির হয়ে একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠলো! ওরে বাপ রে বাপ, কোথায় রসগোল্লা, কোথায় সেই আতসবাজি আর কোথায় কি! জল জ্যান্ত আপা এসে কান টেনে ধরেছে তার! বাবলু হঠাৎ ঘুম ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে দেখলো, এদিকে একাকার ব্যাপার। শাড়ীর বাঁধনের ফাঁক দিয়ে রসগোল্লার রস ঝরে ঝরে টেবিলটাকে একাকার করে ফেলেছে… আর রাজ্যের যতো লাল মাথামোটা পিঁপড়েরা দল বেঁধে এসে আক্রমণ করেছে তার মাথা, ঘাড় আর সেই ঘাড়ের নিচের কাঁধটা!

পটাস করে কানটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে তিড়িংবিড়িং নাচ শুরু করে দিলো বাবলু সারা ঘরময়! আপাও হাত চুলকোতে শুরু করে দিলো! সর্বনাশ করেছে—এ হতচ্ছাড়া বুদ্ধি কে দিলে রে তোকে। মা, মাগো দেখে যাও ব্যাপার।

আম্মা তসবির মালাটা হাতে নিয়েই ও-ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন। হায়, হায় খেয়ে শেষ করে ফেললে রে একেবারে—খোল জামা, প্যান্ট, ঝাড় মাথা-ঘাড়… কে কোথায় আছিস আয় ছুটে আয় ঝাড়ন নিয়ে—সে একেবারে হৈ হৈ হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

বাবলুর গা মাথা ঝেড়ে দেওয়ার পর আম্মা বললেন, উঃ এমনো কি দুরন্ত ছেলে হয়—দ্যাখো দেখি, কেমন দাগড়া-দাগড়া হয়ে উঠেছে…

বাবলু আরও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ....ফোঁপানিরা যেন একের পর এক হুড়হুড় করে এগিয়ে আসতে লাগলো ...ক্রমেই মাত্রাও বেড়ে উঠতে লাগলো।

আপা অমনি হাত চুলকানো বন্ধ করে খেঁকিয়ে উঠলো, দেখেছো মা, সাহেব আবার চুরি করেছে ... আমার শাড়ী, রসগোল্লা কেনার পয়সা এ-সব কোথায় পেলো ও !

আম্মা অমনি জবাব দিলেন, তুই থাম দেখি বাপু—ছেলেটা এদিকে মরে যাচ্ছে, আর তোর ঐ সব হিসেব কষা ! তোর শাসনেই তো ও এইসব আরম্ভ করেছে।

আম্মা আর একবার বাবলুর ঘাড়ের পাশটাতে হাত বুলিয়ে দিলেন।

ঠিক এই সময়ে আব্বা এসে ঘরে ঢুকলেন ঃ এ্যাঁ, এযে দেখি একাকার ব্যাপার !

অমনি আপাটা ফোড়ন কাটলো, দ্যাখো গুণধরের কাণ্ড দ্যাখো ...ঘুম তাড়ানোর আয়োজন করেছেন পয়সা চুরি করে !

তার মানে ? ব্যাপারটা হঠাৎ যেন আঁচ করে উঠতে পারলেন না আব্বা। তারপর দেখেশুনে বললেন, ঘুম তাড়ানোর জন্যে যে বুদ্ধিটা খরচ করেছ, সেটা যদি লেখাপড়ায় লাগাতিস, তাহলে তো কাজ হতো !

তা আর লাগায়নি ?—এই দ্যাখো ব্যাপার।

আপা চট্ পট তার ছোট্ট পার্সটা খুলে একটুক্‌রো কাগজ আব্বার সামনে মেলে ধরলো !

বাবলু তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছেঃ আমি চুরি করিনি আব্বা, বলে নিয়েছি ...

আব্বা পরিষ্কার চোখে দেখতে পেলেন আপার হাতে-ধরা ম্যালানো কাগজটিতে বাবলুর কাঁচা হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে ঃ

আপা, ঘুম তাড়ানোর দাওয়াই কিনবো বলে তোমার কিছু পয়সা আর শাড়ীটা নিয়ে গেলাম। আমি কিন্তু চুরি করিনি এবার।।”
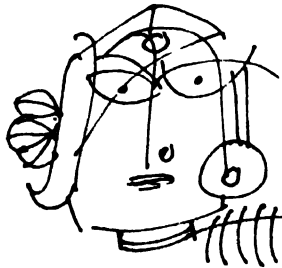
উপহার

মঞ্জিল সেন

রাজুদের ইস্কুলটা লাল-নীল-হলুদ আর বেগুনি রঙের কাগজের শেকলে আর ফুলে সাজানো হয়েছে। রাজ্যপাল আজ ওদের ইস্কুল দেখতে আসছেন, তাই যেন উৎসব পড়ে গেছে। ইস্কুলটা নিজের হাতেই সাজিয়েছে ওরা।

রাজ্যপাল আর তাঁর স্ত্রী এলেন সকাল এগারোটায়। একটা পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে সবাইকে হুঁশিয়ার করতে-করতে তাঁদের গাড়িটার আগে-আগে এল। রাজ্যপাল ঘুরে-ঘুরে ওদের ক্লাস দেখলেন, হাতের কাজ দেখলেন, ওদের সঙ্গে কথা বললেন, খুব খুশি হলেন তিনি। রাজ্যপালের স্ত্রী ওদের জন্য ঝুড়ি-বোঝাই মিঠাই এনেছিলেন, তিনি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে মিঠাই তুলে দিলেন।

তারপরে হলঘরে সভা বসল। ইস্কুলের প্রধান পরিচালক ডঃ রায়, বড়-দিদিমণি, আরও অনেকে বক্তৃতা দিলেন। সব শেষে উঠলেন রাজ্যপাল। তিনি ইস্কুলের কাজ-কর্মের খুব প্রশংসা করলেন। এখানে যেভাবে, ছেলেমেয়েদের যত্ন নেওয়া হয়, তা সত্যিই অনুকরণ করার মতো। এখানকার ছেলেমেয়েদের খুব ভাল লেগেছে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর। তারা যে শত বাধা সত্ত্বেও হতাশ হয়ে পড়েনি, নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, তা থেকে অন্যদেরও শিক্ষা নেওয়া উচিত, এ-কথা বললেন। ইস্কুল আরও যাতে সরকারি সাহায্য পায়, তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি নিজে এক হাজার টাকার একটা চেক্ দিলেন ইস্কুলের জন্য।

খুব হাততালি পড়ল। এবার বড়-দিদিমণি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রাজ্যপালকে কিছু উপহার দিতে চাও তবে এগিয়ে এসো।"

ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কেউ দিল নিজের হাতে তৈরি প্লাস্টিকের ফুল, কেউ দিল মাটির পুতুল, কেউ আবার দিল কাগজের খেলনা।

সবার শেষে উঠে দাঁড়াল রাজু। উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে চলল ও। অতটা হাঁটতে ওর কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু সে-কষ্ট যেন কিছুই নয়।

একজন তরুণ ডাক্তার আমেরিকা থেকে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে ইস্কুলটা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ছোটদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যাপারে বিদেশ থেকে পাশ করে এসেছেন। এমন একটা ইস্কুল ওঁরা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে চিকিৎসা আর লেখাপড়া দুটোই চলবে পাশাপাশি।

আসলে জন্ম থেকে যাদের শরীরের হাড় বা অস্থিতে খুঁত রয়ে গেছে বা খুব ছোট বয়সে কঠিন অসুখ যাদের শরীর জখম করে গেছে, তারাই শুধু এই ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। যেমন রাজুর ছেলেবেলা থেকেই ঘাড় সোজা হত না, মেরুদণ্ডে জোর ছিল না, তাই ও হাঁটতে পারত না। এখানে ওর ঘাড়ে চামড়ার একটা বন্ধনী পরিয়ে সেটা কোমরে আরেকটা চামড়ার চওড়া ফিতের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। মেরুদণ্ড সোজা করার জন্য ও-দুটোর সঙ্গে আবার আটকানো আছে অ্যালুমিনিয়মের স্টিক। ওকে এক পা, দু' পা করে হাঁটতে শেখানো হয়েছে। এখন ও নিজেই

ক্রাচ্ নিয়ে অল্প-অল্প হাঁটতে পারে।

ওই ইস্কুলের কাছেই ফুটপাথে একটি দশ-বারো বছরের ছেলে ভিক্ষে করত, বাচ্চা বয়সে পোলিও হয়েছিল, হাঁটতে পারত না। ওর মা-বাবা খুব গরিব। একদিন ছেলেটি ওর সারা দিনের রোজগার তুলে দিতে এসেছিল ডাক্তারবাবুর বউ অর্থাৎ বড়-দিদিমণির হাতে। দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে প্রায় টেনে এনে ইস্কুলের গেটের কাছে অপেক্ষা করছিল ও। অনেকদিন ধরে ও দেখছে ইস্কুলের কাণ্ড-কারখানা, বড় দিদিমণি কখন আসেন তা ওর মুখস্থ। ওর ইচ্ছের কথা শুনে বড়-দিদিমণির দু' চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল, তিনি ওর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করেছিলেন, তারপর ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। ওর কোনো টাকা-পয়সা লাগেনি।

ইস্কুলটার একটু নাম হতেই সরকারি সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল, অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্যের ঝুলি নিয়ে। ক্রমে আরও ডাক্তার এলেন, সেবিকা এলেন, ছোটদের লেখাপড়ার বিভাগও বাড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। এখন একটা বড় বাড়ি নিয়ে ইস্কুল। আগের ছোট বাড়িটা এখন ইস্কুলের আপিস।

লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মে ছেলেমেয়েদের চিকিৎসার এমন সুবন্দোবস্ত দেশে খুব কম আছে, তাই প্রতিবন্ধী-বছরে এই ইস্কুলটা সারা ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া দেশ-বিদেশের কাগজেও এই ইস্কুলের কথা বেরিয়েছে, ছবিও ছাপা হয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা, আন্তর্জাতিক সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছেন ডঃ অনুপম রায়, যিনি আরম্ভ করেছিলেন এই ইস্কুলটা। এই সব ছেলেমেয়েদের সুচিকিৎসার জন্য দরকার দামি-দামি যন্ত্রপাতি, তার জন্য চাই অনেক টাকা। এতদিনে ডঃ রায়ের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

রাজুর মতো এখানে আরও সব ছেলে-মেয়েদের হাঁটতে শেখা, ইলেকট্রিক ট্রিটমেণ্ট, মাংসপেশীর নানারকম চিকিৎসা ছাড়াও ঠিকমতো কথা বলা, বুদ্ধির খেলা, নানাভাবে লেখাপড়া শেখার ক্লাস করতে হয়।

প্রতিবন্ধী বলে ওদের বুদ্ধি কম এ-কথা কিন্তু সত্যি নয়, বরং ওদের বয়সের অনেকের চাইতেই ওদের অনুভূতি বোধহয় বেশি। রাজুর যখন পাঁচ-ছ বছর বয়স, তখন ও একদিন ওর দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "দিদি, মা-বাবা মরে গেলে আমার কী হবে ?"

ওই বয়সেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা হয়েছিল ওর। তখনও কিন্তু এই ইস্কুলে ভর্তি হয়নি ও। তখন ও ঘাড় সোজা করতে পারত না, দাঁড়াতে পারত না, কথা ছিল জড়ানো, মুখ দিয়ে লালা গড়াত। আজ ও ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে পারে, মেরুদণ্ডে একটু-একটু করে জোর পাচ্ছে, কথাও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ওর বয়স এখন তেরো।

ওর হাত দুটো কিন্তু বেশ শক্ত, আর শক্ত ওর মন। কারিগরি কাজ শিখে ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এমন একটা মনোবল গড়ে উঠেছে ওর মধ্যে। এই ইস্কুলেই লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে নানারকম হাতের কাজ শেখানো হয়, আলাদা-আলাদা সব বিভাগ।

একটা কথা বলা হয়নি, রাজু কিন্তু ইস্কুলের সেরা ছেলে। লেখাপড়া, হাতের কাজ, সব কিছুতেই সেরা। কিছুদিন আগে টেলিভিশন থেকে ওদের ইস্কুলের ছবি তুলতে এসেছিল, তখন আলাদা করে ওর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। বাড়িতে টেলিভিশনের পর্দায় সেই ছবি দেখে ওর কী আনন্দ ! ওর মা-বাবাও খুব খুশি হয়েছিলেন।

ইস্কুলে সবচেয়ে রাজুর যা ভাল লাগে তা হল শনিবার গল্পের ক্লাস। হলঘরে সবাই জড়ো হয়, তারপর বড়-দিদিমণি দেশ-বিদেশের সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন। সে-সব গল্প শুনতে-শুনতে নানান দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওদের যেন ভাব হয়ে যায়। বরফে ঢাকা পাহাড়ি উপত্যক

বেয়ে সাদা ভালুকের আসা-যাওয়া, নেকড়ে বাঘের গল্প, রূপকথার গল্প, কতরকম গল্প! বিদেশের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা কেমন করে বড় হয়েছে, নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছে, সেসব কাহিনী শুনতে শুনতে জ্বল্‌জ্বল্ করে রাজুর চোখ। ওকেও একদিন ওদের মতো বড় হতে হবে।

বড়-বড় হরফে ওদের ইস্কুলের কথা কাগজে ছাপা হতেই রাজ্যপাল খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন, ইস্কুলটা দেখবেন বলে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাই আজ এই অনুষ্ঠান।

রাজ্যপাল আসার কয়েকদিন আগে থেকেই রাজুর যেন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। বড়-দিদিমণি বলেছেন, রাজ্যপালকে কেউ যদি কিছু উপহার দিতে চায়, দিতে পারে। মনে-মনে ও ঠিক করেছে রাজ্যপালকে একটা উপহার দেবে।

* * *

রাজু এগিয়ে চলেছে। ওর বাঁ কাঁধে ঝুলছে একটা সুন্দর কাপড়ের থলি। রাজ্যপালের সামনে গিয়ে ও দাঁড়াল, তারপর ডান হাতের ক্রাচ্‌টা টেবিলে হেলান দিয়ে রেখে থলি থেকে বার করল একটা ছবি। নিজের হাতে ও এঁকেছে।

একটি কিশোরের ছবি। ছেলেটি বাঁ বগলে একটা ক্রাচ্, ডান হাত মুঠো করে ওপরে তোলা, কচি মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সমস্ত ছবিটার মধ্যেই ফুটে উঠেছে একটা নির্ভীক, বলিষ্ঠ ভঙ্গি। যেন সারা দুনিয়ার লোককে ও বলতে চাইছে, 'আমি হার মানব না।'

ছবির তলায় ইংরেজিতে স্পষ্ট করে লেখা, 'হোপ্'।

রাজ্যপাল কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছবিটার দিকে. তারপর শুধু ছবিটাই নিলেন না, হাত বাড়িয়ে রাজুকে বুকে টেনে নিলেন।

হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল হল্‌ঘরটা।
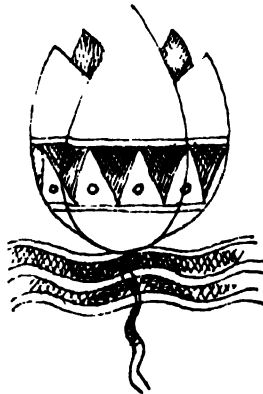
একঠোঙা ভাত

আতোয়ার রহমান

এমনভাবে আব্বার সামনে পড়ে যাবে, ও ভাবতেও পারেনি।

আব্বা যে বাড়ীতেই আছেন, খুঁজে টুঁজে না দেখলে এতোক্ষণ তা কারো বোঝবারও উপায় ছিলো না। অথচ আব্বাজির মতো ছেলেটির কথা ভাবতে ভাবতে ও বারান্দায় গা দিতেই উঠোনে তাঁর আবির্ভাব! যেন আকাশ ফুঁড়ে। আর, তারপরই তাঁর গম্ভীর গলার হাঁক, এই শাকির, অবেলায় কোথায় বেরুচ্ছিস?

শাকির থতমত খেয়ে গিয়ে খবরের কাগজে মোড়া ভাতের ঠোঙাটা বগলে আরো চেপে ধরলো, জী না, কোথাও যাচ্ছিনে। ইয়ে—এমনিই—

—তাহলে জামা গায়ে কেন?

তার মানে, বেরুনো দূরে থাক, এখন কৈফিয়ত দিয়ে মরতে হবে। কিন্তু—শাকির মনে মনে নিজের উপস্থিত বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিলো,—হঠাৎ একটা লাগসই জবাব মুখে এসে গেছে, শীত-শীত লাগছে, আব্বা।

আব্বা কিন্তু ওর উপস্থিত বুদ্ধির খবরও রাখেন না, ধারও ধারেন না,—বগলে ওটা কি?

অর্থাৎ আঁঠি ভেঙে শাঁস না নিলে তাঁর আর চলছে না। ক্লাস এইটে পড়া ছেলেকেও তাঁর অবিশ্বাস! তবে, শাকির এবারও উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেল, ঘরে কিছু আবর্জনা জমেছিলো। কাগজে জড়িয়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম।

জেরা ছেড়ে আব্বা, এবার হুকুম দিলেন, ওগুলো ফেলে এসে হারিকেন দুটো মুছে নাও।

শাকির এখন অতি বাধ্য, জী আচ্ছা, আব্বা।

তারপর আব্বা গেলেন এক দিকে, ও গেল আর এক দিকে।

ওর 'আর এক দিকে' যাওয়া মানে অবশ্যই বাইরে যাওয়া। কিন্তু সেটা শুধু ভান। আঙিনা

থেকে একটুখানি ঘুরে এসে সবাইকে দেখালো, ও সত্যিই অবর্জনা ফেলতে গিয়েছিলো।

ঠোঙাটা অবশ্যি ওকে জামার তলায় লুকিয়ে ফিরিয়ে আনতে হল। আর, তারপর আবার টেবিলের দেরাজে লুকিয়ে রাখতে।

কিন্তু দেরাজ বন্ধ করতেই ছেলেটির মুখখানা আরো স্পষ্ট হয়ে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আরো করুণ দৃষ্টি নিয়ে। শাকির যখন কদমতলা থেকে চলে আসে, ছেলেটি তখন একবার বাবার, একবার মায়ের, একবার ওর দিকে তাকাচ্ছিলো। এখন ওর মনে হয়, ছেলেটি যেন শুধু ওর দিকেই চেয়ে আছে।

এই নিয়ে তিনবার ওর প্ল্যান ভেস্তে গেল। ঘণ্টা দেড়েকেরও কম সময়ের মধ্যে। একবার অসময়ে মায়ের উঠোন ঝাঁট দেওয়ার উৎসাহে, একবার ছোটো ভাইটি অকারণ লাফ-ঝাঁপের সময় পড়ে গিয়ে কাঁদতে শুরু করায়, শেষ বারে আব্বার আকাশ-ফোঁড়া আবির্ভাবে। এদিকে, আশ্বিন মাসের ছোট্টো দিনটা আর একটু পরেই ফুরিয়ে যাবে। না, একটু পরে কেন, এখনই তো চারদিকে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কালচে ছায়া নামতে শুরু করেছে। আর কি আব্বা বাড়ীর বাইরে পা ফেলতে দেবেন?

অথচ কদমতলায় একবার ওর না গেলেই নয়। ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় সেখানে ও যা দেখে এসেছে, তারপর আর এইভাবে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। এতো বসে থাকা নয়, রীতিমতো আটকে পড়া। এর থেকে বাবা-মার কাছে সব কথা খুলে বলাও হয়তো ভালো ছিলো। বিশেষ করে এই জন্মে যে, ও লোকটিকে কথা দিয়ে এসেছে। তার ছেলেটিকে বাঁচানোর জন্যে। এদিকে, লুকিয়ে রাখা ভাতগুলোও হয়তো এতোক্ষণ ঠোঙায় থেকে পচতে শুরু করেছে।

তা—ভাতের আর দোষ কী? একে দুপুরে রাঁধা। তার ওপর, সেলোফেনের ঠোঙায় বন্দী হয়ে রয়েছে সেই সাড়ে চারটে থেকে। এ-ভাত যদি না পচে তো পচবেটা কে? শাকির?

হ্যাঁ, ওরই পচা উচিত। হঠাৎ ভীষণ রেগে গিয়ে ও ভাবলো, ও নিজে ছাড়া আর কে পচবে? আসলে দোষটা তো ওরই। কী দরকার ছিলো ওর ভালো মানুষ সাজতে যাওয়ার?এ যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো ব্যাপার। না, তার চেয়েও বেশী, তার থেকেও খারাপ। ওর তো আর বুঝতে বাকী নেই যে, ওদের অবস্থাও এখন ভালো যাচ্ছে না। আব্বা আজকাল বাজার-টাজারের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই খিটমিট করেন। শাকিররা দু'ভাই দরকারী কিছু চাইলেও সহজে পায় না। মার হাত আগে ছিলো রীতিমতো দরাজ। কিন্তু এখন নেহাৎ কানা-খোঁড়া ছাড়া আর কাউকে ভিক্ষে দিতে তিনি রাজী নন। এ-অবস্থায় শাকিরকে কেউ বলে না দিলেও চলে, বাইরের কারো জন্যে ভাত চাইলে ও পাবে না। তবু কেন ও এমন কাণ্ড করতে গিয়েছিলো?

কিন্তু রাগের মধ্যেও আবার ওর সেই ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। কী করুণ তার মুখখানা! আহা, ওর পথ চেয়ে বসে থাকতে থাকতে এখন হয়তো আরো নেতিয়ে পড়েছে! আর, তার বাবা-মা নিশ্চয়ই শাকিরকে ধাপ্পাবাজ ভেবে গালাগালি দিচ্ছে।

কথাটা ভাবতেই শাকিরের মনটা যেন চুপসে গেল। উপোসী বাচ্চা ও আগেও দেখেছে। কিন্তু এমনটি আর কখনো চোখে পড়েনি। কতোই বা বয়েস? বড়ো জোর বছর তিনেক। কিন্তু এরই মধ্যে চেহারা বুড়োটে হয়ে গেছে।

শাকির যখন তাকে প্রথম দেখে, সে তখন একটা মেয়েছেলের হাঁটুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে ছিলো। পাশে একটা গালভাঙা, হাড্ডিসার লোক। শাকিরের বুঝতে কষ্ট হয়নি, মেয়েছেলেটি ওই লোকটির বউ, আর বাচ্চাটা তাদেরই। পথে ঘাটে এরকম লোকজন শাকির বেশ কিছু দিন

যাবৎই দেখছে। বিশেষ করে, বন্যার পর থেকে। এবারের বন্যায় দেশের একটি জেলা ছাড়া আর সব এলাকাই ডুবে গিয়েছিলো। তখন থেকেই চারদিকে এই রকম মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো পানিতে, কখনো ডাঙায়। তাদের খাবার চাই, কাজ চাই। তারা তাই চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। অথচ ওই লোকটা ছিলো। তার বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে। সেই জন্যেই শাকির একটু অবাক হয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু—হারিকেন নিয়ে বসতেই শাকিরের আবার মনে হয়,—না যাওয়াই ভালো ছিলো। হারিকেন দুটি তো রোজই ও-ই পরিষ্কার করে। তবু দেখা যাচ্ছে, চিমনি আর খোলের গায়ে ময়লার চর পড়ে আছে। এ ময়লা তুলতে নির্ঘাৎ ঝাড়া আধ ঘন্টা লেগে যাবে। ততোক্ষণে সন্ধ্যে পার হয়ে নিষুতি রাত। এরই মধ্যে মা আর আব্বার মাগরেরের ওজুর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মানে কিনা—বেরুনো আজ ওর হয়ে গেছে। ও শুধু শুধু উপোস দিয়ে মরছে।

না, শুধু উপোস কেন? এই বেরুনোর জন্যে ওকে আজ দেড় ঘন্টার মধ্যেই এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে। সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা অভিনয় করতেও। যেমন, কিছুক্ষণ আগে

আব্বার সামনে। আর, তার আগে মায়ের কাছেও।

ইস্কুল থেকে ফিরে ভাত খাওয়াই ওর অভ্যেস। মা তাই দুপুরের রান্না থেকে ওর জন্যে কিছু ভাত-তরকারি রেখে দেন। আজ কিন্তু ও কদমতলার লোকটির কথা শোনার পরই ঠিক করে ফেলেছিলো, বিকেলে কিছু খাবে না, ভাতগুলো ছেলেটিকে খাওয়াবে।

কিন্তু সরাসরি তার জন্যে ভাত চাইলে মা বাধা দিতে পারেন। ছেলেটির কথা শোনার পর থেকেই ওর বুকখানা ধড়ফড় করছিলো। তার ওপর, ও প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাড়ী ফেরে। তার ফলে এসেছিলো অন্যান্য দিনের বিকেলের থেকে কিছু বেশী ক্লান্তি। সেসবের সুযোগ নিয়ে ও মাকে বলে, শরীরটা ভালো লাগছে না। তুমি আমার পড়ার টেবিলেই খাবার দাও, মা।

ওর কথা শুনে মা গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, জ্বরটর আসেনি তো রে ? সময়টা খারাপ। না, চাপা সর্দিও হতে পারে। গা তো ঠাণ্ডাই দেখছি।

ও এবার সত্যি কথাই বলেছিলো, বেশী নড়তে চড়তে ইচ্ছে করছে না।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। হাত-মুখ ধুয়ে নে।

ভাত-তরকারি টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে মা অন্য কাজে চলে গিয়েছিলেন। আর, সেই ফাঁকে শাকির কাঁপা-কাঁপা হাতে ভাতগুলো কিছু তরকারি শুদ্ধ পুরোনো একটা সেলোফেনের ঠোঙায় ঢুকিয়ে ফেলে। তারপর দেরাজে লুকিয়ে রাখে।

ওর খেয়াল ছিলো না, কাজটা সারতে ও বেশী সময় নেয়নি। খেতে ওর যতোক্ষণ লাগে, তার অর্ধেক সময়ের মধ্যেই হাত ধুতে বেরিয়ে আসে। তারপব মার কাছে ধরা পড়ে যায় আর কি ! মা বাসন তুলতে এসে বললেন, কি বে, এতো শীগগীর খাওয়া হয়ে গেল ?

—ভীষণ ক্ষিধে লেগেছিলো, মা।

—তাই বলে মাছের কাঁটা, বেগুনের খোসাও খেয়ে ফেলবি নাকি ?

কথাটা শুনতেই শাকিরের বুকখানা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। ব্যস্ততার মধ্যে কাঁটা আর খোসা বাছবার কথা ওর মনেই ছিলো না। মাথা নীচু করে মুখ ধুতে ধুতে ও তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, কচু ! অতো শতো বুঝিনে বাপু। ক্ষিধেয় বাঁচিনে। কাঁটা বাছবার সময় কোথায় ? চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছি।

রক্ষা, মা ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করেননি।

তাই বলে শাকিরের ভাবনা মেটেনি। মার কাছে ধরা পড়বার ভয় গেছে, কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকেছে কদমতলায় যাওয়ার ভাবনা। যার জন্যে ভাতগুলো লুকিয়ে রাখা। এখন যতো তাড়াতাড়ি বেরুনো যায়, ততোই ভালো।

এমনিতে বেরতে অবশ্যি তেমন বাধা নেই। কিন্তু পেটফোলা ঠোঙাটার কি হবে ? ওটা হাতে নিয়ে তো আর সবার সামনে দিয়ে বেরুনো চলে না। বিশেষ করে, মায়ের কাছে আসল ব্যাপারটা লুকোনোর পর। ঠোঙাই শেষ পর্যন্ত ওকে ডোবাবে দেখা যাচ্ছে। যেমন একটু আগেই আব্বার সামনে ডোবাতে বসেছিলো। এখন ফেলে দেওয়ার উপায় নেই।

আর, ফেলে ও দেবেই বা কেন ? লোকটি যে এই ভাতগুলোর আশাতেই ওর পথ চেয়ে বসে আছে। তাছাড়া, ও কথা দিয়ে এসেছে। একটা বিরাট কাজের ভার নিয়ে। সুতরাং বেরুতে ওকে হবেই। এখনই।

হারিকেন দুটি ধরিয়ে একটা আব্বার ঘরে দিয়ে, একটা নিজের টেবিলে নিয়ে ও ভাবতে বসলো। টেবিলে মাথা গুঁজে। হ্যাঁ, আর দেরী নয়। বেরুনোর একটা পথ এখনই চাই। ও কথা দিয়ে এসেছে। একটা বড়ো কাজের ভার নিয়েও। আর, লোকটির ভাতের বড়ো দরকার। তার

চেয়েও বেশী ছেলেটার। আসলে তার জন্যেই তো ওর এতো কাণ্ড করা।

শাকির তাদের দেখে প্রথমে ভেবেছিলো, তারা কোথাও যাওয়ার পথে কদমতলায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। সেই জন্যেই ও লোকটিকে জিজ্ঞেস ক'রে, আপনারা কোথায় যাবেন, চাচা ?

লোকটি একবার ওর দিকে চেয়েই মুখখানা নামিয়ে নিয়েছিলো, কই আর যামু, বাজান ?

শাকির আবার বলেছিলো, মানে—আপনারা বোধ হয় এদিকের লোক নন। তাই ভাবছিলাম,—এখানে বসে—

—এখানে বইয়া আছি একটা মাইন্‌ষের লাইগ্যা।

—আপনাদের চেনাজানা কেউ বুঝি ?

লোকটি এবার মুহূর্ত কয়েকের জন্যে নীরব। তারপর অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে যা বললো, তাতে শাকির হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো, না, চেনাজানা ঠিক না। একটা দালাল। আমার পোলাডারে কিনবার চায়। আমাগো এখানে বহাইয়া রাইখ্যা ট্যাকা আনতে গ্যাছে।

শাকির প্রায় চীৎকার করে উঠলো, আপনারা ছেলে বেচবেন ?

—না বেইচা উপায় কি, বাজান ? আইজ দশ-বারো দিন শাকপাতা ছাড়া আর কিছুই খাইতে পাই নাই। আমরা দুইজনা না অয় তাতে কোনো রকমে—কিন্তু পোলাডা—

শাকির আবার বললো, তার জন্যে আপনারা ছেলে বেচবেন ?

— লোকটা কয়, এক বড়ো মাইন্‌ষের লাইগ্যা কিন্যা নিয়া যাইতাছে। অন্ততঃ দুইডা খাইতে পাইবো।

ছেলেটা হঠাৎ উঠে বসে একবার বাবার, একবার মায়ের, একবার শাকিরের দিকে তাকাতে লাগলো। তার মা চোখ মুছছে।

শাকিরের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথা ফুটলো না।

তারপর ও বলে ফেললো, আচ্ছা, চাচা, খাবারের জন্যেই যখন এতো, তখন একটু সবুর করুন না। আমি আপনার জন্যে কিছু খাবার এনে দিচ্ছি। তারপর ইস্কুলের ছেলেরা মিলে গ্রামের মধ্যে বলে-টলে দেখি। হয়তো অন্য ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

লোকটি সেকথার জবাব না দিয়ে ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো, তুমি খাইতে দিবা, বাজান ? আল্লা তোমারে বাঁচাইয়া রাখুক। আমরা দোয়া করি।

শাকির ব্যস্ত গলায় বলে উঠলো, না, না দোয়া করতে হবে না। আমি একটু পরেই আসছি।

ও আর দাঁড়ায়নি, প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ী চলে এসেছে। পেছন থেকে শুধু শুনেছিলো, ছেলেটি কাঁদছে, মা, বাত খামু।

এমন কথার পর আর বসে থাকা যায় না। বিশেষ করে, ভাত হাতে আসার পর। বেরুতে ওকে হবেই। আর, এখনই। যেমন করে পারা যায়।

তারপর—যেন সত্যি সত্যিই এখনই বেরুচ্ছে,—চেয়ার ছেড়ে ও তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো।

তবু ভাবনা ওকে ছাড়ে না। বেরুবো বললেই কি বেরুনো যায় ? তাহলে আর এতোক্ষণ ও কী দেখছে ?

তা—যাই ও দেখুক না কেন, উপায় একটা চাই-ই চাই। ও তাই আবার উপায় ভাবতে বসলো। বুকখানা ওর এখন ভয়ে রীতিমতো টিপটিপ করছে। সেই দালালটা যদি এর মধ্যে এসে পড়ে থাকে ?

নামাজ সেরে আব্বা তসবিহ নিয়ে বসেছেন। তাঁর যেন ওঠার নাম নেই। কিন্তু শাকির আবার উঠে দাঁড়ালো। এই-ই ওর শেষ চেষ্টা। এবার যা হয়, হয়ে যাক। ও জামাটা পরে ফেললো। সেই ভাত লুকোনোর সময়কার মতো কাঁপা-কাঁপা হাতে। তারপর বারান্দার আবছা অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়ে রইলো। খবরের কাগজে মোড়া ঠোঙাটা সাবধানে জামার তলায় লুকিয়ে।

আব্বা জায়নামাজ ছেড়ে উঠলেন যেন একবছর পর।

সঙ্গে সঙ্গে শাকির তাঁর উদ্দেশে বললো, আব্বা একটু বাইরে যাচ্ছি। নঈমদের ওখানে। খুব দরকার। ও একটা নতুন ধরনের অঙ্ক দেখিয়ে দেবে, বলেছিলো। কাল ক্লাসে ওগুলো লাগতে পারে।

আব্বা প্রায় ধমক ছাড়লেন, তাহলে সন্ধ্যার আগে মনে ছিলো না কেন ?

—ও বলেছিলো, বিকেলে বাড়ী থাকবে না।

তারপর ও আব্বার উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা করলো না, প্রায় লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ে বাইরের দিকে ছুট দিলো। আব্বা এখন যা ইচ্ছে ভাবুন। পরে সব কথা শুনলে ওকে নিশ্চয়ই কিছু বলবেন না।

কিন্তু পরের কথা পরে। এখন ওর আরো একটু ভাবনা বাকী আছে। কদমগাছটা পূব দিকে, কিন্তু নঈমদের বাড়ী দক্ষিণে। তবু এখন ওকে দক্ষিণেই যেতে হবে। তারপর একটা ছোট্টো ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে কদমতলার দিকে। নঈমকে একবার দেখা দিয়ে না গেলে বিপদ হতে পারে। পথে কখন কার সামনে পড়ে যায়, কে জানে! ওর তো সবাই মুরুব্বি,—সব ছোটোদেরই। সামনে পড়া মুরুব্বিটি হয়তো কাল সকালেই আব্বার কাছে এসে এক গাল হেসে বলবেন, আপনার ছেলেকে অন্ধকারে কদমতলার দিকে যেতে দেখলাম।

না, কাউকে ও তেমন সুযোগ দিতে চায় না। নঈমদের বাড়ী প্রায় আধ মাইল। তবু ও দৌড়তে শুরু করলো। দালালটাকে ওর ঠেকাতেই হবে। পারলে নঈমকে সাথে নিয়ে গিয়ে। নঈম ওর বড়ো বন্ধু।

কিন্তু নঈম বাড়ী নেই। ইস্কুল থেকে ফিরে পাশের গ্রামে গিয়েছিলো, এখনো ফেরেনি।

তা—না ফিরে থাকে তো না-ই ফিরলো। তার কাছে তো আসল দরকার নয়। শাকির হাঁপাতে হাঁপাতেই ফিরে দাঁড়ালো।

নঈমের আব্বা বাধা দিতে চাইলেন, কি হয়েছে, বাবা ? তুমি হাঁপাচ্ছো কেন ?

এসো, একটু বসো। নঈম হয়তো এখনই এসে পড়বে।

—না, থাক।

বলেই আবার ও হন হন করে ছুটতে লাগলো। নিজের বাবার কথার জন্যেই ও বসে থাকেনি। নঈমের বাবার জন্যে ভাবনা কি ? আসলে ভাবনা তো এখন ওর শুধু দালালটার। সে যদি এর মধ্যে এসে পড়ে থাকে ? আর, লোকটাই কি এখনো ওর জন্যে বসে আছে ?

তা অবশ্যি আছে। শাকির একটু পরেই দেখতে পেলো। নিজের চোখেই, একেবারে পষ্টো। যদিও কদমতলাটা বেশ অন্ধকার। তারা শুয়ে রয়েছে।

শাকিরের দম আটকে আসছে। তবু ও কাছে গিয়েই ঠোঙাটা বার করে ডাক দিলো, চাচা।

লোকটি মাথাটা একটুখানি উঁচু করে ক্ষীণ গলায় বললো, কেডা ?

—আমি, চাচা। সেই যে—খাবার আনবো, বলে গিয়েছিলাম। এনেছি। শীগগীর উঠুন।

আপনার ছেলেকে খেতে দিন।

লোকটি উঠে বসলো, বাত আনছো, বাজান? কিন্তুক—পোলা তো নাই।

শাকির যেন আর্তনাদ করে উঠলো, নেই! কোথায় গেল?

—হ্যারে তো হেই বৈকালেই দালালে নিয়া গ্যাছে।

—কেড়ে নিয়ে গেছে বুঝি?

—না, কাইরা নিবো ক্যান? আমরা তো তারে জবানই দিছিলাম।

শাকির কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপর হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লো, ছেলে যদি বেচবেনই তাহলে তখন আমাকে এতো কথা বলেছিলেন কেন?

ইতিমধ্যে ছেলেটির মাও উঠে বসেছে। শাকিরের কথার জবাব সে-ই দিলো, বাজান, এব মাস লঙ্গরখানায় খাইলাম। তাও কোনো কিচ্ছু পাই নাই, গরবাড়ীর উপায় অয় নাই। এক বেলার বাত দিয়া তুমি আর কি করবা, বাজান? আমাগো—

লোকটি তাকে থামিয়ে দিলো, থাউক। পোলা মানুষ। অরে আর এতো কথা কইয়া কি অইবো! তার থিকা বাজান বাত আনছে, খাইয়া লও। দালাল যে বাত দিছিলো, তা তো কখন হজম অইয়া গ্যাছে! দশদিন পব খাওন।

সে এবার ঝুঁকে পড়ে ঠোঙা খুলে ভাতগুলো দেখতে লাগলো।

আর, শাকিরের হঠাৎ চোখ ফেটে কান্না এলো। ও এখন এদের কি বলবে? ওর একটা লাগসই, মোক্ষম জবাব চাই। অথচ তা কিছুতেই মুখে আসছে না। সে-জবাব ওকে কে যুগিয়ে দেবে?
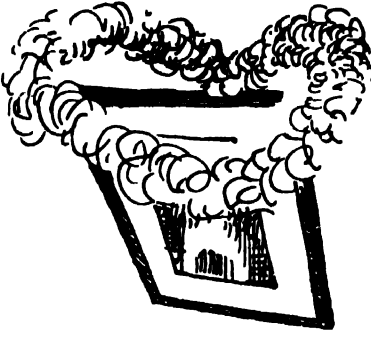
ছবি-বিভ্রাট

আনিস চৌধুরী

এতক্ষণ প্ল্যাটফর্মে এক সঙ্গেই ছিল মনি। রাতের ট্রেন। অসম্ভব ঠ্যালাঠেলি আর ভিড়। একেবারে চোখে চোখে রাখা সম্ভব হয়নি। পেয়ারা কেনার লোভে ফেরিওয়ালার পেছন পেছন গিয়েছিল। সে আর নতুন কি! বরাবরই মনি একটু হুজুগে ছেলে। এটা সেটা দেখলেই কেনার বাতিক। তা হক। সবাই জানে কাজের সময় সে ঠিক ঠিক হাজির। মনি যে কাঁটায় কাঁটায় ট্রেনের কামরায় উঠে বসবে, তাতে কারও সন্দেহ ছিলনা।

অথচ কাণ্ডটা সেদিনই ঘটল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

কিন্তু মনির পাত্তা নেই।

বরকত সাহেব একবার চেন টানার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু জিনিসপত্রের ভিড়ে কোথায় চেন আর কোথায় কি। আর টেনেই বা কি লাভ। যদি অন্য কোন কামরায় উঠে থাকে। বরং পরের স্টেশনে নেবে খোঁজ করলেই চলবে। মনির মা-ত প্রায় কান্নাই জুড়ে দিলেন। অনেক করে বোঝালেন বরকত সাহেব, অমন কাঁচা ছেলে নয়। সত্যি সত্যি যদি ট্রেনটা ফেল করে থাকে, পরের ট্রেনে ঠিকই ফিরবে। দুর্ভাবনার কিছু নেই।

একে একে সবাই নাবল ট্রেন থেকে। মনির পাত্তা নেই। নিজে ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে তার পাঠালেন বরকত সাহেব। আর খোঁজাখুঁজিও কম হলনা। কেউ কেউ বলল, এ ভাবে আর হবে না। বরং কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন। পুরস্কার ঘোষণা করুন।

বরকত সাহেব মনস্থির করতে পারেন না। কাগজে তাহলে একটা ছবি ছাপতে হয়। আর বাড়িতে মনির একটাই ছবি। ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে। রাগ করেই ছেঁড়া গেঞ্জি পরে ছবি তুলেছিল ওর শখের লাল জামাটা শুকোয়নি বলে। কাগজে যদি ওরকম একটা ছবি ছাপান হয় সবাই বলবে, দেখ দেখ বাপটা কি কিপ্‌টে। ছেলেকে ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়ে রাখে। দশজন দশ কথা শোনাবে।

দেখতে দেখতে সাতদিন কেটে যায়। কোন খবর নেই। বাধ্য হয়ে ঐ ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ের

ছবিটাই ছাপিয়ে দিতে হল কাগজের নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপনে। ফিরে আসার জন্য মনিকে অনুরোধ জানানো হল।

কিছুই ভাল লাগেনা বরকত সাহেবের। আহারে রুচি নেই। লোকজন খোঁজ খবরদারি করতে আসে। পাড়াপড়শিরা নানা পরামর্শ দেয়। কেউ কেউ বিচিত্র সব কাহিনী শোনায়।

পাড়ার বড় মুদির দোকানের মালিক রজব আলী আসে। তার এক চোখ কানা। তবু লাঠি ঠুকে ঠুকে সে ঠিক হাজির।

বরকত সাহেব ভেবেছিলেন বোধ হয় কোন পাওনার তাগিদেই এসেছে লোকটা।

রজব আলী হেসে বলে, না না সে জন্যে আসিনি।

তবে ?

ফিস্‌ফিসে গলায় বলে রজব আলী, আমার মনে হয় আমি মনিকে দেখেছি।

লাফিয়ে ওঠেন বরকত সাহেব, দেখেছ মানে। কোথায়, কবে দেখেছ ?

রজব আলী বলে, আমি সিঁড়ি দিয়ে নাবছিলাম কাল সন্ধ্যায়। এমন সময় একটা ছায়া ছায়া অন্ধকার দেখলাম।

কেমন করে জান সেটা মনির ছায়া ?

ছায়াটা ওর মতই বেঁটেখাটো ছিল, সগৌরবে জানিয়ে দেয় রজব আলী।

বরকত সাহেব সন্তুষ্ট হন না। বলেন, আসল লোকত আর দেখনি। শুধু ছায়া দেখেছ।

রজব আলীর যে এক চোখ খারাপ, ভাল করে দেখতে পায়না, সে কথাটাই জানিয়ে দিয়ে বলে, আমি ওরকমই দেখি। ছায়া দেখেই লোক চিনে ফেলি। আর লোকই কেন, ছায়া দেখে দিব্যি বলে দিতে পারি কোনটা সজনে গাছ, কোনটা তেঁতুল আর কোনটা বট গাছ।

বরকত সাহেব বলেন, না না এ খবর কোন কাজে আসবে না।

আরও লোকজন ছিল সেদিন। ছিল কাগজের হকার ভোলা, স্কুলের বাংলা টিচার রকীবুদ্দিন সাইকেল দোকানের মিস্ত্রী কালু শেখ। তারা সমস্বরে রজব আলীকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ওরকম ছায়ার কথা শুনে কি হবে। চেহারাটা কাল না ফরসা, চুলটা সোজা না বাঁকা সিঁথি করা, গায়ের জামায় চারটে না ছটা বোতাম এসব না বললে কি করে বোঝা যাবে ?

রজব আলী একটু চিন্তা করে বলে, আমাদের মনি ত বেশ ফর্সা। ছায়াটাও ওরকমই মনে হয়েছিল কিন্তু।

তার কথা শেষ হবার আগেই বাংলা টিচার রকীবুদ্দিন গম্ভীর হয়ে বলে, আসলে আমার ব্যাপারটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। আপনাকে সময়মত খবর দিলে এ কাণ্ডটা আর ঘটত না।

বরকত সাহেব উৎকণ্ঠিত হয়ে বলেন, সে রকম কোন আভাস পেয়েছিলেন নাকি ?

রকীবুদ্দিন চোখ বড় বড় করে বলেন, সে কথাইত বলছি। ফার্স্ট টারমিন্যাল পরীক্ষায় বাংলায় যখন ও পঁচাশি নম্বর পেল তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল।

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। বাংলায় পঁচাশি নম্বর পাওয়ার সঙ্গে মনির নিরুদ্দেশ হবার যে কি সম্পর্ক, বুঝতে পারে না।

রকীবুদ্দিন বলেন, আসলে রচনায় নম্বর পেয়েইত বাংলায় অত ভাল করল। গরু, কচুরিপানা, বা ভ্রমণ কাহিনী যে কোনটার ওপর লিখতে বলেছিলাম রচনা। মনি কিনা সব ছেড়ে ভ্রমণ কাহিনীর ওপরই লিখল। মনে মনে আগেই বোধ হয় সব ঠিক করা ছিল। খাসা রচনা। আমার ত পড়ে চক্ষুস্থির। এখন মনে হচ্ছে আগে থেকেই বাড়ি পালাবার মতলব ছিল। তা না হলে এমন হাত খুলবে কি করে।

তারপর আবার একটু থেমে রকীবুদ্দিন বলেন, দেখবেন ও সহজে ফিরবেনা।

এরকম আরও অনেকেই শোনাল নিত্য নতুন কাহিনী।

কাগজের হকার ভোলা নাকি জানালায় আড়চোখে দেখেছে একটা খবর দেখে মনিকে একদিন ভীষণ উত্তেজিত হতে। খবরটা ছিল সাইকেল যোগে কারও বিশ্বভ্রমণের কাহিনী। তারপর সেই নাকি আবার আরেকদিন দেখেছে তাকে এক সাইকেলের দোকানে। সুতরাং—এমনি আরও কত কি!

বরকত সাহেব কথা বলেন না। তাঁর ভাবনা কমে না। মুখভার করে বসে থাকেন। চায়ের কাপটা পড়েই থাকে সামনে।

ঠিক এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

একঘর মানুষকে অবাক করে হন্ হন্ করে এসে ঢোকে মনি।

বরকত সাহেবের মুখে কথা ফোটে না।

যারা মনির নিরুদ্দেশ হবার কারণ বাৎলাতে এসেছিল তারাও এতটা আশা করেনি। এভাবে হঠাৎ না বলে কয়ে এসে মনি যেন তাদের ভয়ানক নিরাশ করেছে।

বরকত সাহেবের মুখ আবার হাসিতে উজ্জ্বল। সবাইকে উঁচু গলায় শুনিয়ে বলেন, কই তোমরা না বলেছিলে মনি সহজে ফিরবেনা। এখন? তোমাদের এসব আজগুবি গপ্পে কান দেওয়াই উচিত নয়।

তারপর নিজেই উঠে গিয়ে খবরটা দিতে যান ভিতরে।

সে আসরে সবাই ছেঁকে ধরে মনিকে।

রকীবুদ্দিন বলেন, আর দুটো দিন থেকে গেলেই পারতে বাপু। খামাখা আমাদের এমন নাজেহাল করলে তোমার বাবার কাছে।

মনি বলে, সে রকম ইচ্ছেই তার ছিল, মানে সেদিন রাতে ট্রেন ফেল করে সে ধরল পরের আরেকটি ট্রেন। কিন্তু কপালই খারাপ বলতে হবে। ঐ ট্রেন নাকি আবার পলাশপুর থামেনা। সোজা কুড়িগ্রাম চলে যায়। কুড়িগ্রাম নেবে পরের দিন দুপুরের আগে কোন ট্রেন নেই। ওয়েটিং রুমে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা ঠিকই ধরেছিল সে। কিন্তু আবার এক কাণ্ড। কোন জংশন লাইনে একটা মালগাড়ি পড়ে যাওয়ায় ট্রেন তের ঘণ্টা লেট। আবার এল কুড়িগ্রাম ফিরে।

সেখানে তার মামাত ভাই রণ্টুর সঙ্গে দেখা। রণ্টু তাকে দেখে অবাক। বলল, আরে তুমি যে।

রণ্টুই জানাল, তারা কুড়িগ্রামে থাকে। ধরে বসল দুটো দিন থেকে যাবার জন্য।

আপত্তি করেছিল মনি প্রথমে।

রণ্টু সে কথায় আমল দেয় না। বলে, কি আর হয়েছে। চিঠি লিখলে তাও তিনদিনের আগে পৌঁছুবে না। বরং দুটো দিন সে কাটিয়েই যাক। মোটামুটি একটা এ্যাডভেঞ্চার হয়ে যাবে। রকীবুদ্দিন এটুকু শুনেই বলেন, তাহলে তাই করলে পারতে।

মনি তার থলে থেকে একটা কাগজ বার করে। তাতে তার গেঞ্জি পরা ছবি ছাপা নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন। সেটা দেখিয়ে বলে, এরকম একটা বিশ্রী ছবি ছাপার পর আমার আর থাকা চলে? লোকজন দেখলেই বা কি বলবে? ছবির ভয়েইত ফিরে আসতে হল তাড়াতাড়ি। একবার ছাপা হয়েছে যথেষ্ট। হয়ত সকলের চোখে পড়েনি। দেরি করলে আবার যে ঐ ছেঁড়া গেঞ্জি পরা ছবিটা ছাপা হত কাগজে আরেক দিন।

রকীবুদ্দিন তাহলে ভুল কিছু বলেন নি। মনি নিরুদ্দেশ হত ঠিকই অন্তত আরও কিছুদিনের জন্যে। যত নষ্টের মূল আসলে ঐ ছেঁড়া গেঞ্জি পরা ছবিটা। একটা ভাল শার্ট পরা ছবি ছাপা হলে, তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসার কোন গরজই হত না মনির। আর বরকত সাহেবের কাছে তাদের নাকালও হতে হত না এমন করে।

আসলে বরকত সাহেবের ওপরই উল্টো রাগ হয় রকীবুদ্দিনের। রাগে গর্জাতে গর্জাতে বেরিয়ে যান আর সবাইকে নিয়ে।

কেউ কোনদিন তাঁর ভুল ধরেনি। তিনি যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। বরকত সাহেব একটা বাজে ছবি ছাপিয়ে তাঁকে মিথ্যেবাদী করলেন।

তাঁরা এবার আগে থেকেই চাঁদা করে মনির একখানা ভাল ছবি তুলে রাখবেন। বলাত যায় না পরের বার ঐ ছবিখানা যদি কাজে লাগে। মনি যদি আবার নিরুদ্দেশ হয়।

আর তখন যদি কাগজে ওরকম একটা ছবি ছাপানো হয় মনের দুঃখে হুট্ করে বাড়ি ফিরে আসতে হবে না মনিকে, হলপ করে বলতে পারেন রকীবুদ্দিন।

আর বরকত সাহেবও বুঝবেন রকীবুদ্দিনের কথা ফেলবার মত নয়।
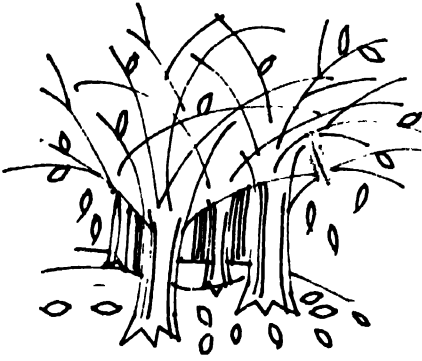
আকাশে অনেক ঘুড়ি

সুচরিত চৌধুরী

শীতের দুরন্ত দুপুরে বাবু উঠে আসে ছাতে, চুপি চুপি। আকাশে অনেক ঘুড়ি। টুক্‌রো টুক্‌রো রঙের পাতা যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। সবুজ তার পাশে নীল—বেগুনীটা দূরে, হলুদ আর খয়েরীতে লেগেছে ঝগড়া, বাদামী যাচ্ছে পালিয়ে, লেজুর তুলে তুলে নেচে ছোট্ট একখানা গোলাপী ঘুড়ি ওদের মাঝখানে গিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে।

বাবু হাততালি দিয়ে ওঠে খুশিতে।

পরক্ষণেই তার ভুরুজোড়া যায় কুঁচ্‌কে, চমক্ খায় চোখদুটো—বাঁশের চাঙে হঠাৎ ফুটে ওঠা কুমড়ো ফুলের মতো।

চরকার মতো ঘুরে ঘুরে এগিয়ে আসছে একটা সাদাঘুড়ি।

সবুজ ঘুড়ি সরে যায়, হলুদ আর খয়েরীটা ওদের ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে এগোয় সাদা ঘুড়ির দিকে, নীলটা নেই—যেন কোনদিন ছিলোনা, বেগুনীটা একটা আক্রোশ নিয়ে দূর থেকে ছুটে আসে,—আর লেজুর তোলা গোলাপী ঘুড়ি নিজের মনে নেচে বেড়ায়—কখনো বা ডিগ্‌বাজীও খায়।

—'এই, এই, দুষ্টুমী করিস্‌নি।' বাবু হাঁকে।

বাবুর হাঁক শুনে গোলাপীটা যেন আবার ডিগবাজী খায়।

তারপর শুরু হয় সাদা ঘুড়ির ছোঁ-মারা। বেগুনী ঘুড়িটার সূতোর ওপর পড়ে ঘুরতে থাকে বোঁ বোঁ করে। বেগুনীও জানে ঘুরতে। দুজনেই ঘোরে—ওদের সূতো যেন মাটি থেকে আকাশ অবধি বেয়ে ওঠা দুটো সরু তলোয়ার।

দুজনেই ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে যায় আকাশের সাদা-নীলে মেশা আলোর রেখায়।

বাবু অবাক। ওরা কি মিলিয়ে গেলো!

রেলিঙের ওপর চিবুক রেখে বাবু ভাবে। কিন্তু ভাবনা তার হঠাৎ থেমে যায়। দেখে,—বিন্দু থেকে বেড়ে বেড়ে একটা বুনোহাঁস হয়ে সাদা ঘুড়িটা আসছে ফিরে, ফিরে আসছে মাঠ থেকে ফিরে আসা ক্লান্ত খেলোয়াড়ের মতো।

খয়েরী, হলুদ, নীল ঘুড়িগুলি মাথা উঁচিয়ে তাকায়। কিন্তু সাদা ঘুড়ির তাতে একটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। হল্‌দেটা গিয়ে ছোঁ মারলো তাকে, জবাবে সাদা ঘুড়িটা নিজেকে একটু ঘুরিয়ে নিলো—তারপর ঝরা পাতার মতো উল্টেপাল্টে ভাসতে ভাসতে চলে গেলো হল্‌দে ঘুড়িটা। আর, একবার ওপরে আরেকবার নিচে ছোঁ মেরে মেরে সাদা ঘুড়িটা উড়ে চলে গেলো।

বাবুর চোখে প্রতীক্ষা। এবার ফিরবে বেগুনী রঙের ঘুড়িটা। রূপোলী রোদ সোনালী হলো, লাল হলো ঢলে পড়া সূর্যটা, ছাতের শুকোনো কাপড়গুলো গুছিয়ে নেওয়া হলো, পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়লো হিমেল কুয়াশা। তবু সে এলোনা ফিরে।

লেজুরতোলা দুষ্টু ঘুড়িটা ডিগ্‌বাজী খেয়ে বাবুকে শেষবারের মতো হাসিয়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু বাবু হাসেনা।

চোখে তখন তার বেগুনী ঘুড়ির ফিরে আসার জিজ্ঞাসা।

—'বাবুকে দেখ্‌ছিনে যে! সন্ধ্যা হয়ে এলো, এখনো পার্ক থেকে ফিরছেনা কেন?'

দোতালা থেকে বাবার কণ্ঠস্বর আসে ভেসে।

মা ডাক দেন,—'বাবু, এই বাবু!'

বাবুর চমক্ ভাঙ্গে। ছাতের সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এসে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—'কোথায় ছিলে?'

—'ছাতে।'

মা তাঁর বনহংসী চোখ তুলে বিস্ময়ে তাকান।

বাবা বলেন মন্দ্রস্বরে—'আর যেয়োনা কখনো। যাও, তোমার টিচার এসে গেছেন।'

বাবু একতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলো,—বাবা বলছেন—'ওকে ছাতে যেতে দিয়োনা।'

—'গেছে যাক্ না। চারধারে শক্ত রেলিং, ভয় কি?'

—'না, না, না। শেলী, তুমি জানোনা—ছাতের নেশা ভয়ানক নেশা।'

পড়ার টেবিলে বাবু গেলো ঘুমিয়ে। আয়া এসে কোলে করে তাকে নিয়ে গেলো ডাইনিং রুমে। অনেকখন সাধাসাধির পরও বাবু চোখ মেললোনা, মুখ খুললোনা।

শোবার ঘরে তাকে রেখে মশারী খাটিয়ে বাতি নিবিয়ে আয়া গেলো চলে।

আর, ছায়া হয়ে বাবু উঠে আসে ছাতে।

তারপর বাবু যেন ঘুড়ি।

বাবু উড়ছে। ছোঁ মেরে মেরে বাবু উড়ছে। ও পাড়ার লালঘুড়ি এসে শুধোয়—'বাবু খেল্‌বি?'

—'না, ভাই। আমি আজ একজনের খোঁজে বেরিয়েছি।'

—'কোথায় যাবি?'

—'ওইখানে।' পূব আকাশের সাদা-নীলে মেশা আলোর রেখার দিকে ইশারা করে দেখায় বাবু।

একটা ঈগলপাখী পাশ কেটে যাচ্ছিলো, বাবু তাকে জিজ্ঞেস করলো—'একটা বেগুনী ঘুড়ি দেখেছো ?'

ঈগলপাখী কোনো জবাব দিলোনা, কেন না তার ঠোঁটে ছিলো একটা সাপ—শুধু ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিলো—'না।'

বাবু চললো উড়ে।

মেঘেরা হাট থেকে তুলো নিয়ে ফিরছে ঘরে। নিচে নদী—ধোপার কাপড়ের মতো রোদে শুকোচ্ছে। ছোট ছোট পাহাড়গুলি থুড়থুড়ে বুড়ির মতো হাঁটু বুকে নিয়ে ঘুমুচ্ছে—আর, গাছপাতা দিঘি ঘরবাড়ি মাঠ পুকুরগুলি যেন শীতল পাটির গায়ে আঁকা কারুকাজ।

দূরে, অনেক দূরে উড়ে চললো বাবু।

আয়া যেন নাটাই, সূতো যেন তার হাত। আয়া বল্‌ছে—'বাবু ভাই, আর যেয়োনা।'

—'চুপ্ করো, কথা বলোনা।'

বলেই বাবু মাথা ঝাঁকিয়ে জোরে এক টান দেয়। টাল সামলাতে না পেরে আয়ার হাত যায় ফস্‌কে। আয়া চেঁচায়—'বাবু ভাই, তুমি কোথায় ?'

বাবু তখন হারিয়ে গেছে বিমুক্ত হাওয়ার বনে।

যেতে যেতে যেতে—বাবু গিয়ে দাঁড়ায় বিরাট এক শালগাছের তলে।

চারধারে চোখ বুলিয়ে বাবু অবাকঃ সারি সারি পাহাড়, কুয়াশায় ভেজা —ফুলে ফুলে একাকার।

একটা কাঠবিড়ালী এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়—'সা'ব কুলী মাংতা ?

—'না।'

ভেংচি কেটে কাঠবিড়ালীটি সরে গিয়ে দাঁড়ায় একটা ট্যাক্সির সামনে। ট্যাক্সি থেকে গলা বাড়িয়ে ধমকে ওঠে কাঠ্ ঠোকরা—'এই ব্যাটা, সর্। দেখছিস্ না সাহেব আমার দিকে চেয়ে আছে। আসুন, সাহেব আসুন।'

বাবুর মুখে কথা নেই।

দুটো খরগোশ এসে ট্যাক্সির সামনে গিযে দাঁড়ায়—'এই ট্যাক্সিওয়ালা গ্রীণ স্ট্রিট্ চলো।'

একরাশ ধূলো উড়িয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেলো।

রিক্সাষ্ট্যান্ডে লেগেছে ঝগড়া। দুটো শালিখ চেঁচাচ্ছে।

—'আমি গিয়ে ধরে আনলুম, তুই নিলি তুলে। দে, দে, সওয়ারী দিয়ে দে। ও সাহেব,—'

সাহেব ছিলো কোলাব্যাঙ। মদ গিলে চূর হয়ে আছে। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বল্লে—'জল্দি চালাও। নো ব্লাডি টকিং।'

—'কোথায় যাবো সাহেব ?'

—'সিলবার ট্যাংক্।'

কয়েকটা চাম্‌চিকে এসে কিল্‌বিল্ করে ঘিরে ধরে বাবুকে।

—'সা'ব, বক্‌শীষ।'

হঠাৎ একটা ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে এলো। বাবু উঠলো চম্‌কে।

—'আরে টেঁপি যে!'

টেঁপির পরণে স্যুট-টাই, ঠোটে পাইপ্। লেজটি দুই বেণীর মতো স্টাইল্ করে বাঁধা।

—'হ্যাল্লো বাবু।' টেঁপি এসে খুশিতে জড়িয়ে ধরলো বাবুকে।

—'চল্, আমাদের বাংলোতেই চল্। এখানকার হোটেলে বড্ড ভিড়, সিট্ পাবিনে।' বলেই বাবুকে টানতে টানতে নিয়ে এলো তার লেটেষ্ট মডেল্ ওপেল্‌কারে।

গাড়ী চললো এগিয়ে। বাবু জিজ্ঞেস করে—'টেঁপি, তুই আমাদের বাসা ছেড়ে চলে এলি কেন ?'

—'সে অনেক কথা, পরে বলবো।' রেডিও'র প্লাক্ ঘুরিয়ে দেয় টেঁপি। মার্টিন ডেনির 'সঙ্ অব প্যারাডাইসে'র সুরটা বাজে।

ওদের পাশ কেটে শাঁই করে চলে যায় একটা লাল রঙের স্পোর্টস্-কার। তার চালিকা মিস্ গ্রেহাউন্ড শিষ্ মেরে চেঁচায়—'হ্যাল্লো টেঁপি, বাই-বাই।'

—'আরে যা যা এন্‌সি ডক্টারের ফ্যান্সি ডটার। বেশী ফুটুনি দেখাস্‌নি।' জিব্ বের করে টেঁপি ভেঙায়।

দূর থেকে এগিয়ে আসছিলো একটা শেভরলেট। টেঁপিকে দেখে ঘ্যাচ্ করে থেমে গেলো, তার ভেতর থেকে লেজ বের করে এল্‌সিশিয়ানটা ইশারা করে ডাকলো টেঁপিকে।

রেডিও বন্ধ করে টেঁপি গিয়ে দাঁড়ালো ওর পাশে।

—'টেপি, কালকের ডিনার পার্টিতে এলি না কেন? আমার ড্যাডি কিন্তু তোর ওপর রেগে গেছে।'

—'শরীরটা বড্ড ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছিলো। ক্ষমা করে দে।'

—'ক্ষমা না হয় করলাম, কিন্তু খাবারটা যা খাসা হয়েছিলো। একেবারে সলিড্ হাড়।' লালা গড়িয়ে পড়লো এল্‌সেশিয়ানটার জিব্ থেকে।

বাবুকে দেখিয়ে টেপি বললে,—'পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন আমার গেষ্ট বন্ধু মাষ্টার বাবুঘুড়ি। বাবু, উনি হলেন মাষ্টার ডগ্‌লাস্ ববি।'

দুজনের মাঝে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

মাষ্টার ডগ্‌লাস ঘেউ করে একটা ডাক ছাড়লো, জবাবে জিব্ দিয়ে তুক্‌তুক্ করে উঠলো বাবু।

—'টেপি, ওকে আমাদের বাংলোয় একদিন নিয়ে আসিস্।'

টেপি লেজ নাড়ে।

শেভরলেট চলে যায়, ওপেলকার এগোয়।

একটা স্কোয়ারের সামনে এসে টেপিকে থামতে হয়। ট্রাফিক পুলিশ বনবিড়াল সিগ্‌ন্যাল দিচ্ছে দু' হাতে—গোঁফ তার খাড়া হয়ে আছে।

ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে গার্লস্ স্কুলের বাস—তাতে অসংখ্য টিয়াপাখী।

ফুটপাতে কাকের ভিড়, কাকে কাকে কাকারণ্য।

কয়েকটা চড়ুই সার বেঁধে বসে চেঁচাচ্ছে—'সা'ব, পালিশ্।'

সামনের 'চাকাইচা রেস্তোরা'র সুইংডোর ঠেলে ঢুক্‌ছে কতকগুলো ময়না, বেরোচ্ছে এক দঙ্গল গল্‌দা চিংড়ী।

সিগ্‌ন্যাল পেয়ে টেপি এগোয়।

টেপিদের বাংলো দেখে বাবু অবাক। ড্রয়িংরুমের চার দেয়ালে পল্ ক্লি'র আঁকা ছবি।

ভেতর থেকে ঘেউ করে একটা ডাক ভেসে আসতেই টেপি বললে—'এই রে সেরেছে। দাঁড়া, বাবাকে একটু শান্ত করে আসি।'

টেপি চলে গেলো।

সন্ধ্যা তখন রঙে রঙে ঝল্‌মলো।

বাবু চোখের পাতা মেলে দিয়ে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো ক্লি'র ছবিগুলো।

একটা বক এসে দাঁড়ায়—হাতে ট্রে, তাতে গ্লাসভরা বোন্‌জুস্।

ওদিকে টেপির বাবা রেগে মেগে আগুন।

—'এই হারামজাদা শোন্। তোকে কতোবার বারণ করেছি মোটর চালাস্‌নি। এক্‌সিডেন্ট করলে তোর কোন্ বাবা তোকে বাঁচাতে যাবে!'

বলেই টেপির বাবার আরেক বিরাট ডাক।

সেই ডাকে সমস্ত বাংলো থরথর করে কেঁপে ওঠে। বাবুর্চিখানার বক্‌গুলো থম্‌কে দাঁড়ায়, ইঁদুর-চাকররা দূরে সরে যায়, নেপালী আয়া ভেজা বিড়ালীটি চোখ-কপালে তুলে কিচেন্‌রুমে

গিয়ে লুকায়,—আর দারোয়ান হুলোবাঁদরটা গেটে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের তালুতে খইনি টিপতে টিপতে বলে—'মেরা সা'ব এটম্‌বোমা বন্ গিয়া, আভি মুল্লুককে মুল্লুক জ্বল্ যায়েগা। ভাগো হিঁয়াসে।'

রাতের উচ্ছিষ্টের জন্যে কতকগুলো মশা জটলা পাকিয়ে বসেছিলো—ওরা গেলো পালিয়ে।

টেপি মুখভার করে দাঁড়িয়ে রইলো। টেপির মা এসে বলে—'ওসব অলুক্ষণে কথা বলতে নেই। এক্‌সিডেন্ট করবে কেন! ড্রাইভিং কম্‌পিটিশনে আমার টেপি ফার্স্ট হয়েছে।'

টেপির বাবা তার চওড়া মুখখানাকে বিকৃত করে বলে উঠলো—'ফার্স্ট হয়েছে! সামনের পরীক্ষায় দেখা যাবে।'

বলেই লেজ নাড়তে নাড়তে পাশের রুমে চলে গেলো।

টেপি বললে,—'মা, আমার বন্ধু বাবু ঘুড়ি এসেছে।'

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—'এ্যাঁ! আকাশের ঘুড়ি এসেছে আমাদের ঘরে! যা বাবা, যা—খাতির করে বসাগে।'

রাত গভীর টেপি ঘুমুচ্ছে ওধারে, বাবু এধারে।

বাবুর চোখে ঘুম নেই। জানালার কাঁচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের বাঁকা চাঁদখানি—তাকে যেন দাঁড় দিয়ে ঠেল্‌ছে একটা ময়না, হাজার হাজার তারা—বাবু ঠিক ওদের মতো একটা বেসর দেখেছিলো তার দাদীমার নাকের পাতায়, আর ওই রাতের আকাশের মতো মায়ের'৫. . খানা শাড়ীও আছে।

বাবু ভাবে। ভাবে—সেই টেপি।

একদিন ওদের চাকর আবুল তাকে গলায় রশি দিয়ে টেনে নিয়ে এসেছিলো।

আয়া গেলো রেগে, মাকে এসে নালিশ করলো,—'আবুলের কাণ্ড দেখুন। কোত্থেকে এক কুকুরের বাচ্চা এনেছে ধরে। বাবুকে খাম্‌চে দিলে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবেন না।'

মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে আবুল বলে—'রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কঁ্যা কঁ্যা করছিলো। দেখলাম,—ওর জন্যে কারো মাথাব্যথা নেই। কেউ ফিরেও তাকালোনা। তাই নিয়ে এলুম। দেখুন না মেম সা'ব—কানদুটো ঠিক এল্‌সেশিয়ানের মতো।'

মা দেখলেন, বাবা তাঁব অম্বিষ্ট দৃষ্টির সমাপ্তি টেনে বললেন—'তাই বলে তো মনে হচ্ছে। চুরি করে আনিস্‌নি তো?

আবুল শপথ করে।

—'খুব যত্ন করে রেখে দে।' বাবার হুকুম।

তারপর বাবার এক বিজ্ঞাপন বেরোলো পত্রিকায়—'একটা এল্‌সেশিয়ানের বাচ্চা পাওয়া গিয়েছে। উপযুক্ত প্রমাণসহ নিচের ঠিকানায় দেখা করুন।'

অনেকে এলো, দেখে চলে গেলো। আর, কেটে গেলো পুরো একটা বছর।

বাবা তাঁর ভুল বুঝলেন। মা একটু ঠাট্টা মিশিয়ে হেসে বললেন—'তোমার বাঁ চোখটা আবার খারাপ হয়ে গিয়েছে বুঝি!'

—'কি যে বলো তুমি! ভুল হতে পারে, কিন্তু ওর ভেতর একটা স্পিরিট আছে।'

—'ওই দেখো, তোমার টেপির স্পিরিট দেখো।' মা জানলার দিকে হাত ইশারা করলেন।

দেখা গেলো রাস্তার মাঝখানে হৈ চৈ। চারদিক থেকে চারটে কুকুর আক্রমণ করছে টেপিকে, টেপি কিন্তু নাজেহাল করছে সবাইকে। দূরে হল্লা করছে পাড়ার ছেলেরা—'সাবাস্ টেপি, সাবাস্।'

আর, টেপির চেহারা তখন ভয়ানক—গায়ের লোমগুলি তীক্ষ্ণ, কান দুটি লিচু পাতার মতো নোয়ানো—গুটানো লেজ, বেরকরা দাঁতগুলি যেন এক একটা ছোরা।

বাবা তরতর করে নিচে নেমে গেলেন। সাথে সাথে ডাক—'টেপি এই টেপি।'

বাবার ডাক শুনে আবুল গিয়ে ছুঁড়ছে ইঁটের টুক্‌রো, আর ডাকছে—'টেপি।'

কিন্তু টেপি কারো ডাক শোনে না।

লোকজনের চলাফেরা বন্ধ। পাড়ার জানালায় সশংকিত চোখ। হঠাৎ একটা রিনরিনে ডাক শুনে টেপি ওদের মাঝখান থেকে দৌড়ে চলে এলো, চলে এলো দেয়াল টপ্‌কে।

বাবু তখনো আয়াকে জড়িয়ে ধরে একটানা ডেকে চলছিলো—'তেপি, তেপি।'

বাবা চিন্তিত হলেন। আবুলকে হুকুম দিলেন—ওকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে। কিন্তু টেপি শেকল বাঁধা কুকুর নয়,—জন্ম যার পথের মাঝখানে ঘরে তাকে বেঁধে রাখা যায়না।

সার`দি`ন ঘেউ ঘেউ করতো।

ওর যন্ত্রণায় বাবা অতীষ্ট হয়ে উঠলেন, বললেন—'এই আবুল,তোর টেপির জ্বালায় আমরা যে টিকতে পারছিনে। ওর একটা ব্যবস্থা কর্।'

আর, সত্যি সত্যি ওর একদিন ব্যবস্থা হয়ে গেলো। শেকল ধরে টেনে টেনে আবুল ওকে নিয়ে গেলো, কিন্তু আনলোনা ফিরিয়ে।

বাবু তখন ভালো করে কথা বলতে শিখেছে, একদিন আয়াকে শুধলো—'টেপি কোথায়।'

—'চলে গেছে।'

বাবু ভাবে। ভাবে—সেই টেপি।

ভাবতে ভাবতে বাবু ঘুমিয়ে পড়ে—যখন জাগে তখন রোদের সাথে জানলা গলিয়ে একটা চড়ুই পাখী সাতবার ডাক দিয়ে সুরুৎ করে উড়ে যায়।

—'বাবু, চল্ শীগ্‌গীর চল্।'

বাবুকে নিয়ে টেপি গিয়ে পৌঁছলো স্টেডিয়ামে।

স্পোর্টস্ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে।

অনেক বাঁদর লাফালো, অনেক শেয়াল দৌড়লো—টাগ্ অব ওয়ারের রশি ধরে দুদিক থেকে দুটি ভাল্লুকের সেকি আক্রোশ—চারধারে মুর্গী, পায়রা, বুনোহাঁস আর গাঙচিলের সেকি চীৎকার—সব দেখে দেখে বাবু হয়রান।

—'তুই এখানে বস্। আমি একটু আসি।' বলেই টেপি চলে গেলো স্টেডিয়ামের ওধারে।

বাবু বসলো। পাশে অসংখ্য হরিণ।

টুপ্ করে একটা আম্‌লকী এসে পড়লো বাবুর কোলে, ঘাড় ফিরোতেই খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো একটা ছোট্ট হরিণ।

বাবু গম্ভীর হয়ে গেলো, কিন্তু চোখে তার ফুটে উঠলো দুষ্টু হাসির টান,—নিজেকে জানতে না দেওয়া দুটি তারার মতো।

তারপর এক নিমেষে ছোট্ট হরিণ এসে বসলো বাবুর পাশে। আলাপ করলো, হাসলো,

ফোটালো অনেক কথাকলি।

মাঠের দিকে চেয়ে বাবু অবাক না হয়ে পারলোনা—সাইকেল রেসে অনেক জিরাফের ভিড়ে দেখা গেলো টেপিকে। আর, টেপিই সবাইকে পেছনে ফেলে চলে গেলো।

স্পোর্টসের শেষে ছোট্ট হরিণ চুপি চুপি বললে,—'বাবু ভাই, আমাদের দেশে যাবে?'

—'তোমাদের দেশ কোথায়?'

—'ওই-ই পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে পূব সীমানায়।'

আর, তখুনি বাবুর মনে পড়ে গেলো সেই বেগুনী ঘুড়ির কথা। বললে সে,—'যাবো।'

—'কাল সূর্য ওঠার আগেই তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবো।'

ভোর রাতে ছোট্ট হরিণ আর বাবু গিয়ে দাঁড়ায় বাসস্ট্যান্ডে। 'প্যারাডাইস এক্সপ্রেস' বাসখানি চলে যাচ্ছিলো,—ওদের দেখে থম্‌কে দাঁড়ায়।

—'রোখ্‌খে।'

বাসে অনেক শেয়াল, কাকও আছে কয়েকটা—একটা বাঁদর কম্বল জড়িয়ে এককোণে ঝিমোচ্ছে, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ্।

—'ও মাঙ্কি কন্‌ট্রাক্টার সা'ব। জেরা জায়গা দে দো ভাই।' বলেই কন্‌ডাক্টর পাঁতিহাস ডাক ছাড়ে—'একদম্ ছোড় দি জিয়ে উস্তাদ।'

ড্রাইভার খয়েরী ভেড়া তার রাত্রিজাগর চোখ দু'টি মেলে বলে—'বহুৎ আচ্ছা।'

এঁকে বেঁকে চললো 'প্যারাডাইস এক্সপ্রেস,' পাহাড়ের পথ বেয়ে, উঁচুনিচু।

এগোতে এগোতে কখনো দু'পাশে বাঁধাকপির ক্ষেত, কখনো বা গাজরের, মূলোর—শালগম, টমেটো—কতো কি!

ছোট্ট হরিণ বললে—'এটা শাকসব্জির দেশ, এরপর গাছের দেশ।'

এলো গাছের দেশ। থরে থরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দঁড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছ—শাল, তমাল, তাল, সেগুন, ঝাউ, দেবদারু—আরো অনেক, যার কোনো নাম নেই।

এলো ফুলের দেশ—কতো ফুল।

ফলের দেশে এসেই বাবুর খিদে পেয়ে গেলো।

শুনে ছোট্ট হরিণ বাবুকে বললে—'এরপরেই আমাদের দেশ। কোনমতে খিদে চেপে রাখো। এখানে কিছুই পাওয়া যাবেনা।'

বাবু অবাক। চারধারে কতো কমলালেবু—আপেল, ন্যাসপাতি, আঙুর আছে ঝুলে।

বাস স্টপে থামতেই দুটো আপেল টুপ্ করে উঠে এসে বসলো বাবুর পাশে। তার সুগন্ধে সবদিক্ মো মো করে উঠলো। সবার জিব্ থেকে লালা পড়লো গড়িয়ে।

বাবু চুপি চুপি বলে,—'এদের বুঝি খেতে নেই?'

ছোট্ট হরিণের চোখদুটি হীরের মতো ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো—'চুপ্। ওদের বোঁটার মধ্যে ছোরা আছে, শুনলে বুকে বসিয়ে দেবে।'

হরিণের দেশে এসে ওরা নেমে গেলো।

বাবু জিজ্ঞেস করে—'হরিণভাই, তোমাদের দেশ এতো নির্জন কেন?'

—'আমরা নির্জনতার মধ্যেই বেঁচে থাকি।'

ঘাস, লতাপাতা, পাথরের নুড়ি পেরিয়ে ওরা এসে পৌছলো পাহাড় বেয়ে ঝরে পড়া একট ঝরণার ধারে।

তার পাশে কয়েকটা হরিণ-হরিণী আছে দাঁড়িয়ে।

বাবুকে দেখে সবাই মিলিয়ে গেলো বনের আড়ালে।

ছোট্ট হরিণ ডাক দেয়—'মা, এই রিনিঝিনি, বাবা. তোমরা পালাচ্ছো কেন! এ আমার বন্ধু বাবুঘুড়ি।'

বাবা হরিণ পাতার আড়াল থেকে মুখ বাড়ালো।

—'বাবা, ইনি হচ্ছেন মাস্টার বাবু। ঘুড়ি, মানুষ নয়।'

বাবা হরিণ শুধু তাকালো,তাকালো তার আজীবন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কিছুটা নিঃসংশয়ের টান টেনে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাবু শুয়ে পড়লো ঘাসের বিছানায়। বিকেলের ঝিকিমিকি আলোয় জাগলো, ডাক দিলো—'হরিণ ভাই'।

মা হরিণের জবাব ভেসে এলো—'নেই, হাটে গেছে।' তারপর চুপি চুপি মেয়েকে বললে—'এই রিনিঝিনি! যাতো মা, ওকে ঘাসের সরবতটা দিয়ে আয়।'

রিনিঝিনি সরবতের পেয়ালা রেখে বাবুর সামনে থেকে গেল পালিয়ে।

সন্ধ্যার পর যখন চুপি চুপি চাঁদ উঠে এলো আকাশে তখন বনের সব ঘাসপাতা উঠলো কেঁপে।

অর্কেস্ট্রা বাজছে।

জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে ঝরণা, বাঁশবনে বাঁশীর রাগ বিস্তার, ঝি ঝি পোকারা ধরেছে তানপুরা—আর নিঃশব্দ হাওয়ায় পাখোয়াজের বিলম্বিত রূপক তাল।

হরিণ হরিণীরা চারধার থেকে বেরিয়ে এসে নাচছে।

বাবুর চোখে তখন কথা নেই।

রাতে ঘুমোবার আগে বাবু তার মনের কথা খুলে বললো ছোট্ট হরিণের কাছে। সেই দুরন্ত দুপুরের বেগুনী ঘুড়ির কথা—যা মিলিয়ে গেছে পূব-আকাশের সাদা নীলে মেশা আলোর রেখায়।

শুনে ছোট্ট হরিণ বললে—'চলো'।

—'কোথায়?'

—'ফকির দাদুর কাছে।'

ঝরণা পেরিয়ে একটা বিরাট পাথর, তারপাশে ঘাষের বন।

পায়ের সাড়া পেয়ে ফকির হরিণ হাঁক দেয়—'কে আসে?'

—'আমরা।'

—'কি চাস্ তোরা?'

সব শুনে ফকির হরিণ চোখ বুঁজে বললে—'ওই বিরাট পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে দাঁড়াগে। সেখানেই দেখতে পাবি।'

বলার সাথে সাথেই বাবু দিলো দৌড়।

ছোট্ট হরিণকে ডাক দেয় ফকির হরিণ—'তুই যাস্‌নে।'

—'কেন ফকির দাদা?'

—'ওরে বোকা, মানুষের মায়ায় তোর কি দরকার?'

খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো ছোট্ট হরিণ—'ফকির দাদা, তোমারও দেখ্‌ছি মাঝে মাঝে ভুল হয়।'

গম্ভীর ফকির হরিণ, তার সব শিঙগুলি উঠলো দুলে, বললে—'মানুষকে চিনতে আমার কখনো ভুল হয়না। তোর বন্ধু বাবুঘুড়ি ঘুড়ি নয়, মানুষ।'

ছোট্ট হরিণ ছুটছে, ছুটছে একটা তীরের মতো। না, না, —তার বন্ধু বাবুঘুড়ি মানুষ নয়, ঘুড়ি।

বাবু তখন সেই পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে অবাক—আকাশে অনেক ঘুড়ি। পৃথিবীর সব ঘুড়ি যেন এসে সেখানে উড়ছে।

ছোট্ট হরিণ হাঁফাতে হাঁফাতে ডাক দিলো—'বাবু ভাই!'

বাবু হাততালি দিয়ে খুশিতে চেঁচায়—'ভাই হরিণ, দেখো, দেখো কতো ঘুড়ি।'

ছোট্ট হরিণ শুধোয়,—'বাবু ভাই, তুমি ঘুড়ি না মানুষ?'

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ।

ছোট্ট হরিণ লুটিয়ে পড়ে। বাবু আসে দৌড়ে। চেঁচাতে চেঁচাতে বলে—'হরিণ ভাই, হরিণ ভাই—আমি মানুষ নই, আমি ঘুড়ি।'

ছোট্ট হরিণের কোনো জবাব নেই, সে তখন একটা বেগুনী ঘুড়ি হয়ে আকাশের দিকে ধীরে ধীরে উড়ে চলেছে।

বাবু চেঁচায়—'আমিও যাবো, আমিও যাবো।'

মা আসেন ছুটে—'কি হলো বাবু! চেঁচাচ্ছো কেন? কোথায় যাবে তুমি!'

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে বাবু ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদে ওঠে—'মা, আমিও যাবো।'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—'কোথায়?'

—'সেখানে। যেখানে আকাশে অনেক ঘুড়ি।'

বাবু আর কখনো তুমি ছাতে যেয়োনা।' বাবার কণ্ঠস্বর ভোরের স্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দিলো।

বাবু যেন বদ্‌লে গেছে—সে ভাবে, তার বুঝি কেউ নেই। দুপুরে চোখের আড়াল হলে মা ডাক দেন—'বাবু কোথায় যাচ্ছো!' বাবা সব সময় বলেন—'ছাতে যেয়োনা।' আয়া যেন ছায়ার মতো পিছু পিছু লেগে আছে। বাবু ভাবে—সে একদিন পালিয়ে যাবে ছাতে।

আর, সত্যি সত্যি একদিন সে চুপি চুপি উঠে এলো নির্জন দুপুরে ছাতের দরজায় একটি শব্দ রেখে, উঠে এলো সিঁড়িতে পায়ের ছাপ এঁকে।

আকাশে তখন অনেক ঘুড়ি।

ঘুড়িগুলি যেন গান গাইছে—

"আমরা ঘুড়ি
ঘোড়ায় উড়ি
মেঘ ধুলো মেঘ ছড়িয়ে
আমরা পাখী
পাখায় রাখি
রঙ থেকে রঙ জড়িয়ে।

মাটি থেকে শোনা যাচ্ছে ছেলেদের কোরাস—

"এই নীল লাল হলুদ ঘুড়িটা
ব-কাটা, ব-কাটা, ব-কাটা।
হোই হোই শাদা কেটে গেলো ব্যাটা
ব-কাটা, ব-কাটা, ব-কাটা"

কেটে যাওয়া শাদা ঘুড়ি ভেসে ভেসে গান ধরে—

"আমি রঙের খেলায় হেরে গেলাম
তোমাদের ভালবাসা যা পেলাম
তা দিয়ে হৃদয়টুকু ভরে নিলাম।
আমি রঙের খেলায় হেরে গেলাম।"

বাবু হাঁক দিলো—'এই শাদাঘুড়ি যাস্‌নে, বল্‌ছি যাস্‌নে।' আর, তখুনি শাদাঘুড়ির সুতো এসে পড়লো বাবুর সামনে, রেলিঙের ধারে। বাবু একটা লাফ দিলো।

তারপর বিরাট এক হৈ চৈ।

বাবু মাটিতে শুয়ে আছে। তার একহাতে সূতো, আরেকহাতে জড়ানো শাদা ঘুড়ি।

ঘুড়িটা শাদা, কিন্তু লাল।

গোবর্ধনের কাণ্ড

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গল্পটা গোবর্ধনকে নিয়ে। কিন্তু তার আগে পিসিমার কথা একটু বলে নিই। বুঝতে সুবিধে হবে।

পিসিমা সারাজীবন সংসার করে-করে আজকাল কেমন যেন একটু হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। ঠিক করলেন, এবার কিছুদিন তীর্থধর্ম করে মনটাকে আবার চাঙ্গা করে নেবেন। কিন্তু তীর্থধর্ম করব বললেই তো আর করা হয় না, অনেক কিছু ভাবতে হয়। প্রথমত, পিসিমার যা বয়স হয়েছে, তাতে ওঁর পক্ষে এখন আর একা বেরনো সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, গয়া-কাশী-বৃন্দাবন যেখানেই যাওয়া হোক না কেন, সে তো আর বিনে পয়সায় হবে না, ছেলেদের কাছে হাত পাততেই হবে। তৃতীয়ত, তিন পুরুষের এই বাড়ি কি যার তার হাতে রেখে যাওয়া যায়, ফিরে এসে হয়তো দেখবেন, বাড়িকে বাড়িই লোপাট হয়ে গেছে। যা দিনকাল বাবা, কিচ্ছুটি বিশ্বাস নেই।

পিসিমার দুই ছেলে। বড় ছেলে শক্তিপদ চিরিমিরিতে চাকরি করে। সেখানেই ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার পেতেছে। কখনও-সখনও বাড়িতে এলে যেন মহোৎসব লেগে যায়। ছোট ছেলে মুক্তিপদ চিরকাল মায়ের সঙ্গেই কাটিয়েছে, এখনও তাই। মুক্তিপদর এক ছেলে বিল্টু, কনভেন্টে পড়ে। যেমন বিচ্ছু, তেমনি দিদিমা অন্তপ্রাণ। তীর্থ করতে গেলে বিল্টুকে ছেড়ে কতদিন যে বাইরে থাকা যাবে, সেটাও একটা ভাবার বিষয়।

যাই হোক, শেষটায় অনেক ভেবেচিন্তে একদিন সুযোগ বুঝে পিসিমা বলেই ফেললেন, "দ্যাখো বউমা, আমি একটা কথা ভাবছিলাম। যদি রাগ না করো তো বলি।"

বউমা অর্থাৎ বিল্টুর মা তো অবাক, "ও মা, রাগ করব কেন, বলুন না?"

"ভাবছিলাম কি, বয়স তো আর কম হল না, এবার একটু তীর্থধর্ম করতে বড় মন চাইছিল। একটানা তিরিশ বছর হল, এ-বাড়ির বাইরে পা দিইনি, কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠেছি বউমা।"

"বেশ তো করবেন। কোথায় যাবেন শুনি ?"

"তীর্থধর্ম করবার জন্য দেশে কি জায়গার অভাব আছে নাকি ? গয়া-কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-হৃষীকেশ, কত জায়গা। কবে মরে যাই, একবার ঘুরে না এলে আর ওসব দেখাই হবে না। স্বর্গে গিয়ে কী জবাব দেব বলো দেখি।"

কথাটা শেষ পর্যন্ত মুক্তিপদর কানে গিয়েও পৌঁছল। মুক্তিপদ কিছুটা গম্ভীর স্বভাবের লোক। বলল, "তোমার এই শরীরের অবস্থা মা, তোমাকে তো একা ছাড়তে পারি না।"

"ও মা, আমি কি একা যাব বললাম নাকি ! তোরা যদি আমাকে নিয়ে যাস, তবেই না আমার যাওয়া।"

"আমরা নিয়ে যাব, বলো কী মা ! তা হলে এ বাড়িতে থাকবে কে ! এমনিতেই তো আজকাল চুরিহারির শেষ নেই।"

পিসিমা একগাল হাসলেন, "কেন, গোবর্ধন থাকবে। গোবর্ধনের তো সাতকুলে কেউ নেই, এ-বাড়িতে এইটুকুন থেকে কাটাতে-কাটাতে এখন তো প্রায় বুড়ো হতে চলল, ওকে বললে ওই থাকবে। আর আমরা গেলে তো কুড়ি-পঁচিশ দিনের ব্যাপার, ও ক'টা দিন দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।"

মুক্তিপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

পিসিমা মুক্তিপদর গায়ে হাত বোলান, "চল না বাবা, ক'দিন ধরেই মনটা বড় ছটফট করছে। তীর্থ আমায় টানছে রে।"

মুক্তিপদ বলল, "ঠিক আছে, কিন্তু গোবর্ধনের সঙ্গে কথা বলেছ ? ওকে আগে বলা দরকার।"

বিল্টুর মা পাশেই ছিল, বলল, "গোবর্ধনের সঙ্গে কথা বলা আর না-বলা সবই সমান। যা ভূতের ভয় ওর।"

"ভূতের ভয় না ছাই।" মুক্তিপদ বলল, "ডেকে জেনে নাও না, ও থাকতে পারবে কি না।"

ডাক পড়ল গোবর্ধনের। চাতালে মাছ কুটতে বসেছিল গোবর্ধন, ডাক পেয়েই মাছকাছ রেখে চলে এল। তারপর গামছায় হাত মুছতে-মুছতে একগাল হাসি, "আমায় ডাকছিলেন বাবু ?"

"হুঁ !" মুক্তিপদ গম্ভীর গলায় বলল, "তোর ওপর যদি একটা দায়িত্ব দিই, রাখতে পারবি ?"

"কী বাবু ?" গোবর্ধনের চোখদুটো কেমন গোল-গোল হয়ে ওঠে।

"মা'কে নিয়ে আমরা সবাই ক'দিনের জন্য একটু বাইরে যাব, তুই একা-একা থাকতে পারবি তো বাড়িতে ?"

"অ্যাই দ্যাখো, আমি কি কচি খোকাটি নাকি যে, থাকতে পারব না। কিন্তু আপনারা কোথায় যাবেন বাবু ?"

পিসিমা বললেন, "বেশি দূর নয়, এই কাছেই, গয়া-কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন, আর যদি সময় পাই তো হরিদ্বার-হৃষীকেশ।"

গোবর্ধন বলল, "আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করছে মা। আমাকেও নে' চলুন না ?"

"শোনো কথা ! আমরা সবাই মিলে যদি যাই, তা হলে বাড়ি পাহারা দেবে কে ?"

গোবর্ধন আবার মাথা নাড়ে, "তা তো বটেই, তা তো বটেই। বাড়িতে কারও থাকা দরকার। ঠিকই বলেছেন বাবু, বাড়িতে কেউ না থাকলে কি চলে !"

"তাই বলছিলাম, এবার না হয় তুই বাড়ি পাহারা দে, আমরা ঘুরে আসি, পরের বার তুই যাস আমরা বাড়িতে থাকব।"

গোবর্ধন বলল, "সেই ভাল।"

"ভাল তো বুঝলাম, কিন্তু তোর নাকি আবার ভূতের ভয়?" গোবর্ধনের সারা মুখে এবার হাসি ছড়ায়, "হেঁহেঁ কী যে বলেন, ভূতের আমি থোড়াই কেয়ার করি। ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি।"

"তা হলে ওই কথা হল, তুই বাড়ি পাহারা দিবি। বাড়ি থেকে কোথাও বেরোবি না। তোর কাছে কিছু টাকাও রেখে যাব, যখন যা দরকার হয় খরচ করবি, বুঝলি?"

গোবর্ধন মাথা নাড়ে, "ঠিক আছে।"

পিসিমা বললেন, "দেখলি তো, বলেছিলাম না গোবর্ধন পারবে। বুদ্ধিশুদ্ধি যতই কম হোক ওর, একটা বাড়ি পাহারা দিতে পারবে না, খুব পারবে।"

"তুই যা তা হলে।" গোবর্ধনকে বিদায় দিয়ে মুক্তিপদ চান করার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। বিল্টুকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য অনেকক্ষণ আগেই বিল্টুর মা সেজেগুজে বেরিয়ে গিয়েছিল।

গোবর্ধন হাতের গামছাটা আবার কাঁধে ফেলে চাতালের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু চাতালে পৌঁছবার আগেই ও যা দেখল, তাতে ওর চক্ষু চড়কগাছ। দেখল, বাড়ির ধেড়ে বেড়ালটা দেড় কেজি ওজনের রুই মাছের মুড়োটা মুখে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে।

চিৎকার করে উঠল গোবর্ধন, "পালাল, পালাল।"

পিসিমা পড়িমরি করে ছুটে এলেন, "কে পালাল?"

"বেড়ালটা! মা, বেড়ালটা।"

"বেড়ালটা!" প্রথম দিকে পিসিমা কিছু বুঝতে পারেন না। কিন্তু একটু পরেই ওঁর চোখে পড়ল, ধাড়ি বেড়ালটা মাছের মুড়ো চিবোচ্ছে। "কী সব্বোনাশ, মাছগুলো ঢেকে রাখিসনি গোবর্ধন?"

গোবর্ধন কাঁদো-কাঁদো। "আপনারা ডাকলেন বলেই না তড়িঘড়ি উঠে গেলাম। তখন কি আর খেয়াল ছিল, বেড়ালে খাবে।"

পিসিমা আর কী করেন, বিড়বিড় করতে-করতে আবার নিজের ঘরে চলে গেলেন।

এ হেন গোবর্ধনের ওপরই বাড়িটা দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ল। দিন-সাতেক পরে মালপত্র বাঁধাছাদা করে পিসিমা, তাঁর ছেলে, ছেলের বউ আর বিল্টুকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন। ট্যাক্সি ছাড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পিসিমা গোবর্ধনকে বোঝালেন, "দেখিস বাবা, সাবধানে থাকিস। নানারকম লোক ঘোরে চারপাশে, কারও কথায় যেন কান দিস না বাপ। বাড়ি থেকে যদি কখনও বেরোতেই হয়, এই ধর বাজার করতে গেলি, কিংবা কোনও কাজে বেরোলি, তো সবগুলো ঘরে ঠিকমতো তালা লেগেছে কি না দেখে নিয়ে তবে বেরোস। আর বাইরের দরজাটা সব সময় বন্ধ রাখিস। কেউ এসে দরজা ধাক্কালেই হুট করে খুলে দিস না যেন। আগে জিজ্ঞেস করে নিবি কে, কী চায়। তারপর যদি তোর মনে হয় দরজা খোলা দরকার, তখন খুলবি।"

গোবর্ধন কেবল মাথা নাড়ে, হুঁ, হুঁ। ভাবখানা এরকম, যেন ওকে বোঝাবার দরকার নেই, ও জানে, কীভাবে বাড়ি পাহারা দিতে হয়।

তারপর ট্যাক্সি ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল, পিসিমা বিড়বিড় করে উঠলেন, "দুর্গা, দুর্গা।" বিল্টু ট্যাক্সির বাইরে হাত বার করে চেঁচাতে লাগল, "টা টা—"

আর গোবর্ধনের তখন কান্না পেয়ে গেল, এত বড় একটা বাড়ি, এতগুলো ঘর, ও ওখানে একা থাকবে কী করে। ভূতের ভয় তো আছেই, চোর-ডাকাতের ভয়ও তো কম নয়। তা ছাড়া কেউ যদি পিস্তল হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে বলে,'এই গোবর্ধন বাড়ি ছেড়ে পালা, এখন থেকে এ-বাড়িতে আমরা বোমা বানাব। কিংবা ...'

আর ভাবতে পারে না গোবর্ধন। পাথরের স্ট্যাচুর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মনে হল, কে যেন ওকে পেছন থেকে ডাকছে, "এই যে গোবর্ধনদা, ভাল আছ?"

গোবর্ধন একটু চমকে ওঠে, কে রে বাবা, কে ডাকে!

লোকটা ততক্ষণে কাছে এগিয়ে এসেছে,একমুখ দাড়ি, কেমন বেঁটে-বেঁটে চেহারা।

"আজ্ঞে আমায় ডাকছেন ?"

"তা নয় তো কী! গোবর্ধন আর কে আছে এখানে শুনি ?"

গোবর্ধন বলে, "তা তো ঠিকই। আমি ছাড়া আর কে-ই বা আছে এখানে!"

লোকটা এবার দাড়ি চুলকোতে-চুলকোতে বলে, "তা ওনারা সব কোথায় গেলেন গো গোবর্ধনদা ?"

গোবর্ধন সরল-সোজা মানুষ। বলেই ফেলল, "তীর্থ করতে।"

"তীর্থ করতে! তাই নাকি! ভাল, ভাল, তা তুমি বুঝি এখন থেকে একা থাকবে বাড়িতে ?"

গোবর্ধন বলল, "সেরকমই তো কথা। আমি বাড়ি পাহারা দেব।"

"বাহ্, বেশ, বেশ! তা অত বড় একটা বাড়ি, একা-একা থাকবে, ভয় করবে না ?"

গোবর্ধনের হঠাৎ মনে হল, লোকটা এত কথা জিজ্ঞেস করে কেন! লোকটাকে তো ও চেনেই না। তা ছাড়া কেমন একটা হতকুচ্ছিত চেহারা। নাহ্, লোকটাকে বেশি পাত্তা দেওয়া উচিত নয়, বলল, "ভয় করবে কি করবে না, তা তোমায় বলব কেন ?"

"আরে না, না, রাগ কোরো না গোবর্ধনদা, তোমাকে আমি ভালবাসি বলেই জিজ্ঞেস করছি। তোমার যদি ভয় না করে তো ভালই, আর যদি ভয় করে তো ..."

"তো কী ?" গোবর্ধন লোকটার মুখের দিকে তাকায়।

"তো আমায় বলো, ভয় তাড়াবার সব ম্যাজিক, আমার জানা আছে।"

"ভয় তাড়াবার ম্যাজিক, তুমি কি ম্যাজিশিয়ান ?"

"আরে না, না, ম্যাজিশিয়ান হব কেন, আমি ম্যাজিশিয়ান নই।"

"তবে ?"

এবার কেমন সন্দেহ হয় গোবর্ধনের, সে কথায় তোমার কী দরকার, শুনি ?

"দরকার নেই, তবু জিজ্ঞেস করছি, আসলে ওঁরা যদি তালা লাগিয়ে চাবিগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থাকেন তো ভালই, তোমার কোনও দায়িত্ব রইল না। আর তা যদি না করে থাকেন, তা হলে চাবিগুলো খুব সাবধানে রাখা দরকার।"

গোবর্ধন হাসে, সে-কথা আমায় বলতে হবে না, খুব সাবধানেই আমি সে-সব রাখব। চোরটোর এলে বুঝতেই পারবে না, চাবিগুলো আমি কোথায় রেখেছি।

"বাহ্, বাহ্, খুব ভাল। তা ঘরগুলো তো সব তালাবন্ধ, তুমি কোথায় শোবে ?"

গোবর্ধনের আবার কেমন অস্বস্তি লাগে, নাহ্, লোকটা তো ওকে ছাড়ছে না দেখছি। এত কথা শোনারই বা কী দরকার ওর।

এ-সময় গোবর্ধনের মনে পড়ল, পিসিমা ওকে বারবার করে বুঝিয়ে গেছেন, 'বাইরের লোকজন কেউ ঘরে এলে একদম ভেতরে ঢোকাবি না, বুঝলি ? যে আসে বলে দিবি, বাড়িতে কেউ নেই। তা ছাড়া গায়ে পড়ে কারও সঙ্গে আলাপ করতেও যাবি না। বিপদ-আপদ কিন্তু ওসব থেকেই শুরু হয়, বুঝলি গোবর্ধন ?'

"তুমি যদি রান্নাঘরে শোও, তাহলে সবচে ভাল। বাড়িতে কেউ নেই দেখে অনেক বাড়িতেই কাজের লোকেরা বাবুদের বিছানায় গিয়ে শোয়, এটা কিন্তু উচিত নয়।"

গোবর্ধন এবার চটে ওঠে, "মেলাই ফ্যাচফ্যাচ কোরো না দেখি। তোমাকে আমি চিনি না, জানি না, তখন থেকে মেলাই বকে চলেছ।"

লোকটা হাসে। লোকটার রাগটাগ কিছু আছে বলেই মনে হয় না।

"হাসছ যে?"

"হাসছি না, তোমায় দেখছি।"

"আমায় আবার দেখার কী হল?" গোবর্ধন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই থাকে।

"না গো গোবর্ধনদা, রাগ কোরো না। ঘরে যাও। সাবধানে থেকো। আর ওই যে বললাম, ভয়টয় পেলে আমাকে ডেকো। বুঝলে?"

গোবর্ধন বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও দেখি। বলতে-বলতে বাড়ির দরজায় এসে হঠাৎ ওর খেয়াল হল, এই যাহ্, লোকটা কোথায় থাকে তা তো জিজ্ঞেস করা হল না। সত্যি-সত্যি যদি একা বাড়িতে রাতে ওর ভয়টয় লাগে কাকে ডাকবে ও।

কিন্তু ততক্ষণে ও দেখল, লোকটা হনহন করে হেঁটে ওর চোখের বাইরে মিলিয়ে গেছে।

যাকগে, ভালই হয়েছে। জানা নেই, শোনা নেই, ওরকম লোকের খোঁজখবর না রাখাই ভাল। সদর-দরজায় খিল তুলে দিল গোবর্ধন। দিয়ে চারপাশে একবার তাকিয়ে বুঝল, সন্ধে হতে আর বাকি নেই। এখনই সবগুলো ঘরের জানালা বন্ধ করে দরজায় তালা লাগানো দরকার। তারপর চারটি আলুসেদ্ধ আর ভাত রান্না করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে হবে।

কোথায় শোবে, রান্না ঘরেই শোবে কি! রান্না ঘরে অবশ্য কোনও দিনই শোয় না ও, রোজ শোয় বড়ঘরের মেঝেতে। ও-ঘরেই পিসিমা শোন খাটেতে। পিসিমা রোজ শোবার সময় বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে নিয়ে তারপর বালিশে তিনটে টোকা দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েন।

আজ কেউ মন্ত্র পড়বে না, বালিশে টোকাও দেবে না, কথাটা ভাবতেই কেমন মন খারাপ হয়ে গেল ওর। তা হোক, মন খারাপ হলে তো চলবে না, কাজগুলো আগে সেরে নেওয়া যাক।

একে-একে ঘরগুলোর জানালা বন্ধ করতে শুরু করে ও। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে টেনেটুনে দেখে ঠিকমতো লেগেছে কি না। এইভাবে তিনটে ঘর বন্ধ করে পিসিমার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাতেই দেখে মাছের মুড়োখেকো সেই ধাড়ি বেড়ালটা পিসিমার খাটের মাঝখানে শুয়ে আরাম করছে। দেখেই মাথায় রক্ত উঠে এল ওর, কিন্তু সামলে নিল। মনে হল, এই ফাঁকা বাড়িতে বেড়ালটাই আজ ওর ভরসা। বেড়ালটা আজ যদি ওর বিছানাতেও শোয়, ও রাগ করবে না।

গোবর্ধন ডাকল, "এই পুসি, বিছানায় শুয়েছিস কেন, নীচে আয়, আমার কাছে আজ রাতটা থাকিস, হ্যাঁ?"

বিড়ালটা কী বুঝল কে জানে, এক লাফে খাট থেকে নেমে দে ছুট।

"যাহ্ বাবা, সেদিনে মুড়ো খেলি, তাও তোকে ভালভাবে ডাকলাম, আর অমনি পালিয়ে গেলি!"

যাক্‌গে, কী আর করা যায়। গোবর্ধন পিসিমার ঘরের জানালাগুলোও বন্ধ করল, তারপর আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে তালা লাগাল, লাগিয়ে টেনেটুনে দেখে নিল, না ঠিকই আছে।

ব্যস, সব কাজ ফুরিয়ে গেল। এখন যা কাজ তা ওর নিজের। চারটি রান্না করে খেয়ে শুয়ে পড়া, ব্যস।

নাহ্, রান্নাঘরে শোওয়াই ভাল, তখন লোকটাও তো সেই কথাই বলল, বাড়ির কাজের লোকদের রান্নাঘরেই শোওয়া উচিত। ঠিক আছে, আজ তাই শোবে ও। দরকার হলে সারা রাত আলো জ্বেলে রাখবে। ভয় কী, না কোনও ভয় পায় না ও।

রান্নাঘরে ঢুকল গোবর্ধন। চারপাশে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিল। দুপুরে

খাওয়াদাওয়ার পরই বাসনকোসন ধুয়ে ঘরটা ঝেড়ে-পুছে পরিষ্কার করে রেখেছিল। ওপাশে গ্যাসের উনুন, রান্না করতে আর কতক্ষণ লাগবে। উলটো দিকে জানালাটা হাহা করছে খোলা। বাইরে মিশকালো অন্ধকার। আর সঙ্গে সঙ্গে গা'টা কেমন ছমছম করে উঠল ওর।

না বাবা, এ-জানালাটাও বন্ধ রাখাই ভাল। এগিয়ে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করল গোবর্ধন। তারপর ভাবল, এত সকালে রান্না না করে আগে না হয় বিছানাটাই একপাশে পেতে রাখি। বিছানা বলতে একটা শতরঞ্চি একটা কাঁথা আর ইটের মতো শক্ত একটা বালিশ।

তাই করল গোবর্ধন। বিছানাটা একপাশে পেতে আরাম করে তার উপরে একটু বসল। বসেই একটা হাই তুলল তারপর ইচ্ছে হল একটু শোয়। কেউ তো আর গালাগালি করার নেই আজ, শুলেই বা দোষ কী! মাথাটা একটু কাত হয়ে এল ওর। তারপর শুয়েই পড়ল গোবর্ধন।

কিন্তু ওর এই এক দোষ, শুলেই ঘুম পায়। ভীষণ ঘুম পেয়ে গেল। দেখতে-দেখতে ঘুমিয়েও পড়ল গোবর্ধন।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিল খেয়ালই নেই, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই তড়াক করে উঠে বসল ও। অন্ধকার কেন, ও তো আলো জ্বালিয়েই শুয়েছিল, তবে কি লোডশেডিং! কী জানি বাবা, কেমন যেন সন্দেহ হতে থাকে ওর। আর এ-সময় মনে হল দেশলাইটা যে কোথায় রেখেছে খেয়ালই নেই। সব্বোনাশ, কী হবে তা হলে! এখন যদি দাঁত-বার-করা জ্যান্ত একটা ভূত এসে ওর ঘাড়ে চেপে বসে। সারা গা ভয়ে শিরশির করে ওঠে। পিসিমার ঘরে ছোট্ট একটা গীতা রয়েছে, সেটাও যদি মনে করে তখন হাতের কাছে নিয়ে রাখত, তা হল অন্তত ভূতের হাত থেকে বাঁচা যেত, কী হবে এখন!

দু-এক মুহূর্ত ওভাবেই কাটল, হঠাৎ দরজায় খুটখুট করে কয়েকটা টোকা। এই সেরেছে, টোকা দেয় কে! ভূতেরা কি টোকা দিয়ে ঘরে ঢোকে নাকি।

গোবর্ধন কোনও উত্তর দেয় না। উত্তর দেবে কী, শরীরটা যেন ওর কাঠ হয়ে রয়েছে। গোঁগোঁ করে মুখ দিয়ে কেমন একটা শব্দ বেরোতে থাকে ওর।

দরজায় আবার টোকা, ঠকঠক, ঠকঠক। তারপর ফিসফিস করে কার যেন গলা শুনতে পেল ও, "ও গোবর্ধনদা, ঘুমোলে?"

"কে"! গোবর্ধন জবাব না দিয়ে পারল না। ভূতটুত নয়, নির্ঘাত কোনও মানুষ-টানুষই এসেছে।

"আহা, আগে দরজাট' খুলবে তো! খুলেই দ্যাখো না, আমি কে!"

গোবর্ধন অত বোকা নয়, দরজা খুলতে বলল, আর অমনি খুলে দেবে। এত রাতে যে এসে দরজায় টোকা দেয়, ফিসফিস করে ডাকে, সে যে ভালমানুষ নয়, তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

"কী হল গো গোবর্ধনদা, খুলবে না?"

"খুলতে তো আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি কে আগে বলবে তো?"

"আমি তোমার বন্ধু গো। সেই যে অতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করলাম তোমার সঙ্গে, ভুলে গেলে? তোমার যে বাপু এত ভুলো মন, তা তো জানা ছিল না।"

গোবর্ধন বুঝল, কে এসেছে। লোকটা একটু বেশি কথা বলে ঠিকই কিন্তু খারাপ বলে মনে হয়নি তখন। তবু জিজ্ঞেস করল, "এত রাতে কী চাই তোমার?"

"আহা, দরজাটা আগে খুলবে তো! তুমি কেমন লোক বলো তো!"

গোবর্ধন বলল, "দাঁড়াও খুলছি, কিন্তু অন্ধকার যে! ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে শুয়ে ছিলাম, কে

যে নেভাল বুঝতেই পারছি না।"

"বুঝবে কী করে, লোডশেডিং চলছে গো গোবর্ধনদা। ঘরে অন্য কোনও আলো নেই?"

গোবর্ধন ততক্ষণে দেওয়াল হাতড়ে-হাতড়ে দরজার কাছে চলে এসেছে। এসে ছিটকিনিটা খুঁজে পেতেই দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকাল। ভাল করে অন্ধকারে চেনা যায় না, তবু মনে হল সেই লোকটাই। তেমনি বেঁটেখাঁটো চেহারা।

"যাক বাবা খুলেছ তা হলে। লোকটা সুড়ুত করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ইশ, কী অন্ধকার গো, ঘরে আর আলো নেই?"

"থাকবে না কেন, আছে। কিন্তু দেশলাইটা কোথায় রেখেছি মনে করতে পারছি না।"

তাই নাকি, তা হলে দাঁড়াও, আমার দেশলাইটাই জ্বালাচ্ছি।" বলতে-বলতে ফশ করে দেশলাই জ্বালাল লোকটা।

আর ওই সামান্য একটু আলোয় লোকটার দিকে তাকিয়ে কেমন চমকে উঠল গোবর্ধন, "ওমা তুমি খালি গায়ে কেন গো? আর ও রকম একটা নেংটি পরে কেউ বুঝি পথে বেরোয়?'

লোকটা চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "আহ্, আগে মোমবাতি বার করবে তো!"

"দেশলাই কাঠি তো বেশিক্ষণ জ্বলে না, নিভে গেল।" লোকটা আবার একটা কাঠি জ্বালিয়ে আদেশ করল, "মোমবাতি বার করো দেখি, আগে জ্বালাও।"

গ্যাসের উনুনের কাছেই মোমবাতিটা ছিল, গোবর্ধন মোমবাতিটা তুলে নিতেই টুক করে ঘরের আলোটা আবার জ্বলে উঠল।

"যাক বাবা, বাঁচা গেল তাহলে। মাঝরাতে যে কখনও লোডশেডিং হয়, তা কোনওদিন টেরই পাইনি। যাকগে, এবার স্পষ্ট ও লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে, ওমা গো, এ কী চেহারা তোমার, গায়ে ওসব কী মেখেছ শুনি?"

লোকটা হাসল, "তেল।"

"তেল! তেল কেন? এই রাতে কেউ তেল মাখে নাকি গায়ে?"

আমি মাখি। না মাখলে আমার চলে না।"

"ওমা সে আবার কী কথা?"

"হ্যাঁ গোবর্ধনদা ওটাই কথা। গায়ে জবজবে করে তেল মেখে না রাখলে আমায় ধরে ফেলবে যে।"

"শোনো কথা, কে ধরবে? তুমি কি চোর না ডাকাত?"

লোকটা হাসল, "তাও তো তুমি এখন আমার পুরো মুখটা দেখতে পাচ্ছ, অন্য কোনও জায়গায় গেলে এই কালো কাপড়টা আমি মুখে জড়িয়ে চোখদুটো শুধু বার করে রাখি।"

গোবর্ধনের বিস্ময় যেন কাটতে চায় না, "কেন মুখ দেখালে কী হয়?"

"কী যে হয়, তুমি বুঝবে না। যাকগে, এবার একটা কাজ করো দেখি, বড্ড খিদে পেয়েছে। হাঁড়িতে যদি কিছু ভাতটাত থাকে তো আগে খেতে দাও, খেয়ে নিই।"

গোবর্ধনের এ সময় মনে পড়ল, রাতে ওরও খাওয়া হয়নি। হাঁড়ি ঠনঠন করছে। রাতে ও ভাত রান্না করে খেয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ায় সেসব তখন হয়নি।

"কী হল, হাঁ করে দেখছ কী, ভাতটাত আছে, না নেই?"

গোবর্ধন কাচুমাচু মুখ করে বলল, "নেই। তবে রেঁধে দিতে কতক্ষণ। রাতে তো আমারও খাওয়া হয়নি।"

"কেন, খাওয়া হয়নি কেন তোমার? চাল-ডাল-আলু সবই তো আছে দেখতে পাচ্ছি।"

গোবর্ধন বলল, "রেঁধে খেয়ে নেব ভেবেছিলাম, কিন্তু ভীষণ ঘুম পেল, ঘুমিয়েই পড়লাম।"

"আজব লোক তো তুমি। তা হলে দু'জনের জন্যেই ভাত করো। ঘি-টি কিছু আছে তো? অনেকদিন ঘি-দুধ খাওয়া হয়নি।"

গোবর্ধন বলল, "আছে। কিন্তু সে তো পাওয়া যাবে না, ঘিয়ের শিশি পিসিমা তাঁর আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রেখে গেছেন।"

"বটে, তা হলে ওটা খুলে বার করে নিলেই হবে! তুমি ভাতটা আগে চাপাও তো। বাহ্, এই তো ডিম দেখতে পাচ্ছি, ডিমের ঝোল আর ভাতই রাঁধো। ঘি-ভাত আর ডিম, চমৎকার জমবে খাওয়াটা।"

গোবর্ধনের এবার একটু খারাপ লাগে, ঘিয়ের শিশি পিসিমার আলমারি থেকে বার করে আনাটা তো চুরিরই শামিল। বলল, "না। তুমি কে হে, ঘরে ঢুকে খবরদারি করছ, ওসব ঘিয়ের শিশি-ফিশির দিকে নজর দেওয়া চলবে না।"

লোকটা হাহা করে একটু হাসল, "তারপর বলল, আমি কে? তাই না?"

একটু থমকে দাঁড়াল গোবর্ধন।

লোকটা ততক্ষণে ওর নেংটির ভেতর থেকে চকচকে একটা ধারালো ছুরি বার করে দু'আঙুলে নাচাতে-নাচাতে বলল, "এটা কী? চেনো?"

"আঁ, আঁ।" গোবর্ধনের ভিরমি খাওয়ার মতো ব্যাপার।

লোকটা বলল, "ভয়ের কিছু নেই, এই দ্যাখো, আবার এটাকে আমি ঢুকিয়ে রাখছি। তুমি ভাতটা চাপাবে? না, রাত ভোর করে দেবে?"

গোবর্ধন ভয়ে-ভয়ে বলল, "চাপাচ্ছি।" বস্তা থেকে চাল বার করে ও ধুয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে চাপিয়ে দিল হাঁড়িতে।

লোকটা একটু হাসল, "অত ভয় পাচ্ছ কেন গোবর্ধনদা, তোমাকে আমি বন্ধু ভেবেছি বলেই না এসেছি। আসলে আজ সারাটি দিন একটা দানাও আমার পেটে পড়েনি। এত খিদে পেয়েছে যে, কী বলব। আর তোমাদের বাড়িতে যখন এসেছি ঘি-ভাত না খেয়ে গেলে কি চলে?"

"কেন, সারাদিন খাওনি কেন?"

লোকটা হাসল, "জুটলে তো খাব। তিন দিন ধরে রাত জেগে-জেগে এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে বেড়াচ্ছি, কোথাও থেকেও কিছু সরাতে পারিনি।"

গোবর্ধনের মাথার চুল যেন খাড়া হয়ে উঠল, "তার মানে তুমি চোর?"

লোকটা হাসে, "চোর তো বটেই কিন্তু চোরও তো মানুষ। তোমাদের মতো মানুষ।"

বুক ঢিপঢিপ শুরু হল গোবর্ধনের, শেষটায় চোরই এসে ঢুকে পড়ল তা হলে। লোকটা বলল, "কী ভাবছ? চোর বলে বুঝি খুব ঘেন্না হচ্ছে?"

গোবর্ধন ভেবে দেখল, এখন আর বেগড়বাঁই করা যাবে না। করে লাভও নেই। সারা গায়ে জবজবে করে তেল মাখা, জাপটে ধরে যে চেঁচাবে, তারও উপায় নেই, সুড়ুত করে পালিয়ে যাবে। তা ছাড়া জাপটে ধরতে গেলে আবার সেই ছুরিটা বার করে ওর বুকে ঘ্যাচাং করে বিঁধিয়েও দিতে পারে। তার চেয়ে বরং লোকটার মন জুগিয়ে চলাই ভাল। আগে তো প্রাণ, তারপর অন্য সব।

গোবর্ধন বলল, "না, না, ঘেন্না করব কেন! চোরও তো মানুষ। তবে এর আগে কোনওদিন

তো চোর দেখিনি, তাই"।

লোকটা বলল, "আসলে কী জানো, চুরি না করলে খাব কী বলো দেখি ! সংসারে এত অভাব যে, চুরি ছাড়া উপায় নেই। আজ এই যে মওকামতো তোমাদের বাড়ি এসে ঢুকলাম, টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি, কাপড়চোপড়, ঘটি-বাটি, যা পারি নিয়ে যাব। কয়েকদিন তো সেসব ভাঙিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে।"

গোবর্ধন বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল, বলল, "তা তো বটেই, তা তো বটেই। তোমাদের তো খুব কষ্ট।"

"কষ্ট মানে, সে তোমাকে বলে বোঝানো যাবে না গোবর্ধনদা। যাকগে, ভাত তো তোমার হয়ে এল, এবার চলো দেখি ঘিয়ের শিশিটা নিয়ে আসি।"

গোবর্ধন কী করবে বুঝতে পারে না। আমতা-আমতা করে বলল, "ঘিয়ের শিশিটা কি না হলেই নয়। পিসিমা ফিরে এসে কিন্তু আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে।"

লোকটা একটু দাড়ি চুলকে নিল, "তা হলে তো আবার আমাকে ছুরিটাই বার করতে হয়।" হেঁহেঁ করে হাসতে থাকে।

গোবর্ধন ভয়ে-ভয়ে বলল, "আরে না, না, ছুরি কেন, ছুরি বার করে কী করবে, চলো না ঘর খুলে দিচ্ছি। তবে ঘিয়ের শিশিতে কিন্তু আমি হাত দেব না, তুমি নিতে চাও নেবে।"

লোকটা হাসল, "ঠিক আছে চলো, তোমাকে হাত দিতে হবে না।"

পিসিমার ঘরের তালা খোলে গোবর্ধন, আলো জ্বালে, আর লোকটাও ওর পিছন-পিছন এসে ঘরে ঢুকে পড়ে, "বাহ্ চমৎকার ধবধব করছে বিছানাখানা। ডানলোপিলো নাকি গো, চমৎকার গদি মনে হচ্ছে।"

গোবর্ধন মাথা নাড়ে। মুখখানা বেশ ভার হয়ে রয়েছে ওর।

"তা হলে একটু শুয়ে দেখি তো। কোনওদিন তো এরকম নরম বিছানায় শুইনি। তবু তোমার সঙ্গে আলাপ হল বলেই না একটু শোবার সুযোগ পাচ্ছি।"

গোবর্ধন বাধা দিতে গেল, "এই কী হচ্ছে, কী হচ্ছে?"

লোকটা ততক্ষণে ছুরিটা আবার বার করে নাচাতে-নাচাতে ধপাস করে বিছানায় গিয়ে শুয়েই পড়ল।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল গোবর্ধন।

লোকটা পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে-নাচাতে বলল, "তুমি এবার যাও গোবর্ধনদা রান্নাটা হয়ে গেলে আমায় ডেকো। আর এই যে দেখছ, ছুরিটা আবার হাতে তুলে নাচাল লোকটা, একটু যদি এদিক-ওদিক করার চেষ্টা করো, তা হলে তো বুঝতেই পারছ।"

গোবর্ধন বলল, "না, না, তুমি বিশ্রাম করো, রান্না হলেই তোমাকে পিঁড়ি-গেলাস পেতে যত্ন করে খাওয়াব।"

বলতে-বলতে গোবর্ধন ঘর ছেড়ে আবার রান্না ঘরে এসে ঢুকল। ভাতের মাড় গালল। ডিমের কারি বানাবার জন্য সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে ভাবতে লাগল, কী করে এখন বাঁচা যায় এই চোরটার হাত থেকে। চোরেরা না পারে হেন কাজ নেই। চুরি করে যা-যা নেবার

তো নেবেই, না জানি যাবার সময় গোবর্ধনের গলাতেই ছুরিটা চালিয়ে দিয়ে যায়। ওরে বাবা রে. বিড়বিড় করে উঠল গোবর্ধন।

আর তখনই পিসিমার ঘর থেকে লোকটার গলা পাওয়া গেল আবার, ডিমে একটু গরমমসলা দিও গোবর্ধনদা।"

"তা তো দিতেই হবে।" গোবর্ধন বিড়বিড় করতে-করতে উত্তর দেয়।

"আর ঘরে তোমার পান নেই গোবর্ধনদা ? তুমি পান খাও না ? খাওয়ার পর পান হলে একটু ভাল হত।"

গোবর্ধন রাগে চিড়বিড় করে জ্বলতে থাকে, খাওয়াই জোটে না, আবার পান চাই। কিন্তু রাগ দেখানোটা ভাল হবে না। একটু গলাতুলে বলল. "না, পান নেই। এ-বাড়িতে কেউ পান খায় না।"

"কেমন বাড়ি গো তোমাদের. কেউ পান খায় না। যাকগে, রান্নাটা হল ? তুমি দেখছি রান্না নামাতেই ভোর করে দেবে।"

গোবর্ধন বলল, "হয়ে গেছে। এবার খেয়ে যেতে পারো।"

"রান্না হয়ে গেছে! লোকটা তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল, তারপর এক লাফে রান্না ঘরে। তোমার মতো লোক হয় না গোবর্ধনদা, তুমি খুব ভাল।"

গোবর্ধন আর কথা বাড়ায় না, দু'জনের জন্য ভাত বেড়ে খেতে বসে যায়। রাত এখন কত হল কে জানে।

"বাহ্, চমৎকার হয়েছে কিন্তু। তোমার রান্নার হাত খুব ভাল গোবর্ধনদা।"

গোবর্ধন বলল, "আমার রান্না সবাই পছন্দ করে। তুমি তো আজ প্রথম খাচ্ছ।"

লোকটা হাত চাটতে-চাটতে বলল, "তবু তো ঘি দাওনি। ঘি দিলে আর কথাই ছিল না। যাকগে, একটা কথা শোনো, ঘিয়ের শিশিটা এখানে খরচ না করে আমি বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য বার করে রেখেছি। আর মুখে মাখার একটু ক্রিমও আছে দেখলাম, সেটাও। তা ছাড়া আমার একটু মাথায় মাখার তেল আর শ্যাম্পুও দরকার। ওগুলো কী কী আছে, আমাকে বার করে দিও দেখি। আসলে তোমাদের ঘরে এত জিনিস, কোনটা ফেলে যে কোনটা নিই, সেটাই ভাবছি।"

গোবর্ধন আবার ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকায়। কীভাবে যে লোকটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তাই ভাবতে থাকে!

লোকটা এক ঘটি জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল, "আহ, একে না বলে খাওয়া। কতদিন যে এরকম পেট পুরে খেতে পাইনি, তা আমিই জানি।"

গোবর্ধনও উঠে দাঁড়ায়। লোকটাকে এখন চোখে-চোখে রাখা ছাড়া আর কীই-বা করার আছে ওর।

লোকটা বলল, "এরকম একটা ভোজনের পরে এবার একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে হত!"

গোবর্ধন বলল, "ঘুমোও না, কে বারণ করেছে। তুমি তো পিসিমার বিছানার ওপর শুয়ে গায়ের তেল বিছানায় লাগিয়ে রেখেছ। কাল আমাকে ওসব আবার কাচাকাচি করতে হবে।"

লোকটা হাসল, "তোমাকে একটু কষ্ট দিলাম আর কি! যাকগে, তুমি যখন বলছ, তা হলে একটু ঘুমিয়ে নিই।"

লোকটা আবার পিসিমার ঘরে ঢুকল, ঢুকেই এক লাফে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল।

গোবর্ধনও পিসিমার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই ওর চোখ ছানাবড়া। দেখল, ঘরের মধ্যে দুটো

বিরাট-বিরাট বস্তা। "এ কী করেছ ?"

লোকটা হাসল, "মালপত্র বেঁধেছেঁদে ঠিক করে রেখেছি। একটু ঘুমিয়ে নিই, পরে উঠে নিয়ে যাব।"

গোবর্ধন কী যে বলবে, ভেবে পায় না।

"তুমিও ঘুমোও না গোবর্ধনদা, যখন যাব তোমাকে বলেই যাব।"

গোবর্ধনের মাথায় এবার একটা বুদ্ধি এল। ভাবল, লোকটা একবার ঘুমোলেই ও এক সময় ঘরের বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে দেবে। তারপর চিৎকার করে লোকটাকে ধরিয়ে দেবে। কী মজা !"

"কী হল গোবর্ধনদা, ঘুমোবে না ?"

গোবর্ধন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুমোব।" বলেই মেঝেতে ও শুয়ে চোখ বুজল। তারপর পিটপিট করে মাঝে-মাঝে দেখতে লাগল।

লোকটা এরপর চুপচাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। মুখটা অবশ্য ওদিকে ঘুরিয়ে রেখেছে, ঠিক ঘুমিয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটুও নড়ছে না, সাড়া-শব্দও নেই। গোবর্ধন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ভাল করে আর একটু ঘুমিয়ে নিক না, তারপর উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে হবে।

আরও কিছুক্ষণ পর এক সময় ঘাড় তুলল গোবর্ধন, ঘাড় তুলে উঠবার জন্য একটু চেষ্টা করতেই লোকটা পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছ গোবর্ধনদা ?"

গোবর্ধন বেশ লজ্জা পেয়ে গেল। কী শয়তান দেখেছ, একটুও ঘুমোয়নি তাহলে। বলল, "যাচ্ছি না তো, শুয়েই তো আছি।"

হ্যাঁ, শুয়েই থাকো, ঘুমোও।"

গোবর্ধন আর কথা বলে না। আবার মাথা নিচু করে শুয়ে পড়ে।

আবার কিছুক্ষণ কেটে গেল। এবার একেবারে নিশ্চিন্ত না হয়ে উঠবে না গোবর্ধন। মাঝে-মাঝে পিটপিট করে তাকায়। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেলে হঠাৎ মনে হল লোকটা এবার ঘুমিয়েছে। নাক ডাকতে শুরু করেছে। বাঁশির সুরের মতো খুব ধীরে-ধীরে নাক ডাকছে। যাক বাবা, এবার নির্ঘাত ঘুমিয়েছে। এই মওকা। ধীরে-ধীরে উঠে বসল গোবর্ধন। আর ঠিক তক্ষুনি আবার লোকটার নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল।

"কী গোবর্ধনদা, কোথায় যাচ্ছ ?"

গোবর্ধন আবার লজ্জা পেয়ে গেল, "কোথাও না তো !" বলতে-বলতেই আবার শুয়ে পড়ল। আশ্চর্য লোকটা বোঝে কী করে গোবর্ধন উঠছে। লোকটা সত্যি-সত্যি ম্যাজিক জানে।

গোবর্ধন অসহায়ভাবে আবার চোখ বুজল। মহা ফ্যাচাংয়েই পড়া গেল দেখছি। লোকটা মালপত্র বস্তা করে বেঁধে রেখেছে, কখন যে উঠে ওগুলো নিয়ে পালাবে কে জানে।

যাকগে ওর কী করার আছে। চোরের হাতে তো জীবন দিতে পারে না ও। চোখ বুজেই রইল এরপর। আর সত্যি-সত্যি এবার গোবর্ধনই ঘুমিয়ে পড়ল। ওরই নাক ডাকতে লাগল।

চারপাশ বেশ ফরসা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল গোবর্ধনের। লোকটা খাট থেকে নেমে গোবর্ধনকে ডাকছে, "ও গোবর্ধনদা, ওঠো, ওঠো।"

গোবর্ধন লাফিয়ে উঠে বসল। "কী হয়েছে ?"

"কী হয়েছে মানে, দেখছ না ভোর হয়ে গেছে। কী কেলেঙ্কারি বলো তো !"

"কেন, কেলেঙ্কারি কেন?"

"বাহ্ রে। মালগুলো নিয়ে যাব বলে বেঁধে রাখলাম, এখন এগুলো নিয়ে বেরোই কী করে। বাইরে বেরোতে গেলেই তো লোকে দেখে ফেলবে, সন্দেহ করবে।"

গোবর্ধন কাচুমাচু মুখ করে বলল, "তাই তো! তা হলে আর কী করা যাবে! বোসো, চা করে দিই, খেয়ে যাও।"

লোকটা এবার খেঁকিয়ে উঠল, "তুমি কী ক্যাবলা বলো তো গোবর্ধনদা, আমায় ডাকতে পারলে না!"

গোবর্ধন বলল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে।"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে!" লোকটা ভ্যাঙাল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে চোখের নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল।

গোবর্ধন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বারান্দায় রোদ বিছিয়ে পড়েছে। ব্যাটা আবার যদি আসে,দরজাই খুলব না আর।

গোবর্ধন বস্তা দুটো খুলে জায়গামতো জিনিসপত্রগুলো আবার গুছিয়ে রেখে চা বানাবার জন্য রান্নাঘরে ঢুকল। যাক বাবা, রাতটা তো, কোনওরকমে কাটানো গেছে। আর নয় বাবা, লোকটা যতই ডাকুক, আর দরজা খুলবে না গোবর্ধন।
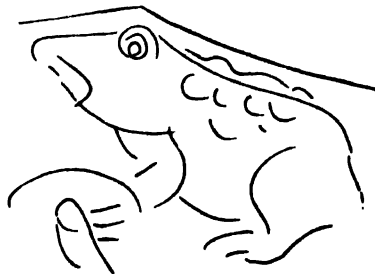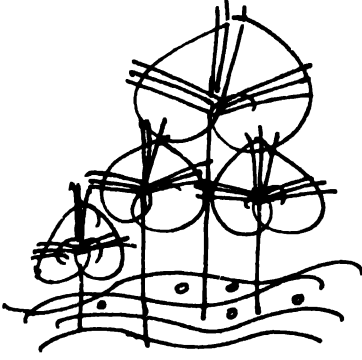
অলৌকিক চাকতি-রহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আমার ভাগনে ডন সেদিন ঘরে ঢুকে চাপা গলায় বলল, "মামা! মামা! আলাদিন।"

"আলাদিন মানে?" অবাক হয়ে তাকালুম ওর দিকে। ডনের চোখেমুখে রহস্য ঝিলিক দিচ্ছে। ঠোঁটের কোনায় কেমন একটা হাসি। একটু একটু হাঁফাচ্ছে। মনে হল, খুব দৌড়ে এসেছে শ্রীমান।

ডন বলল, "আলাদিন মানে ম্যাজিক ল্যাম্প। পেয়ে গেছি মামা।"

হাসতে হাসতে বললুম, "বেশ তো, এবার ওটা ঘষে দ্যাখ, দত্যি দানা বেরোয় নাকি।"

ডন হাতের মুঠো খুলে আমার দিকে হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ?"

ওর হাতের চেটোয় একটা ছোট্ট চাকতি। আগে যেমন তামার পয়সা ছিল, তেমনি দেখতে। শ্যাওলা রঙের জং ধরে আছে। দেখে নিয়ে বললুম, "হ্যাঁ রে, তবে যে বললি আলাদিনের ম্যাজিক ল্যাম্প! এ তো দেখছি একটা চাকতি! এটা ঘষে কি দত্যি বেরোবে? বড়জোর কষ্টেসিষ্টে একটি টিকটিকি বেরুতে পারে।"

ডন গম্ভীর হয়ে বলল, "না মামা। এটা আলাদিনের নাম্বার টু। এর ম্যাজিক একেবারে অন্যরকম।"

"কীরকম, শুনি?"

ডন ঝটপট এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "খুব সিক্রেট ব্যাপার, মামা। তুমি আর আমি ছাড়া কেউ যেন না জানতে পারে। এই চাকতিটা যদি ভালুককে খাইয়ে দাও, ভালুকটা গাধা হয়ে যাবে। আবার গাধাকে খাইয়ে দিলে গাধাটা ভালুক হয়ে যাবে। দারুণ ম্যাজিক, তাই না?"

মুখটা ওর মতো গম্ভীর করে বললুম, "তাই বুঝি? তুই নিশ্চয় পরীক্ষা করে দেখেছিস?"

ডন আনমনে বলল, "এখনও দেখিনি। সেজন্যেই তো তোমার কাছে এলুম। একা টেস্ট করতে সাহস পাচ্ছি না, মামা।"

ওকে সাহস দিয়ে বললুম, "ভাবিস নে। আমি তোর সঙ্গে আছি। তবে তার আগে গোড়ার কথাটা বল তো বাবা, এ চাকতি তুই পেলি কোথায়? আর এটার অমন ম্যাজিকের কথাই বা জানলি কীভাবে?"

ডন এতক্ষণে শান্ত হয়ে বসল। তারপর চাকতি-রহস্য ফাঁস করল। চাকতিটা তাকে দিয়েছে বুধিরাম ভালুকওয়ালা। বুধিরামকে আমি কখনও দেখিনি। তার ভালুকটাও দেখিনি। তবে এই ছোট্ট শহরে মাঝে মাঝে ভালুকওয়ালারা ডুগডুগি বাজাতে-বাজাতে ভালুকের নাচ দেখাতে আসে। কুকুরগুলো তাতে বেজায় রেগে যায়। ভালুকওয়ালা পাড়া ছেড়ে গেলেও পাড়ার কুকুরদের রাগ কতক্ষণ পড়ে না। তাদের গজরানি শুনে টের পাই, হুঁ—ভালুকের নাচের আসর বসেছিল পাড়ায়।

তো বুধিরাম ডনকে দু টাকায় চাকতিটা বেচে গেছে। এই অলৌকিক চাকতি বুধিরাম পেয়েছিল হরিদ্বারে এক সাধুর কাছে। ঝড়-জলের রাতে বনের ভেতর ভালুকের বাচ্চা ধরতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল বুধিরাম। অনেক কষ্টে একটা পাহাড়ি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে ছিলেন সেই সাধু। কিন্তু তিনি অসুস্থ। বুধিরাম তাঁর সেবাযত্ন করেছিল। তবু বাঁচাতে পারেনি। মৃত্যুর আগে সাধু বাবা তাকে চাকতিটা দিয়েছিলেন।

বুধিরাম চাকতিটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। বাচ্চা ভালুকটাকে নাচ আর হরেকরকম খেলা শিখিয়ে বড় করেছিল। এর পর একদিন নদীর ধারে শীতের রোদে বসে বুধিরাম ছাতু খাচ্ছে। তার ভালুকটা পাশে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। হঠাৎ হল কি, ভালুকটা বুধিরামের ঝোলার কোণটা চিবুতে শুরু করল। প্রথমে বুধিরাম অতটা লক্ষ্য করেনি। তারপর দেখল, ভালুকটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। সটান দু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আচমকা অবিকল গাধার মতো একখানা ডাক ছাড়ল। বুধিরাম হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। দেখতে দেখতে ভালুকের কালো চেহারা সাদা হয়ে যাচ্ছে। গড়নও বদলাচ্ছে।

তারপর ফের একবার ডাক ছাড়তেই তাজ্জব বুধিরাম দেখল, তার সাধের ভালুক স্রেফ গাধা হয়ে গেছে এবং গলায় বকলেস ও শেকল সমেত চারঠ্যাঙে নড়বড় করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ছাতু খাওয়া ফেলে বুধিরাম চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ল। "আরে উল্লুক। করছিস কী। তুই গাধা নাকি? তুই তো ভালুক আছিস।"

ভালুক বা গাধা কানে নিল না। ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে ওপাশের মাঠে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণে বুধিরাম টের পেল কী হয়েছে। ওর ঝুলির তলার নানান টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে সাধুবাবার চাকতিটাও রেখে দিয়েছিল। হাঁদারাম ভালুক ঝুলির কোণসুদ্ধ চাকতিটা গিলে ফেলেই এক গণ্ডগোল!

বুধিরামের তখন মহা সমস্যা। শিক্ষিত ভালুক হাতছাড়া হলে রোজগার বন্ধ। সে দৌড়ল। মাঠে গিয়ে দেখল, তার নির্বোধ জানোয়ারটা গিয়ে পড়েছে এক ধোপার পাল্লায়। ধোপার নাম রামু। রামু ঝিলের ধারে কাপড় কেচে শুকোতে দিয়েছিল। সবে জড়ো করে প্রকাণ্ড বোঁচকা বেঁধেছে, এমন সময় গাধাটা পেয়ে তার সুবিধেই হল।

আসলে হয়েছে কি, রামুর একটা গাধা ছিল। গাধাটা কদিন আগে হারিয়ে গেছে। এই গাধাটা দেখে রামু ভেবেছে, তারই সেই হারানো গাধার সুবুদ্ধি হয়েছে এবং মনিবের কাছে ফিরে

এসেছে। গলায় বকলেস আর শেকল দেখে রামু দুঃখ করে বলল, "আহা! কোন বদমাশের পাল্লায় পড়েছিলি বাবা? দেখ দিকি, গলায় বকলেস আর শেকল পরিয়ে বেঁধে রেখেছিল! চল, চল। বাড়ি গিয়ে খুলে দোব'খন।"

বোকা জানোয়ারটা দিব্যি রামুর প্রকাণ্ড বোঁচকা পিঠে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এতটুকু আপত্তি করছে না দেখে বুধিরামের চোখে জল এসে গেল রাগে আর দুঃখে। মনে মনে বলল, 'বটে রে নেমকহারাম!' তারপর সোজা এগিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, "অ্যাই বেটাচ্ছেলে! তুই গাধা, না ভালুক? ফেলে দে বোঁচকা। ফেলে দে বলছি।"

ব্যাস, রামুর সঙ্গে বুধিরামের ঝগড়া বেধে গেল। রামু বলে, "এ আমার গাধা!" বুধিরাম বলে, "কক্ষনো না, এ আমার ভালুক!" গণ্ডগোল শুনে ভিড় জমে গেল। ঝগড়াঝাটিতে ভিড় জমলে যা হয়, একদল রামুর পক্ষে, আরেকদল বুধিরামের পক্ষে। তার ফলে মারামারি বেধে যায় আর কি! খবর পেয়ে থানা থেকে দারোগাবাবু এক দঙ্গল সেপাই নিয়ে হাজির। দারোগাবাবু সব শুনে এক কথায় মীমাংসা করে দিলেন। "বেশ! সাধুর চাকতি খেয়েই যদি বুধিরামের ভালুক রামুর গাধা হয়ে থাকে, তাহলে চাকতিটা ওর পেটেই আছে। পেট চিরে দেখলেই বোঝা যাবে।"

এতে কিন্তু রামুর যত, তত বুধিরামেরও আপত্তি। জানোয়ারটা মারা পড়বে যে! শেষে রামুই একটা ফিকির বাতলে দিল। নাদি হাতড়ে দেখবে, চাকতি আছে নাকি। থাকলে আলবাত যার জানোয়ার তাকে ফেরত দেবে। বুধিরাম অগত্যা রাজি হল।

সাধুর চাকতি যাবে কোথায়? পরদিনই গাধার আস্তাবলে পাওয়া গেল। তখন রামু

বুধিরামকে বলল, "ভাই বুধিরাম! গাধাটা দিলে আমি কষ্টে পড়ব। তার চেয়ে বরং তুমি কিছু টাকা নাও। ভালুক তো তুমি জঙ্গল ঢুঁড়লে পেয়ে যাবে বিনি পয়সায়। গাধা তো বিনি পয়সায় জঙ্গলে পাব না।"

বুধিরাম ভেবে দেখল, মন্দ হবে না। সে টাকা নিয়ে চলে এল। রামু-ধোপার বাড়িতে সেই আজগুবি ভালুক বা গাধা, কিংবা গাধা বা ভালুক যাই হোক, বহাল তবিয়তে আছে। কাপড়ের বোঁচকা বইছে। মন ভাল থাকলে গানও গাইছে গলা ছেড়ে। বুধিরাম ফের একটা ভালুক যোগাড় করেছে জঙ্গল ঢুঁড়ে। তবে এখনও পোষ মানেনি তত। মাঝে মাঝে পালিয়ে যায়। খুঁজে নিয়ে আসে বুধিরাম।...

অলৌকিক চাকতির গুপ্তরহস্য ফাঁস করে শ্রীমান ডন বলল, "চাকতিটা পেয়ে একটা কথা ভাবছি, মামা। যা খেয়ে ভালুক গাধা হয়ে যায়, তা খেয়ে গাধাই বা ভালুক হবে না কেন?"

সায় দিয়ে বললুম, "ঠিক বলেছ। তাই তো হওয়া উচিত।"

ডন ফিসফিস করে বলল, "কাকেও বোলো না মামা। রোজ বিকেলে দেখি, ঝিলের ধারে ধোপাদের গাধা চরে বেড়ায়। খাইয়ে দেব চাকতিটা। কিন্তু একা যে পারব না। তোমার হেল্প্ চাই মামা!"

মনে মনে আঁতকে উঠে বললুম, "বেশ তো। আগে তুমি একা চেষ্টা করে দেখ। না পারলে আমি তো আছি!"

ডন উৎসাহে প্রায় নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেল। বুঝলুম, বেচারা গাধাদের বরাতে কিংবা উলটে ডনের বরাতেই কিছু একটা আছে। গাধাকে চাকতি গেলানো কি সহজ কথা?

বিকেলে দূর থেকে দেখলুম, শ্রীমান ডন মাঠে ওৎ পেতে আছে। একটা গাধা আনমনে চরছে। একটু পরে ডন কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হুঁ, বুদ্ধি আছে শ্রীমানের। একগোছা ঘাসের ভেতর চাকতিটা গুঁজে গাধাটার মুখের সামনে ধরল। অবাক হয়ে দেখলুম, গাধাটা দিব্যি ঘাসের গোছা মুখে পুরে দিল। এবার আমার গা শিউরে উঠল। সত্যিই কি কিছু ঘটবে? সেকেণ্ডগুলো লম্বা মনে হচ্ছিল। মিনিটগুলো কাটতে চায় না। গাধাটা আকাশের দিকে আচমকা একটা বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল। তারপর ওপাশের জঙ্গলের দিকে দৌড়ল। চোখে কি ভুল দেখছি, গাধাটার গায়ের রঙ যেন বদলে ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য সূর্য ডুবে গেছে। রোদ আর নেই। ছাইরঙা আলোয় গাধার গায়ের রং ধূসর দেখানোও স্বাভাবিক। তাতে বেশ খানিকটা দূরে আছি। ডনকে দেখলুম। পা টিপে-টিপে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল। তারপর আর কাকেও দেখতে পেলুম না। না গাধা না ডন।

মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ ডন প্রায় ডিগবাজি খেয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল এবং দিশেহারা হয়ে দৌড়তে থাকল। চেঁচিয়ে ডাকলুম, "ডন! ডন! কী হয়েছে?"

আমাকে দেখে ডন দৌড়ে কাছে এল। হাফাতে হাফাতে বলল, "গাধা মামা, গাধা! ভালুক হয়ে গেছে!"

শিউরে উঠে বললুম, "বলিস কী! চল তো দেখি।"

ঝিলের ধারে জঙ্গলটার ভেতর কতকালের একটা ভাঙা মন্দির আছে। তখনও আলো মরেনি। ডনের ইশারা-মতো উঁকি মেরে দেখি, মন্দিরের চত্বরে সত্যি একটা কালো ভালুক সামনের দু ঠ্যাঙ খাড়া করে বসে আছে। কী হিংস্র চেহারা!

তা তো হবেই। চাকতির ম্যাজিক। ফিসফিস করে বললুম, "এখন আর কিছু করার নেই।

কাল সকালে বরং ভালুকটার একটা ব্যবস্থা করা যাবে। হিড়িক ফেলে দেব আমরা। পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে যাবে দেখবি।"

ডন খুশি হয়ে বলল, "আমরা নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাব, কী বলো মামা?"

"তা আর বলতে?" বলে আমরা মাঠে ফিরে এলুম। সেই সময় দেখি হাতে একটা ছড়ি নিয়ে ব্যস্তভাবে একটা লোক আসছে। তার কাঁধে ঝুলি। অন্য হাতে একটা ডুগডুগি। আমরা দাঁড়িয়ে গেলুম।

লোকটা সেলাম দিয়ে বলল, "বাবুজি! এদিকে একটা ভালুক দেখেছেন? আমার ভালুকটা পালিয়ে এসেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ডন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "বুধিরাম, বুধিরাম! ওখানে একটা ভালুক আছে কিন্তু। খবর্দার, ওটা তোমার ভালুকটা ভেবে বোসো না বলে দিচ্ছি।"

"জরুর" বলে মুচকি হেসে বুধিরাম দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকল। আমি গম্ভীর হয়ে ডনের হাত ধরে বললুম, "বাড়ি আয় ডন!" এই সময় আবছা আঁধারে কোথাও একটা গাধা ডেকে উঠল। সাধুর চাকতি গলায় আটকে যায়নি তো গাধাটার? ডনটা বড্ড বাজে ঝামেলা করে।
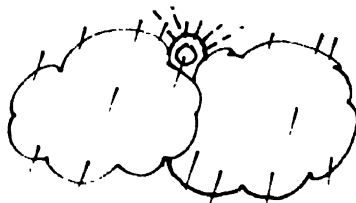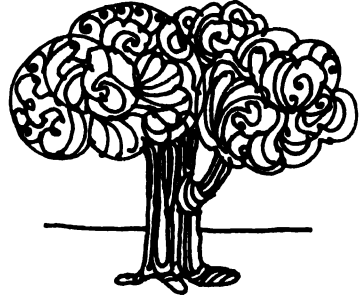
দোলনার মিছিল

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা নয়—এই কটা বছর আগে মাত্র। তখন সেই শীতের সন্ধ্যায় চুপচাপ স্তব্ধতা আরও যেন বেশি। মনে হবে সন্ধ্যা পেরিয়েছে, আর এই মুহূর্তে রাত্রির শুরু। কলকাতার ময়দানের দিকে চোখ ঘুরে ঘুরে কোথাও এসে থামতে পারে না যেখানে দিনের গড়ের মাঠের টুকরো কোলাহলের যৎকিঞ্চিৎও পড়ে আছে। বিশ্বাস হয় না সারাদিনের প্রাণোজ্জ্বল রোদ এই তল্লাট জুড়ে অবিরাম খেলা করেও ফুরতে পারেনি। চাঞ্চল্যে আর উত্তাপে সমস্ত মাঠের ঘাস, গাছের পাতা কেঁপেছে। এখন কিন্তু কিছুই চোখে পড়ে না। চতুর্দিক অন্ধকার। অন্ধকারকে বন্দী করার জন্য সেই সকাল দুপুর থেকে কারা যেন জাল ছড়িয়ে রেখেছিল। অদৃশ্য সেই জাল কারও চোখে পড়েনি। এখন ধরা পড়েছে রাশি রশি অন্ধকার সকলের অলক্ষ্যে।

মাঠে বসে আছে কেউ কেউ, কোথাও কোথাও বা অনেকেই। ডিসেম্বর মাস আসতে আর মাত্র কটা-দিন বাকি। তাই জমিয়ে শীত পড়ার আগে এই সময়টা উপভোগ্য। শীতের হাওয়া মাঝে মাঝে ভয় দেখাচ্ছে।

অন্ধকারে কেউ নজরে আসে না। যারা বসে আছে তারা বুঝি সবাই অন্ধকারে আধ গলা ডুবে আছে। দূর থেকে বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপনের নীলচে আলো এসে যেখানে অন্ধকারকে একটু আধটু হঠাবার চেষ্টা করেছে সেখানে কারও কারও মাথা আলো-অন্ধকারে নড়াচড়া করতে দেখা যায়।

খিদিরপুরে পানবাজারের দিকে যে বেসরকারী বাস যায় সেই বাসের সিট থেকে এইটুকু নজরে আসে। চতুর্দিকে অন্ধকারের আবরণ, আর দূরে রূপালী পর্দার ছবির মতো নানা বিজ্ঞাপনের চিত্র। ইলেকট্রিক ফ্যানের পাখাকটি বুঝি এইবার ঘুরতে শুরু করবে, সেলাইয়ের

কলের চাকা ঘুরল বলে ; কেউ মিষ্টান্নের পাত্র হাতে হাসছে, বিতরণের অপেক্ষায় শুধু। এদিকে মেট্রো সিনেমার ললাটের আলোকদ্যুতি। লিপটনের চায়ের বিজ্ঞাপনে কেটলী থেকে তরল উষ্ণ চা ক্রমাগত কেউ ঢেলে চলেছে।

চারিদিকের অন্ধকার, শীতের হাওয়া, বিজ্ঞাপনের আলো আর তার সঙ্গে পাঞ্জাবী বাস কর্মীদের নিজস্ব ভাষার আলাপ। চোখে দেখা আর কানে শোনা এই সব দৃশ্য আর শব্দ ছাড়াও আরও একটি দৃশ্য ও শব্দের উল্লেখ করতে হয়।

বাসের একখানি সিট দখল করে আমি যখন এইসব দেখছি-শুনছি, তখন দেখেছি এক ভিখারিনী কাঁধে অর্ধোলঙ্গ শীর্ণ শিশুপুত্রকে নিয়ে জানালার কাছে হাত বাড়িয়ে। ভিক্ষুকদের ভাষা যা হয়ে থাকে তাই। একটা কথাও বেশি কি কম বলেনি। শুধু বার বার বলেছে একটা কথাই।

বাসযাত্রীদের অনেকেই বিরক্ত বোধ করেছে। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কেউ। কেউবা ক্লান্তি বোধ করেছে। আমিও ক্লান্ত বোধ করেছি। কিন্তু পয়সা দিয়েছি ভিখারিনীর হাতে। কেন জানি আমার চোখ পড়েছিল শীর্ণ ক্লান্ত ঘুমন্ত শিশুর মুখের উপর সহসা-ই।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি তাকে। অঘোর ঘুমে দু-চোখের পাতা দুটো বোঁজা। মার শীর্ণ কাঁধের উপর মাথাটা হেলান। তার আহারের কথাটা বলতে পারিনা। তবে পোশাক দেখে মজা পাবারই কথা। গায়ে একটা পুরনো ফাটা বহুমলিন জামা, এক পায়ে গরম একপাটি মোজা, মাথায় শতছিন্ন একটি কান ঢাকা টুপি। বাতাসের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এ-রকম ব্যবস্থা। কিন্তু টুপির গায়ে এতগুলো ফুটো যে যে-পথে খুশি বাতাস ঢুকতে পারে আর হাড়-কাঁপানো শীত কাঁপাতে পারে। মাথার ওপরে তারার আকাশ। প্রত্যেকটিকে মনে হয় সমান উজ্জ্বল, রূপোর সাদা ফুলের মতো। চাঁদের রাজ্য পৃথিবীর মাথা জুড়ে মস্ত নীল ছাতার মতো। সেই রাজ্যের অগুনতি প্রহরীর মতো এই ছড়ানো রূপালী তারার দল।

স্টার্ট দেওয়ার আগে বাস যখন ঝাঁকুনি দিল তখন দেখলাম ভিখারিনী শেষবারের মতো ভিক্ষা প্রার্থনা করে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে।

আমি আরেকবার তার শীর্ণ কাঁধের ওপর ঘুমন্ত শিশুকে লক্ষ্য করলাম। আর এইবার এতক্ষণে বাস চলতে শুরু হওয়ার মুহূর্তে আমার মনে এল একজোটে অনেক অনেক কথা। অনেক আগে পড়া একটা সুন্দর গল্পের মতো কিংবা অনেক দিন মনে-মনে ভাবা একটা তৈরি কাহিনী, প্রায় চিরকালের রূপকথার কাহিনীর মতো।

বাস চলতে শুরু করলে আমি দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ মিনিট যাত্রার কথা ভেবে বাস্তবিক ক্লান্তি অনুভব করলাম। আর ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে আমি আমার মনের অনেক অনেক কথাগুলো বেশি করে ভাবতে আরম্ভ করেছি।

মনে করতে পারছি না আমি আদৌ জেগে জেগে এত সব ভেবেছি, না বাসের সিটে বসে স্বপ্ন দেখেছি। আমি ওই পথে অনেকদিন হলো ওই বাসে যাইনি। আবার যদি কখনও যাই তো ভেবে দেখার চেষ্টা করব, স্বপ্ন না জেগে-জেগে মনের ভাবনা। অবশ্য যদি সেই শীর্ণ মলিন শিশুকে আবার দেখতে পাই।

আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম এই মহানগরীর সহস্র-শত শিশু এই শীতের রাতে সমস্ত শরীর গরম পোশাকে ঢেকে, পায়ে গরম মোজার ঢাকা দিয়েছে, মাথায় কানঢাকা টুপি পরেছে, আর এইভাবে শীতকে বন্দী করেছে।

ঘরে ঘরে দোলনা আর সেই দোলনার বিছানায় এই শিশুর দল দোলনা দুলছে আর সেই সঙ্গে দোলনার গান—

ছোট্‌টো ছেলে ঘুমিয়ে আছে
মা আছে তার কোথাও কাছে
তারার ফুলের লক্ষ গাছে
ঘুমের পরী নাচে

দোলনা জুড়ে ছোট্‌টো ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

আমি স্পষ্ট দেখলাম অসংখ্য দোলনা আর সেই দোলনায় শিশুর দল। শুনলাম অসংখ্য মায়ের কণ্ঠ আর সেই সব কণ্ঠে দোলনার গান।

তারপর শুনলাম অবিরত নিঃশ্বাসের ক্রমাগত ওঠাপড়া। দোলনার গান শুনতে শুনতে ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে কোথাও শীতের হাওয়া নেই, গায়ে শীতের হাওয়া কোথাও আঁচড় কাটে নি।

লোকে ঘোড়ায় চেপে যায়, হাতীর পিঠে চাপে, পালকি চাপে। ছোট্টো ছেলের দল চলেছে দোলনায় চেপে। সারি সারি দোলনা চলেছে উটের সারির মতো। রেলগাড়ির কামরাগুলো যেমন থাকে একখানার পিছনে আর একখানা এও সেই রকম। দোলনার সারি চলেছে আর সেই দোলনায় ঘুমন্ত শিশুর দল।

আমি স্পষ্ট দেখলাম হাউই যেমন ওপরে উঠে যায়, তারা-বাজী যেমন ওপরে উঠে আকাশের গায়ে তারার মালা হয়ে জ্বলে, দোলনার সারিও ওপরে উঠছে, যেন তারাদের পাহারা পেরিয়ে চাঁদের রাজ্যে পাড়ি দেবে, অনেক গভীর রাতে সেখানে শিশুদের আকাশ জোড়া সভা বসবে।

আমি যেন তন্দ্রা থেকে সজাগ হয়ে প্রত্যেকটি দোলনার শিশুর মুখ লক্ষ্য করতে লাগলাম। অনেক মুখ চেনা মনে হলো, আবার বহু মুখ অচেনা। আমি যেন কোন একটি বিশেষ মুখের অপেক্ষায় ছিলাম। কার মুখ আমি আসলে দেখতে চাইছিলাম আমার নিজের কাছেও স্পষ্ট ছিল না। তারপর সহসাই মনে হলো আমি কোন একটি দোলনায় সেই ভিখারিনীর শীর্ণ শিশুকে দেখতে চেয়েছি।

আমি প্রত্যেকটি দোলনার গতি লক্ষ্য করতে লাগলাম। দোলনার মিছিল চোখের সামনে দিয়ে দীর্ঘ রেখার মতো ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে। অসংখ্য নিদ্রিত সুখী শিশুমুখ দোলনার শয্যায়। আমি আশা করে আছি এইবার দেখব সেই মুখ। আর সব শিশুর মতই তার মুখে হাসি। তার দেহ গরম পোশাকে ঢাকা, পা দুখানা গরম মোজায় মোড়া আর কান ঢাকা গরম টুপি—যার গায়ে একটিও ছিদ্র নেই। কখন আসবে তার দোলনা আর সেই দোলনার কোমল শয্যায় তার ঘুমন্ত মুখ।

আমার কেমন আশঙ্কা হলো। অগণন এই দোলনার মিছিলে আমি কি তবে লক্ষ্য করতে ভুল করেছি। কোন ফাঁকে দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তার দোলনা।

আর এমনি আশঙ্কায় আমি আরও বেশি সজাগ হওয়ার চেষ্টা করলাম।

কত দোলনা, কত রকমের মুখ, রঙীন বেলুনের মতো হরেক রকমের মাথার কানঢাকা টুপি, রঙ-বেরঙের মোজা—সোজা চলেছে একের পর এক গ্যাস বেলুনের মতো ওপর দিকে।

আমি দেখলাম হাজারো তারা পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। রাত্রির আকাশে তারাগুলো যথার্থ প্রহরী, তাদের অতি উজ্জ্বল আলো প্রহরীর হাতের মশাল। চাঁদের রাজ্যে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আশ্চর্য, তারাদের প্রহর পেরিয়ে দোলনার মিছিল চলল, নক্ষত্রের গোলক ধাঁধা পেরিয়ে। একটি একটি করে দোলনা চোখের আড়াল হতে লাগল। তারকা-প্রহরীদের ছাড়পত্র পেয়ে চাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। আমার চেনা মুখের দেখা এখনও পেলাম না, কোন একটি দোলনায় তো সেই ঘুমন্ত মুখ দেখা দিল না। এদিকে দোলনার মিছিলও ছোট হয়ে এসেছে।

প্রত্যেকটি দোলনার শিশু ঘুমন্ত, আর সেই নিদ্রিত শিশুর গায়ের জামা, মাথার টুপি, পায়ের মোজা এ-সব কিছু দেখেই নক্ষত্র প্রহরীরা খুশি হয়ে তাদের চাঁদের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার দিয়েছে।

এইভাবে দোলনার সংখ্যা ক্রমশ কমতে কমতে যখন মাত্র পাঁচ দশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে তখনই বুঝি একটু আধটু নজরে এল।

একেবারে শেষের দোলনার গায়ে ওটা কি?

যখন একেবারে শেষ দোলনাটা এল তখন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দোলনার মাথাটি চেপে ধরে ঘুমন্ত অবস্থায় ঝুলছে সেই অতিশীর্ণ অতিমলিন ভিখারী শিশু। মনে হলো দোলনাটাই বুঝি তার মা-র বাহু, জীর্ণ কাঁধ।

আজ শীতের এই রাত ক্রমে বড় হবে, এক সময় গভীর রাতে চারিপাশের ক্রমস্তব্ধতার সঙ্গে হাওয়ার ছুরি আরও তীক্ষ্ণ হবে, শীতের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। তখন জগৎশিশু স্বপ্নের সুনীল আকাশে তারকার বিচিত্র নক্সাকাটা গোলক ধাঁধার পথ পেরিয়ে স্নিগ্ধ শুভ্র চাঁদের আলোর রুপার রাজ্যে প্রবেশ করে, সেখানে শিশু মেলার অবিরাম কোলাহলে রাত্রির প্রহরগুলি পার হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে দোলনার শিশুশয্যায়। অতিশীর্ণ অতিমলিন শিশুও তো সেই জগৎ শিশুসভার একজন। সেই বা কেন পড়ে থাকবে—

আকাশ যখন তারায় জ্বলে
চাঁদের দেশে শিশুরা চলে
মায়ের কোল কি কৌশলে
এড়িয়ে চলে সদলবলে

গাছের পাতা অন্ধকারে
ঝিমিয়ে আছে হিমের ভারে
মানুষ ভরা এ সংসারে
সকল শিশু শয্যা ছাড়ে

শীর্ণশিশু মলিন অতি
তুমিও বুঝি চপলগতি
মিলেছ এসে এ শিশুমেলায়
চাঁদের তারার আলোর খেলায়

সে-ও মা-র শীর্ণ কোল ছেড়েছে। গায়ের জামা, মাথার টুপি, পায়ের মোজার কথা ভুলে দোলনার পিছু নিয়েছে।

শেষ দোলনার সঙ্গে তারকার পাহারা পেরিয়ে সে-ও এইবার চাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করল বলে।

কিন্তু ঠিক এই সময় বাধল কোলাহল। আমার মনে হলো সমস্ত আকাশটা বিদ্যুতের আলোয় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঝিকিয়ে উঠল। মনে হলো তারার রাজ্যে হঠাৎ গণ্ডগোল বেধেছে, শহরের ভিড়ে হাতাহাতি মারামারি হলে যেমনটি হয়।

আমি বুঝতে পারলাম শেষ দোলনাটাও যখন তারকা প্রহরীদের অনুমতি পেয়ে চাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, গোলমাল তখনই শুরু হয়েছে।

ভিখারী শিশুটি চাঁদের রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি পায়নি। তার দোলনা নেই, গায়ের গরম

পোশাক নেই, মাথায় নতুন টুপি নেই, নেই পায়ে এক জোড়া মোজা। চাঁদের রাজ্যের দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে সে কেঁদেছে।

তার কান্নার শব্দে শেষ দোলনার ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভেঙে গেছে। সে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়েছে। তাকে দাঁড়াতে দেখে আগের দোলনার শিশুর ঘুম ভেঙেছে, তাকে দেখে তার আগের দোলনার শিশুর, এইভাবে তারও আগের দোলনার শিশুদের।

তারকা প্রহরীরা সবাই বুদ্ধিবিবেচনা হারিয়ে ফেলেছে। তারা তো বিবেচনা মতো সকলকেই অনুমতি দিয়েছে। তবে কেন এই দুর্ঘটনা। জগৎশিশু সভার মেলায় তো হাঙ্গামা হবার কথা নয়!

শেষ দোলনার শিশুটি থেকে প্রথম দোলনার শিশু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে কোলাহল। দোলনার কোন শিশু আর নিদ্রিত নেই।

সবাই চায় সেই অতিমলিন অতিশীর্ণ শিশুকে চাঁদের দেশে। তাকে নিয়েই এই গণ্ডগোল। হাঙ্গামা হুজ্‌জুত।

ছেলের দল কিছুতেই ছাড়বে না, আর নক্ষত্রপ্রহরীরা কিছুতেই সেই ভিখারী শিশুকে অনুমতি দেবে না। কোলাহল কলরব ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আর ঠিক এমন মুহূর্তে—

কড় কড় কড়
ডাকল মেঘ
পড়ল বাজ
বুক ধড়ফড়
হাওযার বেগ
আকাশ জুড়ে কঠিন মেঘ
ক্রুদ্ধ আজ।

আমি বরাবরের মতো এবারও স্পষ্ট দেখলাম একটির পর একটি সহস্র-শত সংখ্যাতীত দোলনা চাঁদের রাজ্য অস্বীকার করে মাটির পৃথিবীর দিকে সারবন্দী হয়ে নামছে, ঠিক প্যারাসুটের বাহিনী।

সব শিশু এক জোটে নাকি বলেছে, চাঁদের রাজ্যে শিশুসভায় একটি শিশুর অভাবও কম নয়। একটি শিশুর অভাবে চাঁদের রাজ্যে শিশুসভায় তোলপাড় শুরু হয়েছে তবে।

যখন দোলনাগুলো সারিবদ্ধ হয়ে নামছে তখন হঠাৎ আকাশে চেয়ে দেখি একটি একটি করে তারা কমে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসব-গৃহের সব আলোগুলি বুঝি একটা একটা করে নিভে যাবে। চাঁদের দি'কে চেয়ে দেখি, কেমন যেন টিমটিমে হয়ে আসছে চাঁদের আলো।

সব কিছু দেখে শুনে ভয়ে ঘাবড়িয়ে গেলাম, সেই রকম শীর্ণ ভিখারী শিশুর কথা ভেবে মনে মনে খুশি হলাম। ওরই দুঃখে হাজার দোলনার শিশু কষ্ট পেয়েছে। আর তারা চাঁদের রাজ্য থেকে নেমে আসছে মাটির দিকে। আর তাইতে ঝরে গেল, একটি একটি করে ঝরে গেল নক্ষত্রপুঞ্জের অযুত নক্ষত্র। শিশুসভা আর বসল না।

যত বেশি তারা খসছে একটির পর একটি, চাঁদের আলোর জোর ততই কমে আসছে। এইবার আমার বুক দুর-দুর করতে লাগলো ভয়ে, মেঘডাকায়, বাজপড়ায় যেমন ভয়, ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে নেওয়ায়, বারিধারায় ভাসিয়ে দেওয়ায় যেমন ভয়, বিদ্যুতের চমক লাগায়, শহরজুড়ে আগুন লাগায় যেমন ভয়—সেই রকম কোন ভয়, আমি বুঝতে পারলাম অন্ধকারে

প্রাণ হারানোর ভয়। দোলনার গানের একটি কথাও আমার মনে পড়ল না। নিভন্ত তারকারাশি আর নিস্তেজ চাঁদের আলোয় চোখ রেখে বার বার শুনতে পেলাম—

হাওয়ার দাঁতে তীক্ষ্ণ ধার
ভয়ঙ্কর অন্ধকার
চতুর্দিকে দুর্নিবার
তারায় ভরা আকাশটার
চাঁদ কি এখন চমৎকার ?

তারপব কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সামান্য কটি মাত্র তারকা, চাঁদের আলো কেরোসিন বাতির মতো টিমটিমে। আর সেই আলোয় দেখা গেলো দোলনার মিছিল আকাশ-পথ বেয়ে নেমে চলে গেছে কোথায়, কোন অন্ধকারে মিলিয়েছে।

আর ঠিক এরই পরে, সারা বাড়ির ইলেকট্রিক ব্যবস্থায় হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটলে যেমন বাড়ির সমস্ত আলোগুলো নিভে যায়, অচল হয়ে পড়ে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, সেই সব কটা তারা হঠাৎ নিভে গেল একসঙ্গে। অতি উজ্জ্বল বড় ইলেকট্রিক বাল্‌বে ঢিল মারলে যেমন শব্দ করে ফেটে যায় আর মুহূর্তের মধ্যে আলো যায় নিভে, ঠিক সেই রকম চাঁদের বালবে কে যেন খুব শক্তি দিয়ে ঢিল মেরেছে। আর তাইতেই বুক কাঁপান শব্দের আর্তনাদ উঠল। অতএব অতবড় চাঁদটা চক্ষের নিমেষে নিভে গেল।

মনে আছে এই সময় কনডাকটর আমায় ঠেলা দিয়েছে। আমি পানবাজারেব মোড ছাড়িয়ে এসেছি। আমাব মনের ভাবনা কিংবা আমার দেখা স্বপ্ন যেটাই সত্য হোক, এই পর্যন্তই। জায়গা ছেড়ে উঠে বাস থেকে নামতে নামতে আমার কেন যেন মনে হলো ভিখারিনীব ক্লান্ত বাহুর অসাবধানতায় অতি মলিন অতি শীর্ণ শিশু মা-র দুর্বল কাঁধেব আশ্রয় হারিয়ে সোজা এসে পড়েছে মাটিতে। তার কণ্ঠের ভীষণ আর্তনাদে তার মা চমকে উঠেছে। আব ঠিক একই মুহূর্তে এ্যাসপ্ল্যানেড অঞ্চলের সমস্ত বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপনগুলোর আলো নিভে গেছে। কোথাও আলোর রেশটুকু নেই। ভিখারিনী দুর্বল শীর্ণ দুটি হাত বাড়িয়ে শিশু সন্তানের খোঁজ করছে সেই অন্ধকারে।

আমার একটিবার কিন্তু মনে হয়েছে সেই অন্ধকার হাতড়ালে দুটি হাতে ঠেকবে শুধু অগণন শিশুর অসংখ্য দোলনা।

আকাশের পথ বেয়ে নীচে নামতে নামতে দোলনার মিছিল নিবিড় অন্ধকারে এইখানে এসে থেমেছে। অনেক শিশু যেন চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে।

গোড়াতেই বলে রেখেছি, অনেক অনেক আগেকার কথা নয়—এই কটি বছর আগে মাত্র।

ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান

শহীদ সাবের

স্কুল থেকে বেরিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল, ছোট্ট একটি গলির ভিতর দিয়ে আসছিল খোকা, অন্ধকার হয়ে এসেছে, গলির ভেতরটাতে আরো অন্ধকার, এদিকটায় গ্যাস বাতি জ্বলে, আর সেই গ্যাসের আবছা আলোয় পথ চিনে যেতে বেশ অসুবিধে।

গলির মাঝামাঝি এসেই হঠাৎ কি একটা শব্দ এলো তার কানে, থমকে দাঁড়ায় খোকা। এক মিনিট মাত্র, তারপরই একটা অসম্ভব চিন্তায় বুকটা তার ধড়াস করে উঠল. ভয়ে হাঁটু দু'টো কাঁপছে তার। সে ভাবতে লাগল, কি করবে, কি তার করা উচিত? ইতস্ততঃ করতে লাগল খোকা।

কিন্তু বেশীক্ষণ এই অবস্থা রইল না। ধীরে ধীরে মনে সাহস ফিরিয়ে আনল সে। তার মনে হল এই মুহূর্তে সে যেন একটা বিরাট কর্তব্য করতে যাচ্ছে। অসীম সাহসে বুক বেঁধে সে পা টিপে টিপে এগুলো।

পাশেই একটা পুরনো একতলা বাড়ী। বাড়ীখানার প্রায় ভেঙ্গে-পড়া দশা। তা হলেও খোকা বেশ বুঝতে পারল ওর ভেতরে লোক থাকে। একটু ভেতরের দিকের একটা কামরাতে টিমটিমে বাতি জ্বলছে—তারই একটুখানি আলো এসে পড়েছে রাস্তার ওপর। খোকা পাটিপে টিপে সেই আলো লক্ষ্য করে এগুলো।

খুব সন্তর্পণে পা ফেলে খোকা এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। জানালাটা বন্ধ।

কিন্তু কাঠের ফাঁক দিয়ে চোখ রাখলে ঘরের ভেতরটা বেশ দেখা যায়। একবার দৃষ্টি দিয়েই শুকিয়ে উঠল খোকার অন্তরাত্মা।

দেখল ঘরের ভেতর একপাশে একটা ভাঙ্গা লণ্ঠন জ্বলছে। আবছা আলোয় দশ বারো জন লোক বসে আছে। তাদের সবাইকে ভাল করে দেখা যায় না। তবু যা দেখলে তাতেই খোকার প্রাণ যায় যায়।

একটা লোক হতভম্বের মতো ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে আছে আর একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে সামনে, হাতে রিভলবার।

বাকী লোকগুলো ওকে ঘিরে রয়েছে।

চেয়ারে উপবিষ্ট লোকটা বলছে, 'না', ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।'

রিভলভারধারী কঠিন দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'করতেই হবে তোমাকে। নইলে দেখতেই তো পাচ্ছ— !'

রিভলভারটা একবার নাড়ালো সে।

'একটুও শব্দ হবে না, একেবারে আধুনিক যন্ত্র' সামান্য একটু হিস্। তার পরেই ব্যাস।'

কিন্তু লোকটার কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, মনের বল তারও কম নয়।

নিরুত্তর বসে রইল লোকটা।

তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অস্ত্রধারী আবার বললে, 'শোন তেওয়ারী, আধ ঘন্টা সময় দিলাম তোমাকে। এর মধ্যে মনস্থির করো। এই রইল কাগজ কলম। শুধু একটা সই, নইলে আধঘন্টা পরে আত্মারাম আর খাঁচায় থাকবে না।'

হঠাৎ চেতনা ফিরে এলো খোকার।

আর মাত্র আধ ঘন্টা। আর মাত্র আধ ঘন্টা। তার পরেই একটা প্রাণ ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। খোকার মনের মধ্যে গেল হঠাৎ আলোর ঝলকানি। না, আর এখানে নয় খোকা ভাবল। ত্রস্তে নেমে এল সে জানালা থেকে।

পা টিপে টিপে গলি থেকে বেরিয়ে খোকা দিল এক দৌড়। এক দৌড়ে এসে পড়ল রাস্তার মোড়ে।

বগলে বই চেপে সে ভাবতে লাগল, কি করবে এখন। কোথায় যাবে? খোকার মনে হল যেমন করেই হোক লোকটাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? স্কুলে থার্ড ক্লাসের ছাত্র সে। বয়স্ক লোক যদি হতো, বন্ধু-বান্ধবদের জুটিয়ে সে নিজেই উদ্ধার করতো লোকটিকে।

বড় রাস্তায় অনেক আলো। ভয় তার কেটে গেল অনেকটা। তার জায়গায় ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল সাহস।

হ্যাঁ সাহস করে শুনতে হবে তাকে। এমন একটা কর্তব্য তাকে করতে হবে যা কতদিন ধরে সে কল্পনা করে এসেছে।

চট করে তার মনে পড়ে গেল তার প্রিয় বইয়ের অতি পরিচিত মানুষগুলির কথা। সত্যেন ঘোষ। ডিটেকটিভ সত্যেন ঘোষ হবারই এইটেই সুযোগ।

কিন্তু খোকা ভাবল সত্যেন ঘোষ তো বয়স্ক বুড়ো লোক। সে বরং তার সাগরেদ তরুণ সুব্রত হতে পারে। ঠিক। সে হল সুব্রত। শক্তিমান, বলিষ্ঠ নির্ভীক সুব্রত। কোন চালাকী তার কাছে খাটে না। প্রত্যেকটা খুনী তার কাছে ধরা পড়ে। যারা পড়ে না তারা অসাধারণ। কিন্তু খোকাকে এবারে সে দুঃসাহসিক কাজের বিবরণ পড়াই নয়,এবার হাতে কলমে এগুতে হবে। এতদিন সে বীরের কীর্তি কলাপের কাহিনী পড়েই এসেছে, এবার সে নিজেই বীর হবে।

কিন্তু এখন কি করা যায়। মাথায় তার বুদ্ধিও আসছে না। দীনেন রায়ের ব্লেক যদি এই অবস্থায় পড়তেন তা হলে কর্তব্য ঠিক করতে তার এক মুহুর্তও দেরী হতো না। অথচ সময় খুব কম। না, আর দেরী করা চলে না। মাত্র আধঘন্টা সময়. তার মধ্যে আবার পাঁচ মিনিট ইতিমধ্যেই কেটে গেছে।

তাইতো। লোকটাকে বাঁচাতে হবে যে। সেই আধঘন্টা কাটবার আগেই আচমকা হানা দিয়ে লোকটাকে বাঁচাতে হবে মৃত্যুর কবল থেকে।

সে ভাবতে লাগল সত্যেন ঘোষ এরকম অবস্থায় পড়লে কি করতেন। ভাবতে ভাবতে তার

মনে হলো এমন অবস্থায় তার কর্তব্য হচ্ছে একজন ইনসপেক্টার সঙ্গে করে সরাসরি ঘরে গিয়ে হানা দেওয়া।

কিন্তু ইনসপেক্টার কোথায় থাকেন, তাও যে তার জানা নাই।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা লোক। খোকা ভাবল, সমস্ত ব্যাপারটা এসে একে খুলে বলাটা কেমন হবে?

বিপদ আছে তাতে। এসব আনাড়ি লোক হয়তো চেঁচামেচি করে সব মাটি করে দেবে। টের পেয়ে পাখী ততক্ষণে উড়েই যাবে।

তবে হ্যাঁ, ইনসপেক্টারের খোঁজটা ওর কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

লোকটার সামনে গিয়ে সে খুব বুদ্ধিমানের মতো জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা এখন কয়টা বাজে বলতে পারেন?'

লোকটা একটু অবাক হলেন। তারপর হেসে বললেন, 'সাতটা'।

খোকা একটু ভাবল।

'আচ্ছা, পুলিশের ইনসপেক্টার কোথায় থাকেন বলতে পারেন?'

'কেন খোকা! পুলিশের ইনসপেক্টার দিয়ে কি করবে?'

লোকটার কথায় খোকার রাগ হয় খুব।

খোকা ভাবে: লোকটা পেয়েছে কি তাকে, কতবড় একটা কাজ করতে বেরিয়েছে সে। যদি সফল হয় তা হলে কালকের 'প্রভাতী' সংবাদ পত্রগুলিতে বড় বড় অক্ষরে তার কীর্তিকথা প্রচার করা হবে।

লোকটার কথার জবাবে খোকা বললে, 'আমার দরকার। কোন ইনসপেক্টারের ঠিকানা জানা থাকলে দয়া করে বলুন।'

ভদ্রলোক একটুখানি চুপ করে থেকে তাকে বললেন, 'কেন, তুমি থানায় গেলে তো পার।

কথাটা ঠিক মনে ধরলো তার। থানায় রওয়ানা হল খোকা।

লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে থানার পথ চিনে সোজা সে হাজির হল থানার অফিস-ঘরে। সামনেই বসে ছিলেন ও-সি।

দেখলেন বেশ একটা অল্প বয়স্ক ছেলে কি যেন বলবে মনে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খোকা কি দরকার তোমার।

আবার খোকা মনে মনে বেজায় চটে গেল। কিন্তু মুখে শুধু বললে, 'অনেকগুলি লোক মিলে একটা লোককে খুন করছে।'

ও-সির কাজই হল অপরাধ যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। কাজেই তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।

কোথায়? কেমন করে? তুমি কি করে জানলে।

খোকা তাকে আদ্যোপান্ত সব ঘটনা খুলে বলল, সব শুনে ও-সি মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই তো।'

খোকার তখন সাহস আরও বেড়ে গেল।

সে বলল, 'শিগগীর চলুন। এতক্ষণে হয়তো লোকটাকে ওরা মেরেই ফেলেছে।

ও-সি তখন সঙ্গে জনা দশেক কনস্টেবল নিয়ে একটা জীপে গিয়ে উঠলেন।

জীপ গাড়ীটা ছুটে চলছে। খোকার তখন কী আরাম। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছে খোকা। দুরু দুরু কাঁপছে তার বুক। কত বড় একটা অভিযানে চলেছে সে। তার মনে হয় ওদের জীপটা যদি অন্য একটা জীপকে অনুসরণ করতে হত তা' হলে বেশ হত। সাঁই সাঁই করে

বেরিয়ে যেত এক একটা গাড়ী। অবশেষে অপরাধীর গাড়ীটা ধরে ফেলতো তারা।

সেই গলির মোড়টা এসে পড়তেই খোকা বলল, 'থামুন, এইখানে।'

হুড়মুড় করে নেমে পড়লো সবাই।

খোকা বলল, 'সাবধানে পা টিপে টিপে আসুন নইলে,—ফুড়ুৎ।'

খুব সন্তর্পণে এগিয়ে এসে সেই একতলা বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল তারা। ভেতরে তখনও আলো জ্বলছে। আর ঘর থেকে ভেসে আসছে তুমুল হাসির সাড়া। জানালার কাছে এসে খোকা উঁকি মারলে।'

ও-সিকে ফিস ফিস করে বলল, 'ওই ওরা।' ও-সি এদিক-ওদিক তাকিয়ে, দুয়ারে আঘাত দিল। ভেতর থেকে ভেসে এল কর্কশ কণ্ঠস্বর 'কে?'

'দুয়ার খোল।'

দুয়ারটা পরক্ষণেই খুলে গেল। একটা লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি চান?'

খোকা দেখেই তাকে চিনতে পারল। সেই রিভলভারধারী।

'আরে এ যে দেখছি মমতাজ সাহেব।' ও-সি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার?'

মমতাজ সাহেব বল্লেন, 'আমিও তো বলি কি ব্যাপার। আপনি যে হঠাৎ। তা আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।'

মমতাজ সাহেবের পিছু পিছু সকলে ঘরে ঢুকল। ও-সি সারাটা ঘর একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর চেয়ারের উপর পড়ে থাকা কাগজ-পত্রগুলি দেখতে-দেখতে হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন।

মমতাজ সাহেব ও তার সঙ্গীরা সকলেই তখন দারুণ হকচকিয়ে গেছেন। এক সঙ্গে এতগুলি পুলিশ, দারোগা দেখে সকলের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছিল।

ও-সির হাসি দেখে তারা ঘাবড়ে গেল আরো। ও-সি তাদের ভয় ভাঙানোর জন্যে বললেন, কিছু মনে করবেন না; অসময়ে হানা দিয়ে আপনাদের কাজের ব্যাঘাত করলুম বলে। ব্যাপার কিছুই নয়। আমরা সবাই এসেছিলাম একটা অনুরোধ নিয়ে। আমরা যেন বাদ না পড়ি।

মমতাজ সাহেবও হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

তারপর কিছুক্ষণ খোশগল্প করে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আসার সময় খোকাকে শক্ত হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে ভুললেন না ও-সি।

বাইরে এসে খোকাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মোহন কখানা পড়েছ বল দিকি?

খোকা বুঝতেই পারল না ও-সি কি বলছেন।

এ আবার কেমন রহস্য, সে ভাবল।

'মাথাটাতো গুলে খেয়েছ। দুনিয়া শুদ্ধ খালি চোর ডাকাত খুনী ছাড়া আর কিছু দেখনা। তোমাদের নিয়ে যে কি হবে, তাই আমি ভেবে পাই না।' খোকাকে আচ্ছা করে ধমকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

বড় বড় অক্ষরে নিচের ঘটনাটি বেরুল।

গত ১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজামিত্র রোডের বাড়ীতে আইঢাই অভিনেতা সংঘ যখন তাঁহাদের নূতন নাটক 'খুন আর খুনের' মহড়া দিতেছিলেন তখন ফরাক্কাবাদের ও-সির নেতৃত্বে একদল পুলিশ তথায় গিয়ে হানা দেয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সৈফুদ্দীন ওরফে খোকা নামে এক বালক থানা পুলিশকে সংবাদ দেয় যে কিছু লোক মিলে অপর একটি লোককে হত্যা

করিতে যাইতেছে। তাহারা সেই লোকটিকে কোন একটি দলিলে স্বাক্ষর করিবার আদেশ সহ আধ ঘন্টার সময় দিয়াছে, এই আধ ঘন্টার মধ্যে উক্ত দলিলে স্বাক্ষর না করিলে তাহাকে রিভলভার দ্বারা হত্যা করিবার হুমকী দেওয়া হইয়াছে। বালকের নিকট হইতে এই মর্মে সংবাদ পাইয়া ফরক্কাবাদের পুলিশ তথায় হানা দেয়। আরো জানা গিয়াছে যে, থানার ও-সি তথায় গিয়া আইঢাই সংঘের প্রসিদ্ধ অভিনেতা মমতাজ উদ্দীন সাহেবকে দেখিতে পান। ঘরের মধ্যে ঢোল, তবলা, পোষাক এবং একটি নাটকের পাণ্ডুলিপিও তিনি দেখিতে পান, পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া তিনি সমগ্র ব্যাপারটি বুঝিতে পারেন। কিছুক্ষণ পূর্বে বালকটি যখন সেই পথ দিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন নাটকের মহড়া চলিতেছিল, বালকটিকে যথোপযুক্ত ধমক দিয়া ও-সি বাড়ী পৌছাইয়া দেন। জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়া তাহার নিকট হইতে জানা যায় যে, গোয়েন্দা কাহিনী তাহার অত্যন্ত প্রিয়, মোট ১৮০ খানা মোহন সিরিজ, ১৮৯ খানা সেক্সটন ব্লেক, সব কটি কনান ডয়েল, নীহার গুপ্ত, পাঁচ কড়ি দের সব খানা গোয়েন্দা গ্রন্থ সে ইতিমধ্যেই শেষ করিয়াছে। ছেলেটি আগাথা কৃষ্টের নাম শুনিয়াছে, তবে ইংরাজী জানা না থাকায় এখনও সুরু করিতে পারে নাই।

গুণের আদর

গোলাম রহ্মান

নতুন চাকরটাকে নিয়ে ভারী মুশকিলে পড়া গেছে ! হরদম এটা-সেটা ভুল করে বসছে। তার জন্যে বকুনিও খাচ্ছে খুব। কিন্তু উপায় নেই—এই কয়দিনের মধ্যেই ব্যাটা আব্বার সুনজরে পড়ে গেছে। ওর উপর আব্বার কেমন যেন একটা মায়া লক্ষ্য করছি। ওর হাবাগোবা ভাব আর গরুর মতো নিরীহ চোখ দুটোর দিকে তাকালে আমার নিজেরও খুব মায়া হয়। নেহায়েৎই গো-বেচারা ! দোষের মধ্যে কেবল কানে একটু খাটো। সে জন্যেই তার উপর আমার রাগ।

পয়লা দিন ছোটো চাচা এলেন। উনি শুকুরকে দেখতে পেয়ে আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ও, এই ছোঁড়াটাকে বুঝি নতুন চাকর রেখেছো ভাবী ?

আম্মা বললেন ঃ হ্যাঁ, সপ্তাহ দুয়েক থেকে ও এখানে কাজে লেগেছে। মুনিম সাহেব ওকে পাঠিয়েছেন। ওর ভাই না কে যেন ওঁদের বাড়িতে কাজ করে।

ঃ বেশ তো ভালো কথা। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে কথা হচ্ছে, সাবধান থাকা ভালো। কথায় বলে, 'সাবধানের মার নেই।' —ছোটো চাচা বললেন ঃ ওর নামটা এক্ষুণি রেজিস্ট্রি করিয়ে আনো থানা থেকে। দিন কাল ভালো না। কাউকে বিশ্বাস নেই।

আম্মা আবার অত ইংরাজি কথার মানে-মতলব বোঝেন না। বললেন ঃ তাই-ই করাবো। তবে এত তাড়াতাড়ি কি ? একটু পুরোনো-টুরোনো হোক—বছর খানেক কাজ কাম করুক তখন দেখা যাবে।

ছোটো চাচা বললেন ঃ সে কি ভাবী ! —পুরোনো হলেই তো ল্যাঠা চুকে গেলো। তার জন্যে আবার রেজিস্ট্রি কিসের ?

আম্মা আর সে কথায় কান দিলেন না। জোরে জোরে ডাক দিলেন ঃ শুকুর—ও শুকুর—

শুকুর সামনে এসে দাঁড়ালো। তার পরনে লুঙ্গি আর কোমরে গামছা বাঁধা। আম্মা বললেন ঃ বাইরে দোকান থেকে ভালো জর্দা নিয়ে আয় এক ভরি—এই পাঁচ টাকার নোট ভাংগিয়ে।

ছোটো চাচা ভয়ানক পান চিবোন। তাঁর আবার ভালো জর্দা না হলে চলে না।

আম্মার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে শুকুর বেরিয়ে গেলো।

তারপর পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট করে সময় বয়ে যাচ্ছে কিন্তু শুকুরের কোনো পাত্তাই নেই। কোথায় গেলো হতভাগা? রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসেনি তো! আমরা সকলেই ভাবনায় পড়লাম। আর তা'ছাড়া জর্দার দোকান তো কাছেই। এতক্ষণ ও কি করছে? এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় পাঁচ গজ পর্দার কাপড় কিনে হাজির হলো শ্রীমান শুকুর।

ঃ ওরে হতভাগা জর্দা কোথায়? তোকে পর্দার কাপড় আনতে কে বললে? উল্লু, গাধা কোথাকার!— ছোটো চাচা রেগে জিজ্ঞেস করেন।

শুকুর আম্মার দিকে তাকিয়ে বললেঃ আপনিই তো বললেন, আম্মা।—অপরাধীর মতো তার কণ্ঠস্বর।

ঃ হতভাগা; আমি তোকে পাঁচ টাকার নোট ভাংগিয়ে জর্দা আনতে বলেছি, না পাঁচ গজ পর্দার কাপড় আনতে বলেছি? বেআক্কেল কোথাকার!

আমি বললামঃ যাক, যখন এনেই ফেলেছে তখন ওই কাপড়টা রেখে দাও—পরে কাজে লাগবে। তারপর শুকুরকে আবার খুচরো পয়সা দিয়ে বাইরে পাঠানো হলো। সে জর্দা নিয়ে এলো।

এই ঘটনার কিছুদিন পর। রান্নাঘরে কি করতে গিয়ে হঠাৎ পায়ের উপর গরম চায়ের কেট্‌লী উল্টে ফেলেছে ডলি। ভাগ্যিস পানি খুব ফুটন্ত ছিলো না। তবুও পা-টা বেশ পুড়ে গেছে। আম্মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেনঃ যা তো বাবা শুকুর, চট্ করে ওষুধের দোকান থেকে মলম নিয়ে আয়। তোর ডলি বু'র পা পুড়ে গেছে!

হুকুম করলে সেটা আর তামিল করতে মোটেই ভুল হয় না। শুকুর তাড়াতাড়ি গিয়ে পশু দে'র দোকান থেকে ভালো দেখে একটা কলম নিয়ে এলো। আম্মা তো হতভম্ব।

ঃ হতভাগা,লোকের জান নিয়ে এদিকে টানাটানি—আর তুই কোন আক্কেলে পশুপতির দোকান থেকে কলম নিয়ে এলি? ফাজলামি পেয়েছিস্?—আমি ছুটে এসে বলিঃ আম্মা, বাড়ি থেকে কালা চাকরটাকে যত শীগগির পারো সরাও।—তা না হলে আর চলছে না। তারপর ওর হাত থেকে পয়সা কেড়ে নিয়ে আমি সামনের ডিস্পেন্সারী থেকে পোড়ার মলম নিয়ে আসি।

এই ধরণের ঘটনা হর-হামেশা ঘটছে আমাদের বাড়ি।

একদিনের ঘটনা। বৃষ্টির অবশ্য কোনো নাম-গন্ধ ছিলো না। কেন না এটা বৈশাখ মাস। খর রোদ, সূর্যের তেজ খুব। হঠাৎ এরই মধ্যে কোথা থেকে কি করে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেলো। সংগে সংগে শুরু হলো হাওয়া আর বৃষ্টি। এই বৃষ্টি আর সেই বৃষ্টি! বন-বন শোঁ-শোঁ কত রকমের আওয়াজ বাতাসের সাথে! তার সাথে আবার কড়-কড়-কড়াৎ মড়-মড়-মড়াৎ—বিদ্যুতের গর্জন।

একটু আগেই উয়ারী থেকে খালা-আম্মা এসেছেন আমাদের বাড়ি। সংগে এসেছে সুলতান, ফরিদ আর ফওজিয়া।

আমরা কয় ভাইবোন মিলে আম্মার কাছে আবদার করলামঃ এই বৃষ্টির দিনে গরম গরম পাঁপড় ভাজা খেতে খুব মন চাইছে।

আম্মা বললেনঃ পাঁপড় তো নেই ঘরে। তবে তা' না করে চাল-ভাজা, মটর-ভাজা আর পেঁয়াজ-কুচি তেল দিয়ে মাখিয়ে দেই—খা।—খুব ভালো লাগবে খেতে।

খালাতো ভাই সুলতান বললেঃ পাঁপড় আবার কি! এই সময় খিচুড়ী খেলে মন্দ হতো না।—এই কথায় ফওজিয়া, ডলি, ফরিদ আর আমি আপত্তি জানালাম। আমরা কয়জন মিলে

জিদ ধরলাম ঃ না, পাঁপড়ই খাবো।

অগত্যা আম্মা শুকুরকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ ছাতা মাথায় দিয়ে বাজার থেকে ভালো তেল আর কাঁচা পাঁপড় নিয়ে আয়। দেখ্, কোনো রকম ভুলচুক যেন না হয়।—শুকুরকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

শুকুর বললে ঃ না, ভুলচুক কেন হবে আম্মা। যা বলবেন— তা-ই আনবো। এই বলে সে

খুব দ্রুত বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লো । আমরা তার কর্মতৎপরতা দেখে খুবই আনন্দিত হলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের আনন্দ গুলী কর্পূরের মত উবে গেল। আমরা সকলেই দেখলাম যে, শুকুর একটা রঙিন ছিটের কাপড়ে বেঁধে গোটা দশেক বেল নিয়ে এসেছে। তার কাণ্ড দেখে খালা-আম্মা ততক্ষণে হাসতে আরম্ভ করেছেন।

আম্মা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কই রে গাধা তেল কই, আর পাঁপড়ই বা কোথায় ?

ছিটের রঙিন টুকরো আর বেল কয়টার দিকে আংগুল উঁচিয়ে দেখালে শুকুর ঃ এ যে !

আমি রেগে বলে উঠলাম ঃ এই ঝড় বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে বরফ দিয়ে বেলের সরবৎ করে দাও—খেয়ে সকলে নিউমোনিয়া বাধাই।

আম্মা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন ঃ আল্লার নাম নে, হতভাগা। ও-সব কি কু-কথা মুখে আনছিস ? আর এই হতভাগা চাকরটাই হয়েছে আমার যত সব অশান্তির কারণ। এই হারামজাদার জন্যেই ছেলেপিলেরা যত সব বাজে আর কু-কথা মুখে আনছে! তারপর উনি ।ঃ হতভাগা কালা বদ্ধ কোথাকার। সাহেব বাড়িতে আসলে তোকে ঝাঁটা মেরে কালই র করে দেবো।

বৃষ্টি বাদল থেমে গেল। বিকেল বেলা আব্বা এলেন। রাত্রে খাওয়ার টেবিলে আম্মা শুকুর সম্বন্ধে কথা তুললেন। বললেনঃ ওই কালাটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না! একটা বললে অন্যটা করে।

ঃ অন্য একটা ভালো চাকর রাখো আব্বা। আম্মার কথায় সায় দিয়ে আমি বললাম।

এই কথা শুনে আব্বা ভয়ানক রেগে গেলেন। বললেনঃ ওকে কি আমি সাধে রেখেছি? ওর গুণের জন্যেই রেখেছি। সেটা তো আর তোমাদের মগজে ঢুকবে না। মুনিম সাহেব নিজে ওকে পাঠিয়েছেন।

আম্মা আর কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। একটু পরে আব্বা বললেনঃ তোরা তো দেখতে পাস না। কালই তোদেরকে চোখে গোঁজা দিয়ে দেখাবো। কই, তোর সিলভার ক্যাপ পার্কারটা কই?

আমি তাড়াতাড়ি এনে সেটা আব্বার হাতে দেই?

ঃ আমাকে আর দিতে হবে না। —আব্বা রেগে বলে ওঠেনঃ ওটাকে আজ রাতে কল-ঘরের দরজার কাছে ফেলে আসবি সকালে শুকুর থালা-বাসন মাজতে যাবে। ওরই ভাগ্যে জুটবে কলমখানা।

আম্মা বললেনঃ তা জেনে শুনে দামী কলমটা ওকে দিতে হবে?

আব্বা একটু নরম হয়ে বললেনঃ দিলেই বা।

যাই হোক, সেদিনকার মতো খাওয়া-দাওয়া সেরে খালা-আম্মারা চলে গেলেন। আমরাও দক্ষিণ হস্তের কার্য সমাধা করে সময় মতো ঘুমুতে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠতেই দেখি আমার ফাউন্টেন পেনটা হাতে নিয়ে শুকুর হাজিরঃ মিয়াভাই, আপনার কলমডা যে কহন পইড়া গ্যাছে—খেয়াল রাহেন নাই। অত বেখেয়াল অইলে চলবো ক্যামনে?

আব্বা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলে উঠলেনঃ দেখলি। সাধে কি আর ওকে রেখেছি। এর আগেও একদিন মানিব্যাগ ফেলে পরীক্ষা করেছি—তারপরে একদিন একশো টাকার নোট ফেলে পরীক্ষা করেছি। কাজেই এ-কথা আমি জোর করেই বলতে পারি—আর যাই হোক, ছেলেটি চোর নয়। তার প্রমাণও পেয়েছি। আর মুনিম সাহেবও তাই বলেছেন।—আব্বা বলতে থাকেনঃ তবে কথা হলো যে, কানে সে একটু কালা। বেশ তো, তার জন্যে কি? ও হালেই কালা হয়েছে। চিকিৎসা করালে সেরে যাবে। ইতিমধ্যে আমি ওর কান পরীক্ষা করিয়েছি। মাহব ডাক্তার বলেছেন, চিন্তার কারণ নেই—ভালো হয়ে যাবে।

আব্বা ওকে ডাকলেন! ডেকে পাঁচটা টাকা দিলেন। বললেনঃ এটা তোর বখ্‌শিশ। আর তুই সামনের দোকান থেকে আটা নিয়ে আয়। রুটির নাশ্‌তা খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরুবো। জরুরী কাজ আছে।

শুকুর সংগে সংগে বেরিয়ে গিয়ে একটা দুধ-আনা কেটলীতে কি যেন নিয়ে এলো।

আমি জিজ্ঞেস করলামঃ কি আনলি রে হতভাগা?

শুকুর হেসে বললেঃ কেন, মাঠা।

আব্বা শুনে হেসে উঠলেনঃ বেশ বেশ। তারপর আম্মাকে বললেনঃ নুন দিয়ে মাঠাটা তৈরী করে দাও। রুটি খাওয়ার আর দরকার নেই। মাঠা খেলে পেট ঠাণ্ডা হবে।

শুকুর দু-পাটি দাঁত বের করে হেসে ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে।

ভেলকির নাম ঘোড়া

শৈলেন ঘোষ

আমি একটি ঘোড়া।

আসলে আমায় ঘোড়া বললে ভুল বলা হবে। কেন না, আমি ঘোড়া ছিলুম না। আমি ঘোড়া হয়ে গেছি।

আমি কিন্তু তোমাদেরই মত একটি ছোট্ট ছেলে। আমি যখন ঘোড়া হইনি, মানে, তোমাদের মত আমার যখন মাথা কিংবা নড়া, ঠ্যাং কিংবা ধড় ছিল, বা যখন আমি তোমাদের মত গান গাইতে অথবা ঝগড়া করতে কিংবা চুমুক দিয়ে দুধ খেতে পারতুম, তখন সবাই আমায় মানুষ বলেই জানতো। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটি করে নাম থাকে, আমারও ছিল। অনেক পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে বাবা আমার নাম রেখেছিল গণেশ।

মা-দুগ্গার ছেলে গণেশঠাকুর পুজোর সময় মায়ের সঙ্গে যখন মর্ত্যে আসেন, তখন তাঁকে দেখলে শান্ত-শিষ্টই মনে হয়। আসলে গণেশঠাকুর শান্তই। এখন ভাগ্যদোষে মুণ্ডুটা ঠাকুরের হাতিমার্কা হয়ে গেছে, সে আর কী করা! আমার বাবাও হয়তো ঠাকুরের এই শান্ত-শিষ্ট ভাবটি দেখেই আমারও নাম রেখেছিল গণেশ। হয়তো আশা ছিল, ওই গণেশঠাকুরের মত আমারও স্বভাবটি হবে শান্ত। আমিও ঠাকুরের মত লক্ষ্মী ছেলে হয়ে মায়ের আঁচল ধরে ঘুরঘুর করবো। তা অবশ্য হলো না। কারণ আমার জ্ঞান-গম্যি হবার আগেই আমার মা আমায় ছেড়ে স্বগ্গে গেলেন। অগত্যা বাবার কাছেই আমি মানুষ হয়েছি। আর মা না থাকলে যা হয়, সবাই বললে, বাবা আমায় আদর দিয়ে একটি বাঁদর করেছে! সত্যি, আমি একটি ভয়ানক দুরন্ত ছেলে হয়ে উঠলুম। আমায় সবাই বললে, ছেলে নয়তো, গুণ্ডা। তাই আমার নামও হয়ে গেল গুণ্ডা-গণেশ।

তা আমি যদি চোপরদিন মারামারি করি, দশজনের মাথা ফাটাই কিংবা দশটা গাছের আম পেড়ে, কিছু পেটে পুরে বাকি ছড়িয়ে-মড়িয়ে অন্যের লোকসান করি, তখন তো লোকে আমায় ফুল-চন্দন দিয়ে পুজো করবে না। লোকে গুণ্ডা বলবেই।

অবশ্য আমার সামনে ও-নামটি মুখ ফুটে বলার কারো সাধ্যি ছিল না। বললে যে কী হয়, সেটি জানতেও কারো বাকি ছিল না। কাজেই কে আর আমায় ঘাঁটাতে আসে! গুণ্ডা দেখলে দশ হাত দূর দিয়ে কেটে পড়াই ভালো!

বেশ লাগে! আমায় সবাই ভয় পায়! আমার সঙ্গে গায়ের জোরে সবাই হেরো! বীরের মত বুক ফুলিয়ে পথঘাট দিয়ে হেঁটে বেড়াতে বেড়ে লাগে। আমি যেন গুণ্ডার-সর্দার!

আমার দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা যে বাবার কাছে বলছে না, তা নয়। সে-সব কথা বাবার এক কান দিয়ে ঢোকে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাবা আমায় আদর দিতে কোনদিন কসুর করেনি। বাবার তো অভাব ছিল না কিছুরই। ধান-ভানাই কলের মালিক। ঝিকঝিক করে কল চলছে, ঝনঝন করে টাকা আসছে। তাই এই মা-মরা ছেলেটার জন্যে দুধ-ঘিয়ের ঘাটতি যাতে না পড়ে, সেদিকে বাবার সব সময়ে নজর। বায়না ধরলে কী পাই না! চাই কি, যদি বলি, আমার নাক বিঁধিয়ে দাও, আমি নাকছাবি পরবো, বাবা আমার না করবে না। কিন্তু আমি জানি ওটা মেয়েদের সাজ! ছ্যা-ছ্যা! ছেলেরা কখনও মেয়েদের মত সাজে! বিশেষ করে আমার মত ছেলে!

শেষকালে কিন্তু আমার মত এই ছেলে যে বেঁড়ে ওস্তাদি করতে গিয়ে একটি চার-ঠ্যাং-এ ল্যাজওলা ঘোড়া হয়ে যাবে, এটা কে ভাবতে পারে! আমি যে আমি, যার কাছে বিপদ-টিপদ ফুঃ, সে-ই পড়েছি গাড্ডায়! কী কুক্ষণেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপটা খুঁজে বার করার ভূত চেপেছিল আমার মাথায়, তাই এখন ভাবি। সেই গল্প বলি।

আমাদের গ্রামটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেদিকে খানিকটা ঝোপ, খানিকটা জঙ্গল। পায়ে-চলা একটা সরু রাস্তা ওইদিকে চলে গেছে। অবশ্য ওই রাস্তা ধরে কেউ বড়-একটা হাঁটে না। বিচ্ছিরি অন্ধকার আর ঘুপচি-মত জঙ্গলটা। বাঘ-ভল্লুক না থাক, সাপ-খোপ যে নিশ্চয়ই আছে, সে-কথা আর বলতে! শুনেছি, জঙ্গলটার মাঝ-বরাবর নাকি একটা অনেক দিনের পড়ো-বাড়ি আছে। দিন-দুপুরে ঠাওর করলেও দেখা যায় না। সবাই বলে ওটা নাকি সলোমন সাহেবের বাড়ি।

সলোমন সাহেবকে কেউ দেখেনি। তিনশো চারশো বছরের ওই পুরনো বাড়িটার মত সলোমন সাহেবের নামটাও তিনশো চারশো বছর ধরে সবাই জানে। সলোমন সাহেবের নাম করলেই ভয়ে কাঁপে সবাই। বলে, সাহেব নাকি এখনও মরেনি। এখনও নাকি নিঝুম রাত্তিরে ওই ভাঙা বাড়ির ছাতের ওপর একটা টিমটিমে আলো জ্বেলে ঘুরে বেড়ায়। ইংরিজীতে গান গায় আর নয়তো জঙ্গলের গাছ গাছালির আড়ালে কী যেন আঁতিপাতি করে খুঁজে বেড়ায়!

সত্যি বলতে কী, গান শোনা তো দূরের কথা, কোনদিন সাহেবের গলার টুঁ শব্দটি পর্যন্ত আমার কানে আসেনি। তবে সাহেবের গল্প শুনতে শুনতে আমার যেন কেমন সব গোলমাল হয়ে যেতো। সবাই বলে, সাহেব নাকি নানান রকম ভেলকিবাজির মন্তরও জানে। কিন্তু যখন শুনলুম, ওই ভেলকির জোরেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপটা সাহেব ভাঙা-বাড়ির গুপ্তঘরে লুকিয়ে রেখেছে, তখনই আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি কিন্তু আগে আশ্চর্য প্রদীপটা কী জানতুম না। বিপদ হলো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্পটা বাবার মুখে শুনে।

বাবা কি গল্প বলতে চায়! আমিও ছাড়বো না। এমন ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে দিলুম, বাবার 'না' বলে নিস্তার নেই। মশাই, পড়াশোনার নাম শুনলে যার গায়ে জ্বর আসে, সেই আমি এখন একেবারে একটি লক্ষ্মী ছেলে। বাবার পাশে শুয়ে শুয়ে কখনও 'হ্যাঁ', কখনও 'হুঁ' করে, আবার কখনও 'এরপর কী হলো' 'তারপর কী হলো' করতে করতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প

শুনতে লাগলুম। যখন গল্প শেষ হলো, আসলে ভূতটা তখনই আমার মাথায় চাপলো। আমার মনে হলো, ওই প্রদীপটা পেলে তো মন্দ হয় না। ওটা যদি সঙ্গে থাকে তাহলে তো যখন খুশি যা চাই তাই পাই। বাবাকে তখন আর কলে পিষে ধান ভানতে হবে না। আশ্চর্য প্রদীপ মাটিতে ঘবলেই হলো। অমনি দত্যি হাজির। আমার সামনে মাথা হেঁট করে সেলাম জানিয়ে বলবে, "প্রভু, আমি আপনার হুকুম তামিল করার জন্যে হাজির। এখন আদেশ করুন আমায় কী করতে হবে!"

আমি অমনি সঙ্গে সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলবো, "আমার সামনে ওই যে মাঠটা দেখছ, ওখানে এখুনি একটা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দাও। আমার বাবাকে পৃথিবীর সবসেরা পোশাক এনে দাও। আমার বাবা হবে সব রাজার সেরা রাজা। আমি হব পৃথিবীর সবচেয়ে বীর আর সাহসী রাজপুত্তুর।"

সুতরাং ওই আশ্চর্য প্রদীপটা আমার চাই-ই চাই। তাই আমি কাউকে কিছু না বলে, আশ্চর্য প্রদীপের খোঁজে এক দিন ভরদুপুরে পড়ো-বাড়ির জঙ্গলে ঢুকে পড়লুম।

বাইরে থেকে বোঝাই দায় জঙ্গলের ভেতরটা এমন সাংঘাতিক থমথমে। ভোঁ-ভোঁ। কেউ

কোত্থাও নেই। মাঝে মাঝে ওই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের মাথার ওপর দিয়ে দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। কে জানে রাক্ষসের হাসি কেমন শুনতে! মনে হচ্ছিল, গাছের মাথায় হাওয়ার ওই তোলপাড় রাক্ষসের হাসির চেয়েও বুক-কাঁপানো!

তোমরা যদি ভেবে থাকো, এতেই আমি জুজু হয়ে গেছি, তাহলে মাপ করতে হলো। ভেবো না, আমার মতলব আমি শিকেয় তুলে, উল্টো রাস্তায় হাঁটা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবো। সে-ধাতে আমি গড়া নই। আমি হাঁটতেই লাগলুম। জঙ্গলের ভেতরে, আরও ভেতরে। যতই হাঁটছি মনে হচ্ছে একটা চাপা অন্ধকার হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য এই, এতখানি হেঁটেও সলোমন সাহেবের বাড়ির টিকিটি পর্যন্ত আমার নজরে পড়লো না! আমার আগে ধারণা ছিল, জঙ্গলটা এমন কী আর! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এমন গোলমেলে জঙ্গল পৃথিবীতে হয়তো আর দুটি নেই। সে যাই হোক, সলোমন সাহেবের বাড়ি আমায় খুঁজে বার করতেই হবে!

খিদে পাচ্ছে। আমি একটি বুদ্ধু। উচিত ছিল সঙ্গে কিছু খাবার নেওয়া। সে যখন নেওয়া হয়নি, এখন আর ও-কথা ভেবে লাভ নেই কারণ তাহলে সঙ্গে একটা লণ্ঠনও নেওয়া উচিত ছিল। সত্যি, কী ভীষণ অন্ধকার। এরপর তো বোঝাই দায় হবে এখন দুপুর না বিকেল। সন্ধে না রাত্তির।

হঠাৎ সামনের ঝোপটা খসখস করে নড়ে উঠলো। আমি থমকে গেলুম। এতক্ষণ কোন কিছুর সাড়া-শব্দ ছিল না। তাই চোখ ঠারিয়ে চেয়ে রইলুম সেদিকে। কিছুই দেখতে পেলুম না। মনে মনে ভাবলুম ওদিকে আর না-এগোনই ভালো। পাশ কাটালুম। ঝোপটা আবার নড়ে উঠলো। কী রকম সন্দেহ হলো আমার। তড়বড়িয়ে সরে গেলুম। এই নিঃঝুম জঙ্গলে এই যেন প্রথম আমার গায়ে কাঁটা দিল। ওদিকে আর না-তাকিয়ে জোরে পা ফেললুম। কিন্তু জোরে হাঁটা সহজ নয়। ঝরঝরে রাস্তা তো নেই যে, গড়গড়িয়ে এগিয়ে যাব। গাছ-আগাছা সরিয়ে-নাড়িয়ে এগোতে হচ্ছে।

"কু-উ-উ-উ!"

কিসের চিৎকার! চমকে উঠেছি। এ আবার কী! চিৎকার করেই নিশ্চুপ হয়ে গেল যে! আমি থমকে দাঁড়িয়ে নিঃসাড়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগলুম। কিছুই নজরে পড়লো না। ওঃ কী ভীষণ নির্জন! কী করবো! আর এগোন কি ঠিক হবে! না। এগোন ঠিক না। এই ঝোপটার আড়ালে একটু দাঁড়াই। এখানে আমায় কেউ দেখতে পাবে না।

একদম নট-নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি! চারিদিক এমনই নিস্তব্ধ যে মনে হচ্ছে, আমার নিজেরই নিশ্বাস যেন সাপের মত ফোঁসফোঁস করে তেড়ে উঠছে। আমি সামলাবার চেষ্টা করেও পারছি না। আমি বোধ হয় ভয় পেয়েছি।

"ঠকাস!"

উঃ! কী পড়লো আমার মাথার ওপর! একটা মরামোষের মুণ্ডু। মাথাটা ঝনঝনিয়ে উঠলো। চনমনিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষু ছানাবড়া। গাছের ওপব ওটা কীরে বাবা! একটা দানব নাকি! না। একটা শকুনি!

শকুনি! বাপরে বাপ, এত বড়! গাছের ডালে বসে আমার দিকে চেয়ে ডানা নাড়াচ্ছে! কী বিচ্ছিরি কুচুটে চাউনিটা! চোখ দুটো ভাঁটার মত ড্যাবড্যাবে। এত বড় শকুনি আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মার ছুট!

ছুটবো কোথায়? ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসার পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমি ওইখানেই পেট-কাটা ঘুড়ির মত ঘুরপাক খেতে খেতে এদিক ওদিক গোঁৎ মারতে লাগলুম।

হঠাৎ শকুনিটা ডানা ঝাপটিয়ে আমার দিকে ছোঁ মারলে। তাই দেখে আমিও পড়ি-মরি ঝোপ ডিঙিয়ে লাফ মারলুম। তার আগেই শকুনিটা তার ইয়া লম্বা ঠ্যাং দিয়ে আমার মুণ্ডুটা জাপ্টে ধরলে। আমায় হুস করে টেনে আকাশে তুলে নিলে। আমি শকুনির ঠ্যাং-এ কবজার মত আটকে হাওয়ায় উড়তে লাগলুম। শকুনিটা তার ঠ্যাং দিয়ে আমার গলাটা এমনভাবে চেপে ধরেছে যে, আমি শত চেষ্টাতেও চেঁচাতে পারছি না। অগত্যা তেড়েমেড়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলুম। কিন্তু তা-তে কি ওর শক্ত ঠ্যাং-এর খোঁচা-নোখের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়! আমি ঠ্যাং ঝোলা হয়ে আঁকপাক করতে লাগলুম আর মনে মনে ভাবতে লাগলুম, এবার গণেশবাবাজীর কম্ম শেষ! ঠ্যাং দিয়ে ঠুকেই শকুনি আমার ন্যাটা চুকিয়ে দেবে!

উঃ। আমার নিশ্বেস আটকে আসছে! কী করি! আমি প্রাণের দায়েই আমার হাত দিয়ে শকুনির ঠ্যাং দুটো আঁকড়ে ধরলুম। তখনি কে যেন আমার মাথায় বুদ্ধি দিলে, ওর ঠ্যাং দুটো ভেঙে দে। আমি শকুনির ঠ্যাং দুটো দুহাত দিয়ে চেপে ধরলুম।খ্যাঁক খ্যাঁক করে বিকট আওয়াজ করে খিঁচিয়ে উঠলো শকুনিটা। আমার মাথায় টেনে ঝাড়লে ঠোঁটের ঠোক্কর। মাথা আমার ঝনঝনিয়ে উঠলো। আমিও ছাড়বার পাত্তর নই। ঘুঁসি পাকিয়ে ওর মুখের দিকে ছুঁড়তে লাগলুম। শকুনিটা উড়তে উড়তে মুখ সামলাতে লাগলো।

হঠাৎ শকুনির গলাটা নাগাল পেয়ে গেলুম। আমি চেপে ধরেছি। ওই আকাশের ওপর শকুনের সঙ্গে আমার ঝটাপটি লেগে গেল। শকুনি ডানা ঝাপটিয়ে আমায় যতই কাবু করতে চাইছে, আমি ততই ওর গলাটা দুহাত দিয়ে খামচে ধরছি। কিন্তু কী অসম্ভব শক্তি! আমার গায়ে, মাথায় ঠোক্কর মেরে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তুললে। আমার গা দিয়ে ঝর ঝরিয়ে রক্ত পড়ছে। আমিও ওর গলাটা মটকে দেবার জন্যে প্রাণপণে লড়তে লাগলুম। জানি না যুদ্ধের সময় আকাশে উড়োজাহাজের লড়াই কেমন হয়। কিন্তু শকুনি-মানুষে এই লড়াইটা তখন কেউ দেখলে নিশ্চয়ই শিউরে উঠতো। অবশ্য কেউ কেউ বলতে পার, হুঁঃ! কথা বলছে! একটা সামান্য শকুনির সঙ্গে লড়তে পারে না!

একদম আচমকা দুহাত দিয়ে শকুনির ডানা দুটো জড়িয়ে ধরেছি। এক ঝাঁক পালক ডানা থেকে ফরফর করে খসে পড়লো। উড়তে উড়তে থমকে গেল শকুনিটা। দুজনে এক সঙ্গে আকাশ থেকে ছিটকে পড়ছি। আমি ঠিক জানি, এবার আমার মরণ! বলতে বলতেই গাছের ওপর ধাক্কা খেলুম। তারপর মাটির ওপর, না কাঁটা-ঝোপে, হুমড়ি খেয়ে পড়লুম, তা আমার মনে নেই। কেননা আমার মনে হলো আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

হয়তো অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলুম। হঠাৎ আমি চমকে উঠলুম। "হি-হি-হি"—কার যেন হাসি কানে আসছে। হাসি শুনে আমি চমকে উঠলুম, না চমকে উঠে আমি হাসি শুনতে পেলুম, তা আমি এখনই বলতে পারছি না। তবে বুঝতে পারলুম, আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। এতক্ষণ মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলুম। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছি। আবার কানে এলো হাসি, "হি-হি-হি।"

কোন বুড়ো মানুষের হাসির শব্দ নিশ্চয়ই এমন হতে পারে না। এ যেন কোন ছোট্ট মেয়ের কচি কচি হাসি। আমি চোখ কচলালুম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। ভীষণ অন্ধকার। শুধু বুঝতে পারলুম, এটা জঙ্গলের কোন আগাছা ঘেরা জায়গা নয়। একটা সুড়ঙ্গ। এখানে যে কেমন করে এলুম, আমি জানি না। আশেপাশে শকুনিটাকেও দেখছি না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম।

পা টলছে। ভীষণ কষ্ট লাগছে। আবার সেই ছোট্ট মেয়েটির কচি-হাসি খিলখিলিয়ে উঠলো। চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠলুম, "কে—?" আমার চিৎকারের ধ্বনিটা প্রতিধ্বনি হয়ে "কে-কে?" করতে করতে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু হাসি আবার খিলখিলিয়ে উঠলো। আমি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলুম। এত অন্ধকার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবু সামলে সামলে পা ফেলছি। মনে হচ্ছে গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছি আমি।

কই, আরতো শুনতে পাচ্ছি না হাসিটা! হঠাৎ এমন চুপ করে গেল কেন? একেবারে নিঃঝুম, নিঃশব্দ! আমি অন্ধকারে একলা একটা কানামাছি। সুড়ঙ্গের এবড়োখেবড়ো খানা-খন্দে টাল খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি, জানি না।

"ক্যাঁক-ক্যাঁক!"

উঃ! একটা প্যাঁচা ডেকে উঠেছে। একেবারে আমার পেছনে। প্যাঁচার ডাক কত শুনেছি। কিন্তু নিঃস্তব্ধ অন্ধকারে প্যাঁচার ডাক যে এমন ভয়ংকর, আমি জানতুম না। ভয়ে আঁতকে উঠেছি। পা দুটো আচমকা লাফিয়ে উঠলো। হোঁচট খেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সেই সুড়ঙ্গের ফাঁক-ফোকর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকি বেরিয়ে এসে আমার ঘাড়ে-মাথায় খোঁচাতে লাগলো। আমি চামচিকি সামলাতে অন্ধকারে হাত ছুঁড়তে লাগলুম। চামচিকির সঙ্গে আমার খামচা-খামচি লেগে গেল। আমি ছুট দিলুম। চামচিকিরা পালিয়ে গেল।

একটু ছুটেই হকচকিয়ে গেছি। অন্ধকারে যেন আলো দেখা যাচ্ছে। ঠিক তাই। আলতো পায়ের ডিঙি মেরে এগিয়ে চললুম আলোর দিকে।

একটা জানলা। আলো আসছে জানলা দিয়ে। পাল্লা দুটো যেমন-তেমন ভেজানো। একটুখানি ফাঁক। সেই ফাঁকেই আলো। আমি জানলার সামনে এসে চুপিসাড়ে দাঁড়ালুম। ফাঁকের মধ্যে চোখ মেলে উঁকি মারলুম। স্পষ্ট দেখলুম, একটা ঘর। একটা ভাঙা চৌকির ওপর লম্ফ জ্বলছে টিমটিম করে।নোংরা। ঘরের দেওয়ালের চুন-বালি খসে খসে যেন নেড়িকুত্তার হাড় কখানা জিরজির করছে। দেওয়ালে টাঙানো বড় বড় ছবিগুলো কান্নিক মেরে লটকে আছে। রংচটা টুটো ফুটো ছবিগুলো যেন এক-একটা কঙ্কাল! আলো-আঁধারিতে ভয়ের মুখোশ পরে মুখ খিঁচিয়ে চেয়ে আছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো! আমি অবাক চোখে চেয়ে রইলুম।

হঠাৎ একটা ছায়া নড়ে উঠলো। আমার চোখের দৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়ার ওপর লাফিয়ে পড়লো। একী! এ যে সেই শকুনিটা! আবছা আলোর ছায়ার ভেতর যেন সত্যিই একটা দানব। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে! খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। বুঝতে পারছি, আমার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙেছে কিংবা চোখ খেয়েছে। চোখ দুটো বিচ্ছিরি রকমের হিংসুটে। তীক্ষ্ণ ঠোঁটে ছোপ ছোপ রক্ত! দেখলে মনে হয় অনেক বয়েস। ছ্যাতলা পড়েছে গায়ে।

এতক্ষণ দেখতে পাইনি, ঘরের একপাশে একটা খাটও পাতা। তার ওপর ছেঁড়া-ময়লা বিছানা। বালিশের ঢাকনাটা নোংরা চিরকুট। তেলচিটচিটে। শকুনিটা লেংচে লেংচে এসে বিছানার ওপর লাফিয়ে বসলো। ডানার ঝাপটায় এক ঝাঁক ধুলো সারাটা ঘর ঘুরপাক খেয়ে এই জানলাটার ফাঁক দিয়ে আমার নাকে এসে ধাক্কা মারলো। উঃ! কী গন্ধ! আমি নাকে হাত দিয়ে চোখ সরিয়ে নিলুম।

আবার উঁকি দিয়েছি। দেখি, শকুনিটা ঠ্যাং গলিয়ে বালিশের তলা খামচাচ্ছে। আমি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। কী বার করলো ওটা বালিশের নীচ থেকে? আমি শিউরে উঠলুম। উত্তেজনায় ঠক ঠক করে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠলো। দেখলুম, শকুনিটার ঠ্যাং-এর খাঁজে

একটা প্রদীপ। এই কি তাহলে সেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ! তাহলে কি আমি এখন সলোমন সাহেবের বাড়ির অন্দরে আটকা পড়েছি!

শকুনিটা বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলো। ঘরের কোণে একটা কানা-ভাঙা শেওলা-পড়া মাটির কলসি। প্রদীপটা নিয়ে সেই কলসির মধ্যে ঠ্যাং ডোবালে। যখন তুললো, দেখলুম, প্রদীপ উপচে জল গড়াচ্ছে। শকুনিটা প্রদীপে চুমুক দিয়ে জলটা গিলে ফেললে। ঘরের লম্ফটা হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলো। অন্ধকার ঘরটা আলোয় আলোয় ঝলসে গেল। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। দেখি, শকুনিটা আর শকুনি নেই। একটা সাহেব। উসকো-খুসকো চুল-ঝাঁকড়া মাথায় একটা পুরনো ত্যাবড়ানো টুপি। তাপ্পিমারা একটা প্যান্ট। হাঁ-করা ছেঁড়া-কুটো একজোড়া জুতো পায়ে গলানো। খোঁচা খোঁচা ময়লা-ভর্তি নোখ। দাড়িগোঁফে ময়লা জমে পাঁশুটে পানা হয়ে গেছে। কত বয়েস আমি বলতে পারি না। বয়েসের ভারে নিজে যেমন বেঁকে গেছে, তেমনি একটা বেঁকা-ছড়ি হাতে। ছড়িটার মাথায় স্পষ্ট দেখলুম একটা ছোট্ট মুণ্ডু—ঘোড়ার! সাহেব হঠাৎ ছড়িটা বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে চেঁচিয়ে উঠলো, "মাই হর্স, মাই হর্স।" আমি লেখাপড়া শিখিনি, তাই কথাটার মানে বুঝলুম না। তবে বুঝতে পারলুম লোকটা সাহেবী-ভাষায় কথা বললে। তাহলে বোধ হয় এই সাহেবই সলোমন সাহেব।

এতক্ষণে আমার ভয়টা ভীষণ হয়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পারছি, সলোমন সাহেবই হয়তো শকুনি সেজে এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে আমায় ধরে এনেছে। আমি বোধহয় বন্দী। হয়তো এইখানেই আমার ইহলীলা শেষ। কিন্তু মরবার আগে আমি শুধু একটা কথাই জানতে চাই, একটা শকুনি সাহেব হলো কী করে। এ কেমন করে হয়? কী করে হয়?

ভাবতে ভাবতেই দেখি সাহেব টুপি খুলে ফেলেছে। মাথাটা যেন পাখির বাসা। চুলের ভেতর আঙুল গুঁজে খচমচ করে চুলকোতে আরম্ভ করলে। তারপর মাথা ছেড়ে ট্যাঁকের ওপর খচমচানি লাগিয়ে দিলে। ইস! ট্যাঁকে কী বিচ্ছিরি দগদগে ঘা! চুলকোতে চুলকোতে নিজেই তিড়িং বিড়িং লাফিয়ে উঠছে। তারপর বিরাট একটা বাজখাঁই গলায় "উফ" করে হাঁক পেড়ে ওই বিছানার ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগলো।আমার নজর কিন্তু ওর হাতে ওই প্রদীপটার ওপর। ওটি কিন্তু সাহেব হাতছাড়া করেনি। হয়তো হাতছাড়া করবেও না। তখন কিন্তু আমার মুশকিল। হাতছাড়া না করলে আমি প্রদীপটা হাতাবো কী করে!

বিছানার ওপর সাহেবের গড়গড়ানি থেমে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলুম, সাহেব হাতের ছড়িটা মাথার কাছে রেখে দিলে। আর প্রদীপটা বালিশের নীচে রেখে ঘুমুবার জন্যে চোখ বুজলে। আমি ভাবলুম, যাক ঘুমুলে তবু ভালো। আমি নড়লুম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম, আর একটু দেখি।

সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লো সাহেব। কেননা, নাক ডাকাচ্ছে। আমি জানলার পাল্লা দুটো এবার আর একটু ফাঁক করে মাথাটা গলিয়ে দিলুম। রক্ষে এই, জানলায় গরাদ নেই। হয়তো এককালে ছিল। এখন ভেঙে গেছে। সুতরাং জানলা গলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে আমার অসুবিধে নেই।

সাহস যে আমার কেমন করে হলো জানি না। আমি জানলা গলে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লুম। জানলাটা খুব উঁচু না। লাফাতে গিয়ে যেটুকু শব্দ হলো, তাতে সাহেবের ঘুম ভাঙবার কথা নয়। ঘরের মধ্যে ঢুকেই আমি ঘরের চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলুম। ঘরের একদিকে একটা ভাঙা-চোরা দেরাজ। একটা দরজা হুড়কো লাগানো। খুলে দরকার নেই। এখন

ভগবানের দয়ায় প্রদীপটা হাতাতে পারলেই হচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে লোকটার মাথার নীচে বালিশ। বালিশের নীচে প্রদীপ। ওখান থেকে বার করা তো সহজ কাজ নয়। সাহেবের ঘুম ভেঙে গেলে! অবশ্য ঘুম ভাঙলেই বা কী! আমি দেবো ছুট। আমায় ধরবে ওই বুড়ো সাহেব! হুঁ! তবেই হয়েছে!

সেই ঘোড়ার মুণ্ডু-আঁটা ছড়িটার গায়ে হাত দেবার লোভ সামলাতে পারলুম না। তুলে দেখি, বেশ ভারী। দরকার নেই। যেখানকার জিনিস সেখানেই থাক। লম্ফের আলোটা জ্বালাতন করছে। আমার ছাপ পড়েছে দেওয়ালের গায়ে। যদিও তেমন বাতাস নেই, তবু লম্ফের আলোর সঙ্গে আমার ছায়াটা কাঁপছে। নিভিয়ে দিই আলোটা।

সাহেব পাশ ফিরলো। আমি ঝটপট সরে গেলুম। ভাগ্যিস আলো নেভাইনি! সাহেব পাশ ফিরতেই দেখি, বালিশের নীচ থেকে প্রদীপটা উঁকি মারছে। এর নাম বরাত। আলো নিভলে দেখতে পেতুম না। আর লোভ সামলাতে পারলুম না। খুব সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেলুম সাহেবের মাথার কাছে। হাত বাড়ালুম। এই সেই আলাদিনের প্রদীপ! উত্তেজনায় খামচে ধরলুম প্রদীপটা। যাঃ! সাহেবের গায়ে হাত লেগে গেল! ঘুম ভেঙে গেল সাহেবের। ধড়মড় করে উঠে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "হু ইজ দেয়ার?"

আমি ভয়ে ছিটকে গেলুম। প্রদীপটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে সট করে খাটের নীচে সেঁদিয়ে লুকিয়ে পড়লুম। সাহেব আবার চেঁচিয়ে উঠলো, "হু ইজ দেয়ার? অন্দর মে কোন আছে?" বিছানা থেকে তড়বড়িয়ে নেমে পড়লো। লাঠিটা মেঝেতে গড়িয়ে গেল। তুলে নিল সাহেব। তারপর দেখলুম, সেই লাঠিটা হাতে নিয়ে সাহেব খাটের নীচে উঁকি মারছে। সাহেবের চোখ দুটো জ্বলছে। আমি খাটের নীচ থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরুতে গেলুম। বেটাল হয়ে কানাভাঙা কলসিটার গায়ে ধাক্কা মারলুম। কলসিটা ফটাস! জল গড়িয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। জলের ওপর হড়কাতে হড়কাতে আমি ভাঙা দেরাজের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছি। সাহেবও ঠিক দেখেছে। লাঠিটা উঁচিয়ে তেড়ে এলো। আমি দেরাজের পেছন থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে গিয়ে লম্ফটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। মাটিতে ছিটকে পড়ে লম্ফটা দপ্ করে নিভে গেল। ঘরের মধ্যে জমাট অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো সাহেবও আমায় দেখতে পাচ্ছে না। এখন জল থৈ-থৈ অন্ধকার ঘরের মধ্যে সাহেব আর আমি। বিপদের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার দম আটকে আসছে।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই সাহেব হাতের ছড়িটা আনিমানি বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে হাঁক পাড়লে "ইউ নটি বয়!" আমি জানি, আর আমায় কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তাই প্রাণের দায়ে হাতড়ে হাতড়ে জানলাটা খুঁজতে লাগলুম। ওটাই আমার পালাবার পথ।

ভাগ্য কাকে বলে! আমি জানলাটা খুঁজে পেয়েছি। মেরেছি লাফ। একেবারে বাইরে। পেছন ফিরে দেখি, সাহেবও জানলা টপকেছে। আমি ছুটতে গেলুম। তার আগেই সাহেব ঘোড়ার মুণ্ডু-আঁটা ছড়িটা দিয়ে আমার মাথায় টেনে এক ঘা দিলে। আমি মানে আমি, মানে গণেশ চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘোড়া হয়ে গেলুম! অন্ধকারে আমার হাত থেকে প্রদীপটা ছিটকে পড়লো, ঝন-ঝন-ঝন। আমি চিৎকার করে উঠলুম, চিঁ হিঁ হিঁ! তারপর চার-পা তুলে লাফাতে লাগলুম।

আমি জানতুম না পালাবার পথ নেই। লাফাতে লাফাতে সুড়ঙ্গের ভেতরে ওই মস্ত ভাঙা গেটটায় আমার মাথা ঠুকে গেল। গেটে তালা ঝোলানো। আমি তালার ওপর মাথা গুঁজে গোঁত্তা মারলুম। তালা খুললো না। ততক্ষণে সাহেব এসে আমার পিঠে আরও ক' ঘা বসিয়ে দিলে।

আমি সামনের দু পা তুলে তুর্কি নাচ শুরু করে দিলুম। সাহেবও মার থামাচে না, আমিও নাচ থামালুম না। শেষে নাচতে নাচতে সাহেবের ঘাড়ে পা তুলে দিয়েছি। সাহেব "মাই গড" বলে চেঁচিয়ে উঠে মাটিতে চিৎপটাং। হাতের ছড়িটা হাত ফসকে ছিটকে গেল। সেই তক্কে আমি চার পা তুলে সাহেবের পেটের ওপর লাফালাফি শুরু করে দিলুম। সাহেব কোঁতাতে লাগলো, "সেভ মি, সেভ মি।"

আমি সে-কথারও মানে বুঝলুম না, নাচানাচিও থামালুম না। আমার ঠ্যাং-এর ঠেলায় সাহেব পাশ-বালিশের মত গড়াগড়ি খেতে লাগলো। শেষমেষ সাহেবের মুখে ফেনা উঠলো। সাহেব ঠাণ্ডা মেরে গেল।

এইরে, শেষে আমি সাহেব খুন করে বসলুম! এবার তো তাহলে আমার নিস্তার নেই! আমি পালাবার জন্যে ওই তালা-আঁটা গেটটায় তেড়ে-মেড়ে ধাক্কা দিতে লাগলুম। দেওয়ালের এ-ধার ও-ধার থেকে ধুলোবালি ঝরঝরিয়ে খসে পড়ছে। কিন্তু গেট খুলছেও না, ভাঙছেও না। হঠাৎ দেখি কী, অন্ধকারে যেন একটা আলোর ফুলকি ছুটতে ছুটতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি স্থির হয়ে গেলুম। তারপর দেখি, হাতে লম্ফ নিয়ে একটি ছোট্ট মেয়ে। আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। হাঁপাতে হাঁপাতে খুব চাপাগলায় বললে, "গেটে তালা আঁটা, পেছনের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।"

আমি অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলুম, এখানে এ আবার কে? ভারী মিষ্টি! এর আবার কী মতলব! এই কি তবে খিলখিলিয়ে হাসছিল!

মেয়েটি বললে, "বাঁচতে হলে পালাতে হবে। নইলে সাহেব আবার এক্ষুনি জেগে উঠবে। ভেবো না, সাহেব মরেছে। এ সাহেব মরে না। এর নাম সলোমন সাহেব। ম্যাজিক জানে। এসো, আমার সঙ্গে।"

ওর হাতে আলো ছিল, তাই দেখেশুনে পেছনের রাস্তায় পৌঁছে গেলুম। এদিকেও একটা গেট। খোলা। মেয়েটি বললে, "এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।"

আমি দেখলুম, এটা ভাঙা-বাড়ির পেছনদিক। বাইরে সেই চেনা জঙ্গল। সেই রকম গভীর আর সেই রকম থমথমে। অবিশ্যি তখন ছিল দিন, এখন রাত। তাই অন্ধকারটাও এখন জমাট।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "আমি যাব কী করে?"

মেয়েটি বললে, "আমার সঙ্গে।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি কে?"

সে বললে, "লক্ষ্মী।"

আমি বললুম, "আমি গণেশ।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি তো লক্ষ্মী, সাহেবের বাড়িতে এলে কী করে?"

লক্ষ্মী বললে, "সাহেব আমায় ধরে এনেছে। আমি ওই জঙ্গলের ধারে রোজ ছাগল চরাতে আসতুম। একদিন সন্ধে হয়ে গেছলো। হঠাৎ ওই জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে এলো। আমি ছুটতে গেলুম, আমায় থাবা মারলো। পড়ে গেলুম। বাঘটা আমায় টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে এই ভাঙা-বাড়িটায় ধরে এনে বন্দী করে রাখলে। তারপর তুমি যেমন দেখলে, একটা শকুনি প্রদীপের জল খেয়ে সাহেব হয়ে গেল, আমিও তেমনি দেখলুম, একটা ডোরাকাটা বাঘ, ওই প্রদীপের জল খেয়ে, সলোমন হয়ে গেছে। যে সাহেব, সেই সলোমন। তাই নাম সলোমন সাহেব।

"প্রদীপটা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ?" আমি লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলুম।

লক্ষ্মী বললে, "না, আলাদিনের নয়। সলোমনের আশ্চর্য প্রদীপ।"

আমি বললুম, "প্রদীপটা খুঁজতেই তো আমি এখানে এসেছিলুম। পেয়েও গেছলুম। কিন্তু সাহেব যেই লাঠি মারলো, আমি ঘোড়া হয়ে গেলুম, আর আমার হাত থেকে প্রদীপটাও ছিটকে পড়ে হারিয়ে গেল। আচ্ছা, আমি আর মানুষ হতে পারবো না ?"

হঠাৎ লক্ষ্মীর হাতের সেই লম্ফটা দপ করে নিভে গেল। লক্ষ্মী চেঁচিয়ে উঠলো, "সলোমন সাহেব, সলোমন সাহেব ! পালাও, পালাও !"

আমি বললুম, "তোমায় নিয়ে যাব। তোমায় মায়ের কাছে পৌঁছে দেব। আমার পিঠের ওপর তাড়াতাড়ি লাফিয়ে ওঠো"।

লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলে, "সত্যি ?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ। তুমি আমার বোন।"

লক্ষ্মী আমার পিঠের ওপর বসতে না বসতেই সলোমন সাহেব "পাকড়ো, পাকড়ো" করে চিৎকার করে উঠলো। ততক্ষণে লক্ষ্মীকে পিঠে নিয়ে আমি ছুট দিয়েছি।

কানে তখন অস্পষ্ট কান্নায় সলোমনের গলার চিৎকার ভেসে আসছে, "মাই ল্যাম্প, মাই ল্যাম্প।" সে চিৎকার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমি লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলুম, "সাহেব ল্যাম্প ল্যাম্প করে কী বলছিল ? কী মানে ?"

লক্ষ্মী বললে, "তুমি জানো না ?"

আমি বললুম, "না।"

"ও।" চুপ করে গেল লক্ষ্মী।

খানিকক্ষণ চুপচাপ ছুটলুম। তারপর আমিই কথা বললুম, "আমি ঘোড়া"।

লক্ষ্মী উত্তর দিলে, "লেখাপড়া না-শিখলে মুখ্‌খু লোকে ঘোড়াই হয়।"

"ও, তাই বুঝি। তবে যে বলে গাধা হয়।"

লক্ষ্মী বললে, "হ্যাঁ। ওই একই কথা। দুটোই মুখ্‌খু !"

"তা হলে ?"

"তা হলে তোমায় মুখ্‌খু থাকলে চলবে না। সব কিছু জানতে হবে, শিখতে হবে।"

আমি বললুম, "আমি জানবো, আমি শিখবো।"

লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলে, "ঠিক ?"

আমি উত্তর দিলুম, "ঠিক, ঠিক, ঠিক।"

দূরে একটা ঝিলের ওপর চাঁদের ছায়া পড়েছে। লক্ষ্মী বললে, "দাঁড়াও, আমি নামবো।"

আমি ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে বললুম, "কেন ?"

লক্ষ্মী আমার পিঠ থেকে লাফিয়ে বললে, "আসছি।"

লক্ষ্মী ঝিলের কাছে চলে গেল। আমি দেখলুম লক্ষ্মী তার আঁচল থেকে সেই প্রদীপটা বার করে, প্রদীপে জল নিলে। আমার কাছে এলো। মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "জলটা খেয়ে নাও।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "এটা সলোমনের প্রদীপ ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি পেলে কী করে ?"

"তোমার হাত থেকে ছিটকে গেছলো, আমি কুড়িয়ে রেখেছিলুম।"

আমি চোখ বুজে জলটা গিলে ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা-মুণ্ডু সব একাকার হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো। আমি এত বড় একটা ঘোড়া, চক্ষের পলকে আবার গণেশ হয়ে গেলুম।

আমি বললুম, "প্রদীপটা তো সাংঘাতিক জাদু জানে।"

লক্ষ্মী বললে, "প্রদীপও না, জাদুও না। ওই যে তুমি বললে, জানবে শিখবে, তাই তুমি আবার ঘোড়া থেকে মানুষ হলে।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তাই বুঝি?"

লক্ষ্মী বললে, "তাই।"

আমি হাত বাড়ালুম, "দেখি প্রদীপটা।"

লক্ষ্মী প্রদীপটা আমার হাতে দিল। আমি লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাক'লুম। লক্ষ্মী অবাক চোখে আমায় দেখলে। আমি প্রদীপটা ঝিলের জলে ছুঁড়ে দিলুম। জলে ঢেউ খেলে গেল। আকাশের চাঁদটা জলের ছায়ায়, ঢেউ-এর দোলায় নেচে উঠলো।

লক্ষ্মী বললে, "এ কী, ফেলে দিলে?"

আমি বললুম, "ওর কাজ শেষ হয়ে গেছে। প্রদীপ কী হবে? আমি তো আমার বোনকে পেয়েছি।"

লক্ষ্মীর মুখটা হাসিতে উছলে গেল। আবার তেমনি হি-হি-হি করে হেসে উঠলো।

আমিও হাসতে হাসতে, লক্ষ্মীর হাত ধরে, চাঁদের আলোয় ছুটতে ছুটতে বাড়ি চললুম।
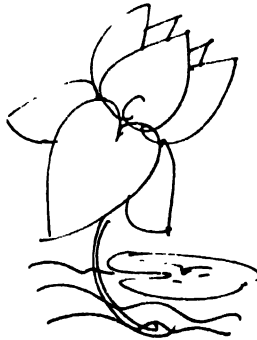
সোনালী মৌমাছি

ফয়েজ আহ্‌মদ

রোববারের বিকেল। হালকা রোদ আরো হালকা হয়ে আসছে। লুবু মাঠ থেকে খেলা করে দৌড়ে আসছিল বাড়িতে। সে তার ছোট্ট বাগানটায় ঢুকেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। চুপটি করে পা' টিপে টিপে সে ফুল গাছের পাতার আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিছু একটা ধরতে চায় সে।

মা তার অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এসে বললেন ঃ কি করছ, লুবু ?

কোন উত্তর নেই। কেবল নিজের মুখের উপর ডান হাতের তর্জনী রেখে ইঙ্গিত করল লুবু, চুপ, কথা বলো না !

মা একটু থেমে আবার বললেন ঃ ও, তুমি ফড়িং ধরছ বুঝি—না প্রজাপতি ?

লুবুর সম্মুখের ফুলটা থেকে একটা সোনালী মৌমাছি উড়ে গিয়ে বসল একটু দূরে আর একটা ফুলে। গুন গুন করে গান গেয়ে মধু খাচ্ছিল মৌমাছিটা।

কি যে করলে, মা ! তোমার কথা শুনে সুন্দর মৌমাছিটা সরে পড়ল। লুবুর ভারি দুঃখ।

মা তো অবাক ঃ বলো কি, মৌমাছি ধরতে নেই, হুল ফুটিয়ে দেবে।

কেন সে হুল ফুটাবে ? তাকে তো আমি আদর-যত্ন করে রাখব, তার গান শুনব আমি। তা ছাড়া সে আমাদেরই আম গাছে থাকে।

মা বললেন ঃ না বাবা, দরকার নেই মৌমাছির গানে। তুমি এসে পড়। এই বলে মা চলে গেলেন।

মিহি সুরে হেসে উঠলো মৌমাছিটা। যেন একটা পাতলা তারের বাদ্য-যন্ত্রে কেউ দিয়েছে। তারপর মৌমাছিটা বলল ঃ তোমার মা ঠিকই বলেছেন। শুধু আমিই তোমাকে ফুটিয়ে দেব না, শত শত মৌমাছি-বন্ধু এসে তোমাকে আক্রমণ করবে।

লুবু একটু এগিয়ে মৌমাছিকে বলল : তোমাদের মধ্যে তো ভারি জোট দেখছি হে।

জোট থাকবে না? মৌমাছি লুবুর দিকে মুখ তুলে ফুলের পাপড়ির উপর দাঁড়িয়ে বলল : যদি পরস্পরকে সাহায্য করতে না আসি, তবে তো তোমাদের মতো ছেলেরা এক দিনেই বংশ উজাড় করে দেবে।

আচ্ছা, তোমাদের এই দল বেঁধে থাকার বুদ্ধি কে দিল? লুবু প্রশ্ন করল।

আমরা অনেক দুঃখ পেয়েই শিখেছি। মৌমাছি বলে চলল : তোমাকে তবে খুলে বলি সব তিনটে-বুদ্ধি আমাদের হয়েছে, তিনটে ঘটনায়। তোমাদের মতোই ছিলাম আমরা এক আমাদের রাজ্যের রাজা ছিলেন ভয়ানক স্বার্থপর আর তিনি তাঁর সভাসদ্‌দের কথাই শুনতেন। তিনি ভাবতেন রাজ্যে তাঁর চেয়ে বুদ্ধিমান কেউই নেই।

শোনাও দেখি তোমাদের রাজার গল্প।

মৌমাছি শুরু করল : রাজার সভাস্‌দদের মধ্যে মন্ত্রী, সেনাপতি, বৈজ্ঞানিক আর একজন ছিলেন সব চেয়ে খয়েরখাঁ, মানে জী-হুজুর গোছের লোক—রাজা যা বলেন তাতেই রাজার খাজনা আর নানা ধরনের কর দিতে দিতেই আমাদের সব টাকা ফুরিয়ে যেত। উপর বৈজ্ঞানিকের পরামর্শে রাজা একবার রাজ্যময় ঢোল পিটিয়ে দিলেন—প্রজাদের শাল পাতা দিয়ে ঘর বানিয়ে থাকতে হবে, গরীবের এর বেশী লাগে না। ভালো ঘর না বানিয়ে যে টাকা বাঁচবে তা দিয়ে আসতে হবে রাজাকে।

তোমরা রাজার কথা শুনলে কেন? শাল পাতার ঘরে লোকে থাকতে পারে! লুবু বলল।

সবাই রাজার অত্যাচারের ভয়ে শালপাতার ঘর বানিয়ে বাকি টাকা সব দিয়ে এলো রাজকোষে। মৌমাছি বলল : রাজা পাহাড় কেটে পাথর এনে আমাদের টাকা দিয়ে বানালেন একটার পর একটা প্রাসাদ। তারপর নতুন প্রাসাদে সভা ডেকে একদিন রাজা সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন—কে সব চেয়ে বুদ্ধিমান দুনিয়ায়? মন্ত্রীগণ এক সাথে উত্তর দিলেন—আমাদের দয়ালু মহারাজা। রাজা সবাইকে মিষ্টি খাইয়ে বিদায় দিলেন।

রাজার মন্ত্রিরা সব ভাঁড় দেখছি!

কিন্তু আমাদের গায়ে এক বাড়িতে সাত ভাই আর এক বোন ছিল। সবার ছোট বোনকে সাত ভাই এত ভালো বাসত যে, বোন যা বলত ভাইরা সে কাজ করতই। বোন ভাইদের বলল, তাদের ঘরগুলো শাল পাতার বদলে শাল গাছের হওয়া চাই। শালপাতার ঘরে অনেক বিপদ, সে বাস করতে পারবে না! ভাইরা তাই করলো। রাজাকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে এলো। কিছু দিন পর বোশেখ মাসের এক দিন ভয়ানক ঝড় বয়ে গেল। সর্বনাশা ঝড় গরীব প্রজাদের সমস্ত শালপাতার ঘর উড়িয়ে নিয়ে গেল আকাশে, কোন চিহ্নমাত্র রইল না ঘরের! চার দিকে প্রজাদের কান্নার রোল উঠলো। কিন্তু কেবলমাত্র সেই সাত ভাই, এক বোনের ঘর ঝড়ে উড়ে গেল না।

এবার রাজা কি বলেন?

তিনি রাজসভার পরামর্শ চাইলেন নতুন করে টাকা উঠাবার জন্যে। মৌমাছি বলতে লাগল : এবার মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন—হুজুর, ফরমান জারী করে দিন, কেউ যেন ধান ইত্যাদি খাদ্যশস্য গোলা করে জমিয়ে না রাখে। অতিরিক্ত সব শস্য রাজগোলায় উঠবে, বেশী খেয়ে গরীবের অসুখ হতে পারে! শুনে রাজা ভারি খুশী। এবার রাজা সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন—কে সব চেয়ে বুদ্ধিমান দুনিয়ায়? সভার মন্ত্রিগণ এক সাথে উত্তর দিলেন—আমাদের দয়ালু রাজা। রাজা হয়ে সবাইকে মিষ্টি খাইয়ে দিলেন। কিন্তু রাজ-দরবারের এক কোণে খাঁচার মধ্যে ছিল

রাজার প্রিয় কাকাতুয়া। সে বলে উঠলো—সব চেয়ে বুদ্ধিমতী সেই সাত ভাই-এর এক বোন, যার শাল গাছের ঘর ঝড়ে উড়িয়ে নেয়নি।

কাকাতুয়া ঠিক বলেছে।

সেই থেকে আমরা নিজেদের ঘর তৈরী করি শক্ত করে, যাতে ঝড়বৃষ্টি ক্ষতি করতে না

পারে। এই আমাদের প্রথম শিক্ষা।

তারপর ?

তারপর রাজার লোক গাঁয়ে গাঁয়ে ঢোল পিটিয়ে হুকুম জারি করে গেল রাজাকে অতি

শস্য দিয়ে আসার। প্রজারা নিজেদের পিঠে বয়ে সব ধান, শস্য রাজার গোলায় দিয়ে এ

অত্যাচারের ভয়ে। রাজা সে শস্য বিক্রি করে লাখে লাখে টাকা দিয়ে প্রাসাদ সাজাবার জিনিষপত্র ক্রয় করলেন। কিন্তু দেশে আবার দুর্যোগ এলো, এবার ভাতের অভাব। কারো ঘরেই ধান চাল নেই, বাজারেও কিনতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কেনার-ক্ষমতা কোথায় তাদের? চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল, দেশে ভাতের অভাবে অর্ধেক লোকই মারা গেল। সেই সাত ভাই-এর এক বোন গোলার ধান রাজাকে দেয়নি। ভাইদের সে বলেছিল—আমি অভাবের দিনে কষ্ট করতে পারব না। তারা সবাই ছিল বেঁচে।

এবার রাজা কি বলেন?

রাজা সভা ডেকে বললেন—আমার প্রাসাদ ও জিনিষপত্র পাহারা দেয়ার জন্যে লোকজনের দরকার। তাদের মাইনে, পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাওয়া-দাওয়ার জন্যে টাকা চাই। মৌমাছি মুখ কালো করে কথাগুলো বলছিল: এবার সেনাপতি পরামর্শ দিলেন—হুজুর, দেশ রক্ষার জন্যে টাকা দরকার। আপনি আদেশ করুন প্রজারা যেন তাদের সমস্ত ঢাল-তলোয়ার, বল্লম, বর্ম, কোটালের কাছে জমা দেয়। সে সমস্ত অন্য রাজার কাছে বিক্রি করে বিস্তর টাকা হবে। তাছাড়া প্রজাদের কাছে অস্ত্র থাকলে কখন যে বিদ্রোহ করে বসে, ঠিক আছে? রাজার মনে ধরল পরামর্শ। এবার রাজা সভার সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন—কে এদেশে সব চেয়ে বুদ্ধিমান? সভার মন্ত্রিগণ এক সাথে উত্তর দিলেন—আমাদের দয়ালু রাজা। খুশী হয়ে রাজা সবাইকে মিষ্টি খাইয়ে দিলেন। কিন্তু সেই কাকাতুয়া এতক্ষণ চুপ ছিল, সে বলল—রাজ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী সাত ভাই-এর এক বোন, যে রাজাকে গোলার ধান না দিয়ে অভাবের সময় কষ্ট পায়নি।

কাকাতুয়া ঠিক বলেছে।

সেই থেকে আমরা দুর্দিনের ভয়ে খাদ্য জুগিয়ে রাখি। এই আমাদের দ্বিতীয় শিক্ষা। মৌমাছি বলল।

তারপর?

তারপর রাজার ঢুলী রাজ্যের গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে সমস্ত আত্মরক্ষার অস্ত্র কোটালের কাছে জমা দিতে বলে গেল। গরীব প্রজারা রাজার ভয়ে সমস্ত ঢাল-তলোয়ার দিয়ে এলো গরুর গাড়িতে চাপিয়ে। কিন্তু সেই সাত ভাই-এর এক বোন ভাইদের রাজাকে অস্ত্র দিতে মানা করেছিল। সে বলেছিল—দেশে চোর-ডাকাতের ভয় রয়েছে, কোন অস্ত্র না থাকলে আমার ভয় করে। ভাইরা বোনের কথা মতো কোন অস্ত্রই রাজাকে দেয়নি। আমাদের রাজা সমস্ত অস্ত্র অন্য দেশের রাজার কাছে বিক্রি করে প্রাসাদের খরচ চালাতে লাগলেন। অন্য রাজার নতুন অস্ত্র পেয়ে শক্তি বেড়ে গেল। তিনি একদিন আমাদের দেশ আক্রমণ করলেন। আমাদের রাজা পরাজিত হতে বাধ্য হলেন। কারণ তাঁর অস্ত্র আর সৈন্য নেই বললেই চলে। আর প্রজারা তো মাটির পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল অস্ত্রছাড়া। ভিন দেশের রাজার সৈন্যরা দেশের সব লুট করে নিয়ে গেল, বহু লোক মারা গেল। আমাদের রাজা পরাজিত হয়ে বিজয়ী রাজাকে কর দিতে রাজী হয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন। এদিকে সেই সাত ভাই আর এক বোন তাদের অস্ত্র দিয়ে শত্রুদের বাধা দিল। তারা সবাইকে ডেকে নিয়ে রুখে দাঁড়াল। তাদের গ্রামের তিন দিকে নদী। তারা বাকি দিকটা বিরাট খাল কেটে দু'দিকের নদীর সাথে মিলিয়ে দিল। শত্রু সৈন্য আর গ্রামে আসতে সাহসই পেল না। মৌমাছি খুব গর্বের সাথে শেষের কথাগুলো বলল।

এবার রাজা কি বলেন?

রাজা সভা ডেকে পরামর্শ চাইলেন, কি করে রাজ্য উদ্ধার করা যায়! কিন্তু সভায় কেবলমাত্র উপস্থিত সেই যাদুকর—আর সব মন্ত্রীই যুদ্ধের সময় ভেড়ার মতো কোন প্রকার বাধা না দিয়েই

মারা গেছেন। যাদুকর কোন বুদ্ধি দিতে পারলেন না। কি করেই বা দিবেন? কেউ যে রাজার কথা শুনবে, তা' তো বলা যায় না। রাজা ভয়ানক ক্ষেপে গেলেন। নিজের মনে শক্তি ও সাহস আনার জন্যে তিনি যাদুকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান? যাদুকর চীৎকার করে বলল: আমাদের দয়ালু রাজা। রাজা খুশী হয়ে তাকে মিষ্টি খাওয়ালেন। এমন সময় রাজ-দরবারের কোণ থেকে সেই কাকাতুয়া বলে উঠলো রাজ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমতী সাত ভাই-এর এক বোন, যে রাজাকে কোন অস্ত্র দেয়নি। সে গ্রামের সবাইকে নিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুদের তাড়িয়েছে।

কাকাতুয়া ঠিক বলেছে।

সেই থেকে আমরা সাথে অস্ত্র রাখি, শত্রুকে ঘায়েল করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করি। এই আমাদের তৃতীয় শিক্ষা। মৌমাছি বলল।

তারপর?

তারপর রাজা কাকাতুয়া আর সাত ভাই এক বোনের উপর রেগে গেলেন। তক্ষুনি কাকাতুয়াটাকে ছেড়ে দিলেন। সে উড়ে বনে চলে গেল। প্রহরীদের হুকুম দিলেন সাত ভাইকে বেঁধে নিয়ে আসতে দরবারে। বিচার হবে, কেন তারা রাজার নির্দেশ মানেনি। যাদুকরকে বললেন, মন্ত্র-বলে সাত ভাই-এর বোন ও তার গ্রামের লোকদের সামান্য পোকায় পরিণত করতে।

যাদুকরের মন্ত্রে তোমরা মৌমাছি হয়ে গেছ?

হ্যাঁ, আমাদের মৌমাছি বানিয়ে দেওয়া হল, যাতে কোন নিজস্ব দেশ আমাদের না থাকে। আমরা আজকে এখানে, কালকে ওখানে। সাত ভাই-এর বোনকে রাণী বানালাম, তার মত বুদ্ধি কার? আমরা তিন শিক্ষা ভুলিনি। আমরা ভালো করে বাসা বানিয়ে থাকি, দুর্দিনের জন্য খাদ্য জুগিয়ে রাখি আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুকে রুখি। এই বলে সোনালী মৌমাছিটা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে গুণ গুণ করে গান গেয়ে মিলিয়ে গেল।

লুবু দাঁড়িয়ে রইল তন্ময় হয়ে।

ভয়ঙ্কর এক সত্যি ডাকাতির গল্প

সলিল লাহিড়ী

আমার দুই নাতি-নাতনিকে নিয়ে হয়েছে মহা জ্বালা। আমাকে কাছে পেলেই বলবে,—বলত দাদু একটা গল্প। কত আর গল্প বলি দুজনকে। পপাই আর ঝিল্লি মাত্র দু-সপ্তাহ হল বোম্বাই থেকে কলকাতা এসেছে গরমের ছুটিতে। কিন্তু এরই মধ্যে বেতাল-পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ সিংহাসন, হ-য-ব-র-ল, পঞ্চতন্ত্রের গল্প, রবিন হুডের গল্প শোনা শেষ। এখন চলেছে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলার পালা। তাও কত বানানো যায়?

রোববার সকালে সবে খবরের কাগজ খুলেছি, গুটি গুটি পায়ে ছয় বছরের পপাই আর চার বছরের ঝিল্লি এসে হাজির।—দাদু, গল্প।

—এই রে! এই সকালেই তোদের হামলা শুরু?

—দাদুভাই, গল্প। কাল কোথায় গল্প বলেছ?—পপাই বেশ চাপই দেয় আমার উপর।

—একটা ভাল গল্প।—পুঁচকে নাতনী ঝিল্লিটাও সায় দেয় দাদা পপাই-এর আবদারের সঙ্গে। কাগজ পড়া বন্ধ রেখে ভাবতে বসি, তাইতো, বিচ্ছু দুজনকে কিসের গল্প বলি।

—কিরে, এত ভাবছিস কি গালে হাত দিয়ে?—কথা শুনে চমকে তাকাই। দেখি ড্রইংরুমে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার প্রভাস দাদু। আমার ঠাকুর্দার খুড়তুতো ভাই। নিরানব্বই বছর বয়স হলে হবে কি, এখনও সোজা হাঁটেন। লিকলিকে চেহারা, তবুও শরীরের বাঁধুনি এখনও মজবুত। মাথায় হাল্কা কোঁকড়ানো সাদা চুল, এক হাত লম্বা পাকা দাড়ি। দেখলেই দারুণ ভাল লাগে। হবেই বা না কেন? দীর্ঘদিন স্বদেশী করেছেন। অ্যানার্কিস্টদলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রফেসরী আর শুধু জনহিতকর কাজই করেছেন। বিয়ে-থাও করেননি, আর টাকাকড়ি, জমি-জমা যা ছিল সব নানান প্রতিষ্ঠানকে দান করে দিয়েছেন। এখন নানান বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের বাড়ি দু-একদিন থাকেন। ব্যাস্, এই হচ্ছে প্রভাস দাদুর বর্তমান জীবন।

—কিরে নাতি, কি সমস্যায় পড়লি এত ?—হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করেন প্রভাস দাদু।

—আর বলবেন না দাদু, এই যে পাশে দেখছেন দুই বিচ্ছু, এরা হচ্ছে মেয়ে ঝুমকির ছেলেমেয়ে। এদের গল্প শোনাতে হবে। প্রতিদিন বারো ষোলটা গল্প বলা যায় ?

—আরে বোম্বেটে! তোরা তবে আমার নাতির নাতি-নাতনি! বাঃ, বাঃ।—আদরে পপাই-ঝিল্লিকে কাছে টানেন দাদু।

—অ্যাঃ, বিশ্রী দাড়ি।—মুখ ভ্যাটকায় ঝিল্লি। পপাই-এর মুখেও অখুশির ছাপ।

—বিশ্রী দাড়ি কিরে ? এই দাড়ির মধ্যেইতো গল্পের ঝুড়ি লুকোনো—ঝিল্লিকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন প্রভাস দাদু!

—অ্যাঃ! দাড়ির মধ্যে গল্প থাকে বুঝি ?—দাদুর গায়ের কাছে চলে আসে পপাই।

—থাকেই তো। তা কিসের গল্প শুনবি ? বাঘ-সিংহের, রাজকন্যার রাজপুত্তুরের, না ভূতের ?—মজার মানুষ প্রভাস দাদু জিজ্ঞেস করেন পপাইকে।

—ডাকাতের।

—ডাকাতের গল্প শুনবি ?

—হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ডাকাতের গল্প বলবে কিন্তু। মিথ্যে মিথ্যে ডাকাতের গল্প বললে চলবে না, বলে দিলাম।

—বাপরে! গল্প শুনবি ডাকাতের, অথচ ডাকাতকে হতে হবে সত্যি ?—কঠিন হুকুম তো ব্যাটা তোর। মুচকি হাসেন দাদু। একটু ভাবেন। তারপর বলেন—শোন তবে, একদম এক খাঁটি ডাকাতের গল্প। এ ডাকাতকে আমি দেখেছি। সে এক ভয়ঙ্কর ডাকাত।

—ডা-কা-ত দেখেছ তুমি! সত্যি সত্যি ডাকাত! বুড়ো দাদু, ঐ ডাকাতের গোলগোল ভাঁটার মত চোখ ছিল, ইয়া পেল্লাই চেহারা ছিল, ঝাঁকড়া চুল ছিল, রণ-পা দিয়ে চলত ?

—দাঁড়া ব্যাটা, গল্পটা শোন। বাপ্‌রে, একদম ঝড় বইয়ে দিলি কথার তোড়ে। মনে রাখিস পোড়নাতি কথাটা, সত্যিই এটা সত্যি ডাকাতের গল্প। সব নিজের চোখে দেখা।

পপাই-ঝিল্লি প্রভাস দাদুর গা ঘেঁসে বসে। সত্যি বলতে কি, আমিও এই সত্যি গল্পের গন্ধে বসে থাকি ঘরে। প্রভাস দাদুর জীবনে বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা যে ঘটেছে তাতো আমি জানি। তবে প্রকাশ করেছেন কমই এই যা। তাই সত্যি ডাকাতের গল্পের লোভ আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে আটকে রাখে।

—বুঝলি পোড়নাতিরা, এই ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় আশি বছর আগে। আমাদের এই দেশ ছিল তখনও পরাধীন, ইংরেজরা আমাদের কাঁধে রাজা হয়ে বসে। সেই সময় ভারতবর্ষে সত্যিকার রাজারাও ছিল, আর ছিল জমিদাররা। রাজা-জমিদার খাজনা দিলেই ইংরেজরা খুশি থাকত। রাজা-জমিদাররা খুশিমত নিজ রাজ্য শাসন করত।

—বুড়ো দাদু, জমিদার কাদের বলে ?—পপাই প্রভাস দাদুর গল্পের মাঝখানে প্রশ্নটা করে।

—রাজা কাদের বলে তাতো জানিস ?

—হ্যাঁ বুড়ো দাদু, তা জানি।

—প্রতি রাজার রাজ্যে বিরাট জায়গা জমি নিয়ে থাকত কয়েকজন জমিদার। জমিদাররা খাজনা দিত রাজাকে। রাজা খাজনা দিত ইংরেজদের। সে সময়ে এক একজন জমিদারের দারুণ প্রতাপ ছিল। কত লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া, পেল্লাই প্রাসাদ থাকত জমিদারের, তা তোরা আজ

সলিল লাহিড়ী

কল্পনাও করতে পারবি না। আমার বাবা, মানে তোদের দাদুর বুড়ো দাদুও ছিল এমনি একজন জমিদার।

—দাদুভাই! তুমি জমিদার!—পপাই অবাক হোয়ে আমার দিকে তাকায়।—ধ্যাৎ। সে সব তো কবে চলে গেছে। এখন আমি স্রেফ তোদের দাদুভাই। জমিদারি-টারি কি আর আজ আছে?—নাতি পপাইকে বোঝাই আমি।

—এই ক্ষুদে নাতি, শোন না তারপরের ঘটনা। চুপটি করে শোন, তা না হলে সেই ভয়ঙ্কর ডাকাত পট করে আসবে, আর ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে টুক করে তোকে তুলে নিয়ে যাবে।

প্রভাস দাদুর কথাটা শুনে পপাইবাবু আমার গায়ের কাছে সেঁটে বসে।—বুঝলি, জমিদারদের প্রতাপের কথা তো শুনলি। জমিদারের ছেলে বলে আমাদের চলাফেরা বেশ মেজাজী ধরনের ছিল। সবাই খাতির করত আমাদের। পেল্লায় সাতমহলা আমাদের জমিদার বাড়ি থেকে একটু দূরে ছিল কাছারিবাড়ি। কাছারিবাড়িটাও ছিল প্রকাণ্ড।

—কাছারিবাড়ি কি গো?—পিন্ পিন্ স্বরে বলে নাতনী ঝিল্লি।

—জমিদারির কাজকর্ম, হিসাব-নিকাশ এসব কাজ যেখানে হয়, সেটাই কাছারিবাড়ি। বলতে পারিস্ জমিদারের অফিস সেটা। হ্যাঁ, যা বলছিলাম; সেই কাছারি বাড়ির মাথা হচ্ছে নায়েব জমিদারির দেখাশোনা, খাজনা আদায়, জমিদারকে খাজনা দেওয়া প্রজাদের জন্য রাস্তাঘাট, স্কুল এসব বানানো, সব কিছুই করত নায়েব। নায়েবও দারুণ কেউকেটা লোক ছিল।

আমাদের যে নায়েব ছিল, তখন তার বেশ বয়স হয়েছে। প্রায় ৪৫/৫০ মত হবে। আর বাবার বয়স ৩৫ মতো তখন। নায়েব রামেশ্বরবাবু এমন সুন্দর কাজকর্ম দেখতেন যে বাবাকে একটুও ভাবতে হত না। বাবাও ভালমানুষ ছিলেন। তাই প্রজারাও বেশ সুখেই ছিল। আমাদের জমিদারির বেশ বোল-বোলাও তখন।

এই সময়ে একদিন নায়েব রামেশ্বরবাবু বাবার কাছে হাতজোড় করে এসে দাঁড়ালো।

—কি ব্যাপার নায়েববাবু?—অবাক হয়ে বাবা জিজ্ঞেস করেন।

—আজ্ঞে, মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়েছে। কদিন ছুটি চাই, আর—

—আরে! তাই নাকি! এতো খুব আনন্দের কথা। যাও বিয়ের সব ব্যবস্থা কর। টাকা পয়সা যা লাগে খাজাঞ্চীকে বলে নিয়ে যাও। ঐ টাকা তোমার মেয়ের বিয়েতে আশীর্বাদী দিলাম। তবে ছুটি-টুটি পাবে না!

—আজ্ঞে কত্তা—হাত কচলান বয়স্ক নায়েববাবু।

—দিনের যে কোনো একসময় কাছারিতে এসো, তাতেই হবে। তুমি না এলে আমি চোখে অন্ধকার দেখব।

—যো হুজুর।—আভূমি নত হয়ে বাবাকে নমস্কার জানিয়ে চলে যান নায়েব রামেশ্বরবাবু।

বেশ চলছে সবকিছু। হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা বাবা যখন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প করছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন নায়েববাবু। পাংশুটে মুখ, কেমন ভীত চাহনি।

নায়েববাবুর এরকম চেহারা দেখে বাবা তো অবাক!—কি হয়েছে নায়েব? এমন চেহারা কেন?

—কত্তাবাবু, আমার সর্বনাশ হল। এত্তেলা পাঠিয়েছে সুখু ডাকাত। পরশুদিন, মেয়েটার বিয়ের রাত্তে আসবে গহনা টাকা-পয়সা লুট করতে।

—হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন নায়েব রামেশ্বরবাবু।

—সেকি! সুখু ডাকাত তো আমার সীমানায় কোনোদিন আসেনি!—গম্ভীর, থমথমে হয়ে যায় বাবার মুখ।

—কিন্তু হুজুর, সুখু ডাকাতকে তো আপনি জানেনেই। ও যখন এত্তেলা পাঠিয়েছে, তখন ও পরশু আসবেই আর মেয়েটার গহনাগাটি, যাবতীয় টাকা-পয়সা লুটে নিয়ে যাবেই।

—হুম। —থমথমে মুখে যেন কি চিন্তা করেন বাবা।

—কত্তা, সুখু ডাকাত একথাও জানিয়েছে, বাধা-দিলে মেয়েটাকেও নাকি লুঠ করে নিয়ে যাবে। কি হবে হুজুর?—কাঁদতে কাঁদতে বাবার পাদুটো জড়িয়ে ধরে নায়েবকাকা।

—নায়েব, যাও মেয়ের বিয়ের যা করছ কর। বিয়ের রাতে আসরে আমি থাকব। আমি থাকতে তোমার কোনো ভয় নেই।—বাবার আশ্বাসবাণীতে কান্না থামে নায়েবকাকার। চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে যান নায়েব রামেশ্বর চাটুজ্যে। নায়েবকাকার মেয়ের বিয়ে সবে শেষ হয়েছে। বিয়ে বাড়িতে আনন্দের সঙ্গে উৎকণ্ঠা ছেয়ে আছে। বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাতের মত সুখু ডাকাতও ছিল দুরন্ত ডাকাত। সুখু ডাকাত আসত খবর পাঠিয়ে, এত্তেলা দিয়ে। তবুও তাকে বাধা দিতে পারত না কেউ। জনা পঞ্চাশেক সাগরেদ নিয়ে আসত তারপর ঝড়ের গতিতে সব লুঠে নিয়ে যেত।

আজ রাতেই সুখু ডাকাতের আসার কথা নায়েব রামেশ্বর কাকার বাড়ি। তাই ভয় জড়িয়ে আছে সবার মনে। শুধু নিরুত্তাপ আমার বাবা। নায়েব কাকা বাইরের ঘরে বসে আছেন। বাবার লেঠেল সর্দার রুখু তার দলবল নিয়ে ঘিরে আছে নায়েবের বাড়ি।

অতিথিদের খাওয়া দাওয়া সবে শেষ হয়েছে। বিয়েবাড়ির সানাই-এর আওয়াজ সবে থেমেছে। সন্ধে গড়িয়ে রাত নেমেছে। বাবার লেঠেল সর্দার রুখু ছুটে আসে বাবার কাছে।—হুজুর, দূরে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে।

—তাই নাকি?—বাবা ত্রস্ত পায়ে বাইরে আসেন। দূরে জোনাকির আলোর মত একরাশ আলোর বিন্দু চলাফেরা করছে, দেখতে পেলেন বাবা। আমরাও দেখলাম সবাই।

বাবা বললেন,—সবাই বাড়ির মধ্যে চলে যাও। মেয়েরা ঘরে ঢুকে ঘর বন্ধ করে দাও। রুখু, কয়েকজন লেঠেল নিয়ে তুই শুধু আমার পাশে থাকবি। অন্য লেঠেলরা মেয়েদেব ঘরের চারপাশে থাকবে।

—হুজুর, মাত্র কয়েকটা লেঠেল নিয়ে সুখুকে ঠেকানো যাবে—অবাক গলায় বলে লেঠেল সর্দার রুখু।

—তর্ক করিস না। যা বলছি কর। সময় নেই বেশি।—ধমক লাগান বাবা।

দেখতে দেখতে মশালের আলো কাছে আসে। শেষে স্থির হয়ে এসে দাঁড়ায় নায়েব রামেশ্বরকাকার বাড়ির সামনে। আমরা জানলার মধ্যে দিয়ে গোলগোল বিস্ময়ভরা চোখে দেখছি, কি ঘটে এরপর।

হ্যাঁগো বুড়ো দাদ. তোমার বাবা ডাকাতদের দেখে ভয় পেল না?

—শোন না ক্ষুদে নাতি কি হল এরপর। নায়েবকাকার বাড়ির দরজার মুখে বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুখু ডাকাত বলে উঠল,—একি হুজুর, আপনি এখানে? আপনাকে তো নুটিশ পাঠাইনি। হুজুর, পথটা ছাড়ুন, আমার কাজটা সেরে আমি ফিরে যাই।

—তা হয় না সুখু। আজকের এ লুঠ করতে পারবে না তুমি।

—হুজুর, সে কি হয়? সুখু একবার এত্তেলা দিয়ে ফিরিয়ে নেয় না।

—কিন্তু আজ লুঠ হলে নায়েবের মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে সুখু।

—আমারও যে বড় টাকার দরকার হুজুর। এখান থেকে মোটা লাভ হবে, তাইতো এখানে আসা।

—না, এখান থেকে কিছুই পাবে না সুখু। ফিরে যাও বলছি।

—হুজুর, মিথ্যে ধমকাচ্ছেন আমায়। সুখু খালি হাতে ফিরে যেতে জানে না। আচ্ছা হুজুর, আপনি এর মধ্যে কেন? সুখুতো কোনোদিন আপনার খাজনা লুঠ করেনি, আপনার খাজাঞ্চীখানাতে হানা দেয়নি, তবে?

—কিন্তু নায়েব তো আমারই প্রজা। প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের কাজ। নায়েবের মেয়ে, আমার মেয়ে। তাই তার সর্বনাশ হতে দিতে পারি না।

—দেখুন হুজুর, পথ ছাড়ুন। মিথ্যে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

—আমাকে না সরিয়ে তো ভিতরে যেতে পারছ না সুখু।

—অহেতুক আপনাকে আঘাত করব কেন হুজুর। ডাকাত হতে পারি, তবুও যে আমাদেরও একটা নিয়ম আছে, ধম্ম আছে।

—সুখু, জমিদার হিসাবে আমারও তো একটা ধর্ম আছে, একটা নিয়ম আছে। প্রজাকে যদি জমিদার না বাঁচায় তবে কে বাঁচাবে বল?

—তাইতো হুজুর, বড় বিপদে ফেললেন। শুনেছি বটে আপনার সাহস খুব, আপনি প্রজাদের ভালওবাসেন। তা বলে—কি করবে এখন ভাবতে থাকে সুখু ডাকাত।

—সর্দার ফালতু সময় নষ্ট করছ কেন। জমিদারের মাথায় এক ডাণ্ডা বসিয়ে ভিতরে যাই। লুটের কাজে দেরি ভাল নয়।

—চো-ও-প!——ভয়ংকর গর্জে উঠে সুখু সর্দার। সুখুর সাকরেদরা চুপ করে যায়।

—দেখ সুখু, তোমারও যেমন নিয়ম আছে, আমারও তেমনি নিয়ম আছে। এক কাজ করা যাক তাতে দুজনেরই ইজ্জত থাকবে, দুজনেরই কানুন ঠিক থাকবে।

—বেশ, বলুন হুজুর। ইজ্জত আর কানুন ঠিক থাকলে আপনার কথা ভাবতে পারি।—বাবার মুখোমুখি লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর সুখু ডাকাত। মালকোচা মারা ধুতি। খালি গা। কুচকুচে কালো শরীর। ঝাঁকড়া চুল। ভাঁটার মত গোল রক্তরাঙা চোখ। দূর থেকে দেখেতো আমার শরীর হিম। বাবা কিন্তু অকুতোভয়, স্থির।

—শোন সুখু, তুমি আর আমি লাঠির লড়াই করি। যদি তুমি জেত, বাধা দেব না, তুমি লুট করতে চাও, যা করতে চাও, করবে। আমার লাঠিয়ালরা বাধা দেবে না। আর যদি তুমি হার, ফিরে যাবে খালি হাতে, কিচ্ছু ক্ষতি না করে। বল রাজি?

সুখু কিছুক্ষণ ভাবে। বলে—ঠিক আছে হুজুর। আপনি মরদের মত বাজী ধরেছেন, এতে রাজি।

সুখু এরপরে চেঁচিয়ে উঠে, নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলে,—সরে দাঁড়া সব। জমিদারের সঙ্গে লাঠির বাজী। এর মধ্যে কেউ টুঁ-ফাঁ করবি না, লাঠি-সড়কি তুলবি না, তাইতে যার যাই হোক। হুঁশিয়ার।

এরপরই পলকের মধ্যে বাবা গায়ের বেনিয়ন খুলে রুখু লাঠিয়ালের হাতে দিলেন। মিহি কোঁচানো ধুতিটাকে মালকোচা মেরে নিলেন। তারপর রুখু লাঠিয়ালের তেল চুকচুকে লাঠিটাকে হাতে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে এসে দাঁড়ালেন সুখু ডাকাতের সামনে।

—ওমা! ডাকতের সঙ্গে সত্যি লড়াই করতে গেল তোমার বাবা!—কাঁদোকাঁদো মুখ

পপাই-এর।—কি হবে বুড়ো দাদু ?

—শোনতো বেটা সব। সুখুও লাঠি উচিয়ে চেঁচিয়ে বলল,—সাবধান হুজুর। লাঠি যদি মাথায় বসে দোষ নেবেন না। বাজী আপনিই ধরেছেন।

শুরু হোল লাঠির খেলা। একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠছে সুখুর লাঠি, তাকে আটকাচ্ছেন বাবা। অন্যবার বাবার লাঠির আঘাত প্রতিহত করছে সুখু। এতজোরে দুজনের লাঠি ঘুরছে যে দেখাই যাচ্ছে না লাঠি। শুধু দুই লাঠির আঘাতে স্ফুলিঙ্গ উঠছে সেটাই দেখছি।

মনে মনে ভগবানকে ডাকছি। হে ভগবান, বাবাকে মেরে ফেল না। বাবা যেন সুখুর লাঠির ঘায়ে মরে না যায়। সুখুর মত ভয়ঙ্কর ডাকাত লেঠেলের সঙ্গে লড়াই তো চাট্টিখানি কথা না।

হঠাৎ ভেসে উঠে ভয়ঙ্কর গর্জন বাবার। তারপর দেখি শূন্যে লাফিয়ে উঠলেন বাবা। আকাশে ঘোরালেন লাঠি তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন,—সামাল সুখু।

ভয়ঙ্কর সেই শব্দের সঙ্গে দেখি ডাকাতের লাঠিটা ছিটকে গড়িয়ে গেল দূরে। সুখুকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লেন মাটিতে বাবা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন চকিতে।

বাবার দুই পায়ের মাঝখানে পড়ে সুখু ডাকাত। বাবার লাঠি সুখুর বুকের উপর।

—সুখু—হেসে বলেন বাবা।

—জিৎ আপনারই হুজুর। বেঁচে গেল নায়েব আপনারই জন্য।—ম্লান হাসে সুখু ডাকাত।

বাবা সরে দাঁড়ান। মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায় সুখু।—হুজুর, আপনার মত এমন পাকা লেঠেলের কাছে হেরেও সুখ।—বসে পড়ে বাবার পায়ের কাছে নত হয়ে সুখু ডাকাত। তারপর ফিরে যায় সুখু।

শুধু যাবার সময় বলে যায়,—হুজুর, কখনও যদি আপনার দরকার হয়, আপদ-বিপদ হয়, আপনার এই সুখুকে ডাকবেন। সুখু আপনার মত এমন দরাজ দিলের মানুষের জন্য জান কবুল করবে।—ধূলোর ঝড় উড়িয়ে, পঞ্চাশজন সাকরেদ ডাকাতকে নিয়ে খালি হাতেই ফিরে যায় সুখু। পরাজয়ের পরেও হাসি সুখু ডাকাতের মুখে।

সুখী হাসি ঝিল্লি-পপাই—আমাদেরও মুখে।
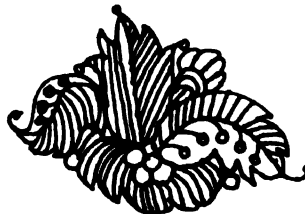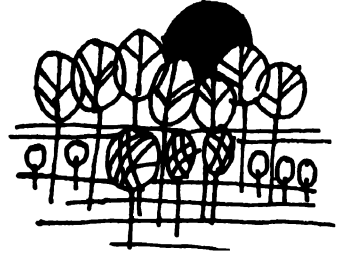
ভাইবোন

আলাউদ্দিন আল আজাদ

আশ্চর্য লাগে, এমনও একটা রাত নেমে এল ! আজ পঁচিশে মার্চ, উনিশ শ একাত্তর।

এসব কি ঘটছে ? কালোবিড়ালটা, হ্যাঁ সেই যে বস্তির কালোবিড়ালটা, সিঁড়ি মাড়িয়ে তর তর করে নেমে যায়, বিপরীত আলো থেকে দেয়ালে পড়ে বিশাল একটা ছায়া। দেয়ালঘড়িটা একটানা চলেছে টক্‌টক্‌ টক্‌টক্‌।

এবং হাতঘড়িটা ? তাও—টিক্‌টিক্‌ টিক্‌টিক্‌, একটুও থামছে না। টিক্‌টিক্‌ টিক্‌টিক্‌। কাট্‌ছে সময়। কাট্‌ছে, কাট্‌ছে।

টররর টররর, এবার কিছু দূরে অস্ত্রের আওয়াজে মুহূর্তে গলাগলি হয়ে পরস্পর মিশে থাকে ওরা দুইজন। ফেলে না নিঃশ্বাস। এখন অস্ত্রের শব্দ দূরে,কিন্তু কাছেও থাকতে পারে হায়েনার দল। বিশেষত, এইখানে যারা এসেছিল। থপ্‌থপ্‌ বুটের ধ্বনি কিছুক্ষণ আগেও শোনা গেছে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের কাছে, সিঁড়িতে বারান্দায় এবং মাঝে মাঝে, খটাখট কড়ানাড়া।

ওমা, কালো বিড়ালটা মিউমিউ করছে কেন—ঐতো, আসছে এদিকে। লেজ দুলিয়ে সেও পেয়েছে ভয়। লুকিয়ে ছিল কোথায় যেন এতক্ষণ। আরো কাছে এসে পড়ে যদি ? গলা টেপা উচিত। ওর সশব্দ বিচরণ সন্ধান দিতে পারে যদি কেউ এখনো ঘাপটি মেরে থেকে থাকে শিকারের আশায়।

একগাদা কাপড় জড়িয়ে বইয়ের শেলফের পিছনে পড়ে আছে ভাইবোন। ঘোমটার মত আড়াল না দুইজোড়া নির্ঘুম চোখ। বুঝি শ্বাস রোধ হয়ে আসছে, মাথাটা একটু তুলতেই ভাইয়ার মুখ চেপে ধরে শরমিন। প্রায় নিঃশব্দে বলল, 'চুপ্‌—'

এই ফ্ল্যাট বাড়ির পেছনেই রাস্তা। একটা গাড়ি চলে গেল। সর্‌সর্‌ শব্দে। নিশ্চয় মিলিটারী জিপ।

ওর কানখাড়া, ঢিব্‌ঢিব্‌ করছে হৃৎপিণ্ড।

বলল, উৎপল শরমিনের কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে, আমাদের পালাবার পথ দেখা দরকার আরেকজন আসতে পারে।'

'কিন্তু—।' শরমিন বলল উৎপলের কানে, 'কয়েকটা যদি এখনো পাহারায় থেকে থাকে? আমাদের ধরে ফেলবে।'

কিছু অসম্ভব নয়। উৎপল চিন্তিতভাবে বলল, 'যাদের বার করেছিল কাতারবন্দী করে মেরে ফেলেছে। কয়েকজন যে গর্ত খুঁড়েছে, তারাও বাদ যায়নি।'

'বাবা-মার লাশ কোথায়?

'বোধ হয়, বারান্দার কাছেই।'

'আবার তো ওরা আসতে পারে লাশের জন্য?

'হ্যাঁ, এই বিপদ।' উৎপল মেঝেতে ভর দিয়ে বলল, 'আমি উঠি?'

'না, না।' ওকে চেপে ধরল শরমিন, প্রশ্ন করল, 'ক'টা বাজে এখন?'

হাতঘড়ির রেডিয়াম-কাঁটা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছিল, ওর চোখের সামনে ধরে বলল, সাড়ে তিনটার মত।'

কি ভাবল শরমিন। তারপর বলল, 'রাত থাকতে বেরুনো ঠিক হবে না ভাইয়া। ভোর হয়ে যাক্‌।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো। ভোর হয়ে যাক্‌।'

উৎপল কান পেতে দূরের শব্দ শুনল, তারপর বলল, 'আমরা উঠতে পারি এখন। একটা কাজ করতে হবে। আমরা দুজনেই লুঙি পরবো। কিন্তু তোর চুল নিয়েই বিপদ। কাঁচি তো আছে, কেটে দিই?'

'না—।' বড় সখের ছাট, গাল ফুলিয়ে বলল শরমিন, 'আমি চুল ফেলবো না।'

'বুঝলাম তো।' উৎপল বলল, 'কিন্তু ওরা যদি বুঝতে পারে তুই একটা মেয়ে—'

শরমিন বলল,'না। ববচুল তো? ওগুলো ভিতরে ভিতরে ঠেসে দিয়ে বাবার জিন্নাহ টুপিটা পরে নেবো।'

'বেশ, সেই ভালো!' বলে উৎপল উপর থেকে কাপড়চোপড় কিছু ঠেলে ফেলল, এবং আর কিছু কাঁধে নিয়ে উঠে বসল। পাশে শরমিন। দুইজন চুপচাপ বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ এক সময় গলা জড়িয়ে ওরা কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অঝোর অশ্রু, বাধ মানে না। দুই ঘন্টা আগেও ছিলেন সবাই। কে জানত এমন। প্রফেসরদের পাড়ায় ঢুকে বেপরোয়া আক্রমণ চালাবে ভাবতে পারেনি কেউ। ওদিকে বেদম গোলাগুলী এবং আগুন চলছে, দুটি জিপ এসে থামল গেটের কাছে। নামল ওরা। পালাবার পথ ছিল না। পাকবাহিনী এসে বুটের লাথি মারল দরোজায় ধমাধম্‌।

কেবলমাত্র কাপুরুষের পক্ষেই তা সহ্য করা সম্ভব। বাবা জ্ঞানী শিক্ষক, এবং কাপুরুষ ছিলেন না।

মা ছুটে গেলেন, তিন বছরের শিশু উজ্জ্বলকে কোলে নিয়ে। এলেমজির একটি ব্রাশ। নিমেষে সব ঠাণ্ডা।

ভাগ্যিস, ওরা ঘরে ঢুকল না। চলে গেল। হয়তো পাশের দালানে, আরো মানুষ মারার জন্য।

'কাঁদিস্‌নে মিনি।' চোখজোড়া না মুছেই বলল উৎপল, 'এখন কান্নার সময় নয়।'

'আমাদের কি হবে ভাইয়া? আমরা কি বাঁচতে পারবো?' শরমিন কাঁদতে কাঁদতে বলল ইয়ের গলা ছেড়ে দিয়ে।

'চেষ্টা তো করতে হবে।' হঠাৎ কঠিন, আগুনের শিখার মত দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। সটান বলল, 'আর কোন কথা নয়। চট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে নে। দুজনের ব্যাগ হবে একটাই।'

অদ্ভুত সবই, গাছে গাছে নীড়ে নীড়ে ডানাঝাড়া দিয়ে পাখি ডাকলো না। তবু শুকতারা জ্বলছে দপ্‌দপ্‌ করে, পাতার ঝোপড়া নড়িয়ে নড়িয়ে রাত শেষের হাওয়াও বইছে।

ওরা তৈরি। জানালার পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে শেষবারের মত দেখে নিল বাইরেটা, ঠা মাথায় আরো একবার ভাবল।
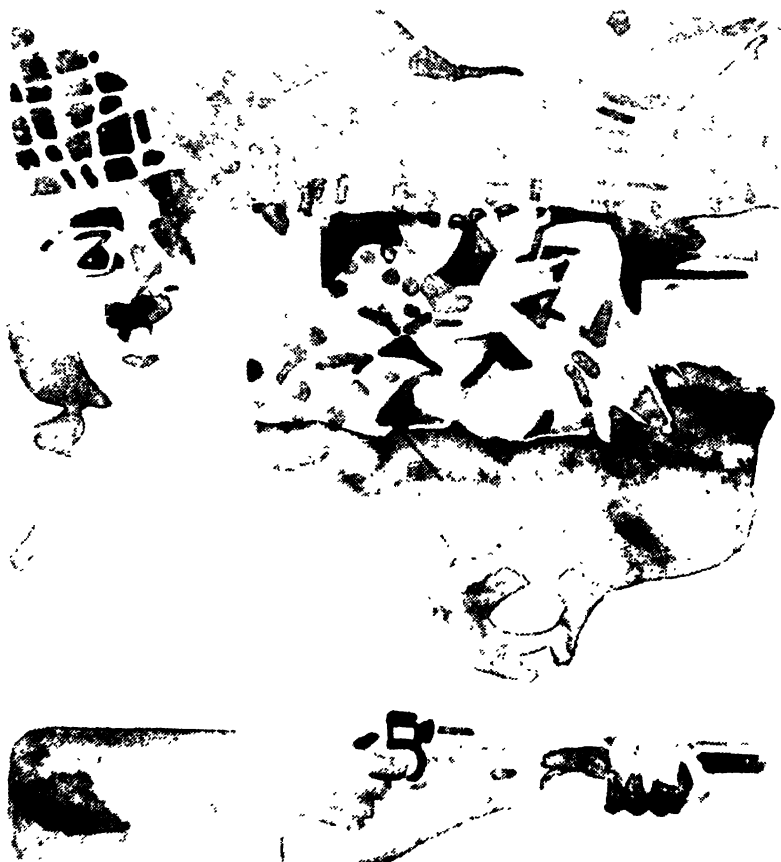
আবছা আঁধার। বড় বড় গাছগুলো কাঁপছে, নড়ছে। কেউ নেই কোথাও, ঘাসের চত্বরে, হয়, পড়ে আছে শাদা পোশাকে পোশাকে কয়েকটি মৃতদেহ।

'আমি বলেছিলাম আমার কথা শুনলো না।' জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে অস্পষ্ট স্বরে, 'দেশের বাড়িতে চলে গেলে কি হতো! হিলিরা গেছে, মিতারা গেছে। কিন্তু এক কথা. তাঁর গণিত। গণিত ঠিকই আছে! ভুল হবে না হিসেব! এই কি ছিল তাঁর হিসেব গুলিখেয়ে মরা? আমাদের দিকেও একবার তাকালেন না। কি যে হয়ে গেল—'

'আজ বিকেলে আলোচনা ভেঙে গেলে আমিওতো, জোর করেছিলাম।' পানি ঝরছে

বলল উৎপল, 'বাবা আমাকে ধমক দিলেন। বললেন, পালাতে চাস্ তুই পালিয়ে যা। এত বইপুস্তক রেখে আমি কোথায় যাবো ? তাছাড়া অত ভড়কাবার কি আছে। মীমাংসা হবেই একটা কিছু।'

এই তো মীমাংসা।

'ওদেরকে দাফন করতে পারবো না, এই এখন আবার বড় দঃখ।'

'চল না একটু দেখে আসি ?'

'না থাক্। এখন বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না।'

মায়ের হাতের আংটিটা আনতে পারতাম।'

উৎপল শান্তভাবে বলল, 'বাবার উপহার। ওটা তাঁর হাতেই থাক্।'

চোখজোড়া মুছতে মুছতে শরমিন বলল, নিয়ে আসতে পারতাম উজ্জ্বলকে। সূর্যমুখীর কাছে, ছোট একটা গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দেওয়া কঠিন হতো না।'

উৎপল বলল, 'মায়ের ছেলে মায়ের কোলের কাছেই থাক্ না।'

'কি যে ভুল করেছি আমরা।' শরমিন আপন মনে বলতে থাকে, 'গোলাগুলী যখন সুরু হলো তখনো যদি আমরা সরে পড়তাম।'

'বেশী ভাবিসনে মিনি। কত মানুষ মেরেছে ওরা, তার ঠিক নেই।' উৎপল একজন জ্ঞানীর ভঙ্গিতে বলল, 'ভালই হলো, বাঙালির ব্যক্তিগত শোক কিছু রইলো না।'

দুজনে চুপ হয়ে গেল। বাইরে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ চক্ষুস্থির। একটা জিপ্ এলো, থামলো গেটের কিছু দূরে, প্রায় নিঃশব্দে। সশস্ত্র সৈন্যের একটা দল। ভিতরে ঢুকলো। এদিকে আসছে এগিয়ে।

আ-হ্, শ্বাসরোধ হয়ে এল—একি দুঃস্বপ্ন না যন্ত্রণা ? আস্তে আস্তে চোখ খোলে; চেতনা যেন অনেক কষ্টে, গড়িয়ে গড়িয়ে জাগলো। লাশ, লাশ। রক্তে ভেজা তাজা লাশ। গল্‌গল্ রক্ত ঝরছে এখনো। অগুণতি লাশের ভেতরে চাপা পড়েছে উৎপল। এখানে ওখানে কিছু মাটি; সে অনেক চেষ্টায় মোড় ফিরল, এবং একটি ফাঁকে নাকমুখ বাড়িয়ে দেয় শ্বাস নেয়ার জন্য এবং কান খোলা রেখে সাবধানে লাশ ঠেলে ঠেলে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করে।

একে একে ভাসছে সব ছবি এবং অনুভব করলো, যদিও শরীর রক্তাক্ত কোথাও গুলী লাগেনি; এরপরেও যখন বেঁচে আছে, হয়তো আর সহজে মরবে না। কিন্তু হুঁশিয়ার থাকা প্রয়োজন; বেয়নেট উঁচিয়ে চত্বরে ঢোকবার পর সৈন্যরা দৌড়ে এসেছিল।

ওরা ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন কোয়ার্টারে এবং ওদের বাসার দিকেও এল তিনজন।

এবারে এক নয়, দুজায়গায় ওরা লুকালো। শরীরটা কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে শুয়ে পড়ল কাপড় চোপড়ের নিচে।

উৎপল নিজে মিশে থাকে কিচেনের দরজার আড়ালে। কালো বিড়ালটা মিউমিউ করতে করতে বাইরে চলে গেল।

ঠকঠক করে কাঁপছিল ঠ্যাং, কিন্তু সে শুনতে পেল একজন বলছে, 'জ্বালাদো, সবকুছ্ জ্বালাদো!'

শরমিন ? শরমিন তো শেলফের পিছনে ? আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। সে দৌড়ে গেল এবং ওরা কিছু বার করবার আগেই একধারে রাখা জিলটা তুলে নিয়ে মেলে ধরে একজনের চোখের সামনে।

সে বলল, 'ইয়ে কোরআন হ্যায়, পাক কোরআন।'

'পাকড়াও শালাকো।'

'শালা ইস্টুডেন, গাদ্দার।'

উৎপল জোর দিয়ে বলল, 'নেই খান সাহাব—হাম ইস্টুডেন নেহি হ্যায়। প্রফেসর সাহাব কো নকর্।'

পেট্রল ছড়িয়ে দিয়েছিল শেলফের ওপর, কিন্তু আগুন লাগাবার সময় পেল না। ওরা পাকড়াও হয়ে বাইরে দেখলো একদল সৈন্য দাঁড়িয়ে মৃতের স্তূপের কাছে এবং আশপাশ নানা জায়গা থেকে লাশ বয়ে আনছে লোকজন, যাদের কেউ-কেউ চেনা—চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। বুঝল, একবার তো হয়ে গেছে, এ আরেকবার।

দূরে ছিটেফোঁটা গুলীর শব্দ। আগুনের শিখা নেই, কিন্তু ধোঁয়ায় আসমান ছেয়ে গেছে।

শেষ দুইজন একটি লাশ বয়ে নিয়ে এলে ওরা সবাইকে লাইন করে দাঁড়াতে বলল। এক দো তিন চার পাঁচ ছে সাত আট ন।

সেও দাঁড়াল দুজনের পরে তিনজনের আগে। এক্ষুণি এলেমজির ব্রাশ ফায়ার করবে, নিশ্চিত মৃত্যু।

তবু শেষ বুদ্ধি খাটাবে সে, ভাবলো মনে মনে। লুটিয়ে পড়বে ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে।

একজন হাউমাউ করে উঠে জড়িয়ে ধরে লাইট মেশিনগান উঁচানো সৈন্যের পা; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্রের গর্জন টররর টর্রর। এরপর সব ধোঁয়া, অন্ধকার।

আসছে, ঘাসের ওপরে কনুইয়ের চাপ দিয়ে একটু একটু এগুচ্ছে উৎপল। যখনই সন্দেহ, মাটির কাছ থেকেই আড়দৃষ্টিতে তাকায় কিঞ্চিৎ কখনো বা পড়ে থাকে কিছুক্ষণ মৃতের মতো। গায়ে রক্তাক্ত গেঞ্জি, লুঙিটা খসে পড়েছে।

হামাগুড়ি দিতে দিতে সিঁড়ির কাছে আসতেই দোরের আড়াল থেকে ছুটে এল শরমিন। ওকে তুলে ধরলো এবং বলল, কেউ নেই এখন—

'জল্‌দি চল্। এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বো আমরা।' তুড়িদৌড়ে ওরা এক ঘরের ভিতরে।

বাথরুমে ঢুকে ঝট্‌পট্ শাওয়ার ছেড়ে দেয় উৎপল, রক্তমাখা দেহে বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না তাই। টাওয়ালে গা গতর মুছে আবার একটা লুঙি পরল। তখন শরমিন অপেক্ষা করছে। একটাকে ঘরের কোন থেকে একটা হলে তুলে দিল। পূব আকাশে সূর্য উঠছে নিশ্চয়ই। চারদিকটা, ক্রমে ফরসা। ফ্ল্যাটের দরজা জানালা সব খোলা রেখে কিছুক্ষণের মধ্যেই, দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে ফুটপাথে গিয়ে পড়ল ওরা দুইজন। দ্রুত পেরিয়ে গেল বড় রাস্তা। ছোট্ট গলির মুখে গিয়ে ওঠে। সেখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মৃগী রোগীর মত কাঁপতে থাকে উৎপল এবং কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমাকে একটু ধর্ মিনি। দেখ্‌তো, আমি কি বেঁচে আছি?'

'হ্যাঁ বেঁচে আছ তো।' শরমিন ওর হাতটা শক্ত করে ধরলো, তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবে এটা আমাদের দ্বিতীয় জীবন।'

হাতঘড়িটা ওরা ছিনিয়ে নিয়েছিল, ভুল করে উৎপল কব্জি দেখে ঘড়ি দেখার মতো। তারপর একটু ব্যথা-ব্যথা লাগতে বুকের বাঁ-পাশে হাত রাখল। হ্যাঁ, হৃৎপিণ্ডটা এখনো চলছে, ঘড়ির মতোই টিব্‌টিব্। ছোটবোন শরমিন, ওর বড় চিকন বুদ্ধি। সে স্থানকাল ভুললো না। সে হাত বাড়িয়ে কাছ ঘেঁষতে আচমকা যেন সম্বিৎ পায়, তখন দুজনে জলদি এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে সামনের দিকে।

ফাটল

মুর্তজা বশীর

মাথার পেছনে ডান হাত রেখে, চিৎ হয়ে শুয়েছিল পিন্টু।

ঘুম তার ভেঙ্গেছিল ছোট বোন রাবেয়ার বাঁশীর মত সরু গলার আওয়াজ শুনে। রোজ ভোরে এমনি বাঁশীর সুর তুলে কোরান পড়ে তার বোন। মাঝে মাঝে তার বিরক্তিও ধরে। সকালে, কানের কাছে কোনরকম শব্দ সে বরদাস্ত করতে পারে না। শীতের আমেজ এখনো লেপের ভেতর থেকে পালিয়ে যায়নি, বরং এক উষ্ণতা এখনো ঘিরে। সারা শরীরে উইয়ের ঢিপির মত বাসা বেঁধেছে।

রাবেয়া বসেছিল দোর গোড়ায়। বারান্দায় রোদ এক চিলতে পড়েছে। সেখানে ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে দুলে দুলে পড়ছিল রাবেয়া। সবদিনের মত ভোরের রোদ পালটালির ছাদ বেয়ে এখানে এসে জমে থাকে। সদর রাস্তা থেকে কিছু ভেতরের দিকে বাসা। দুপাশে উঁচু দোতলা, তার মাঝে এই একতলায় রোদ আসতে বেলা বেশ হয়ে যায়।

তা নাহলে আরো সকালে তাকে কোরান নিয়ে বসতে হয়। আব্বা ফযরের নামাজ পড়েই পাটিতে বসে অপেক্ষা করেন তার জন্য। সে এলে তাকে কোরানের সূরা পড়ান, ভুলচুক সংশোধন করে দেন।

কপালের ভুরু পর্যন্ত ঘোমটা টেনে রাবেয়া পড়েছিল। এই শীতে মাথায় কাপড় তেমন খারাপ লাগেনা তার, তবে গরমে বেশ অস্বস্তি মনে হলেও উপায় থাকেনা। শরীফ সাহেব কিছুতেই তাকে ফ্রক পরা দেখতে পারেন না। বারো পেরিয়ে তেরোতে পা দিয়েছে, অমনি তিনি মেয়েকে শাড়ি পরতে বলেছেন। নইলে, চেঁচামেচির শেষ নেই। মুসলমান ঘরের মেয়ে শাড়ি ছাড়া কেমন বেআব্রু লাগে, নিজের চোখে কেমন লজ্জা এসে ভিড় করে।

রাবেয়াকে হঠাৎ পড়ার মাঝে থামতে দেখে তিনি প্রশ্ন করেন, কি হলোরে থামলি যে? চোখ বুজে রাবেয়ার মিহি সুরের আয়াত শুনছিলেন তিনি, হঠাৎ চোখ মেললেন।

আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে হুট করে জবাব দিতে পারল না রাবেয়া। শরীফ সাহেব ঝুঁকে রাবেয়ার ডান হাতের তর্জনী লক্ষ্য করে বললেন, পড়। ইন্নাল্লাহা বি কুল্লি শাইয়ি আলিমু। আইন জবর লাম যের .....

ঠিক এমনি করে তিনি ইস্কুলে ইতিহাস পড়ান। ছাত্রদের সন তারিখ দিয়ে মুখস্থ করান সেকেন্দার শাহ্, তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ, সব.।

হাই পাওয়ারের পুরু লেন্সের চশমা নাকের ডগা থেকে সরিয়ে ফেললেও নিষ্প্রভ চোখ দিয়ে গড়গড় করে বলতে পারেন কোন লাইনের পর কি, কোন ঘটনার পর কোন ঘটনা। প্রথম যৌবনে তিনি সখ করে ইতিহাসের শিক্ষক হয়েছিলেন। মনে ছিল অফুরন্ত আশা, ছেলেদের ইতিহাস পড়াবেন নিজের দেশকে ভালভাবে ভালবাসতে শেখাবেন, দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের মহান কাহিনী শুনিয়ে ছেলেদের দেশপ্রেম জাগাবেন। আগে হৃদয়ে পেতেন উষ্ণতা। তারপর সেই উদ্দামতা এক সময় কখন যে হারিয়ে গেছে টেরই পাননি। এখন সবকিছু মনে হয় অর্থহীন, বিবর্ণ মৃতদেহ। আপসোস হয় তাঁর এই বার্ধক্যের দোরগোড়ায় এসে নিজের এমন নির্বুদ্ধিতার জন্য। এখন মনে হয় সবকিছু ভুল করেছেন, জীবনে আগাগোড়াই তাঁর মিথ্যে দিয়ে ভরা। অতীতের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে তিনি অতীতেই রয়ে গেছেন, ভবিষৎও অতীত হয়ে গেছে।

আব্বার জন্য তাই মায়া হয় পিন্টুর। ছোটবেলায় যে আব্বাকে সে দেখেছিল, এখন এই কৈশোরে তাঁকে মনে হয় অন্য কেউ। সেই প্রাণস্ফূর্তি শুকিয়ে গেছে, তার চিহ্ন কোথাও নেই। আব্বাকে দেখলে তার মনে হয় একটা শুকনো নদীর মত। দিক পাল্টিয়ে যে নদী চলে গেছে শুধু রেখেছে তার বালির খাদ। তা না হলে আব্বা রাবেয়াকে আরো পড়াতেন, এবং তাকেও ছবি আঁকার ইস্কুলে ভর্তি করতেন।

রাবেয়ার বড় ইচ্ছে ছিল ডাক্তারী পড়ার।

অবশ্য এরও এক কারণ ছিল। পাশের বাড়ীর সেই যে কালো মত পাতলা মেয়েটা হেনা, যার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব ছিল, ও মারা যাওয়াতে রাবেয়া ঠিক করল ডাক্তারী পড়ার। কতটুকু তখন রাবেয়া, এই এগারো বারো হবে। একরকম বিনি চিকিৎসায় মরে গেল হেনা। দুটাকা ভিজিটের ডাক্তার একমাস ধরে চিকিৎসা করেও কিছু করতে পারেনি। পাঁচ টাকা ভিজিটের ডাক্তার সপ্তাহে তিনবার এসে, এক রাশ ফলমূল দুধ মাখন দিলে হয়ত বাঁচত !

কিন্তু তা হয়নি।

কেরাণী বাপের চোখের সামনে মেয়েটা শুকিয়ে মরে গেল। রাবেয়া কেঁদেছিল বান্ধবীর মৃত্যুতে। পিন্টু তাকে কিছুতেই থামাতে পারেনি।

ডুকরে ডুকরে কেঁদে বুক ব্যথা করে ফেলেছিল সে। একসময় যখন বুকের ব্যথায় আর কাঁদতে পারলনা চোখ তুলে দেখল ভাইকে। বলল, ভাইয়া এমনি করে মরে গেল কেন সে ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি পিন্টু। শুধু চোখের কোণে অশ্রু এসে জমে উঠছিল। সেদিকে তাকিয়ে হয়ত জবাব খুঁজে পেয়েছিল রাবেয়া। তাই মাথায় কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে বলেছিল, গরীব বলে ভাল ডাক্তার আনতে পারেনি, না ভাইয়া ?

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জবাব রাবেয়া নিজেই দিল, আমি ডাক্তার হবো। দেখো ভাইয়া, আমি ডাক্তারী পড়বো।

শুনে হেসেছিল পিন্টু, দূর তা কি তুই পারবি ? মুরগীর জবাই দেখলে কেমন ভয় পাস তুই। ডাক্তারী অবশ্য আর পড়া হয়নি তার। তার পরের বছরে এইটে ওঠার পর আব্বা নাম দিলেন। চাকরীর সময় ফুরানতে আর দেরী নেই। মেয়েকে পড়ানো যেন পানিতে টাকা মনে হলো শরীফ সাহেবের। বিয়ে হলে চলে যাবে, তাকে পড়িয়ে কি লাভ ? বরং পিন্টু, ওকে পড়ালে আবার পয়সা ঘরে আসবে। ছেলে তাঁর চাকরী করে টাকা আনবে। যে তিনি খরচ করবেন তা পাই পয়সায় ফেরৎ আসবে ঘরে।

রাবেয়া অবশ্য খুব কেঁদেছিল। হেনা মারা যাওয়াতে যেমন করে কেঁদেছিল তেমনি। কিন্তু গর কান্নাকে কিছুতেই আমল দেননি তিনি। বরং ধমক দিয়েছেন, শাসিয়েছেন।

কান্না কিসের শুনি ? পড়ে তুই জজ ব্যারিস্টার হবি ?

ডাক্তার হবো।

ছাই হবি।

মেয়ের সেই অপলক চাহনী কিছুতেই সহ্য করতে পারেননি তিনি। সেই বোবা চাহনীতেও যেন ভাষা ফুটে রয়েছে। সে ভাষায় জ্বালা ধরে মনে। নিজের অক্ষমতায় সে জ্বালা আরো তীব্রতর হয়ে উঠে। মেয়ের সামনে থেকে পালিয়ে তবে যেন শান্তি পান।

সেই রাবেয়াকে অবশ্য তিনি নিজেই কোরান পড়া শেখালেন। যাতে কোরানের সুমধুর বাণীতে সব গ্লানি আপসোস ভরাট হয়ে যায়। মেয়েটার গলায় মাধুর্য আছে, মেয়ে না হলে তাকে মৌলানা করতেন।

পিন্টু কিন্তু আব্বাকে সেজন্য ক্ষমা করতে আজও পারেনি। তার মনে হয়েছে এ অবিচার। বোন তার ছাত্রী ভালই ছিল, ক্লাশে ফাস্ট সেকেণ্ড হতো। তার এই পরিণাম দেখে বুক বারবার কেঁপে উঠল। শেষে কি তারও এই অবস্থা হবে?

ম্যাট্রিক পাশ করার পর সে আব্বাকে আভাষে ইঙ্গিতে জানিয়েছে ছবি আঁকা সে শিখবে; কিন্তু সেকথা তিনি কানে নেননি।

শরীরটাকে ধনুকের মত বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গল পিন্টু। বিছানার ময়লা চাদরে উবু হয়ে শুয়ে আধভেজান দরোজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল।

উঠোনের একধারে, কলপারের পাশ ঘেঁষে ওঠা নারকেল গাছের পাতায় রোদের রেখা দুটো শালিক। একটা বুঝি মা, তাই অন্যটা তার খয়েরী রঙের ডানা মৃদু কাঁপিয়ে হা করছিল বারবার। চিকন সরু পাতার ফাঁক গলিয়ে রোদের আদর শালিকটার বুকে পিঠে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় খয়েরী রঙের ওপর সোনালী জরির কাজ। পিন্টুর দেখতে ভাল লাগছিল সেই পালকগুলোর ওপর উজ্জ্বল ছটা। কেমন মসৃণ আর মোলায়েম ও জায়গাগুলো। রীতিমত নিজের সত্তা দিয়ে অনুভব করা যায়।

চোখভরে চেয়ে তবুও তৃপ্তি মেলেনা। কিন্তু এমনি করেই বা কতক্ষণ শুয়ে থাকবে। আব্বা ডেকেছিলেন ভোরে নামাজ পড়তে, ইচ্ছে করে জবাব দেয়নি। উঠতে কেমন আলসেমি লেগেছে। এখন উঠতে বড্ড ভয় লাগল। দরোজা দিয়ে কলপারে যাবে তারও উপায় নেই। রাবেয়াকে নিয়ে আব্বা তার বসে।

দোরের চৌকাঠে বাঁ পা রেখেছে শরীফ সাহেব তাকালেন। হাতের তসবীটা মাথার কাছে রেখে জিগগেস করলেন, তাহলে কি ঠিক করলে?

চুপ করে রইল পিন্টু। কিছুক্ষণ পর ইতস্তত করে জবাব দিল, বলেছি'ত।

কি? ঘন আধপাকা ভুরুর নিচে, চশমার নিকেলের গোল ফ্রেমের পুরুকাচের ভেতর চোখ জোড়া কুঁচকে থাকে। মিনিট দুয়েক গুম ধরে থাকার পর বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়লেন তিনি, ছবি আঁকবেন না কচু করবেন। ছবি এঁকে কি হবে?

শরীফ সাহেব বুঝে উঠতে পারলেন না ছবি এঁকে লাভ কি। ছোটবেলায় পিন্টু যখন কাগজে কিংবা দেয়ালে ছবি আঁকতো ভালই লাগত তাঁর। মনে মনে ভাবতেন প্রতিভা আছে তাঁর ছেলের। তা না হলে নিজের থেকে এমন সুন্দর করে ছবি আঁকতে সে পারত না। আনন্দে তাঁর বুক ভরে উঠত। নিজের সহকর্মীদের বলতেন ছেলের কথা, বলতে গর্বে তাঁর মন উঁচু হয়ে যেত। সবাইকে বলতেন ম্যাট্রিকের পর তাকে আর্ট ইস্কুলে পড়াবেন। রং কাগজ এনে দিয়েছিলেন ছবি আঁকার জন্য। মাঝে মাঝে তার কাজ নিজে যেচে দেখেছেন। স্ত্রীকেও ডেকে দেখিয়েছেন। দেখিয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন।

কিন্তু, আজ তাঁর মনে হয় তিনি ফের ভুল করেছেন। নিজেও ভুল করেছিলেন, পিন্টুর জীবনও ভুলে ভরে দিয়েছেন। ছবি আঁকবে যাদের ঘরে বাড়তি পয়সা রয়েছে তাদের ছেলেরা। সামান্য কটা টাকা সারা মাস ঘাম ঝরিয়ে মুখে ফেনা তুলে যা উপার্জন করেন তা এই খেয়ালের

উড়িয়ে দেবার কোন যুক্তি খুঁজে পাননা তিনি। এটা গরীবের ঘরে ঘোড়া রোগ। হ্যাঁ
। রোগ ছাড়া এ আবার কী।

মুহূর্ত কয়েক ইতস্তত করল পিন্টু। রাবেয়ার দিকে তাকাল। মাথা নিচু করে রাবেয়া কি যে
শোনা যায় না স্পষ্ট করে। আব্বার দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বলল, এতে এমন কি

পিন্টুর কথা শেষ করতে দিলেন না শরীফ সাহেব। চেঁচিয়ে ওঠেন, ক্ষতি কি? হ্যাঁ বলে কি!
। তুই আগে পয়দা হয়েছিস, না আমি?

বারান্দার একপাশে লোহার রড ওপরের টালির ছাদের সঙ্গে মিশেছে। সেখানে হেলান দিয়ে
। পিন্টু। আব্বার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কলপারে তাকাল।

রোদে ভরে গেছে সামনের দোতলা বাসার দেয়াল। নারকেল গাছের পাতা রোদে বালুকণার
; জ্বলছে। শালিক পাখী দুটো নেই। কলের মুখে কাপড় জড়ানো, তা বেয়ে টিপ টিপ করে
পড়ছে নিচে রাখা গত রাতের হাড়িপাতিলের ওপর। এ্যালমিনিয়ামের ঢাকনীটার ওপর
। চিন চিন শব্দ ওর মনে হলো নিজের মাথার ভেতরে যেন। অমনি করে ভেঙ্গে চৌচির
। পড়বে মগজের পানিগুলো। কত আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে অজান্তে বাসা বেঁধেছিল। তা যেন
। ছিটে ফোঁটা হয়ে ছড়িয়ে যাবে।

ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার ঝোঁক। কাঠ কয়লা কিংবা ছোট ছোট লাল ইটের টুকরো দিয়ে
। কত কি নাই আঁকতো। গাছপালা নদী মানুষ ঘরবাড়ী তার কি ছাই ঠিক আছে। নাওয়া
। খাওয়া নেই, এঁকেছে শুধু। হালকা মেঘের মত লঘু পায়ে মনের আকাশে ঘুরে বেরিয়েছে
। অজানায়। সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় পড়তে বসে আকাশের নানারঙের খেলা দেখে ভাবত
' রং ছড়াবে সেও তার কাগজে। বাবার টেবিল থেকে লাল কালো কালির দোয়াত দিয়ে
.জর খাতায় রং ভরিয়েছে।

কিন্তু কে জানত এই তার শেষ হবে, এমনি করে তার সমস্ত রংয়ের পরিণতি ঘটবে।

আব্বার নিষ্পন্দ চাহনীর সুমুখে উদ্ধতভাবে বেশীক্ষণ তাকাতে পারেনা সে। সব সাহস এক
। কর্পূরের মত উবে যায়। সমস্ত অনুভূতি, চিন্তা, কথা ভূমিকম্পের মত ওলটপালট হয়ে

চেঁচামেচি শুনে ইতিমধ্যে মা তাঁর রান্নাঘর থেকে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন।

জিগগেস করলেন, কি হয়েছে? এত সকালে ওকে বকছ কেন?

পিন্টুকে একবার দেখে স্ত্রীকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বললেন, কি আর হবে? তোমার ছেলের
াথায় ভীমরতি ধরেছে। ছবি আঁকবে, কচু করবে।

বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। তসবীটা হাতে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

উঠোন থেকে আমিনা বিবি এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। পিন্টুর কাছে এসে বললেন, ছবি
ব, হ্যাঁ বাবা একি কথা তোর?

এধরনের প্রশ্নে বিরক্ত ও রাগ হলো পিন্টুর। তাঁর এধরনের না জানার ভান মেজাজকে
বিগড়িয়ে দিল ওর। ভূরু কুঁচকে পাল্টা জিগগেস করল, বাহ্ আকাশ থেকে পড়লে যেন। আব্বা
। আমাকে আর্ট ইস্কুলে পড়াবেন?

পিন্টুর কথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলেন আমিনা বিবি। খানিকখন একেবারে চুপ মেরে

গেলেন। রাবেয়ার মিনমিনে একটানা গলার আওয়াজ হঠাৎ ভয়ে থেমে গেল। হঠাৎ ঘরে
ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন শরীফ সাহেব।

বললেন, কিরে, কি শূয়োর ?

পিন্টুর গালে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চড় মারলেন। বললেন, হারামজাদা মাথা কিনে নিয়ে
না ? বলেছিলাম 'ত বলেছিলাম।

চড় খেয়ে কাঁদল না পিন্টু। আচমকা শুধু রডের সঙ্গে মাথায় একটা আঘাত পেল। হাত দিয়
সে জায়গাটা ছুঁয়ে আব্বার দিকে তাকাল। সারা মুখ কেমন বিকৃত হয়ে গেছে তাঁর। কপালে
বলির দাগগুলো আরো খাঁজ বেঁধে গেছে। মনে হয় আরো দশ বছর যেন এরি মধ্যে বে
গেছে। অবাক হয়ে গেল পিন্টু।

শরীফ সাহেব আড়চোখে দেখলেন ছেলেকে। কি দেখছে এমন করে পিন্টু ? ইচ্ছে হলে
আরেকটা চড় মারেন তিনি। যাতে সে চাহনী ভেঙ্গে খান খান করে দিতে পারেন। কিছুতে
সইতে পারছিলেন না।

পিন্টুর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন শরীফ সাহেব।

মা ছেলের মাথায় হাত বুলালেন। বললেন, খামোকা দিলে'ত আব্বাকে চটিয়ে।

পিন্টু কথার জবাব দিল না। মাথা নিচু করে রইল।

আমিনা বিবি ফের বললেন, আমাদের ছবি আঁকতে নেই বাবা।

না নেই। কেন নেই ?

আল্লা বেজার হন। তাছাড়া বেহেশতে যায়গা হবে না।

হুঁ যতসব বাজে কথা। বেজার হন না ছাই হন।

পিন্টুর জবাব শুনে কথা খুঁজে পেলেন না তিনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মুখ
বিশ্রীভাবে হা হয়ে পানখাওয়া কালো দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

আজকালকার ছেলেদের কি ব্যারাম হয়েছে বুঝে উঠতে পারেন না তিনি। মুরুব্বী মানে
মুখে মুখে কথা কয়। নির্বাক হয়ে যান তিনি। এসব কথা বলা গুনাহ্,শোনাও সর্বনাশ। মাথা
বার কয়েক ডাইনে বাঁয়ে হেলিয়ে নিজের দুগালে গোটা তিনচার চড় মেরে বলেন, তৌবা, তৌব
তৌবা কর বাবা। এসব কথা বলতে নেই।

তিনি ভাবতেই পারেন না মুসলমান ঘরের ছেলে কি করে মানুষের ছবি আঁকবে ? অবিক
চেহারা মিলিয়ে চেহারা। এ যেন খোদার সমকক্ষ হওয়া। ভাবতেই অজানা ভয়ে শিউরি
ওঠেন তিনি। চোখজোড়া আপসেই বুঁজে আসে।

আমিনা বিবি কাঁদেন আর আঁচলে চোখ মুছেন।

বাবা তুই এত বুদ্ধিমান, তোর মুখে একি কথা ? এমন বেশরিয়তী কাফেরী কাজ করবি ? অ
তাছাড়া আল্লা না চান ওনার কিছু হয় তাহলে'ত তোকেই তোর ছোট ভাইবোনদের মানুষ করতে
হবে, বল ?

হ্যাঁ এটাই বলো এতোখন। আসল কথা এটাই। তোমরা'ত শুধু টাকা চেন, আর কি বোঝ ?

তাছাড়া চিনবে কি শুনি দিকিন ? শুধু তর্কটাই'ত শিখেছিস। মুহূর্তকয়েক চুপ করে পিন্টুকে
দেখেন। কেমন চোয়াড়ে চেহারা করে রয়েছে। তাঁরও ইচ্ছে হয় ওকে মারার। হোক না কে
ছেলে তাঁর বড় হয়েছে। মার কাছে ছেলে সবসময় ছেলেই। বড় হলেও কিছু যায় আসে না।

ধীর গলায় বলেন, টাকা না থাকলে বাবুর তেজ এতখন কোন চুলোয় যেত, তার ইয়ত্
আছে ? চাকরী কর, তবে বুঝবি কত ধানে কত চাল। বাপের ওপর খাসত, বুঝিস না।

তবুও গজগজ করল পিন্টু, রাবুর'ত বারোটা বাজিয়েছ, এখন আমি।

শুনে রাগে থ মেরে গেলেন আমিনা বিবি। নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। পিন্টুর গালে সজোরে চড় কষিয়ে দিলেন।

চিৎকার করলেন, বেয়াদব, নালায়েক। এতখন তবে দেয়ালের সাথে কথা বলছিলাম, না? এমন ছেলের সাথে কথা বলতেও জাতমান থাকে না। ঘেন্না হয়।

হ্যাঁ বেয়াদপইত'। ঘেন্নাত' হবেই। কথা না বললেও পারো। কথা আছে না, সত্যি কথা বললে বাপেও বেজার।

ঘর থেকে তাড়া খাওয়া মোষের মত ছুটে এলেন শরীফ সাহেব।

কি, কি, বললি?

পিন্টু আর দাঁড়াল না। বারান্দা থেকে নেবে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল। সদর দরোজায় চটের তালি দেয়া দোদুল্যমান পর্দার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন শরীফ সাহেব। যেন কোন শত্রুকে চ্যালেঞ্জ করছেন, শূয়োরের বাচ্চা, আর যদি এ বাড়ীতে ঢুকিস তবে ঠাং ভেঙ্গে দেব।

নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, এ আমার ছেলে না, কক্ষনো না।

আমিনা বিবি রাগে ক্ষোভে কেঁদে ফেললেন। রাবেয়া মাথা নিচু করে পাটির বুনুনীতে নখ খুঁটতে লাগল। চোখ জোড়ায় পানিতে ভেসে যায়। কোরানের অক্ষর ঝাপসা হয়ে ওঠে।

সারাটা দিন ঘুরল পিন্টু। শহরের রাস্তায়, নদীর ধারে পার্কে—সব জায়গায় ঘুরেও বিরাম পেলনা। এক অস্থিরতা তাকে চঞ্চল করে তুলল। ঘর থেকে, রাগ হয়ে যখন বেরুল তখন আব্বা আম্মার প্রতি হয়েছিল ভীষণ অভিমান। তার সব আশা যে এমনি করে বাতাসে মিলিয়ে যাবে আদৌ কল্পনা করতে পারেনি। এখন ভাবতে গেলেই সব ভাবনা কান্না হয়ে চোখের মাঝে জড়ো হতে চায়। আব্বার হঠাৎ করে মত পাল্টানো সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনা। চেষ্টা করেও কোন সুরাহা পায়না। শুধু এটুকু জানে, আব্বা তার কথার নড়চড় করবেন না। ভাবতেই বুকটা ভেঙ্গে যেতে চায়। তার চেয়ে এই ভাল, আর সে মাথা ঘামাবে না। দরকার নেই। থাক। না পড়িয়ে যদি আব্বা শান্তি পান, তবে থাক।

ঘরে যখন ফিরে এল তখন সামনের দোতলার কার্নিশে রোদ শুয়ে আছে। সূর্য ঢেকে গেছে অন্য পাশের উঁচু ছাদের আড়ালে। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রইল পিন্টু। হাতটা পেছনে টান করার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁধের কাছে ফেঁসে যাবার শব্দ পেল। একবার দেখার চেষ্টা করে ফের কাত হয়ে রইল। চোখের পাতায় যেন মাকড়সা জাল বুনেছে। ক্লান্তি জড়ো হয়ে বাসা বাঁধছে। ঘুমের ঘোরে শুনল রাবেয়া ডাকল। জবাব দিতে তার মোটেই ইচ্ছে করলনা।

রাবেয়া হাত দিয়ে মৃদু ঠেলে বলল, ভাইয়া ভাত খাবে?

না। জোরে একটা শ্বাস টেনে জবাব দিল পিন্টু।

মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল রাবেয়া। পিন্টু তার পায়ের শব্দ শুনে বলল, রাবু চা দিতে পারবি? মাথাটা ভেঙ্গে যাচ্ছে।

টিপে দেই ভাইয়া?

ঘাড় কাত করে দরোজার সুমুখে দাঁড়ান রাবেয়াকে দেখল পিন্টু। বলল, দিবি? না' থাক।

আবার পাশ ফিরে শুয়ে রইল সে।

শুয়ে শুয়ে মনে হলো পিন্টুর, ওর কপালে মাকড়সা হেঁটে বেড়াচ্ছে। চোখ মেলতেই দেখল

রাবেয়া দাঁড়িয়ে।

হাসল পিন্টু, কিরে?

চা এনেছি, খাবে না?

উঠে বসে সবে চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে নিতে শরীফ সাহেব ঘরে ঢুকলেন। আব্বাকে দেখে চমকে উঠল রাবেয়া। কাপ থেকে চা ছলকে নিজের গায়ে পড়ল। পিন্টু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে যাবে শরীফ সাহেব কান ধরলেন।

কিরে হারামজাদা খুব যে তেজ দেখিয়ে বেরিয়ে গেলি? জানি তেজ কমলেই কুকুরের মত আসতে হবে।

নিস্পন্দ চোখ জোড়া আব্বার দিকে মেলে ধরল পিন্টু। বারকয়েক ঢোক গিলে বলল, আব্বা আমি ছবি আঁকা শিখবো না।

কানটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কপাল কুঁচকে পিন্টুকে বারকয়েক নিরীক্ষণ করে বললেন, মানে?

আপনি যা বলবেন তাই পড়বো। বলতে গিয়ে গলা ভিজে এল পিন্টুর। শরীফ সাহেব চমকে উঠলেন। কেমন ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। আবার তাঁর মনে হলো জীবনে এবারও তিনি হেরে গেছেন। ফতুর হয়ে গেছেন একেবারে।

শরীফ সাহেবের কান্না বুক ঠেলে উপরে কেবলি আসতে চায়। প্রাণপণে তা তিনি দমিয়ে রাখতে গিয়ে মুখটা বিকৃত করে ফেললেন।

আব্বার মুখের দিকে নির্নিমেষ ভাবে চেয়ে থাকে পিন্টু। তারপর মাথা ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল। কি বিশ্রী ফাটল ধরছে কোণের দিকটায়। বেশ কিছু চুণসুরকী খসে গেছে তার পাশ দিয়ে। কয়েকটা বিবর্ণ ইট বেরিয়ে সেই ফাঁক দিয়ে।

শরীফ সাহেবের মুখের দিকে তাকাল পিন্টু। কিন্তু কিছুতেই আব্বার চেহারা সে দেখতে পেলনা। বারবার চেষ্টা করেও পারলনা। মনে হলো সে দেয়াল দেখছে।

সেই বিবর্ণ দেয়ালে ফাটল ধরেছে।

মাইথর

হালিমা খাতুন

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি পাঁচিলের ধারে একটা বেড়াল বসে আছে। ভাবলাম বেড়ালটা কাদের। 'ইয়েতি' নয়তো। ইয়েতি পাশের বাড়ীতে থাকে। বেশ আরামেই থাকে। কারণ, ওর বাবার ঐ একটা বেড়াল ছাড়া আর কিছু নেই। অনেক কাল আগে নাকি তাঁর একটা কুকুর ছিল। সেটা হারিয়ে যাবার পর তিনি নাকি আর কুকুর পোষেননি। একটা নাকি ময়না পাখি পুষেছিলেন, সে উড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ইয়েতিকে আনার অনেকদিন আগে।

থাকগে, সে সব কথা। তবে আমি ভাবলাম ইয়েতি যদি হয়, ওকে ডেকে ঘরে পাঠিয়ে দিই। আমি ডাকলে বোধ হয় ও আসবে। কারণ ও আমাকে চেনে। যুদ্ধের সময় ওর বাবা যখন অন্যখানে চলে যান, ও আমাদের কাছে থাকতো। ডাক দিলাম—ঃ ইয়েতি—ইয়েতি।

ডাক শুনেও নড়েনা দেখে কাছে গেলাম। ওমা, দেখি কি বেড়াল না। খানিকটা সাদা কাগজ আর অন্ধকার। ভাবলাম বেশ মজাতো! আমি এখন পড়ার টেবিল থেকে একটা সাদা কাগজ নিলাম আর আলমারী পিছন থেকে কিছুটা অন্ধকার—এদিয়ে বেড়াল হবে কিনা ভাবতে ভাবতেই একটা সুন্দর বেড়ালছানা হয়ে, মিউ মিউ করে ডাকতে লাগল।

বিড়াল ছানাটার একটা নাম রাখা দরকার। ভেবে মনে মনে নাম খুঁজতে লাগলাম। বেড়ালদের নামের খুব অভাব। সবখানে 'মিনি' নয়ত 'পুষি'। এ সব নাম আমার ভাল লাগেনা। অনেকে কুকুরের নাম রাখে 'টাইগার'। বিড়াল যদিও বাঘের মাসী। তাকে কেউ কখনও টাইগার নামে ডাকেনা। অন্য কি নাম রাখা যায়। ফুল বা পাখির নাম বিড়ালকে মানাবেনা। তা হলে কি ওকে 'হিপো' বলে ডাকবো। না 'গণ্ডার'! শেষ পর্যন্ত 'মাইথর' বলে ডাকব ঠিক করলাম। নামটা ওর পছন্দ হল কিনা দেখবার জন্য ডেকে বললাম ঃ মাইথর, মাইথর, নাম পছন্দ হয়েছে ?

মিউ মিউ করে সাড়া দিল মাইথর। কিন্তু তাকিয়ে দেখি বিড়াল নয়, সামনে একটা খরগোস দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। লাল চোখ দুটো পানিতে চিক চিক করছে। ভাবলাম মাইথরকে দেখে ভয় পেয়েছে খরগোসটা। আর ওটা বোধ হয় নীলিমদের। কারণ 'পিটার ব্যারিট' এর গল্প পড়ার পর থেকেই নীলিম আর মিতি খরগোস কিনে দেবার বায়না ধরেছিল। আমার যদিও খরগোসের

গল্প ভাল লাগে, সত্যি খরগোস ভাল লাগেনা। কারণ ওরা সব গাছ খেয়ে ফেলে আর ঘরে বন্ধ করে রাখলে ঘর নোংরা করে।

এসব ভাবছি, এমন সময় খরগোসটা বলল ঃ আপনি আমাকে 'মাইথর' বলে ডাকছেন কেন ? আমার নামতো 'পিটার'।

ঃ পিটার, তা বেশ। তুমি কি 'পামকিন ইটার' না 'ইলেকট্রিক গীটার' ?

ঃ ওসব আমি কিছুই না। আমি শুধু এক খরগোস।

ঃ তুমি যদি খরগোস হও, আমার বেড়াল কোথায় গেল ?

ঃ বেড়াল তো ছিলনা। তা যাবে কোথায় ?

ঃ বেড়াল না থাকলে, মিউ মিউ করে ডাকল যে !

ঃ মিউ মিউ করে যে কেউ ডাকতে পারে। আপনিও পারেন।

ঃ তার মানে তুমি কি বলতে চাও, আমি একটা বেড়াল ?

ঃ কখনও না। আর তা হলে আমি এখানে থাকতেই পারতাম না। ওরা যা হিংসুটে। খরগোস দেখলেই ওরা কামড়াতে আসে।

ঃ বেড়ালদের সম্পর্কে তোমার ধারণাটা খুব খারাপ।

ঃ তা হতে পারে।

ঃ বেশতো কথা শিখেছ। তা তোমাকে নিয়ে আমি কি করব ?

ঃ কিছু করতে হবেনা। দরজাটা খুলে দেন, আমি চলে যাই।

ঃ তা না হয় দিলাম, কিন্তু আমার বেড়াল ?

ঃ ঐ আসছে।

বলতে বলতে খরগোস উধাও হল খোলা দরজা দিয়ে।

একটু পরেই একটা সিগারেটের প্যাকেট চিবোতে চিবোতে ঘরে ঢুকলো কালো-সাদায় মেশানো হাওয়াই সার্ট গায়ে এক ছাগল। ভাল করে শিং গজায়নি ছাগলটার। দেখতে বেশ হরিণ হরিণ চেহারা। ছাগলদের আমি বেশ পছন্দ করি। ছোটবেলায় আমার একটা আদুরে ছাগলছানা ছিল। ওর মার অসুখের সময় আমি ওকে শিশিতে করে দুধ খাওয়াতাম। তারপর থেকে ও আমার কাছে কাছে ঘুরতো।

আমি ওকে অনেক খেলা শিখিয়েছিলাম। এমনকি মুখ দিয়ে পেন্সিল ধরে ও শ্লেটে দাগ দিতে শিখেছিল। আর একটু বড় হলে ওকে আমার অংক শেখাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা আর হয়নি, আমাকেই অংক আর ইংরেজী শেখাবার জন্য শহরে চালান করে দেওয়া হয়েছিল। অংকের শিংয়ের গুঁতো খেতে খেতে আমি আমার ছাগল ছানার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

ছাগলটা দেখি আমার কাছে ঘেঁসে এসে দাঁড়াল। তারপর সালাম করে বলল

ঃ আমাকে চিনতে পারছেন ?

ঃ চেনা চেনা ঠেকছে। ভাল করে চিনতে পারছিনা। নামটা বলতো ?

ঃ আমার নাম লম্বকর্ণ। পরশুরাম আমাকে মানুষ করেছেন। ছোটবেলায় আমার মা মারা যায়। আমাকে শিশিতে করে দুধ খাওয়াতেন পরশুরাম।

ঃ সে তো আমি।

ঃ আমি ওতো তাই বলছি।

ঃ তা আমার নাম তো পরশুরাম নয়।

ঃ তাহলে আপনার নাম কালশ্যাম।

ঃ তুমি যে কি বলছ তার মাথা মুণ্ডু নেই। আমি ওসব হতে যাব কেন? আমি তো আমি।

ঃ আমিও তাই বলছি। আপনি আপনিই। আর আমার ছোট বেলার মনিব।

ঃ তা বেশ। এখন থেকে তোমার নাম মাইথর। তোমাকে দিয়ে আমি একটা চিড়িয়াখানা শুরু করব।

ঃ আমার ইচ্ছে ছিল সার্কাসের দলে যাওয়ার। তা আপনি যখন বলেছেন, আমি চিড়িয়াখানায় চাকরী করতে পারি। তবে বাঘ, ভালুক-টালুক আনবেন না। ওরা মানে ওদের আমার বড় ভয় করে। যত পড়ালেখা শিখুকনা কেন ওরা পশুই থেকে যায়।

ঃ লেখাপড়া তুমিও বেশ শিখেছ দেখছি। তা ঐ সিগারেটের প্যাকেট খাওয়া তোমার ছাড়তে

হবে।

ঃ তা আমি ছেড়ে দিতে পারি। ওটা ছেড়ে পান ধরব।

ঃ না, তা চলবেনা।

ঃ তাহলে চীনাবাদাম খাবো।

ঃ সে মাঝে মাঝে খাবে বৈকি।

ঃ না রোজ আমার পাঁচ সের করে খোসা ছাড়ানো চীনাবাদাম লাগবে।

ঃ নিজে পাইনা চীনাবাদাম খেতে আর তোমাকে পাঁচ সের করে চীনাবাদাম আমি কোথা থেকে দেব ?

ঃ তা হলে আমি চললাম।

ঃ কোথায় চললে ?

ঃ পিকিং।

ঃ সে কোথায় ?

ঃ চীন দেশে।

ঃ কেন যাবে সেখানে ?

ঃ চীনা বাদাম খেতে।

ঃ যেতে চাইলেই যাওয়া যাবে ? পাসপোর্ট লাগবেনা ?

ঃ লাগবে। দোকান থেকে একটা কিনে নেব।

ঃ দোকান থেকে নেবে ? জিনিষটা কি জানো তুমি ?

ঃ নিশ্চয়ই জানি। ফটো লাগানো থাকে। আমি আগে ফটোর দোকানে কাজ করেছি। অনেক ফটো তুলেছি তখন। আর নেগেটিভ যা খেয়েছি তখন। খুব মজা লাগে। চিবোতে ঘুম এসে যায়। আর ঘুমোলেই নেগেটিভগুলো সব ছবি হয়ে যায়।

ঃ তা হোক। তুমি যেওনা।

ঃ আমার যে টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

ঃ কাটা টিকিট দিয়ে কেমন করে যাবে ?

ঃ যেমন করে হোক যাবই। এ দেশে থেকে কি লাভ! ঐ যে তোমার মাইথর আসছে, দেখ সামনে তাকিয়ে।

সত্যিই সামনে তাকিয়ে দেখি মাইথর মিটিমিটি হাসছে। কাঁধে তার একটা ক্যামেরা, বললাম ঃ কোথায় গিছিলি ?

ঃকোথাও না।

ঃ মানে ?

ঃ এখানেই ছিলাম।

ঃ তাহলে পিটার র‍্যাবিট লম্বকর্ণ ওসব কে ?

ঃ আমার তোলা ছবি।

ঃ তোর তোলা ছবি। আর তুই কে ?

ঃ আমি কে তাতো জানিনা।

ঃ তা হলে তুই ব্লাকশিপ। মানে কালো ভেড়া। ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ। বেড়াল, কুকুর, ছাগল কাউকে আমার দরকার নেই। তোর গায়ে উল হবে। সেই উল দিয়ে আমি কম্বল আর সোয়েটার বানিয়ে বিক্রী করব। তারপর বড়লোক হবো।

ঃ তুমি তো বড়লোক। তুমি তো আমার চেয়ে অনেক বড়।

ঃ বড়লোক কি, তা তুই জানিস ?

ঃ খুব জানি। বড়লোকরা খালি রোগা হতে চায়, কিন্তু হয়ে যায় মোটা গোলগাল ফুটবল। ওদের পেটের মধ্যেই কাপড় চোপড় রাখা যায়।

ঃ তুই বড় বেশী কথা বলছিস।

ঃ তাহলে তুমি বল বেশী কথা। আমি শুনি।

এই কথা বলে মাইথর একটা গাধা হয়ে গেল। ছবিতে ছাড়া আমি আর কোথাও গাধা দেখিনি। লোকে ওদের কেন বড় বোকা বলে, তাও জানিনা। ওরা ত শুনেছি সারাক্ষণ বোঝা বয়ে বেড়ায়। বোকামী কখন করে জানিনা। যাকগে সত্যি একটা গাধা যখন পাওয়া গেল, ওকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। ওকে আমি রমনা পার্কে নিয়ে যাব রোজ বিকেলে। ওর পিঠে চড়বার জন্য একটা টিকিট ছাপিয়ে নেব, চার আনা করে। ঢাকায় কেউতো গাধা দেখেনি। কাজেই সবাই গাধায় চড়তে চাইবে। তখন আমার অনেক টাকা হবে। অনেক টাকা হলে আমি একটা সার্কাস কোম্পানী খুলব। তানাহলে একটা ছোট ন্যাশনাল পার্ক বানাবো।

গাধারা কি খায়, দাঁড়িয়ে ঘুমায় না শুয়ে ঘুমায়। এসব কিছুই আমি জানিনা। কিন্তু এসব তো ওকে বলা যায় না।

একদিন বাজারের থলের মধ্যে আমি একটা জ্যান্ত কাঁকড়া পেয়েছিলাম। সেটাকে আমি হাত ধোয়ার বেসিনের মধ্যে পানিতে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম কাঁকড়াকে পুষবো। তখন সমস্যা হয়েছিল কাঁকড়ার খাবার নিয়ে। কাঁকড়া কি খায় তা আমি জানতাম না। অভিধানে দেখেও কিছু পেলামনা। বিশ্বকোষ খুঁজতে খুঁজতে এক দিন লেগে গেল। কাঁকড়াটা শেষকালে মরেই গেল।

কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা হেসেছিল। পরে জেনেছি, কাঁকড়া মাটি খায়।

এখন গাধাকে নিয়ে কি করা যায় ; সেটাই ভাবছিলাম। আমাকে ভাবতে দেখে গাধা বলল—

ঃ তা ভাবছেন কি ? আমি সব খাই। ভাত ডাল শাক-শব্জী সবই খাই। মিষ্টিও খাই। আখরোট, আঙ্গুর, পেস্তা, বাদাম, আপেল, আম, লেবু, কমলা, আতা, বেল, ক্যারেল, ফুলকপি, বাতাবী ....

ঃ বাপরে বাপ, থামো থামো। তোমার লিষ্ট দেখি পাগল করে দেবে। এখন বল তোমাকে রাখব কোথায় ?

ঃ কেন আপনার গ্যারাজ নেই ?

ঃ আছে, তবে পানি পড়ে।

ঃ পানি আমি খেয়ে ফেলব। সেজন্য ভাববেন না। শুধু আমার একটা ঘুমের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ঃ কি রকম ?

ঃ গান না শুনলে আমার ঘুম আসে না। তাই রোজ ঘুমাবার আগে আমাকে কিছু পপ গান শোনাতে হবে।

ঃ কে শোনাবে ?

ঃ কেন আপনি ?

ঃ আমি তোমাকে পপগান শোনাব ! জানো গানের জন্য আমাকে কত বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ঃ তাহলে তো ভাল হবে। ওরকম গান শুনলেই আমার ঘুম এসে যায়।

ঃ তোমার ঘুমতো আসবে ঠিকই, কিন্তু আমাকে যে বাসা ছেড়ে দিতে হবে।

ঃ দেবেন।

ঃ তা হলে আমি যাব কোথায় ?

ঃ কেন আমার পিঠে বসে থাকবেন। তারপর যেখানে বাড়ী খালি পাওয়া যায়, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো।

ঃ তারপর তোমার ঘুম আর আমার গানের কি হবে ?

ঃ হবে।

ঃ কি হবে ?

ঃ রেকর্ড হবে।

ঃ রেকর্ড হবে !

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কে করবে ?

ঃ গ্রামোফোন কোম্পানী।

ঃ তাহলে তো ভাল হবে।

ঃ বেশ তাহলে উঠে পড়ুন।

ঃ এখন ?

ঃ এখন।

ঃ আমার যে অনেক হোম টাস্‌ক্‌ বাকী, কাল স্কুল।

ঃ হোম টাস্ক করে কি হয় ! স্যার তো না দেখেই সই করে দেন।

ঃ কে বলেছে তোমাকে ?

ঃ আমার মা।

ঃ তোমার মা ?

ঃ হ্যাঁ আমার মাকে স্যার বলেছেন, অত খাতা দেখার সময় হয়না তার।

ঃ তাহলে কাজ দেন কেন ?

ঃ দিতে হয়, তাই দেন।

ঃ তুমি তো অনেক কিছু জানো।

ঃ আরও নাচতে জানি। ছবি আঁকতে জানি। ভলিবল খেলতে পারি। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন সব পারি।

ঃ আমি ও তো পারি। কিন্তু কারু তো খেলার সময় নেই। সবাই ব্যস্ত।

ঃ আমিও !

ঃ কিসের জন্য ব্যস্ত ?

ঃ রেডিও প্রোগ্রাম। টিভি প্রোগ্রাম। এই সব।

ঃ আমি ভেবেছিলাম অন্য কিছু। তা তোমার তো ওখানে চেনাশোনা আছে, যদি আমাকে সাথে করে নিয়ে একটু বলে দিতে তাহলে আমাকেও প্রোগ্রাম দিত ওরা। প্রোগ্রাম পেলে আমিও শিল্পী হয়ে যেতাম। তখন আর বাড়ীওয়ালারা আমাকে বের করে দিতনা বাড়ী থেকে। বরং সমীহ করে চলতো।

ঃ তোমার তো বেশ বুদ্ধি দেখছি।

ঃ বুদ্ধি তো ছিল, কেবল কাজে লাগাতে পারছিনা।

ঃ লাগালেই হয়। দেখনা আমি কেমন দুটো কান লাগিয়ে নিয়েছি।

ঃ তার মানে ?

ঃ তার মানে আমি একটা ঘোড়া। এদেশে একটু লোকের চোখে পড়ার জন্য দুটো কান লাগিয়ে নিয়েছিলাম বুদ্ধি করে। ইচ্ছে করলে, কান দুটোকে আমি ঘোড়ার কানের মত ছোট করে ফেলতে পারি। চেহারাটাও ঘোড়ার মত করতে পারি।

ঃ কর দেখি।

ঃ তা হলে এতটুকু জায়গায় হবেনা। বাইরে যেতে হবে।

'চল' বলে ওকে নিয়ে মাঠে গেলাম।

তাকিয়ে দেখি সাদা একটা ঘোড়া। এক কালে স্বাস্থ্য তার ভালই ছিল মনে হয়। এখন একেবারে হাড় জির জিরে পক্ষীরাজ।

তারপর বলল সে

ঃ দেখছো তো আমার আসল চেহারা!

ঃ তাই গাধা হয়ে থাকি। তা এখন আমার যেতে হবে।

ঃ কোথায় ?

ঃ একটা মিটিং আছে।

ঃ মিটিংয়ে কি যাবে, থাকো এখানে!

ঃ না গেলে হবেনা, আমি যে সভাপতি—

এই বলে গাধা আবার গাধা হয়ে চলে গেল। তার গায়ে তখন লম্বা হাতাওয়ালা পাঞ্জাবী জামা আর পরনে ফুল প্যান্ট। চোখে তার ইংরেজী চশমা। আস্তে আস্তে সে মিলিয়ে গেল।

'সরে দাঁড়ান' 'সরে দাঁড়ান' 'সাবধান' 'সাবধান' শব্দগুলো শুনে আমি তাড়াতাড়ি পাঁচিলের পা ঘেষে দাঁড়ালাম। ডোরাকাটা ছিটের জামা পরে ঢুকলো এক জেব্রা। একদম ছবির মত দেখতে। এত কাছে এতবড় জেব্রা কখনো দেখিনি। ভয় ভয় লাগলো একটু। কামড়ে দেয় অথবা লাথি কিংবা গুঁতো যদি দেয়। পাঁচিল বেয়ে উঠবো নাকি।

ঃ ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে চিনি।

ঃ কেমন করে ?

ঃ ইংরেজী বইয়ে জেড্ এর জায়গায় আমার ছবি আছে। তার উপরে পাতলা কাগজ রেখে আপনি যখন আমাকে এঁকেছিলেন, তখন থেকে আমি আপনাকে চিনি। তারপর একবার দেখা হয়েছিল মীরপুর চিড়িয়াখানায়।

ঃ তা বেশ এখন কোথা থেকে এলে ? কেমন করে এলে ? আর যাবেই বা কোথায় ?

ঃ এলাম অন্ধকার থেকে যাব আলোতে।

ঃ বেশ সুন্দর কথাতো। দাঁড়াও, আমার নোটবুকে লিখে নেব।

ঃ আরো অনেক সুন্দর কথা আমি জানি। সে সব লিখতে গেলে আপনার খাতা ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং মনের খাতায় লিখে নিন। সেখানে কাগজের অভাব নেই।

ঃ আরে, এটাও তো একটা সুন্দর কথা!

ঃ দেখেন না, আমার গায়ে আরো কত সুন্দর কথা লেখা আছে।

ঃ তার মানে তুমি আমাকে পড়তে বলছো ?

ঃ না পড়লে, জানবেন কেমন করে ?

ঃ টেলিভিশন দেখে জানব।

ঃ সেটা আবার কি জিনিস ?

ঃ একটা বাক্‌স। যার গায়ের ছবিতে সব দেখা যায়।

ঃ বুঝেছি। চকলেটের বাক্স। আমি দেখেছি চিড়িয়াখানায় অনেক বাচ্চারা চকলেটের বাক্স নিয়ে যেত। চকলেট ফুরিয়ে গেলে সেই বাক্সের মধ্যে তারা অনেক কিছু রাখে।

ঃ কিছু বোঝনি তুমি। টেলিভিশন মোটেই চকলেটের বাক্স নয়।

ঃ বারে, আপনিই তো বল্লেন, যে বাক্সের গায়ে ছবি থাকে, তাকেই টেলিভিশন বলে।

ঃ বলেছি তাই। কিন্তু তুমি বুঝতে পারোনি। আসলে তোমরা বনে থাকো এসব শহুরে জিনিস দেখবে কোত্থেকে ?

ঃ তা হোকগে। আপনি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন না আর আমাকে বুনো বলছেন।

ঃ না, না, তুমি বুনো হবে কেন ? তুমি কত সুন্দর সুন্দর কথা বলো। আমি বরং তোমার গায়ের কথাগুলোর একটা ছবি তুলে নেই। দেখি মাইথর কোথায়, তার কাছে তো একটা ক্যামেরা ছিল।

'মাইথর' 'মাইথর' বলে ডাক দিলাম। 'ইয়েচ্ চার' বলে মাইথর সামনে এসে দাঁড়ালো। বললাম ঃ লেখাপড়া কদ্দুর শিখেছ ?

ঃ চার, বি ·এচ ·চি পাশ করেছি।

ঃ বেশ তোমার ক্যামেরাটা কোথায় ?

ঃ ক্যামেরাটা দিয়ে কি করবেন চার ?

ঃ জেব্রার গায়ের লেখাগুলোর ছবি তুলতে হবে।

ঃ 'তুলা' হয়ে গেছে, ওয়াস করতে দিয়েছি।

ঃ ছবি আগেই কেন তুলেছ বলতো ?

ঃ আমি তো এম ·এচ ·চি পড়ব। তখন লাগবে যে।

ঃ বেশ করেছ, তোমার বেশ বুদ্ধি আছে। এখন জেব্রার একটা থাকার ব্যবস্থা কর দেখি।

ঃ ব্যবস্থা তো হয়ে গেছে, ওকে তো ওয়াস করতে দেওয়া হয়েছে।

ঃ এই মাত্র যে এখানে ছিল।

ঃ ছিল। এখন নেই।

ঃ তা কেমন করে হয়। আমি তো মীরপুর পাঠিয়ে দেব ভেবেছি। ওর ঘরের সামনে আমার নাম লেখা থাকবে তা আর হোলনা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম

ঃ মাইথর, একটা গান কর।

দেখলাম মাইথর কোথাও নেই। সামনে একটা সাদা কাগজ পড়ে আছে।

ওদিকে নীলিম গান করছে।

"মানুষও বানাইয়া
খেলছো যারে লইয়া
সে মানুষ ও কেমনে গোনাগার।"

আমি যেন শুনতে পেলাম

"বিড়াল ও বানাইয়া
খেলছো যারে লইয়া
সে বিড়াল কেমনে অন্ধকার।"

রুরুর স্বপ্নওয়ালা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকটার আসার শব্দ অনেকক্ষণ আগে থেকে পাওয়া যায়। ছড়ের টানে শব্দ ওঠে ওর ছোট্ট দুতারের বাজনাটা থেকে। মাথায় একটা ঝাঁকায় অনেক গুলো বাজনা। আর হাতে একটা। হাতেরটা দিয়ে ও সুর তোলে। ভারি মিষ্টি সুর। মিষ্টি হলে কি হবে সুরটায় একটা কান্না মেশানো থাকে। ঠিক কান্না পায় না, কিন্তু ! কষ্ট হয়।

রুরু একলা জানলার ধারে বসে থাকে। ওর বাবা মা দুজনেই কাজে বেরিয়ে যান। বাবা মারা কেন কাজে যান, কী করেন রুরু কিচ্ছু বুঝতে পারে না। বাবা বাড়িতে থাকলে কত মজা হয়। বাবা ওকে কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে গান গাইতে গাইতে দুলতে থাকেন। রুরু কাঁধের ওপরে দোলে। ওর হাতের কাছে কত কি জিনিস এসে যায়। আলমারির ওপর বনসাই করা গাছটা। হাজার রকমের হাতি, ফুলদানির ফুল সব। কিন্তু রুরু ওসব কিছুতেই হাত দেয় না। ওর তো একটু ভয়ও করে তাই বাবার চুল আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। যাতে কোনওক্রমেই ও পড়ে না যায়। আর খুব ভাল লাগে। তোমরাই বল, বাবার কাঁধে চড়তে কার না ভাল লাগে? বাবা গল্প পড়ে শোনান, গল্প বানিয়ে শোনান, কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। বাবা মানেই হইচই বাবা মানেই আনন্দ।

কিন্তু মার কথাই বোধহয় আগে বলা উচিত ছিল। মাকে দেখলেই রুরু একদম খুশি হয়ে যায়। ওর কোন দুঃখের কথা মনে পড়ে না। সারা দুপুরটা একলা থাকার কষ্ট কোথায় উধাও হয়ে যায়। তখন শুধুই খুশির হাওয়া। তোমাদের মার কথা তো রুরু জানে না, কিন্তু রুরুর মা কখনও একদিনে রুরুকে এক নামে দুবার ডাকেন না। রুরুর কত নাম রুরু, রুরাই, রুরুসোনা, সোনামনি, ধনমনি, রুরুমনি, খোকনসোনা থেকে শুরু করে হাবলু, গুবলু, টুবলু! নামের কোন সীমা সংখ্যা নেই। আর কখনও কোন কারণ নেই, মা কোলে তুলে নিয়ে অ্যাতো অ্যাতো আদর করেন। সে সময় রুরুর খুব ভাল লাগে।

কিন্তু সেসব তো শুধুই ছুটির দিনে। অন্যদিনে রুরু ভোরবেলা ইস্কুল যায়। বাবা পৌঁছে দিয়ে আসেন। ওর স্কুল যখন ছুটি হয় তখন বেরিয়ে দেখে বকুলদি দাঁড়িয়ে আছে। বকুলদি খুব সাঙ্ঘাতিক লোক। বাবাকে ছোট দেখেছে। বাবাও তাঁর বকুলপিসির মুখের চোটে কাবু হয়ে যান। আর ছোট্ট রুরু—সে কী করে বকুলদিকে সামলাবে। বাড়িতে ফিরে আসে বকুলদির সঙ্গে। বকুলদি শক্ত করে হাত ধরে থাকে। এ ছাড়াও বকুলদিকে নিয়ে একটা অসুবিধে আছে। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সারা রাস্তা বকুলদি রাজ্যের মানুষকে বকতে বকতে আসে।

বকুলদির ধারণা সবাই রুরুর পা মাড়িয়ে দিতে চায়, রুরুকে ধাক্কা দিতে চায়। সুতরাং বকুলদি সারা রাস্তা বলতে বলতে আসে—'হ্যাগা ও ভালমানুষের ছেলে, ভগবান তো দুটি চক্ষু দিয়েছেন, সেগুলি দিয়ে একটু দেখলে কোন ক্ষতিটা হয় শুনি? দেখছ একটা দুধের বাচ্ছাকে নিয়ে চলেছি। বুড়োমানুষকে না হয় নাই রেয়াত করলে, দুধের বাচ্ছাটাকে একটু বাঁচিয়ে চল। এখুনি তো বাছার আমার পা মাড়াচ্ছিলে।' রুরুর লজ্জা করে। বলে, বকুলদি, তুমি কেন অমনি করে বলছ?

ব্যস, বকুলদি বলবে, চোপ। কোন কথা বলবি না। জানিস, তোর বাবাকে আমি ইস্কুল থেকে আনতাম। তোর বাপের ঠাকুর্দা আমি তাঁকে বাবা বলতাম, তখন বেঁচে। আমায় বলে দিয়েছিলেন সাবধানে আনবি আমার নাতিকে। তুই তোর বাবার চেয়ে সেয়ানা। সে না হয় এখন পণ্ডিত হয়েছে, তবু আমাকে কিছু বলে দেখুক না?

বাড়ি এসে বকুলদি ওকে প্রথমে দুধ খেতে বাধ্য করে। একদিন সামান্য একটু দুধ একটা

বেড়ালকে খাইয়েছিল রুরু। বকুলদি জোর করে দু-গ্লাস দুধ খাইয়েছিল সেজন্য। তারপর স্নান, তারপর খাওয়া। প্রায় বেত হাতে নিয়ে বসে থাকে বকুলদি। 'খাও' ফেল না। বলি বাবা মা তো কত খরচা করে তোমার জন্যে, তার বদলে তো শরীরটা একটু ভাল করতে পার। এই প্যাকাটি শরীর আমার দেখতে ভাল লাগে না।

খাবার পর বকুলদি নিজে খায়। খায় তো ছাই। খাবার নিয়ে বসে মাত্র। তারপর বলে, দাদু ভাই, এবার ঘুমিয়ে পড়। বলে, নিজে শুয়ে পড়ে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই একদম ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়। সেই সময় রুরু গিয়ে জানলায় বসে। জানলায় বসে রুরু কত কী দেখে। পাড়ায় বোধহয় এগার বারটা কুকুর আছে। কখনও তাদের দেখা পাওয়া যায়, কখনও দেখাই যায় না। রুরু জানলা ছেড়ে বারান্দায় চলে যায়। বারান্দা থেকে অনেকটা রাস্তা দেখা যায়। বারান্দাটা লোহার নকশা কাটা জালে ঢাকা, কেউ ভেতরে আসতে পারে না, কিন্তু বাইরেটা দেখা যায়। ওখানে বসেই রুরুর সঙ্গে ওই বাজনাওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

রুরু একটা বাজনা কিনেছিল, কিন্তু তার থেকে কোনও সুর বার করতে পারছিল না। সে কথা বলতেই বাজনাওয়ালা বলল, 'দাদা, এত সহজেই কি সুর বেরোবে? তোমাকে কসরৎ করতে হবে। সুরের কান ঠিক করতে হবে। তবে তো হবে।'

রুরু একগাল হেসে ফেলল। বলল, তুমি কি পাগল? সুর কি বাঘ না ভাল্লুক না মানুষ যে তার কান থাকবে?

বাজনাওয়ালা বলল, এটা ঠিক বলছ। এ কথাটা আমার আগে মনে হয় নি। তবে কানেই তো সুর বাজে?

রুরু আবার বলল, তা তো বাজেই। তুমি যে দূর থেকে তোমার বাজনা বাজাতে বাজাতে আস তখন তো আমি ঠিক বুঝতে পারি।

এবারও বাজনাওয়ালা জব্দ। সে বলল, ঠিক কথা। আমি ভুল করেছি। কী করলে আমার মাফ হবে? রুরু বলল, বাজনা শিখিয়ে দাও। বাজনাওয়ালা তখন একটা অদ্ভুত কথা বলল। বলল, আমি বাজনা শেখাতে পারি না। তবে আমার ঝুলিতে অনেক স্বপ্ন আছে, তোমাকে স্বপ্ন দেখাতে পারি।

রুরু অবাক হয়ে গেল। বলল, তুমি স্বপ্ন দেখাতে পার? কিসের স্বপ্ন?

সে উত্তর দিল, তুমি ঠিক কর। ফুলের দেশের স্বপ্ন দেখবে, না বরফের দেশের স্বপ্ন দেখবে, না যেখানে পাহাড়ে চূড়োয় মেঘ আটকে থাকে সেখানকার স্বপ্ন দেখবে।

রুরু একটু ভেবে বলল, আমি বাবার ছোটবেলার স্বপ্ন দেখব।

বাজনাওয়ালা বলল, হবে হবে সব হবে। আজকে রাতে তুমি এই পাতাটা হাতে নিয়ে ঘুমোতে যেও। তারপরে দেখো কী হয়। রুরু সেদিন খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। আর অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই যেন ঘুমিয়ে পড়ল। এক সময় শুনতে পেল বাজনাওয়ালার সেই সুরটা ভেসে আসছে। দেখল ও একটা বিশাল জলপ্রপাতের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা মস্ত নদী হুহু করে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের ওপর থেকে মাটিতে। কী সাঙ্ঘাতিক সেই জলের তোড়। আর জল পড়ে পড়ে কত ফেনা তৈরি করছে, আর সেই জলকণার মধ্যে সূর্যরশ্মি পড়ে রামধনুতে ভরে দিয়েছে জায়গাটা। খুব শীত করছিল। হঠাৎ একজন ওর গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দিল। রুরু ফিরে দেখল সেই বাজনাওয়ালা। ওঃ মুখে কিরকম একটা হাসি। বলল, কেমন দেখছ? রুরু বলল, খুব সুন্দর। এ জায়গাটার নাম কী? এ নদীটার নাম কী? বাজনাওয়ালা বলল, নদীটার নাম নায়েগ্রা। তুমি নাম শুনেছ? রুরু বলল, মনে পড়ে না। স্বপ্নটা

শেষ হয়ে গেল। তখন সকাল হয়ে গেছে।

তারপর থেকে রুরু বসে থাকে কখন আসবে সেই বাজনাওয়ালা। কতদিন বাদে সে আসে। রুরু খুব খুশি হয়। বলে বাবাকে বলেছি আমি নায়েগ্রার কথা। বাবা বিশ্বাস করেন নি যে আমি সত্যিই দেখেছি। বাবা দেখেছেন নায়েগ্রা। খুব অবাক হয়ে গেলেন আমি এত খুঁটিনাটি খবর জানি দেখে। বাজনাওয়ালা হাসল। বলল, আজ তুমি ফুলের রাজ্যে যাবে। সেদিন সারাটা রাত ও একটা পাহাড়ের উপত্যকায় কাটাল। এত ফুল ও কখনও দেখে নি। এত প্রজাপতি ও কোনদিন দেখে নি। রুরু তার ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে দৌড়তে লাগল ফুলের বনের মধ্যে। বাজনাওয়ালা দাঁড়িয়ে রইল আর রুরুর মজা দেখতে দেখতে খুব হাসছিল। বলছিল, কী, বলেছিলাম না, এ জায়গাটা সুন্দর?

তারপর আরও কত স্বপ্ন দেখল রুরু। বাজনাওয়ালার কথা আর তার মনেই পড়ে না। মনে হয় স্বপ্নওয়ালা। ও স্বপ্ন বিলিয়ে বেড়ায়। কোথায় না নিয়ে গেল রুরুকে। সেই যে নদীটা দেখেছিল,—ছোট্ট নদী কিন্তু ভীষণ তার স্রোত। একটা বড় পাথরের চাঁইকে হেলা ভরে ঠেলে নিয়ে চলেছে সেই ছোট্ট নদীটা। একদল হাতি দাঁড়িয়ে আছে নদীর ওপারে। এপারে দাঁড়িয়ে স্বপ্নওয়ালা বলল, নদীতে জল বেশিক্ষণ থাকবে না। পাহাড়ী নদীর স্বভাবই ওইরকম।

একদিন ওরা একটা মেলায় গেল। কি বিরাট মেলা। এমন মেলা রুরু কখনও দেখেনি। কত পাঁপড় ভাজা হচ্ছে। একটা জিনিস দেখেও বুঝতেই পারল না জিনিসটা কী। স্বপ্নওয়ালা বলল, এ হল গোলাপী রেউড়ি। বিরাট বিরাট ঘূর্ণিতে চড়ছে লোকে। কত দোকান তার ঠিক ঠিকানা নেই। এক জায়গায় মেয়েরা খুব ভিড় করে আছে, সেখানে আদিবাসী গ্রাম থেকে গয়না নিয়ে এসেছে। আর-এক জায়গায় চিড়িয়াখানা আছে, কথাবলা পুতুল আছে, কী নেই? হঠাৎ রুরু দেখল এক জায়গায় একটা ছোট্ট ছেলে কাঁদছে। চোখ মুছছে মাঝে মাঝে, আবার কাঁদছে। সবাই জিজ্ঞেস করছে, তোমার নাম কী খোকা? কোথায় থাক? ছেলেটা উত্তর দিচ্ছে না। এমন সময় বকুলদি ঢুকল। বকুলদির গায়ে লালপাড় শাড়ি, এক মাথা চুল। বকুলদিকে দেখে সেই ছোট্ট ছেলেটা বলল, বকুলপিসি তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বকুলদি জোরসে সেই ছোট্ট ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, সোনা মনি, আমিও তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। রুরু ডাকল, বকুলদি! বকুলদি ওর দিকে তাকাল কিন্তু চিনতে পারল না রুরুকে।

স্বপ্নওয়ালা বলল, তোমার বাবার ছোটবেলা দেখলে। রুরু অবাক। ওই ছোট্ট ছেলেটা ওর বাবা? তাই কখনও হয়। স্বপ্নওয়ালা হাসল। রুরুর সঙ্গে স্বপ্নওয়ালার সেই শেষ দেখা। রুরু বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা, তুমি ছোটবেলায় মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলে? বাবা বললেন, কই না তো? বকুলদি ঝিমোচ্ছিল হঠাৎ টান টান হয়ে উঠল। বলল, দাদুভাই, যে কথা আমি কাউকে বলি নি, এই এতবছর বাদে তুমি তা জানলে কি করে? রুরু হেসে বলল, কেন বলব? বকুলদি যে কেন ওকে শক্ত করে ধরে রাখে ইস্কুল থেকে আসার সময় সেটা বুঝতে পারল রুরু।

যেটা বুঝতে পারে নি সেটা হল কেন স্বপ্নওয়ালা চলে গেল। এখনও দুপুরে রুরু কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে স্বপ্নওয়ালার বাজনা। শুনতে পায় না।
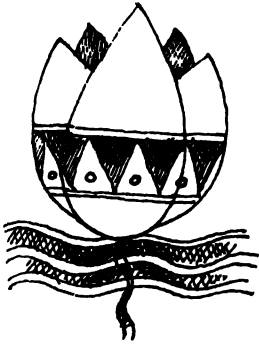
রবীন্দ্র জন্মোৎসব ও কুমড়োর চাটনি

পূর্ণেন্দু পত্রী

সেবারে সত্যি সত্যি বিন্ধ্যপর্বতের মত অটল ছিলাম প্রতিজ্ঞায়। কিন্তু ডোবালো ঐ হাঁদারাম হাবুলটা। ও এমন করে বোঝালে যে জল হয়ে গেলাম। হাবুলটা হাঁদা হোক আর যাই হোক, কথা বলে বেশ গুছিয়ে। বেশ যুক্তিটুক্তি জুড়ে দিতে পারে কথার মধ্যে। ঐ আমাকে বোঝালে—

শোন্, তুই যা ভাবছিস এবারে তা হবে না। এবার আমরা যেটা করছি সেটা অন্য জিনিস। একটা কথা তো সত্যি, নেণ্টুকাকা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলে, অন্যবারের মত করবে না। তা ছাড়া ধর, ফাংশানে বক্তৃতা দেবার জন্যেও তো নেণ্টুকাকাকে দরকার। এমন কি, ভগবান না করুন, আমরা যাঁকে সভাপতি করার কথা ভাবছি, তিনি কোন কারণে পৌঁছতে না পারলে নেণ্টুকাকাকেই তো সভাপতির চেয়ারে বসাতে হবে।

তখনও আমার পুরো রাগটা জল হয়নি। আমি বললাম—

কিন্তু গত বছরের সরস্বতী পুজোর ব্যাপারটা মনে করে দ্যাখ্। আমাদের আকাশে উঠিয়ে দিয়ে কী রকম মইটা কেড়ে নিলেন। বার বার ভাল লাগে এসব ? মুখেই শুধু বড় বড় বাৎ। আসল জিনিসের বেলায় লবডঙ্কা।

আবার হাবলু আমাকে বোঝালে— তুই যা বলছিস সব সত্যি। সব মেনে নিলাম। কিন্তু সব যদি মানি তাহলে তো এই গ্রামে বাস করে কোনদিন কিছু করা যাবে না। নেণ্টুকাকার মুখে বড় বড বুলি. চাঁদার বেলায় পাঁচ সিকে পয়সা, তার কাছে যাব না। হরি জ্যাঠার সেবারে একটা তক্তাপোষ আর রান্নার বাসন-কোঁষণ দেবার কথা ছিল, দিলেন না। তাহলে তাঁর কাছেও চাঁদা চাওয়া বারণ। মুখুজ্যে বাড়ির বিমলবাবু, আমরা তাঁর গাছের ডাব চুরি করেছি বলে ইস্কুলে গিয়ে হেডস্যারের কাছে নালিশ করেছিলেন, তাঁর কাছেও তাহলে যাওয়া চলে না। এইভাবে যদি আমরা কেবল ভাল লোক বাছতে শুরু করি তাহলে দেখবি কিস্যু হবে না। দুচারটে ভাল মানুষ যদি বা মেলে, তখন বলবি ওঁর কানে বড় পুঁজের গন্ধ, তাঁর পায়ে দাদ, অমুকবাবু তাঁর বৌকে ঠেঙায়, তমুকবাবু ঘুষখোর, তখন চাঁদার খাতায় জমার ঘরে জিরো

ছাড়া আর কি জমবে বল্ ?

হাবলুটার যুক্তি ঠিক যেন ছাক্‌নি জালের মত, ঘন ঘন গিঁট দিয়ে বোনা। পালাবার ফাঁক নেই। পরে ভেবেচিন্তে দেখলাম, হাবলু মন্দ বলে নি কথাগুলো। আমাদের এবারের চাঁদা চাইবার উদ্দেশ্যটা সত্যিই ভিন্ন। শুধু ভিন্ন বললে কম বলা হয়। আমরা প্রায় একটা রেভলিউশনারী কাণ্ড করতে চলেছি খড়গাছির মত একটা অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে। রবীন্দ্রজন্মোৎসব। তাক্ লাগিয়ে দেবো এবার সবাইকে। হৈ চৈ পড়ে যাবে আশপাশের সাত গাঁয়ে। এখানকার লোক উৎসব বলতে তো বোঝে শুধু দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো আর কার্তিক পুজো। আর ঐ চত্তির মাসের কটা দিন শিবঠাকুরের গাজনকে নিয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং ঢাকের বাদ্যি। কিন্তু ওসবের মধ্যে তো কালচারাল ব্যাপার স্যাপার নেই। এবারে সেটাতেই হাত দিয়েছি আমরা। পরীক্ষায় ফেল করি বলে সবাই আমাদের ভাবে ফ্যালনা। এবার আমরা ঐ ফ্যালনা কজন ছেলেই দেখিয়ে দেবো, বিশ্বের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, মানে চেতনার যে অভ্যুদয় চলেছে আজ পৃথিবী জুড়ে অর্থাৎ বিশ্বকবিকে হৃদয়ে বরণ করার মধ্যে দিয়ে, ক্লাবের কালচারাল সেক্রেটারী হিসেবে আমি যে স্পীচটা দেবো সেটা এখনো লেখা হয়ে ওঠে নি। তবে মেজদার ঘরের তাকে একটা ধুমসো রচনার বই আছে। তার মধ্যে 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ' নামে পাঁচ পাতার একটা প্রবন্ধ, পেজ নাম্বার ১৪২, মনে করে রেখেছি।

নেণ্টুকাকা অন্যদের মত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন না। বাড়ি আসেন শনিবার শনিবার। ঠিক হল সামনের রবিবারই যাওয়া হবে নেণ্টুকাকার কাছে।

রবিবার। তখনও মাটির রোদ গাছপালার মাথায় ওঠেনি। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি, হাবলু, সুঁটে, ঝণ্টু আর বাঁটুল। অধিক সন্নেসীতে গাজন নষ্ট হতে পারে এই ভয়ে আমাদের জাগরণী সংঘের অন্যান্য সদস্যদের ডাকা হল না। তাদের অন্য কাজে অন্য জায়গায় যেতে বলা হ'ল।

মল্লিকদের বাঁশঝাড়ের কাছটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। আমরা খানিকটা এগিয়েছি। সকলের আগে আগে যাচ্ছিল ঝণ্টু। হঠাৎ হেঁই হেঁই করে চেঁচিয়ে উঠল সে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। ঝণ্টু আমাদের আঙুল দিয়ে দেখাল, একটা ইয়া বড় সাপ আমাদের ডানদিকে শুকনো বাঁশপাতার ওপর মৃদু খিস খিস শব্দ তুলে যেন সাঁতার কাটতে কাটতে চলে যাচ্ছে। সাপটা দূরের ঝোপের আড়ালে চলে যাবার পর হাবলু হালুম করে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে।

দেখলি ? দেখলি ?

কি ? সাপ তো ?

না হে বন্ধু, সাপের কথা বলছি না। বলছি সাথ-এর কথা। ডান দিক দিয়ে সাপ গেল। দক্ষিণেতে ভূজঙ্গম। খুব শুভ লক্ষণ। নেণ্টুকাকা আজ বধ হবেই হবে।

হাবলুর উৎসাহে আমাদের গালও গোল হয়ে উঠল টেনিস বলের মত।

নেণ্টুকাকা তাঁর পুকুরপাড়ে ছাইগাদার কাছে কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগানের মধ্যে বসে খুরপী দিয়ে ঘাস তুলছিলেন। নেণ্টুকাকার খুব বাগানের সখ। ফুলের নয়, শাকসব্জীর। লাউ, কুমড়ো, বেগুন, ঢেঁড়শ, এসবের। বাড়িতে এলে সকাল সন্ধ্যে ঐ বাগানেই। নেণ্টুকাকা ঘাস তুলছিলেন আর দূরে তাঁর প্রিয় চাকর সন্নেসী মাটি কোপাচ্ছিল কোদালে। আমাদের দলবলকে দেখে এক পলকের জন্যে একটু অবাক হবার মত ভঙ্গী ফুটেছিল নেণ্টুকাকার মুখে। পরক্ষণেই সেটা ঢাকা পড়ে গেল দরাজ হাসিতে।

এস, এস। এত সকাল সকাল তোমাদের আবার কি ব্যাপার ?
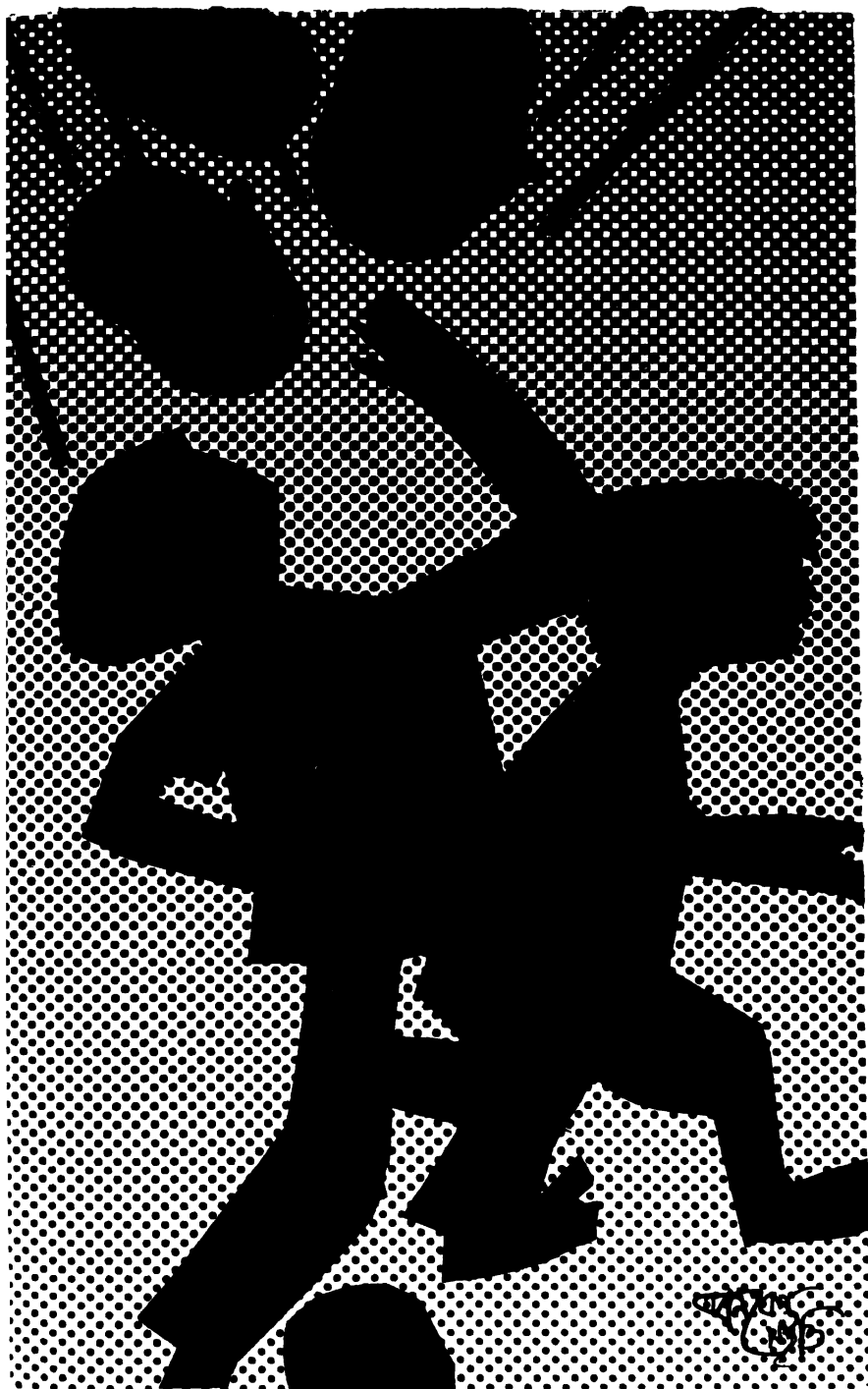
আমরা সবাই হাবলুর দিকে তাকালাম। আগে থেকে কথা হয়ে আছে, হাবলুই যা বলার বলবে। কেননা নেণ্টুকাকার বাইরেটা যেমনই আটপৌরে হোক, ভেতরটা তো বেশ মাজাঘষা। তাঁর বিদ্যেবুদ্ধির ঝুলি থেকে কখন কী বেরিয়ে পড়বে কে জানে! বিদ্বান লোকেরা সাপুড়ের চুপড়ির সাপের মত। এমনিতে ঠাণ্ডা। ফণা তুললেই সর্বনাশ। ভেবে চিন্তে তাই হাবলুকেই সামনে রাখা। হাবলু অঙ্কে আর ভূগোলে আর সংস্কৃতে ফেল করে বটে, কিন্তু বাংলা আর ইতিহাসে চৌকস। ৬০—৬২ তো বাঁধা।

হাবলু নিজের থতমত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে খচ্‌খচ্ করে নিজের মাথা খানিকটা চুলকে নিয়ে খুব বিনীত ভঙ্গীতে শুরু করলে—

নেণ্টুকাকা-আ-আ ···

বল, বল।

আমরা এবারে আপনার কাছে অনেক বড় দাবী নিয়ে এসেছি।

পায়ের কাছে এক গোছা তোলা ঘাস জমেছিল, সেগুলোকে ছুঁড়ে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে নেণ্টুকাকা বললেন—

সে তো আসবেই। তোমাদের মত যারা সবুজ, তারাই তো চিরকাল বড় বড় দাবী নিয়ে এগিয়ে আসে সকলের আগে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছো? আয়রে সবুজ, আয়রে আমার কাঁচা। পড়েছো?

হাবলু এবং তার দেখাদেখি আমরা সকলেই এমনভাবে হাসলাম, যেন পড়েছি। নেণ্টুকাকার মুখে রবীন্দ্রনাথের নামটা শোনামাত্রই আমাদের মনে যেন জগঝম্পের বাজনা বেজে উঠল। হাবলুর কথাই ঠিক। রবীন্দ্রনাথ-টাথের ব্যাপারে নেণ্টুকাকা আমাদের আগের মত বিট্রে করবেন না। হাবলু আমাদের দিকে এমন একটা মিষ্টি হাসি ছুঁড়ে দিলে, যেন তার আধখানা যুদ্ধ জেতা হয়ে গেছে অলরেডি।

হাবলুর গলায় আবার সেই আগের মত বিনীত স্বর—

নেণ্টুকাকা, আপনি যা বললেন মানে যাঁর নাম বললেন, আমরা এবার আমাদের গ্রামে সেই জগৎ-বরেণ্য কবিরই জন্মোৎসব পালন করতে উদ্যোগী হয়েছি। আপনাকে মানে আমরা আপনার কাছে এসেছি অনেকগুলো দাবী নিয়ে।

তোমরা রবীন্দ্রজন্মোৎসব করছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ, বাঃ। তোমাদের বেশ উন্নতি হয়েছে তো। রাত জেগে ইয়ার্কি মেরে, ধেই ধেই করে নেচে, আর কতকগুলো ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে আজকালকার ছেলেরা ঐ যে কেবল দুর্গাপুজো আর সরস্বতী পুজো নিয়ে মাতামাতি করে, ওটা দেখলেই আমার রাগ হয়। এই যে রবীন্দ্রজন্মোৎসব করছো, খুব ভাল জিনিস। এতে নিজেদেরও অনেক কিছু শেখা হয়, লোককেও শেখানো যায়। খুব ভাল। তা আমাকে, আমার কাছে তোমাদের কি দাবী আছে, বলে ফেল।

হাবলুর হাত আবার মাথায় উঠে এসে চুল ঘাঁটতে লাগল। আমাদের হাতের মুঠোও শক্ত হয়ে উঠল উত্তেজনায়।

হাবলু বললে—আমাদের একটা হাতের লেখা কাগজ আছে। আমরা তার রবীন্দ্রসংখ্যা বার করবো। তার জন্যে আপনাকে একটা লেখা দিতে হবে। আর জন্মোৎসবের দিন আমরা ঠিক করেছি, আপনিই হবেন আমাদের প্রধান অতিথি। আর ···

এইবার চাঁদার কথা। আসল ব্যাপার। বলে ফ্যাল্ হাবলু, সাহস করে বলে ফ্যাল্। দশ টাকা। দেরী করিস নে। হাবলুর ঠোঁটের ডগার কাছে আটকে আছে আমাদের জোড়া জোড়া চোখ।

আর, কাঁকনকে যদি উদ্বোধন সঙ্গীতটা গাইবার পারমিশন দেন…তাহলে খুব ভাল হয়—কেননা আমাদের এখানে তো আর কোন গান জানা মেয়ে নেই…

কাঁকন নেণ্টুকাকার বড় মেয়ে। বছর এগার বারো বয়েস। বাড়িতে মাষ্টার এসে গান শিখিয়ে যায়। হাবলুর বুদ্ধি আছে বটে। এটা আমাদের কারো মাথায় আগে আসেনি। বুঝেছি, নেণ্টুকাকার মনটাকে ও ভিজিয়ে ফেলতে চাইছে। তা বেশ,কিন্তু চাঁদার কথাটা বল্ এবার!

হাবলু থামতেই নেণ্টুকাকা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সন্নেসীর দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন—

সন্নেসী, একটু তামাক সেজে নিয়ে আয় তো, বাবা।

সন্নেসী মাটি কোপানো থামিয়ে চলে গেল। নেণ্টুকাকা পিঠটাকে সোজা করে নিয়ে আবার অন্য একটা জায়গায় গিয়ে বসলেন, ঘাস তুলতে। বসতে বসতেই প্রশ্ন করলেন—তোমাদের প্রোগ্রামটা কি সেদিন?

প্রোগ্রাম? প্রোগ্রাম একটা মোটামুটি ভেবেছি। এই, প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত। তারপর সভাপতি আর প্রধান অতিথি বরণ, তারপর দুটো একটা গান আর বক্তৃতা। ঝণ্টু আর বাঁটুল ওরা দুজনে মিলে একটা কমিক করবে। এর পর ক্লাবের সেক্রেটারী কিছু বলবে। তারপর নাটক।

কি নাটক?

কবিগুরুর মুকুট।

সন্নেসী তামাক সেজে নিয়ে এল হুঁকোয়। নেণ্টুকাকা হুঁকোয় পর পর কয়েকটা টান দিয়ে গলগল করে কিছু ধোঁয়া উড়িয়ে আমাদের দিকে তাকালেন—

তোমাদের বেশ উৎসাহ আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ্যমবিশন নেই। যাঁর জন্মদিন পালন করছো, তাঁর লেখাটেখা একেবারেই পড়ে দেখনি মনে হচ্ছে। 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটা পড়েছো রবীন্দ্রনাথের? পড়েছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি আছে লেখা কবিতায়? 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, ভাগ করে খেতে হবে তাহাদের সাথে অন্নপান।' এই যে এত বড় একটা কথা, এটাকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী করার কোন মানেই হয় না। শুধু খানিকটা নাচ গান আর বক্তৃতা করলেই কি শ্রদ্ধা জানানো হয়ে যাবে অতবড় একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস পোয়েটকে? তোমরা যদি আমার সাজেশান শুনতে চাও তাহলে বলি।

আমরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে বলে উঠলুম—কেন শুনবো না কাকু? নিশ্চয়ই শুনবো।

নেণ্টুকাকা কি যেন বলতে যাওয়ার মুখেই থেমে গেলেন। 'মেজবাবু' বলে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল ও পাড়ার জগদীশ। নেণ্টুকাকার চাষবাস সব ঐ জগদীশই দেখাশোনা করে।

কে? জগদীশ এসে গেছো? একটু দাঁড়াও।

নেণ্টুকাকা এবার হাবলুর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—উৎসবটা শুরু হবে সকাল থেকে। সকাল বেলায় শুধু প্রভাত ফেরী। রবীন্দ্রনাথেরই একটা গান গেয়ে তোমরা গ্রামটা ঘুরলে। তারপর দুপুর বেলায় কাঙালী ভোজন। খুব বেশী আইটেম করার দরকার নেই। খিচুড়ী হবে। তার সঙ্গে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, কুমড়োর চাটনী আর যদি পারো একটু করে পাঁপর ভাজা। কত আর লোক হবে! পাঁচ-ছ'শোর বেশী তো হবে না। এমন কিছু নয়। আসলে খাওয়াটা এখানে বড় কথা নয়। ঐ যে কাঙালী ভোজন, তাতে কোন জাত বেজাতের বিচার

থাকবে না। বামুন-কায়েত, শূদ্র ভদ্র, হিন্দু মুসলমান সবাইকে একসঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে খাওয়ানোটাই হল আসল কথা। এইটেই রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা ছিল, জানতো?

হাবলু আমতা আমতা করে বললে,—ওতো অনেক টাকার ব্যাপার। আমরা অত টাকা ...

টাকা? শোনো টাকার জন্যে কখনো কোন বড় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি।

হুঁকোর আগুনটা নিভে এসেছিল। নেণ্টুকাকা জোরে কয়েকটা টান দিয়ে সেটাকে বাগানের বেড়ার গায়ে ঠেকিয়ে রেখে আবার সন্নেসীকে ডাক দিলেন। সন্নেসী মাটি কাটা থামিয়ে নেণ্টুকাকার সামনে এসে দাঁড়াল।

সন্নেসী! তোমার মাকে গিয়ে বল, ২০টা টাকা দিতে।

২০ টাকা! হাবলু চকিতে ঘুরে তাকাল আমাদের দিকে। তার মুখে দিগ্বিজয়ের হাসি। ঝণ্টুর গাল লাল হয়ে উঠেছে আনন্দে। সুঁটে পটপট করে হাতের আঙুলগুলোকে মটকে নিলে। বাঁটুল এক চক্কর ঘুরিয়ে নিলে নিজেকে। আমারও গালের হাসি গাল ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

হ্যাট্স অফ, হাবলু! তুই যাদু জানিস। নেণ্টুকাকার কাছ থেকে ২০ টাকা চাঁদা আদায়! যা কিনা শিবের বাপেরও অসাধ্যি আজ তুই তাই করলি। ১ টাকা আদায় করতে আমাদের পেটের অন্নপ্রাশনের ভাত হজম হয়ে গেছে। হাবলু, এখান থেকে বেরিয়ে তোর পায়ের ধুলো নেব, মাইরী।

তোমরা, আজকালকার ছেলেরা—সামান্য কাঙালী ভোজন করাতে ভয় পাচ্ছ? টাকার ভয়ে, তাইতো? আচ্ছা, এবার ঐ রবীন্দ্রনাথের কথাই ভেবে দ্যাখ তো। পকেট ফাঁকা, সিকি পয়সাও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই। তা সত্ত্বেও ফাঁকা মাঠের মধ্যে অতবড় একটা বিশ্বভারতী গড়ে তুললেন শান্তিনিকেতনে। টাকার জন্যে কাজটা আটকালো কি? আটকায় না। উদ্দেশ্য যদি বড়ো হয়, আটকায় না। পাঁচশো লোকের কি ধর ছশো লোকের জন্যে খিচুড়ী করতে কত খরচ? হিসেব করে বলতে পারবে এক্ষুনি?

আমরা সকলেই খানিকটা থতোমতো। পাঁচশো ছশো লোকের খিচুড়ী রাঁধতে কত চাল, কত ডাল ওসব কি আমাদের জানার কথা!

হাবলু বললে—এখুনি তো বলতে পারব না। আমরা তো আগে কোনদিন কাঙালী ভোজন করাই নি। তবে মুখুজ্যে পাড়ার বঙ্কু মেশোমশাইকে জিজ্ঞেস করলেই জেনে যাবো। ওঁর বাবার শ্রাদ্ধে কাঙালী ভোজন হয়েছিল, চার পাঁচ মাস আগে।

অঙ্কে বোধ হয় তোমরা কেউই ভাল নাও। এ বছর কত পেয়েছ অঙ্কে?

নেণ্টুকাকা একদম সোজাসুজি আমার দিকেই তাকিয়ে। আমার বুক ধক্‌ধক্ করে উঠল।

আমি! আমাকে বলছেন? আমি সত্যি সত্যি অঙ্কে খুব কাঁচা।

কত পেয়েছো, কত, নম্বরটা বল না।

আমি, আমি ১৭ পেয়েছিলাম।

তা এত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার কি আছে? অঙ্কে কম নম্বর পাওয়াটা এমন কিচ্ছু অপরাধ নয়। মন দিয়ে অঙ্ক কষলেই শেখা হয়ে যাবে। এই যে রবীন্দ্রনাথের কথাই ধর না। লেখাপড়ায় কি ভাল ছেলে ছিলেন? ছিলেন না। কতটুকুই বা পড়েছিলেন? বেশী পড়েন নি। তাহলে এত বড় হলেন কি করে? জানো? কারণটা কি? রবীন্দ্রনাথ তোমাদের মত ভেতো বাঙালী ছিলেন না। বাঙালীদের উপর হাড়ে চটা ছিলেন 'সাতকোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ তো করো নি' এই কথা কবি অনেক দুঃখ করেই লিখে গেছেন। কেন বলতো? কারণ বাঙালীরা বড্ড বাক্যবাগীশ জাত। কাজে কুঁড়ে। তোমরা রবীন্দ্রজন্মোৎসব করতে চাইছো, অথচ তোমাদের কতকগুলো সাধারণ জ্ঞান নেই। তোমরা যদি ভেবে থাকো, চাল ডাল তেল নুন

এসব জিনিষের কি দরদাম, এসব রবীন্দ্রনাথ জানতেন না, তাহলে ভুল করবে। রবীন্দ্রনাথ কবিতাও লিখতেন। আবার জমিদারিও চালাতেন। তোমার নাম কি ?

নেণ্টুকাকা প্রশ্নটা করলেন ঝণ্টুর দিকে তাকিয়ে।

আমার নাম ? ঝণ্টু।

ঝণ্টুতো ডাক নাম। ভাল নাম কি ?

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার ছেলে বলতো তুমি ?

আমার বাবা হলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওঃ, তুমি ক্ষীরোদকাকার ছেলে ? বাঃ। বাড়িতে অম্বল খাও ?

অম্বল ? অম্বল তো খাই।

কিসের অম্বল ? পেঁপের, না কুমড়োর, না ঢেঁড়শের। না কুঁচো চিংড়ীর ?

সব রকমই হয়।

বেশী হয় কোনটা ?

বেশী হয কুমড়োর।

কুমড়োর ক ত করে সের, জানো ?

আজ্ঞে না।

তাহলেই দ্যাখ কুমড়োর অম্বল রোজ খাচ্ছ, অথচ জিনিসটা বাজারে কত দামে বিক্রি হচ্ছে, খবর রাখো না। রবীন্দ্রনাথের মত অত বড় একটা বিশ্ব প্রতিভার কতটুকু খবর রাখো তোমরা বুঝতেই পারছি। তোমরা তো এখনো যোগ্যই হয়ে ওঠোনি। ...

আমাদের যে গালগুলো হাসি খুশীতে পাকা আমের মত লাল টুস টুসে হয়ে উঠেছিলো একটু আগে, চুপসে আমসত্ত্বের মত কালো হয়ে যেতে লাগলো। কুমড়োর দামটা জানিনা বলেই বোধ হয় চাঁদার করকরে কুড়িটা টাকা আর পাওয়া গেল না। কুমড়ো জিনিসটা গোল জানতাম। তার ভিতরে যে এত গণ্ডগোল জানতাম কি ছাই! তীরে এসে সব কিছু ভরাডুবি হয়ে যেতে বসেছে দেখে মনের মধ্যেটা হায় হায় করে উঠলো।

আর ঠিক সেই সময়েই হাবলু যেন থিয়েটারে পার্ট বলছে, এমনি নাটকীয় ভঙ্গীতে সজোরে বলে উঠল—নেণ্টুকাকা, ৩০৫ টাকা লাগবে।

৩০৫ টাকা ? কি করে হিসেবটা কষলে ?

আজ্ঞে, আমাদের পাড়ার দাশু হালদারের হোটেল আছে বাগনান স্টেশনে। সেখানে শুধু ডাল ভাত আর তরকারি খেতে ১২ আনা পড়ে। দাশুকাকা বলেছিলেন এই ১২ আনায় তাঁর ৪ আনা লাভ থাকে। তাহলে পার হেড ৮ আনা করেই পড়ে এক একজনের। আমরা যদি ৬০০ জন লোককে খাওয়াই খরচ পড়বে, ৩০০ টাকা। আর যে হালুইকর রাঁধবে, তাকে ৫ টাকা মজুরী দিতে হবে।

বাঃ। এই তো। দেখ, তোমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলে। হাবলু ভয় না পেয়ে চেষ্টা করল বলেই উত্তরটা পেয়ে গেল। কোন কিছুতে চট্ করে ভয় পেতে নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়'। সব সময় মনে রাখবে কথাটা। এই তো হয়ে গেল। মোটামুটি কত খরচ হবে তার একটা হিসেব তোমরা পেয়ে গেলে। এবার কাজে নেমে পড়, কথা না বলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু ....

কিন্তু কি বল ?

কাঙালী ভোজনের তো অনেক খরচা। সবাই যদি একটু বেশী বেশী করে চাঁদা না দেন ...

তা তো বটেই। এ তো আর ১টাকা ২ টাকার ব্যাপার নয়। গ্রামে তোমরা একটা ভাল জিনিস করছো। সবাইকে সাহায্য করতে হবে বৈকি। তোমরা ছেলেমানুষ, কি করে করবে নইলে!

এই সময় সন্নেসীকে দেখা গেল আসতে। দুটো দশ টাকার নোট হাতে। হাবুলকে আমি ইসারা করলাম হাতের তিনটে আঙুল দেখিয়ে। অর্থাৎ এ সময় আরেকবার কথাটা তুলে ২০ কে ৩০ করে নে।

হাবলু পকেট থেকে চাঁদার বই আর ফাউন্টেন পেনটা বের করে ফেললে।

তাহলে নেণ্টুকাকা, আপনার নামে আমরা ...

দাঁড়াও বলছি।

সন্নেসী এসে ১০ টাকার নোট দুটো নেণ্টুকাকার হাতে দিতেই, তিনি জগদীশকে ডাকলেন। জগদীশ কঞ্চির বেড়ার উপর দিয়ে তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

আজ ২০ টাকা দিচ্ছি। বাকী টাকাটা সামনের সপ্তাহে এসে নিয়ে যেও, কেমন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে জগদীশ ১০ টাকার নোট দুটো নিয়ে চলে গেল। নেণ্টুকাকা আমাদের দিকে ঘুরে তাকালেন।

হ্যাঁ, কি বলছিলে ?

আজ্ঞে, চাঁদা ...

চাঁদা ? চাঁদা আমি দেবো না। বুঝলে ? ১ টাকা ২ টাকা চাঁদা দিলে অত বড় ব্যাপার তোমরা সামলাতে পারবে না। তোমরা বরং একটা কাজ কর।

হাবলুর গলার স্বর তখন ১৮ দিনের জ্বরের রুগীর মত চিনচিনে। মুখখানাও লম্বা হয়ে ঝুলে এসেছে নীচের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের অপমান নিজে সামলাবার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। তবুও গলায় আগের মতই বিনীত ভঙ্গী ফুটিয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন।

কাঙালী ভোজনের জন্যে কুমড়োর চাটনীটা তো হচ্ছে। তোমাদের আর বাজার থেকে কুমড়ো কেনার দরকার নেই। যে কটা কুমড়ো লাগবে, আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেও। আর ম্যাগাজীনের জন্যে যে লেখাটা চেয়েছ, সেটা সামনের রবিবারে এসে নিয়ে যেও। কবি রবীন্দ্রনাথকে সবাই চেনে। কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই চেনে না। ঐ বিষয়েই তোমাদের একটা বড় প্রবন্ধ লিখে দেবো।

বাইরে বেরিয়ে এসে আমার ইচ্ছে করছিল, বশিষ্ঠ কিংবা বিশ্বামিত্র মুনির মত অভিশাপ দিয়ে হাবলুকে শেষ করে দি। ওর জন্যেই সকালটা নষ্ট। আর গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

ঝণ্টু বললে—আমি জানতাম।

কি ?

হাবলু তখন বললে না যে, ডান দিকে সাপ পড়া খুব ভাল। আসলে তো সাপটা ছিল বাঁদিকে। বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে গিছল।

তখনই বললি না কেন রে রাসকেল ? দিনটা মাটি হোত না।

আহা, তখন বললে তো তোরা আর যেতিস না। আর না গেলে নেণ্টুকাকার রবীন্দ্র-প্রতিভা কি জানা হোত কোনদিন ?

সে বছর আর রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করিনি আমরা কুমড়োর চাটনীর ভয়ে।
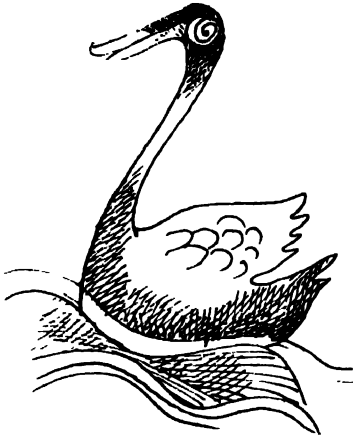
তিমুর গল্প

কাইয়ুম চৌধুরী

তিমু হাঁফিয়ে উঠল শেষ পর্যন্ত।

কি যে ছাই বৃষ্টি নেমেছে। পড়ছে তো পড়ছেই। কালো ঘোড়ার মত লাফাতে লাফাতে মেঘগুলো ছুটে যাচ্ছে। মেঘের যেন শেষ নেই। মনে হচ্ছে একপাল বুনো ঘোড়া চারদিক আঁধার করে বনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তিমু একটা ছবি দেখেছিল। বুনো ঘোড়ার ওপর। নানান রঙের ঘোড়া। কালো, মিশকালো, ছাই, গাঢ় ছাই, সাদা, ফিকে সাদা সব রং এর ঘোড়া নাচতে নাচতে যাচ্ছে। ঘাড় বেঁকিয়ে, সোজা হয়ে, কেশর দুলিয়ে, বাতাসে সিল্কের রুমালের মত পতাকা উড়িয়ে মিষ্টি সুরের মত ভেসে যাচ্ছে। আজকে মেঘের ঘনঘটা দেখে তিমুর আবার ছবিটার কথা মনে হলো। ঠিক সে রকম। অবাক হয়ে ছবি দেখেছিল। দেখেছিল কি করে বুনো ঘোড়াকে পোষ মানাতে হয়। তিন চারটে পোষা ঘোড়াকে বুনোদের দলে ভিড়িয়ে দিয়ে বুনোদেরকে দলে টানার চেষ্টা।

অবাক হয়ে দেখেছিল তিমু। মোটেও বিরক্ত হয়নি।

আজকের বুনো মেঘগুলোকে তো বশ মানাবার উপায় নেই।

কোত্থেকে যে এত মেঘ উড়ে আসছে। কি চেপে বিষ্টি। কলোনীর দালানগুলো সাদাটে হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে ঘসা কাগজের চশমা চোখে এঁটে দেখছি। মাঝে মাঝে বাতাস যেন কাগজটাকে ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে।

শিমু আপার কাছে মেলা ঘসা কাগজ আছে। শিমু আপা ঘসা কাগজ দিয়ে কাপড়ে নক্‌শা তোলে। একটু কাগজ চেয়েছিল বলে একদিন শিমু আপার কি রাগ! ঘর থেকে প্রায় বার করে দিয়েছিল।

তিমু বাবাকে নালিশ করেছিল।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বাবা বলেছিলেন, বকে দেব আপাকে। তুমি কিস্‌সু নিয়োনা আপার কাছ থেকে। আমি এনে দেব।

শিমু আপার দেয়া চকলেট সে নেয়নি।

বাদামঅলা চকলেট। যা তিমু খুব পছন্দ করে।

ঃ কেন নিবিনে ?

শিমু আপা অবাক হয়ে যায়।

ঃ কেন ? আমিতো ছবির বই-এর ঘোড়াটা বাংলা খাতার মলাটে তুলতে চেয়েছিলাম।

ঃ না খেলি। বয়ে গেল।

শিমু আপা চকলেট চিবুতে চিবুতে চলে যায়।

অবাক হয়ে গেল তিমু।

এতক্ষণ খেয়াল করেনি। বিষ্টিটা বাইরে কমে এসেছে। কলোনীর একটা জানালাও খোলা নেই। এরকমটি তিমু কোনদিন দেখেনি। অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে বিরাট বিরাট দৈত্যগুলো চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে। হাত, পা ছড়িয়ে। দালানগুলোর অবশ্যি হাত, পা নেই। তবুও তিমু যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

জানালা থেকে একটু সরে বসলো তিমু। বসেই অবাক হলো। হঠাৎ সে জানালা থেকে সরে এলো কেন ? হেসে ফেললো তিমু।

দৈত্যগুলোর যদি ঘুম ভেঙ্গে যায় মানুষ দেখে ? রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। ঘুমপুরীতে জেগে আছে একমাত্র সেইই। যেন জিয়নকাঠি তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তারপরে রাজকন্যে।

না, ভুল হলো। প্রথম ঘুমন্ত রাজকন্যে। তারপর জিয়নকাঠি।

আবার হাসলো তিমু।

রাজকনো কেমন দেখতে ? ভাবতে পারেনা তিমু। যতবারই চেষ্টা করে রাজকন্যে সোনার পালঙ্কে গভীর ঘুমে অচেতন ততোবারই তিমু দেখে শিমু আপা ঘুমিয়ে।

ছবিতে দেখা রাজকন্যের চেহারাটা মনে নেই। সেটাও নাকি আঁকা ছিল, বাবা বলেছিলেন। আঁকা ছবি মানুষের মতো হাঁটে, কথা কয়। তিমুর খুব ভালো লাগছিল। যেমনটি বই পড়ে মনে হয় ঠিক তেমনটি।

ছবিটি যে বানিয়েছিল বাবা তার নামও বলেছিলেন। ওয়াল্ট ডিজ্‌নী। সে যেখানে ছবি বানায় সে জায়গাটার নাম ডিজ্‌নীল্যাণ্ড। হ্যাঁ, তিমুর এখনো মনে আছে। শিমু আপা বোধহয় ভুলে গেছে। তিমু ভোলেনি।

আঁকা লোকগুলোকে কেন জানি খুব আদর করতে ইচ্ছে করছিলো তিমুর। এরা এতো ভালো, এতো সুন্দর। এরা সত্যি হয়না কেন ?

তিমু ভেবে পায়না।

মানুষের আঁকা মানুষ যদি এতো ভালো এতো সুন্দর হতে পারে, সতিকারেরটা হয়না কেন ?

কলোনীর বিদঘুটে দালানগুলো ছাই আর দেখতে ইচ্ছে করেনা। অথচ দেখ মানুষের আঁকা শহর কত্তো সুন্দর। নিজের শহর মানুষ ওভাবে বানাতে পারেনা ?

বাবাকে একথা তিমু শুধিয়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, ও ছবি যারা এঁকেছে তাদের দেশটা আঁকা ছবির চাইতেও সুন্দর।

ঃ আমাদেরটা নয় কেন বাবা ?

ঃ আমাদের দেশ সুন্দর নয় ? বাবা হেসে ফেলেছিলেন। পরে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, আর একটু বড়ো হও তখন বুঝবে।

তিমু ভাবে। হাতে এঁকে ওরা মিথ্যের দেশ বানালো। আহা! সেই মিথ্যেগুলোও যদি আমাদের এখানে সত্যি হতো। কি মজাই না হতো!

আচ্ছা কাণ্ড।

সেতো জানালা খুলে বিষ্টি দেখছে, মেঘ দেখছে। কলোনীর জানালাগুলো বন্ধ কেন এরকম ? ওরা মেঘ দেখেনা ? বিষ্টি ?

ঃ এই তিমু খাবি ? কাঁঠাল বিচি ?

শিমু আপা কোঁচড় থেকে বার করে দেয় একমুঠো। শিমু আপাটা বিষ্টি হলেই কাঁঠাল বিচি খাবে, টুক্ টুক্ করে। ভাজা কাঁঠাল বিচি পট্‌পট্ করে ভাঙবে আর খাবে।

বিষ্টি হলে আরেকজন একটা জিনিস খেতে খু-উ-ব ভালোবাসে।

শিমুকে বলে, আপা ? আজ রাতে আমরা খিচুড়ী খাবো, তাই না ?

কাঁঠাল বিচি চিবুতে চিবুতে শিমু আপা জবাব দেয়। তুই টের পেলি কি করে ?

তিমু হেসে বলে। বা—রে। বিষ্টি হলে আগে বাবাইতো, হাঁকডাক সুরু করে। কোন কথা নেই। বিষ্টি হয়েছেতো। বাবার জন্যে খিচুড়ী।

শিমু আপা হঠাৎ খিল্‌খিলয়ে হেসে ওঠে।

ঃ তোর মনে নেই তিমু ? একবার খুব জোর বিষ্টি। বাবাতো হাঁকডাক। খিচুড়ী চাই। বাজার হলো। রান্না হলো। সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। মা শুদ্ধ। খেতে বসে দেখি খট্‌খটে রোদ। ভ্যাপসা গরম। বাবার মন খারাপ।

ঃ বাবা আরেকটা জিনিস খুব পছন্দ করেন, শিমু আপা বলে, রবীন্দ্রনাথের গান। বাবা বলেন, বর্ষা দিনের গান হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান।

তিমু কাঁঠাল বিচি চিবোয়। তার লজ্জা করল বলতে—রবীন্দ্রনাথের গান সেও তো খুব পছন্দ করে। বিশেষ করে বাবার গলায় সেই গানটা—

'সঘন গহন রাত্রি
ঝরিছে শ্রাবণ ধারা—'

ঃ আমিও গান শিখব, তিমু হঠাৎ বলে।

ঃ তবেই সেরেছে ; একটা গাধাও এ তল্লাটে থাকবেনা আর।

ঃ তুমি যে থাকবেনা এ আমি হলপ করে বলতে পারি। তিমু গম্ভীর গলায় জবাব দেয়।

ঃ তবে রে। পাজী। শিমু আপা কান টেনে ধরে। কথাতো বেশ শিখেছো—বাবাতো আমাদের দুজনাকেই গান শেখাবেন বলেছিলেন।

তিমু হঠাৎ বলে,—আচ্ছা বাবাটা এখনো আসছেনা কেন ? কটা বাজেরে আপা ? আপিস ছুটি হয়নি ?

বাইরেটা আরো আঁধার হয়ে এসেছে।

অন্যদিন কিন্তু এসময় সুন্দর বিকেল। রাস্তায়, মাঠে লোকজন, চলাফেরা। কলোনীর ছেলেদের হুটোপুটি। তিমুও যায় খেলতে। চার দালানের মাঝের মাঠটায়। ওরা পাঁচ-ছ বন্ধু মিলে বল খেলে। হ্যাঁ, ফুটবল। বলটা দীপুর।

বাবাকে একবার তিমু বলেছিল বল কিনে দিতে। বল কিনতে গিয়ে তিমু শেষ পর্যন্ত কেনেনি। তার বদলে কিনেছে সুন্দর ছবির বই। প্রায়ই সে পাতা উল্টে উল্টে ছবি দেখে। একই ছবি বার বার। অনেকবার। এখন ছবিগুলো প্রায় মুখস্ত।

একটা জিনিস তিমু ভালো করেই বুঝেছে—একবারে সবকিছু ভালো করে দেখা যায়না। নজরেই আসেনা অনেক কিছু। বার বার দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হয় ছবির এ জিনিসগুলো আগে দেখিনি। এক এক সময় হঠাৎ আশ্চর্য রকম নতুন হয়ে দেখা দেয় ছবিটি। তিমু হঠাৎ লক্ষ্য করে বিষ্টি দিনে জানালার পাশে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা মেঘ দেখার মতো আনন্দ সে বই দেখেও পায়।

ছবির সে বইটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরা ছিল। একটা ছবির কথা এখনো তার মনে আছে। ছবিটা শ্যাম দেশের। পাতলা কুয়াশার মতো বিষ্টির মাঝে দু'টো ঘোড়া মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ছাই ছাই সবুজ ছবিটা, কেন যে তার ভালো লেগেছিল তিমু জানে না।

বিষ্টি অনেক কমেছে এখন। সামনের পীচের রাস্তা সন্ধ্যার মৃদু আলোয় অদ্ভুত চকচকে দেখাচ্ছে। রাস্তার পাশে সবুজ মাঠ এখন থৈ থৈ। কলোনীর দালানগুলো পানিতেই যেন ভাসছে।

তিমু দেখে সেই পানিতে ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে একটা ঘোড়া নিচু মাথা করে আস্তে আস্তে তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

সারা গা বেয়ে পানি ঝরছে। টপ্ টপ্ করে। এই অল্প আলোতেও তিমু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে একটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঘোড়াটাকে কাঁপিয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়াটা ঢুলছে চার পা এক করে। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে।

কষ্ট হল তিমুর। হঠাৎ ঘোড়াটা এখানে এলো কেন?

তিমু ঘোড়া দেখে আনন্দ পায়। সে ঘোড়াতো টগবগানো। কেশর ফুলানো। যার চামড়া মখমলের মতো মিহি।

এতো নিজের শরীরই টানতে পারে না। তাই বোধ হয় এখন এর কোন মালিক নেই। কে এখন শুধু শুধু বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে?

মালিক নেই এরকম ঘোড়ার ছবি তিমু দেখেছিল পত্রিকায়। আঁকা ছবি। সেটা কেটে তার ছবির এলবামে রেখেছে। জোছনা রাতে দুটো ঘোড়া আপন মনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। বাবাকে সে ছবিটা দেখিয়েছিল। বাবা হেসে বলেছিলেন, তোর ভালো লাগে এ সব ছবি?

যিনি এঁকেছিলেন বাবা তাঁর নামও বলেছিলেন। মনে নেই এখন। আমাদের দেশের কার যেন আঁকা। বাবা সেই সঙ্গে আরেকটা ছবি দেখিয়েছিলেন। ছবিটা ছাপা ছিল ডাকটিকেটের ওপর। কালো কালিতে আঁকা। জাপানের একজন নামকরা ছবি আঁকিয়ের। ডাকটিকেটটা বাবা তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আরো রঙীন রঙীন ছোট্ট ছোট্ট টিকেট। সব জমা করে রেখেছে তিমু।

তিমু ভাবে বড় হলে আরো ছবি দেখবে। ছবির বই কিনবে। ঘোড়ার ছবি। নানান দেশের।

একটা খালি ঠেলাগাড়ি আস্তে আস্তে বাড়ির সামনে আসে। তিমুর মনে হল ভিজে ক্লান্ত ঠেলা গাড়িটার কোথাও যাবার যেন ইচ্ছে নেই। শব্দ শুনে ঘোড়াটা চকিতে মুখ তোলে। এগুতে থাকে একপা একপা করে। তারপর মিশে যায় দূর দালানের কাল অন্ধকারে।

তিমুর হঠাৎ মনে হলো ভিজে জবুথবু ঠেলাওয়ালাটার সঙ্গে ওই বুড়ো ঘোড়াটার কো তফাৎ নেই।

ছোটমাসির মেয়েরা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা শহরে বাঘ, ভাল্লুক কিংবা গণ্ডার নেই বটে, তবে কিনা চোর ডাকাত আর ছেলেধরা সবসময় গিসগিস করছে। আমার ছোটমাসির কাছে তাই এই শহরটাও গভীর জঙ্গলের মতন। সব সময় সাবধানে থাকতে হবে।

ছোটমাসির দুই মেয়ে, রুমু আর ঝুমু। ওদের আরও দুটো বেশ ভাল-ভাল নাম আছে বটে, কিন্তু সে-দুটো বেশ শক্ত, রুমু ঝুমু নামেই সবাই চেনে। ছোটমাসি তাদের এক মিনিটের জন্যও চোখের আড়াল করেন না। নেহাত ইস্কুলের সময়টুকু ছাড়া। তাও ছোটমাসি ওদের ইস্কুলে পৌঁছে দেন, দুপুরে টিফিনের সময় যান, আবার বিকেলে যান নিয়ে আসতে। রুমু আর ঝুমু পড়ে ক্লাস এইট আর নাইনে। ওরা বেশ বড় হয়ে গেছে, নিজেরাই স্কুলে যাওয়া-আসা করতে পারে, কিন্তু তার কোনো উপায় নেই, ছোটমাসি সবসময় ওদের পাহারা দিয়ে রাখতে চান যে!

আমি একদিন বলেছিলাম, "এই তো বাড়ির কাছেই স্কুল, ওরা তো হেঁটেই চলে আসতে পারে, কত ছেলেমেয়ে আসে।"

ছোটমাসি চোখ গোল-গোল করে বললেন, "আর যদি ছেলেধরা ওদের ধরে নিয়ে যায়? ও পাশের পার্কটায় কয়েকটা বিচ্ছিরি চেহারার লোক বসে থাকে, দেখলেই আমার কী রকম যেন সন্দেহ হয়!"

আমি বললাম, "ছেলেধরা ওদের ধরবে কেন? ওরা তো ছেলে নয়!"

ছোটমাসি তখন এক ধমক দিলেন, "তুই চুপ কর। তুই কিছু বুঝিস না!"

টিফিনের সময় গিয়ে ছোটমাসি কড়া নজর রাখেন ওরা যাতে কোনোরকমে ফুচকা বা ঝালমুড়ি না খেয়ে ফেলে! রুমু-ঝুমুর ক্লাসের বন্ধুরা মনের সুখে আলুকাবলি আর ঘুগনি-চটপটি খায়, কিন্তু ওদের সেদিকে যাবারই উপায় নেই। ছোটমাসির চোখের সামনে বসে ওদের বাড়িতে তৈরি খাবার খেতে হয়।

আমি অবশ্য মাঝে-মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওদের ডালমুট, চানাচুর আর হজমি গুলি খাওয়াই। যদিও জানি, ধরা পড়ে গেলে ছোটমাসির হাতে আমাকেও বোধহয় মার খেতে হবে!

ছোটমাসির ধারণা চোরডাকাতের মতন অসুখের জীবাণুরাও সব সময় আমাদের চারপাশে ওত পেতে আছে। কখন যে তারা মুখ দিয়ে নাকদিয়ে ঢুকে পড়ে তার ঠিক নেই। সেইজন্য বাইরের কোনো জিনিস খাওয়া ওঁর মেয়েদের একদম বারণ।

একদিন আমি ছোটমাসির বাড়ির রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম। দেখি কী, সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখটা একটা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ছোটমাসি, ও কে?"

ছোটমাসি বললেন, "ও-ই তো আমাদের রান্নার ঠাকুর!"

"ওর মুখ বাঁধা কেন?"

"বাঃ মুখ বাঁধা থাকবে না? আমার রান্নাঘরে মুখ-খোলা কারুকে ঢুকতে দিই না। মনে কর, দুধ জ্বাল দিচ্ছে কিংবা ঝোল রাঁধছে, এমন সময় আপন মনে কথা বলে ফেলল! আর কথা বললেই একটু থুতু ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাহলে ওদের সেই থুতুমাখা জিনিস আমরা খাব?"

"রান্না করতে করতে আপন মনে কথা বলবে কেন?"

"যদি বলে? হঠাৎ বলে ফেলতেও তো পারে!"

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, "আমরা কথা বলার সময় তো থুতু বেরোয় না!"

ছোটমাসিও হাসতে-হাসতে বললেন, "একটু-একটু বেরোয়, চোখে দেখা যায় না! স্বাস্থ্য-বইতে লেখা আছে!"

আর একদিন দেখেছিলাম ও বাড়ির বাজার করা। সব বাড়ির লোকেরা বাজারে যায় থলি নিয়ে। আর ছোটমাসির চাকর যায় একটা বড় প্ল্যাস্টিকের বালতি নিয়ে, সেটায় আবার জল ভরা থাকে। সেই বালতিতে করে আনা হয় জ্যান্ত মাছ। ছোটমাসি তখন দাঁড়িয়ে থাকেন দোতলার বারান্দায়। চাকর বালতি থেকে মাছটা তুলে ছুঁড়ে দেয় উঠোনে। তখন মাছটা যদি দু' তিনবার লাফায় তাহলে ছোটমাসি খুশি। আর যদি বেচারা মাছটা লাফাতে না পারে অমনি ছোটমাসি বলবেন, যা, এক্ষুনি ফেরত দিয়ে আয়!

ছোটমাসিদের দুধ নেওয়া হয় বাড়ির সামনেরই একজন গোয়ালার কাছ থেকে। দুধ দোয়াবার সময় ছোটমাসি রোজ সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে একফোঁটাও জল মেশানো না হয়। এ-ব্যাপারে তিনি ঠাকুর-চাকরদেরও বিশ্বাস করেন না। শুধু তাই নয়, তিনি আর-একটা কাণ্ডও করেন। সেটা অবশ্য আমি নিজে দেখিনি, তবে শুনেছি। দুধ দোয়াবার আগে নাকি ছোটমাসি রোজ সেই গরুকে দশখানা জেলুসিল ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খাইয়ে দেন। গরুর যদি অম্বল হয়, তাহলে সেই দুধ খেয়ে ওঁর মেয়েদেরও অম্বল হবে সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

এই তো গেল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। কিন্তু কলকাতার রাস্তাঘাটে তো অনেক নোংরা থাকে, আর নিশ্বাসের সঙ্গে তার গন্ধও নাকে ঢুকে যায়। রাস্তায় বেরুলে নিশ্বাস তো নিতেই হবে! সেইজন্য ছোটমাসি মেয়েদের নাকেরও ব্যায়াম করান।

প্রত্যেক শনি-রবিবার ছোটমাসি দুই মেয়েকে নিয়ে চলে যান ঠাকুরপুকুর। সেখানে ওঁদের আর-একটা চমৎকার বাড়ি আছে। সাদারঙের তিনতলা বাড়ি, মস্তবড় বাগান, সবটাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা, একদিকের দেয়ালের পাশে একটা ছোট্ট পুকুর। এখানে থাকেন রুমু-ঝুমুর দাদু আর দিদিমা।

এখানে ছোটমাসি মেয়েদের নিয়ে আসেন টাটকা হাওয়া খাওয়াতে। এখানে ধুলোবালি নেই, কাছাকাছি কোনো কলকারখানা নেই বলে বাতাসে ধোঁয়া নেই, খুবই স্বাস্থ্যকর জায়গা।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোটমাসি রুমু-ঝুমুকে নিয়ে চলে আসেন সেই বাড়ির ছাদে। তারপর তাদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলেন, "নিশ্বাস নে! ভাল করে নিশ্বাস নে!"

ঠিক ড্রিল মাস্টারের মতন ছোটমাসি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, "নিশ্বাস নে, এবার ছাড়, ছাড়। আবার নে!"

খানিকক্ষণ এরকম করার পর ছোটমাসি বলেন "এবার হাঁ করে খানিকটা হাওয়া খেয়ে ফ্যাল! এরকম টাটকা হাওয়া তো কলকাতায় পাবি না!"

রুমু-ঝুমু মায়ের সব কথা শুনে যায় লক্ষ্মী মেয়ের মতন। ওরা বুঝে গেছে, প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই। ছোটমাসির মনটা বড্ড নরম, কেউ ওর কথায় কোনদিন প্রতিবাদ করলেই উনি অমনি কেঁদে ফেলেন!

এত সব করেও রুমু-ঝুমুর চেহারা বেশ সুন্দর হয়েছে, পড়াশুনোতেও ওরা ভাল ছোটমাসির এরকম বাড়াবাড়ি দেখে আমরা মাঝে-মাঝে হাসাহাসি করি বটে, তাতে কিন্তু ছোটমাসি চটে যান না। নিজেও হেসে ফেলে বলেন, "তবুও দ্যাখ না, এত সাবধানে থেকেও কি সবসময় ভাল জিনিস পাওয়ার উপায় আছে? সেদিন ওদের খাওয়ার জন্য খুব বেছে বেছে

ছোলা ভিজিয়ে দিলুম, তারপর ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে দেখি কী, একটা ছোলা পোকায় ফুটো করা!"

একদিন আমি ছোটমাসিদের বাড়িতে দুপুরে বেড়াতে গেছি। ছোটমাসি তখন স্নান করছিলেন। বাথরুম থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর চোখ দুটি কপালে উঠে গেছে, মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন।

আমিও ভয় পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল ?"

ছোটমাসি বললেন, "হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, আর তারপরেই যা বুকটা কাঁপতে লাগল ... "

"কী কথা ?"

"তুই জানিস, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থল ?"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এটা আবার একটা নতুন কথা নাকি ? এতে ভয় পাবারই বা কী আছে ?

আমি বললাম, "তা তে কী হয়েছে ?"

ছোটমাসি বললেন, "পৃথিবীর তিনভাগ জল এটা আগে খেয়াল করিনি! তার মানে আমার মেয়েরা তো কখনো-না-কখনো জলের ধারে যাবেই। এদিকে আমি ওদের সাঁতার শেখাইনি। ওরা ডুবে যাবে যে! কালই যদি ডুবে যায় ?"

আমি হাসতে লাগলাম।

ছোটমাসি বললেন, "ধর, ওরা লেখাপড়ায় খুব ভাল হল। তারপর বিলেত-আমেরিকায় গেল .... "

আমি বললাম, "তাতো যেতেই পারে।"

"তখন সমুদ্র পেরিয়ে যেতে হবে ... মনে কর, সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছে হঠাৎ প্লেনটা ভেঙে গেল আর ওরা সমুদ্রে গিয়ে পড়বে ... তখন যদি সাঁতার না জানে, উরিব্বাবাঃ, কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হবে!"

"বালাই ষাট, ওদের প্লেন কেন ভাঙবে! তবে যদি প্লেন ভেঙেই যায়, তখন অত উঁচু থেকে সমুদ্রে পড়লে ... "

"প্যারাসুট থাকবে তো! প্লেনে প্যারাসুট থাকে না ? প্যারাসুটে করে জলে নামবে, তারপর তো সাঁতার জানতে হবে।"

আমি কল্পনা করতে লাগলুম প্লেন থেকে প্যারাসুট নিয়ে আমাদের রুমু আর ঝুমু নামছে আটলান্টিক মহাসাগরে, তারপর জলপরীদের মতন সাঁতার কাটতে লাগল।

"যদি জাহাজে করে যায়, জাহাজও তো ফুটো হয়ে যেতে পারে ?"

"তা তো বটেই।"

"পরশু থেকে ওদের গরমের ছুটি। পরশু থেকেই আমি ওদের সাঁতার শেখাব!"

"ঠিক আছে আমিই সাঁতার শিখিয়ে দেব ওদের।"

"তুই সাঁতার শেখাবি ? কোথায় ?"

"কেন, গঙ্গায়।"

"গঙ্গায় ? সাঁতার না শিখেই কেউ গঙ্গায় নামে ? রোজ কত লোক ডুবে যায়।"

"তা হলে বালিগঞ্জের লেকে ?"

"ধুত্ ওখানে একগাদা লোক সাঁতার কাটে। কত রকম নোংরা থাকে জলে ··· ।"

ছোটমাসি উঠে পড়ে লেগে গেলেন তাঁর দুই মেয়ের সাঁতার শেখাবার ব্যবস্থা করতে। যে-কোনো জায়গায় তো ছোটমাসি মেয়েদের সাঁতার শেখাতে রাজি হতে পারেন না। একদম পরিষ্কার জল চাই, সেই জলে আবার ওষুধ ফেলতে হবে। তার আগে মেয়েদেরও নিতে হবে নানারকম ইঞ্জেকশান।

ছোটমাসির নানান জায়গায় চেনাশুনো। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যবস্থা করে ফেললেন কলকাতার খুব বড় একটা ক্লাবের সুইমিং পুলে। তাও অন্য সকলের সঙ্গে নয়। খুব ভোরবেলা যখন কেউ যায় না, সেই সময় আগের দিনের জল বদলে নতুন জল ভরা হবে, তাতে মেশাবেন ছোটমাসি তাঁর নিজস্ব ওষুধ। এবং সাঁতার শেখাবার জন্য ছোটমাসি ঠিক করলেন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। ছোটমাসির ধারণা, যারা ইংরিজি বলে তারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, রুমু-ঝুমু এর আগে কখনো মায়ের কথার অবাধ্য না হলেও সাঁতার শিখতে রাজি হল না। দুজনেই বলল, জলে নামতে ওদের ভয় করে।

এদিকে ছোটমাসি একটা জিনিস ধরলে কিছুতেই সেটা মাঝপথে ছাড়েন না। ওদের কত করে বোঝালেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "এত ভয় কিসের ? দেখবি একদিন-দুদিন নামলেই ভয় কেটে যাবে। ভাল ট্রেনার থাকবে। দরকার হলে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব !"

মেয়েরা তবু শুনতে চায় না। কাচুমাচু মুখ করে বলতে লাগল, "এ বছর না, পরের বছর !"

সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক, এখন মেয়েরা রাজি না হলে কি চলে ? কত কষ্ট করে ছোটমাসি সেই ক্লাবের লোকদের রাজি করিয়েছেন আলাদা ব্যবস্থা করবার জন্য। সুতরাং ছোটমাসি কাঁদতে শুরু করলেন।

কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগলেন, "আমি তোদের ভালর জন্য এত সব করি। আর তোরা আমার কথা শুনবি না ? সাঁতার না শিখলে কবে হঠাৎ ডুবে যাবি, পৃথিবীর তিনভাগ জল, এক ভাগ স্থল !"

সুতরাং শেষ পর্যন্ত রুমু-ঝুমুকে রাজি হতেই হল।

যেদিন প্রথম সাঁতার শিখতে যাওয়া হবে সেদিন আমিও ভোরবেলা গিয়ে হাজির হলাম। ওদের উৎসাহ দিতে হবে তো! রুমু-ঝুমুর মুখচোখে খুব ভয়-ভয় ভাব। তখনও বলছে, "মা, আজ না গেলে হয় না ? বড্ড ভয় করছে !"

ছোটমাসি খুব নরম গলায় বললেন, "দেখিস কোনো ভয় নেই। আমি তো পাশেই থাকব।"

সেই ক্লাবে গিয়ে সুইমিং পুলের কাছে দাঁড়িয়ে রুমু আর ঝুমু এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠল। ওদের ট্রেনার মেয়েটি জলে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক। আমরা আরও বেশি অবাক। ভয়ের চোটে রুমু-ঝুমুর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

ছোটমাসি বললেন, "ওমা, তোরা ওরকম করছিস কেন ? ভয় নেই ! ভয় নেই !"

ওরা আরও জোরে হেসে উঠল।

ছোটমাসি বললেন, "থাক, থাক, ভয় পাচ্ছে। ওদের নামতে হবে না !"

রুমু আর ঝুমু অমনি লাফিয়ে পড়ল জলে। ছোটমাসি আঁতকে উঠলেন যেন।

তারপরই দেখলাম একটা মজার দৃশ্য। ট্রেনার মেয়েটি ওদের দু'জনকে ধরতে আসতেই ওরা পাশ কাটিয়ে ঝপাস ঝপাস করে সাঁতার কেটে দূরে চলে গেল। খুব পাকা সাঁতারুর মতন।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিও হেসে উঠল। ছোটমাসি প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারেননি। তিনি

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ? মেয়েটি হাসছে কেন ?"

আমি বললাম, "ওর বোধহয় খুব হাসিখুশি স্বভাব !"

তারপর ছোটমাসি বললেন, "ওরা অতদূর চলে গেল কী করে ? সাঁতার না জেনেও সাঁতার কাটছে ?"

আমি বললাম, "তোমারই মেয়ে তো। তুমি খুব ভাল সাঁতার জান, তাই ওদের আর শেখার দরকার হয়নি !"

রুমু-ঝুমু এই সময় টুপ করে ডুবে গেল। আর ওঠেই না, ওঠেই না। তখন ছোটমাসি খুব ভয় পেয়ে নিজেই শাড়ি-টাড়ি পরা অবস্থায় জলে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আমি ওঁর হাত টেনে ধরলাম। রুমু-ঝুমু ডুবসাঁতার কেটে অনেক দূরে গিয়ে ভুশ করে আবার মাথা তুলল।

এবার ছোটমাসি বুঝলেন। গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা ওরা সাঁতার জানে ? এই, তোরা কোথায় সাঁতার শিখলি ? কবে শিখলি ?"

রুমু-ঝুমু চিত-সাঁতার কাটতে-কাটতে উত্তর দিল "ঠাকুরপুকুরে।"

ছোটমাসি আরও অবাক হয়ে বললেন, "ঠাকুরপুকুরে ওরা কোথায় সাঁতার শিখল ?"

আমি বললাম, "ঠাকুরপুকুর নাম যখন, নিশ্চয়ই সেখানে অনেক পুকুর আছে।"

ছোটমাসি বললেন, "পুকুর কোথায় ? আমাদের ঠাকুরপুকুরের বাড়িতে একটা নোংরা ডোবা আছে। সেটা তো পানায় ভরা, কেউ নামে না !"

রুমু-ঝুমু বলল, "আমরা সেটাতেই সাঁতার শিখেছি।"

"কে শেখাল ?"

"কেউ শেখায়নি ! নিজে-নিজে !"

ছোটমাসি ধপাস করে একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ে বললেন, "হায়, হায়, কী হবে ? একা-একা সাঁতার শেখা কী সাঙ্ঘাতিক কথা ! আর ঐ বিচ্ছিরি নোংরা পুকুর, কতকাল ওর জল পরিষ্কার করা হয় না সেটাতে নেমেছে আমার মেয়েরা ! ওরা বেঁচে আছে, কী করে ? হ্যাঁরে নিলু, কী হল বল তো !"

আমি বললাম, "সত্যিই তো, ওরা বেঁচে আছে কী করে ! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার !"

রুমু-ঝুমু তখন মনের আনন্দে জল তোলপাড় করে সাঁতার কাটছে !
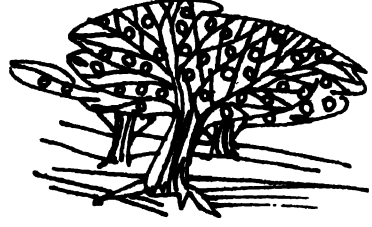
রাজার খেলা

প্রফুল্ল রায়

ধর্মতলায় নিধু জ্যাঠার সঙ্গে ট্রাম থেকে নেমে কার্জন পার্কের ভেতর দিয়ে ইডেন গার্ডেনের দিকে যেতে যেতে একেবারে হাঁ হয়ে গেল রাজা। চারপাশ থেকে যত বাস মিনিবাস ট্রাম ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কার আসছে, সব মানুষে ঠাসা। গাড়িগুলো এসে থামছে কার্জন পার্কে, রাজভবনের গায়ে এবং ওধারের ময়দানে। সেগুলো থেকে গল গল করে মানুষ বেরিয়ে এসে সোজা চলেছে ইডেন গার্ডেনের দিকে। আজ গোটা কলকাতা যাচ্ছে রঞ্জি স্টেডিয়ামে ইণ্ডিয়া ভার্সাস ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ম্যাচ দেখতে।

কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। অগুনতি গাড়ি সামনে দিয়ে দারুণ স্পীডে রেড রোডের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ট্রাফিক কনট্রোলে লাল আলো জ্বলতেই ছুটন্ত গাড়িগুলো থেমে গেল। আর নিধু জ্যাঠার হাত ধরে, রাস্তা পেরিয়ে রাজভবনের ফুটপাথে চলে এল রাজা। তারপর মানুষের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল।

নিধু জ্যাঠার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় সে অনেক লম্বা, প্রায় ছ ফুটের মতো। টান টান চেহারা, শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। মাথার প্রায় সব চুল সাদা হয়ে গেছে, তবু নিধু জ্যাঠা খুব স্মার্ট। তার হাঁটার ভঙ্গি যুবকদের মতো।

এই মুহূর্তে নিধু জ্যাঠার পরনে মালকোচা দিয়ে পরা ধুতি আর ফুল শার্ট, তার ওপর রোঁয়াওলা উলের সোয়েটার। পায়ে কেডস। কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে।

তার পাশে রাজাকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে। রাজার পরনে এখন ফুল প্যান্ট আর বুশ শার্ট, তার ওপর লাল পুল-ওভার। পায়ে নীল মোজা আর বুট।

রাজভবনের ফুটপাথটা সেমি সার্কেলে ঘুরে গেছে। সেটা ধরে খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল, ওধারের ময়দানে কয়েক হাজার প্রাইভেট কার পার্ক করা রয়েছে। তার মানে গাড়িওলারা ওখানে গাড়ি রেখে স্টেডিয়ামে ঢুকেছে। খেলা ভাঙলে ফিরে এসে যে যার গাড়িতে উঠে চলে যাবে।

নিধু জ্যাঠার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দারুণ ভাল লাগছিল রাজার, ভীষণ উত্তেজনাও হচ্ছিল। তার কারণ, এই প্রথম সে ইডেন গার্ডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে।

রাজারা থাকে উত্তর কলকাতায়—বাগবাজারের কাছে একটা সরু গলিতে। সে পড়ে মডেল স্কুলে, ক্লাস সিক্সে। আজ একত্রিশে ডিসেম্বর। এ বছরেরই অক্টোবরে সে এগার পেরিয়ে বারোয় পা দিয়েছে।

পড়াশোনায় রাজা বেশ ভাল। প্রতি বছর ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে আসছে। লেখাপড়ার মতো খেলাধুলোতেও তার খুব ঝোঁক। কিন্তু নর্থ ক্যালকাটায় খেলার মাঠ নেই। কখনও সখনও কোনো পার্কে একটু জায়গা পেলে পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে টেনিস বল দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল কি ইণ্ডিয়া-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের আসর বসিয়ে দ্যায়। নইলে খবরের কাগজের খেলার পাতা আর ঝকমকানো রঙিন সব স্পোর্টস ম্যাগাজিন পড়ে কখনও সে স্বপ্ন দ্যাখে পেলের মতো ফুটবল খেলোয়াড় হবে, কখনও বা ভাবে ভিভ রিচার্ডসের মতো ব্যাটসম্যান না হলে চলবে না।

এই খেলাধুলোর ব্যাপারটায় সারাক্ষণ রাজাকে তাতিয়ে রাখে নিধু জ্যাঠা। এই যে আজ জীবনে প্রথম ইডেনে টেস্ট ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে সেটাও নিধু জ্যাঠার জন্যই।

রাজার বাবারও খেলাটেলায় যথেষ্ট আগ্রহ। তিনি মোটামুটি একটা চাকরি করেন। এদিকে ফ্যামিলিতে লোকজন অনেক। রাজারা চার ভাইবোন, বাবা, মা, ঠাকুমা আর এক বিধবা পিসিমা। মোট আটজন। এত বড় সংসার চালাতে অফিস ছুটির পরও বাবা আরো কী সব করেন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রোজই তাঁর রাত হয়। অনেক কষ্টে টায়টোয় কোনোরকমে রাজাদের চলে যায়।

বাবার পক্ষে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে টেস্ট ম্যাচের টিকিট কেটে দেওয়া সম্ভব না। দামী দামী খেলার ম্যাগাজিনও তিনি কিনে দিতে পারেন না। বাড়িতে একটাই মোটে বাংলা খবরের কাগজ আসে। নিধু জ্যাঠাই এর ওর কাছ থেকে অন্য সব খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন চেয়ে এনে রাজাকে দেয়। পড়া হয়ে গেলে সেগুলো ফেরত দিয়ে আসে।

টেস্ট খেলা তো আজ বললে কাল হয় না। ছ'মাস কি তারও আগে ঠিক করা থাকে। এবার ইডেনে ইণ্ডিয়া ইংল্যাণ্ডের টেস্ট দেখার জন্য রাজা আর নিধু জ্যাঠা সবাইকে লুকিয়ে পয়সা জমাতে শুরু করেছিল। দু'জনের টিকিটের দাম দেড়'শ টাকা। টেস্টের তারিখটা জানার পর থেকেই টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে একটা ফাঁকা পাউডারের কৌটোয় রাখছিল রাজা। এইভাবে পঁচিশ টাকা জমানো গেছে। বাকি একশ পঁচিশ টাকা দিয়ে দু'খানা টিকিট কিনে আনে নিধু জ্যাঠা।

নিধু জ্যাঠা রাজার আপন জ্যাঠা নয়। এমন কি তার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্কই নেই। না থাক, তবু আপনজনের চেয়ে সে অনেক বেশি।

রাজা শুনেছে, দেশভাগের আগে ঢাকা শহরে বাবারা যে পাড়ায় থাকতেন নিধু জ্যাঠাও সেখানেই থাকত। বাবার থেকে কয়েক বছরের বড়; সেই হিসেবে সে বাবার দাদা, রাজাদের জ্যাঠা।

নিধু জ্যাঠার পোশাকী নাম প্রিয়নাথ নাগ, ডাকনাম নিধু। ভাল নামটা লোকে ভুলেই গেছে। নিধুটাই সবার মুখে মুখে চালু রয়েছে।

নিধু জ্যাঠার তিন কুলে কেউ নেই, বিয়েও করেনি। রাজা শুনেছে, দেশভাগের কয়েক বছর পরে ঢাকা থেকে বাবাদের সঙ্গে সে-ও কলকাতায় চলে আসে। তার জন্মের ঢের আগে থেকেই নিধু জ্যাঠা তাদের বাড়িতে আছে। তবে তার খরচ সে নিজেই চালায়। কলেজ স্ট্রীটে একটা বড়

বইয়ের দোকানে কী একটা কাজ করে। তাতে যে মাইনে পায় তার প্রায় সবটাই মাসের শেষে বাবার হাতে তুলে দেয়। তাতে রাজাদের যথেষ্ট উপকার হয়। দিনে সাত-আট কাপ চা ছাড়া আর কোনো নেশা নেই। সবাই তাকে ভালবাসে। ছোটদের যত আবদার তার কাছে।

রাজা আরো শুনেছে ঢাকায় থাকতে দুর্দান্ত স্পোর্টসম্যান ছিল নিধু জ্যাঠা। বিখ্যাত উয়াড়ি ক্লাবের সে ছিল বাঘা রাইট আউট। তখন ঢাকায় ক্রিকেট খেলাটা তেমন একটা হত না। তবু উৎসাহ কম ছিল না। ওরই মধ্যে ব্যাট-ট্যাট কিনে প্র্যাকটিশ করত।

পৃথিবীতে যত বড় বড় ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার সমস্ত রেকর্ড নিধু জ্যাঠার মুখস্থ। তার কাছেই রাজা শুনেছে টেস্ট ম্যাচে কে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছে, কে বেশি ক্যাচ ধরেছে, কোন দেশে সবচেয়ে বেশি অল রাউণ্ডার পাওয়া গেছে, ইত্যাদি। ফুটবলের গল্প ও

হলে তো রাতের পর রাত কাবার করে দিতে পারে নিধু জ্যাঠা। পেলে, লেভ ইয়াসিন, গ্যারিঞ্চা বা জার্ড মুলার থেকে পাওলো রোসি পর্যন্ত কে কীভাবে গোল করে, কার খেলার স্টাইল কী রকম—বলতে বলতে তার চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে।

এতক্ষণে বাঁ দিকে রেড রোড, নেতাজীর স্ট্যাচু, দেশবন্ধুর মূর্তি রেখে আকাশবাণী ভবনের সামনে এসে পড়ল রাজারা। এখানে বাঁশের খুঁটি পুঁতে নানা গেটের দিকে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চারদিকে প্রচুর পুলিশ। একজন পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করে সাত নম্বর গেটের হদিসটা জেনে নিল নিধু জ্যাঠা।

মিনিট পনেরর ভেতর দেখা গেল, ক্লাব হাউসের ডান দিকে সিমেন্টের গ্যালারিতে তারা সীট খুঁজে বসে পড়েছে। বাড়ি থেকে আসার সময় দুপুরে খাবার জন্য মা লুচি আলুভাজা ডিমসেদ্ধ আর কমলালেবু দিয়েছিল। খাবারগুলো একটা কাপড়ের সাইড-ব্যাগে পুরে নিয়ে এসেছে নিধু জ্যাঠা। ব্যাগটা এখন তার কোলে।

এখনও খেলা শুরু হয়নি। সবে সাড়ে ন'টা। আরো আধ ঘণ্টা বাদে ঠিক দশটায় টস হবে, তারপর তো খেলা।

রাজা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। তাদের বাঁ পাশে ক্লাব হাউস। তারপর থেকে গোল মাঠটাকে ঘিরে স্টেডিয়ামের অনেকগুলো ব্লক। ব্লকগুলোতে এখন শুধু মানুষ আর মানুষ। অসংখ্য গেট দিয়ে আরো অনেকে আসছে। কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা থাকবে না, খেলা শুরু হবার আগে স্টেডিয়াম বোঝাই হয়ে যাবে।

পশ্চিম দিকের ব্লকগুলোর পেছনে ইডেন গার্ডেনের উঁচু উঁচু গাছ, আরো দূরে হাইকোর্টের চুড়ো দেখা যাচ্ছে।

এতদিন রাজা তার বন্ধু বুবুনদের টিভিতেই রঞ্জি স্টেডিয়াম দেখেছে।

এখন নিজের চোখে সব দেখতে পাচ্ছে। এত মানুষ, তাদের নানা রঙের পোশাক, মাথার টুপি, ক্লাব হাউস, ইডেনের গাছপালা—সমস্ত মিলিয়ে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

এ বছর শীতটা বেশ জাঁকিয়েই পড়েছে। কনকনে হাওয়া ইডেন গার্ডেনের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই ছুটে যাচ্ছে। হাওয়াটা এত ঠাণ্ডা, মনে হয় হিমালয়ের বরফ গায়ে মেখে নেমে এসেছে। অবশ্য রোদও উঠেছে চমৎকার। উষ্ণ সোনালি রোদ আর ঠাণ্ডা বাতাসে শীতের সকালটি দারুণ লাগছে।

চারপাশের মানুষেরা আজকের খেলাটার ব্যাপারে নানা রকম মন্তব্য করে যাচ্ছে।

একজন বলল, 'গাভাসকার টপ ফর্মে আছে। ইডেনে ডাবল সেঞ্চুরি করবে।'

আরেক জন বলল, 'কচু করবে। কাওয়ানস আর এডমণ্ডসকে ঠেকিয়ে কুড়িটা রান আগে করুক। তারপর বলবেন—'

তৃতীয় লোকটি বলল, 'এই নতুন ছেলেটা, মানে আজাহারউদ্দিন সম্পর্কে কী মনে হয় ?'

চতুর্থ লোকটি বলল, 'আমার ধারণা, খুব ভাল খেলবে। ওকে পাওয়াতে ইণ্ডিয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে।'

পঞ্চম লোকটি বলল, 'ইংল্যাণ্ডের ল্যাম্ব আর গ্যাটিং দুর্দান্ত খেলছে এই সীজনটা। এখানকার টেস্টের রেজাল্ট কী হবে কে জানে।'

রাজারা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে পাঁচ রো নিচের সীট থেকে একটা লোক অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'এই আইসক্রিম, এই পটেটো চীপস, এই চিউয়িং গাম, এই পপ কর্ন, ইধর আও—' অর্থাৎ সামনে দিয়ে যে ফেরিওলা যা-ই নিয়ে যাক তাকেই ডাকছে লোকটা।

রাজার বাঁ পাশের সীটে এক মহিলা স্টেডিয়ামে ঢুকেই ব্যাগ থেকে উলের গোলা বার করে সোয়েটার বুনে চলেছেন। তাঁর ডান ধারে এক বেজায় মোটা মারোয়াড়ি আরেক জনের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোতে শুরু করেছে। খুব সম্ভব উল বোনা আর ঘুমোবার মতো জরুরি কাজের জন্যই তাদের এখানে আসা।

রাজা কিন্তু এসব কিছুই শুনছিল না, বা লক্ষ্যও করছিল না। সে শুধু স্বপ্নের ঘোরে পুরো স্টেডিয়ামটা বার বার দেখছে।

হঠাৎ পাশ থেকে নিধু জ্যাঠা ডাকল, 'রাজা—'

অন্যমনস্কর মতো সাড়া দিল রাজা, 'উঁ—'

'নোট বইটা এনেছিস?'

একটা তিন ইঞ্চি বাই দু ইঞ্চি মাপের ছোট-সবুজ মলাটের নোট বই রাজাকে দিয়েছে নিধু জ্যাঠা। ওটাতে পেলে গ্যারিঞ্চা বেকেন বাউয়ার থেকে শুরু করে মারাদোনা ফ্রান্সিস কোলি ইউসোবিও পর্যন্ত ফুটবলের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের গোল করার কায়দা যেমন লেখা আছে তেমনি ভিভ রিচার্ডস, ব্রাডম্যান, উইকস, গাভাসকার ইত্যাদি ক্রিকেটের বড় বড় স্টাররা কে কীভাবে স্ট্রোক করেন তার নিখুঁত বর্ণনাও নোট বইটিতে পাওয়া যাবে। ক্রিকেট এবং ফুটবলের দারুণ কিছু ঘটলেই রাজার সবুজ নোট বুকে তা উঠে যায়।

রাজা ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'এনেছি।'

'ভেরি গুড। যখনই কারো ভালো স্ট্রোক কি বোলিং দেখবি তক্ষুণি টুকে রাখবি।'

মুখে কিছু না বলে আবার ঘাড় কাত করে রাজা।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় পেঙ্গুইন পাখির মতো ঢলঢলে কালো কোট-পরা দুই আম্পায়ার এবং দু'দলের ক্যাপ্টেন সুনীল গাভাসকার আর ডেভিড গাওয়ার মাঠের মাঝখানে টস করতে এলেন। টসে জিতে ইণ্ডিয়া ব্যাটিং নিল। গাওয়ার এবং গাভাসকার ক্লাব হাউসে ফিরে গেলেন। আম্পায়াররা মাঠেই থেকে গেলেন।

একটু পরেই গাওয়ার তাঁর টীম নিয়ে ফিল্ডিং করতে এলেন। গাভাসকার তাঁর পার্টনার গাইকোয়াড়কে নিয়ে এলেন ব্যাটিং করতে।

সবুজ কার্পেটের মতো গোল মাঠে ধপধপে সাদা ট্রাউজার্স শার্ট পরা এগার জন ফিল্ডার, দু'জন ব্যাটসম্যান আর কালো কোট পরা দু'জন আম্পায়ার ছাড়া আর কেউ নেই।

এতদিন টিভিতে আর স্বপ্নে রাজা যাদের দেখেছে, এখন তারা একেবারে চোখের সামনে। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে তার, চোখের পলক পড়ছে না।

গাভাসকার আর গাইকোয়াড় কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যাট করতে পারলেন না, অল্প রান করেই এডমণ্ডস এবং কাওয়ানসের বলে কট আউট হয়ে গেলেন।

কাওয়ানস দুর্দান্ত 'বল' করছিলেন। নিধু জ্যাঠা পাশ থেকে ফিসফিস করে বলল, 'কাওয়ানসের বল করার কায়দাটা টুকে নে।'

রাজা নোট বই আর ডট পেন বার করেই রেখেছিল। তক্ষুণি লিখে ফেলল।

গাভাসকার এবং গাইকোয়াড়ের পর এলেন বেঙ্গসরকার আর অমরনাথ। বেঙ্গসরকার এবং অমরনাথের দুটো স্ট্রেট ড্রাইভ, একটা স্কোয়ার কাট আর একটা সুইপের বর্ণনা লিখে নিল রাজা।

বেঙ্গসরকার এবং অমরনাথ জুটি আউট হলে এলেন রবি শাস্ত্রী আর আজাহারউদ্দিন। তাঁদের কত লেট কাট, অন ড্রাইভ, পুল আর কভার ড্রাইভের বিবরণ যে রাজার নোট বুকে

টোকা হতে লাগল তার ঠিক নেই।

একসময় প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো।

এরপর আরো চার দিন নিধু জ্যাঠার সঙ্গে ইডেনে এল রাজা। ইণ্ডিয়ার প্রথম ইনিংস সাত উইকেটে চারশ সাঁইত্রিশ রানে ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হলো। ইংল্যাণ্ড আউট হলো দুশো ছিয়াত্তর রানে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ড্র হয়ে গেল।

এর মধ্যে মাইক গ্যাটিং আর অ্যালান ল্যাম্বের হাঁটু মুড়ে পুল, সুইপ, ড্রাইভ, চেতন শর্মা, শিবরামকৃষ্ণণ ও শিবলাল যাদবের বোলিং-এর স্টাইল, ডেলিভারি, সব টুকে নিয়েছে রাজা।

১৯৮৫-এর পাঁচই জানুয়ারি খেলা শেষ হবার ঘণ্টাখানেক আগে পাশ থেকে নিধু জ্যাঠা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা রাজা—'

পাঁচ দিন ধরে রাজার চোখ মাঠের মাঝখানেই আটকে আছে। মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, 'কী বলছ?'

'স্টেডিয়ামে সবসুদ্ধু কত লোক আছে বল্ তো—'

'খবরের কাগজে লিখেছে আশী হাজার।'

'এর মধ্যে কত বাঙালী আছে, মনে হয়?'

বলতে পারব না।'

একটু ভেবে নিধু জ্যাঠা বলল, 'ধর মিনিমাম সত্তর হাজার।'

রাজা উত্তর দিল না।

নিধু জ্যাঠা এবার বলল, 'সত্তর হাজার লোকের হাত কতগুলো?'

রাজা হতভম্বের মতো বলল, 'তুমি কি খেলা দেখতে এসে গুণ অঙ্কের ক্লাস বসাতে চাইছ?'

'বল্ না—'

'একজন মানুষের দুটো করে হাত হলে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার।'

'রাইট। ভেবে দ্যাখ, কেউ ভাল ব্যাট, বল বা ফিল্ডিং করলে সত্তর হাজার বাঙালী একলাখ চল্লিশ হাজার হাতে হাততালি দিচ্ছে। দিচ্ছে কিনা?'

মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বিমূঢ়ের মতো তাকালো রাজা। বলল, 'হ্যাঁ দিচ্ছে।'

'এবার বল্ মাঠে কত জন প্লেয়ার খেলছে?'

'দু দলের বাইশ জন।'

'তাদের ভেতর ক'জন বাঙালী?'

'একজনও না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর খুব আস্তে আস্তে, অথচ বেশ জোর দিয়ে নিধু জ্যাঠা বলল, 'আর কেউ পারুক, আর না-ই পারুক, তোকে অন্তত মাঠের মাঝখানে ওই বাইশ জনের একজন হতে হবে।'

রাজা চমকে উঠল, 'কীভাবে?'

'লেখাপড়ার সঙ্গে ক্রিকেট প্র্যাকটিশ করে করে, ভাল খেলা শিখে।'

'শিখব কী করে? আমার কি প্যাড আছে? ব্যাট, উইকেট, গ্লাভস, ডিউস বল আছে?'

'ঠিক বলেছিস।' খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিধু জ্যাঠা বলল, 'দেখি কী করা যায়।'

টেস্ট ম্যাচ শেষ হবার মাসখানেক বাদে একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ভীষণ অবাক হয়ে গেল রাজা। যতটা অবাক, ততটাই খুশি। নিধু জ্যাঠা নতুন ব্যাট, লাল টুকটুকে ডিউস বল,

প্যাড, উইকেট আর গ্লাভস কিনে এনে তারজন্য অপেক্ষা করছে।

রাজার বাবাও হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, 'নিধুদা, এত টাকা খরচ করে এসব কিনতে গেলে কেন ?'

নিধু জ্যাঠা বাবাকে বলল, 'এ নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না ভজন।' রাজার বাবার ডাকনাম ভজন।

'কিন্তু টাকাগুলো পেলে কোথায় ? নিশ্চয়ই ধার-টার করেছ ?'

'যা ভাল বুঝেছি, করেছি। তোর শরীর ভাল না, শুয়ে থাক গিয়ে।'

বাবা তাঁর এই একরোখা জেদী দাদাটিকে ভাল করেই চেনেন। আর একটি কথাও না বলে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন।

নিধু জ্যাঠা বলল, 'তাহলে কাল থেকেই প্র্যাকটিশ শুরু করা যাক। ভাবছি তোর সঙ্গে আমিও নতুন করে আরম্ভ করব। ভোরবেলা উঠে আড়াই ঘণ্টা পড়ে নিবি, তারপর এক ঘণ্টা প্র্যাকটিশ। মাঠ থেকে ফিরে আধঘণ্টা রেস্ট। রেস্টের পর স্নান করে খেয়ে স্কুলে। আর আমি চলে যাব কলেজ স্ট্রীটে। কাল থেকে এই হবে আমাদের রোজকার রুটিন। ঠিক আছে ?'

রাজা মাথা হেলিয়ে জানালো, 'ঠিক আছে।'

'মনে রাখবি, ইডেন গার্ডেনে মাঠের ভেতর যে বাইশ জনকে দেখেছিস তার একজন তোকে হতেই হবে।'

রাজা বলল, মনে রাখবে।

পরদিন সকালে ব্যাট প্যাড-ট্যাড নিয়ে ঠিক আটটায় রাজা আর নিধু জ্যাঠা চলে গেল কাছাকাছি একটা পার্কে। সেখানে ঘাস-টাস বলতে কিছু নেই। চারদিক গর্তে বোঝাই। এখানে ক্রিকেট প্র্যাকটিশ অসম্ভব।

নিধু জ্যাঠা বলল, 'চল, অন্য জায়গায় যাই।'

খানিকটা দূরে আরেকটা পার্কে এসেও কাজের কাজ কিছুই হলো না। সি· এম· ডি· এ'র কী সব কাজকর্ম হচ্ছে এদিকে, যার জন্য পার্কটায় অগুনতি গুদাম বানিয়ে মালপত্র রাখা হয়েছে। দশ ইঞ্চি জায়গাও এখানে ফাঁকা পড়ে নেই।

এবার রাজারা গেল আরো দূরের একটা পার্কে। সেটা পাতাল রেল দখল করে রেখেছে। এখানেও বিরাট বিরাট গোডাউন। সেগুলো সিমেন্ট বালি লোহার রড এবং নানারকম ভারী ভারী যন্ত্রপাতিতে বোঝাই।

রাজার স্কুল আর নিধু জ্যাঠার কাজে যাবার সময় হয়ে আসছিল। ওরা বাড়ি ফিরে এল। ঠিক হলো, পরের দিন আবার মাঠের খোঁজে বেরুবে।

কিন্তু পরের দিনও খেলার মাঠ পাওয়া গেল না। সব পার্কই হয় সি· এম· ডি· এ· নয় পাতাল রেল কিংবা হকার আর ভিখিরিরা দখল করে রেখেছে।

চারদিন ঘোরাঘুরির পর একটা পার্ক পাওয়া গেল কিন্তু সেখানে বদমাশ বাজে ছোকরাদের আড্ডা। রাজাদের উইকেট পুঁততে দেখে তারা তেড়ে এল, 'এখানে খেলা-ফেলা চলবে না। ভাগ—'

রাজা হতাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু নিধু জ্যাঠা ভেঙে পড়ার মানুষ না। খবর নিয়ে সে জানতে পারল, ওই ছোকরাগুলো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পার্কে বসে থাকে। সারাক্ষণ নেশাটেশা করে। ওরা পারে না, এমন নোংরা কাজ নেই। ওদের জন্য সন্ধে পর্যন্ত কেউ পার্কে ঢুকতে পারে

না। তবে সন্ধের পর ঠাণ্ডাটা যখন আরো কয়েক গুণ বেড়ে যায় তখন ওরা পার্ক থেকে চলে যায়।

এই পার্কটার ভেতরে এবং চারদিকের রাস্তায় কর্পোরেশন প্রচুর তেজী আলো লাগিয়ে দিয়েছে। এত আলো যে একটা আলপিন পড়লে খুঁজে নেওয়া যায়।

নিধু জ্যাঠা আর রাজা ঠিক করে ফেলল, রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর আলোয় ঝলমলে ফাঁকা পার্কে তারা প্র্যাকটিশ করতে আসবে। ঠাণ্ডাটা তখন একটু বেশিই থাকবে কিন্তু কী আর করা যাবে! ক্রিকেট তো শীতেরই খেলা। তা ছাড়া ইংল্যাণ্ডে গেলে তো এর থেকে অনেক বেশি ঠাণ্ডায় খেলতে হবে।

পরদিন রাত থেকেই আলোকিত ফাঁকা মাঠে সত্তর বছরের একজন বোলার বারো বছরের এক ব্যাটসম্যানকে বল করতে থাকে। চারদিক নিঝুম, মাথার ওপর জানুয়ারির হিম পড়ে যাচ্ছে অবিরাম। কিন্তু দুই ক্রিকেটারের সে ব্যাপারে হুঁশ নেই। সারা পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে তারা প্র্যাকটিশ করে চলেছে।

নিধু জ্যাঠা বল করতে করতে বলে, 'এই একটা লেগ স্পিন দিলাম। সুইপ কর—'

রাজা ব্যাট চালায়।

নিধু জ্যাঠা হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'হলো না, হলো না। ল্যাম্ব শিবরামকৃষ্ণণের বলে হাঁটু মুড়ে কীভাবে সুইপ করেছিল, ভেবে নে—' বল কুড়িয়ে এনে আবার ডেলিভারি দিতে গিয়ে বলল, 'আবার লেগ স্পিন দিচ্ছি। ট্রাই এগেন —'

এইভাবে রাতের পর রাত দু'জনে প্র্যাকটিশ করে যায়। ইডেন গার্ডেনে বাইশ জন টেস্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন হতে পারবে কিনা, রাজা জানে না। কিন্তু চেষ্টা তো করে যেতে হবে।
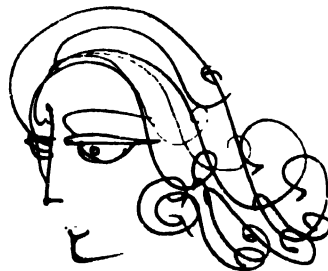
ডবল পশুপতি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পশুপতিবাবু নিতান্তই ভালমানুষ। তবে দোষের মধ্যে তাঁর মুখটা বড় ভুলো। তিনি সর্বদা এতই আনমনা যে, আচমকা যদি কেউ তাঁকে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করে, তা হলেও তিনি চট করে সেটা মনে করতে পারবেন না। একটু ভেবে বলতে হয়।

পশুপতিবাবুদের অবস্থা একসময়ে বেশ ভালই ছিল। তাঁর ঠাকুর্দা পুরনো জিনিস কেনাবেচার কারবার করে খুব পয়সা করেছিলেন। বিশাল দো-মহলা বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা, দাসদাসীর অভাব ছিল না। তবে এখন আর তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটা আছে, তবে সংস্কার আর মেরামতির অভাবে সেটার অবস্থা বেশ করুণ। বিশাল বাগানটা এখন আগাছায় ভরা। বহু লোক বাড়িটা ভাড়া নিতে চায়, কিনতে চায়।

এই বিশাল বাড়িতে পশুপতিবাবু একা থাকেন। সকালে উঠে তিনি ডনবৈঠক দেন, কল-ওঠা ভেজা ছোলা আর আদা খান, নিজেই রান্না করেন। একা মানুষ বলে তাঁর বিশেষ টাকা-পয়সার দরকার হয় না। তাঁর একটা ছোট লোহালক্কড়ের দোকান আছে। সামান্য আয় হয়, তবে পশুপতিবাবুর চলে যায়।

দেখতে গেলে পশুপতিবাবুর ভালই আছেন। তবে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, "এই যে পশুপতিবাবু, নমস্কার। কেমন আছেন?" তখন পশুপতিবাবুর ভারী সমস্যা হয়। আসলে কেমন আছেন তা পশুপতিবাবু আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠাহর করতে পারেন না। তাই অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেন, "বোধহয় ভালই।" কিংবা, "মন্দ নয়। খারাপও হতে পারে।" অবশ্য এই জবাব দিতে পশুপতিবাবুর এত দেরি হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয় ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন, নয়তো জবাব শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একদিন সকালবেলা পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময় একটা লোক

বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় বোধহয় ডাকতে লাগল, "পশুবাবু আছেন নাকি? পশুবাবু?"

ব্যায়ামের সময় কেউ বাধা দিলে পশুপতিবাবু ভয়ানক চটে যান। আজও গেলেন। মাঝপথে ব্যায়াম বন্ধ করা যায় না, আবার জবাব না দিলেও অস্বস্তি। তাই প্রাণপণে বুকডন দিতে দিতে, পশুপতিবাবু শুধু "হুম্, হুম্, হুম্" শব্দ করতে লাগলেন।

লোকটা বুদ্ধিমান। দরজার বাইরে থেকে শব্দটা অনুধাবন করে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তারপর ব্যায়ামরত পশুপতিকে দেখে একগাল হেসে বলল, "ব্যায়াম করছেন? খুব ভাল। ব্যায়ামের মতো জিনিস হয় না। হজম হয়, খিদে পায়, জোর বাড়ে, গুণ্ডা-বদমাশদের ভয় খেতে হয় না। ব্যায়ামের যে কত উপকার।"

পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন। বেশ সেয়ানা চেহারার মাঝবয়সী রোগা একটা লোক। চেনা নয়।

পশুপতিবাবু বুকডন শেষ করে মুগুর ভাঁজতে লাগলেন। লোকটা সভয়ে একটু কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপনমনেই বলতে লাগল, "লোকে বলে বটে, পশুপতিবাবু লোকটা সুবিধের নয়, মহাকেপ্পন, হাড়বজ্জাত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক। আমি বলি, তা সবাই যে সমান হবে এমন কোনও কথা নেই। আর পশুপতিবাবুর খারাপটাই তো শুধু দেখলে হবে না। তার ভাল দিকটাও দেখতে হবে। লোকটা স্বাস্থ্যবান, সাহসী, উদার।"

পশুপতিবাবু রাগবেন কি খুশি হবেন তা বুঝতে পারলেন না। তবে হাতের মুগুরদুটো খুব বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল। ব্যায়ামের সময় কথা বলতে নেই।

লোকটা ঘুরন্ত মুগুরদুটোর দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, "তা মহেন্দ্র তবু, বলে বসল, 'ওহে নিতাই, তোমার পুরনো স্বভাবটা আর বদলাল না। তুমি কেবল লোকের ভালটাই দেখে গেলে। কিন্তু দুনিয়াটা যে খারাপ লোকে ভরে গেছে, সেটা আর তোমার চোখে পড়ল না। পশুপতির আবার গুণটা কিসের? বাপ-পিতেমোর অত বড় বাড়িটা ভূতের বাড়ি করে ফেলে রেখেছে। অথচ কত লোক বাড়ি না পেয়ে কত কষ্টে এখানে-সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে।'"

পশুপতিবাবু মুগুর নামিয়ে রাখলেন। হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। লোকটার দিকে একবার গম্ভীর চোখে তাকানোর চেষ্টা করলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আরও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে তবেই তিনি কথা বলতে পারেন।

পশুপতিবাবু মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য বিছানার ওপর শীর্ষাসন করতে লাগলেন।

লোকটা বলল, "আমিও ছেড়ে কথা কইনি। মহেন্দ্রকে আমিও দু'কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি। 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর বাইরেটাই দেখলি, ভিতরটা দেখলি না। পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে ধানাই-পানাই করলে তো চলবে না। তিনি অল্প কথার মানুষ। দিনরাত লোক গিয়ে তাঁর কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে মাথা ধরিয়ে দেয়। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন ঠিক করতে পারেন না। তবে এই আমি যদি যাই, তা হলে আমার মুখের দিকে চেয়েই পশুপতিবাবু বুঝতে পেরে যাবেন, এই হচ্ছে খাঁটি লোক। বাড়িতে যদি ভাড়াটে বসাতেই হয় তো একে। কী জানিস মহেন্দ্র, পশুপতিবাবু কথা কম বলেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।'"

পশুপতি ধনুরাসন শেষ করলেন। ময়ূরাসন করতে লাগলেন। এবং লোকটাকে কী বলবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভুজঙ্গাসনে এসে তিনি ফের উৎকর্ণ হলেন।

লোকটা আপনমনেই হেসে বলছিল, "আমি বলি কি, পশুপতিবাবু কি আর আমার প্রস্তাব

ফেলতে পারবেন। তিনি তেমন লোকই নন। লোকে তাঁর বাড়িটা কিনতে চায়, ভাড়া নিতে চায়। পশুপতিবাবু তাদের সবাইকে বলেন, ভেবে দেখি। তা ভাবতে পশুপতিবাবুর একটু সময় লাগে বইকী। ভগবান তো আর সবাইকে একরকম মগজ দেননি। তাই মহেন্দ্র যখন বলে বসল, 'তুমি পারবে না হে নিতাই,' তখন আমিও বললুম, 'ওরে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর ভাবনাগুলো যদি তোরা ভেবে দিতিস তবে কাজটা কত সহজ হত। পশুপতি ছেলেমানুষ, বুদ্ধিটাও ঘোলাটে, মগজেও কিছু খাটো, ও আর কত ভাববে। আসল কথা হল, পশুপতিকে ভাববার সময় দিতে
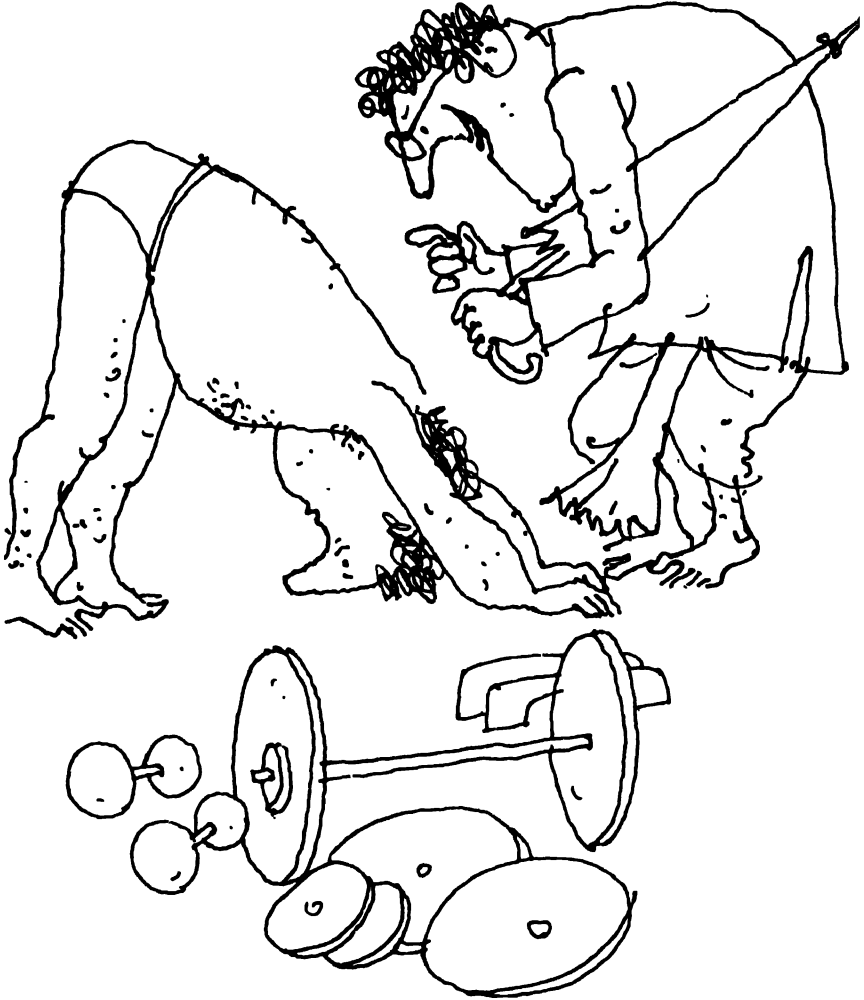
নেই।' তাই আমি আর দেরি করিনি। একেবারে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মালপত্র আর তিনটে টানা-রিকশায় পুরো ফ্যামিলিকে চাপিয়ে এনে হাজির করেছি। জানি, পশুপতি ফেলতে পারবেন না। আমিও ফিরে যাবার নই, আর ভাড়া? পশুপতিবাবু টাকার কাঙাল নন জানি, তবু আমিই বা অধর্ম করতে যাব কোন দুঃখে? গুনে-গুনে পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেব মাসে। আর পুরো

বাড়িটাও তো নিচ্ছি না। শুধু দোতলার পুব-দক্ষিণ কোণের চারখানা ঘর আর দরদালানটুকু।”

পশুপতির ব্যায়াম যখন শেষ হল, তখনও ভাবা শেষ হয়নি। তিনি লোকটার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, “না, না, আপনাকে ভাবতে হবে না। মালপত্র ঠেলাওলারই নামিয়ে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। শুধু চাবিটা কোথায় সেটা কষ্ট করে বললেই হবে। আমার বাচ্চারা বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গিন্নিও আবার রগচটা মানুষ।”

পশুপতি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে ভালমানুষ হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। এ-লোকটা তাঁকে কোনও প্রশ্ন করেনি, মতামতও চায়নি। বরং তাঁর হয়ে নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। পশুপতিবাবু এখন করেন কী?

বাইরে এসে তিনি দেখলেন, বাস্তবিকই তিন-চারটে ঠেলার ওপর থেকে পাহাড়প্রমাণ মালপত্র কুলিরা ধীরেসুস্থে নামাচ্ছে। গোটাপাঁচেক নানা বয়সের বাচ্চা বাগানে নিরুদ্বেগ ছুটোছুটি করছে। একজন মোটাসোটা বদরাগী চেহারার ভদ্রমহিলা কুলিদের ধমকাচ্ছেন, তিনি পশুপতিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, “ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে তো! আর জল-টল তুলে রেখেছেন তো কলঘরে?”

এর কী জবাব দেওয়া যায় পশুপতিবাবু তা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র ওপরে উঠতে লাগল। দুমদাম শব্দ, চেঁচামেচি, হইহট্টগোল।

পশুপতি সভয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রান্নাবান্না মাথায় উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দোকানে রওনা হয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন যে, মাথাটা আর ভাবতেও পারছে না কিছু।

সন্ধেবেলা যখন পশুপতি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গোটা বাড়িটাই প্রায় নিতাইয়ের দখলে। একতলার বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে তাসের আসর বসিয়েছে। দোতলায় কে যেন গলা সাধছে। গোটাপাঁচেক বাচ্চা চেঁচিয়ে পড়া করছে।

পশুপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দিন-সাতেক আগেও একজন বাড়িটা দশ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিল। আর দুজন লোক ভাড়া নিতে চেয়েছিল মাসে দু'হাজার টাকায়। পশুপতিবাবু ভাববার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

তাঁকে দেখে নিতাই তাসের আসর থেকেই একেবারে আপনজনের মতো চেঁচিয়ে উঠল, “পশুপতি, এসে গেছ! বাঃ, আমি তো তোমার জন্য ভেবে মরছিলুম। পশুপতি তো ফিরতে এত রাত করে না। তা হয়েছিল কী জানো, চায়ের চিনি আর দুধ ছিল না। তা আমি গিন্নিকে বললুম, সে কী কথা, দুধ চিনি নেই তো কী হয়েছে? আমার পশুপতিভায়ার ঘরেই তো রয়েছে। সে তো আর আমার পর নয়। তাই দরজাটা খুলতে হয়েছিল ভায়া, কিন্তু কিছু মনে কোরো না।”

পশুপতি ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন, তালা ভাঙা। ঘর হাঁহাঁ করছে, খোলা। এর জন্য কী বলা যায় তা পশুপতি শত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। ওপরে ধুপধাপ শব্দ, কান্না, চিৎকার, ঝগড়া, বাসন ফেলার আওয়াজ, সবই তাঁর কানে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছিল। ভারী শান্তিতে ছিলেন এতদিন। এবার না নিজের ভিটে থেকে বাস তুলতে হয়।

একটু বাদেই নিতাইয়ের বড় মেয়ে হলুদ আর নুন চাইতে এল। তারপর মেজো ছেলে এসে

দেশলাই ধার নিয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ নিতাই এসে দশটা টাকা ধার চাইল, মাসের শেষেই দেবে।

পশুপতিবাবু কষে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে. ভাবতে ক্লান্ত হয়ে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। পশুপতি উঠে দরজা খুলে দেখল, ভারী অভিমানী মুখ করে নিতাই দাঁড়িয়ে।

"কাজটা কি ঠিক করলে পশুপতি-ভায়া?"

পশুপতি আবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কোন কাজের কথা হচ্ছে। নিতাই মাথা নেড়ে বলল, "ভাড়া না হয় আরও দশ টাকা বাড়িয়েই দিচ্ছি। তা কথাটা তো মুখে বললেই পারতে। বাথরুমের দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে লাথি মারার কোনও দরকার ছিল কি? কাজটা কি ঠিক হল হে পশুপতি?"

পশুপতি খুব ভাবছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

নিতাই দুঃখের সঙ্গে বলল, "আর খুব আস্তেও মারোনি। আমার কাঁকালে বেশ লেগেছে। যা হোক, ওই ষাটই দেব, মনে রাগ পুষে রেখো না ভাই।"

পশুপতিবাবু কী বলা উচিত ভাবতে লাগলেন। নিতাই চলে গেল।

পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ নিতাইয়ের বউ একটা খুন্তি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল।

"বলি পশুপতিবাবু, আপনার আক্কেলখানা কী বলুন তো! ঢের-ঢের বাড়িওয়ালা দেখেছি বাপু, আপনার মতো তো দেখিনি? কোন্ আক্কেলে আপনি আমগাছে উঠে রান্নাঘরে ঢিল ছুঁড়ছিলেন? তাও ছোটখাটো ঢিল নয়, অ্যাত বড় বড় পাথর। তার দু'খানা আমার ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গরম ফ্যান চলকে আমার হাতে ফোসকা ধরিয়েছে। চারখানা কাচের গেলাস ভেঙেছে। একটা ঢেলা পড়েছে ডালের বাটিতে। বলি এসব কী হচ্ছে? আপনি কি পাগল না পাজি?"

পশুপতি একবারও সদুত্তর দিতে পারলেন না, তবে ভাবতে লাগলেন।

নিতাইয়ের বউ চোখ পাকিয়ে বলল, "আমিও দুর্গা-দারোগার মেয়ে। এই বলে দিলুম, ফে ঢিল মারলে আমিও দেখে নেব।"

পশুপতি শুকনো মুখে কাজে বেরোলেন। রান্নাবান্না আর করলেন না। হোটেলেই খে নেবেন দুপুরবেলাটায়।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতেই দেখেন, নিতাইয়ের তাসের আড্ডা নেই। নিতাই একা শুকনে মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

পশুপতি কাছে যেতেই নিতাই কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "গায়ের জোর থাকলেই কি গুণ্ডা করতে হবে ভাই?"

পশুপতি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

নিতাই বলল, "না হয় তাসের আড্ডায় একটু গোলমাল হয়েই ছিল। তাস নিয়ে বসে ওরকম হয়, তা বলে লাঠিসোঁটা নিয়ে ভদ্দরলোকের ছেলেদের ওপর চড়াও হওয়াটা কি ঠিক তাস খেলা তুমি যে পছন্দ করো না, এটা আমাকে বলে দিলেই তো হত।"

পশুপতি মাথা চুলকোতে লাগলেন।

নিতাই ধরা গলায় বলল, "আমি অফিস থেকে এসে শুনি, তাসুড়েরা সব বসে ছিল আসর জমিয়ে আর হঠাৎ নাকি তুমি একেবারে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দেওয়ায় তারা সব পিঠ বাঁচাতে সরে পড়ে। আর তা ছাড়া শিবুর কান ওভাবে মলাও তোমার ঠিক হয়নি। আমার সেজো ছেলে দুষ্টু ঠিকই, কিন্তু সেও তোমার ছেলের সঙ্গেই ভাই কানটা শুধু ছিঁড়ে নিতে বাকি রেখেছে, ক্যানেস্তারা বাজানো তুমি যে পছন্দ করো না তা তো আর বেচারা জানত না।"

পশুপতি খুবই অবাক হলেন এবং ভাবতে লাগলেন।

একটু রাতের দিকে পশুপতি রান্না করতে বসে হঠাৎ শুনতে পেলেন, ওপরে একটা তুমুল চেঁচামেচি আর দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে। কে একজন চেঁচাল, "বাবা রে, মেরে ফেললে।" আর একজন বলে উঠল, "এসব ঠিক কাজ হচ্ছে?" আর একজন, "ও কী, পড়ে যাব যে খাট থেকে!" আর একজন, "আমার বিনুনিটা যে কেটে দিল, ও মা!" সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দৌড়ে নামতে নামতে বলল, "ছেড়ে দাও ভাই, মাপ করে দাও ভাই, ঘাট হয়েছে। কালই সকালবেলায় তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আর জীবনে এমুখো হব না।"

পশুপতি ভাবতে-ভাবতেই খেলেন, ঘুমোলেন।

সকালবেলা উঠে দেখলেন, বাড়ি ফাঁকা, নিতাই কাকভোরেই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছে।

পশুপতি অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে যদিও তিনি কোনও কূলকিনারা করতে পারছিলেন না, তবু ব্যায়াম করতে করতে তিনি মাঝে-মাঝে ফিক ফিক করে হেসে ফেলছিলেন।
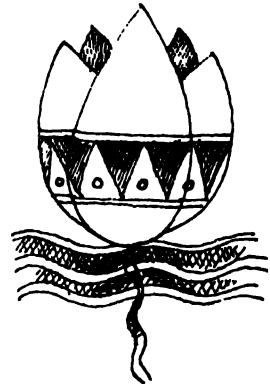
সেই বইটা

অজেয় রায়

বইটা প্রথমে দেখে ফেলেন পিন্টুর মাস্টারমশাই। পিন্টুকে গোটা-বারো অঙ্ক কষতে দিয়ে মাস্টারমশাই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একটু চোখ বুজে ঝিমিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল, ছাত্রটি যেন বড় বেশী চুপচাপ। অনেক কষ্টে চোখের পাতা দুটো আধখোলা করে চেয়ে দেখলেন, পিন্টু চোখ গোল গোল করে অঙ্কের বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে কী যেন পড়ছে।

অ্যাঁ, অঙ্ক পড়ছে! মাস্টারমশাইয়ের সন্দেহ হল।

হাঁক ছাড়লেন, "পিন্টু, বইটা দেখি।"

পিন্টু চমকে উঠল। তার হাত থেকে পেনসিলটা ছিটকে পড়ল মেঝেয়। তারপর সে তাড়াহুড়োয় অঙ্কের বইয়ের বদলে মাস্টারমশাইয়ের সামনে এগিয়ে দিল 'সেই বইটা'।

বইটা হাতে পাওয়া মাত্র ঝট করে মাস্টারমশাইয়ের ঘুম কেটে গেল। চটি একখানা বই। মলাটের ওপর ছোরা হাতে মুখোশ পরা একটা বিদঘুটে লোকের ছবি। বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা—'জীবন্ত মৃত্যু'।

ধাঁ করে বাঁ হাত বাড়িয়ে, পিন্টুর কান পাকড়ে কাছে টেনে এনে, ডান হাতে গোটা চারেক জ্বালাময়ী গাঁট্টা লাগিয়ে, মাস্টারমশাই চোখ রাঙিয়ে বললেন, "বটে, এই বুঝি অঙ্ক হচ্ছে? গতবারের রেজাল্ট কি ভুলে গেছ? কাল রোববারে একটা বাংলা রচনা, পঁচিশটা অঙ্ক আর একপাতা ইংরিজী ট্রানস্লেশন যদি না-করে রাখ তা সোমবার তোমার কপালে দুঃখু আছে বলে রাখছি।"

এই বলে তখনকার মতো অঙ্কগুলো শেষ করার আদেশ দিয়ে তিনি বইটা খুলে উল্টোতে লাগলেন।

"ইস, এই রকম যাচ্ছেতাই বই আজকালকার ছেলেরা কেন যে পড়ে!" বলতে বলতে,

মাস্টারমশাই বইয়ের প্রথম পাতাটা পড়তে শুরু করলেন। ক্রমশ তিনি খাড়া হয়ে বসলেন, তারপর ঝুঁকে পড়ে পড়তে লাগলেন। পিন্টু বার দুই অঙ্ক জিজ্ঞেস করে কড়া ধমক খেয়ে চুপ মেরে গেল। ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বই শেষ করে তবে তিনি উঠলেন। যাবার সময় পিন্টুর মায়ের হাতে বইখানা দিয়ে বললেন, "স্টুডেন্ট লাইফে এই সব আজেবাজে ডিটেকটিভ বই পড়া মোটেই উচিত নয়।" অতঃপর পিন্টুকে তার হোমটাস্কের কথা আরেক দফা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

পিন্টুর মা তো বিরাট হই-চই জুড়ে দিলেন বই নিয়ে। "কোথা থেকে আনা হয়েছে এ বই? বল্ শিগগিরি।"

পিন্টু জবাব দেয়, "খুকু এনেছে।"

"অ্যাঁ, খুকু! এই সব বই আনছে! কোথায় খুকু?"

খুকু কাছেই ছিল। মাত্র কয়েক পাতা পড়ার পর ছোড়দা জোর করে বইটা কেড়ে নেওয়ায় বেচারা খুবই চটে ছিল। কিন্তু নালিশের উপায় ছিল না। তাই আপাতত পিন্টুর বেকায়দা অবস্থা দরজার আড়াল থেকে দেখে বেজায় মজা পাচ্ছিল। মায়ের ডাকে ভয়ে-ভয়ে বেরিয়ে এসে জানাল, "ওপরের গুদোমঘরে পেয়েছি। আমি কিন্তু পড়িনি। ছোড়দা নিয়ে নিল।"

মা বললেন, "হুঁ, নিশ্চয় বাবলু এনেছিল।"

বাবলু পিন্টুর মাসতুতো দাদা। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এ-বাড়িতে এসে মাস খানেক ছিল। সে যত রাজ্যের গল্পের বই এনে গিলত। পিন্টু এবং খুকুরও সেই সব বই পড়ার ঝোঁক চাপায় দুই ভাইবোন খুব বকুনি খায়। বাবলু তারপর থেকে বই লুকিয়ে রাখত। গুদামঘরে আছে গাদা গাদা পুরনো পত্রিকা, খালি টিনের কৌটো, শিশি বোতল ইত্যাদি জিনিস। খুকু তার পুতুলের কাপড় রাখার জন্যে একটা পছন্দসই বাক্সের সন্ধানে ওই ঘরে ঢুকে বইখানা আবিষ্কার করে।

"রোস, উনি আজ আপিস থেকে আসুন। তোমাদের একচোট হবে। লুকিয়ে-লুকিয়ে ডিটেকটিব পড়া হচ্ছে!" মা তর্জন করতে থাকেন।

পিন্টুর বড়দা কলেজ থেকে ফিরে, খেয়ে দেয়ে ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বইয়ের ব্যাপার কানে যেতে এসে বলল, "দেখি কী বই? ইস, এইসব রাবিশ পড়ার জন্যেই তোদের জেনারেল নলেজ এত পুওর।" এই বলে সে বইটা মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

পিন্টু মনে মনে গজরায়। ওঃ, উনি আবার জেনারেল নলেজ শেখাচ্ছেন। ইদিকে তো নিজে সেদিন, কোন এক দেশের রাজধানীর নাম বলতে না-পেরে, বাবার কাছে জেনারেল নলেজ নেই বলে বকুনি খেলে। আমি সব শুনেছি। দাঁড়াও না, তোমার ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের তার কাল সকালে দেখবে ইঁদুরে কেটে দিয়েছে।

পিন্টুর বড়দার সেদিন আর ক্লাবে খেলতে যাওয়া হল না। আগাপাশতলা চুটিয়ে পড়ে খাবার আগে মায়ের হাতে বইখানা সমর্পণ করল। সেই সঙ্গে বইটার এক প্রস্থ শ্রাদ্ধ করতেও কসুর করল না।

পরের দিন রবিবার সকালটা পিন্টুর যে কী-রকম বিশ্রী কাটল তা পিন্টুই জানে, আর জানে তার প্রিয় বন্ধু ভজা। "ছাত্রজীবনের কর্তব্য" রচনাটা লিখতে গিয়ে পিন্টু ইচ্ছে করেই ওই গুরুজনের প্রতি ভক্তি-টক্তির কথাগুলো স্রেফ বাদ দিয়ে দিল। উঃ, আর মাত্র দশ-বারো পাতা

বাকী ছিল। ডিটেকটিভ পঞ্চু তরফদারের সঙ্গে দস্যু "সবুজ শার্দুল"-এর শেষ সংগ্রাম ঘনিয়ে এসেছে। কী হবে কে জানে! পঞ্চু তরফদার কি পারবে জিততে? ক্ষোভে পিন্টুর নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। দেওয়াল-আলমারির ভিতরে রাখা বইটাকে সে বারবার অসহায় চোখে দেখে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মা পান চিবুতে-চিবুতে বইটা বের করলেন। একটার ওপর

আর-একটা বালিশ চাপিয়ে জুত করে শুয়ে খুকুকে এক ধমক দিলেন, "খবরদার বেরুবি না। দুপুরে ঘুমুতে হবে বলে রাখছি। দিনভোর টই-টই করে মেয়েব কী ছিরিই না হচ্চে।" তারপর তিনি বইখানা খুললেন।

খুকু বইটার দিকে একবার করুণ চোখে চেয়ে মটকা মেবে পড়ে রইল। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে বই শেষ করে, "ধ্যৎ, যত্ত সব আজগুবি কাণ্ড" বলে, মা বইটা খুকুর উল্টো দিকে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

খুকু সাবধানে উঠে বসল। হ্যাঁ, মা ঘুমিয়েছে। সে আ—স্তে হাত বাড়িয়ে বইখানা নিল এবং একটুও শব্দ না-করে পাতা উল্টিয়ে পড়তে লাগল।

প্রায় অর্ধেকটা পড়েছে, এমন সময় মা হঠাৎ পাশ ফিরলেন। ভয় পেয়ে খুকু টপ্ করে বই ঠিক জায়গায় রেখে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। মা বাবকতক এ-পাশ ও-পাশ করলেন। আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর খুকুকে ঠেলা দিয়ে বললেন, "এই, ওঠ। আর ঘুমায় না। দেখ তো পাঁচুর মা উনুনে আঁচ দিয়েছে কি না।"

খুকু দেখে এসে বলল, "হ্যাঁ, দিয়েছে।"

বইটা আলমারিতে তুলে রেখে মা চা বানাতে গেলেন।

রাত্তিরে সবাই খেতে বসেছে। সবাই চুপচাপ। হুস্‌হাস্ কচমচ শব্দ হচ্ছে। পিন্টুর মন তো আজ সারা দিনই খিচড়ে আছে। আর খুকু? সে যে কোন্‌টার পর কী খাচ্ছে তা ঠাওরই করতে পারছে না। সারা বিকেল তার মন 'মৃত্যু গুহা'র মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সেই যেখানে পঞ্চু

তরফদার নির্জন পাহাড়ে গুহার মধ্যে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। বাইরে একটা যমদূতের মতো দস্যু পাহারা দিচ্ছে। সবুজ শার্দূল গেছে বিখ্যাত রক্ত-হীরা চুরি করতে। যাবার সময় সে হুঙ্কার দিয়ে শাসিয়ে গেছে, ফিরে এসে তার বিচার করবে। সবুজ শার্দূলের পিছনে লাগার ফল টিকটিকি পঞ্চু তরফদারকে এবার হাতে-নাতে ভোগ করতে হবে। নিষ্ঠুর দস্যু-সর্দার সবুজ শার্দূলের বিচার মানে তো ভয়ঙ্কর মৃত্যুদণ্ড। আর থাকতে না পেরে খুকু পিণ্টুর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, "আচ্ছা ছোড়দা, পঞ্চু তরফদার কি মৃত্যু-গুহা থেকে রক্ষা পাবে?"

কথাটায় পিণ্টুর কাটা ঘায়ে যেন নুন পড়ল। খুকুকে এক কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলে উঠল একটু জোরেই "জানি না।"

বাবা চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন। মায়ের কানেও কথাগুলো গিয়েছিল। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "ফের সেই বই নিয়ে আরম্ভ করেছ। দেখ, কোত্থেকে এক রদ্দি ডিটেকটিভ বই জুটিয়েছে, তাই নিয়ে দুই ভাই-বোনের আর নাওয়া খাওয়া নেই। আহা, কী আমার বই রে। কেবল পাতায়-পাতায় খুন আর ঘুঁষোঘুঁষি। আর নামের কী ঘটা—জীবন্ত মৃত্যু।"

বাবা কড়া গলায় বললেন, "পিণ্টু, তোমার আগের বারের অঙ্কের রেজাল্ট মনে আছে তো? বেশ, বই পড়তে হলে ভাল বই পড়। জীবনী, জাতকের গল্প, ভ্রমণকাহিনী। না, কেবল বাজে বই পড়ে সময় নষ্ট! কোথায় রেখেছ বইটা?"

মা বললেন, "আলমারিতে তুলে রেখেছি। ওদের বারণ করে দিয়েছি, খবরদার, কেউ ছোঁবে না।"

"হুম্।" বাবা গম্ভীর মুখে খেতে লাগলেন।

রাত্তিরে অন্ধকার ঘরে শুয়ে খুকুর আর ঘুম আসছে না। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। বাড়ির সবাই তার শত্রু। মা এখনও শুতে আসেনি। একা-একা শুয়ে তার মন অভিমানে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে খসখস আওয়াজ। একটা ছায়ামূর্তি মশারির পাশ দিয়ে আলমারির কাছে এগিয়ে গেল। কে? মা? কিন্তু মা তো এত লম্বা নয়। তক্ষুনি খুকুর মনে পড়ে গেল দস্যু 'সবুজ শার্দূল'-এর বর্ণনা। দীর্ঘদেহী, ছায়ামূর্তি, নিঃশব্দচরণ। নিশ্চয় এ কোনো দস্যু। একবার খুকু চেঁচিয়ে ডাকতে চেষ্টা করল বাবাকে। কিন্তু গলা কাঠ, আওয়াজ বেরুল না। এদিকে সে বুঝতে পারল, ছায়ামূর্তি আলমারি খুলল। কী সব খুটখাট শব্দ। নির্ঘাত ও মায়ের নতুন সোনার হারটা নিচ্ছে। মা বিকেলে ওই হার পরে পাশের বাড়িতে বিনি-মাসীর কাছে বেড়াতে গেছিল। ফিরে এসে আলমারিতে রেখেছে। লোকটা এবার দরজার দিকে ফিরে চলল। ও দরজার বাইরে গেলেই খুকু চেঁচাবে ঠিক করেছে। দরজার পরদার বাইরে বারান্দার আলো দেখা যাচ্ছে। ছায়ামূর্তি পর্দা সরিয়ে বারান্দায় পা দিল। এক ঝলক আলো পড়ল তার গায়ে।

একী! এ যে বাবা! আর তাঁর হাতে সেই বইটা!!

খুকুর আর চিৎকার করা হল না।
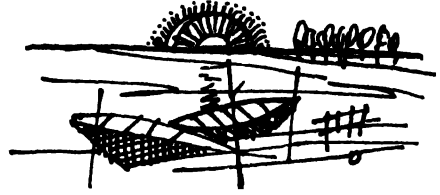
বাবার সাথে যাওয়া

সৈয়দ শামসুল হক

এত সুন্দর দোতলা বাড়ি তার চাচার, আনুর বিশ্বাসই হতে চায় না। আর কি চওড়া তকতকে সিঁড়ি! সারাদিন দৌড়ে দৌড়ে উঠেও ক্লান্তি হয় না আনুর। চাচাতো ভাই মনির তার বয়সী, তার সঙ্গে ভাব হয়ে যায় এক মিনিটে। মনিরের সঙ্গে ছাদে উঠে সে ঘুরে ঘুরে শহর দেখে।

বাবার সঙ্গে আনু বেড়াতে এসেছে তার চাচার বাড়িতে, সিরাজগঞ্জ। তার আপন চাচা নয় বাবার চাচাতো ভাই। বাবা নাকি ছোটবেলায় মানুষ হয়েছে এই চাচার মায়ের কাছে।

এসব কিছুই জানত না আনু। জলেশ্বরী থেকে রওনা দেবার কদিন আগে শুনেছে। কদিন থেকেই মা বাবাকে বারবার বলছিলেন এখানে আসতে। বলছিলেন, যাও না একবার ছোট মিয়ার কাছে। হাজার হোক নিজের মানুষ, তার কাছে শরম কিসের?

বাবা প্রতিবাদ করেন, শরমের কথা না। সে বড়লোক মানুষ, আমি কোনদিনই তার সাথে বেশি ওঠ-বোস রাখিনি। পছন্দই করিনি এসব। আজ কোন্ মুখে যাই। আর গেলেই বা কি ভাববে বল?

সন্ধ্যায় বাতি জ্বেলে আনু পড়ছিল। বারান্দায় বসে গলা নিচু করে আলাপ করছিলেন বাবা আর মা। বাবা নামাজ পড়ে জলচৌকি থেকে আর ওঠেননি। মা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আনু উৎকর্ণ হয়ে ওঠে তাঁদের চাপা গলায় আলোচনা শুনে।

ভাবাভাবি আর কি? মেয়েগুলো কত বড় হল একেকজন? তুমি তো বাসায় থাক না, থাকি আমি। জ্বালা হয়েছে আমার।

মার গলা বুঝি ধরে এসেছিল। বাবা বিব্রত হয়ে বললেন, আহা, সে তো বুঝলাম।

অনেকক্ষণ পরে মা বলেন, আনুকে নিয়ে তুমি একবার সিরাজগঞ্জে যাও। ভিক্ষে তো আর আমরা চাই না। আস্তে আস্তে শোধ করে দেব, বলবে।

আচ্ছা, দেখি।

বাবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যায়। অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। আনু বুঝতে পারে বাবা দরুদ পড়তে সুরু করেছেন।

পড়ায় আর মন বসে না আনুর। জোর করে সে তাকিয়ে থাকে বইয়ের পাতার দিকে। অক্ষরগুলো যেন তার চোখ পোড়াতে থাকে। চোখে পানি এসে যায় তার। সে সচকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। থানার বড় দারোগা তার বাবা। একটু পরে থানায় চলে যান তিনি।

ছোট দারোগার বউয়ের কথা মনে পড়ে যায় আনুর। সেদিন বেড়াতে এসেছিলেন। সারা গা গয়নায় মোড়া, মুখে পাউডার, ঠোঁটে পানের পাতলা লাল রং, পায়ে হিলতোলা সোনালী স্যান্ডেল। আনু উঠোনে গাঁদা ফুলের গাছগুলো বাঁশের চিকন বাতা দিয়ে ঘিরে দিচ্ছিল তখন।

বারান্দায় বসে মার সঙ্গে গাল ঠেসে ঠেসে পান খেলেন ছোট দারোগার বউ। বললেন, বুবু, একটা কথা কই। মেয়েদের বিয়ে দেন নাই যে, শেষে মুখে না কালি দেয়।

শুনে অপ্রতিভ হয়ে যান মা। আম্‌তা আম্‌তা করেন। কিছুই বলতে পারেন না। আনু তখন ভারী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কি একটা ছুতো খুঁজে সে বেরিয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, এ কথা শোনা তার ঠিক হচ্ছে না। ভীষণ রাগ হয় ছোট দারোগার বউয়ের ওপর। তার এত মাথা ব্যথা কেন? সে বুঝতে পারে না বড় আপা মেজ আপা এদের বিয়ে দেবার জন্য সবাই এত ভাবনা করে কেন? এমন কি তার বাবা-মাও বাদ যান না। তবু তাদের কথা শুনে খারাপ লাগে না আনুর, যতটা খারাপ লাগল ছোট দারোগার বউয়ের কথা শুনে।

মনটা কালো হয়ে যায় আনুর। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতের বাতাটা দিয়ে ঝোপঝাড়গুলো পেটাতে থাকে। কচি কচি বুনো গাছগুলো ভেঙে গিয়ে ঝাঁঝালো একটা গন্ধ উঠতে থাকে। গন্ধটা ভারী ভাল লাগে আনুর। সে আরো পেটাতে থাকে। নেশার মতো তাকে পেয়ে বসে গন্ধটা।

থানার সিপাই ইয়াসিন কোথা থেকে এসে বলে, খোকাবাবু, হুঁশিয়ার থাকবেন, এই সব জঙ্গলে সাপ ভি থাকতে পারে।

আরে বাপ্।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় আনুর খ্যাপা হাতটা। মুখে বলে, যাঃ।

কিন্তু চোখ তার সন্ধানী আলোর মতো দ্রুত ঘুরতে থাকে, কি জানি, সত্যি সত্যি যদি সাপ-টাপ বেরিয়ে পড়ে।

একটু পরেই আনু দেখতে পায় ছোট দারোগার বউ বেরিয়ে গেলেন তাদের বাসা থেকে। তার মুখটা গম্ভীর, আঁধার। অবাক হয়ে যায় আনু। একটু আগেই তো কি ডগমগে দেখাচ্ছিল বউটার মুখ।

ইয়াসিন বলে, কি খোকাবাবু। কুস্তি শিখলেন নাই?

ভুলেই গিয়েছিল আনু। সোৎসাহে সে বলে ওঠে, হ্যাঁ, শিখব। কালকে। কাল তুমি ভোরে আমাকে ডেকে নিয়ে যেও ইয়াসিন।

রাতে রান্নার ছিল দেরী। আপাদের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল আনু। ঘুম নয়, জাগরণ আর তন্দ্রা মেশানো একটা কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল আনু। এমন সময় ভারী মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আর নরম একটা স্পর্শে সে আবিষ্ট হয়ে যায়। চোখ খুলে দেখে, বড়আপা তার পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তার পায়ের কাছে সেজআপা বালিশে ওয়াড় পরাচ্ছেন। চোখ বুঁজে পড়ে থাকে আনু। তার এত ভাল লাগে, মনে হয় শূন্যে মেঘের ভেতরে ভেসে আছে সে। ভেসে ভেসে কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলে যাচ্ছে। তার কান্না পায়। বড়আপা, মেজআপা কত ভালো।

কিন্তু সবাই মুখ আঁধার করে থাকে, ফিসফিস করে কথা বলে। আনু ছাড়া কেউ ভালবাসে না তাদের। আনু সারা জীবন এ ভাবে শুয়ে থাকতে পারে। কোথাও যাবে না সে, কিচ্ছু করবে না।

মেজআপা তার পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বলেন, ভাত খাবি না?

উ। না। খাব না।

মেজআপা তখন তাকে আদর করতে থাকেন খুব।

ওঠ না মনি, তোকে আজ একটা সুন্দর গল্প বলব। ওঠ ভাত খেতে খেতে বলব।

আদরটা এত মিষ্টি লাগছিল। আনু ইচ্ছে করেই জেদ করে, অনেকক্ষণ ধরে করে। বড়আপা তাকে কাঁধ ধরে উঠিয়ে দেন। বলেন, বাব্বাঃ কি ভার হয়েছিস তুই আনু! আমি তুলতেই পারি না।

সে রাতে মেজআপা ভাত মেখে দিল, ডিমের মতো মুঠো পাকিয়ে দিল, মুখে তুলে দিল, তবে খেল আনু।

রাতে শুয়ে শুয়ে আনু ভাবে তার চাচার কথা যাকে সে কখনো দেখেনি। সন্ধ্যের সময় বাবা

তার মা-র কথাগুলো, মা তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে বলছিলেন, সেই সব ঘুরে ঘুরে ধূসর প্রজাপতির মতো মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। ও পাশের চৌকিতে বাবা শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাবার জন্যে ভারী মায়া করে আনুর। বালিশে মুখ গুঁজে সে পড়ে থাকে।

অন্যদিন হলে কোথাও যাবার নাম শুনে লাফিয়ে উঠত আনু। আজ তার কি হয়েছে, বুকের মধ্যে কেমন টিপ্ টিপ্ করছে, এখান থেকে, এ বাসা থেকে, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না তার। বড় আপার ফর্সা চেহারাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মাথায় একটা ছোট্ট টিপ। চিবুকের কাছে একটুখানি ভাঁজ। আনু আয়নায় দেখেছে তার চিবুকেও ওরকম ভাঁজ আছে। তার মায়েরও আছে। বড় আপা যখন হাসেন ভাঁজটা ছড়িয়ে যায়, কি সুন্দর লাগে! ইয়াসিনের কাছে কাল থেকে সে কুস্তি শিখবে। পিন্টু যদি তাকে মারতে আসে, এবার এমন একটা পট্কান দেবে তাকে যে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে শয়তানটা।

বাবার যদি অনেক টাকা থাকত, তাহলে ভাবনা ছিল না। আনু স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার বাবার টাকা নেই, মা তাই চাচার কাছে যেতে বলছেন। চাচার কাছ থেকে টাকা আনবে বাবা? চাচা বোধ হয় খুব রাগী। নইলে বাবা যেতে চাইলেন না কেন? মা অনেক করে বলতে তবে রাজী হলেন তিনি। আনু যেন বাবার সঙ্গে মিশে যায়। আনু বুঝতে পারে, বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। বাবার যেতে ইচ্ছে করছে না। আনু যদি একলাফে বড় হয়ে যেতে পারত, তো অনেক টাকা রোজগার করে ফেলত সে। তাহলে আর কোন ভাবনা থাকত না। আনু বারবার পাশ বদলাতে থাকে বিছানায়, কুণ্ডল পাকিয়ে শোয়, আবার পরক্ষণেই সোজা হয়।

বাবা ডাকেন, আনু, ও আনু।

তখন ঘোরটা কেটে যায় আনুর। বাবা পাশে এসে দাঁড়ান। মা ও ঘর থেকে বলেন, কি হল?

কিছু না, ছেলেটা কেমন কাতরাচ্ছে।

কপালে হাত দিয়ে দেখেন বাবা। না, জ্বর আসেনি। বাবা আবার ডাকেন, আনু, আনু রে।

আনু ঘুমজড়িত গলায় বলে, কি?

ও রকম করছিস কেন?

চুপ করে থাকে আনু।

আয় আমার সঙ্গে শুবি।

আনুকে প্রায় কোলে করে বাবা তার নিজের বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেন। বলেন,

খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস? ভয় কিরে, এই তো আমি এ ঘরেই আছি।

একটু একটু হাসেন বাবা। আনুর তখন ভীষণ ঘুম পায়। বাবার হাতটা ধরে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। একেবারে সেই ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গে তার। সালুআপা বলে, আনু আজ তোকে নিয়ে বাবা সিরাজগঞ্জে যাবে, চাচার কাছে।

আজ?

আনুর যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। বিছানা ছেড়ে ওঠে না। সালুআপা তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলে, আমি মিথ্যে বলছি? যা মাকে জিজ্ঞেস কর। আমার বয়েই গেছে।

গট্ গট্ করে বেরিয়ে যায় সালুআপা। তখন যেন বিশ্বাস হয় আনুর।

সেই আসা। আসবার উত্তেজনায় আনু ভুলেই গিয়েছিল বাবা কেন চাচার ওখানে যাচ্ছেন, বাবা যেতে চাননি, তার যেতে ইচ্ছে করেনি।

সিরাজগঞ্জ বাজারে এসে ট্রেন থামল। নামল ওরা। মা এক বোয়ম মোরব্বা বানিয়ে দিয়েছিলেন চাচাদের জন্যে, আনুর হাতে সেটা। বাবা বললেন, সাবধানে আনু। বাড়ির কাছে

এসে দেখিস ভাঙ্গে না যেন।

আত্মীয়-স্বজন বলতে কাউকে চেনে না আনু। বাবা কোনদিন কারো কথা বলেন না। এ চাচা যে এতদিন কোথায় ছিলেন কে জানে! এই সেদিন আনু প্রথম শুনল, তার এক চাচা আছেন, বাবার চাচাতো ভাই। বাবার কোন আপন ভাই নেই। একজন ছিল, বসন্তে মারা গেছে সেই ছোটবেলায়। বাবা তাকে নিয়ে যখন ছেলেবেলায় স্কুলে যেতেন, বাবা একবার গল্প করেছিলেন, একটা খাল পড়ত, সেই খালটা ভাইকে কাঁধে করে পার হতেন। বাবা বলতেন, আমি দুঃখ কষ্ট করে একাই মানুষ হয়েছি। কেউ তো আর আমাকে দেখেনি। এখন আমার কি দরকার সেধে সেধে তাদের সাথে আত্মীয়তা করবার?

চাচার কাছেও আসতে চাননি বাবা। মা বারবার করে বলাতে এসেছেন। তাদের রিক্সাটা দু'পাশে লাইব্রেরী, স্টেশনারী, ওষুধের দোকান, ছাপাখানা, চায়ের স্টল পেরিয়ে চলেছে। সকালবেলা বড় বড় মাছ উঠেছে বাজারে। বাজারের কাছে এসে রিক্সা থামাতে বলল বাবা। আনুকে বললেন, বস আমি আসছি।

পাঁচ মিনিট পরে বাবা একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ নিয়ে ফিরলেন। দড়ি দিয়ে তার কান্‌কোর ভেতরে ফোঁড় করে বাঁধা। কান্‌কো দেখাচ্ছে লাল টকটকে। আনু অবাক হয়ে যায়। বাবা বলেন, কারো বাড়িতে খালি হাতে যেতে নেই। মাছটা বেশ বড় না?

হ্যাঁ।

রিক্সা আবার চলতে লাগল। বাবাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আনু চুপ করে দুধারের অচেনা বাড়িঘর দেখতে থাকে। একটা উঁচু ব্রীজের নিচে এসে পৌঁছুল ওরা। ব্রীজটার ওপরে রিক্সা টেনে টেনে পার করতে হবে। বাবা নেমে গেলেন। আনু রইল রিকসায়। বাবা পাশে পাশে হেঁটে এলেন। তারপর ও মাথায় গিয়ে আবার রিকসায় উঠে বসলেন তিনি। এই ব্রীজটার নাম এলিয়ট ব্রীজ। এইটুকু হেঁটেই যেন হাঁফিয়ে গেছেন বাবা। মুখ ঘামে ভিজে গেছে। চকচক করছে তাঁর সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি। বাবা দু হাতে মুখ মুছলেন অনেকক্ষণ ধরে।

বাসায় এসে চাচাকে পাওয়া গেল না। চাচা ঢাকায় গেছেন কাজে, কাল ফিরবেন। চাচী বিরাট ঘোমটা টেনে বাবার সামনে এসে সালাম করতে গেলেন, বাবা বললেন, থাক, থাক।

মনির এক লাফে কোথা থেকে এসে মোরব্বার বোয়মটা কেড়ে নিয়ে গেল আনুর হাত থেকে। বাবা হেসে বললেন, ও তোর ভাই। মনির।

সিঁড়ির পাশে ছোট্ট ঘরটায় থাকবার ব্যবস্থা হল তাদের। আনুর ভারী ইচ্ছে করছিল. দোতলায় যদি থাকতে পারত! দোতলায় কোনদিন থাকেনি সে। না জানি, কেমন ভাল লাগে দোতলায় ঘুমোতে। মনির থাকে দোতলায়।

ভারী ভাব হয়ে গেল মনিরের সঙ্গে। আনু তার সব বই উল্‌টে পাল্‌টে দেখল, সেও তার মতো ক্লাস ফোরে পড়ে। তার খেলার বন্দুকটা নিয়ে শিখে নিল কেমন করে ছুঁড়তে হয়। বলল. আমার বাবার সত্যিকার রাইফেল আছে, পিস্তল আছে। আমাকে গুলি মারতে শেখাবে বলেছে।

তারপর মনিরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল টাউন দেখতে। এলিয়ট ব্রীজের ওপর হেঁটে হেঁটে পার হতে ভারী মজা লাগল আনুর।

বিকেলে ফুটবল খেলতে নিয়ে গেল মনির। সেনবাবুদের মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলে। চরদিঘির রাজা নাকি সেনবাবু। এখন কলকাতায় চলে গেছে। বিরাট বাড়িটা, মাঠটা, পুকুরটা পড়ে আছে।

কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ভুতুড়ে বাড়ির মতো। ছেলেরা তাকে দেখে ঘিরে দাঁড়াল।সেতো নতুন,

তার কেমন লজ্জা করতে লাগল তখন। ফুটবলের মাঠে একটা বলও সে কিক করতে পারল না। বল তার সামনে দিয়ে চলে যায়, ভাবে ওরাই কেউ কিক্‌ করুক, আনুর সংকোচ আর কাটে না। মনির দমাদম দুটো গোল করে। তারপর খেলা শেষে সবাই একসঙ্গে চিৎ হয়ে শুয়ে গল্প করতে থাকে। আনু পাশে বসে ঘাস ছেঁড়ে একটা একটা করে। ওদের একটা কথাও সে বুঝতে পারে না। কাকে যেন জব্দ করবে সেই বুদ্ধি আঁটছে ওরা। কাল স্কুলে গেলে যে ছেলেটা জব্দ হবে তার কথা ভেবে আনুর বড় মায়া করে। রাতে বাবার পাশে শুয়ে আর ঘুম আসে না। অচেনা সব শব্দ উঠতে থাকে দূর দূরান্তর থেকে, অন্ধকারের ভেতর শেয়াল ডাকে, ঝি ঝি পা ঘষে ঘষে কান অবশ করে ফেলে, কোথায় কে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়, সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দ নামে ওঠে, আবার নামে; মা-বড়আপা-মেজআপা-সালুআপা-ছোটআপা-মিনুআপা কি করছে এখন! এখন ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। না, গল্প করছে। আনুর কথা বলছে। কদিন আগে বাবা একটা কলেজ-পড়া ছেলেকে জায়গীর রেখেছেন—সেই মাস্টার সাহেব বোধহয় ল্যাম্প জ্বেলে মোটা মোটা বই পড়ছেন। মাস্টার সাহেবের জন্য ভাত-ঢাকা দেয়া থাকে, অনেক রাতে খান। আনুকে একটা ছবির বই এনে দিয়েছিলেন মাস্টার সাহেব। আবার একসঙ্গে অনেকগুলো শেয়াল ডেকে ওঠে। তন্দ্রার ভেতর থেকে চমকে ওঠে আনু। এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর তলিয়ে যায় ঘুমে।

চাচা ভোরবেলায় এসে পৌঁছুলেন। বাবাকে দেখে ভারী খুশি হলেন তিনি। না, আনু যেমন ভেবেছিল, খুব রাগী হবেন চাচা, তেমন একটুও না। গোলগাল মুখ, ফর্সা, ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরনে আর লাল পাম্পশু পায়ে, হাতে মস্ত বড় একটা আংটি। ট্রেন থেকে নেমে এসে আর কাপড় বদলালেন না, হাত-মুখ ধুলেন না, বাবার সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করতে লেগে গেলেন। এই কি আনু? শোন বাবা, দেখি, দেখি।

আনু এসে সামনে দাঁড়াল। বাবা বললেন, সালাম কর।

করল সে। চাচা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ভারী সুন্দর হয়েছে। বাপের মতো বড় হওয়া চাই, বুঝলে আনু? খালি সুন্দর চেহারায় কিছু হয় না।

লাল হয়ে যায় আনু। বাবা বলেন, আমি আর কি? আমার চেয়েও বড় হোক সেই দোয়াই কবি। পুলিশের চাকুরী আবার চাকুরী? লোকে মনে করে পয়সাই পয়সা। দারোগারা লাল হয়ে গেল। এদিকে খবর নিয়ে দেখ, আমার একদিক দেখতে আরেকদিক কানা হয়ে যায়।

এইরকম আক্ষেপ করে চলেন বাবা। একা একা। চাচা চুপ করে শোনেন। পরে বলেন, কি যে বলেন মিয়াভাই। আপনাদের অভাব? এইতো সেদিন সিরাজগঞ্জে এক বাচ্চা দারোগা এল, তার—।

তাঁকে শেষ করতে দিলেন না বাবা। বাধা দিয়ে বললেন, সবাই কি আর একরকম? ধর্ম যদি পানিতে ফেলা যায়, তাহলে আলাদা কথা।

রাখেন আপনার ধর্ম! আপনি সেই পুরানো কালের ধ্যান নিয়ে আছেন। যুগ এখন অন্য রকম। এখন ও-সব চলে না।

প্রায় তর্ক লেগে যায় বাবা আর চাচার। ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে সরে আসে আনু বাবার মুখটা কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে একমুহূর্তে, চেনাই যাচ্ছে না আর। আর চাচার ফর্সা চেহারা লাল হয়ে গেছে উত্তেজনায়। আনু চুপ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। নামলে রান্নাঘর দেখা যায়। দু'জন কাজের মেয়ে রান্নার জোগাড় করছে। চাচী একটা মোড়ায় বসে পাখা হাতে তদারক করছেন। আনুকে দেখে ডাকলেন তিনি। বললেন, এই ছেলে, শোন।

কাছে এল আনু। আনুর খুব খারাপ লাগল তখন। তার মা আর বড়আপা রোজ নিজহাতে রান্না করেন। গরমে, কালিতে, ধোঁয়ায় কি বিচ্ছিরি দেখায় তাদের। এরকম কাজের মেয়ে যদি থাকত, তাহলে আর কষ্ট হত না। চাচীকে কি সুন্দর ছিমছাম দেখাচ্ছে। সে মাকে বলবে।

চাচী তাকে কাছে ডেকে তার মায়ের তার বোনদের গল্প শুনতে লাগলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কত কথা। সে দেখতে কেমন, সে কত বড়, কোথা থেকে বিয়ের কথা আসছে। আনু তার অত কি জানে! সে ভাল করে কিছুই বলতে পারল না। বলতে ইচ্ছে করল না। আনু খুব বিব্রত বোধ করল, লজ্জা করল তার। সে তো জানে বাবা তার আপার বিয়ে দেবেন বলে টাকা চাইতে এসেছেন চাচার কাছে।

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে আবার আলাপ করলেন বাবা আর চাচা। ভাত খাবার পর। আনু দোতলায় মনিরের পড়ার টেবিলের পাশে বসে রইল। মনিরকে একটা ফুলের তোড়া এঁকে দিল আনু। মনির অবাক হয়ে আঁকাটা দেখল, তারপর আরও এঁকে দেবার জন্য বায়না ধরল। তখন পাতা, লাটিম, কলম এঁকে দিল আনু। সবশেষে একটা ছবি আঁকল সে—একটা বাড়ি, পাশে নদী বয়ে যাচ্ছে, তালগাছ কাৎ হয়ে পড়েছে, আকাশে মেঘ, মেঘের মধ্যে সূর্য। বলল, রং নেই তোর?

না।

রং থাকলে কি সুন্দর রং করে দিতাম।

না হোক। এমনিই ভাল।

মনিরের একটা মজার খেলা ছিল। চোঙ্-এর মধ্যে ভাঙা চুড়ির অনেকগুলো টুকরো আর ঘষা কাঁচ বসানো। একদিকে চোখ রেখে রেখে আস্তে আস্তে চোঙটা ঘোরালে নতুন নতুন নক্শা তৈরি হয়। এমন অদ্ভুত খেলা জীবনে দেখে নাই আনু। সেইটে অবলীলাক্রমে মনির দিয়ে দিল তাকে।

ঠক ঠক করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন চাচা। তাকে ভারী গম্ভীর দেখাচ্ছে। আনু ভয় পেয়ে খেলাটা মনিরকে ফিরিয়ে দিল, বলল, কাল নেব ভাই।

তারপর নেমে এল নিচে। এসে দেখে বাবা এশার নামাজ পড়তে বসেছেন। চোখ বোজা ঘরে আলোটা ছোট করে রাখা। নিবিড় একটা ছায়ার মতো মনে হচ্ছে বাবাকে। নিঃশব্দে আনু গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

পরদিন সকালে ফিরে যেতে চাইলেন বাবা। চাচা বললেন আরও একদিন থেকে যেতে। আরও একদিন থেকে গেলেন ওরা। তারপর দুপুর এগারটার গাড়িতে উঠল।

গাড়িতে উঠে আনু জিজ্ঞেস করল, টাকা দেয়নি বাবা?

বাবা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন।

তুই শুনলি কোত্থেকে?

আনু চোখ নামিয়ে নিল। থতমত খেয়ে গেল সে। তার জিজ্ঞেস করাই উচিত হয়নি। বাবা টের পেয়ে গেলেন, সন্ধ্যেয় মা-র সঙ্গে বাবার কথাগুলো সব সে শুনেছে।

বাবা কিছু বললেন না আর। তার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি। আনুর মনে হল, সে মাটিতে মিশে যায়। বাবাকে ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। আনুর মনে হল, আনু বুঝতে পারল, টাকা দেয়নি চাচা। বাবার মুখের দিকে আর তাকাতে সাহস পেল না সে। ট্রেন ছুটে চলেছে চাকায় চাকায় ছড়া কাটতে কাটতে। আনু সেইটে কান পেতে শুনতে লাগল—ঢাকা যাব, টাকা পাব—ঢাকা যাব, টাকা পাব।
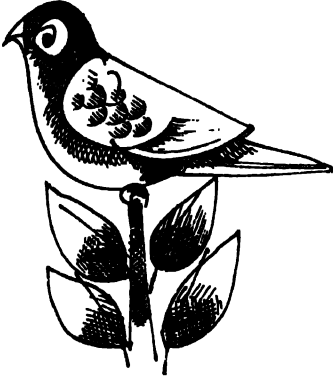
ময়ূর মুখীর নিশান

রাবেয়া খাতুন

পিপুল পাতা তুলতে এসেছে নিশান। সকাল থেকে গাঙ্গে আজ নলা মাছ গাবিয়েছে। ঘরের কাজ, মাঠের কাজ ফেলে, কমিয়ে যে যতোটা পেরেছে মাছ ধরেছে।

নিশান এক কোচরের বেশী ধরতে পারেনি। বাবা গেছে ধলাখালীর হাটে। নইলে চান্দারী ভরে যেতো। তে-কোন জাল আর কোচ দিয়ে বাবা এতো অতো মাছ ধরতে পারে। মা বাসন ভর্তি করে ভাজে। গুনা তারে গেঁথে সুটকি দেয়।

আজ শুধু চড়চড়ি। পিপুল পাতা দিয়ে। ঝাল ঝাল করে। বাবার খুব পছন্দ।

হাটবার বলে অন্য ভিটের চাচীদের সংগে সকাল সকাল গাংগ থেকে গোশল করে এসেছে মা। রোদে একটু রং ধরলো কি নদীতে ঢল নামলো ভিন গাঁয়ের নৌকার ধলাখালী হাট বারে এমনি হয়। বেজায় বড়ো হাট। সাত গ্রামের লোক ছোটে সকাল থেকে। যে যে দিক থেকেই আসুক যেতে আসতে ময়ূর মুখীর মোড় পেরুতেই হবে।

মা মাছ কুটতে বসেই নিশানকে বল্লো পিপুল পাতার কথা।

রতনদের ছাই গাদার পাশে লতানো জংগল। কাল্‌চে সবুজ, পান পা: গড়নের পাতা তুলতে তুলতে নিশান তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। ইস্ সূর্য যেনে মাথার ওপর থেকে গড়াবেনা আজ। সারা দিনের বেচা কেনা সেরে বাবার ফিরতে ফিরতে সন্ধে। কখন যে বেলা পড়বে?

এবারে আখের ফলন খুব ভালো হয়েছে। কোষা বোঝাই করে আখ নিয়ে গেছে বাবা। বলে গেছে, সামনে শীত, ছিট কাপড়ের রংগিন সার্ট নিয়ে আসবে ফেরার সময়। সেই সার্ট পরে এবার মাঘ মাসে সে যাবে নানীর বাড়ী ভেজানো রসের পিঠা খেতে।

কথাটা মাকে বলতে মা মিষ্টি হেসেছে। রোদ উঠেছে নারকেল গাছের মাথায়। দাওয়ায় একটি দিক এরই মধ্যে ভরে গেছে ধোঁয়া ধোঁয়া আঁধারে। পা ছড়িয়ে বসে মা পলতে পাকাচ্ছে বাতির জন্য। ঘরের পেছনে বাতাবী লেবুর ঝোঁপের তলায় দাদার কবর। মগরেবের আজানের

আগে আগে মা দুটো প্রদীপ জ্বালে। একটা থাকে ঘরে। আর একটা দাদার ওখানে।

তার আগে নিশানকে আর একটি কাজ করতে হয়। উত্তর ভিটের চাচীর দো-আখা থেকে পাট খড়িতে করে আগুন আনতে হয়। সে সময় চাচীও দু একটি কাজ দেয়। যেমন ছোটো খুকী বড়ো বিরক্ত করছে, ওকে একটু নিয়ে যা। কিংবা দুটো পেঁয়াজ দিয়ে যা তোর মার কাছ থেকে।

শেষ বেলায় খেয়ে রাতে খাবার গরজ সাধারণত থাকে না। এশার নামাজের পর পরই নীরব হয়ে আসে পাড়া। হাটের দিন একটু অন্য রকম। বাবা চাচারা না ফেরা অব্দি নিশানের বয়সী ছেলেমেয়েরা উঠোনে ছুটোছুটি করে। মা চাচীরা গোল হয়ে বসে। পুঁথি পড়া শোনে চাচী চাচার কাছে। বাচ্চারা ঘুমায়। ছাড়াবাড়ীর জংলা ভিটে থেকে ভেসে আসে শেয়ালের ডাক।

এরই কোনও সময় ঘাটে কোষা লাগার শব্দ শোনা যায়। মা লণ্ঠন হাতে পথ দেখাতে যায় পিছু পিছু আসে নিশানরা। হাটুরে বাবা চাচাদের পকেটে থাকে ঢাকা শহরের লবেনচুশ। সুবাসি বিস্কুট বা পাতলা কাগজে পেঁচানো, চাক চাক করে কাটা পাউরুটি।

আজ সন্ধের পর সময় যেনো থেমে রইলো। নবী দাদা তারা দেখে রাতের প্রহর বলতে পারেন। ঝড় তুফানের দিন বাতাস শুকে বলতে পারেন মওসুমী হাল। উঠোনে হাটাহাটি করছিলেন তিনি। এতো দেরী তো হবার কথা নয় হাঁটুরেদের।

নালার এক বাঁশের সাঁকো পার হয়ে এ সময় এলো জমির চাচা। বেচা কেনার কিছু ছিলোন বলে হাটে যায়নি। নিশানকে সামনে পেয়ে বল্লো, কিরে তর বাজানও ফিরে নাই। নিশান বললো, না। আইজ হাটে কি হইচে চাচা।

জমির চাচা বললো, কিছু বুঝবার পারতাছি না।

তিন ভিটের চাচীরা, মা, নবী দাদা ঘিরে দাঁড়ালো জমির চাচাকে।

সন্ধে থেকে জমির চাচা নদীর ধারে। একটি নৌকাও ফিরতে না দেখে অবাক হয়েছিলো গত কিছু দিন থেকে তো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিলো নানা রকম খারাপ খবর। মুক্তিযুদ্ধের হাট বাজারে গণ্ডোগোলের। মানুষ মারার।

ময়ূর মুখীর বাঁক ঘুরে ফিরতি নৌকো যাও কিছু গেছে, সেগুলো এতো জোরে চলে গেছে মনে হয়েছে পেছনে বাঘ ভালুক তাড়া করছে। একজন হাঁটুরে শুধু পাড় ঘেঁষে যাবার সময় চেঁচিয়ে বলে গেছিলো, ভাইরা সাবধান। বাতাস বড়ো গরম। ধলাখালীর হাটে দুষমুনগো জাহাজ লাগছে। মাইনষের খুনে ভাইসা গেছে জামিন। নাওগুলা ডুবছে উথাল পাথাল পদ্মার ঢেউয়ে হেরা ডুবাইছে ইচ্ছা কইরা। আপনেরা জান মালনিয়া সাবধান হনগো মিয়া ভাইওরা।

জমির চাচারা খবরটা পাড়ায় ঢুকতে দেয়নি। গাংগের পাড়ে থেকে আরও ফিরতি নৌকোর অপেক্ষা করেছে। অপেক্ষা করেছে আরও খবরের জন্য।

রাজধানী ঢাকা থেকে লঞ্চের লোকের মুখে মুখে কতো রকম খবরই তো আসছিলো খবরগুলো মিথ্যে নয় গ্রামের মানুষ একবার তার প্রমাণ পেয়েছিলো। সেই চৈত্র মাসে পিলপিল করে শহরের লোক ফিরছিলো গ্রামে। তাদের সংগে জিনিষপত্র ছিল না। ছিল শুধু ভয়।

শহুরে মানুষের পায়ে কাদা, এলোমেলো পোশাক, চোখ ভরা ক্লান্তি, এ যেনো ভাবাই যায় না। নিশান বরাবরই দেখেছে তারা যখনই গ্রামে আসে, কাপড় চোপর থাকে ঝকঝকে। ঘোর ফেরায় আমীর আমীর ভাব। সেই তাদের একি চেহারা। কতো জনম যেনো খায়নি। ঘুমোয়নি।

নিশানদের মতো কিশোররাই তখন ওদের দেখাশোনা করেছে। শুনেছে ভয়ংকর, অবিশ্বাস সব ঘটনা। দেশে যুদ্ধ লেগেছে। অবাঙালীরা এক রাতে কামান দেগে, বন্দুক ছুঁড়ে ঢাকা শহরকে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশে ওরা ছিল বাঙালীদের পড়শী সেজে। চেষ্টা করেছিল দেশী

মানুষের ভাষা, সাহস, সংস্কৃতি সব একসংগে কেড়ে নিতে। না পেরে ধ্বংস করে দিতে চাইছে পুরো জাতটাকে।

রাজধানী থেকে, জেলা শহর থেকে সব লোক পালাচ্ছে গ্রামের দিকে। ওরা নাকি নদীকে খুব ভয় করে। পাগড়ীর প্যাচের মতো নদী নালা পেরিয়ে গাও গঞ্জে কখনো আসবেনা।

নিশান ভেবেছিলো হবেও বা। বুড়ীগংগা সে কখনো দেখেনি। বাবার সংগে আরুল বিলের ওপারের হাটে গিয়ে ইছামতী ধলেশ্বরী দেখেছে। জমির চাচার সংগে ইল্‌শে মাছ ধরতে গিয়ে দেখেছে পদ্মা। বর্ষায় ওরা নাকি ভয়ংকর রূপ ধরে। এপারে ওপারে নজর চলে না। শুধু পানি

আর পানি। চার চারটা বড়ো নদীর পরও আছে খাল, বিল, নালা। উড়ে না এলে শয়তানেরও সাধ্য নেই চট করে গ্রামে চলে আসা।

শহর থেকে পালানো সেই মানুষেরা থাকেনি খুব বেশী দিন। ফিরে গেছিলো কিংবা সরে গেছিলো আর কোথাও।

ময়ূর মুখী গ্রামের লোক ভেবেছিলো তারা নিরাপদ। যুদ্ধের কোনও ধাক্কা তাদের জন্য আসবেনা। যুদ্ধের তারা কি জানে। বাপ দাদার আমল থেকে চাষ আবাদ নিয়ে আছে। লড়াই করার জন্য মানুষের মধ্যেই আলাদা একটি শ্রেণী আছে। দেশের জন্য, দশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য তারা যুদ্ধ করে, প্রাণ দেয়, জয়ী হয়।

ধারনা ভাঙলো শহরের মানুষের ফিরে যাবার মাস কয়েকের মধ্যে। গ্রামের উঠতি বয়সের যে ছেলেরা হাইস্কুলে পড়তো, বাজারে দোকানদারী করতো, কিংবা কাজ করতো ক্ষেত খামারে,

রাতারাতি তারা যেন কোথায় চলে গেল। নবী দাদার পুঁথির সেই রূপনগরীর মতো ছেলেরা সব বনে চলে গেছে চারমুখো দেওএর জন্য। ফিরে যখন এলো তখন তাদের ঘাড়ে তীর ধনুক। মুখে শপথ। দেওকে তারা বধ করবে।

ময়ূর মুখী থেকে যারা গেলো তারা যদিও ফিরলো না, কিন্তু রাতের ছায়ায় আপন শরীর মিশিয়ে গ্রামে এলো আর একদল ছেলে। বনের গভীরে তারা শিবির তৈরী করেছে।

মাঝেমাঝে তারা আসতো। গাঁয়ের মাতব্বর মেম্বরদের সংগে কথাবার্তা বলতো। চলে যেতো। একদিন তাদের একজনের সংগে দেখা হয়েছিলো। খালি গা। লুংগি পরা। কোমরে বাঁধা গামছা। নিশান বলেছিলো, আমারে লইবেন আপনেগো লগে।

সে হেসে বলেছিলো, তুমি কি করো খোকা।

নিশান বলেছিলো, আগে ইস্কুলে পড়তাম। অখন বাজানের লগে আউখ ক্ষ্যাতে কাম করি।

সে বলেছিলো, তাই করো।

নিশান অবাক গলায় প্রশ্ন করেছিলো, ক্যান ?

সে জবাব দিয়েছিলো, সবাই একসংগে যুদ্ধে এলে চলবে কি করে। আমরা ক্যাম্পে আটা রুটি আর আখের গুড় খাই। তুমি আমাদের জন্য গুড় তৈরী করো।

গাজী বাড়ির তালাগ ধরে, বাঁশ ঝাড়ের তলা দিয়ে চলে গেছিলো সে। কথাটা পছন্দ হয়নি নিশানের। সে ক্লাশ ফাইভে পড়ে। মুক্তি যুদ্ধে তার মতো কতো ছেলেই নাকি গেছে। সরাসরি বাবাকেই এক বিকেলে সে বললো মনের কথা। শুনে বাবা প্রথম দিকে জবাব দেয়নি। আবার বলতে একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে জবাব দিয়েছিলো, যুদ্ধে যাইবার চাও যাইবা। দরকার মনে করলে বাপ ব্যাটায় একলগে যামু। অখন একটু তামুক সাজো দেখিন বাজান।

সেই বাবা জান দিলো ধলাখালীর হাটে। লাশ এলো তিন দিন পর। শরীর ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। শুধু বাবা নয়, দক্ষিণ-ভিটির মামু, পূর্ব পাড়ার নুরুর ফুপা, দুনির বাবা, সবার এক অবস্থা। একসংগে অনেক লোক ছেড়ে গেলো গ্রামের মায়া।

লাশ এসেছিলো শেষ বেলায়। ঘরে ঘরে কান্না। উঠোনে উঠোনে কাফন দাফনের ব্যস্ততা। গ্রামের সব চেয়ে বুড়ো মানুষটিও একসংগে এতো লোকের মাতন দেখেনি। বোবা গাছপালার ডাল চুইয়ে চুইয়েও যেনো ঝরছিলো চোখের পানি।

পুরো গ্রাম বলতে গেলে জেগে রইলো সারা রাত। সকালে পিলে চমকানো এক খবর। কান্নাটান্না বন্ধ করো। এসব এখন বিলাপ। শিগগীর তৈরী হও অথবা পালাও। দুশমনদের সৈন্য ঘোরা ফেরা করছে আশপাশের গ্রামের কাছাকাছি।

গ্রামের সবাই যেনো কথা বলতে ভুলে গেলো। পালাবে কোথায় ? ধলাখালীর হাট হয়েছে গোরস্তান। বিলের ওপারের গাঁ-গুলোতে গেলো রাতে দেখা গেছে আগুন আর ধোঁয়া। তবু দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেলো কেউ কেউ। কেউ পিতল কাসার বাসন কোসন পুঁতে ফেললো মাটির তলায়। কেউ ধার দিতে লেগে গেলো দা, বটি, সাবল, সরকি।

নিশান তাকিয়ে আছে বেড়ার খাঁজে গোঁজা বাবার বড়ো গুলতিটার দিকে। বাবার সখ ছিলো শীতের সময় পাখী শিকারে যাওয়া। মাটির গুলির ঝোলা নিয়ে সে যেতো পিছু পিছু। মাথায় নতুন গামছা বেঁধে, কাছা মেরে লুংগি পরে বাবা বিলে নামতো। হাতের সই ছিলো দারুন। নিশানের কাঁধের ছালা ভরে যেতো বক, ঘুঘু, ডাহুক, বন পায়রায়। বাড়ী ফিরে সেগুলোর ছেড়া ছেলার কাজ বাবাই করতো। পরদিন সেসবের একটি বড়ো ভাগ নতুন মাটির হাঁড়িতে করে নিশান দিয়ে আসতো বুজীর বাড়ী। দুলাভাই শিকারের মাংস খেতে খুব ভালো বাসতেন।

নিশানের বুক থেকে উঠে আসে গরম নিঃশ্বাস। কি যে হলো দিনের হাল। দুলাভাইয়েরও কোন খবর নেই। ওদের গ্রাম সীমান্ত ঘেঁষে। ওরা নাকি ওপার চলে গেছে।

মা এলো কাঁসার বাটিতে করে মুড়ি নিয়ে। নিশান বললো, মাও আমি যুদ্ধে যামু।

বাটি নামিয়ে দিয়ে মা চোখ মুছছিলো। কাল থেকে কেঁদে কেঁদে মার চোখ লাল। টকটকে চোখ নিয়ে মা শুধু তাকিয়ে রইলো। নিশান ডান হাতের মুঠিতে বুকে চাপড় মেরে, গলায় আর একটু জোর দিয়ে বললো, যুদ্ধে যামু। এই তুফান আলীর পোলা নিশান আলী যুদ্ধে যাইবো। বাপের পক্ষী শিকারের গুলাই দিয়া দুষমুন শিকার করবো।

মা দুপা সরে এসে ওকে বুকের কাছে নিয়ে বললো, তুই বাজান যুদ্ধে গেলে আমি বাঁচুম কারে লইয়া? একে একে হগগলেই তো ছাইড়া গেলো আমারে।

নিশান জবাব দিলো, আমি ছাইড়া যামু না। এই যুদ্ধে যাওন মাইনে মাঠে ময়দানে গিয়া লড়াই দেওন নারে মা। ঘর থনই যুদ্ধ করুম। খালি আমি না। তুমিও।

মা যেনো নিশ্চিন্ত হলো। দাওয়া থেকে নেমেই আবার কেঁদে উঠলো নতুন করে। নিশান চমকালো, আবার কোন মুসিবত এলো? না কিছুনা। অবসর সময় বাবা দাওয়ার একদিকে ছোটো কেবিন ঘর তৈরী করছিলো। তার পড়ার সুবিধার জন্য। বাবার খুব আশা ছিলো সে লেখা পড়া জানা জ্ঞানী মানুষ হবে। গোলমালে ঘরের কাজ আর এগোয়নি। কতো শেষ না করা কাজই না যাবার আগে ফেলে যেতে হয় মানুষকে।

নিশানের মনে হলো গত চারদিনে সে যেনো অনেক বড়ো হয়ে গেছে। অনেক বেশী বুঝতে পারছে।

মুড়ির কিছু খেয়ে, বাকিটা মুরগীর খোঁয়াড়ের কাছে ফেলে দিয়ে সে এলো পঞ্চবটির জঙ্গলে। ক্যাম্প করা ভাইরা এবার দলে নিলো। কাজ-শেখালো। কাজ দিলো। কালো কাসুন্দির ঝোপের আড়ালে থেকে খালের দিকে চোখ রাখতে হবে। ওখান থেকে বড়ো নদীর বাঁক দেখা যায়। দৃষ্টির সবটুকু আলো জ্বালিয়ে দিয়ে, সে পথ পাহারা দেয় নিশান। ভুলে যায় বাবার কথা। চাচাদের কথা। মনকে জাগিয়ে রাখে একটা ধাতব রাক্ষসের জন্য। কবে সেটা খালে ঢুকবে।

বিকেল হলেই বাতাসে ভাসে বন তুলসীর সুবাস। খুব সামান্য সময়ের জন্য আনমনা হয়ে যায় সে। এমনি ছায়া ছায়া বিকেলে নদীর ধারে কপাটি খেলতো স্কুল থেকে ফিরে। একবার দম দেবার মুখে রতন বললো, ঐ নিশান তর বুজীর নাও যায়রে।

বুজীকে নিয়ে খালের পানিতে সত্যি যাচ্ছিলো এক মালাই নৌকো। দুলাভাই দাঁড়িয়ে বাইরে। বুজীর ঝকঝকে চোখ দেখা যাচ্ছিলো গলুই-এর কাছে, খাটো ঘোমটার ভেতর।

খেলা মাথায় উঠলো। পাড় ধরে নৌকোর সংগে দৌড়াতে সুরু করলো সে। দুলাভাই চেঁচিয়ে বললো, নাও ভিড়ামু। উঠবা নায়ে।

ছুটতে ছুটতেই নিশান জবাব দিলো, না না। আপনেগো মায়ের আগে আমি বাড়ীতে পৌঁছা মাওরে খবর দিমু।

যে গাংগ বর্ষায় বুজীকে নিয়ে আসতো, শুকনোর সময় সেই যোগাতো রসালো ফল। নামে গাংগ আসলে শাখা নদী। ভূগোলের স্যার বলেছিলেন গোটা বিক্রমপুরের সবচেয়ে বড়ো নদী ছিলো ইছামতী। রাজা বাদশাহদের বড়ো বড়ো নৌকোর বহর ভাসতো তার বুকে। সে নদী মরে গিয়ে জন্ম হয়েছে ধলেশ্বরীর। আর এই ক্ষীণ শরীর মধুমতীর। শীতে এ নদী একেবারে শুকিয়ে যায়। পুরা বালির ওপর কারা যেনো বুনে দিয়ে যায় বাংগি, তরমুজ। সবুজ সতেজ লতাগুলোয় কতো যে ফল ধরে। কি সোয়াদ সেগুলো খেতে।

বন্ধুর মতো, আপন জনের মতো সেই নদী আজ সে পাহারা দিচ্ছে। কখনো নিজেকে মনে হয় পুঁথির সেই শাহজাদার মতো। রাজ্যের শেষ সীমায় সে অপেক্ষা করে থাকতো রোজ মানুষ খেকো এক সমুদ্র দানবের জন্য। পানির রাক্ষসটাকে সে হত্যা করেছিলো। কেটে দিয়েছিলো লাল চোখ শয়তানের হাতীর শুঁড়ের মতো আটটি শুঁড়কে।

ঝিকঝিক, থিকথিক শব্দ বাতাসে। সজাগ হলো নিশান। রতন ছিলো পাঁকুড় গাছের মগডালে। চেঁচিয়ে বললো, ঐ আয়া পড়ছে। বাইসুত কি আলীসান জাহাজের। শিগগীর ক্যাম্পে খবর দে। আনু ভাইরে। গোবিন্দ দাদারে।

সন্ধের দিকে দোতলা লঞ্চ ঢুকে গেলো গাংগে। পাড়ের দিকে এলোনা। থমকে রইলো মাঝ নদীতে। খোল ভর্তি খাকী পোষাকের মানুষ। ছাদের উপর সাজানো হলো কামান। গ্রামের দিকে তাক করা। সবার মাঝে জ্বলছে একটা লাল আলো। পুঁথির সেই সমুদ্র দানবের চোখের মতো। এটা আরও সাংঘাতিক। ঘুরে ঘুরে আলো ফেলছে চারদিকে।

গোপন বৈঠকে ঠিক হলো রাতের অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়া হবে এটাকে। সবার আগে একজনকে গ্রেনেড ছুঁড়ে অন্ধ করে দিতে হবে সার্চ লাইটের আগুনে চোখ। কে যাবে। নিশান এগিয়ে এলো।

কমাণ্ডার ভাই ঘাড় নেড়ে বললেন, আমিও তোর কথাই ভাবছিলাম। সব রকম সাঁতার তুই খুব ভাল জানিস। তুই আলোটা নষ্ট করে দিলেই, দুপার থেকে আমরা আক্রমণ চালাতে পারবো।

সন্ধে রাতে নিশান এলো ভাত খেতে। মা বললো, বাজান শরীরটা আইজ জুইত লাগতাছেনা। পাহারাদারী থন আইজ একটু জলদি ঘরে ফিরিস।

নিশান ঘাড় দুলিয়ে ছোট্ট জবাব দিলো, আইচ্ছা।

রাত নিঝুম হলে, থমথমে হলে নিশান বেরুলো। রেকি করা জায়গা থেকে খুব সাবধানে নামলো খালের পানিতে। গ্রেনেড ধরা হাতটাকে মাথার ওপর দিকে রেখে লঞ্চের দিকে এগুলো আরও সাবধানে।

সার্চ লাইটটা যেনো ইবলিশের জ্যান্ত চোখ। ক্লান্তি নেই। ভুল নেই। ব্যর্থতা নেই। তা হোক। নিশান মনে মনে ভাবলো, দরকার হলে সারা রাত, সারা জীবন সে সুযোগের অপেক্ষা করবে। তবু ওটাকে শেষ করা চাই। নইলে পাশের গাঁয়ের মতো তাদের গ্রামটাও পুড়ে ছারখার হবে। দলেদলে মানুষ মরবে বেয়োনেটের খোঁচায়। শিশুদের শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে চলবে বন্দুকের কিরিচে গেঁথে ফেলার প্রতিযোগিতা। যেনো হাসি ঠাট্টার খেলা একটা। এমনি করে বাচ্চাদের জীবন নিয়ে খেলে পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যগুলো। আর মেয়েদের নাকি জোর করে ধরে নিয়ে যায় জাহাজে।

নিশান মাথা ঝাকানি দিলো। তাদের গ্রামেও তেমনি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। হেলমেট পরা লোকগুলো জাহাজের ছাদে ঘোরাফেরা করছে। কমাণ্ডার আন্দাজ করছেন রাতে নামার প্ল্যান ওদের নেই। ভোর ভোরে ঘিরে ফেলবে গোটা গ্রাম। রাতের আঁধারে গ্রামবাসীরা যাতে পালাতে না পারে তার জন্য নদীর বাঁকে পাহারা দিয়ে আছে আরও পাঁচ ছটা লঞ্চ। হয়তো সেগুলোও যোগ দেবে সকালের তাণ্ডব কাণ্ড-কারখানায়। তার আগে এটার ব্যবস্থা করতে হবে। শয়তানের চোখের মতো, দানবের চোখের মতো দগদগে লাল আলোটার খতম তারাবী পড়াতে হবে। শূন্যে তোলা হাতের মুঠিতে গ্রেনেডের গোলা। অন্য হাতে সাবধানে সাতার কাটা।

শয়তানের জাহাজ দাঁড় করানো মাঝ নদীতে সার্চ লাইট খোয়ার বিরাম নেই। সেই সংগে

পিলে চমকানো ফাঁকা গুলির আওয়াজ। জাহান্নামের বাসিন্দাগুলোর চোখে কি নিশি রাতেও ঘুম থাকে না। না থাক। নিশানের চোখের উপর এখন কোনও সার্চ লাইট নাই। আছে বাবার আধখোলা লাল একটা চোখ, বাকী চোখটি উড়ে গেছিলো গোলার ঘায়ে! জমির চাচা খোলা চোখের পাতা বন্ধ করে দিয়েছিলো। মুর্দার চোখ নাকি খোলা অবস্থায় কবরে যেতে নেই। কিন্তু নিশান স্পষ্ট দেখছে বাবা তাকিয়ে আছে। সাদা জমিনের ওপর ছোপ ছোপ রক্তের ফোঁটা। নানা ছোপ ছোপ নয়, জমাট বাধা রক্তের চাপ। টকটকে লাল।

মাঝরাতে সমস্ত গ্রাম কেঁপে উঠলো ভয়ঙ্কর বিকট আওয়াজে। দানোর ঘুরন্ত চোখ আচমকা নিভলো। কয়েক মুহূর্তে আকাশ মাটি নদী মিশে গেলো একদম অন্ধকারে। তারপর দশ দিক ভরে এলো গর্জন আর গর্জনে।

ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে জোনাকীর আলোর শব্দে জ্বললো আর এক ধরনের তেজী নীল আলো। ঝাঁকে ঝাঁকে অবিরাম। লঞ্চ ডুবলো। সকাল হলো। বড় নদীর বাঁকে অপেক্ষা করছিলো যে দুটো সাজোয়া লঞ্চ, রাতের গোলাগুলির শব্দে তারা আর সাহস পেলো না গ্রামে ঢোকার। ঘুরিয়ে নিলো গতিমুখ।

একটু বেলা করে গাঁয়ের ছেলেরা, ক্যাম্পের যুবকরা ফিরে এলো। এলো না শুধু নিশান। গাংগের কোথাও সে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে থাক।
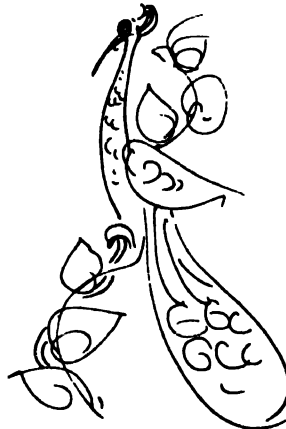
ঘরে ফেরা

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

বাবা আর আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি, বিকেলে নদীর পাড়ে। নদীটা অনেকদূর চলে গেছে একটানা, নৌকোগুলি শাদা লাল বাদামী কোড়ার মতন বাতাসে কেশর ফোলছে।

সেদিকে তাকিয়ে জিগগেস করলাম, সেই ঘটনাটা ফের বলো না বাবা, কি করে বেঁচে এলে?

বাবা বললেন, আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। রোজই একজন দুজন করে গুলী করে মারে। লম্বা একটা বাড়ি, জানালা দিয়ে দেখা যায়। আমার বাঁ পাশের লোকটিকে আগের দিন মেরে ফেলেছে। ভাবলাম এবার আমার পালা, সে-রাতে কিন্তু কেউ এলো না। সকাল বেলা দেখলাম ডানদিকের দুজনকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওদের মেরে ফেলবে। একজন বয়স্ক, চল্লিশের মতন বয়েস; অন্যজনের বয়েস কম; কত হবে, পনেরো, ছেলেটি কাঁদছে। হয় তো ওরা দুজন বাবা-ছেলে, কিংবা দু ভাই, কিংবা কেউ কারো কিছু নয়। তারা ছেলেটির দু চোখ পটি দিয়ে বেঁধেছে, কিন্তু বয়স্ক লোকটি কিছুতেই চোখ বাঁধবে না। সঙ্গের অফিসার খেকিয়ে উঠেছে, ছেলেটি ঠিক হয়ে দাঁড়িয়ে, কিন্তু ঐ লোকটি ঢিলেঢালা, পকেটে দুহাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, কোন ভাবান্তর নেই।

অফিসারটি ফের খেকিয়ে উঠেছে, পকেট থেকে হাত বের করো। লোকটি মাথা নেড়েছে, আস্তে আস্তে বলেছে, আজ বেলা হয়ে গেছে, আজ বাদ দিলে হয় না।

আমরা জানলায় মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে, আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

অফিসারটি তখন গুলী করার হুকুম দিয়েছে। রাইফেল তাগ করার আগেই ছেলেটি সার্ট ছিঁড়ে বুকের ওপর জড়ো করেছে, ভাবটা গুলী ঠেকে যাবে। সার্ট ফুটো ফুটো হয়ে আকাশে উড়েছে আর ছেলেটি মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ঐ লোকটি আলগোছে পিছে পড়ে গেছে, খুব সম্ভব পকেটে ওর হাত থাকার দরুন।

অফিসারটি ছেলেটির মুখে রিভলবার থেকে একবার গুলী ছুঁড়েছে। কিন্তু লোকটির গায়ে গেঁথেছে ছ'টি গুলী, কে জানে বেয়াদবী করার জন্য কি না।

নদীতে বাতাসের পাগলামো বেড়েছে। ঐ ছেলেটির ফুটো ফুটো সার্টের মতন ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। আমি ঐ দিকে তাকিয়ে ফের জিগগেস করেছি, তারপর তোমাদের কিছু হয় নি।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। ঐ ফাঁকে আকাশে গুটিকয় তারা জেগে গেলো। বাবা আস্তে আস্তে বললেন, না কিছু হয়নি। শুধু সে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি। ওরা একটানা গুলী করছে। বুকটা ঝাঝড়া হয়ে গেছে। সকালে উঠে দেখি বুকটা ভারি, ব্যথা, টনটন করছে। আর ঐ কথা মনে হলে একটা একটা গুলী যেন লাগে বুকের মধ্যে।

বাবা চুপচাপ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন, আমিও। তখন মনে মনে বললাম, তুমি যখন ছিলে না বাবা তখন খুব খারাপ লাগত। মা মন ভার করে বসে থাকতেন। আত্মীয় স্বজনেরা দূরে দূরে থাকতেন। তখন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিলো। একটা মেয়েকে ভালো লেগে গিয়েছিলো আমার। তখন তো লোকজন হামেশাই এ-পাড়া ও-পাড়া করত, নিরাপদ এলাকার খোঁজে। আমাদের বাড়ির পাশে ওরা এসে ওঠেছিলোঃ শুধু মা, মেয়ে, দুটি চাকর। ওর বাবা আগেই মারা গেছেন। আমার খুব আলাপ করতে ইচ্ছে করত, কথা বলতে ইচ্ছে করত সীমার সঙ্গে। বয়েস কত হবে? ধরো চৌদ্দ পনেরো। সুন্দর করে শাড়ী পরত আর বিকেলে চুপচাপ জানালার কাছে বসে থাকত। আমি লুকিয়ে দেখতাম, বিশ্বাস করো বাবা, আমার মনের মধ্যেকার জমা দুঃখ কমে যেত, সুখী হত চোখ, মনে হত একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছি, ফের সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি ফিরে আসবে, মা ফের খুশী হয়ে উঠবেন, সীমারা আমাদের কাছাকাছি থাকবে চিরকাল, বিশ্বাস করো বাবা ওর দিকে লুকিয়ে তাকালেই সুখটা সামনে এসে দাঁড়াত। মা ওদের বাসায় গেছেন, আমাকে বলেছেন যেতে, কিন্তু আমি যাইনি। একদিন বিকেল, আমি ফিরছি বাজার থেকে, দেখি সীমার রিকশা থামিয়েছে, এক সৈন্য রিকশাওয়ালার গদি ওলট পালট করছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সীমার মুখ ফ্যাকাশে, আমাকে দেখেই রিকশা থেকে নেমে এসেছে, রিকশাওয়ালার হাতে একটা টাকা গুঁজে আমার সঙ্গে হাঁটা শুরু করেছে পাশাপাশি। সৈন্যটা ত থ, রিকশাওয়ালা ছাড়া পেয়ে ছুট। আমি জিগগেস করেছিলাম, খুব ভয় পেয়েছিলে, না? সীমা জবাবে বলেছিল, হ্যাঁ, তুমি পাওনি? আমি জিগগেস করেছিলাম, কোথায় গিয়েছিলে? সীমা বলেছিল, মার অসুখ, ওষুধ আনতে। আমি জিগগেস করেছিলাম, তোমার বাবা? সীমা বলেছিল, নেই, মারা গেছেন। ফের জিগগেস করেছিল, তোমার বাবা? আমি বলেছিলাম, ধরে নিয়ে গেছে। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ, হঠাৎ দেখি বাসা সামনে। সীমা আস্তে করে বলেছিল, আসি। তুমি আসবে তো? আমি জবাব দিইনি, শুধু তাকিয়ে থেকেছি, সীমা হেঁটে হেঁটে বারান্দায় উঠেছে, একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে ভেতরে চলে গেছে। পরের সন্ধ্যায় মা আমাকে বললেন, সীমারা অন্য পাড়ায় চলে যাবে রে। ওর মা খুব ভয় পেয়েছে। কোন কথা না বলে আমি রাস্তায় নেমে এসেছি, সন্ধ্যার বাতাস ঠাণ্ডা, আমার মুখ আর কান ধুয়ে দিচ্ছিল। আমি অনেকক্ষণ হেঁটেছি, ইচ্ছে হচ্ছিল সীমাদের বাসায় যেতে, যেন ওখানে গেলে আমি শান্তি পাব। আমি কিন্তু ওদের বাসার দিকে গেলাম না, অন্যদিকে হেঁটে বেড়ালাম, মধ্যে মধ্যে দু' একটি গাড়ি দ্রুত ছুটে যাচ্ছে, কেউ তো তখন সন্ধ্যার পর রাস্তায় পারতপক্ষে বের হত না। আমার খুব ইচ্ছে করছিল সীমার সঙ্গে যে-বিকেলে হেঁটেছি সেই অনুভূতিটা ফের জেগে

উঠুক, কিন্তু মনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে এসেছে খালি রাস্তার ঠাণ্ডা। অনেকক্ষণ হেঁটেছি, অর্থহীন হাঁটা সেই বোধও জেগে গেছে তখন। হঠাৎ দেখি ওদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, জানালায় বাতি। বাতির রং হলুদ কমলা লেবুর মতন। অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম, অনেকক্ষণ। ঠিক মনে নেই কখন ফের হাঁটা শুরু করেছি। আর তখনই বুকের মধ্যেকার জমা করা শব্দটা চিৎকার করে উঠেছে, সব চিন্তা ছাপিয়ে।

আমি আস্তে বলেছি, ফিরে চলো বাবা। তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। রাস্তা খালি, ঝোপঝাড়ে খসখস আওয়াজ উঠছে। হয়তো শেয়াল, হয়তো বাগডাস। মসজিদের কাছে এসে গেছি। মিনারটা বাতাসে কাঁপছে।

কয়েক পলক থেমে আমি বলেছি, পাড়ার আনছার আলী সাহেবকে তোমার মনে আছে

বাবা? সেই যে খুব নামাজ রোজা করতেন ভদ্রলোক, সব সময় মসজিদে নামাজ পড়তেন। একবার কার্ফু দিয়েছে। ভদ্রলোক এশার নামাজ মসজিদে পড়বেনই। লাগোয়া বাসা তাঁর। হেঁটে হেঁটে মসজিদে এসেছেন। একটা সৈন্য দেখেছিলো। সোজা মসজিদের ভেতর এসে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। সারারাত মসজিদের ভেতর লাশ পড়েছিলো। সকালবেলা তাঁর ছেলেরা এসে তাঁকে কবর দিয়েছে, মসজিদের পাশেই, ঐ তো কবর, দেখেছো বাবা?

অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখা যায় না। রাস্তার পাশে বাঁশের বেড়া, খানিকটা জমি উঁচু হয়ে আছে। বাবা খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন, কিছু বললেন না। কোথাও কোন শব্দ নেই, ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। কে যেন দূর থেকে হেঁকে উঠেছেঃ কে যায়; বাতাসে ঐ আওয়াজ থেকে থেকে কাঁপছে।

আমরা ফের হাঁটছি। রাস্তা জুড়ে ঝিঁঝির ডাক; নিরবচ্ছিন্ন ধারায় শব্দের পর শব্দ, ডাকের পর ডাক কানের কাছে তৈরী হচ্ছে, আওয়াজটার আঘাতে ধ্বসে যাচ্ছে বাড়িঘর ঝোপঝাড় জঙ্গল মানুষের বসতি। সেই শব্দের মধ্যে ভেসে এসেছে গন্ধ, সেই বকুল গাছটা গন্ধের দোকান সাজিয়ে বসেছে। গাছটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম, বললাম, নিশিকান্তকে তোমার মনে নেই বাবা? নিশির এক বুড়ি দাদী ছিল, দুচোখ ছানি পড়া, সংসারে আর কেউ ছিল না। সেই নিশিকে এই গাছটাতে গেঁথে মেরেছে। বুড়ি দাদী রোজ গাছের নিচে এসে বসত আর চেঁচাতঃ কি রে নিশি গাছ থেকে নামবিনে। তারপর যে কোথাও চলে গেল বুড়ি, কেউ জানে না। নিশি গাছটায় বহুদিন গেঁথেছিল। ছাদ থেকে দেখা যেত, দু হাত ছড়ানো, নিশি সমস্ত পাড়াটার দিকে চেয়ে আছে।

বাবা এবারেও কিছু বললেন না। গাছটার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছেন। অন্ধকারটা কচুরী পানার মতন রাস্তার বাঁকে জমে আছে চাপচাপ স্তরস্তর অন্ধকার। আমাদের বাসা কাছেই। ঐ ত মেহেদীর বেড়া, দালানের টুকরো, গেটটা খোলা। আমি মনে মনে বললাম, জানো বাবা তোমার ছাড়া পাওয়ার দুদিন আগে মা হঠাৎ করে মারা গেলেন। মা ভেবেছিলেন তুমি বোধহয় আর কোন দিন ফিরে আসবে না। হঠাৎ হাঁপাতে লাগলাম, আর হাঁটতে পারছি না, সেই ঝিঁঝি ফের কানের কাছে বেজে উঠছে, স্তরস্তর অন্ধকারের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছে।

বাবা গেট দিয়ে ঢুকলেন, তাকালেন আমার দিকে। আর আমার আঠারো বছরের দুচোখ বেয়ে পানি ঝরতে শুরু করল, সব কথা নষ্ট, আমি ফোঁপাতে লাগলাম, আস্তে আস্তে বললাম, যেন আমি না আর কেউঃ ভেতরে যেতে ভয় করছে বাবা।

তিন পাহাড়ের হরিণ

শওকত আলী

শীতের পাতা ঝরা শেষ হয়েছে সেই কবে। পশ্চিম থেকে মাতাল হাওয়া দিগদিগন্ত দাপাদাপি করে চলে যায়। পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে হাওয়ার ঝাপটা শিস দিয়ে ওঠে, মনে হয় কোথায় কোন গুহার ভেতর স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার থেকে হিংস্র ময়াল তার শিকার দেখে শীৎকার দিয়ে উঠছে।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। দিগন্ত ঘোলাটে, প্রখর সূর্য মাথার ওপরে জ্বলে যায়, বনের ভেতর গাছতলায় শুকনো পাতার রাশ ওড়ে। পাতাঝরা ডাল-পালায় হাওয়ার ঝাপটা নিজেকে কেবলি আছড়ায়। প্রখর শুকনো হাওয়া বুকের ভেতরকার রসটুকু পর্যন্ত শুষে নিয়ে যায়। বুক জোড়া পিপাসা হাহা করছে চারদিকে।

হরিণের দলটা আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা নিষ্ঠুর। প্রখর সূর্যের দিকে তাকিয়ে দুপুর বেলা তারা পাহাড়ের গায়ে উঁচু পাথরগুলোর আড়ালে চলে যায়, আবার সূর্য ঢলে পড়লে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। সবার চোখ পড়ে থাকে দিগন্তের দিকে, হাওয়ার ঝটপটানি শুনলেই কান খাড়া হয়ে ওঠে। ঐ বুঝি মেঘ ডাকলো।

তারা রুদ্ধশ্বাসে চোখ ফিরিয়ে দেখে। তারপর হতাশ হয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। না বৃষ্টি হবে না, মেঘ নেই আকাশে। একদিন দু'দিন নয় বেশ কিছুদিন ধরে ওরা আট্‌কা পড়ে গেছে। বহুদিন আগে যে পথে এসেছিলো, সে পথ এখন আর নেই। তারা এসেছিলো গভীর খাদের পাশ দিয়ে। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে। গত বর্ষার দারুণ বৃষ্টিতে কখন ধ্বস নেমে পাথরের চাঁইগুলো ভেসে গিয়েছে কেউ লক্ষ্য করে নি। এখন সেখানে রাস্তা নেই, গভীর খাদ।

এমনিতে ভারী আরামে ছিলো তারা। তিনদিকে পাহাড় খাড়া উঁচু হয়ে উঠেছে আর একদিকে

হাল্কা বন, বনের ওপারে দু'পেয়েদের বাস। দু'পেয়ে জানোয়ারগুলো প্রচণ্ড শব্দ করে কী যেন ছুঁড়ে মারে। তাই ওদিকে বনের জানোয়ার এগোয় না। হরিণের দলটা ওদিকে কখনো যায় নি। দলের বুড়োরা বলে দিয়েছিলো, দু'পেয়েরা যেদিকে আছে সেদিকে কখনো যেও না। ওরা ওদিকে কক্ষনো যায় নি। সামনে আর ডাইনে বাঁয়ে যদি হিংস্র কোন জানোয়ার থাকে তা'হলে তিরিশ চল্লিশ হাত পাথুরে খাড়াই বেয়ে ওঠার মত সামর্থ আর যারই থাক ওজনে ভারী বাঘ-চিতার নেই। ছোট ছোট পাথরে ভর্তি পাহাড়ের গা, খাড়াই পাহাড়ে একবার পা ফস্কালে গড়াতে গড়াতে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে নিচে আছড়ে পড়তে হবে।

বেশ আরামে ছিলো হরিণের দলটা। খাড়াই পাহাড় ঘেরা একটুখানি সমতল। এইটুকু জায়গার ভেতরেই একটা ছোট্ট জলা, মাটির ভেতর থেকে ধীর ফোয়ারায় পানি বইছে আর সেই জলার চারদিক ঘিরে সবুজ ঘাস। শীতের প্রথম দিকেও ঘন কালো ঘাস ছিলো। এখন সবুজ ঘাস রোদে পুড়ে গিয়েছে শুকিয়ে। জলার ধার ঘেঁষে যে জায়গাটুকুতে ঘাস ছিলো তাও এখন বাচ্চা হরিণেরা খেয়ে সাফ করে দিয়েছে।

এখন এ জায়গা থেকে বেরুনো ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। যদি বৃষ্টি হতো, তাহলে হয়তো তাদের এতো দুশ্চিন্তা ছিলো না। বৃষ্টি হলে ঘাস গজাতো গাছপালা সবুজ হয়ে উঠতো, এক বছরের জন্যে তারা থেকে যেতে পারতো। কিন্তু বৃষ্টি নামে না, দিনের পর দিন আকাশের দিকে চেয়ে আছে আর অস্থির হচ্ছে।

অস্থির হচ্ছে নিজেদের জন্যে নয়। বড়রা তো যেতেই পারে। বাচ্চারা এখনো ছোট। এখনও সাহস পায় না যে প্রকাণ্ড খাদ লাফ দিয়ে পার হবে, কি ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ওপরে উঠে যাবে।

আর এ জায়গা ছেড়ে গেলেই বেঁচে গেলো তাতো নয়। এ জায়গার বাইরে কোথায় যাবে? কোথায় খুঁজে বেড়াবে ঘাসের দেশ? যদি না পাওয়া যায়? শুধু দলসুদ্ধ সবাইকে খুঁজেই বেড়াতে হয়, তাহলে বনের হিংস্র জানোয়াররা কি ছেড়ে দেবে? এ তল্লাটের শয়তান হচ্ছে কালরাজ, তার নাগাল এড়িয়ে যাওয়া কি অতই সহজ?

তাই তরুণ হরিণেরা পথ খুঁজে ফিরছে। একটা পথ তারা খুঁজে পেয়েছে। অতি বিপজ্জনক রাস্তা। প্রকাণ্ড এক খাদের ওপারে পর পর ক'খানা বড় পাথরের চাঁই ঢালু পাহাড়ের গায়ে সাজানো আছে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে ওপরে চলে যেতে হবে। কিন্তু খুব সাবধানে, একবার পা ফস্কালে, কি একটা পাথর যদি গড়িয়ে পড়ে তাহলে নিশ্চিত মরণ। সে পথ দিয়েই কেউ কেউ বাইরে যায়, খুঁজে ফেরে কোথায় আছে ঘাসে ঢাকা সবুজ মাটি। কোথায় ঝর্ণার ঠাণ্ডা পানি টলটল করছে। কোন নদীর ধারে দিগন্ত বিস্তীর্ণ সমতলে সবুজ হাওয়া খেলা করে ফিরছে।

কিন্তু আজো সে দেশের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। হরিণেরা অপেক্ষা করছে একজায়গায় দাঁড়িয়ে। পথ চেয়ে আছে বাচ্চারা। কেউ কেউ কান পেতে আছে, যদি অতি পরিচিত শব্দটা শোনা যায়। সর্দার দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার চকচকে গায়ে দিনশেষের আলোর আভা। মাঝে মাঝে সর্দার বলছে, না ওরা ফিরবে না। ফিরলে এতোক্ষণে ফিরে আসতো। কে জানে, হয়তো পালিয়েই গিয়েছে।

যা বেয়াদপ ছোকরা তোমাদের ঐ চিত্রল। এক বুড়ো হরিণ নিচুগলায় মন্তব্য করে। বাচ্চারা তরুণরা কেউ কথা বলছে না। তাদের বিশ্বাস হয় না। তারা কান পেতে রেখেছে। কোথাও একটু শব্দ হলেই বুকের ভেতরে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শোনে।

তারা জানে, চিত্রল ফিরে আসবে।

আজ ভোরে, তখন পূবের পাহাড় চূড়োয় ভোরের আলো সবে দেখা দিয়েছে তখনই বেরিয়ে যায় চিত্রল অশান্ত আর চপল। ওরা তিনবন্ধু। সেই যে গেলো, তারপর আর ফেরেনি। ওরা কী খবর নিয়ে আসে সেই জন্যে এখন সবার অপেক্ষা। বুড়োরা আর সর্দার নিজেদের মধ্যে কী যেন কানাকানি করছে। এক সময় সর্দার জিজ্ঞেস করলো, তোমরা দেখেছো কেউ, ওরা কোন দিকে

গেছে? একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করে, ওরা কি কাউকে কিছু বলে গিয়েছে?

সর্দারের কথার জবাব কেউ দেয় না। কেউ জানলে তো! চিত্রল কাউকে কিছু বলে না। অশান্ত চপল তার অত বন্ধু,তারাও জানে না। সে কারো শাসন মানতে চায় না। জাতের নিয়ম কানুনের পরোয়া করে না। যখন ইচ্ছে, যে দিকে ইচ্ছে চলে যায়। আবার ইচ্ছেমত ফিরে আসে। যা কিছু কথা ওর, সব বাচ্চাদের সঙ্গে। তাদেরকে ও গল্প শোনায়, কোথায় আকাশ ঝকঝকে নীল। কোথায় বিশাল হ্রদে রাতের জ্যোৎস্না ছলোচ্ছল ঢেউ দিয়ে মাটি ছুঁয়ে যায়—কোথায়

মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ।

সে বলে আর তার দু'চোখের ভেতরে কেমন যেন কোমল আলো জেগে ওঠে। ওর কথা শুনতে শুনতে বাচ্চাদের শরীরে কী রকম কাঁপ লেগে যায়। গল্প বলা শেষ হলে বাচ্চা হরিণদের ডেকে বলে, আমরা একদিন সেই দেশে যাবো।

তারপর সে নাচতে আরম্ভ করে দেয়। বলে, আমরা এমনি নাচতে নাচতে যাবো, চলো এসো সবাই।

তখন সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে খোলা মাঠে ওদের নাচ সুরু হয়ে যায়। খটাখট খটাখট হুর্‌রে হুর্‌রে শব্দ বাজতে থাকে। পাহাড়ে পাহাড়ে সেই শব্দ অস্ফুট প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। অনেক রাত হয়ে যায়, তবু বাচ্চারা মায়ের কাছে ফেরে না।

সেই চিত্রলের মনের খবর কে বলবে ? দস্যিপনায় তার জুড়ি নেই, দুঃসাহসের সীমা নেই।

সর্দার ফের জানতে চাইলো, কেউ বলতে পারে কি না, চিত্রল কোন দিকে গিয়েছে। কেউ বলতে পারে না।

সর্দার চিত্রলকে শাসন করো, চপলের বাবা কথা বললো হঠাৎ।

সর্দার মুখ ফেরায়। অশান্ত আর চপলের মা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের দু'চোখের ভেতরে কী রকম একটা অজানা ভয় থমথম করছে।

অন্যান্য বুড়োরাও তখন বলাবলি করে, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। ছোকরা যা গোঁয়ার। একেক দিন রাত হয়ে যায়। তবু সে ফেরে না। সারা বনময় ঘুরে বেড়ায়। চওড়া চওড়া খাদ, নিচে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে, তাও সে হাসতে হাসতে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলে যায়।

আজ হয়তো অনেক দূরে কোথাও গেছে। ফেরার কথা হয়তো মনেই ছিলো না। যখন মনে হয়েছে তখন হয়তো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আর যদি - - - - -

কথাটা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। কথাটা কেউ মুখ দিয়ে উচ্চারণও করতে চায় না। কিন্তু মনে মনে সবাই বোঝে। সবাই দেখেছে তাকে। কী ভয়ঙ্কর দেখতে। শয়তানটা বহুদিন ধরে তাদের দলের পেছনে লেগে আছে। হলদে গায়ে কালো কালো ডোরা, মাথাটা কী প্রকাণ্ড, চোখ জোড়া অসম্ভব নিষ্ঠুর, দেখলেই হাত-পা হিম হয়ে আসতে চায়। কতবার সে পিছন থেকে লাফিয়ে পড়েছে। দল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে কোন শিশু হরিণকে। সর্বদা তটস্থ থাকতে হতো তখন। এ জায়গায় আস্তানা নেওয়ার পর আর সে হামলা করতে আসতে পারে না। কিন্তু লোভ তার যায়নি। কতদিন দেখা গেছে, টিলার ওপর মাথা তুলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। রাগে গরগর করছে, ল্যাজ আছড়াচ্ছে, আর থেকে থেকে কী হুঙ্কার।

সবাই দেখেছে শয়তানটাকে। সবারই বুকের ভিতরে আশঙ্কা থমথম করে উঠলো। যদি কালরাজের মুখে চিত্রল চপল অশান্ত পড়ে, তাহলে ?

কথা বলতে পারে না কেউ। সর্দার মাথা উঁচু করে ডাইনে-বাঁয়ে তাকালো। না কোথাও কোন সচল কিছু দেখা যায় না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। একটুপর আর কিছুই দেখা যাবে না সর্দার ডেকে জিজ্ঞেস করে সবাইকে, ওদের খুঁজতে যাবে কেউ ?

কেউ সাড়া দেয় না। গাছে পাতা নেই, তবু যেন নিস্পত্র ডাল থেকে উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে লাগছে কারো কারো গায়ে।

ওদের চুপ করে থাকতে দেখেই কি না কে জানে সর্দার গালাগাল দিতে আরম্ভ করলো, ভীরুর দল, তোদের মরাই ভালো।

বাচ্চারা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো, ওরা একসঙ্গে কথা বলে উঠলো। বললো, সর্দার পথ ঘাট চেনে, বুড়োরা রাক্ষুসে জানোয়ারদের চেনে, আমরা কেউ চিনি না। বড়রা যাক, ওদেরই যাওয়া উচিত প্রথমে।

ওদের কোলাহল শুনে ধমকে ওঠে সর্দার, এ্যাই চোপ্। শিং বাগিয়ে ধরে বলে, চ্যাচাবি তো খুঁচিয়ে মারবো।

গালাগাল করতে থাকে সর্দার। বলে অমন বেয়াদপ হরিণ দলের কুলাঙ্গার। কালরাজ যদি ওকে চিবিয়ে খায় তবে তার উচিত শাস্তি হয়।

হরিণেরা চুপ করে শোনে। তিনটে বুড়ো ছিলো, শিঙ্গের ভারে মাথা নুয়ে পড়েছে তাদের। তারা মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, হ্যাঁ ঠিকই তো, ছোকরা আমাদের কথা শোনে না। গোঁয়ার একরোখা। ওর বাপের মত, বাপকে খেয়েছিলো কালরাজ, ছেলেকে কি আর ছেড়ে দেবে।

সর্দারের কথা শোনার পর অশান্ত আর চপলের মা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো। চিত্রলের জন্যে কাঁদবার কেউ নেই। শুধু বাচ্চারা চিত্রলের কথা ভাবতে লাগলো। তাদের তীর বেগে ছোটার কায়দা কে শেখাবে? হিংস্র জানোয়ার সামনে এলে কি ভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে, কি ভাবে ক্ষিপ্রগতিতে তার চোখে ধূলো দিতে হবে, কার কাছে শিখবে এ সব? আর কে বলবে জ্যোৎস্নালোকিত হ্রদের গল্প? পাঁচ-পাহাড়ের চূড়োয় যেখানে রুপোর মত বরফ ঝলমল করে সেখান থেকে কেমন করে ঝর্ণাধারা বয়ে আসে, কোথায় যেন সমুদ্র আছে, শুধু নীল পানি, আর তার বুকে পাহাড়ের মত ঢেউ অনবরত দুলছে। কে শোনাবে তাদের এসব কথা? বড়দের জটলা থেকে বাচ্চারা একপাশে সরে দাঁড়ায়। কথা বলে না কেউ। তাদের আপন বলে আর কেউ থাকবে না। আর কেউ বলবে না যে দুনিয়া অনেক বড়। এই শুকনো বনভূমি পার হয়ে পাহাড়ের ওপারে যে আরো সবুজ দিগন্ত আছে, সেই বিপুল মুক্তির কথা শোনাবার জন্যে আর কেউ থাকবে না তাদের কাছে।

কারো কারো চোখে পানি টলমল করে ওঠে।

আর ঠিক তক্ষুনি কে যেন বলে উঠলো, এই চুপ। শোনো তো কিসের শব্দ।

সবাই চুপ করতেই শোনা গেলো, হ্যাঁ আসছে। খুরে খুরে শব্দ বাজছে নাচের ছন্দের মত।

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ভাঙ্গা চাঁদ ঝুলছে পাহাড়ের ওপরে। আর সেই জ্যোৎস্নায় ক্রমশঃ স্পষ্ট দেখা গেলো। তিনটে সজীব অন্ধকার যেন ধেয়ে আসছে। কাছে আসতেই চেনা গেলো। তিন বন্ধু—চিত্রল, অশান্ত, চপল।

ওরা হাঁফাচ্ছিলো, চপল বললো, কালরাজ তাড়া করছিলো পেছনে, বাব্বাঃ শয়তানটা কী দৌড়ায়। অশান্ত ধমকে উঠলো, চুপ করবি তুই। আর বলবার কথা পেলি না।

চিত্রল সর্দারের মুখোমুখি মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। তারপর বললো, অনেক অনেক দূরে আছে সবুজ ঘাসের দেশ। সূর্য যখন ওঠেনি তখন থেকে ছুটতে হবে আর সূর্যটা ডুবে আকাশ থেকে যখন লাল রং মুছে যেতে থাকবে তখন পৌঁছানো যাবে সে জায়গায়। একটা নদী পার হতে হবে, নদীর ওপারে শুধু সমতল মাটি। কেবল সবুজ আর সবুজ।

কিন্তু যাবে কি করে? চিত্রলের কথার মাঝখানে বাধা দিলো এক বুড়ো হরিণ।

চিত্রল হেসে জিজ্ঞেস করলো, কেন যেতে অসুবিধা কোথায়?

কেন, ঐ যে কালরাজ ওৎ পেতে আছে।

চিত্রল সমবেত সব হরিণের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলো। তারপর বললো, আসলে

ভয়টা আমাদের নিজের ভেতরে। আজ আমরা তিনজন একসঙ্গে ছিলাম। গায়ে গায়ে লেগে ছিলাম সর্বক্ষণ, কালরাজ হামলা করতে এসেও পারে নি। আর আমরা যদি ভয় পেয়ে এক একজন এক একদিকে ছুটে যেতাম তাহলেই মরতে হতো আমাদের। আমরা যদি একসঙ্গে থাকি, একজোট হয়ে মুখোমুখি দাঁড়াই, তাহলে কেউ আমাদের ওপর হামলা করতে সাহস পাবে না।

চিত্রল আরো কিছু বলতো হয়তো, তার আগেই কে একজন বলে উঠলো, ঐ ছোকরাকে আর আস্কারা দিও না। ওর কথা শুনে এখান থেকে বেরুলেই আমরা মরবো। কালরাজ আমাদের কাউকে ছাড়বে না। অনেক দিন ধরে সে হরিণের রক্তের স্বাদ পায় নি। না, আমরা যাবো না।

সর্দার কিছু বললো না, শুধু দেখতে লাগলো।

চিত্রল আরকবার চারদিকে তাকিয়ে বললো, আকাশে মেঘের দেখা নেই। এখানকার ফোয়ারা শুকোতে আর দেরী নেই, তখন পানি না খেয়ে মরতে হবে। এখন হয়তো বাচ্চারা খাদ লাফিয়ে পার হয়ে যেতে পারবে। না-খেয়ে না-খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে তখন সে শক্তিটুকুও আর থাকবে না। তখন বাচ্চারা শুকিয়ে না খেয়ে মারা পড়বে। তার চাইতে গেলে এখনই চলে যাওয়া ভালো।

ওর কথা কেউ শুনলো না। বুড়োরা সমস্বরে না না বলে চেঁচাতে লাগলো।

চিত্রল মাথা নিচু করে সরে এলো। কিছুটা হেঁটে এসে পেছনে তাকালো একবার। আহা বাচ্চাগুলোর ভারী কষ্ট হবে। এত সুন্দর বাচ্চারা, কী লাফালাফি ছুটাছুটি করছে—এরাই শুকিয়ে যাবে, হাড়-পাঁজরা দেখা দেবে। পিপাসায় কাতর হয়ে একসময় দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে পড়ে মরতে থাকবে। তখন ? তখন এই বুড়োরা কোথায় থাকবে ?

চারদিকে জ্যোৎস্না, পশ্চিম থেকে গরম হাওয়া বয়ে আসছে। সারাদিন পাহাড়ের গায়ে যে উত্তাপ জমেছিলো সেই জমানো উত্তাপ এখন হাওয়া হয়ে বইছে। চিত্রল আকাশের দিকে তাকালো। তারাগুলো ঝিকিমিকি কাঁপছে। অনেক অনেক দূরে তারার দেশ। চাঁদটা যে কত দূরে কে বলবে ? তার জানতে ইচ্ছে করে। তাদের দলের এক বুড়ো ছিলো, সে তাকে সমুদ্রের কথা বলেছিলো, পাঁচ-পাহাড়ের ধবল চূড়োর গল্প শুনিয়েছিলো। এখনও তার ইচ্ছে করে সেই সব দেশে যেতে।

কিন্তু এরা, এই জীবগুলো গর্ত থেকে বেরুতে চায় না মোটে। নিজের দলের হরিণদের কথা ভেবে করুণা হয় চিত্রলের।

তবু সে যাবে। দরকার হয় একাকী চলে যাবে।

এদিকে একটি একটি করে দিন যেতে লাগলো। আরো আগুন ছোটানো হাওয়া বয়ে এলো পশ্চিম থেকে। পাহাড়ের পাথরে পাথরে বুকজোড়া পিপাসা হা হা করে ফিরতে লাগলো। গাছের শুকনো পাতাও আর পাওয়া যায় না। ফোয়ারার পানি শুকিয়ে এসেছে, এখন আর স্রোত বয় না। আর কদিন কে জানে।

চিত্রলের কোন কাজ নেই। সে আর দূর দেশে যায় না। বাচ্চা হরিণদের ছুটতে শেখায়, জোরে লাফাতে শেখায় আর শেখায় ঢালু পাহাড়ের গায়ে পাথর থেকে পাথরে কিভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যেতে হবে। যারা শিখে ফেলে তাদের নিয়ে যায় বাইরে, সেই বিপজ্জনক খাদের রাস্তা ডিঙ্গিয়ে বাইরের বন থেকে কিছু ঘাস-পাতা খাইয়ে আনে।

হরিণেরা সবাই এখন গালাগাল করে একে অপরকে। বাইরে যাওয়া হরিণের সংখ্যাও

বেড়েছে। কিন্তু তবু এ জায়গা ছেড়ে যে সবাই মিলে দূর অজানার পথে পা বাড়াবে, এমন সাহস কারো হয় না।

কালরাজ হঠাৎ সেদিন দেখতে পেয়েছিলো। দুপুরে টিলার মাথায় দুটো প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে সে ঘুমোচ্ছিলো। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। কটা পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠেছিলো। উঠে বসতেই চোখে পড়ে তিনটে হরিণ একসঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যাচ্ছে। সে লাফিয়ে ওঠে, এতো কাছে সে বহুদিন হরিণ পায়নি। কিন্তু হরিণগুলো যে কিভাবে নিমেষে পাহাড়ের খাদের ওপারে চলে গেলো, সে আজো ভেবে পায় না। হরিণ তিনটের পিছু সে ছাড়ে নি।

কালরাজ ছুটেছিলো ওদের পিছনে। কাছাকাছি গিয়েও ছিলো, কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নি। কাছাকাছি হতেই দেখলো তিনটে হরিণই শিং বাগিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কোনদিন এমন হয় নি। তার অবাক লেগেছিল। এ রকম তো হওয়ার কথা নয়। হরিণের তো চিরকাল বাঘ দেখে যে যেদিকে পেরেছে পালাতে চেয়েছে, অমন গায়ে গায়ে লেগে শিং বাগিয়ে রুখে দাঁড়ায় নি কখনো। কালরাজ দূর থেকে দাঁড়িয়ে হরিণ তিনটের সুঁচালো শক্ত শিংগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলো কিছুক্ষণ। শিংগুলোকে বড় বেশি ধারালো মনে হয়েছিলো তার।

তারপর থেকে কালরাজ লক্ষ্য রেখেছে কোন পথে আসে ওরা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিনও কি পাবে না একটা হরিণকে। ওঃ। কতোদিন হরিণের রক্তের স্বাদ পায়নি, কতোদিন নরোম মিষ্টি মাংস খায়নি। মনে পড়লেই তার জিভ থেকে লালা ঝরতে আরম্ভ করে।

আরেকদিন কয়েকটা শুকনো ঝোপের আড়ালে আড়ালে হাঁটছিলো কালরাজ। লক্ষ রাখছিলো দুটি হরিণের ওপর। বড় হরিণটা খাদ পেরিয়ে এপারে এসে দাঁড়ালো। ছোটটা লাফিয়ে পার হবে ঠিক তক্ষুনি এক অলক্ষুণে পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলো আর সঙ্গে সঙ্গে বড় হরিণটা ফিরে চাইলো। নড়লো না, পালিয়ে গেলো না। কালরাজ এগিয়ে গেলো। তার মনে হচ্ছিলো হরিণটা নির্ঘাৎ ভয় পেয়ে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সে কাছে গেলো, একপা একপা করে। আর একটা মাত্র লাফ। সে লাফ দেবে, এমন সময় দেখলো, হরিণটা লাফিয়ে ওপারে চলে গেলো।

কালরাজের মনে হচ্ছিলো, এ হরিণটাকেই সে কদিন আগে দেখেছে। আরো দুটো হরিণের সঙ্গে শিং বাগিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলো সেদিন। স্পষ্ট মনে পড়ে তার, দুই শিং এর মাঝখানে একটা চওড়া শাদা চিহ্ন দেখেছিলো সেদিনও।

তার জেদ চেপে গেলো। চিরকাল সে রাজার মত হেঁটে ফিরেছে সারা বনে। সে যখন নির্জন দুপুরে হেঁটে যায় তখন বনের পাখিরা চেঁচায়। কে যায়, কে ? অন্য পাখিরা উত্তর দেয় রাজা যায়, বনের রাজা। বনের রাজা কালরাজ, আজ হোক কাল হোক, সে দেখে নেবে হরিণের দলটাকে। তার সঙ্গে চালাকি !

সে পাহাড়ের গায়ে দুটো প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে আস্তানা গাড়লো। আর লক্ষ্য রাখলো, কবে কখন ওরা দল বেঁধে বের হয়।

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। একদিন দেখলো, তখনও সন্ধ্যা হয়নি ভালো করে। সারারাত সে ঘুরে বেড়িয়েছে শিকারের খোঁজে। তিন দিন ধরে কিছুই পাচ্ছে না। ভোরের দিকে আস্তানায় ফিরছে এমনি সময় দেখলো অনেকগুলো হরিণ সেই খাদের ওপার থেকে একে একে এপারে লাফিয়ে আসছে। কালরাজের লোভী জিভ পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো। আনন্দে সে

গরগর করে উঠলো। ল্যাজটাকে আছড়ালো কয়েকবার। তারপর এগিয়ে গেলো। নিঃসাড়ে সে এগোতে লাগলো। যে চড়াই বেয়ে হরিণেরা ওপারে উঠে আসবে সেই চড়াইয়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো। এমনিতে খাড়া চড়াই, ঢালু পাহাড়ের গা-ভর্তি নুড়িপাথর বিছানো। একটু নাড়া লাগতেই একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়লো। শব্দ হলো।

হ্যাঁ, শব্দ হলো। আর চকিতে তাকিয়ে দেখে নিলো চিত্রল। শয়তানটা ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে। সর্দার তখনো ওপারে। বাচ্চারা এক এক করে সবাই লাফিয়ে এসেছে। সে ডাকলো অশান্ত, চপল।

মুহূর্তে তিনজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেলো।

কালরাজ দেখলো, দেখে অবাক লাগলো তার। হ্যাঁ সেই হরিণ তিনটা। নাকি এরা হরিণ নয়, অন্য কোন জীব ? অবাক লাগে তার। আরো আশ্চর্য, দেখলো, বাচ্চা হরিণগুলো এক এক করে লাফিয়ে লাফিয়ে আবার খাদের ওপারে চলে যাচ্ছে। তার মানে, মুখের গ্রাস আবার ফস্কাবে। অসম্ভব। কভি নেহি! কালরাজ গর্জে উঠলো।

নিচে খাদের ধারে যেখানে তিনটে পাথর পাশাপাশি মাটিতে গাঁথা সেখানে হরিণ তিনটে দাঁড়িয়ে। ঘাড় বাঁকিয়ে রেখেছে হরিণগুলো। লড়াইয়ে ডাকছে যেন। এতো সাহস তাদের। কালরাজ রাগে গরগর করতে করতে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে দেখলো একে একে বাচ্চা হরিণগুলো ওপারে, তার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনটে ছিলো একটু আগে একটা গেলো। ঐ আরেকটা । কালরাজ গর্জে উঠলো। পাহাড়ে পাহাড়ে তার গর্জনের প্রতিধ্বনি শোনা গেলো। না, আর পিছোবে না সে। দেখে নেবে হরিণের দলটাকে।

খাদের মুখে, যেখানে কটা পাথর ঢালু পাহাড়ের গায়ে গাঁথা, সেখানে নামতে পারলে খাদের ওপারে যেতে দেরী লাগবে না। আর তা হলেই নরোম উষ্ণ মিষ্টি রক্তমাংসের স্বাদে মুখটা ভরে যাবে। কালরাজের দুচোখে লোভ চকচক করতে লাগলো। সে পায়ে পায়ে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগলো। হরিণের লোমগুলো পর্যন্ত দেখতে পায় সে। আর একবার মাত্র একটা লাফ। আন্দাজ করে ঠিক মতো একটা লাফ শুধু!

কালরাজ বসে পড়ে। শরীরটা গুটিয়ে আনে, পেছনের পা দুটোতে সারাজীবনের শক্তি এনে জড়ো করে।

হুঁশিয়ার, চিত্রল চেঁচিয়ে উঠলো, শয়তানটা এক্ষুনি লাফ দেবে।

একটা বাচ্চা হরিণ তখনও ওপারে যেতে পারেনি। বাঘ দেখে ভয় পেয়ে থরথর করে কাঁপছে সে।

চিত্রল আক্রমণোদ্যত হিংস্র লোভী জানোয়ারটাকে দেখছে। দেখছে আর ঘেন্না হচ্ছে তার। ঘাতক খুনী জীব, তার গায়ের গন্ধ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সব কিছুর মধ্যে কীরকম যেন একটা ঘেন্না মেশানো আছে বলে মনে হয় তার। চিত্রল মনে করতে চেষ্টা করলো, তার মা-বাবাকে মেরেছিলো এই শয়তানটাই। কতো হরিণ যে ওর পেটে গিয়েছে, কেউ তার হিসেব দিতে পারে না। কিন্তু এবার ? এবার আর তা হতে দেবে না চিত্রল, এখানে এই ঢালু খাড়াইয়ের পাশে তোকে আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবো। সে মনে মনে বলে। আয় চলে আয়, চিত্রল ডাকে যেন বাঘটাকে। ডাকে আর দেখে, ডোরাকাটা দাগগুলো যেন তার শয়তানীর সাজ। জানোয়ারটার চোখের ভেতরে কী রকম ধূসর শীতল একটা আলো জ্বলছে। চিত্রল চেনে, সে আলো হচ্ছে বিশ্রী লোভের আলো।

হঠাৎ চিত্রল চেঁচিয়ে উঠলো, হুঁশিয়ার। লাফ দিয়েছে বনের রাজা কালরাজ। বাচ্চা হরিণটা চিৎকার করে উঠলো। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। কালরাজ পাথর তিনটের ওপর এসে পড়লো। বিদ্যুৎ বেগে ওপরে উঠে গেলো চিত্রল, চপল, অশান্ত। বাচ্চা হরিণটা ছিটকে পড়ে নিচের একটা পাথরে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। কালরাজ পড়ামাত্রই বড় পাথর তিনটার নিচের নুড়িগুলো গড়িয়ে পড়লো। দুলে উঠলো পাথরটা। কালরাজ দেখলো হাত বাড়ালেই বাচ্চাটাকে পাওয়া যায়।

যেই থাবা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ অনুভব করলো তার পেটের কাছে কয়েকটা ধারাল খোঁচা লাগছে। চকিতে তাকিয়ে দেখলো তিনটি হরিণ তাদের ধারালো শিং দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলতে চাইছে। কালরাজ শরীরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিলো তারপর ফিরে দাঁড়ালো। পেছনের একটা পা রাখার জায়গা পাথরটাতে নেই। নিচে কোন মাটি পাচ্ছে না সে,যে পায়ে জোর পাবে। তবু জানোয়ারটা রাগে লোভে হিংস্রতায় কুটিল হয়ে উঠলো। সে চিনে নিলো হরিণটাকে যেটা তার মুখের গ্রাস সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। চিত্রল কাছে ছিলো, চিত্রলের মাথা লক্ষ্য করে সে একটা থাবা মারলো। ধারালো নখ লেগে চিত্রলের গলার কাছ দিয়ে অনেকটা জায়গা চিরে গেলো। লাল হয়ে উঠলো গলাটা।

ছোট্ট একটুখানি জায়গা পাথরের ওপর পাথর আল্‌গা হয়ে লেগে আছে, বাঘের ভারী শরীরটা যেদিকে হেলছে পাথরটা সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে।

কালরাজ বুঝলো এক্ষুনি পাথরটা খসে গড়িয়ে পড়বে। নিচের অন্ধকার খাদের দিকে ও তাকিয়ে দেখলো। দেখে বুকের ভেতর কী যেন কেঁপে উঠে। না, তার উঠে যাওয়া দরকার। সে ওপরের দিকে একটা শক্ত পাথর খুঁজলো, যেখানে সে লাফ দিয়ে উঠে যেতে পারে। দেখলো কয়েক হাত দূরেই পাথরটা আছে। সে চলে যাবে এখনকার মত। কিন্তু মুখের গ্রাস কে ফেলে রাখে? বাচ্চা হরিণটাকে দেখে সেই মুহূর্তে সারা জীবনের ক্ষুধা যেন তার পেটের মধ্যে জ্বলে উঠেছে। বাচ্চা হরিণটার দিকে আরেকবার সে থাবা বাড়ালো।

বাচ্চাটার বাঁচবার আশা নেই, নিজের ঘাড় থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে, তবু চিত্রল চেঁচিয়ে ডাকলো, অশান্ত, চপল। তারপর শিং বাগিয়ে এগিয়ে গেলো। অশান্ত চপল তার ডাক শোনার আগেই সে শিংসুদ্ধ মাথাটা বিদ্যুৎ গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে দিলো। কি একটা ফুঁড়ে শিং দুটো ভেতরে প্রবেশ করলো বলে মনে হলো তার। আর সঙ্গে সঙ্গে নাকের কাছে একরাশ লোম এবং দুর্গন্ধ এসে লাগলো। আর ঠিক তক্ষুনি মনে হলো, কি একটা প্রচণ্ডশক্তি তার পিঠের ওপর ভেঙ্গে পড়েছে। সে মুখটা ফেরাতে চাইলো, পারলো না। সব কিছু ভুলে গিয়েছে সে তখন। কেবলি মনে হচ্ছে, জন্ম জন্মের শত্রু এই জানোয়ারটার কাছে তার হার মানলে চলবে না। পেছনের পা দুটোর ওপর ভর করে প্রচণ্ড শক্তিতে সামনের দিকে সে মাথার বোঝাটাকে ঠেলে ফেলতে চাইলো।

সবাই তখন বিমূঢ় হয়ে দেখছে।

পাথরটা দুলছিলো, তার নীচ থেকে দুটি একটি করে নুড়ি খসে পড়ছিলো। এক সময় একটা পাথর খসে পডলো আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা চিত্রলের পিঠ ছেড়ে সামনের থাবা দুটো দিয়ে কী যেন আঁকড়ে ধরতে চাইল। মুহূর্তের জন্য মাত্র, তারপরই পাথরটা আ্‌লগা হয়ে কাত হলো এবং বনের রাজা কালরাজকে নিয়ে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটার পেটে শিং গাঁথা অবস্থায় চিত্রলও পড়লো সেই অনেক নিচে, অন্ধকার খাদে, যে অন্ধকার থেকে কেউ কোনদিন আর উঠে আসে না।

তখন সকাল হচ্ছে, পাখীদের কলকাকলিতে সারা বন যেন ঝঙ্কার দিচ্ছে। পূব পাহাড়ের মাথায় সোনার মত রোদ ঝলমল করছে। হরিণেরা একে একে খাদ পার হয়ে এলো।

বাচ্চারা ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বুড়োরা কথা বলছিলো না। চিত্রলের মা বাবা নেই। কেউ কাঁদছিলো না ওর জন্য। অশান্ত আর চপল সবার পেছনে আসছিলো।

কিছুদুর এগোবার পর সর্দার ডাকলো, কোনদিকে যেতে হবে?

অশান্ত সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, চপলও দেখলো, তারপর তারা এগিয়ে গেলো বাম দিকে, হ্যাঁ, বাম দিকে। অশান্ত সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, বাম দিকে চলো। পাহাড় বন পার হয়ে গেলে নদী দেখবো আমরা। নদী পার হয়ে গেলে পাবো সেই সমতল যেখানে মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু সবুজ আর সবুজ।

বাচ্চারা লাফাতে লাফাতে চললো চপল আর অশান্তর পেছনে পেছনে। তারা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলো, বামের রাস্তা নদী পার হয়ে সবুজ প্রান্তরে গিয়ে উঠেছে। তারপর সবুজ প্রান্তর পার হয়ে তারা পৌঁছোবে পাঁচ-পাহাড়ের কোলে, যার চূড়োয় রুপোর মত বরফ ঝলমল করছে। দেখবে সেই বরফ গলে ঝর্ণা হয়ে কেমন করে নেমে যাচ্ছে। সেখানেই তারা থামবে না। পাহাড় আর ঝর্ণা পার হয়ে তারা আরো এগিয়ে যাবে। এগিয়ে গিয়ে দেখবে, বিশাল সমুদ্র আর তার বুকে নীল পাহাড়ের মত ঢেউ আকাশের বুক ছোঁবার জন্য উপরে উঠছে আর নামছে।
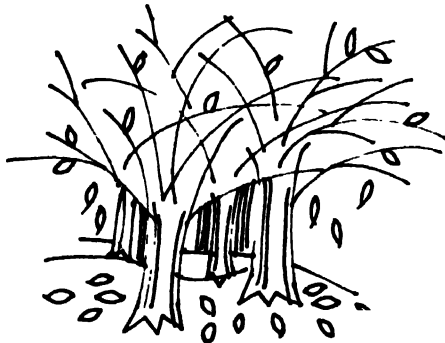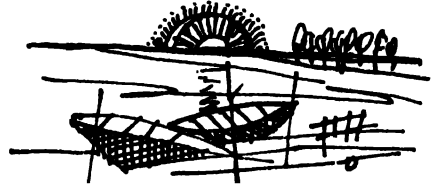
কাণ্ডারী

বশীর আল্ হেলাল

কুদরত আগে নৌকা বাইত, এখন রিকশা চালায়। সেদিন সেই কথা সে এক সাহেবকে বলছিল। সাহেব তার রিকশায় উঠেছিলেন। বলছিল, আগে মাল্লা আছিলাম, অহন রিকশালা হইছি।

কুদরতের বয়স এগারো-বারো বছর। সাহেব তো ওইটুকু ছেলেকে রিকশা চালাতে দেখে অবাক। জিজ্ঞেস করেছিলেন, খোকা, তোর বয়েস কত?

সে বলেছে, ক্যান, এগারো-বারো বছর হইব।

সাহেব বলেছিলেন, এই বয়েসে কেউ রিকশা চালায় নাকি রে, অ্যাঁ?

কুদরত তখন সবচেয়ে সহজ উত্তরটাই দিয়েছিল। বলেছিল, দ্যাখতাছেন এই বয়সে মানষে রিকশা চালায়, তয় কন, এই বয়সে কেউ রিকশা চালায় নাকি!

মোটা সাহেবটি সে-দিন হো হো করে একপেট হেসে চুপ মেরে গিয়েছিলেন, আর কোনো কথা বলেন নি। শুধু বলেছিলেন, বাপু, অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে বসিস নি যেন—বড় জরুরী কাজে বাড়ির বার হয়েছি।

কুদরত ভাবে, ওই এক কথা পেয়েছে শহরের সাহেবরা। বড় জরুরী কাজে বাড়ির বার হয়েছি। সবাই জরুরী কাজে বাড়ির বার হয়েছে, কেবল এই কুদরত ছাড়া গায়ে হাওয়া লাগাবার জন্যে রিকশা নিয়ে পথে নেমেছে। তার ইচ্ছা হয় সাহেবদের ভালো করে দু-কথা শুনিয়ে দেয়। শুনিয়ে দেয়, সেও কম ঠেলায় পড়ে রাস্তায় নামে নি, হ্যাঁ। ইচ্ছা হয়. প্রত্যেকটা সাহেবকে সে এক এক করে শুনিয়ে দেয় তার সেই কাহিনী। শুনিয়ে দেয় কেন সে গ্রাম ছেড়ে শহরে এল—শুনিয়ে দেয়, ছিল নৌকার মাঝি, কেন রিকশাওয়ালা হলো।

কিন্তু সে চুপ করেই থাকে, সে কাহিনী আর কাউকে শোনায় না। শহরের মানুষ কে কার কথা শোনে।

যাই হোক, সেই সাহেব তবু লোক ভালোই ছিলেন। রিকশা থেকে নেমে পুরো আধুলিটাই দরতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ সাহেব তো তাকে নাবালক পেয়ে ন্যায্য ভাড়াটাও দিতে চান না। শুধু তাই নয়, কত আজব রকমের সব কথা যে তাঁরা খয়রাত করে যান। কেউ বলেন, এতটুকু ছোঁড়া, অত পয়সা দিয়ে করবি কী রে, অ্যাঁ? কেউ বলেন, বাছা, পয়সা দিয়ে তো সিগারেটই ফুঁকবি আর জুয়ো খেলবি। কেউ আবার অবাক হয়ে বলেন, একজন বড় মানুষ যা চায় তুইও যে দেখছি তাই চাইছিস খোকা?

এক সাহেব তো রিকশায় চড়ে সুরু করলেনঃ এই, তোর বয়েস কত রে? প্যাডেলে তোর পা-ই ঠেকে না, আর রিকশা নিয়ে বেরিয়েছিস যে বড়? আবার দ্যাখো না, রিকশাখানাকে ছোটাচ্ছে কী রকম। বলি, এই ছোঁড়া, অ্যাকসিডেন্ট করবি নাকি রে—অ্যাঁ?

তাই শুনে কুদরত ছুটন্ত রিকশার আসনে বসে কোমর বেঁকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, এইডি আমার ময়ুরপঙ্খী নাও।

কিন্তু সেই সাহেব তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দেয়ার বেলায় দিচ্ছেন কত? না আট আনার জায়গায় চার আনা পয়সা। সে অবাক হয়ে বলে, কী দ্যান সা'ব?

সাহেব বলেন, ক্যান, যা ভাড়া তাই দি?

চাইর আনা কি ভাড়া অইল সা'ব? কই কোন্ হালায় রিকশালা আপনেরে আমতলি থিক্যা বেলতলি চাইর আনায় লয় তাই জিগান দেহি কেউরে?

সাহেব তখন বলেন, হোনো আজব কথা। হ্যাঁ রে, তরে আবার রিকশালা কইব কোন্ হালায়—তুই হলি গিয়া রিকশালার ছাও। তর বাপরে যেই ভাড়া দেওন লাগত হেই ভাড়া তুই তরে দিবার কস?

কুদরত তখন বলেছিল, সাহেব, এইডা কি একডা কথা অইল? আপনে ইমান থেক্যা কন, আমি কি বেশী সময় লাগাইছি, না আপনেরে কষ্ট দিছি, না—

সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, দ্যাখ্, মানুষের ইমান লইয়া কথা কইস্ না। আমার ইমান ঠিকোই রইছে। ল, আর এক আনা ল।

আর এক আনা পয়সা দিয়ে তিনি গট্‌গটিয়ে চলে গিয়েছিলেন। কুদরত আর কী করে, তার ঘামে-ভেজা কপাল, ঘাড় আর কচি গাল দুটো গামছায় মুছতে মুছতে সাহেবের চলে যাওয়ার পানে তাকিয়ে থেকেছে। রাত্রির অন্ধকারে মুরগির ঘাড় মট্‌কে ধরে শিয়াল যেভাবে পালায়, তিনি তখন সেইভাবে পালাচ্ছিলেন। কিন্তু তখন আকাশে মাটিতে কড়া রোদ্দুর। সেই কড়া রোদ্দুরে গা ডুবিয়ে বেলা এগারোটার তপ্ত ধোঁয়াটে আকাশের দিকে মুখ করে কুদরত শুধু বলেছিল, আল্লা, আমারে জলদি সে'না কর্—আমারে জলদি বড় কর!

এখন তার রিকশায় যাচ্ছেন এক 'ম্যাম-সা'ব'। এই মেম-সাহেবদের কুদরত বড় ভালোবাসে। তাঁরা তার মা-বহিন-তুল্য। তাঁদের সে ভালোবাসে এইজন্যে যে তাঁরা বড় কম কথা বলেন। এইটুকু ছেলেকে রিকশা টানতে দেখে শুধু মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করেন, কোনো কথা বলেন না। মনে দুঃখ পান বলেই মুখে কথা ফোটে না। এবং রিকশা থেকে নেমে ঠিক ভাড়াটি দেন। এইজন্যেই তাঁদের কুদরত বড় ভালোবাসে। ভালো লাগার আরো একটা কারণ—আহা, তাঁরা সুন্দর সেজেগুজে থাকেন। যেমন তাঁদের মন সুন্দর, তেমনি বসনভূষণ সুন্দর। তাঁরা চুলে পরেন ফুল, সঙ্গে সুবাস বয়ে আনেন। ছোটো-চাচার কাছে সেই যে ফুলপরীর গল্প শুনেছিল, ই ফুলপরীরাই তো তার রিকশায় এসে ওঠে। যদি একটি গাছের ছায়ায়, কি পথের মোড়ে, কি

বাড়ির দরজায় কোনো মেম-সাহেবকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে, অমনি সে রিকশা নিয়ে ছুটে যায় হাওয়ার বেগে। বলে, 'আহেন আম্মা—কই যাইবেন?' এই হলো তার স্বভাব।

আর তিনি রিকশায় উঠে বসলে তখন কুদরতের গায়ে একগুণ বল দিগুণ হয়, হ্যান্ডেলের উপর দুই মুঠি যেন বজ্র-মুঠি হয়ে ওঠে, প্যাডেলের উপর পা-দুটিতে তখন তার অসম্ভব শক্তি। সে তখন ঝন্‌ঝনিয়ে ঘন্টি বাজিয়ে গান পর্যন্ত ধরে:

ওরে ও রে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও!

মেমসাহেবদের নিয়ে রিকশা ছোটাতে তার ভারি ভালো লাগে তার কারণ তাঁরা তার রিকশায়

চড়লে তার অকারণ বু-জানের কথা মনে হয়। মনে হয়, বু-জানই বা চড়েছে তার রিকশায়।

হায় বু-জান কখনো তার রিকশায় চড়ে না। কত সাধ তাকে রিকশায় চড়াবে। কিন্তু বু-জান শুনলেই আঁৎকে উঠে জিভ কেটে বলে, হায়, এইডা তুই কেমন কথা কস্‌। তুই আমার পরানের ভাই—তর রিকশায় আমি চড়মু। তর রিকশায় চড়নও যা তর মাথায় পারা দেওনও তা।

তাই শুনে কুদরত হাসে। মনে মনে বলে, বু-জান এতকাল শহরে থাকলে কী হবে, তার

গায়ের এখনো গাঁয়ের গন্ধ যাইতে দেরি আছে।

অথচ কুদরত নৌকার বৈঠা ছেড়ে রিকশার হাতল ধরেছে বু-জানেরই জন্যে। বা-জান বড় শখ করে বু-জানের বিয়ে দিয়েছিল শহরে। স্বামী তার চাকরি করত কারখানায়—তেজগাঁয়। তের শ ছিয়াত্তরের বৈশাখের ঝড়ে কারখানার বিরাট বাড়ির নিচে চাপা পড়ে সে মারা গেল। খবর পেয়ে বাপ-বেটা দুজনেই শহরে ছুটে এসেছিল। বু-জান তখন তিনটি ছোটো ছেলেমেয়েকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে বুক চাপড়ে কাঁদছে। কুদরত দুই হাতে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেছিল, বু-জান, চলো—গেরামে চলো। শহরে আর থাওনের কাম নাই।

কিন্তু বা-জান বলেছিল, বা-জান, তোর বইন গেরামে গিয়া খাইত কীডা, হেই কথাডা আগে চিন্তা করিস। আমাগোরই দিন চলে না—আমরাই শহরে আইয়া ভিখ মাইগ্যা প্যাট চালানের কথা ভাবতা আছি।

কুদরত তখন বলেছিল, তাইলে বা-জান, তুমি যাও গিয়া। আমি আর গেরামে ফিরতাম না—বু-জানের লগে থাকতাম।

বা-জান বলেছিল, এহানে তুই কী করতিস বা-জান ?

কুদরত বলেছিল, সাহেবগো বাড়ি কাম করতাম—ক্যান আমাগো রশিদ-ভাই আর তার বইন লতিফন যেই কাম করে।

বা-জান বলেছিল, এতগুলি মান্ষের হেতে প্যাট ভরত না রে বা-জান।

সে কথা ঠিক ! সাহেবদের বাড়ি চাকর-নফরের কাজ করে কেবল নিজের পেটটাই চলে, অন্যের পেট চালানো যায় না। তাই কুদরত শেষ পর্যন্ত রিকশা চালানোর কাজ নিয়েছে। রিকশা চালানোর তার বয়স হয়নি। রিকশার সীটে বসলে প্যাডেলে পা-ই ঠেকে না। সীট ছেড়ে রডে বসে কোমর বেঁকিয়ে কোনো রকমে প্যাডেল ঘোরাতে হয়। কোনো রিকশার মালিক তার হাতে রিকশা ছাড়তেই চায় না। শেষ পর্যন্ত হাতে-পায়ে ধরে একজনকে রাজি করিয়েছে। সে-দিন এক ভদ্রলোক তার রিকশায় চড়ে বলেছিলেন, তোদের রিকশা চালাতে দেয় কে তাই ভাবি। হ্যাঁ রে, এই বয়েসে রিকশা টানিস, রাজ-রোগে যে মরবি !

কুদরত বাঁই বাঁই করে রিকশা ছোটাতে ছোটাতে বলেছিল, কী যে কন সা'ব—মরমু ক্যা ? আমরা যদি মরি, আপনাগোরে চালাইত কেডায় ? আপনেরা আমাগো পায়ে চলেন কিনা কন ?

হ্যাঁ, যে কথা বলতে গিয়ে এত কথা—মেমসাহেবরা তার রিকশা কেরায়া নিলে তার বড় আনন্দ হয়। কিন্তু তার চেয়েও আনন্দ হয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার রিকশায় চড়লে।

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তার রিকশায় চড়লে কুদরতের কী যে ভালো লাগে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলিই শুধু কুদরতকে মানুষ বলে গণ্য করে। আর তাদের মনে ভয়-ডরও কম। বড়রা যদি রিকশায় চড়ল তো কত রকমের কথা। 'এই, আস্তে চালা, সাবধানে চালা—অ্যাকসিডেন্ট করিস না বাছা—এই যে দ্যাখো, লাগাল বুঝি ধাক্কা!' এমনি যত প্যানপ্যানানি। সব ছাগলের বাচ্চা।

কিন্তু কুদরত কখনো কোথাও ধাক্কা লাগায় না। ধরো, রিকশায় বসে হঠাৎ সামনে একেবারে চোখের উপর বিরাট ট্রাক দেখে সাহেব হয়তো আঁৎকে উঠলেন। কিন্তু তখন কুদরত তাদের গাঁয়ের সেই কার্তিক মাসের ছোটো নদীটিতে স্বচ্ছ স্রোতে চিকন মউরালা মাছটির মতন সাঁৎ করে রাজপথের কল্লোলে ঠিকই ঢাউস ট্রাকটিকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। তার একটু বুক কাঁপে নি।

কিন্তু বাচ্চা মানুষদের অমন ভয়-ডর নাই। তারা হুই হুই করে উঠবে রিকশায়। উঠে কেউ বসল, কেউ বসল না—অমনি তাড়া লাগাবেঃ রিকশালা, জোরে চালাও, জোরে—আরো জোরে।

তাছাড়া, ফুটফুটে বাচ্চা মানুষগুলি রিকশায় চড়লে কুদরতের তার রিকশাকে আর রিকশা বলে মনে হয় না, মনে হয়, সে ডোঙা বোঝাই ফুল নিয়ে যাচ্ছে—পদ্মফুল—লাল সাদা তাজা উজ্জ্বল পদ্মফুল। তাদের গাঁয়ের পদ্ম-বিলে কত পদ্ম। সেখানে ডোঙায় করে মাছ ধরতে গিয়ে সে তো শুধু মাছ নিয়ে আসে না, মাছের সঙ্গে পদ্ম আনে ডোঙা বোঝাই করে।

কুদরত তাই স্কুলের ছুটির সময় স্কুলের ধারে-কাছে থাকে। ছুটির ঘন্টা পড়লে ওরা গেট পেরিয়ে বাঁধ-ভাঙা পানির মতো ছুটে আসে। তাদের মধ্যে দু-তিন জন বাচ্চা মানুষ যখন ব্যাগ-হাতে পড়ি-মরি করে ছুটে এসে তার রিকশায় ওঠে, তার গর্বের অন্ত থাকে না। সে তখন রাজপথের জনস্রোত আর গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়ের দিকে নজর ফেলে কল্পনা করে, সে জবর মাল্লা। খ্যাপা গাঙের খরস্রোতে শক্ত হাতে বৈঠা বেয়ে তাকে যাত্রী পার করতে হবে—নিরাপদ ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে তাকে। ঘাম চক্‌চকে শরীরে গায়ের সকল বল একত্রিত করে সে ক্রিং ক্রিং ঘন্টা বাজিয়ে রিকশা নিয়ে রাজপথের স্রোতে নেমে পড়ে। খানিকক্ষণ গাড়িটাকে হাতে টেনে তারপর প্যাডেলে পা রেখে লাফিয়ে উঠে গান ধরেঃ

হুশিয়ার ! হুশিয়ার !
ও মাঝি রে—
আজি ঝড় তুফানে চালাও তরী
হুশিয়ার ! হুশিয়ার !

সে-দিন সক্কালবেলা দুই সাহেব তার মেজাজটাকে খারাপ করে দিলেন। খালি গায়ে সকালবেলার ফুরফুরে হাওয়া লাগিয়ে গান গাইতে গাইতে সে রিকশা নিয়ে বেরিয়েছিল। বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াতে কোত্থেকে দুই সাহেব এসে উঠলেন। তাঁরা তাকে রাস্তায় রাস্তায় কম ঘোরানো ঘোরালেন না। কুদরতের ঘাম ছুটে গেল। তারপর ভাড়া দেয়ার বেলায় দেখা গেল, তাঁরা আসলে কিপ্‌টের বাদশা। ভাড়ার পয়সা হাতে নিয়ে কুদরত বলল, এই আপনেগো ইনসাফ ?

তাঁদের একজন বললেন, তুই ইনসাফের কী বুঝিস রে ?

ব'লে তাঁরা আর দাঁড়ালেন না।

বেচারা কুদরত আর কী করে, তার মনটা তেঁতো হয়ে গেল। সে পেছন থেকে চীৎকার করে বলল, আমি এত বড় একখানা সংসার চালাইতেছি, আমি ইনসাফ বুঝমু না ?

কিন্তু সাহেবরা তা শুনলেন কিনা কে জানে। কুদরত লুঙির খুঁটে কপালের ঘাম মুছে খালি রিকশা নিয়ে আবার যাত্রা করল। সে আস্তে আস্তে প্যাডেল করছে। হঠাৎ দেখে, বিরাট একখানা ঘিয়া রঙের চক্‌চকে গাড়ি রাস্তার মাঝখানে অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। গাড়িটা নড়েও না চড়েও না। শুধু প্রথম বর্ষার কোলাব্যাঙের মতো থাবা গেড়ে বসে মাঝে-মাঝেই ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাক ছাড়ে। কিন্তু 'ইস্টার্ট' আর নেয় না। কুদরত তাই দেখে খুব হাসতে লাগল।

রিকশা চালাতে চালাতে এই রকমের দৃশ্য দেখলে কুদরতের মজা লাগে। সে দু-একটা ইয়ারকি-ফাজলামি না করে পারেই না। গাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে হাত দুলিয়ে উঁচু গলায় বলল, ও মিয়া, আপনাগো গাড়ির যে সর্দি অইছে—বুকে তইল্ মালিশ করন লাগব—হ।

বলে সে গান ধরেছিল, আর ফিরে তাকায় নি। তখন তাকে পিছন থেকে কারা ডাকল। কচি মিষ্টি আওয়াজে কারা কল্‌কলিয়ে ডাকল। কুদরত পেছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখল, দুটি বাচ্চা মেয়ে আর একটি বাচ্চা ছেলে স্কুলের পোষাক পরে বইয়ের ব্যাগ পানির বোতল হাতে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। তারাই তাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

কুদরতের বুঝতে দেরি হলো না। সে ব্রেক কষে কোমর বেঁকিয়ে রিকশা থামাল। তারপর নেমে রিকশার মুখ ঘোরাল। গাড়ির কাছে রিকশা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, কোন্ ইশ্‌কুলে যাইবেন ? আহেন, ওডেন। আহা, আপনাগো গাড়ি খারাপ অইছে ? তয় ডর নাই, আহেন, আমি পৌঁছাইয়া দিমু।

খোকা-খুকুরা কুদরতের রিকশায় উঠে খুব আনন্দে কলরব করতে লাগল। প্রতিদিন গাড়িতে করে স্কুলে গিয়ে গিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কিনা, তাই আজ খোলা রিকশায় খোলা আকাশের নিচে হেলে দুলে ছুটতে তাদের কী যে মজা লাগছে।

কুদরত মুখ ঘুরিয়ে বলল, আপনেরা পঙ্খীরাজের কিস্‌সা হোনেন নাই ?

ওরা সমস্বরে বলল, শুনেছি শুনেছি!

আমার এই রিকশা সেই পঙ্খীরাজ।

খোকা-খুকুরা বলল, সত্যি সত্যি সত্যি।

তারপর ওরা হাসতে লাগল। কুদরত রিকশাওয়ালাও ওদের সঙ্গে হাসতে লাগল।
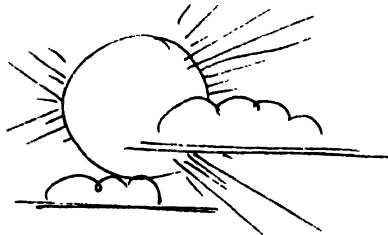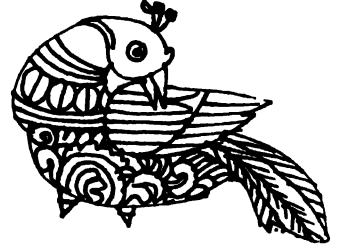
টিটিচিকোরি

বুদ্ধদেব গুহ

ভবানীপুরের গঙ্গাপাড়ের একটি জরাজীর্ণ ভাড়াবাড়িতে রায়পরিবার থাকতেন আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। ছোটবাবু ছিলেন জগৎ রায়। অবিবাহিত, উপার্জনহীন। বাড়ির ভাইপো-ভাইঝি বোনপো-বোনঝি তাঁকে ডাকত, 'ছোটকামা' বলে। মামা এবং কাকা মিলিয়ে।

ছোটকামা বললেন, "অ্যাই পাপা, পা'টা একটু টিপে দে তো! বড্ড ফাঁকিবাজ হয়েছিস তুই।"

পাপা পায়ের কাছে গিয়ে বসল তক্তপোশে। দু'হাতে ছোটকামার পা টিপতে লাগল।

বাড়ির উঠোনের মস্ত বিলিতি আমড়াগাছটাতে পাতার আড়ালে বসে দাঁড়কাক ডাকছিল লাল টাগরা বের করে। গরমের দুপুর। ঝাঁঝাঁ করছিল সাদা রোদ। কা-খ্‌বা-খ্‌বা করছিল কালো কাক।

ডুনা জল নিয়ে এল। ছোটকামা কনুইতে ভর দিয়ে একটু উঠেই ঢকঢক শব্দ করে জল খেলেন।

"কোথায় ছিলাম রে?" ছোটকামা শুধোলেন গল্পের খেই ধরিয়ে দেবার জন্যে।

"ঘনুমামা এখন তাঁর টাট্টুঘোড়ায় করে চলেছেন বাড়েধাঁনের জঙ্গলে," টুলু বলল।

"হ্যাঁ, বাড়েধাঁনের জঙ্গলে," ছোটকামা শুরু করলেন, "ঘনু চলেছে। গরমের দুপুর। গো-পোড়ানো হাওয়া বইছে বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে। সাপেরা সব গর্তের মধ্যে। জংলি ইঁদুর পাহাড়ি নালার ভিজে বুকের পচা পাতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে। বনমুরগি আর তিতির, আসকল, বটেরদের সরু-সরু গলা তিরতির করে কাঁপছে তখন, গান গাইতে থাকা গায়িকার গলার শিরার মতো। ঝরঝর শব্দ করে বয়ে চলেছে পথের দু'পাশ দিয়ে প্রমত্ত ঝরনার মতো লাল, হলুদ, খয়েরি, কালো শুক্‌নো পাতা, হাওয়ার স্রোতের সওয়ার হয়ে কালো কালো নানা আকৃতির পাথরের আর গেরুয়া মাটির উপর দিয়ে। তেষ্টায় ছটফট-করা ময়ূর ডেকে উঠছে বনের গভীর থেকে 'কেঁয়া-আ, কেঁয়া-আ-আ' করে। ডাকছে কালী-তিত্তর জঙ্গলের বুকের

গভীরের মধ্যে লুকনো টাঁড় থেকে। নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যাচ্ছে কোনাকুনি পথের উপর দিয়ে মত্ত হাওয়ায় ঘুরপাক খেতে-খেতে, লাট-খাওয়া ঘুড়ির মতো। ঘনু চলেছে বিলিতি ক্যালেণ্ডারের বহুরঙা ছবির মতো সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তার টাট্টুঘোড়ায় চেপে, টগবগ.... টগবগ.... টগবগ। শব্দ উড়ছে ঘোড়ার খুরে হাওয়ার খুরে। হাজার হাজার অদৃশ্য সব ঘোড়সওয়ার যেন হাওয়ার সওয়ার হয়ে কী এক লড়াইয়ে মেতেছে সেই মর্মরিত বনে-বনে।"

কোথায় যাচ্ছেন ঘনুমামা আজকে, ছোটকামা? পাহাড়ি গ্রামের অত্যাচারী টিকায়েতের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে কি? না, গত রাতে যে ভালুকমায়ের ছানাকে খাদের কুলিরা চুরি করে এনেছিল, তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে?" ডুনা শুধোল উৎকণ্ঠিত গলায়।

"না না, ওসব নয়। আজ ঘনু চলেছে এক দারুণ জায়গায়। এক অবাক পৃথিবীর গভীরের এক অবাক ছবিতে। বলতে পারিস, চলেছে তীর্থযাত্রাতেই। সেই জঙ্গলের গভীরের নীল ঝিলের জল যদি কেউ খায়, কেউ চান করে সেখানে, তবে তার খিদে-তেষ্টা, দুঃখ-কষ্ট কিচ্ছু থাকে না। ছেলে হলে জিন, মেয়ে হলে পরি হয়ে যায় সে," ছোটকামা বললেন।

খুকু হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছিল। ছোটকামা'র মাথার চুল থেকে হাল্কা আর্নিকা তেলের মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ ভাসছিল ঘরে। আলতো হয়ে।

"কোথায় সে জায়গা গো ছোটকামা? নাম কী সে জায়গার?" তিমির শুধোল চোখ বড়-বড় করে।

"বনেরই বুকের দামি ঝিনুকের মধ্যে লুকিয়ে-রাখা দুর্মূল্য মুক্তোর মতো সেই ঝিল। নাম তার টিটিচিকোরি।"

"কী বললে, কী বললে? কী? কী?" ওরা সমস্বরে শুধোল অদ্ভুত শব্দটা শুনে।

"টিটিচিকোরি।"

"টুমি ডাওনি ককনও ছোটকামা? টুমি নিডেও ডাওনি?" পিতৃমাতৃহীন গাগা বলল। গাগার বাবা ছিলেন রায়বাড়ির ন'ভাই। স্বামী-স্ত্রী বিয়ের দু' বছরের মাথায়ই ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা যান। গাগার তখন এক বছর বয়স। এখন গাগার বয়স দশ। পাপার চেয়ে বছরখানেকের ছোট সে। এখনও ওর মুখে এরকম আধো-আধো বুলি। কাককে বলে টাক, ভাতকে বলে ভাট।

"না, আমি নিজে যাইনি কখনও। একবার যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারি," বলেই ছোটকামা হঠাৎ নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে গেলেন।

গল্পের স্রোতে বাধা পড়ায় টুলু বকল গাগাকে। বলল, "বড় বেশি কথা বলিস তুই।"

গাগা বলল, "বেঠ, আমি আড এড মড্যে নেই।" রাগ করেই উঠে যাচ্ছিল ও।

ছোটকামা বললেন, "বোস, বোস। তোর দোষ কী? দোষ তো আমার। শোন বলি। টিটিচিকোরি ঠিক যে কোথায়, তা ঘনুই জানত। তবে শুনেছি বাড়েষাঁনের জঙ্গলের মধ্যে। তার মুখেই শুনেছিলাম তো আমি। মারুমার, গাড়ু, লাত, মুণ্ডু, চাহালচুঙরু, বাড়েষাঁন, লাতেহার, লোহারডাগা, রাংকা এমনি সব কত জঙ্গলেই না যেত ঘনু! আমাকেও নিয়ে যেত মাঝে-মাঝে ডালটনগঞ্জ থেকে। কিন্তু কোনও জঙ্গলের সঙ্গেই টিটিচিকোরির তুলনা হয় না। গা-ছমছম ভয়ের, গা-রিমঝিম ভাল লাগার এমন জায়গা পালামৌ জেলার আর কোথায়ই ছিল না। এমনই বন যে, সূর্যের আলো পৌঁছয় না সেখানে। সেই বনের মধ্যে কতরকম যে গাছ, ফুল, ফল, পাখি। কত জানোয়ার, পোকা, প্রজাপতি। আর তার ঠিক মধ্যিখানে এক ছোট্ট ঝিল। আয়নার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছোট আয়নারই মতো। আর শীতের কোয়েল নদীর চেয়েও তার জল

পরিষ্কার। কচি কলাপাতা-রঙা উপত্যকার মধ্যে-মধ্যে ঝিঙে-রঙা পাহাড় পেরিয়ে পথ। একটি নয় রে, পরপর সাতটি পাহাড়; ঝিলের পাশে। সাত বোনের মতোই ঘিরে রয়েছে ঝিলটিকে হাতে হাত ধরে। তাদের একজনের গায়ে শালবনের শাড়ি, অন্যজনের সেগুনবনের। কারও শিমুলের লালে লাল, কারও করমের, কারও-বা সিসুর। আলাদা-আলাদা বন, এক-এক বোনের গায়ে। সেই যে সাত পাহাড়ের পাহারা-ঘেরা ঝিল, তারই নাম টিটিচিকোরি। বুঝলি গাগা, জ্যোৎস্নারাতে জিন-পরিরা চান করতে নামে সেই ঝিলে। যদি তাদের কেউ দেখে ফ্যালে, তবে তার মৃত্যু নির্ঘাত। তাই যদি-বা কেউ যায়ও টিটিচিকোরিতে, সন্ধের পর থাকে না মোটেই।"

"তা হলে? ঘনুমামা যাচ্ছেন কেন? যেতে-যেতে যদি রাত হয়ে যায়?" উদ্বিগ্ন গলায় শীলা বলল।

"আজকে রাতের বেলা তো সে থাকবেই সেখানে। ঘনু একটা ডেয়ার-ডেভিল পাগল। জিন-পরিদের চান করা দেখবে নাকি চাঁদের আলোয়। চাঁদের সাপেরা খেলা করবে তখন জলে, তারার ফুল ভেসে বেড়াবে, আর তারই মধ্যে পরিরা জলের সুঁচ জলের সুতো দিয়ে জলেরই মধ্যে নকশি-কাঁথা বুনবে।"

"আররে, মলে ডাবে ডে! ডুবে ডাবে না?" গাগা বলল, "ঘনুমামা মলে ডেলে আমাডের কী হবে? কাড গড়প ঠুনব আমডা?"

"মরতে যে পারে, তা ভাল করেই জেনেশুনে তো যাচ্ছে রে। মরতে যে ভয় পায়, সে কি

টিটিচিকোরিতে যেতে পারে কোনওদিন ?"

"তাড়পড় ?" গাগা আবার শুধোল।

শীলা বলল, "ঘনুমামার কি ভয়ডর নেই ?"

"ভয় তো আমাদের জন্যেই। ঘনুর অভিধানে ভয় বলে কোনও কথাই ছিল না। ঘনু কী বলত জানিস ?"

"কী ?"

"বলত, ভয় কথাটা মুছে দেওয়াই উচিত অভিধান থেকে।"

"কেন ?" খুকু বলল গোলাপী ঠোঁট ফাঁক করে।

"ভয় বলে আসলে কোনও জিনিসই নেই। তা থাকে শুধু ভীরুদেরই মনে। না-জানারই আর-এক নাম ভয়। যা-কিছুই আমরা জানি না, যা-কিছুই আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, তাতেই আমাদের ভয়।"

"বলো, বলো !" নীলা বলল।

"হ্যাঁ," ছোটকামা বললেন, "চলেছে তো চলেইছে ঘনু। দুপুরের খাওয়া বলতে একটি বাখরখানি রুটি, দুটি ল্যাংড়া আম আর একটু আমলার আচার। ঘোড়াকেও ঘাস খাইয়েছে। কিন্তু জল পায়নি একটুও। ঘোড়ার পিঠে বাঁধা যে ছাগল ছিল, মানে ছোট্ট ভিস্তি, তার জলও শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। টিটিচিকোরিতে না পৌঁছলে আর জলের আশা নেই।"

"তারপর ?"

"বেলা পড়ে আসছে। রোদটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। গাছের ছায়াগুলো লম্বা থেকে আরও লম্বা হয়ে লুটিয়ে পড়ছে পুবের জঙ্গলের পায়ে কালো আঁচলের মতো, সূর্য যতই হেলছে পশ্চিমে। সামনে দেখা যাচ্ছে জানোয়ারের আর জংলি মানুষদের পায়ে চলা সরু শুঁড়িপথ। ফরেস্ট ডিপার্ট-এর পথ ছেড়ে হঠাৎই বাঁ দিকের গভীর বনের মধ্যের উপত্যকায় হুমড়ি খেয়ে নেমে গেছে সেই শুঁড়িপথটি। যেন ভয়ে-ভয়েই।"

"ঘনু তার ঘোড়ার লাগামে টান দিল। তারপর দু'হাঁটু দিয়ে ঘোড়ার পেটে একটু চাপ দিয়ে ডান দিকের লাগাম ঢিলে করে বাঁ দিকের লাগাম সামান্য টাইট করেই ঘোড়াকে নামিয়ে দিল সেই উপত্যকায়।"

"গাছগুলোতে একটিও পাতা নেই। শূন্য ডালপালাগুলো মাথার উপরে হাত উঁচু করে বৃষ্টির প্রার্থনা জানাচ্ছে যেন মেঘহীন নীলিমার কাছে। বন তো নয়, যেন হাজার-হাজার নাগা-সন্ন্যাসীই শোভাযাত্রা করে চলেছে দ্রুতপায়ে, স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই।"

"তারপর বলো ছোটকামা, বলো," রুদ্ধশ্বাসে বলল আবার খুকু। তার ফরসা সুন্দর বালা-পরা, সুগোল ডান হাতখানিতে ধরে থাকা তালপাখাটি থেমে গেল উত্তেজনায়। ছোটকামাও থেমে গেছেন। টিটিচিকোরির পথের বর্ণনা স্তব্ধ করে দিয়েছে সকলকেই। গ্রীষ্মের দুপুরের গরম ও অস্বস্তির কথা বেমালুম ভুলে গেছে ওরা সকলে। ছোটকামার পিছনে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি মন্থনের সঙ্গে-সঙ্গে একদল কিশোর-কিশোরীও যেন চলে গেছে অনেক বছর আগের এক অদেখা গহন জঙ্গলের গভীরের আশ্চর্য ভয়ঙ্কর, সুন্দর সেই অদেখা টিটিচিকোরির পথে। ছোটকামার জঙ্গলের বন্ধু ঘনুমামার টাট্টুঘোড়ার খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি উঠছে তাদের প্রত্যেকেরই কচি মুখে। উত্তেজনা ফুটছে অন্ধকার রাতের সারসার তারার মতো উজ্জ্বল চোখে। ধুকপুক করছে বুক।

"তারপর ?" একটু ভয় পেয়েই ছোট কামার বুকের কাছ ঘেঁষে বসে বলল খুকু।

"তারপর কিছুটা এগোনোর পরেই ঘনু ঘন বাঁশের জঙ্গলে পৌঁছে গেল। যেখানে বড় বাঘ, বাইসন আর হাতিদের আড্ডা। বড়-বড় শঙ্খচূড় সাপ যেখানে ছায়াতে কুণ্ডুলি পাকিয়ে থাকে শুকনো পাহাড়ি নালার ভেজা-ভেজা বালির মধ্যে। এরা রেগে গেলে মাইলের পর মাইল তাড়া করেও লেজের উপর সটান দাঁড়িয়ে মানুষকে মুখে-মাথায় ছোবল মারে, দড়ি বাঁধারও উপায় থাকে না কোনও। সেই জঙ্গলও একসময় পেরিয়ে এল ঘনু। তারপর পৌঁছল গিয়ে চিলবিল গাছেদের বনে। মেমসাহেবদের মতো গায়ের রঙ তাদের। একটিও পাতা নেই এখন কারও গায়েই। মেমসাহেবদের গা থেকে মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। শেষ সূর্যের আলো সিঁদুরে করে তুলেছে তাদের শরীর। পাতার ঝরনা-বওয়ানো হাওয়ায় ভেসে গরমের শেষ বিকেলের গায়ের পাঁচমিশেলি তীব্র ঝাঁঝালো কটু গন্ধ আসছে দূরের হরজাই জঙ্গলের গা থেকে। মিশে যাচ্ছে মেমসাহেবদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে। পথের দু'পাশের ঝাড়ে-ঝাড়ে হাজার-হাজার লাল-রঙা ফুলদাওয়াই ফুটে উঠে বনপথকে এক লালচে আভা দিয়েছে। তেমন আভায় শুধুমাত্র কোনও বনপথই আভাসিত হতে পারে।"

"ঘনুমামা ?"

"হ্যাঁ ঘনু চলেছে সেই লালিমাতে আভাসিত পথ বেয়ে টগবগ ··· টগবগ ··· টগবগ ··· । তবে ওর টাট্টুর চালও যেন বদলে গেছে এখন। তার খুরের শব্দ অতি সাবধানে 'আর যাওয়া ঠিক হবে কি হবে না' সেই প্রশ্ন এবং উত্তর করতে করতে চলেছে নিজের সঙ্গে নিজেই। যেন বাঁয়ার সঙ্গে ঢিমেতালে কথা বলছে বাঁয়া। সেই মেমসাহেবদের বন পেরিয়ে সবে হরজাই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে ও, আর সঙ্গে-সঙ্গে বনের মধ্যে থেকে তৃষ্ণার্ত গলায় ডাকতে থাকা ময়ূর -ময়ূরী, তিতির আসকল্, বটের, টিয়া, ময়না, টুনটুনি, বুলবুলি, সবাই কোন্ মন্ত্রবলে হঠাৎই চুপ করে গেল থেমে গেল জোরে-জোরে আওয়াজ করে কাঠ ঠুকতে থাকা কাঠঠোকরাও হঠাৎ। লেজ তুলে-তুলে চিঁহর-চিরি-র-রচিরি চিঁহর-র-র করে ডাকতে থাকা কাঠবিড়ালিরাও থেমে গেল ঠিক সেই সময়েই বনের অণু-পরমাণু, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ভরে দিয়ে গমগম্ আওয়াজ করে ডেকে উঠল কেঁদো বাঘ। পালামৌয়ের বাঘ। হুঁ-আঁ-ও। ঘোড়াটার শরীরে কাঁপুনি এল ম্যালেরিয়া জ্বরের মতন। ঘনু তার গলায় আদর করে হাত বোলাল। কিন্তু ঘোড়া সামনের দু'পা জোড়া করে একবার শূন্যে তুলে পরক্ষণে নামিয়ে নিয়েই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নটনড়নচড়ন, নট কিচ্ছু কয়েকবার ডেকেই কিন্তু থেমে গেল বাঘটা। বোধহয় জল খেতেই যাচ্ছে।"

"টিটিচিকোরিতে ? তা'পর ?"

"শোন্। টিটিচিকোরিতে ঘনু যখন পৌঁছল গিয়ে, তখন সূর্য নামছে পাটে। তার গোলাপি আভায় টিটিচিকোরি ঝিলকে মনে হচ্ছে যেন এক গোলাপি সায়র। সাত-বোন পাহাড়ের হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে গোলাপির মধ্যে সবুজের ছায়া ফেলে। প্রত্যেকের গায়েই গভীর জঙ্গলের শাড়ি। পাতাঝরা বনই সব। অথচ আশ্চর্য, পাতা ঝরেনি তাদের একটিও। চারদিক থেকে ঘন বনের সবুজ আঙুলগুলি নেমে এসে ঝিলের গায়ে হাত ছুঁইয়েছে সযতনে। টিটিচিকোরির ঝিলের একপাশে সেগুনবনের পাহাড়ের একটু উঁচুতেই একটা গুহা তার উপর বসে আছে সাদা-মাথা মেছো বাজ।"

"ঘোড়া নিয়েই উঠতে লাগল ঘনু সেদিকে। খুব আস্তে আস্তে। একটু বাদেই সন্ধে নামবে গুহার মুখের কাছে এসেছে, ঠিক সেই সময়ে একটা মস্ত ভালুক গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এসে

পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে যে কত্তবড় তাই-ই দেখাল ঘনুকে। ভাবখানা, দেখেশুনে বাহাদুরি কোরো বাহাদুর। তার বুকের উপরের দিকে ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মতো একটি মোটা সাদা দাগ। হিমালয়ান বেয়ার। কী রে, পা টেপা থামালি কেন রে পাপা ?" ছোটকামা বললেন।

টিটিচিকোরির পাশ থেকে বড় কষ্ট করে পাপা ভবানীপুরে ফিরে এসে আবার ছোটকামার পা টেপা শুরু করল।

"তারপর" খুকু বলল, "বলো ছোটকামা !"

"আজ আর নয়। আবার এর পরের রবিবার। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। যা, তোরাও ঘুমিয়ে নে একটু," বলেই অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো ছোটকামা কোলবালিশটা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ওরা সকলেই হতাশার গুঞ্জরন তুলে হয় লুডো, নয় ক্যারাম, নয়তো কলের গানের কাছে ফিরে গেল।

কাদের বাড়ির রেডিওতে তখন 'অনুরোধের আসর'-এর গান হচ্ছিল 'হারা মরু নদী শ্রান্ত দিনের পাখি ...'। খুব কম লোকের বাড়িতে রেডিও ছিল তখন। কলকাতার সব মানুষই তখন এত বড়লোক হয়ে যায়নি। আরাম ছিল না, টিভি ছিল না, কিন্তু বড় শান্তি ছিল। আরামের সঙ্গে শান্তিকে গুলিয়ে ফেলেনি তখনকার মানুষ।

২

পরের রবিবারও কিন্তু ছোটকামা, রাতের বেলা টিটিচিকোরিতে ঘনুমামা কী দেখলেন, তা কিছুতেই বলেননি। না, তারপরের বা তারও পরের রবিবারও নয়। ঘনুমামা সত্যি-সত্যিই পরিদের চান করতে দেখেছিলেন কি না, তাঁর কোনও বিপদ হয়েছিল কি না, সে সবও নয়।

প্রতিবারেই ছোটকামা টিটিচিকোরিতে ঘনুমামার পৌঁছনোর বর্ণনাই দিতেন নতুন করে, নতুন ভাষায়। যেন টিটিচিকোরিতে পৌঁছনো অনেকগুলিই পথ ছিল বিভিন্ন দিক দিয়ে। তাঁর স্মৃতি আর কল্পনার মধ্যে তো নিশ্চয়ই ছিল। যে যাত্রী যে পথ বেছে নেবে. নেবে। তার খুশিমতো। তখন বলাতেও বড় খুশি ছিল। বলতেন, 'জানিস, ওখানে পৌঁছলে মানুষের আর খিদে পায় না, ঘুম পায় না, ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না কারও সঙ্গেই। ছেলেরা জিন এবং মেয়েরা পরি হয়ে যায় টিটিচিকোরিতে পৌঁছেই। কোনও দুঃখই তাদের আর ছুঁতে পারে না। খাওয়ার কষ্ট, পরার কষ্ট, আমার মতো একা-একা জীবন কাটানোর কষ্ট, কোনও কষ্টই না।'

পাপা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি নিজে তো যাননি কখনও ? একদিনও না ?'

'নাঃ, হয়নি যাওয়া। হলে তো ...।' খুবই হতাশার সুরে বলেছিলেন ছোটকামা।

ছোটকামা তিরিশের দশকের ডালটনগঞ্জ, বারোয়াড়ি, লাতেহার, বেতলা, ছিপাদোহরের জঙ্গলে কাঠ আর বাঁশের ব্যবসার স্মৃতি, ঘনুমামার মতো সঙ্গীর সঙ্গ, এই সবই পিছনে ফেলে এসেছিলেন চিরদিনের মতো, ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে। ওরা যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, 'যেতে ইচ্ছে করে না ওখানে ফিরে আপনার ? দেখতে ইচ্ছে করে না রাতের বেলার টিটিচিকোরিকে ?' ছোটকামা মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে বলতেন, 'নাঃ।' বলেই সেই প্রসঙ্গ চাপা দিতেন সঙ্গে সঙ্গেই। এ-সব প্রসঙ্গ মানে টিটিচিকোরি বা কোয়েল নদীর বা লাতেহারের পণ্ডিতজির দোকানের অথবা ছিপাদোহরের হাটের প্রসঙ্গ, এমনকি ডালটনগঞ্জ সংক্রান্ত কোনও কথা উঠলেও উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনস্ক হয়ে নিচু গলায় বলতেন, 'অন্য কথা বল। অন্য কথা। পাপা, গাগা, খুকু,

তোদের পড়াশুনো নেই? তোরাও কি আমার মতো অপদার্থ হয়েই থাকবি? বেকার? পরের বোঝা?'

৩

অনেক দিন, চল্লিশটি বছর পেরিয়ে এসেছেন ছোটকামা। পেরিয়ে এসেছে পাপা এবং গাগাও, এই কলকাতা শহরও। দেখতে-দেখতে।

বদলে গেছে কলকাতা, বদলে গেছে জীবন। বদলে গেছে মানুষের সফলতার সংজ্ঞা, চাওয়া-পাওয়ার ধরন-ধারণ। ছোটকামা, পাপা এবং গাগারও এখন বড় কষ্ট। স্বপ্নবিলাসীদের জায়গা নেই এই শহরে আর। বেঁচে থাকা সত্যিই বড় কষ্টের হয়ে গেছে। রোজগার নেই, স্বজন নেই, দু'বেলা ডাল-ভাতেরও সংস্থান নেই। তা ছাড়া বেঁচে থাকার মানে তো শুধুই খাওয়া-পরা-থাকার সুখ নয়! ছেলেবেলার সেইসব দুপুর এখন স্মৃতির মণিকোঠায় দুর্মূল্য আতর-মাখানো পশমিনা শালই হয়ে আছে।

অকলুষিত রোদ মাথায় করে চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকের কলকাতার স্তব্ধ, সুন্দর, নির্জন, ঝাঁঝালো দুপুরে ট্রাম যেমন দৌড়ে যেত, তেমন করে দৌড়ে যায় না আর ফাঁকা পথ দিয়ে গাঁগাঁ শব্দ করে লাইনের উপর হেলতে-দুলতে। গল্প বলার আর গল্প শোনার মতো পরিবেশ, সময় আর শান্তি আজকের কলকাতার দুপুরে আর একটুও নেই। সকালবেলায় ফটফট শব্দ করে রাস্তা ধোয় না আর করপোরেশনের লোকেরা। অলিগলিতেও হাঁটা যায় না আর স্বচ্ছন্দে। কোনও পথেই। কাবুলিওয়ালা হেঁকে যায় না সকালের চিলের কান্নার মধ্যে, 'হিং চাই, হিং ....' বলে। বিকেল হলেই বেলফুল আর কুলফি ফেরি করে যায় না ফেরিওয়ালা। সারা শহরের লোকই আজ ফেরিওয়ালা হয়ে গেছে। কিছু না কিছু বেচার আছে প্রত্যেকটি মানুষেরই। হারিয়ে গেছে সেই সব দিন, পরিবেশ, অনুষঙ্গ।

রবিবার দুপুরে আর কোনও ঘরেই মামা-মাসি, কাকা-পিসিদের ঘিরে শিশু আর কিশোরেরা গল্প শোনে না। টিটিচিকোরির পথের বাঘের মতো হুঁয়াউ.... হুঁয়াউ করে হুঙ্কার দেয় এখন ঘরে-ঘরে টিভি, নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে। যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেকই বেশি জানা হয়ে গেছে যেন এখনকার কিশোর-কিশোরীদের। শৈশবের সব শিউলীগন্ধী বিস্ময়ই আজ মরে, পচে, ফুলে, গাড়ি চাপা-পড়া পথের কুকুরের মতো জীবনের পথপাশে পড়ে আছে। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের শকুনেরা ছিঁড়ে খাচ্ছে তাকে।

বড়ই লোভ জমেছে সকলের মনে। নানারকম, অঢেল, অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু, অবাস্তব সব বিজ্ঞাপনে। চাই, চাই, এটা চাই, ওটা চাই, সবই চাই। নিজের নিজের যোগ্যতার অথবা প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়ে প্রত্যেকেরই পেতে ইচ্ছে করছে সমস্ত কিছুই। যা-কিছু প্রতিবেশীর আছে, অথবা আছে আত্মীয়-স্বজনের, সহকর্মীর। 'নেই, নেই,' আর 'চাই, 'চাই,' করে দৌড়তে-দৌড়তে মুখে রক্ত তুলে আছড়ে পড়ে মরে যাচ্ছে তারা এক সময়, অলক্ষ্যে।

পিপাসা, বড়ই পিপাসা। বড় খিদে এখন চারদিকে। সত্যি খিদে, মিথ্যে খিদেও। যা তারা চায়, তার কত সামান্য পেয়েই এই একটা মাত্র ছোট্ট জীবনে কী দারুণ খুশি হওয়া যেত, সুখী থাকা যেত, তা একবারও ভাবার সময়টুকু, অবকাশটুকু পর্যন্তও আজকের কলকাতার বাবা-মায়েদের নেই। অথচ পাপা-গাগাদের কৈশোরে ছিল। তাদের শৈশব ও কৈশোরকে দারিদ্র্যের মধ্যেও রাজকুমারের মতোই উপভোগ করেছিল তারা।

সেই সব স্নিগ্ধ, শান্ত দুপুরের, ছোটকামার গল্প-শোনা সরল পবিত্র শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা এখন সকলেই প্রায় প্রৌঢ়। টুলু নাম-করা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। ডুনা বিলিতি

কমার্শিয়াল ফার্মে মোটামুটি ভাল চাকরি করে। কাপি স্টেটস-এর নেভাডাতে সেট্‌ল করেছে। চারখানা গাড়ি ও বাড়ির মালিক এখন। শীলা ইংল্যাণ্ডে। ওর স্বামী নিউক্লিয়ার মিসাইল বানায়। পৃথিবী ধ্বংস করবে তো, তাই খুব ভাল থাকে। তিমির কলকাতাতেই বড় ব্যবসা করে। খুকু থাকে বোম্বেতে। তার বর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পাঁচ বছর পরপর আসে একবার কলকাতায়। ওর ছেলেমেয়েরা বাংলা বলতেও পারে না। মারাঠি বলে মারাঠাদের মতন।

সকলেরই বিয়েও হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েও। কারও-কারও ছেলেমেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। অপদার্থ রয়ে গেছে শুধু পাপা আর গাগাই। ভ্যাগাবণ্ড ওরা। ইনস্যুরেন্স-এর এজেন্সি, জমি-বাড়ির দালালি, ছুটকোছাটকা কাজ করেছে পাপা জীবনের বিভিন্ন সময়ে। ইন্টারমিডিয়েটের পর আর পড়েনি।

গাগারও বয়স বেড়েছে আরও, চল্লিশ বছর। কিন্তু মনে সে একটুও বাড়েনি। শিশুর মতোই কথা বলে এখনও ট-ট করে। আজকের কলকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে গাগা-পাপাদের কোনই জায়গা নেই। ছোটকামার বন্ধু, ধুতির উপর নীল টুইলের শার্ট পরা, টাট্টুঘোড়ায় চড়া ঘনুমামাই এখনও ওদের স্বপ্নের হিরো। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। চল্লিশটা বছর যে পেছনে ফেলে এসেছে সেই গল্প শোনার দিনগুলো থেকে, তা যেন মনেই পড়ে না ওদের।

মনের বয়স হয়নি ছোটকামারও। ব্যবসা ডুবে যাওয়ায় তিরিশ দশকের শেষের দিকে সেই যে পালামৌয়ের স্বপ্নময় কাব্যিক পরিবেশ ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে, তখন থেকেই ভাগ্যের হাতে মার খেতে-খেতে-খেতে একেবারেই ডানা ভেঙে পড়ে আছেন। এখন সম্পূর্ণই সমাহিত। প্রত্যেক পরাজয়ের মধ্যেও জয়ের মুহূর্ত নিহিত থাকে। আর কিছুই হবার নেই, হবেও না। তবুও প্রায় বিনা-রোজগারেই যে এই নিষ্ঠুর শহরে কী করে এত দীর্ঘদিন হাসিমুখে বেঁচে থাকা যায়, তার এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ ছোটকামা। হয়তো পাপা এবং গাগাও। টিটিচিকোরি ওদের চোখকে স্বপ্নের অঞ্জন দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। নির্লোভ, সরল, উচ্চাশাহীন এক আশ্চর্য জীবনযাপন করে যাচ্ছে এখনও এই তিনজন মানুষ, এই লোভসর্বস্ব ভণ্ডামির শহরে।

ভাই-বোনেদের মধ্যে অনেকেই বাড়ি করেছে। গাড়িও করেছে প্রায় সকলেই। তারা ভাল থাকে, ভাল খায়। তাদের ছেলেমেয়েরা দারুন ইংরেজি গান গায়, কবিতা লেখে ইংরেজিতে।

গাগা একদিন বলেছিল, 'কী লে পাপা, একটা গাড়ি ঠাকলে বেঠ হট, না লে ? নিজেড গাড়ি। বেঠ, ভাবটি গাডি কিনব একডা।'

'বেশ তো', পাপা বলেছে।

গাগা মাঝে-মাঝেই ভাবে একটা গাড়ির কথা। এত লোকের গাড়ি আছে! তবে, গাড়িই যদি কেনে ও কোনওদিন, তবে একটা লাল-রঙা দোতলা বাসই কিনবে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার মোড়ের মুদিটি, বিহারের দ্বারভাঙা জেলায় যার বাড়ি, হাজারিবাগ জেলার সিমারিয়া গ্রামের পরামানিক, ভিখিরি বুড়ি মোক্ষদা, পাড়ার মুড়ি-তেলেভাজার দোকানি পুলিনদা, যে তাকে প্রায়ই ধারে সিগারেট দেয় এবং অনেক সময় পয়সাও নেয় না, তাদের সকলকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাবে, আর সকলে মিলে ফুচকা খাবে। এখন ফুচকার দাম কত হয়েছে কে জানে! কত্ত বছর খায়নি। ওদের ছেলেবেলায় পুরনো দু'পয়সায় দশটা করে ছিল।

জগৎ রায় মানে ছোটকামার খোঁজ এখন শুধুমাত্র গাগা ও পাপা'ই রাখে। রায়-পরিবার বড় হয়ে ওঠার পর ছোটকামাকেও সেই আশ্রয় ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। পরিবার বড় শুধু

আয়তনেই হয়নি, বিত্তের মাপেও মস্ত বড় হয়েছে। অর্থ আসার সঙ্গে-সঙ্গেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যে-সব মূল্যবোধ মাখামাখি হয়ে থাকে, তা উধাও হয়ে গেছিল রায়-পরিবার থেকে, অন্য অনেক পরিবারের মতো। ছোটকামা ভেবেছিলেন, সারাটা জীবনই অমন গল্প বলেই কাটিয়ে দেবেন। মাত্র একজনের তো পেট। চলেই যাবে কোনও না কোনও দাদার সঙ্গে থেকেই। চাহিদাও তো ছিল না তেমন কিছু। খদ্দরের পাজামা আর পাঞ্জাবি, তাও নিজের হাতেই কাচতেন। যা খেতে দেওয়া হত, তাই-ই খেতেন। কিন্তু হয়নি তা।

বারাসাত ছাড়িয়ে একটি গ্রামে কলকাতার এক ভদ্রলোকের বাগানবাড়ির আউটহাউসে থেকে তাঁর আম-বাগান দেখাশোনা করার ভার নিয়েছেন ছোটকামা বছর-পাঁচেক হল। অনেক কিছুই ধরা-ছাড়ার পর। টিনের ছাদের একটি কামরা। গরমে বড়ই গরম এবং শীতে খুবই ঠাণ্ডা হয়। তবু গাছগাছালি, পাখপাখালি, বর্ষায় ব্যাঙের-ছাতা, ব্যাঙ, লজ্জাবতী লতার ঝাড়। ছোটকামা বলেন, 'চমৎকার! বেশ জঙ্গল-জঙ্গল ভাব। দারুণ লাগে রে গাগা, বুঝলি? পালামৌ-পালামৌ গন্ধ আছে বেশ।'

প্রতি রবিবারেই গাগা আর পাপা এখনও ছোটকামার কাছে আসে। যদিও ওদের রোজই রবিবার। ছোটকামা তেমনই গল্প বলেন বোনপো আর ভাইপোকে।

বাগানের মালী ওড়িশাবাসী গণেশ চমৎকার মসুর ডাল রাঁধে। সেও থাকে পাশের ঘরে, একা। বৃষ্টি ও শীতের দিনে ছোটকামার হট ফেভারিট খিচুড়ি রেঁধে দেয় গণেশ। বোনপো, ভাইপো আর কামার পকেট হাতড়ে যা বেরোয় তাই দিয়েই রান্না হয়। ভালবেসে খিচুড়ি খেয়ে আটচল্লিশ বছরের গাগা আর ঊনপঞ্চাশ বছরের পাপা পঁয়ষট্টি বছরের ছোটকামার গল্প শোনে ছেলেবেলার মতোই। হাতে তালপাখা নিয়ে শুয়ে থাকা ছোটকামা আজও তেমনই চমৎকার করে গল্প বলে যান, ক্লান্তিহীন।

চেহারা ওদের তিনজনেরই জীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু মন তেমনই সজীব আছে। এখনও ওদের কল্পনায় নিস্তব্ধ কাঁচপোকা-ওড়া গ্রীষ্ম-দপুরের বাড়েষাঁনের গহন অরণ্যে ঘনুমামা তাঁর টাট্টুঘোড়ার পিঠে চেপে টিটিচিকোরির দিকে চলেন। টগবগ ... টগবগ ... টগবগ ... শব্দ হয় ঘোড়ার খুরে-খুরে। শেষ বেলার সিঁদুরে লাল রঙ লাগে আজও দীর্ঘাঙ্গী মেমেদের মতো চিলবিলের পাতা-ঝরা জঙ্গলে। এখনও কল্পনায় নাগা-সন্নিসিদের মতোই বৃষ্টি নীরব প্রার্থনায় হেঁটে যায় পত্রশূন্য গাছেরা স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

জন্মাবধি কলকাতা শহরের বাইরে একদিনের জন্যেও না-যাওয়া পাপা আর গাগাকে ছোটকামার গল্পের জাদু যেন ভবঘুরেই করে দিয়েছে। ওদের মনের চোখে গত চল্লিশ বছরে একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি সেই মেমেদের মতো জ্যৈষ্ঠের চিলবিল বনের নরম সৌন্দর্য।

ছোটকামা সবসময়ই হাসেন। হাসির আগে জিভ আর টাগরা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করেন। বোঝা যায় যে, এবার কোনও হাসির কথা বলেই নিজেও হাসবেন। এতরকম কষ্টের মধ্যেও হাসতে একটুও কষ্ট হয় না ছোটকামার। অবাক হয়ে পাপা ভাবে। এতদিনেও কিন্তু একটুও ক্লান্তি আসেনি ছোটকামার কল্পনার অরণ্যচারণে। সেই পঞ্চাশ বছরের আগের ডালটনগঞ্জ, লাতেহার, বারোয়াডি, গাড়ু, মুণ্ডু অথবা লোহারডাগার দিনগুলি এখনও জ্বলজ্বল করে তাঁর স্মৃতিতে।

খাওয়াদাওয়ার পর গেঞ্জিটাকে পেটের উপরে গুটিয়ে তুলে খাটের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে খয়েরি লুঙ্গি পরে আরামে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ছোটমামা বললেন, "গাগা, পাটা টিপে দে তো একটু।"

আটচল্লিশ বছরের গাগা পঁয়ষট্টি বছরের ছোটকামাকে বলল, "বিঠানাতে ঠোও তুমি আগে তাপ্পড ডেব। বঠে-বঠে কি পা টেপায় কেউ? গল্প বলটে হবে কিন্তু।"

ছোটকামা হাসেন। বলেন, "আমাদের গাগাটা ঠিক একই রকম রয়ে গেল।" নিজেও যে সেই একই রকম রয়ে গেছেন, সে-কথা একবারও মনে হয় না তাঁর।

দশ বছরেই থেমে আছে গাগা। অনেকেই ভাবে এবং বলে যে, গাগা স্বাভাবিক নয়। ওর বুদ্ধি জড়। একসময় তো সাইকিয়াট্রিস্টও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পাপা আর তার ছোটকামা জানেন যে, গাগা প্রকৃতই ভাগ্যবান। এর চেয়ে বড় স্বাভাবিকতা আর কিছুই হয় না। সারাজীবন শৈশবে বেঁচে থাকার মতো সুখ কি আর কিছু আছে?

ছোটকামা শুরু করলেন, "সেদিন বিকেলে খুব দুর্যোগ, বুঝলি। সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া। জানুয়ারির শেষ। ওই সময়টায় প্রতি বছরই জঙ্গলে ওরকম হয়। পালামৌতে যা শীত দেখেছি, ওয়ার্লডেও তা দেখিনি।"

পাপা ভাবছিল, ছোটকামার ওয়ার্লডের বিস্তৃতি পশ্চিমে পালামৌ আর পুবে কলকাতা!

"তাডপড?" গাগা বলল।

"মুগের ডালের ভুনি-খিচুড়ি হাতা-হাতা, ফার্স্টক্লাস গাওয়া ঘি, আর একেবারে কড়কড়ে করে ভাজা আলু আর শুকনো লঙ্কা খেয়েই সন্ধে লাগতে না লাগতেই তো আমি আর ঘনু বিশ্বাসবাবুদের হুলুক পাহাড়ের নীচের মারুমারের ক্যাম্পের কাঠের ঘরে দরজায় আগল দিয়ে শুয়ে পড়েছি পাশাপাশি খাটিয়া লাগিয়ে। খাটিয়ার নীচে জ্বলন্ত কাঠকয়লার আগুন কালো-রঙা মাটির কালো মালসাতে। গায়ের ওপর দু'আঙুল মোটা দেহাতি কম্বল। ঘনু বলেছিল, 'আঃ, দু'কম্‌লিকা ঠাণ্ডা পড়েছে রে আজ জগা!' সবে ঘুমটা এসেছে, বুঝলি, ঠিক সেই সময়েই দরজাতে কারা যেন ধাক্কা দিতে লাগল খুব জোরে-জোরে।"

"তাডপড?" গাগা বলল।

"আমি তো ভয়েই বাঁচি না। ভয়ে আর শীতে দাঁত খটখটিয়ে বললাম, কোনওমতে, 'কৌন হ্যায় হো? তারা কী বললে জানিস?"

"টি? টি? বড কামা।" গাগা আবার বলল চোখ বড়-বড় করে।

"তারা বলল, 'তেরা বাপ হ্যায় হো।' তখন ঘনু ফিসফিস করে বলল, 'জগা, ডাকাত! দিগা পাঁড়ে', বলেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা বন্দুকটা টেনে নিল নিজের দিকে।"

গাগা রুদ্ধশ্বাসে বলল, "তাডপড?"

তারপর?"

৪

ওই রকমই এক রবিবারের দুপুরে গাগা আর পাপাকে গল্প বলতে বলতেই ছোটকামার খুব ঘাম দিতে লাগল। বুকে খুব ব্যথা। বর্ষার দিন ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল বেদম। গরম ছিল না একটুও। অথচ ঘেমে চান করে যাচ্ছিলেন।

পাপা দৌড়ে গেল ডাক্তার আনতে। মোড়ের মুদির দোকানি রাধাবাবুর কাছে হাতঘড়িটা বন্ধক রেখে সাইকেল-রিকশা করে ডাক্তারকে নিয়ে এল পাপা। বুকে স্টেথিস্কোপ বসিয়ে ধপধপে সাদা পোশাক-পরা বিলেত-ফেরত ডাক্তার খুব ভাল করে পরীক্ষা করলেন ছোটকাকামাকে। মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে শুধোলেন, "কী হল গো মালী তোমাব? ও মালী, কথা বলো!"

ছোটকামা কথা বলতে পারছিলেন না। মাথা নাড়ানেল বালিশের দু'পাশে। মুখ দিয়ে একটু

লালা গড়াল। হাত দিয়ে বুক দেখিয়ে ইশারাতে বললেন, বুকে খুব ব্যথা।

ঝোড়ো-কাকের মতো ভিজে, ওষুধ কিনে যখন ফিরল পাপা, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। ভবানীপুরের গঙ্গার পাড়ের একটি বাড়িতে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যেমন জ্বলত। ছোটকামার মাথার কাছে তাঁর প্রাণের প্রহরীরই মতো গাগা বসেছিল।

ছোটকামা মুখ হাঁ করলেন একবার। গাগা মুখে জল ঢেলে দিতে-দিতে বলল, "এইবারে কোয়েলড পাড়ের ঠটানে ডাহ করটে নিয়ে ডেটে হবে, বুড়লি পাপা? টময় হয়ে গেটে।"

মনে পড়ল পাপারও। ছোটকামা বলতেন, ডালটনগঞ্জের ওই শ্মশান ছাড়া আর কোথাও তাঁকে যেন দাহ না করা হয়।

জ্ঞান যেন একটু একটু করে ফিরে আসছে। ঘুমের ইনজেকশানের কাজ শেষ হয়ে এসেছে।

ছোটকামা বললেন, "জল।"

আবার জল দিল পাপা।

জল খেয়ে চোখ মেললেন, হাসলেন। ফিসফিস করে বললেন, "টিটিচিকোরি।"

তাঁর চোখের সামনে হুলুক পাহাড়ের নীচের শীতের রাতের নীল কুয়াশা, কোয়েলের ওপারের কুট্‌কু, হুটার, খোড়োয়ার, কুজরুম; ঔরঙ্গা আর কোয়েল নদীরসঙ্গমের কেচকির, স ছবিগুলো যেন এক-এক করে ফুটে উঠতে লাগল। ট্রেন যাচ্ছে ঔরঙ্গার ব্রিজের উপর দিয়ে গুম্-গুম্-গুম্-গুম্ ···· । মাথার মধ্যে অনেকগুলো বছর গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল।

"নিয়ে যাবি রে?" ছোটকামা বললেন।

"কোথায়?" ওরা দুজনে খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ির মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল।

"টিটিচিকোরি", আরো-একবারও উচ্চারণ করলেন অস্ফুটে ছোটকামা। তারপরই থেমে গেলেন। আর কথা বলেননি। ওই অবস্থাতেই যদিও ছিলেন তিনদিন। ওই আমবাগানের টিনের ঘরেই।

না, কোয়েলের পারের শ্মশানে নয়। এই সভ্য শিক্ষিত মানুষদের শহর কলকাতার অত্যন্ত নোংরা, লজ্জাকর গুণ্ডামি এবং চরম অশান্তির পরিবেশের এক শ্মশানেই ছোটকামাকে পোড়াল গাগা আর পাপা। শ্মশানের যা ছিরি, এই শহরে মৃত্যুর পরেও শান্তি নেই মানুষের।

শ্মশানে কেউই আসতে পারেনি, এক ডুনা ছাড়া। যদিও ওই তিনদিনে সব বাড়িতেই ঘুরে ঘুরে খবর দিয়েছিল গাগা। পাপা সবসময়ই ছিল ছোটকামার কাছেই। কেউই আসতে পারেনি কারণ, একজন ভাগ্যাবণ্ডের জন্যে নষ্ট করার মতো সময় কলকাতায় কারও নেই। সকলেই ব্যস্ত সাকসেসফুল। অনেক রকম কাজ তাদের প্রত্যেকেরই। যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধে আজকাল। ডুনাই এসেছিল একমাত্র। কিন্তু তারও সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল একটা। একটা প টেনে-টেনে হাঁটে। গাগা প্রত্যেককেই বলেছিল বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, তার ছেলেবেলার খেলার আ গল্প শোনার প্রত্যেক সঙ্গীকে, তাদের স্ত্রী এবং স্বামীদের, ছেলেমেয়েদেরও বলেছিল 'ঠোটোকামা টলে ডাচ্ছেন টিটিচিকোরিতে, টোমরা ঠেট ডেকা ডেকে ডেও।'

তবুও আসেনি কেউ। ছেলেবেলার সঙ্গীরা ছেলেবেলা ফুরোলেই বড় দূরে চলে যায়। ম করে হাত বাড়ালেও তাদের ছোঁয়া যায় না পরে।

পাশের পূতিগন্ধময় গঙ্গায় চান করে শেষ বিকেলে শ্মশানের বাইরে বেরিয়েই পাপা বুঝতে পারল, যে, গাগার সঙ্গে তার বন্ধনটাও এবার ছিন্ন হয়ে যাবে। যোগসূত্র ছিলেন ছোটকামাই। ছোটকামার বেহালাটা, একমাত্র সম্পত্তিটা কাঁধে নিয়ে আগে-আগে চলছিল বেঁটে গাগা। এক

কুঁজো হয়ে। এই নিষ্ঠুর আধুনিক পৃথিবীতে আটচল্লিশ বছরের শরীরের নিঃসহায় বিত্তহীন শিশুটি কী করে যে একা-একা বেঁচে থাকবে তা ভাবতেও পারে না পাপা। ওর নিজের তো কোনও ···· । গাগার জন্যে ভারী চিন্তা হতে লাগল।

অবশ্য পরমুহূর্তে ভাবল, প্রতিদিন তো গাগা একা-একাই বেঁচে এসেছে। ওর জন্যে পাপা তো বটেই অন্য কেউও কিছুমাত্র করেনি। শুধু গাগাকেই নয়, এই আধুনিক পৃথিবীতে বিত্তবান-বিত্তহীন, প্রাপ্তমনস্ক-অপ্রাপ্তমনস্ক প্রত্যেকটি মানুষকেই একা-একাই বাঁচতে হয়। সংসার থাকলেও তারা এমনি একাই থাকত। একাই বাঁচতে হত। ভাবার মতো মন নিয়ে যে মানুষই জন্মেছে, সে সবসময়ই একা। চিরদিনের।

বাস থেকে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে নেমেই প্রচণ্ড শোরগোলের মধ্যেই পাপা, গাগার গায়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "কি করবি এখন তুই" পাপার কথার উত্তর না দিয়েই ও বলল, "টুই ?"

"আমার মেস তো ছেড়ে দিচ্ছি। না ছাড়লে এবারে তাড়িয়েই দেবে। বলেছে তাই। আট মাসের টাকা বাকি। ওদের দোষ নেই।"

"আররে, আমি টো আড মডিনি এখনও ! তোড কোনওই চিন্টা নেই। আমি ঠাকলে টুইও ঠাকবি। ঠিক ডেখিস।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তো ঠিকানাও লাগে একটা, না কি ?"

গাগা হেসে ফেলল শিশুরই মতো। বলল, "যে মানুটডের কোটাও ডাওয়ার ঠাকে, যাডের কেউ টিটি লেকে ককনও, টাডেরই ডরকার টিকানার। আমাডের কোন্ ডরকার ? টুই একটা বোকা।"

"বাঁশদ্রোনির ওই সাধুর আখড়াতে আর ক'দিন বাঁচবি ? কী করে বাঁচবি ? তার উপরে আমাকেও নিয়ে যাবি বলছিস ! পাগল তুই !"

গাগা চারধারের অগণিত ঘর্মাক্ত, ডিজেলের ধোঁয়ার মধ্যে কুঁজো হয়ে হেঁটে যাওয়া ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল পাপাকে, "ড্যাক্, ড্যাক্, এডা ড্যামন কলে বাঁটকে, আমডাও টেমন কলেই বাঁটব। অটো চিন্টা কডিস না। আমাডেট কী ? ঝাড়া হাট-পা টো ! টল্, টুই আমাড ঠঙ্গেই টল।" পাপার হাত ধরে টানল ও।

ঘোরের মধ্যে একটু এগিয়েও গেল পাপা। কিছুটা ভিড়ের ঠেলাতেও। গাগার কানে মুখ ঠেকিয়ে পাপা বলল, "গাগা, একটা জায়গায় যাবি ?"

"কোটায় ? কোটায় ডে ?" শিশুর সারল্যে আর ঔৎসুক্যে বলল গাগা।

"টিটিচিকোরি।"

গাগা সঙ্গে-সঙ্গেই দাঁড়িয়ে পড়ে একগাল হেসে বলল, "ভেলি গুড আইডিয়া। টল, টল। আমডা টিটিচিকোরিতেই ডাই। পডিদের টান করা ডেকি গিয়ে।"

পাপা একদৃষ্টে গাগার দিকে চেয়ে রইল।

পাপা এবং গাগা ভিড়ের ধাক্কায় এলোমেলো হতে হতে ঝড়ে পড়া পাখির মতো পালক খসাতে খসাতে সাত-বোন পাহাড়ের সাত বনের শাড়িপরা পাহাড় ঘেরা পরিদের আবাস টিটিচিকোরির দিকে চলতে লাগল। মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের খয়েরি আলোর মধ্যে ওদের অন্য গ্রহের দুটি জীব বলেই মনে হচ্ছিল।

পাপাকে ঘিরে রাখা হাজার-হাজার মূক, মাথা-নিচু মানুষের বিভিন্নমুখী স্রোতের মধ্যে

বৃষ্টিভেজা, কাদাময় পথের মধ্যে পা হড়কে-হড়কে দূরগামী বাসের জন্যে দৌড়তে থাকা বৃষ্টিভেজা মানুষদের ভ্যাপসা ঘামের গন্ধের মধ্যে পাপার মনে হচ্ছিল যে, ওর চারধারের প্রতিটি মানুষই জীবিকার জন্য দৌড়োদৌড়ি করছে, সকাল থেকে সন্ধে অবশ্যই কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই আসল গন্তব্য বোধহয় ছিল টিটিচিকোরি। জীবিকা কখনওই জীবন নয়। টিটিচিকোরিই আসল জীবন।

হঠাৎই গাগা বলল, "সত্তি বলটি পাপা, বড্ডই খিডে পেয়েটে ডে। ঠেই ভোডবেলা এক কাপ টা খেয়েটি ঠুডু। আড কিটু খাইনি।"

পাপা মুখে ওকে কিছু না বলে মনে-মনে বলল, 'চল্, চল্ গাগা, দেবশিশু ভাই আমার, তাড়াতাড়ি চল্। পা চালিয়ে যাই, যেখানে খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, ঈর্ষা নেই, লোভ নেই, পরশ্রীকাতরতাও নেই। সাত-বোন, পাহাড় ঘেরা সাত-রঙা জঙ্গলের শাড়ি গায়ে জড়িয়ে সেই নীল ঝিলকে পাহারা দেয় যেখানে। রাতের বেলায় রূপোলি চাঁদের সাপেরা কিলবিল হিলহিল করে জলে খেলা করে বেড়ায়, তারারা রাশি-রাশি সবুজাভ নরম ফুল ফুটিয়ে তোলে উড়াল ভিজে চুলে সাঁতরে যাওয়া পরিদের নাভিতে; আর সেই পরিরা জলের সূঁচ, জলের সুতো দিয়ে জলেরই মধ্যে নকশিকাঁথা বোনে।

'চল্, চল্ গাগা, যাই, সেইখানে যাই .... সেই .... পরিদের দেশে .... যাই চল্ .... ।
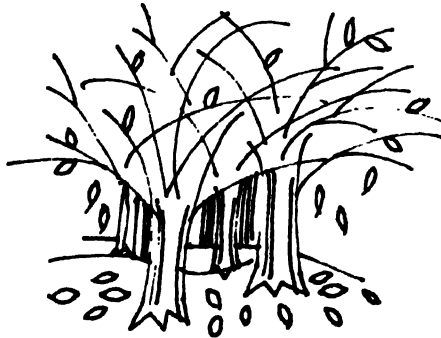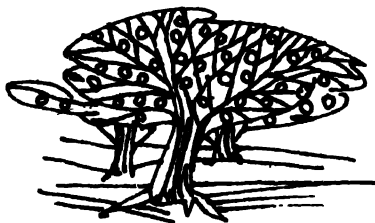
বাবা

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

কিছুতেই মন বসছিল না পড়ায়। খোলা বইয়ের পাতার মধ্যে ভেসে উঠছিল আলেকজান্ডারের মূর্তিটা। টগবগ করে সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছেন, হাতের বড় তলোয়ারটা রোদে ঝলমল করছে। শত্রু সৈন্য চীৎকার করতে করতে চারদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

আজ থেকে 'কল্পনা' হলে 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট' শুরু হবে। কিছুতেই কথাটা ভুলতে পারছিলাম না। কিছুদিন আগেও 'ফ্লাইং কার্পেট', 'জাম্বো দি গ্রেট' ফিল্ম দু'টো মিস করেছি। আজ থেকে আবার 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট'। আগের ফিল্ম দু'টো দেখে এসে কামালরা সবাই ক্লাশ মাতিয়ে রেখেছিল। সুযোগ পেলেই ক্লাসে বেঞ্চি থেকে উঠে এসে ফিল্মের সব গল্প করত। তারপর জোরে হাততালি একসঙ্গে। বারে বারে ভাবলাম, এবার যেমন করেই হোক ফিল্মটা দেখতে হবে। কিছুতেই মিস করা চলবে না। ইতিহাস বই খুলে আলেকজান্ডারের ছবিটা খুলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ঘরের পাশ দিয়ে মা যেতেই ছবি দেখা বন্ধ করে জোরে জোরে পড়তে সুরু করলাম। কতক্ষণ যে এভাবে পড়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ করে ছোট আপা ঘরে ঢুকে বললেন, এতক্ষণ ধরে কি পড়ছিস আবোল তাবোল?

—আবোল তাবোল? ভীষণ রাগ হলো আপার ওপর। সব সময়েই উনি যেন আমার খুঁত ধরতে আসেন। ঠোঁট উল্টে বললাম, আবোল তাবোল কিসের আবার? বইতে যা লেখা আছে তাই পড়ছি।

—বইতে লেখা আছে? তাই নাকি? আচ্ছা দেখা ত বইতে কোথায় লেখা আছে আলেকজান্ডার

সাত বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন ? এগিয়ে এসে বলেন ছোট আপা। বেণী দুটো ঝুলে পড়ে টেবিলের ওপর।

—এই দেখ না। আঙুল দিয়ে বইয়ের একদিক দেখিয়ে দিলাম।

—সেদিকে তাকিয়ে আপার মুখটা সন্ধ্যেবেলার আকাশের মত গম্ভীর হয়ে গেল।

—মিথ্যে পড়া ভান করিসনে খোকা। যা পড়বি ভাল করে পড়লে তোরই লাভ হবে। পড়ায় ফাঁকি দিলে ক্ষতিটা কার হবে বলতে পারিস ? আমাদের নয়। কথাগুলো বলেই ছোট আপা চলে গেলেন সেখান থেকে। রাগে আমার চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠল। কে ডেকেছিল শুধু শুধু উপদেশ দিতে ? পড়তে আর ইচ্ছে হলো না। বইটা বন্ধ করে ঘরের বাইরে চলে গেলাম।

পরদিন স্কুলে যেতেই কামালের সঙ্গে দেখা। আমার ঘাড়ে সজোরে একটা থাপ্পর দিয়ে বলল, হ্যালো ফ্রেন্ড, খবর শুনেছিস ?

আমি না-জানার ভান ক'রে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম, কিসের খবর।

শুনিসনি তাহলে ?

—না ত!

—কোন তিমিরে আছিস তুই ? কল্পনা হলে 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট' শুরু হয়েছে গতকাল থেকে। চল, ম্যাটিনী শো দেখে আসি আজ।

পকেট থেকে দু'টাকা বের করে কামাল দেখাল। তখনো আমার পয়সা জোগাড় হয়নি। মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, চল তাহলে সবাই একসঙ্গে যাই।

—পয়সা জোগাড় করেছিস ত।

—বাড়ি থেকে ম্যানেজ করে নেব।

—অল রাইট। চল, ক্লাশে ঢোকা যাক।

ক্লাসের দিকে এগিয়ে চললাম দু'জন।

টিফিনে পেট ব্যথার নাম করে ছুটি নিলাম হেড মাস্টারের কাছ থেকে। বাড়ি ঢুকে বই আর খাতা একে একে রাখলাম টেবিলের ওপর। খাওয়া শেষ করে দুপুরে মা, আপা সবাই ঘুমুচ্ছেন। সকালে কিছু পুরোন খাতা বিক্রি করেছিলাম। পঞ্চাশ পয়সা পকেটে আছে। দরকার আরো দেড় টাকার। মা'র জমান পয়সা কোথায় থাকত জানতাম। শোয়ার ঘরে কুলুঙ্গির ওপর একটা কোটোর ভেতর মা পয়সা জমিয়ে রাখতেন। কতদিন দুপুরে ওখান থেকে পয়সা সরিয়েছি, মা টেরও পাননি। আজও অসুবিধে হলো না। ঘুমন্ত মা'র দিকে চেয়ে পা টিপে টিপে দেড় টাকা বের করে নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। বাইরে কামাল, জামান, আমজাদ সবাই অপেক্ষা করছিল। ওদের কাছে যেতেই সবাই ঘিরে ধরল।

—পেয়েছিস ?

মাথা নেড়ে বললাম, হঁ্যা। মা কি আর সহজে দিতে চায়। অনেক কষ্টে আদায় করেছি।

—পেয়েছিস যখন তখন আর কি। চল, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। বেশী দেরী হলে আবার টিকিট পাওয়া যাবে না।

সবাই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। মনটা আনন্দে ভরে উঠল আমার। এতদিন পর আমার প্রিয় আলেকজান্ডারকে পর্দায় দেখতে পাব।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে হাতে বইপত্র নিয়ে চুপি চুপি পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কেউ কোন সন্দেহ করল না, এমনকি ছোট আপাও নয়। ওরা সবাই ভেবেছে অন্যান্য দিনের মতো আমি স্কুল থেকে এসেছি।

খানিকক্ষণ পর পড়তে বসলাম। পড়ায় কিছুতেই মন বসছে না আজ। চোখের সামনে ভাসছে সিনেমার দৃশ্যগুলো। সম্রাট আলেকজান্ডার, সেলুকাস, অস্ত্রের ঝনঝনানি, আহত সৈনিকদের আর্ত রব, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ সব মিলিয়ে আমার কাছে একটা অপূর্ব সুন্দর অনুভূতি। এভাবে কতক্ষণ অভিভূত হয়েছিলাম জানিনে। পাশের ঘরে মা বাবার কথা কানে আসতেই সজাগ হয়ে উঠলাম।

বাবা এখুনি অফিস থেকে ফিরেছেন। জামা খুলে চেয়ারে বসেছেন বোধহয়। মা বাবাকে বলছেন, তোমার শার্টটা আর বেশী দিন পরতে পারবে না। অনেক জায়গা ফেঁসে গেছে।

—সেলাই করে দিও বরং। বাবার কণ্ঠস্বর।

—এভাবে সেলাই করে ত আর শার্টের আয়ু বাড়াতে পারবে না। তার চেয়ে একটা নতুন শার্ট তৈরী করে নাও। সবাই বলছে আজকাল কাপড়ের দাম অনেক কমেছে।

—এ মাসটা এটা দিয়েই চালাই কোন রকমে। আসছে মাসে না হয় দেখা যাবে। খোকার একটা শার্টে চলে না। অনেক জায়গায় যেতে হয় ওকে। এ মাসে ওর জন্যে একটা শার্ট করতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাবা বোধহয় চা খাচ্ছেন। হঠাৎ মা বলে উঠলেন, একি ?

—কি হলো আবার ? বাবার চোখে খানিকটা বিস্ময়।

—আজ দুপুরেও কিছু খাওনি তুমি ? অফিসে সারাদিন এত খাটো তুমি, সামান্য টিফিনটাও

খাবে না ? এভাবে ক'দিন শরীরটাকে টিকিয়ে রাখবে তুমি ?

—ভাল্লাগে না ঐ সব আজেবাজে জিনিস খেতে। বরং টাকাটা জমালে অনেক উপকার হবে। খোকার স্কুলের মাইনে, খুকীর কলেজের মাইনে ওখান থেকেই দেওয়া যাবে। তোমার কোটোতে ওটা রেখে দাও।

আমার হাত থেকে বইটা টেবিলের ওপর থেকে নিচে পড়ে গেল। চোখে দুটো ভয়ানকভাবে জ্বালা করে উঠল। কে যেন ভেতর থেকে সশব্দে চাবুক মারল আমাকে। প্রথম বুঝতে পারলাম. এতদিন ধরে কী অন্যায় করে এসেছি। বাবা না খেয়ে আমার জন্যে পয়সা জমাচ্ছেন, আর সেই পয়সা দিয়ে আমি সিনেমা দেখে ফূর্তি করছি বন্ধুদের সঙ্গে। বইয়ের দিকে তাকাতেই আলেকজান্ডারের মুখের বদলে চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার গোঁফ-দাঁড়ি ভর্তি শুকনো মুখটা। আমার মনে হলো, তিনি কারুর চেয়ে কোন অংশে কম নন, বরং আলেকজান্ডারের তুলনায় অনেক বড়, অনেক বড় ভালোবাসার সম্রাট।
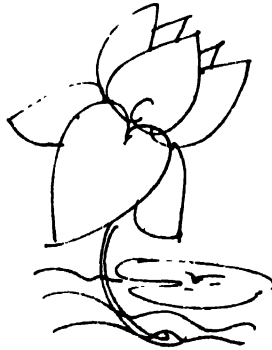
জন্মদিনের উপহার

আল ফারুক

হাবুলমামার আসন্ন জন্মদিন উপলক্ষে সুখীখালা একটা পোর্ট্রেট উপহার দিলেন। মামার নিজেরই পোর্ট্রেট। কাঁচে মোড়া বিরাট সুদৃশ্য ছবি। শিল্পীর তুলির টানে হাবুলমামা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। নাক-চোখ-মুখ-ভ্রূ এমন নিখুঁত হয়েছে যে কি বলবো। এমনকি ঠোঁটের ডগায় যে হাসির রেশটি লেগে রয়েছে তাও নিখুঁত।

গেলবার হাবুলমামার জন্মদিনে সুখীখালা তাঁর নিজের ক্যামেরা দিয়ে নিজেই হাবুলমামার একটা ফটো তুলেছিলেন। মামার ঠোঁটে হাসির রেশ ফুটিয়ে ছবি তুলতে তাঁকে অনেক কসরত করতে হয়েছে। কতবার ক্লীক করেছেন ক্যামেরা। কিন্তু পছন্দ হয়নি পরমুহূর্তে। আবার 'পোজ' বদল করেছেন। আবার ছবি নিয়েছেন। এমনি অনেকবার চেষ্টার পর শেষকালে এই হাসি হাসি মুখের ফটো। সেই ফটো থেকে বিরাট আকারের তৈলচিত্র করিয়েছেন নামজাদা শিল্পীকে দিয়ে।

এ বছর জন্মদিনের ঠিক আগের দিন সুখীখালা নিজেই ছবিটা বয়ে নিয়ে এলেন।

সারা বাড়িতে তখন জন্মদিনের জোর প্রস্তুতি চলছে। ঘরদোর সাজানো, মালা, ফুল, খাবার-দাবারের আয়োজন ইত্যাদি নিয়ে আমরা ভীষণ ব্যস্ত। ছুটাছুটি আর হাঁকডাকে বাড়ি সরগরম। মামার নাম খোদাই করা 'বার্থ-ডে-কেক' আর রঙিন মোমবাতি তখনো এসে পৌঁছেনি বলে আমরা কিছুটা উদ্বিগ্ন।

এমন সময় সুখীখালা থপ্থপ্ করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এলেন। মোটাসোটা আয়েসী শরীর। সোফায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে বললেন—তোর জন্মদিনে তো উপস্থিত থাকতে পারবো না। তাই আজই এলাম দেখা করতে।

—কেন আপা? হাবুলমামার জিজ্ঞাসা।

—কাল সকালের ফ্লাইটে চট্টগ্রাম যাচ্ছি জরুরী কাজে। তাই আজই এলাম।

একটু থেমে তারপর বললেন—তা দেখ্ হাবুল, তোর সেই ফটো থেকে আঁকা পোর্ট্রেট। তোর এবারের জন্মদিনের উপহার। আমি তো নিজে জন্মদিনে উপস্থিত থাকতে পারবো না, তাই আমার ইচ্ছে, তোর জন্মদিনে ছবিটা দেয়ালে শোভা পাক। ছবিটাই আমার উপস্থিতি।

হাবুলমামা লাজুক মুখে বললেন—এসব আবার কেন আপা। তোমার বুক ভরা আশীর্বাদই তো আমার জন্যে যথেষ্ট।

সুখীখালা রা-রা করে উঠলেন।—বলিস কিরে হাবুল। দশটা না পাঁচটা না—একটা মাত্র ভাই তুই। তোর জন্মদিনে জাঁক হবে না। আশীর্বাদের সাথে দক্ষিণা না থাকলে জমবে কেন। না-না হাবুল, তোর জন্মদিনে ছবিটা যেন অবশ্যই দেয়ালে টাঙ্গানো হয়। বোনের ইচ্ছেটা রাখবিনে হাবুল?

সুখীখালার গলাটা সত্যি করুণ হয়ে উঠলো। একটু থেমে তারপর বললেন—ভাবিসনি, তোর ছবি টাঙ্গাতে অসুবিধে হবে বলে সাথে করে একটা মইও নিয়ে এসেছি। মইটাও তোকে প্রেজেন্ট করলাম।

তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি চাকরের মাথায় একটা নতুন মই। মইটা ধরাধরি করে দোতলায় তোলা হচ্ছে।

কাঁচে মোড়া হাবুলমামার ঢাউস অয়েলপেন্টিং আর মইটা রেখে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে সুখীখালা উঠে পড়লেন। যাবার সময় দেউড়ীর দোরগোড়ায় এসেও পই পই করে ছবিটা দেয়ালে টাঙ্গাতে অনুরোধ করে গেলেন।

সুখীখালা চলে গেলে আমরা সোফায় গোল হয়ে বসলাম। সুখীখালা বেতো মানুষ। তার ওপর গ্যাস্ট্রিকের রোগী। বেশি খেতে পারেন না। তাঁর জন্যে আনা অবশিষ্ট খাবারগুলো আমরা পেটে চালান দিতে লাগলাম। খেতে খেতে হাবুলমামার জন্মদিন প্রসঙ্গে আলোচনা চলতে লাগলো।

সাবীল বললো—এবারের জন্মদিনের বিশেষত্ব হলো হাবুলমামার তৈলচিত্র।

শহীদ বললো—হাবুলমামাকে আমরা এবার ডবল-রূপে দেখতে পাবো।

মামী রসিকতা করে বললেন—অর্থাৎ ডবল ডেকার।

মামা ফোঁস করে উঠলেন। বললেন—তোর মামীর খোঁচাটা শুনলি। দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছি অথচ তোর মামী কিনা—কথাটা অসমাপ্ত রেখে হাবুলমামা মুখে ডালমুট পুরে নিলেন।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—না মামা, মামী ঠিক সে অর্থে বলেননি। ডবল ডেকার দোতলা বাস তো—দু'টো গাড়ীই বলতে পারো। তোমাকে এবার দ্বৈত-রূপে দেখবো তো—মামী সেদিকটাই ইঙ্গিত করেছেন।

হাত ঝেড়ে হাবুলমামা বললেন—উঃ, ডালমুট ঝাল কিরে বাবা! তারপর বললেন—যাকগে, গুল্লী মারো ডবল ডেকারে। পোর্ট্রেটার কি করা যায় তাই বলো। আপা বারবার করে বলে গেলেন।

সুযোগ বুঝে বললাম—সে কথাই তো বলছি মামা। পোর্ট্রেটটা টাঙ্গালেই তো তোমার ডুয়েল-রূপ ফুটে উঠবে।

—ডুয়েল! হাবুলমামা ট্যারা চোখে তাকালেন। বললেন—ডুয়েল কি বলছিস? ফাইট-টাইটের কথা বলছিস না তো? ও সবের মধ্যে আমি নেই।

আরে ছোঃ! ফাইট হতে যাবে কেন? ভদ্রলোকেরা ডুয়েল-ফাইট করে কখনো? আমি বলছি, তোমার দুই মূর্তির কথা। একদিকে ছবির মধ্যে স্বপ্নের জগতের তুমি, অন্যদিকে মালা-চন্দনে সজ্জিত বাস্তব তুমি— দু'য়ে মিলে কী যে দেখাবে না তোমাকে—উহঃ!

সান্টু আবেগে গান গেয়ে উঠলো—তুমি কি কেবলই ছবি—পটে আঁকা—

হাবুলমামা হাসি মুখে ধমকে উঠলেন। বললেন—হয়েছে, হয়েছে। এবার তুড়ি মেরে লেগে পড়ো ছবি টাঙ্গাতে।

কিন্তু এই লেগে পড়তে গিয়েই যে শেষকালে এমন দুর্ঘটনা ঘটবে, হাবুলমামা বেকায়দায় পড়বেন আর মামী গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ছুটবেন এবং সব মিলিয়ে আমাদের এমন হয়রানি হতে হবে তা কে জানতো।

ছবি টাঙ্গাতে হলে প্রথমে স্থান নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু এই স্থান নির্বাচন নিয়ে সমস্যা দেখা

দিল। হাবুলমামা সারা ড্রইং রুমটা আমাদের নিয়ে ঘুরে ফিরে দেখলেন। কোথায় বসাবেন ছবিটা। কোনো জায়গায়ই তাঁর পছন্দসই হয় না। শেষকালে আমার দিকে ঘুরে বললেন—কোথায় বসাই ছবিটা বলতো রে ক্যাবলা?

সত্যি কোথায় বসানো যায় ছবিটা। সবাই মিলে ভাবতে লাগলাম। অনেক ভেবে আমি বললাম—কোথায় বসাবে ছবি, মামা, তুমি ঠিক করো। তবে আমার মনে হচ্ছে, ছবিটা এমন জায়গায় বসাতে হবে যাতে দরজা দিয়ে ঢুকতেই তোমার হাসি-হাসি মুখটা সবার চোখে পড়ে।

হাবুলমামা বললেন—দি আইডিয়া—বলে তিনি দরজার মুখোমুখি প্রশস্ত দেয়ালের একটা জায়গায় পেন্সিলের দাগ দিলেন। তারপর মই চাইলেন। বললেন—মই আন্।

আমরা ধরাধরি করে মইটা এনে জায়গা মত বসালাম। তিনি মই রাখার জায়গাটা দু'বার পরীক্ষা করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন—কে উঠবে ছবি টাঙ্গাতে?

আমরা জবাব দেবার আগেই তিনি বললেন—ঘুঘুর কলিজা। নাঃ, তোদের দিয়ে কিসসু হবে না। সব অকর্মার ঢেঁকি। আমিই উঠছি মই-এ।

মই-এ এক পা দিতেই তাঁর বিশাল ওজনের ভারে নতুন মইটা মচমচ করে উঠলো। হাবুলমামা শংকিত কণ্ঠে বলেন—ভাঙ্গবে নাকি রে মই? ক্যাবলা শক্ত করে ধরিস। তারপর বললেন—দে, হাতুড়িটা দে—

হাতুড়ি, পেরেক, দড়ি ইত্যাদি ছবি টাঙ্গাতে যা-যা প্রয়োজন সব আগেই রেডি ছিল। মামার কথা মত হাতুড়ি দিলাম, পেরেক দিলাম।

মামা দেয়ালে ঠুকছেন—ঠুক—ঠুক—ঠুক—

কিন্তু উঁহু পেরেক তো ঢোকে না। যেখানেই আঘাত করেন সেখানেই সিমেন্টের আস্তরণটা পার হয়ে পেরেক যায় দুমড়ে। কী মুশকিল! মামা তাঁর দাগ দেয়া নির্দিষ্ট স্থান থেকে এদিক ওদিক সরতে সরতে অনেক দূর চলে এলেন। কিন্তু যে-কে সেই। পেরেক পোঁতা যাচ্ছে না।

মামা মই-এর ওপর থেকেই হেঁকে বলেন মই সরাতে। আমরা ঠেলে ঠেলে মই সরাই। কখনো ডানে-কখনো বামে। আর মামা সেই সময়টা হনুমানের মত মই ধরে ঝুলে থাকেন।

এভাবে মই ঠেলে ঠেলে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে সদ্য চুনকাম করা দেয়ালটা বিচ্ছিরি হয়ে গেল। অজস্র ক্ষতচিহ্নের মত ফুটে উঠলো। কিন্তু তবু পেরেক পোঁতা আর হয়ে উঠছে না। মই ঠেলে ঠেলে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম। হাত ব্যথা করতে লাগলো। বিরক্তি ধরে গেল। আর মামা তো গলদঘর্ম।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে ব্যাজার মুখে হাবুলমামা বললেন—এ কেমন হলো রে ক্যাবলা?

আমরা আর কি বলবো। চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি অবস্থাটা। হাবুলমামা ঠোঁট উল্টিয়ে কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন। তারপর মাথার চাঁদিতে দু'টো টোকা মেরে বললেন—হয়েছে।

আমরা সমস্বরে বললাম—কি হয়েছে মামা?

হাবুলমামা বললেন—রোস্, মাথায় বুদ্ধি খেলেছে। যেখানে সেখানে পেরেক পুঁতে লাভ নেই। এতে শুধু দেয়ালই নষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে কাগজ-পেন্সিল নে। মেপেজুকে দেখতে হবে দেয়ালটার লম্বা, চওড়া আর উচ্চতা। ইঁটের মাপ নিয়ে তা দিয়ে ভাগ করতে হবে দেয়ালের মাপকে। তাহলেই ধরা যাবে ঠিক কোনখানে কত ইঞ্চি পরে ইঁটের জোড় রয়েছে। সেই জোড়ের মুখে পেরেক বসাতে হবে। তাহলে আর ইঁটের গায়ে পেরেক আটকে যাবে না।

কথা শেষ করে হাবুলমামা আমাদের দিকে বিজ্ঞোচিত চোখে তাকালেন। বললেন—কেমন

আইডিয়াখানা বল্‌তো ?

বললাম—দারুণ মামা। তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

মই-এর ওপরে বসে পা দোলাতে দোলাতে হাবুলমামা বললেন—তারিফ করতেই হবে। একি আর যার তার বুদ্ধি—স্বয়ং হাবুল—

পা দোলানিতে মইটা নড়ে উঠতেই মামার উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথায় বাধা পড়লো। কোঁৎ করে একটা ঢোক গিলে চেঁচিয়ে বললেন—ক্যাবলা, মই শক্ত করে ধরিস।

তারপর শুরু হলো মাপজোক। পাশের বাড়ি থেকে ফিতে আনা হলো। ফিতের সাথে দঁড়ি বেঁধে সারা ঘর জুড়ে সে কি মাপামাপি! লম্বা, চওড়া, উচ্চতা। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-অধঃ-উর্ধ। মাপের আর শেষ নেই। ফিতা টানাটানি আর যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করতে করতে আমরা রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। শেষকালে এক সময় মাপামাপির শেষ হলো। হাবুলমামা মাপ মত তিনটি জায়গা বেছে নিয়ে পেন্সিল দিয়ে কুলের আঁটির মত গোল দাগ দিলেন। তারপর খুশি-খুশি মুখে আমাদের দিকে তাকালেন। ব্যাপারটার একটা জলবৎ সহজ সমাধা মুহূর্তে হয়ে যাচ্ছে—এমনি একটা প্রশান্তভাব চোখেমুখে।

আমি বললাম—মামা জায়গাটা দেয়ালের একটেরেয় হয়ে যাচ্ছে না ?

হাবুলমামা বললেন—কুচ পরোয়া নেই। ছবি টাঙ্গানো নিয়ে কথা। দে—হাতুড়ি দে—পেরেক দে—

হাবুলমামা এবার নতুন পেরেক নিলেন। হাতুড়ি বাগিয়ে ধরলেন। আমাদের মই শক্ত করে ধরতে বললেন। মই যেন না নড়ে—সাবধান করে দিলেন।

আমরা শক্ত করে ধরেই ছিলাম। মামার কথা মত আরো জোরে মই ধরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হাবুলমামা মারাত্মক মুখ করে বললেন—দেখি বাছাধন, পেরেক কেমন দেয়ালে না ঢোকে। বলে মারলেন এক ঘা।—এই তো বাপের সুপুত্রের মত চলেছেন। ইস্ এখানে একটু আটকালো যে! ও কিছু না। এখনই দিচ্ছি ঠিক করে। ওয়ান-টু-থ্রী—বলে দাঁত-মুখ খিচিয়ে মারলেন আর একটি প্রচণ্ড ঘা।

আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন।—উঃহু-রে—গেছিরে—মরেছিরে—দুত্তোরি হাতুড়ির নিকুচি করেছে—

মামার কি হয়েছে বুঝবার আগেই হাবুলমামা হাত চেপে ধরে হাতুড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। আর সেই হাতুড়ি পড়বি তো পড় মামীর মাথায়। মামার হৈ-হল্লা শুনে মামী পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছেন আর অমনি হাতুড়ি গিয়ে পড়লো তাঁর মাথায়।

হাতুড়ির আঘাত খেয়ে মামী চিৎকার করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। রক্তের ফিনকিতে তাঁর মাথা ভেসে যাচ্ছে। মামীর অবস্থা দেখে আমরা সহসা মই ছেড়ে দিয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়লাম। আর সাথে সাথে মই পিছলে হাবুলমামা কলাগাছের মত চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন।

হাবুলমামা যেখানে পেরেক পুঁতছিলেন তার পাশেই রাখা ছিল জন্মদিনের জন্যে কেনা হাঁড়িভর্তি দই আর মিষ্টি। হাবুলমামা মইসমেত সেই দই আর মিষ্টির হাঁড়ির মধ্যেই পড়লেন। মিষ্টি আর দই চেপ্টে তালগোল পাকিয়ে গেল।

তখন একটা দৃশ্য বটে। জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুরের মত হাবুলমামার দশাসই শরীরটা মই-এর

ফাঁকে আটকা পড়েছে। তিনি সেই ফাঁক দিয়ে বের হওয়ার জন্যে যতই হাত-পা ছুঁড়ছেন ততই দই আর মিষ্টিতে ছিটাছিটি হচ্ছে। এবং সারা গায়ে দই আর মিষ্টি লেগে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে যাচ্ছেন।

মামার অবস্থা দেখে আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। তারপর মামার দই মাখানো বিরাট দেহটা টেনে-হেঁচড়ে অনেক কষ্টে মই-এর ফাঁক থেকে বের করলাম।

পড়ে গিয়ে মামা কোমরে জবর আঘাত পেয়েছেন। হাতুড়ির ঘায়ে বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল থেঁতলে গেছে। তার ওপর মই-এর ফাঁক থেকে টেনে-হেঁচড়ে বের করতে গিয়ে এখানে ওখানে ছড়ে গেছে। ওদিকে মামীর মাথা রক্তে জবজবে।

মামাকে ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজ করে কোনো রকমে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। আর মামীকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে।
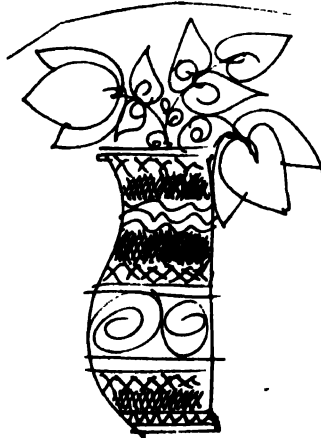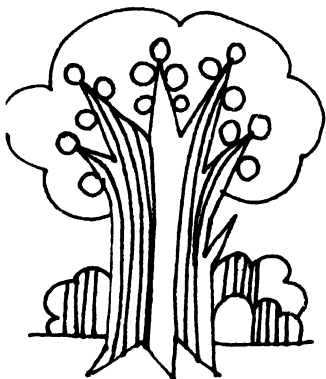
অরণ্যের এক রাত্রি

আশিস সান্যাল

দূরের পলাশ, মহুয়া বনের মাথায় কখন সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু লেপটে পরে চিক চিক হেসে উঠেছিল এখন আর তার কিছুই টের পাওয়া যাবে না। টের পাওয়া যাবে না, কখন আকাশ-সাঁতার-ক্লান্ত পাখিরা ঘরে ফেরবার পথে সমস্ত বনানী প্রদেশ কিচির মিচির শব্দে মুখর করে তুলেছিল। এখন চারিদিকে শুধু জমাট অন্ধকার। এই যে কিছুক্ষণ আগেও কোয়েল নদীর কিনারে একদল বুনো হাঁস আলগোছে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, এখন আর তাদের কাউকে দেখা যাবে না। সমস্ত চরাচর এখন অন্ধকারের করাল গ্রাসে আবদ্ধ।

গ্রামের নাম গাড়ি। এখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে ঠিক আটটায়। খাওয়া দাওয়া সেরে তাই সকলে আমরা প্রস্তুত হয়ে পড়লাম। মোটামুটিভাবে সকলের মধ্যে একটা পরামর্শ হ'ল। ঠিক হল পথ প্রদর্শক হবে আলিমুদ্দিন। এই বন সম্বন্ধে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাছাড়া এখানকার পথঘাট, অলি-গলি সবই তার নখদর্পণে। সে সকলের আগে "স্পট-লাইট" ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাবে। তার পিছনে প্রথম সারিতে থাকবে শশীবাবু আর মহাত্মা। এরপর চারজন মালবাহী দেহাতি এবং সবশেষে থাকবো আমি আর রতনলাল। দেহাতিদের সঙ্গে নেবার কারণ হল, যদি কোন শিকার মেলে তাহলে ওরাই বহন করে গ্রামে পৌছে দিয়ে যাবে।

যথাসময়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। প্রথম ঘণ্টাখানেক গল্প করতে করতেই আমরা এগুলাম। বন যে এখন পর্যন্ত হালকা তা স্পষ্টতঃই বোঝা গেল। কেননা শাল-মহুয়া বন ভেদ করে স্পট-লাইটের আলো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। বোধহয় সেটা কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার। তার উপর গভীর কুয়াসার আস্তরণ। মনে হচ্ছিলো একটা অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে সমস্ত বনাঞ্চল স্তব্ধ হয়ে ভাবছে। আকাশে ছড়ানো ছেটানো তারাগুলো দপ্ দপ্ জ্বলছে। হঠাৎ এই বনের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে এক ঝাঁক হাওয়ায় কেঁপে

উঠল সমস্ত অরণ্য। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত শিহরণ আমার রক্তে দাপাদাপি শুরু করে দিলো। অনুভব করলাম, এই নির্জন অরণ্যে যেন আমাদের অসহায় একাকীত্বকে ঘিরে দুপাশে গাছগুলি ভয়ানক উপহাস করছে।

কিছুক্ষণ একটানা হেঁটে যাবার পর আমরা এক জায়গায় এসে সকলে থেমে গেলাম। আলিমুদ্দিন জানালে, এখান থেকে বন খুব গভীর। আর আমরা যেখানে যাচ্ছি, সে বন খুবই দুর্গম। সবাইকে সে তাই সাবধান করে দিল এবং শেষবারের মত তার নির্দেশগুলি জানিয়ে দিল আমাদের। আমার সঙ্গী রতনলাল এই প্রথম শিকারে এসেছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, কথা শুনেই তার হাত পা থর থর করে কাঁপছে। তাকে অভয় দিয়ে বললাম, 'ভয় কি? তোমাকে ছেড়ে পালাবে না।'

দেখতে দেখতে আমরা আরো অনেকটা গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়লাম। বন এখন এত গভীর যে, দূরের কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু স্পট-লাইটের আলো অরণ্য ভেদ করে যতদূর যায়, ততদূরই আমাদের নিশানা। কিন্তু কান সতর্ক রেখে চলেছি। কেননা বনে যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। সামনে স্পট-লাইটের আলো ফেলতে ফেলতে চলেছে আলিমুদ্দিন। হঠাৎ তার হাতের আলোটা এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। চেয়ে দেখি, কিছুটা দূরে একটা মহুয়া গাছের তলায় দুটো বিরাটাকার হরিণ। আলোতে তাদের চোখ দুটো দপ্ দপ্ জ্বলছে। এখানে আলিমুদ্দিনের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ, আলোটা একটু হেলে পড়লেই হরিণ দুটো ছুটে পালিয়ে যাবে। নির্দেশ মত আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। আলিমুদ্দিন স্পট-লাইটের আলোটা নিয়ে এগিয়ে গেল কিছুটা। কেননা, রেঞ্জের মধ্যে না ফেলতে পারলে গুলি করে কিছু লাভ হবে না। মহাত্মাও বন্দুক প্রস্তুত করে নিয়ে এগিয়ে গেল তার পিছু পিছু। অনেকটা এগিয়ে গেছে তারা। এবার হরিণ দুটো রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছে। আলিমুদ্দিন স্পটের আলোটা হরিণ দুটোর উপর ঠিক রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহাত্মাও মুহূর্তের মধ্যে বন্দুকের নিশানা ঠিক করে ফেলল। প্রথম সাফল্য লাভের আশায় আনন্দ তখন আমাদের মনে দোলা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু, একি? পাশের জঙ্গলে একটা ভারী পায়ের শব্দ শুনে আমরা সবাই সচকিত হয়ে উঠলাম। একটা বিশাল প্রাণী যেন ছুটে আসছে আমাদের দিকে। সব কটা বন্দুক প্রস্তুত হয়ে গেল। আলিমুদ্দিন স্পট-লাইটের মুখ ঘুরিয়ে ফেলল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা থেমে গেল। আমাদের মনে তখন একটা ভয়ানক উৎকণ্ঠার ঝড়। দু মিনিট প্রায় নিঃশব্দে কেটে গেল। আলিমুদ্দিন স্পট-লাইটের আলোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানোয়ারটাকে সন্ধান করতে লাগল। এক সময় শব্দটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। তেমনি উৎকণ্ঠায় আমরা প্রস্তুত হয়ে পড়লাম।

'ধ্যুৎ!' মহাত্মা তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলে আমাদের উৎকণ্ঠার সমাপ্তি ঘটালো। জিজ্ঞাসা করলাম 'কি?'

'কি আবার, বুনো শুয়োর।' উত্তর দিলো মহাত্মা।

ঠিক তাই, একটা বিরাট বুনো শুয়োর তার একপাল বাচ্চা নিয়ে চলেছে। প্রথমে সে হয়ত আমাদের দেখতে পায়নি। পথে স্পট লাইটের আলো দেখে থমকে গিয়েছিল। যাই হোক, লাভজনক শিকারটা হাতছাড়া হওয়ায় আমরা সকলেই কিছুটা বিমর্ষ হলাম।

আলিমুদ্দিন আশ্বাস দিয়ে বললে—'বনে এরকম হামেশাই ঘটে, ঘাবড়ে যাবেন না।'

আবার চলতে শুরু করলাম আমরা সকলে। বন ক্রমে আরো গভীর হয়ে উঠছে। চলার পথটাও এখন অনেক সঙ্কীর্ণ! দুপাশের ডালপালাগুলো এসে গায় লাগছিল। শীতটা পড়েছে খুব

বেশি। এতোক্ষণ বনে বিশেষ হাওয়া ছিলনা। এখন মৃদু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। একে শীত, তার উপর এই হাওয়ায় মনে হচ্ছিল, যেন হাত পা জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। বন্দুক হাতে আছে বটে, কিন্তু হাত পা সেভাবে প্রস্তুত ছিল না। বাতাসে আর একটা অসুবিধাও হল। পাতা ঝরার এমন একটা টুপ টাপ শব্দ হচ্ছিল যে, হিংস্র শ্বাপদ খুব কাছে না এলে তার পায়ের শব্দ বুঝার কোন উপায় আমাদের ছিল না। অবশ্য বাঘের কথা স্বতন্ত্র। তবে আশার কথা এই যে, এতগুলো প্রাণী দেখে সে হয়ত এগুতে সাহস পাবে না। বেশ অনুভব করলাম, একটা ছোট টিলার ওপর

আমরা উঠছি। এখানে খুব খাড়া বড় পাহাড় প্রায় নেই। ছোট ছোট রুক্ষ পাহাড়গুলোই এখানকার সৌন্দর্য। আসামের বনে যেমন ঝোপঝাড় খুব বেশি, এখানে তেমন নেই। তুলনায় বেশ হাল্কা। শীতে হাত পা জড়ো সড়ো হয়ে আসছে। তবু এগোন ছাড়া কোন উপায় ছিল না আমাদের। ছোট টিলাটা পার হয়ে সবে সমভূমিতে নেমেছি। এমন সময় একটা ভয়ানক শব্দে আমরা সচকিত হলাম। মনে হল দুদল মানুষ যেন লাঠি নিয়ে মারামারি করছে। সামনের বাঁশবনে আলো পড়তেই সকলে ভয়ানক আঁতকে উঠলাম।

সর্বনাশ! একদল হাতী, আর এত কাছে!

আলিমুদ্দিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ডেনজার, পালাও পালাও।' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এত বড় দলটা

যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। আমি আর রতনলাল ছিলাম সকলের পেছনে। বিদ্যুতের স্পর্শে আলো যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি কেমন করে এক অলৌকিক শক্তিতে, সামনের বড় পাথরটা পার হয়ে অনেকটা পথ চলে এসেছিলাম তা এখন আর বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে মনে আছে, আমার পেছন পেছন যে রতনলাল ছুটে আসছিল, এ অনুভব আমার তখন ছিল না। আমার কেবলই ওর পায়ের শব্দে মনে হচ্ছিল, হাতীগুলো বুঝি তাড়া করে আসছে পিছু পিছু। এক সময় একটা বুনো লতায় আটকে মাটিতে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম একটা ভারি জিনিস আমার পিঠের উপর আছড়ে পড়ছে। সে যে আর কেউ নয়, আমার বন্ধু রতনলাল, এ কথা যখন জানলাম, তখন কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পেলাম মনে।

আমরা যে আমাদের দল থেকে অনেকটা দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কেননা নানারকম সাংকেতিক শব্দ করে কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে কোন উত্তর পেলাম না। চারিদিকে প্রসারিত শুধু অন্ধকার। নিশুতি বনে কোথাও মানুষের কোন সাড়া নেই। আমরা অনেকক্ষণ কোথাও কোন মানুষের স্বর শোনা যায় কিনা তারজন্য অপেক্ষা করলাম। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাও বিপজ্জনক। আলিমুদ্দিনের কাছে শুনেছিলাম, এ বনে হরিণের সঙ্গে বাইসন, হাতীও দেখা যায় মাঝে মাঝে। সুতরাং এভাবে নিশ্চল দাঁড়িয়ে না থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাক্। ওদের সন্ধান করা এখন বৃথা। তা ছাড়া এখানের রাস্তাঘাট আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই কোন নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করাই শ্রেয়।

'চলো গাছটায় উঠে বসি।' ইঙ্গিতে মাথা নাড়ল রতনলাল। লক্ষ্য করলাম, তার বাকশক্তি প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

একটা পাথর ডিঙিয়ে মাঝারি ধরনের একটা গাছের সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রথমে আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম। রতনলাল আমার ঘাড়ে পা দিয়ে দাঁড়ালো। আমি উঠে দাঁড়ালে ও একটা বড় ডাল ধরে ঝুলে উঠে পড়লো। আমিও অনেক কষ্টে উঠে পড়লাম গাছে। বললাম, 'রাতটা এভাবেই কাটানো যাক্। তারপর সকাল হলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

এভাবে কতক্ষণ কেটেছিল, তা এখন আর সঠিক বলা সম্ভব হবে না। একটা ভয়ানক আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা মিনিটকে মনে হচ্ছিল যেন এক একটা প্রহর। চারিদিকে তখন ভীষণ নির্জনতা। মনে হচ্ছিল অন্ধকারের বুকে সমস্ত বনভূমি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সামান্য হাওয়ায় যখন চারিদিকে ছড়ানো গাছের ডালপালাগুলি ঈষৎ কেঁপে উঠছিল, তখন হয়তো মনে করা যেতে পারতো, সোনার পালঙ্কে শায়িত কোন ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাবার সাধনায় রূপকথার রাজপুত্র নিরলস চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু আমাদের মন নির্জনতার অদ্ভুত রহস্যকে অনুভব করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বরং হাওয়ার সামান্য শব্দও প্রতিমুহূর্তে আমাদের মন আতঙ্কে ভরিয়ে তুলছিল। প্রার্থনা করছিলাম, বাতাস বন্ধ হয়ে যাক্। ডালপালা নড়বার শব্দ থামুক। এবং সমস্ত বনভূমিতে বিরাজিত হোক এক অপরিসীম নৈঃশব্দ্য।

অনেকটা দূরে একটা হরিণের ডাক শোনা গেলো। তারও পর শুকনো পাতায় একটা কিসের হেঁটে যাওয়ার শব্দ। রতনলাল আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে ওই শব্দটার প্রতি আমাকে সতর্ক করতে চেষ্টা করলো। অন্ততঃ তার মনে কিছুটা আশা সঞ্চার করার ইচ্ছায় আমি ইশারায় জানালাম, ওটা কিছু নয়। কিন্তু মনে একটা অকারণ ভয় মাতামাতি শুরু করলো। রতনলালের পকেট থেকে টর্চটা আমার হাতে নিলাম। শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল জানোয়ারটা বোধ হয় কিছু একটা সন্দেহ করেছে। সাধারণতঃ মানুষখেকো বাঘ না হলে, আলো দেখলে বা বন্দুক দেখলে

পথ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু একমাত্র সেই ভরসাতেই তো আর থাকা যায় না। তা ছাড়া আমরা দুজনের মধ্যে কেউই শিকারী বলতে যা বুঝায়, তা নই। শিকারের অভিজ্ঞতাও তেমন নেই। দু একবার শিকারী দলের সঙ্গে বনে এসেছি, এই মাত্র। ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে আমাকে শিকারীর ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হচ্ছে। যাই হোক, কিছুক্ষণ আর শব্দটা শোনা গেল না। মনে কেমন যেন একটা কৌতূহল জাগলো। বাঁ হাতে টর্চের সুইচটা টিপে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রাণী হুড়মুড় শব্দে পালিয়ে গেল। সামান্য আলোতে যতদূর লক্ষ্য করলাম তাতে মনে হল, প্যান্থার জাতীয় কোন প্রাণী। কাছে কোথাও হয়ত জল আছে। সে হয়ত সেদিকেই যাচ্ছিল। অথবা কোথাও শিকার না পেয়ে নতুন শিকারের সন্ধানে এসেছিল এদিকে। তারপর এক সময়ে আমাদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল। টর্চের আলো দেখে নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে খুব। তাই আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেছে অন্যদিকে।

আরো কিছুটা সময় এরকম উৎকণ্ঠায় আর অনিশ্চয়তায় কেটে গেলো। এক সময় রতনলাল আমার পিঠে ধাক্কা মেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো—

'রোশনাই।'

সত্যি। লক্ষ্য করে দেখলাম, তিন চারটি টর্চের আলো কিছু সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। মনে একটা আশা জেগে উঠলো। নিশ্চয়ই আমাদের দলের লোকেরা। তাছাড়া এই নির্জন বনে এত রাতে কেউ ঘুরে বেড়াতে পারে না। আমি প্রত্যুত্তরে আমার টর্চের আলো জ্বেলে ধরলাম। অপর দিক থেকে এইবার সঠিক উত্তর পাওয়া গেল। আমার নাম ধরে ডেকে উঠল একজন। মনে হল শৈলদার কণ্ঠস্বর। এইবার রতনলাল এবং আমি দু জনেই এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম 'এদিকে, এ-দি-কে'। এই আলো এবং উত্তর প্রত্যুত্তর বিনিময় করতে করতে প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ওরা আমাদের কাছে চলে এলো। তখন দলে মাত্র চারজন। শৈলদা, শশীবাবু, মহাত্মা এবং আর একজন। এই লোকটি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিল না।আমরা গাছ থেকে নেমে এলাম। শৈলদা প্রায় দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। লক্ষ্য করলাম, একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তায় তার চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেছে। অবশ্য এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে আমার সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। এই অঞ্চলে ফরেস্ট অফিসারের কাজ করে। তার কাছেই এসেছিলাম আমি বেড়াতে। আমার বিশেষ অনুরোধে সে এই শিকারের ব্যবস্থা করেছিলো। তাই কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটলে, সেটা তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতো। শৈলদার মুখে এইবার একটা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেল। এতোক্ষণের সমস্ত অনিশ্চয়তাকে ঝেড়ে ফেলার মতো একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে সে বললো—

'বাস্, কি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'খুবই স্বাভাবিক', সমর্থন জানাল মহাত্মা। 'কোলকাতার লোক এই গভীর জঙ্গলে ভয়েই শেষ হয়ে যেতো। যাক ভালোভাবেই উপসংহার হয়েছে।'

'তোদের বললাম, সব সময় আমাকে লক্ষ্য করে চলবি, তা অন্যদিকে গেলি কেমন করে?' গলায় একটা দৃপ্ত গাম্ভীর্য টেনে শৈলদা এবার প্রশ্ন করলো।

'মানে পাথরটা ডিঙ্গিয়ে যেতেই মনে হল সামনে খোলা পথ রয়েছে।'

'কিন্তু হাতীর সামনে পড়লে কি আর রক্ষা ছিল।'

'হয়েছে। যা ঘটে গেছে, তা ভেবে আর লাভ কি?' শশীবাবু বললেন।

'কিন্তু ভাবুন তো আমাদের কথা।'

'কিন্তু তোমরাই বা আমাদের ছেড়ে গেলে কেমন করে?' এবার আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

'এত লোকের মধ্যে কে কোথায় গেল, তা বিপদের সময় নির্ণয় করা যায় না। নিয়ম হচ্ছে, যারা দলে আছে, তারা নির্দেশ মত চলবে। আমরা তো ভাবতে পারিনি, তোরা নেই। বিপদ কেটে যাবার পর যখন একসাথে হয়েছি, তখনই খেয়াল হল। তখনই খুঁজতে বেরিয়েছি তোদের। সঙ্গে সাহেবকে নিয়ে এসেছি। এ জঙ্গল তার খুব চেনা। অন্যান্য সকলে এখন তার বাড়িতে অপেক্ষা করছে। যাক্, এবার চল সেখানে। সবাই এতোক্ষণে হয়তো অস্থির হয়ে উঠেছে।'

সাহেবের আস্তানায় এসে দেখি বারান্দায় আগুন জ্বালিয়ে, সবাই তার চার পাশে গোল হয়ে আগুন পোহাচ্ছে। আমাদের দেখেই ওদের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। বুঝলাম, আমাদের না দেখে ওরাও চিন্তিত হয়েছিল।

বাইরে একটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। হাওয়ার থাবায় সমস্ত অরণ্য অঞ্চল যেন কেঁপে উঠছে। নিঃশ্বাস ফেলার মত একটা অদ্ভুত শব্দ চারিদিকে যেন হুটোপুটি করে বেরাচ্ছে। ঘাসের উপর বিক্ষিপ্ত শিশির বিন্দুগুলো অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমাট বেধে গিয়েছে। এতোক্ষণ তেমন অনুভব করিনি, কিন্তু এখন সাহেবের বাড়িতে ফিরে আসার পর মনে হল, আমার পা দুটো শীতে অসাড় হয়ে গিয়েছে। তাই বারান্দায় জ্বালানো আগুন দেখে, তাড়াতাড়ি এসে তার পাশে বসলাম। জুতা এবং মোজা খুলে ফেলে আগুনে হাত পা গুলো সেঁকে নিতে আরম্ভ করলাম। একজন দেহাতি দু'কাপ চা নিয়ে এল আমার এবং রতনলালের জন্য। পরম সৌভাগ্য না থাকলে এ অসময়ে চা পাওয়া যায় না।

আমরা যখন আগুনের পাশে বসে চা খাওয়ায় ব্যস্ত, তখন সাহেব সবাইকে প্রস্তুত হবার জন্য ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ালো। শৈলদা এসে বললো—'তোরা এখানে থাক. আমরা আবার বেরুচ্ছি।'

কিছুমাত্র আপত্তি জানালাম না। কেননা এতোক্ষণের উৎকণ্ঠা এবং পরিশ্রমে ভয়ানক ক্লান্তি বোধ করছিলাম। তাছাড়া এই রাত্রিতে আবার বের হবার মত উৎসাহও আমার ছিল না। আমি আর রতনলাল ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, তখন রাত চারটে। সামনে একটা খড়ের বিছানা পাতা ছিল। আমি আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, শরীর এলিয়ে দিলাম তার ওপরে। কখন যে আমার দুচোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল, তার কিছুই টের পেলাম না।

শিকার কাহিনী বা ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়তো এটি নয়। কিন্তু এক করুণ অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে এই কাহিনী স্মৃতিপট থেকে কখনও বিলুপ্ত হবে না। নির্জনতার যে একটা অদ্ভুত আস্বাদ আছে, অনিশ্চয়তার যে একটা অজানা শিহরণ আছে, অরণ্যের যে একটা দুর্গম আনন্দ আছে, পালামৌয়ের নির্জন অরণ্যে অতিবাহিত একটি রাত সেই অভিজ্ঞতাই যেন মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত করেছে। এখনো কান পাতলে, স্মৃতিপটে বেজে ওঠে অরণ্যের হাতছানি, বাতাসের অবিরল শব্দ, আর অন্ধকারের রহস্যময় প্রতিধ্বনি।

গোগোদার সঙ্গে উলুউলু দেশে

বেলাল চৌধুরী

গোগোদাকে চেনো না তোমরা, সে কি! তোমরা তো দেখছি আমাদের জাতীয় গল্পবৃত্তান্তের কিস্‌স্যুই-জানো না। গোগোদার মতো অত বড় বীরপুরুষের নামই শোন নি? কি আশ্চর্য কথা! যার নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, যার এক হাঁকে কেঁপে ওঠে আসমুদ্রহিমাচল। সমগ্র ভূ-ভারত খুঁজে বেড়ালেও যার জুড়ি মেলা ভার। কাছিমের পিঠে চেপে তিনি ঘুরেছেন কত না দেশবিদেশ, পাড়ি দিয়েছেন সাতসমুদ্র তেরো নদী। এক লম্ফে ডিঙিয়েছেন কত না পাহাড়-পর্বত। যেমন তাঁর বীরত্ব তেমনি তিনি অফুরন্ত গুণেরও খনি বটেন। তাঁর মতো রূপবান, তুখোড় খেলুড়ে, দক্ষ শিকারী, ডাকসাইটে আঁকিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে সচরাচর খুব কমই দেখা যায়। আর তিনি যে একজন নামকরা নাচিয়ে তো তাঁর নামকরণ থেকেই টের পাওয়া যায়। জি ও গো জি ও গো অর্থাৎ গোগোদা শুনেছি, মাঝে মধ্যে রেগে গেলে নাকি সে এক তুলকালাম কাণ্ড, জীবন্ত ক্ষেপণাস্ত্রের চাইতেও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। এসব কথা সাধারণত দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরাই বলাবলি করে। আমি কিন্তু কখনো তাঁকে তেমনভাবে রাগতে দেখিনি বরং আমি বরাবরই দেখেছি, তিনি বেশ ফুরফুরে ফূর্তির মেজাজেই থাকেন। আমোদ উল্লাসে মেতে থাকতেই ঢের বেশি ভালবাসেন। তাঁর মতো মিশুকে প্রকৃতির লোক আমি খুব কমই দেখেছি। আমাকে তিনি খু-উব পছন্দ করেন। আর করবেন নাই বা কেন? আমি কি কারুর চাইতে কম তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেছি? উফ্, কত কত শক্ত কাজ আর পরিশ্রম! আর সারাক্ষণই ক্রমাগত এটা-ওটা খাওয়া, ছোটাছুটি দাপাদাপি করা, বিকট শব্দের বাজনা বাজানো ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কঠিন সব কাজ।

কি বুঝলে? কিস্‌স্যু বোঝনি। আসলে আমি গোগোদার ভীষণ ভক্ত, অনুরাগী আর বাধ্য। তাই তো একবার তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বান্ধবী ইল্লির দেশে। সে দেশের নাম উলুউলু। তোমরা হয়তো ভূগোলে বা মানচিত্রে উলুউলু দেশটি কোথাও খুঁজে

পাবে না। একমাত্র গোগোদা আর আমিই কেবল জানি, দেশটি কোথায় এবং কিভাবে যেতে হয়। তবে গোপনে তোমাদের আমি একটি সূত্র বলে দিতে পারি, সেটা হল সোজা তোমার নাক বরাবর।

উলুউলু দেশে যেতে হলে প্রথমেই যেতে হবে এক গুপ্ত নৌ-বন্দরে, যেখানে অসংখ্য তিমি, জাম্বো জেটের মতো প্রকাণ্ড কুঁজঅলা গায়ক তিমি, নীল তিমি, কমলা-সাদা-হলুদ ছোপ দেয়া, ময়ূরকণ্ঠী নীল, ধবধবে সাদা, লালশির, নীলশির, নীলপক্ষ, রাঙামুড়ি, সামনে সাদা, ডুবুরি, ডুব-না দেয়া, চোখ সাদা, পাতিহাঁস, রাজহাঁস, কচ্ছপ ও কাছিম, ছোট বড় নানা আকারের কুমির, কামট ও তাদের ছানা আর অগুণতি রঙবেরঙের রোগা মোটা গোল চ্যাপটা বেঁটে লম্বা মাছ, মাছের পোনা কোনটা ঠিক সাম্পানের মতো কোনটা বা ডিঙি নৌকার মতো। তোমার খুশিমতো যে কোনটাতে চেপে যেতে পারো। টিকিট-ফিকিটের বালাই নেই। শুধু পিঠে চেপে বসা, পরমুহূর্তেই দেখবে হুশ করে তুমি অগাধ জলের বুক কেটে ছুটে চলেছ তরতর করে। ওই নৌ-বন্দরের কর্মচারীদের মধ্যে নানা কাজে সাহায্য করবার জন্যে রয়েছে জাঁদরেল চেহারার কোলা সোনা নানা জাতের ব্যাঙ, বড় বড় দাঁড়অলা কাঁকড়া, শুঁপো ভোদড়। আর আবহাওয়া বিশারদের কাজ করেন গাঙশালিখ ও শঙ্খ চিল।

আমরা গিয়েছিলুম সব চাইতে দ্রুতগতিসম্পন্ন বিশাল এক নীল তিমির পিঠে চেপে। প্রচণ্ড গতি ভালবাসেন গোগোদা। জলের বুকে ফোয়ারা তুলে সাঁই সাঁই করে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলছিল আমাদের নীল তিমি। বলতে লজ্জা নেই, আমি চোখ বুজে দুহাতে গোগোদাকে আঁকড়ে ধরে পেছনে বসেছিলাম। আমি আবার বিষম ভীতু কি না? গোগোদা কিন্তু বেশ মনের আনন্দেই গাইছিলেন, 'লাল লাল মাছদের নীল নীল গান'। মাঝে মাঝে শিসও দিচ্ছিলেন। সে যাই হোক উলুউলু দেশে পৌঁছে আমার চোখজোড়া তো ছানাবড়া হবার যোগাড়। প্রথমেই পড়ল কোকাকোলা আর শরবতের নদী, তারপরেই আইসক্রিমের খাল বিল। কি ঝলমলে তার রঙ! চার পাশে দুই তীরে তীরে ক্ষীরের ছানার অজস্র গাছপালা। ডালে ডালে ঝুলছে সোনালী রঙের বিস্কুট, কোনটাতে জ্যাম বা জেলি আবার কোনটাতে বা মাখন কিংবা মার্মালেড মাখানো আর রূপালী রাংতা মোড়া নানা ধরনের সুগন্ধী চকোলেট, লজেঞ্চুষের গুচ্ছ দুলছে ঝিরঝিরে হাওয়ায়। আমার তো জিব দিয়ে অনবরত লালা গড়াতে থাকল। আমি কি করব কিছুই আর বুঝতে পারছিলুম না। বাগানে বাগানে ফুটে রয়েছে মিষ্টি খইয়ের ফুল, মুড়ির মোয়া, ক্ষীরকদম্ব, নারকোলনাড়ু, শোন-পাপড়ি। উফ্ আমি আর তাকাতে পারছিলুম না। ঘুরে ঘুরে বাগানের খবরদারি করছে সাহেবদের মতো লালমুখো সব দশাসই ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। দেখলে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। নিচে ছড়ানো চমৎকার সাদা দানা চিনির বালি, চিকচিক করছে মিছরির নুড়ি। এদিক ওদিকে খেলনার দোকানগুলোতে থরে থরে সাজানো রয়েছে রাশি রাশি ফল। থোকা থোকা রস টশটশে আঙুর, গাঢ় লাল রঙা আপেল, উজ্জ্বল হলুদ সোনার বরণ নাশপাতি, ডাঁশা পেয়ারা, মিশমিশে কালো জাম, মসৃণ রূপসী কমলালেবু, দুষ্টু জামরুল, রক্তাভ ডালিম ও বেদানা আর ঘোর সবুজ রঙের ইয়া বড় বড় তরমুজ। শশা, কলা, পাঁপর ভাজা, রেশমী মিঠাই, ফুলকো লুচি ও পরোটারা ঘুড়ি হয়ে ঘুরছে আকাশময়। ভোঁ-কাট্টা হচ্ছে মাঝে মধ্যে। ডানা মেলে পাখির মতো ওড়াউড়ি করছে জিভেগজা, পান্তুয়া আর জিলেপি। সবার গায়ে সাইনবোর্ডের মতো বড় বড় হরফে লেখা আমাকে খাও, আমি খুব মিষ্টি, আমাকে পান কর ইত্যাদি।

ওখানকার রাষ্ট্রপ্রধান হলেন তিতিরদিদি। কি অসামান্য সুন্দরী ও রূপবতী। যেমন তাঁর রূপের ছটা তেমনি তাঁর জমকালো পোশাকের বাহার। এমনিতে বেজায় রাশভারি হলেও

আমাকে দেখে কেন জানি না ফিক্‌ করে হেসে ফেলেছিলেন। আর অমনি এক অবাক কাণ্ড। তাঁর হাসির সঙ্গে ঝরতে লাগল রাশি রাশি মুক্তোদানা। সে কি দৃশ্য! বলে বোঝাতে পারব না। তিতিরদিদির পরেই ইল্লির স্থান। ইল্লির রূপের গুণের বর্ণনা দেয়া অন্ততঃ আমার সাধ্যের অতীত। তাছাড়া গোগোদাই বা কি মনে করবেন? ইল্লির প্রধান সহচরী কাল্লুর সঙ্গে গোগোদা কেন জানি না আমাকে এত বিশেষভাবে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন যে আমি লজ্জায় তার

দিকে মুখ তুলেই তাকাতে পারিনি। ওখানে আরও যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাদের মধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রকের পুপলু, তথ্য ও বেতার দপ্তরের বাবুই, টেলিভিশন কেন্দ্রের শারি ও মৌরি, নৃত্য পটিয়সী মুন্না, সভাকবি ও ছড়াকার ঘুচাই, চারু ও কারু শিল্পী তাতাই, কুস্তিগীর ডোডো, সানাই ও বিউগল বাদক দুই যমজ ভাই বুদ্ধু-ভুতুম, বাঘা সাংবাদিক শার্দুল শাবক তিতাস, যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ বাবু ভোজনপটু তকাই, বীরাঙ্গনা তৃণা, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নায়িকা রাজুমাসি, কোকিলকণ্ঠী সুগায়িকা দুই বোন রিঙ্কু ও টিঙ্কু, ক্রন্দন শিল্পী বুড়ি, বন্ধন শিল্পী রাবড়ি ও তুবরি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অনেকেই ছিলেন। যাদের সকলের সঙ্গেই আমার দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছিল। এবার উলুউলু দেশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেয়া যাক। জনপ্রিয় দৈনিক কাগজে রয়েছে

তিনটি ঃ কাঁচাআম, ইলশেগুঁড়ি ও পাকাকলা।

দৈনন্দিন আহার্যের মধ্যে আচার চাটনি, পনির মোরব্বা, ফুচকা, আলু কাবলি ও আমসত্ত্বই প্রধান খাবার। বঁড়শি ফেললে চটপট উঠে আসে টকটকে লাল চিংড়ি ফ্রাই, হাতের পাতার মতো ইয়াব্বড় ভেটকির কাটলেট। অনুরোধ করলেই খুব সুন্দর রাঙা কুসুম সমেত জলপোচ ডিম পেড়ে দেয় মোরগেরা প্লেটের ওপর কিংবা সাজিয়ে দেবে ফাউল কারি বা আস্ত রোস্ট। তুলতুলে নধর খরগোশ, ধেড়ে ইঁদুর, ছুঁচো, মিনি বেড়ালের পিঠে চেপে ঘোরা যায় সারা শহর। বিরাট বিরাট মোষেরা হচ্ছে ডবল ডেকার। শজারু হচ্ছেন যাননিয়ন্ত্রণের কর্তাব্যক্তি। নান কাজে তাকে সাহায্য করেন ময়না ও টিয়াপাখি। ইস্কুল-টিস্কুলের বালাই না থাকলেও আছে অনেক চিড়িয়াখানা, ফুলের বাগান, রঙিন টেলিভিশন কেন্দ্র, চড়ুইভাতির জায়গা আর দোকান ভর্তি কার্টুনের বই। টিনটিন, অরণ্যদেব, বাদুড়-মানব, জাদুর ম্যানড্রেক, মিকিমাউস, কার্লিকেওর স্মরণীয় কীর্তিকলাপ। সুকুমার রায়ের যাবতীয় রেখা ও লেখা, বিভূতিভূষণের আম আঁটির ভেঁপু শিব্রাম চকরবরতীর গল্প, কমলকুমার মজুমদারের কাঠখোদাই, সত্যজিৎ রায়ের লিমেরিক অমিতাভ চৌধুরীর ছড়রা সবাই গোগ্রাসে গেলে গ্যালনে গ্যালনে। পাগলা দাশু খুড়ো, সীতানাথ বন্দ্যো, বুড়ো আংলা, হর্ষবর্ধন গোবর্ধন, বিনি, ইতু, প্রোফেসর শঙ্কু, ফেলুদা, গুপী, বাঘা, যাদুকর বরফি, ঘনাদা, পদী পিসী এঁরা পৌরসভার সর্বজনমান্য বিশিষ্ট নাগরিক। নানার্থ বর্ণসংক্ষেপ অভিধান সরকারী উদ্যমে সম্পাদনা করেছেন প্রফুল্ল মূর্দ্ধন্য ণ। পূর্ণেন্দু পত্রীর গবেষণা-গ্রন্থ 'কি করে কলকাতা হল' গত বছরের রাষ্ট্রীয় 'পাতাবাহার' পুরস্কারের সম্মান মূল্য এক লক্ষ লজেঞ্চুষ মতি নন্দীর 'স্ট্রাইকার' এবারকার সব চাইতে হিট ছবি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভয়ঙ্কর সুন্দর সমস্ত হলগুলোতে একাদিক্রমে ৫২ সপ্তাহ ধরে হাউস ফুল চলে বিশ্ব রেকর্ড করেছে।

স্থানীয় ফুটবল লীগ পেয়েছে এবার বকপল্লী একাদশ। কোঁচ বক, গাই বক, লাল বক, খুন্তে বক, ওয়াক বক, কালো বক, কুঁড়ো বক, কানা বক প্রভৃতি দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়েরা ছিল দলে গোলদাতাদের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে কানা বক। শীল্ডের ফাইনাল খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সে কি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা! সবাইকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল দু'টি বিদেশী দল। ছাঙ্গু হ্রদের 'অম্বুকুক্কুট বন্ধু একাদশ' ও লাডাকের 'টিট্টিভ প্রতিভা'। লম্বপুচ্ছ, জলপিপি চক্রবাক, সোনাজঙ্ঘা, গগনভেরী, শরাল, ডাহুক পানকৌড়ি, গগনবেড়, হাড়গিলা, সারস সলিলবায়সের মতো নামজাদা খেলোয়াড়রা ছিলেন দু দলে। পর পর দু দিন অতিরিক্ত সময় খেলার পরও ফলাফল অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার মুহূর্তে 'অম্বুকুক্কুট বন্ধু একাদশের' ধুন্ধুমার সেন্টার ফরোয়াড আচমকা একটি দূরপাল্লার সটে গোল করে বসে। কিন্তু 'টিট্টিভ প্রতিভার খেলোয়াড়রা গোলটির বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি জানায়। টাকলামাকানের রেফারি টেকো কাক দুই প্রান্তিক মানুষ গোবির ন্যাড়া শকুন ও পামিরের খোঁড়া বাজের সঙ্গে এ নিয়ে সলাপরামর্শ করেছেন, এমন সময় দেখা গেল, অম্বুকুক্কুট দলের হাড়গিলা শীল্ডটি নিয়ে চোঁচা দৌড় লাগিয়েছে। অমনি দারুণ হাতাহাতি আর হট্টগোলে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত যতদূর জানি কর্তৃপক্ষ কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেননি।

কখনো যদি উলুউলু দেশে যাবার জন্যে মনটা উড়ুউড়ু করে প্রথমেই কিন্তু যেতে হবে গোগোদার কাছে, আর গোগোদার কাছে যেতে হলে আসতে হবে আমার কাছে আর আমি কিন্তু এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরে গেছ এটা-ওটা-সেটা খেতে ভীষণ ভালবাসি। সুতরাং ...

ফুটবল থেকে সাবধান

হাসান আজিজুল হক

ভল্টু বিষম খিদে নিয়ে সকালে বিছানায় উঠে বসল। অথচ যাকে বলে হেঁটে চলে বেড়াবার তাগৎ তা তার নেই। গতকাল বিকেলেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। পল্টু ওদিক থেকে বলটা ধরে ফটুকে কাটিয়ে ভল্টুকে পাশ দিয়েছে। ভল্টুর সামনে কেউ নেই, গোল পর্যন্ত একদম ফাঁকা—খালি গোলকী রামু ভয়ে তলপেট চেপে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক অমনি সময়ে—যাকে বলে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত কোথা থেকে লেদু এসে ধাঁই করে একটা চার্জ কষলে। ভল্টু পশ্চিম মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, পায়ের পাতাও কাজেই পশ্চিম দিকেই ছিল। কচাৎ করে একটা আওয়াজ হলো, আর তার পায়ের পাতাটা সিম্পলি উত্তর দিকে ঘুরে গেল। তারপর আর ওর কিছুই মনে নেই, আবছা দেখলে রামু তলপেট ছেড়ে দিয়ে দুহাত তুলে নাচছে আর আকাট চাষা লেদু কিরকম অবাক গলায় বলছে, লাও বেপদ, পাটো গেল যি।'

এই অবস্থায় বাড়ি ঢোকার উপায় ছিল না। তাহলে আব্বার পিটুনীর চোটে বাকী ঠ্যাংটাও যেত। সেইজন্যে বেশ খানিকটা রাত্তির হলে ভল্টু লেদুর ঘাড়ে ভর দিয়ে চুপি চুপি নিজের ওপরের ঘরে উঠে গেছে। নিচে নামার কোন প্রশ্নই নেই, সেজন্যে ভল্টুকে গতরাতে একসের শুকনো চিড়ে চিবিয়েই কাটাতে হয়েছে। ওর এই ঘরে হাঁড়ি-কুড়ি খুঁজলে মাঝে মাঝে চিড়ে, চাল বা গুড়টুর একটু পাওয়া যায়। এই যা বাঁচোয়া। ছোট বোনটা একবার ডাকতে এসেছিল খেতে। ভল্টু আজ আর খাবে না। বারোমাসের পেত্যেকদিন বাড়িতে ভাত চিবোয় না ভল্টু।

এখন এই সক্কাল বেলায় ভল্টুর এমন ভয়ানক খিদে পেল যে সে পরিষ্কার বুঝতে পারল তার জ্বর হয়েছে। জ্বরটর হলেই খিদেয় সে অজ্ঞান হয়ে যায় এটা তার ছোটবেলাকার অভ্যেস। ডানপায়ের গোড়ালির কাছটায় টেনিস বলের মত ফুলে উঠেছে। 'জীবনে আর আমি ফুটবলের চেহারা দেখব না'—এই বলে ভল্টুর ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল, 'আর লেদু ব্যাটার পা'তো আর পা দিয়ে ভাঙা যাবে না—কাঠের উপর রেখে মুগুর দিয়ে থেঁতো না করলে উপায় নেই।'

ছোট বোনটা এই সময় আবার এলো। বেণী দুলিয়ে ঝংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করল সে নিচে নামবে কিনা। আর ভল্টু মুহূর্তে কেমন উদাস হয়ে গেল, 'হায়রে, আমার কি এমন কেউ আছে যে দুটো খাবার এনে দেয় এখানে—আমার জন্যে একটু ভাবে এমন কেউ নেই এ বাড়িতে। এই যে আমি এখন এ্যালজেব্রা কষব—আর সে সব কি সাংঘাতিক সাংঘাতিক এ্যালজেব্রা—ভাবলেও নাড়িভুঁড়ি বাইরে চলে আসে—সে সম্বন্ধে কারুর কি কোন ভাবনা চিন্তা আছে?' এই সব কথার পর ওর ছোট বোন বেচারা একটা আস্তো কাঁটালের অর্ধেকটা দিয়ে গেছে তাকে। তাই খেয়ে ভল্টু কোন রকমে প্রাণটা রক্ষা করেছে।

খাওয়া শেষ হতেই কিন্তু মনে পড়ল আজ এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টার ফটিকবাবুর ক্লাশ। এইবার ভল্টুর সত্যি সত্যিই জ্বর চলে এলো। সত্যি বলতে কি তার এত শীত করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল যে সে মোটা একটা চাদর টেনে নিয়ে আগাগাড়ো মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। তখুনি নিচে থেকে আবার খড়মের আওয়াজ এলো। ভল্টু টান মেরে চাদর সরিয়ে দিয়ে মরিয়া হয়ে উঠে বসল। সে ভাবল এই রকম ঘাবড়ে গেলে বিপদ বেড়েই যাবে। —স্কুলেও যেতে হবে—এ্যালজেব্রার ব্যবস্থাও করতে হবে। গোড়ালীর কাছে এমন ব্যথা করছে যে ভল্টু উঠে দাঁড়াতে পারছিল না।

অতি কষ্টে নিচে নেমে এলো সে—উঠোনে আসতেই আব্বার সংগে মুখোমুখি, কোথায় যাচ্ছো?

ভল্টু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এমন মারাত্মক একটা হাসি ছাড়লো যে আব্বার মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। তিনি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলেন আর তাঁকে দেখিয়ে ভল্টু হাত পা নাড়তে লাগলে এমনি ভাবে যেন তার পায়ে কিছুই হয়নি।—তেমনি হাসতে হাসতে বললে—'জী না, আমার কিছু হয়নি।

'জিজ্ঞেস করছি কোথায় যাচ্ছো।' ওর আব্বা গম্ভীর গলায় বললেন।

'এই যাঃ, দিচ্ছিলাম সব ভেস্তে'—ভাবলে ভল্টু—তারপর মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, পল্টুর কাছে এ্যালজেব্রাটা একটু আনতে যাচ্ছি—মানে এ্যালজেব্রা আপনি কিনে দেননি তো! বোধহয় একটু চুপসে গেলেন ভল্টুর আব্বা। ভল্টু ওঁর চোখের ওপর দিয়ে মার্চ করতে করতে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসেই তার মনে হোল গোড়ালীটার পাশে ঐ টেনিসবলটা দিয়ে তার জানটাই বেরিয়ে যাচ্ছে। সেটা চেপে ধরে 'মাই ফাদার' বলে ভল্টু বসে পড়লো।

এমন বিচ্ছিরি ব্যথা করতে লাগল যে ইচ্ছে হচ্ছিল পাটাকে কেটে বাদ দিয়ে দেয়। এইসময় লেদু কোথাথেকে দুটো গরু তাড়াতে তাড়াতে এসে হাজির।

'পা কি বুলে?' লেদু বললে।

'পা কি বলে দেখবি—এই দ্যাখ'—বলে ভল্টু বাঁ পা দিয়ে একটা লাথি ঝাড়ল লেদুর কোমর বরাবর। কিন্তু ঠিক সময়ে সরে গেছে লেদু। ফলে এই হলো ভল্টুর বাঁ-পাটাও জখম হলো। লেদুটা চাচা হলে কি হবে। আসলে প্রাণটা ওর বড্ড ভাল, বললে, 'আমার দোষটো কি বল্, আমি চার্জ্জ লোব না? চার্জ্জ না নিলে বলটো যি গোলে ঢুকিয়ে দিতিস।'

ভল্টু গম্ভীর হয়ে বললে, 'যাক' যা করেছিস করেছিস। বল খেলা গেলো আমার চিরদিনের জন্যে। পা-টা কেমন ফুলে উঠেছে দেখেছিস। তোর মন খারাপ করছে না আমার জন্যে?'

লেদু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'তোর লেগে দুঃখুতে আমার জানটো বেরিয়ে যেচে র‍্যা।'

'তাহলে আমাকে একটু খুশী করা তোমার কর্তব্য কিনা?'

'লিচ্চয়'—লেদু বললে।

'তাই যদি ইচ্ছে তোমার, তাহলে বোর্ডিং-এ পল্টুর কাছে নিয়ে চল আমাকে—হাঁটার তো ক্ষমতা রাখিস নি।' লেদু ঘাড় নামিয়ে বললে, 'ওট্ তাইলে—ঘাড়ে করেই লিয়ে যাই তোকে।'

লেদুর চুল মুঠো করে ধরে ভল্টু মনের আনন্দে পল্টুর কাছে পৌঁছুল। সে তখন স্কুলের বারান্দায় বসে নস্যি টানছিল। সামনে এ্যালজেব্রাটা খোলা। ভল্টুকে ওমনি করে আসতে দেখে সে একেবারে থ হয়ে গেল, ফিসফিসিয়ে বললে, কাঁধ থেকে নামো গাড়োল কোথাকার। শীগগীর নামো।

'কেন'? ভল্টু জিজ্ঞেস করল। লাইব্রেরীতে ফটিক স্যার বসে আছে। তোমাকে ওমনি অবস্থায় দেখলে আজ আর চারা নেই। এ্যালজেব্রা হয়েছে?

'না'।

'তাহলে আজ তুই নির্ঘাৎ মারা যাচ্ছিস। তোকে আর রক্ষা করা গেল না।

ফটিকবাবুর নাম শুনেই ভল্টু তাড়াতাড়ি লেদুর ঘাড় থেকে নামার চেষ্টা করছিল। পায়ের ব্যথা নিয়ে লাফিয়ে নামারও উপায় নেই। আর লেদুটা এমনি হাঁদা যে যত তাকে নামিয়ে দিতে বলা হচ্ছে ততই সে স্কুলের খোলা মাঠে চক্কোর দিচ্ছে। 'কিগ? কি বুলছ?' লেদু এই কথা জিজ্ঞেস করে আর লাইব্রেরীর খোলা দরজার সামনে ভল্টুকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

'নেকু? কি বলছি বুঝতে পারছে না?' ভল্টু খিচিয়ে উঠলো।

'লাববে?'

'কোথাকার চাষা বল্‌তো এটা। একশবার বলছি নামিয়ে দে, নামিয়ে দে। এতক্ষণ পরে বলে কিনা লাববে? ওরে আস্তে আস্তে—ফেলে দিস না—মরে যাব, মরে যাব'—ভল্টু কঁকিয়ে উঠল আর সংগে সংগে হুড়মুড় করে লেদু তাকে নামিয়ে দিলে ঘাড় থেকে। 'ইষ্টুপিট, গাধা, উল্লুক'—মহাখাপ্পা হয়ে ভল্টু গালাগাল দিতে লাগল লেদুকে। 'জানিস পায়ে কি সাংঘাতিক দরদ হয়েছে তবু—'

'অয়, তা আমি কি করব—লাবিয়ে দিতে বুললে যে—' রাগে বাক্যহারা হয়ে ভল্টু লেদুর দিকে চেয়ে রইল খানিক। পল্টু সিরিক সিরিক করে একটা অদ্ভুত আওয়াজে হেসে বললে, 'যাক ছেড়েদে—অবোধ জীবতো—করে ফেলেছে। এখন এ্যালজেব্রার কি করবি বল। সকাল থেকে বসে বসে নস্যি টানছি, উপায় তো কিছু করা গেল না। তোদের আর কি ভাই, বাড়িতে থাকিস—স্কুলে না এলেই হোল। আমরা তো বোর্ডিং-এ থাকি, ক্লাশে না পেলে কান ধরে নিয়ে যাবে।

'ওই আনন্দেই থাক' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভল্টু বললে, 'ফ্যামিলি লাইফের দুঃখুতো বুঝলি নে কোনদিন। বাড়িতে যদি জানতে পারে পায়ের এই দশা হয়েছে, মারের চোটে বাকি পা-টাও এ রকম করে দেবে—তারপর গরুর গাড়ি করে স্কুলে পৌছিয়ে দিয়ে বলে যাবে, হারামজাদাটাকে আচ্ছা করে কসুন তো।'

'ফটকে তাহলে তো আজ প্রাণে মারবে রে'—

পল্টু বললে, 'এ্যালজেব্রার এই অংকগুলোই আগের ক্লাশে কষতে বলেছিল। কেউ পারেনি বলে আবার দিয়েছে। আজ কষে নিয়ে না যেতে পারলে—'

'কি হবে চিন্তা করা যাচ্ছে না, ভল্টু পাদপূরণ করে দিলে।

'উপায় করি কি'—

'আমিও তো তাই ভাবছি।'

'ফুটবলটা বার করে নিয়ে আসব? আমার ঘরেই থাকে।' ভল্টু জিজ্ঞেস করে।

'বল দিয়ে কি করবি বলদ কোথাকার?'

'একটু খেলি।'

ভল্টু আর্তনাদ করে উঠল, 'পল্টা, তোর মনে এই ছিল—এমনি দাগা দিলি আমাকে? জানিস এ জন্মের মতো বলখেলার দফা আমার রফা হয়ে গিয়েছে। পাখানা দেখেছিস। সেই তুই আবার

বলের কথা তুলিস এই সকাল বেলায় ?'

তোমার জন্যে দুঃখুতে বুকটো ফাটচে আমার। পা-টো ভেঙে ফ্যালেলোম—লেদু আবার এসে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করলে। 'তুই যাসনি এ্যখনো'—ভল্টু অবাক হয়ে গেল ওকে দেখে।

'বল নিয়ে এসে প্রাকটিশ করি একটু—বিকেলেই তো খেলা আজ সরফরাজপুরের সংগে'—পল্টু আর জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা না রেখে ঘরে গিয়ে বল নিয়ে এলো। দেখেই লেদু লুংগী গুটিয়ে মালকোঁচা মারলে, 'গরু মাটে লিয়ে যাবার বেলা হয় নাই এখনও—দুবার পিটিয়ে লি—লাও, মারো দিকিনি'—বলে লেদু রেডি হয়ে গেল। তখন পল্টু ওর কানে কানে কি বললে আর ভল্টু দেখল গাধাটা মাথা নাড়ছে ঘনঘন পল্টুর কথায়।

প্রথম বলটা ধাই করে স্কুলের দেওয়ালে লেগে ফিরে এলো আর সংগে সংগে বলটাকে পাতিয়ে নিয়ে লেদু এমন একটা ভয়ংকর কিক্ লাগালে যে লাইব্রেরী রুমের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটা ইট খসে পড়ল দুম করে।

এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার ফটিকবাবু লাইব্রেরীর ভেতর থেকে হাঁক পাড়লেন, 'এই সকালে বল বের করেছে কে রে ?' বয়স হয়েছে তো মাষ্টার মশাই-এর—এই জন্যে গলাটা বেশ জমকালো হলেও কেমন কাঁপা কাঁপা, আবার টেনে টেনে বললেন, বলি বল বার করলে কে ?'

ভল্টু বসে বসে দেখছিল ফটিকবাবু বিরাট ভুঁড়ি, কাপড় ইত্যাদি সামলে বহু কষ্টে কাজ ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে আসবার চেষ্টা করছেন। তক্ষুনি পল্টু দরজার কাছে গিয়ে ঘরে উঁকি দিয়ে বললে, 'মাষ্টার মশাই, আমরা।' বলতেই বিদঘুটে গলায় আকাশ ফাটিয়ে ভেংচিয়ে উঠলেন ফটিকবাবু, 'এ্যাঃ আমরা! দাঁত বের করা কোথাকার। বলতে লজ্জা হচ্ছে না ? বেকুফ, বলদ, গোময়।' 'সামান্য একটু প্র্যাকটিশ করছি মাষ্টার মশাই'—পল্টু একেবারে বিনয়ের অবতার। 'চোপ'—আবার বোমা ফাটার আওয়াজ হোল—'সকাল বেলায় পড়াশোনার ইস্তফা দিয়ে প্র্যাকটিস হচ্ছে। এ্যালজেব্রা কষেছিস ?'

'এইমাত্র শেষ করলাম। বিকেলে ম্যাচ তো মাষ্টার মশাই—তাই একটু পায়ের গাঁটগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি।'

'হতভাগার কথা কি—গাঁট ছাড়িয়ে নিচ্ছি। ক্লাশে আজ অংক না হলে তোমার গাঁট আমিই ছাড়িয়ে দেব। যা বলফল নিয়ে পালা।'

এই সময় দুম করে একটা বল এসে লাগল দরজায়। লেদুর মার। ইতিমধ্যেই আরও কয়েকজন এসে জুটেছে। 'এ্যই খবরদার, লাইব্রেরী ঘরে একটা বল এসে লাগলে ছাল ছাড়িয়ে নেব।' বলে ফটিকবাবু খালি গায়ে চেয়ারে গিয়ে বসলেন—পেতলের বিরাট একটা কলসীর মতো তাঁর ভুঁড়ি ঠিক যেন বাতাসে ভেসে রইল।

'টেক এম' পল্টু ফিরে এসে বললে লেদুকে।

ইংরেজী হলেও লেদু বুঝলে, বললে, 'এ্যাম যে হচে না—আমি কি করব ?'

'আবার মার—ভুঁড়িটাতো বাতাসে ভাসছে, দেখতে পাচ্ছো না নাকি—তোমাকে ম্যাচে খেলতে দেওয়া হবে না—এই সামান্য এইম নাই যার সে গোল করবে কিভাবে ?' ধাঁই—বল গিয়ে লাগল লাইব্রেরী ঢোকার সিঁড়িতে। ফটিকবাবুর ঘুম জড়ানো গলা শোনা গেল, 'ওরে আস্তে মার,—শেষে একটা সব্বোনাশ হয়ে যাবে।' ধাঁই, ঝন্‌ঝন্ ঝন্‌ঝন্—স্কুলের ঘন্টা উলটিয়ে পড়ল—আর বদনাটা উপুড় হয়ে গিয়ে সমস্ত পানি লাইব্রেরী ঘরের মেঝেতে গড়িয়ে চল্‌ল। 'এইযে বদমাস, শিয়ালমারা মামদোভূতের দল, বলি, একটু আস্তে আস্তে বুঝি প্র্যাকটিশ হয়না ?

লেদু এখন বলটা পাতিয়ে নিয়েছে। লুংগীটা বেশ ভাল করে কষে বেঁধে 'এ্যাক' করে একটা আওয়াজ করে কিক্ কষালে। বলটা মাটি ছেড়ে উঠল, ভন্টু চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে—পল্টু, হুদাই, ভ্যাবলা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে—বলটা বাঁদিকের দরজা দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে ডানদিকে ঘুরে গেল—তারপর পাখির মতো নিচে নেমে এসে—বিশ্বাস করা যাবে কি সে কথা? ফটিকবাবুর ভুঁড়িতে গিয়ে লাগল। টেবিলের ওপর গতকালকের নেভানো হারিকেনটা উলটে ফেলে দিয়ে ঠিক যেন মনের উল্লাসে লাফাতে লাফাতে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

ভুম—গম্ভীর একটা আওয়াজ বেরুল। ভন্টু ততক্ষণে চোখ খুলে দেখে ফটিকবাবু চেয়ার শুদ্ধু উলটে পড়ে আছেন। আশ্চর্য ব্যাপার—উপুড় হয়ে গেছেন তিনি—নড়ন্ চড়ন কিছু নেই। 'এযে নড়েনা যেরে—ভন্টু প্রায় কেঁদে ফেলল। কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে পল্টু লেদুকে বললে, 'কেটে পড় এক্ষুনি—তল্লাটে যেন পাওয়া যায়না তোকে—যা ভাগ।' লেদু যেতে যেতে শুধু বললে, 'ভুঁড়িটো জব্বর বটে বাপু—কি রকম আওয়াজ হোল শুনলে।

ফটিকবাবু চুপচাপ থাকলেন মিনিট খানেক। ভন্টু পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটা তুলতে গিয়ে দেখল কপালটা ফুলে উঠেছে ওঁর। 'মাষ্টার মশাই খুব কি লেগেছে আপনার?' পল্টু যেন মর্মাহত হয়ে জিজ্ঞেস করল। আর বললে বিশ্বাস করবে না কেউ, দারুণ একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। উনি বোধ হয় বললেন, 'চোপ'—কিন্তু দাঁত নেইতো, শোনাল 'হাপ'—তারপরেই আর কথা নেই ফটিকবাবু উঠে লাইব্রেরী ঘরের মেঝে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করলেন, 'আজ সব কটাকে রাস্টিকিট করব—যদি না করি আমার নাম ফটিক চক্রবর্তী নয় আমার বাপের নাম তারিণীচরণ চক্রবর্তী নয়, আমার ঠাকুর্দার নাম হিরণ্যকশিপু চক্রবর্তী নয় নিয়ায় কাগজ—যা হারামজাদা শীগগীর কাগজ কলম নিয়ায়।'

'কাগজ কলম টেবিলেই রয়েছে মাষ্টার মশাই।' পল্টু বিনীতভাবে বলল।

'হাপ—আবার মুখের ওপর কথা, যা বলছি কর—নিয়ায় কাগজ কলম।'

'টেবিলের কাগজ কলম দেব?'

'কক্ষণও না—ঘর থেকে নিয়ায়।'

অগত্যা পল্টু কাগজ কলম আনতে গেল। ফটিকবাবু গর্জনে পাড়া কাঁপাতে লাগলেন 'পঞ্চান্ন বছর বয়স হোল আমার—নিজের পরিবার পর্যন্ত আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করেনা এই ভুঁড়ির জন্যে—এইজন্যে গোঁফ পর্যন্ত রাখিনি। হাটের লোক রাস্তা করে দিয়েছে এই ভুঁড়ি দেখে—আর তুচ্ছ কোথাকার কটা ছোঁড়া কিনা সেখানে তুচ্ছু গোচর্ম নির্মিত বর্তুল দিয়ে আমাকে আঘাত করে?'

পল্টু কাগজ কলম নিয়ে এলো। ফটিকবাবু নিজের ঘরে এসে তক্তপোষের ওপর বসলেন, 'ইদিকে আয় সব—লাইন দিয়ে দাঁড়া।' পল্টু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে এলো। 'কাম অন্, হোয়াট ইজ ইওর নেম?'—ফটিকবাবু পল্টুকে জিজ্ঞেস করলেন। পল্টু অবাক হয়ে গেল 'স্যার, আমার নাম জানেন না আপনি, আমি পল্টু।'

'জানি তা কি হয়েছে? যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দে—ইওর নেম?'—পল্টু'

'ইয়েস'—ফটিকবাবু খসখস করে পল্টুর নাম লিখলেন।

'হাউ মেনি হিট্স্?'

'কি বলছেন ?'
কবার বল মেরেছিস ?'
'দুবার।'
'মিথ্যে কথা। সত্যি বল নইলে—'
'চারবার।'
'ফোর হিট্‌স'—ফটিকবাবু আপন মনে কথাটা বলে লিখে রাখলেন। এমনি করে সবার নেওয়া হোল। বোর্ডিং এর রাঁধুনী এই সময় এসে বলে ফেললে, 'যাওতো বাপু সব থন—স্যার, আজ চাল নেব ক'সের ?' আর যাবে কোথায়—বোমার মতো ফেটে পড়লেন 'তুমি কোন লাট্—যাও যাও ফলাচ্ছ—তোমার চাকরী নেই আজ থেকে। যাও রোও।'

এরপর ভল্টুর ডাক পড়ল।

'নেম ?'—ফটিকবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'ভল্টু।'

'ফাদার্স নেম ?'

ভল্টু মিউমিউ করে তার আব্বার নাম বলল।

'সাবু খেয়েছ।'

'কি বলছেন মাষ্টার মশাই ?'

'ওতো ওরকম করবেই মাষ্টার মশাই। আসলে আপনার ভুঁড়ির ওপর বলটা ওই ভল্টুই মেরেছে তো।' পল্টু বলল।

'কি রকম ?'

'ওর পাটা একবার দেখুন না। এমন মার মেরেছে যে গোড়ালী একেবারে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। আহা বড্ড লেগেছে বেচারার।'

কথা শুনে ফটিকবাবু হাঁক ছাড়লেন, ইদিকে আয়।

ভল্টু অবাক হয়ে পল্টুর দিকে চাইতে গিয়ে দেখে সে তখন ওপরের দিকে চেয়ে কড়িকাঠ গুনছে। যেন কোন কিছুই সে জানে না।

'পল্টা'—বলে ভল্টু একটা গগনবিদারী চীৎকার করতে যাচ্ছিল, ফটিকবাবু ওর কানটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

'হতভাগা—'

'মাষ্টার মশাই আমি গতকাল—'

'শাট আপ—কথা বললে খুন করব তোকে—গুণ্ডা, ডাকাত, বদমাস—'

'আমি গতকাল মাঠে ফুটবল খেলছিলাম, এই সময় হঠাৎ—'

'চোপ রও—উল্লুক পাজী।'

'হঠাৎ লেদু এসে এমন জোরে—'

'নড়তে নাড়ে বন্দুক ঘাড়ে। সেই তখন থেকে বলছি সকালবেলা বল খেলে কাজ নেই—কানে যাচ্ছে না তোমাদের।'

'এমন জোরে চার্জ করলে যে'—ভল্টু তার গল্প বলেই যাচ্ছে।

'পায়ের অবস্থা দেখছিস ভল্লুক কোথাকার—গ্যাংগ্রিন হয়ে মারা যাবি যে।'

'আমি এখানে একটা বলও মারিনি স্যার।'

'একটি চড়ে তোমার দাঁতকপাটি লাগিয়ে দেব—বলছি চুপ করতে। এই তোরা সব
এখান থেকে। স্কুলের সময় সবাই আসবি। সবকটাকে রাষ্টিকিট করতে হবে।' হঠাৎ পল্টুর
নজর পড়তেই খিচিয়ে উঠলেন ফটিকবাবু, 'তুমি শয়তান ভেবেছ ক্লাশ নেবনা আজ?
ওতে আমার কিছু হয়না। আমার নাম কি জানিস তো? দেখে আয়গে ইসলামপুর স্কুলের
আমার নাম লেখা আছে সোনার কালিতে। আজ সারাদিন শুধু এ্যালজেব্রার ক্লাশ হবে।'

তারপর ফটিকবাবু তাঁর হোমিওপ্যাথির বাক্স খুলে একটা ঔষুধ বের করে ভল্টুকে খা
দিয়ে বললেন, যা বাড়ি যা, দুদিন চুপ করে বাড়িতে বসে থাকবি—স্কুলে আসবি না।
বেরুবি না—তোর বাবাকে আমি বলে দেব। হতভাগা পা-টার দশা করেছে কি—চিরদি
মতো খেলাধূলা যে যাবে—যা ভাগ। নুনের পুটুলী করে রাত্রে সেঁক দিবি আর এই ঔষধ
সন্ধ্যায় এক পুরিয়া, কাল সকালে আর সন্ধ্যেয় এক এক পুরিয়া করে খাবি। যতসব শেয়াল
নিয়ে হয়েছে আমার কারবার। যা যা পালা।' এই বলে হাঁক দিলেন তিনি, 'পল্টা, তামাক সা
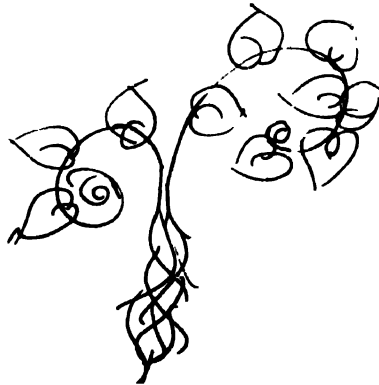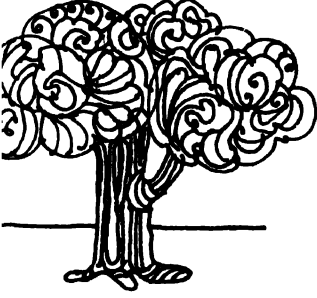
তাঁবুর জগৎ

রাহাত খান

রাজু কোথায় এসেছে বুঝতে পারলো না। বোধহয় আকাশের কাছাকাছি কোন একটি
।। চারদিকে নীল রঙের জোছনা। এখানে ওখানে শাদা হাসির মতো মেঘ। একটা লাল
ঙর পথ নীচ থেকে একটু একে বেঁকে উপরে উঠে গেছে। কে যেন খুব কাছাকাছি থেকে মৃদু
। বললো ঃ উপরে উঠে যাও রাজু। আমি তোমার সাথে আছি।

ঃ তুমি কে কথা বল্ছো ?

রাজু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। চারপাশে তাকায়। বলে ঃ কে তুমি ?

অদৃশ্য লোকটা বললো ঃ আমাকে চেনো না ? আমি মানুষকে স্বপ্ন দেখাই। মানুষকে স্বপ্নের
ে নিয়ে যাই।

কথাগুলি শুনে রাজু আনন্দ অনুভব করলো। বললো ঃ নাকি ? তা তোমার বয়েস কতো ?
ি কি আমার মতো ছোট ছেলে ?

অদৃশ্য লোকটা আস্তে আস্তে যেন ঘুমের ভেতর থেকে বললো ঃ আমার কোন বয়েস নেই।
ী রঙের কি কোন বয়েস থাকে ? আমি তোমার বন্ধু। যারা তোমার মতো স্বপ্ন দেখে আমি
াদের সবারই বন্ধু।

তাহলে স্বপ্নের দিকে যাচ্ছি। রাজু ভাবলো। একবার তাকালো চারপাশে। নীল রঙের
। ঝরছে, শীতের সকালে যেমন উদোম কুয়াশা ঝরে। ষ্টিমারের সার্চলাইটের মতো তীব্র
জ্বলছে সুমুখের পথটা। রাজু হাঁটাতে লাগলো। লাল রঙের ভেতর ডুবে গেল।
াথায় যেন টুপটুপ তারা ঝরছে। আস্তে পায়ে নদী বইছে। এমনি শব্দ। এমনি কলতান।

যেতে যেতে পথ আর ফুরোয় না। শাদা শাদা মেঘগুলি এখন পেছনে। লাল রঙের পথটার
নীলরঙের কুয়াশা বৃষ্টি। আমি একবার ড্রয়িং এর খাতায় আকাশ এঁকেছিলাম। রাজুর
। পড়লো। আমার রঙের বাক্সের নীলের চেয়েও এই আকাশ অনেক বেশী গভীর নীল। তা

হবে। আমি তো এখন ঘুমের দেশের স্বপ্নের ভেতর আছি। যে স্বপ্ন দেখায় মানুষকে তার আছি। রাজু নিচের দিকে তাকালো। বিকেল বেলা পশ্চিমের আকাশ যেমন হয়ে যায় আমি সেরকম রক্তিম হয়ে গেছি। লাল। সিঁদুরের মতো। আগুনের মতো।

তারপর চোখ ফেরালো আর অবাক হয়ে গেল রাজু। নীল রঙের জোছনা কোথাও নেই। এ আর একটা জায়গা। আর এক ঠাঁই সামনে এক বিশাল মাঠ। মাঠের চার পাশে তাঁবু। পেছনে ধূসর রঙের মরাটে পাহাড়।

অদৃশ্য লোকটা বললো ঃ জায়গাটা চিন্‌তে পারছ রাজু ?

ঃ না।

ঃ অনুমান করতে পার ?

ঃ তাও পারি না। এটা কি কোন সার্কাস পার্টির তাঁবু ?

অদৃশ্য লোকটার হাসি শোনা গেল। বললোঃ তুমি সোজা তাঁবুগুলির দিকে হেঁটে চলে যাও। এক একটা তাঁবুতে বসেছে এক এক রকমের দুনিয়া। সার্কাস পার্টিও বলতে পারো। কে মজার সার্কাস। ঘুরে ফিরে তুমি তাঁবুগুলি দেখো। বিদেশে বেড়াতে যায় না মানুষ ? ভ্রমণ করতে যায় না ? মনে করো তুমি ভ্রমণ করছ। তুমি সোজা চলে যাও।

রাজু চেঁচিয়ে বলল ঃ তা না হয় যাচ্ছি। কিন্তু এখানে ঢুকতে টিকিট লাগবে না ? টিকিট ছাড় যদি ঢুকতে না দেয় ?

অদৃশ্য বন্ধু বললো ঃ তোমার ইচ্ছাই তোমার টিকিট। ভুলে যেয়ো না এটা স্বপ্নের জগৎ।

ঃ না ভুলিনি। রাজু বললো ঃ কিন্তু স্বপ্ন কি সবই ভালো ? ধরো দুঃস্বপ্নের কথা দুঃস্বপ্ন দে মানুষ কষ্ট পায়। এখানে এসব কষ্টের ব্যাপার-ট্যাপার নেই তো ?

ঃ থাকবে না কেন ? এখানে সব আছে। এখানকার সবকিছু তোমার ইচ্ছার সাথে ভাঙ্ছে গড়ছে। এখানে তুমি যা খুশী করতে পারো। যা খুশী দেখতে পারো। ভেবো না রাজু। আমি তোমাকে দুটো সুন্দর, সঠিক তাজা চোখ দিয়ে দিচ্ছি।

ঃ চোখ ?

ঃ হ্যাঁ গো।

লোকটি হাসলো ঃ আমি যে ফেরীওয়ালা। যারা ঠিক জিনিসটা ঠিক ঠিক দেখতে চায় আমি তাদের কাছে চোখ বিক্রি করি।

রাজু বললো ঃ আচ্ছা আমি যাচ্ছি। তুমি কিন্তু আমাকে ফেলে চলে যেয়ো না।

রাজু হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতে একটা গোলাকার তাঁবুর ভেতর ঢুকলো। ঢুকেই অবা হয়ে গেল। অপরূপ এক দুনিয়া ভেতরে। এখানে ওখানে উদোম প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, ধুলো পাহাড়, শেওলা জমা দীঘি, উল্টানো সিংহাসন, স্তব্ধ মিনার, নিশ্চল অশ্ব মূর্তি, জংধরা তলোয়া আর অগণিত মনুষ্যাকৃতি পুতুল। সবকিছুর উপর লেগেছে ঘুম আর ধুলোর ছাপ। কোথা এতটুকু শব্দ নেই, এতটুকু জীবন নেই।

মনুষ্যাকৃতি একটা পুতুলের দিকে এগিয়ে গেল রাজু। ভাবলো আহা যদি প্রাণ থাক্‌তো এ পুতুলটার, যদি কথা বলতো !

ভাবলো, আর আশ্চর্য, পুতুলের ঘোলাটে মৃত চোখজোড়া জীবন্ত, চঞ্চল হয়ে ফুটে উঠলো রক্তের দীপ্তি এলো মুখে। জীবন এলো শরীরের সর্বত্র। গম্ভীর অথচ মৃদু মন্দ্রিত গলায় পুতুল বললো ঃ আমার নাম আখ্‌তানুন। যেখানে তুমি এসেছ এটা ইতিহাসের রাজ্য। এখানে যাদে দেখ্‌ছ সবাই আমরা নিজেদের কীর্তির জন্য বেঁচে আছি।

রাজু বললো ঃ ইতিহাসের রাজ্য ? এখানে তাহলে নিশ্চয়ই রাজা সলোমনকে দেখতে পাব ? ফেরাউন, দারিয়ুস, সীজার,আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়নকে দেখতে পাব ?

হ্যাঁ দেখতে পাবে।

ঃ বাঃ কি মজা ! আমি সবার সাথে গল্প করবো জানো আখতানুন, ইতিহাস আমার খুব প্রিয় বিষয়। ভালকথা তুমি ইতিহাসে কোন্ কীর্তির জন্যে বেঁচে আছো ?

আখতানুন বললো ঃ নীল নদী পাড়ি দেবার জন্য আমি নৌকা তৈরী করেছিলাম।

সহৃদয় ব্যবহারের জন্য আখতানুনকে ধন্যবাদ জানালো রাজু। ছাতের উপর থেকে একটুকরো ঝুলন্ত অন্ধকার দুলতে শুরু করলো এই সময়। দূরে কোথাও ঘণ্টা ধ্বনি উঠতে লাগলো সুসময় ফুরিয়ে যাওয়ার মতো বিষাদে, কান্নায়। দেখতে দেখতে আলো নিভে যাওয়ার

মতো জীবন চলে গেল আখতানুনের চোখ মুখ থেকে, শরীর থেকে। আবার নিশ্চল নির্বাক পুতুল হয়ে গেল আখতানুন।

রাজু সামনে এগোলো। কিছুদূর এগিয়ে একটা বিশাল দেয়াল-চিত্র দেখতে পেল সে। যুদ্ধের দৃশ্য। দুই দল মানুষ খোলা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরস্পরের উপর। কেউ রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত ঘোড়ার পাশে শুয়ে যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। লোহার শিরস্ত্রাণ পরা একজন যুবা পুরুষ একটু দূরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছে আর হাত তুলে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে সৈন্যদের এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছে।

এ আবার কি? রাজু ভাবলো আর চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো একজন কঙ্কালসার বৃদ্ধ দেয়াল চিত্রটি দেখছেন মনযোগের সাথে। বৃদ্ধের কাঁধে বসে আছে ঘোরতর কালো রঙের লাল চোখো একটা বাজ পাখী। মাথার উপর নিঃশব্দে উড়ছে কতগুলি ভয়ঙ্কর শকুন।

ঃ কে আপনি, এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে রাজু। বলেঃ দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন আপনি?

বৃদ্ধ ফিরে তাকাল ধীরে ধীরে। অঙ্গারের মতো কালো চোখ তুলে গভীর ব্যথিত কণ্ঠে বললোঃ নিজেকে দেখছি। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করছিলে না? আমি এক অনুতপ্ত, মৃত সৈনিক। হাজার বছর ধরে এখানে দাঁড়িয়ে কৃতকর্মের ফল ভোগ করছি আমি। শকুনিগুলি আমার সুন্দর চিন্তাগুলি খেয়ে ফেলেছে। বাজপাখীটা বুকের ভেতর মুখ ডুবিয়ে তছনছ করছে আমার সুখ ও শান্তি।

রাজু চেঁচিয়ে বললোঃ তাড়িয়ে দিন না ওগুলো ঢিল মেরে। দাঁড়ান, আমিই তাড়াচ্ছি।

বৃদ্ধ বললোঃ না ভাই, ওগুলো তাড়ানো যায় না। চড়া দাম দিয়ে ওগুলো আমিই কিনেছিলাম। ওগুলো আমাকে ছেড়ে যাবে না। তুমি কি ঢিল মেরে তোমার চোখ দুটি তাড়িয়ে দিতে পারো?

ঃ বুঝলাম না, রাজু চেঁচিয়ে বলেঃ আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।

বৃদ্ধ বললোঃ শকুনগুলি আমার লোভ। বাজপাখীটা আমার ক্রোধ। আমি এক ইতিহাস বিখ্যাত খুনী। আমার লোভ আর ক্রোধ মানুষের বহু ক্ষতি করেছে। আমি এখন অনুতপ্ত। কিন্তু এখন আমার অনুতাপের কোন মূল্য নেই।

রাজু বলেঃ ইতিহাসের লোক আপনি? কিন্তু কই, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেঃ ইতিহাসে আমার নাম আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট।

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট। রাজু ভীষণ অবাক হয়ে যায়। তার বিশ্বাসই হয় না এই বৃদ্ধ আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট যার মাথায় ছিল একরাশ কোঁকড়ানো সোনালী চুল। খাড়া নাক আর কঠিন চিবুকের শক্তিশালী পুরুষ আলেকজাণ্ডারের এ যেন একটা ঠাট্টার ছবি।

রাজু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেঃ আপনি আমার সালাম নিন সম্রাট। আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনার বীরত্ব আর দিগ্বিজয়ের কাহিনী নিয়ে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার বই লেখা হয়েছে। বিস্ময়কর আপনার শক্তি ও সাহস। মেসিডোন থেকে পাকিস্তানের পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আপনার রাজ্য। ইতিহাসে আপনি অদ্বিতীয় সম্রাট। আমাদের ক্লাস এইটের বার্ষিক পরীক্ষায় আপনার উপর এবার একটা প্রশ্ন আসবেই। উত্তরগুলি আমার ঝাড়া মুখস্থ। শুনবেন?

ঃ ওঃ তাই নাকি? বৃদ্ধ করুণ ব্যথিত সুরে হাসলো। বললোঃ আমাদের আমলে আমরা রাজা-রাজরারা নিজেদের লোক দিয়ে ইতিহাস লেখাতাম। এই নিয়ম পৃথিবীতে এখনো চলছে তাহলে? আশ্চর্য। আমি ভেবেছিলাম ইতিমধ্যে দুনিয়ার মানুষ আমাদের চালাকী ধরে ফেলেছে।

ব্যাপারটা কি জানো রাজু? নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি টাকা-পয়সা বাহুবল-লোকবল বাড়াবার জন্যেই আমি একটার পর একটা দেশ জয় করেছি, হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ খুন করেছি, শহর গ্রাম লুঠ করেছি। কিন্তু পাছে সাধারণ মানুষ আমাকে ঘৃণা করে এই ভয়ে নিজের লোক দিয়ে আমি নিজের ইতিহাস লিখিয়েছি। কায়দা করে ইতিহাস এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে খুনকে মনে হয় বীরত্ব, লোভকে মনে হয় উচ্চাশা। রাজু আমরা রাজা বাদশার দল নিজেদের স্বার্থেই আইন করতাম, কানুন বানাতাম। কিন্তু ইতিহাসে এইসব মুষ্টিমেয়দের আইন টিকবে না। বর্ষার পাহাড়ী নদী দেখেছ রাজু? ইতিহাস হলো সেইরকম একটা বেগবান নদী। আজ হোক কাল হোক ইতিহাসের তীব্র স্রোতে যুগের ময়লা আবর্জনা ভেসে যাবেই।

বৃদ্ধ কথাগুলি বলে অল্প অল্প হাঁপাতে লাগলো। বললোঃ ভেল্কিবাজী আর জুলুমবাজী টিকবে না রাজু। বহু মানুষের স্বার্থ, সুখ ও সুবিধার উপর একজন বা কয়েকজন নায়কের শাসন আর মানুষ মানবে না। শীঘ্রই সময় আসছে যখন মানুষ নিজের পাওনা নিজেই আদায় করে নেবে।

রাজু তাকিয়ে রইলো বৃদ্ধ আলেকজাণ্ডারের দিকে। কঙ্কালসার বৃদ্ধের কাঁধে বসে আছে একটা ভয়ঙ্কর বাজ পাখী। মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে কতগুলি শকুন।

ছাতের উপর থেকে আবার দুলতে লাগলো ঝুলন্ত অন্ধকারের টুকরোটা। মৃদু গম্ভীর নিনাদে বাজতে লাগলো সময়টা বেদনাময় করে দিয়ে ঘণ্টা-ধ্বনি। দেয়াল-চিত্রের কাছে দাঁড়ানো বৃদ্ধ আলেকজাণ্ডারের ছবিটা দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লুপ্ত হয়ে গেছে ইতিহাসের উদাস প্রাচীন রাজ্য। রাজু নিজেকে দেখতে পেল একটা বিচিত্র জায়গায়।

এবার আমি কোথায় যাই। রাজু ভাবলো আর মনের নিকট থেকে সেই অদৃশ্য বন্ধু বললো এবারে তুমি কালো রঙের তাঁবুর ভেতরে যাও। রাজু বললো আচ্ছা যাচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গেই থেকো। আর কোথাও যেয়ো না। অদৃশ্য লোকটি মিষ্টি হেসে বললো, আমি তোমার চোখের ভেতর থাকি। স্বপ্ন দেখিয়ে বেড়াই। তোমাকে ফেলে আমি কোথায় যাবো?

রাজু ভরসা পেয়ে কালো রঙের তাঁবু'র ভেতর ঢুকলো। বিচিত্র এক দেশ। সীসার মতো মিহি কালো রঙের ধোঁয়া উঠছে চারদিক থেকে। সামনে এক নদীর চরা। কতগুলি পালকহীন ঈগল বসে বসে ঝিমুচ্ছে। বাতাসে তাদের পালকগুলি উড়ছে। শোঁ শোঁ আওয়াজ। এখানে ওখানে পত্রহীন বৃক্ষ। নদীটা ভাঙ্গা, শুকনো। ঘরগুলির দেয়াল নেই, রাজু অবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখলো। তারপর ঈগলগুলির কাছে গেল। ঈগলগুলি রাজুকে একবার তাকিয়ে দেখলো মাত্র। রাজু বললোঃ তোমাদের গায়ে পালক নেই কেন? ঝিমোচ্ছ কেন তোমরা? তোমাদের কি হয়েছে।

একটা বুড়ো ঈগল হাঁপাতে হাঁপাতে বললোঃ আমাদের পালক দিয়ে টুপি বানানো হয়। বিদেশে এই সোনালী পালকের খুব দাম। আমাদের গা থেকে পালক খসানো হচ্ছে বিদেশের বাণিজ্যের জন্য।

ঃ কিন্তু এভাবে গা থেকে পালক খসিয়ে নিলে তোমরা বাঁচবে? রাজু ব্যথিত হয়ে প্রশ্ন করে।

ঃ নিশ্চয়ই বাঁচবো। বেঁচে তো আছিই। দিব্যি টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে পারছি।

বুড়ো ঈগল জবাব দেয়। বলেঃ তুমি কে হে বাপু ভেজা ভেজা কথা বলছো? আমাদের পালক নিয়ে আমরা যা খুশী করবো। যাও তুমি এখান থেকে, ভাগো ···,

ঃ আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

রাজু বললোঃ কিন্তু ঈগল দাদু ..... টেনে টুনে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার নামই বাঁচা নয়। কথাটা মনে রেখো।

ঃ আরে যা, যা, ফক্কর কাঁহেকা ....

বুড়ো ঈগল রেগে যায়ঃ বলে, বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ এভাবে বেঁচে এলাম আর তিনি কোথাকার এগারো বছরের এক ছোঁড়া এলেন এলেম দিতে!

দুঃখিত হয়ে রাজু সেখান থেকে চলে এলো। কিছুদুর গিয়ে সে একটা পাথর বাঁধানো পথ দেখতে পেলো। চারদিক থেকে সীসার মতো মিহি কালো ধোঁয়া উঠছে। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। শ্যামল রঙ নেই। নদীগুলি ভাঙ্গা, শুকনো। ধূসর ছায়া বিছিয়ে পাহাড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে প্রেতের মতো। রাজু পাথর বাঁধানো পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। কোথা থেকে যেন জল-প্রপাতের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো! কিছুদুর গিয়ে ভুল ভাঙ্গলো রাজুর। জল-প্রপাত নয়। একটা বিশাল বটগাছ ঘিরে খেলা করছে বৈশাখের মতো তুমুল বাতাস। চারদিকে খোলা। রাজু বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ায় আর অমনি কোত্থেকে যেন ছুটে আসে ঢোলা কোর্তা, লম্বা বাঁকানো টুপি আর নৌকার মতো জুতো পরা একদল ছোটখাট মানুষ। না, মানুষ নয়। রাজু তাকিয়ে দেখলো একদল বানর।

ঃ আমাদের নগরে প্রবেশ করুন হুজুর। অনায়াসে প্রবেশ করুন। বানরগুলি কুর্নিশ করে কিচির মিচির করে বলেঃ পথে আসতে কষ্ট হয়নি তো? কি বললেন কষ্ট হয়নি? তাহলে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়নি। আমাদের কি কপাল,পথে আসতে হুজুরের কষ্ট হয়নি!

বানরেরা নাচতে লাগলো আনন্দে। রাজু বললোঃ তোমাদের নগর কোথায়? চলো তোমাদের নগরে আমি যাব।

বানরেরা কলকণ্ঠে বলতে লাগলঃ নিশ্চয় যাবেন হুজুর, একশো বার যাবেন। হাজার বার যাবেন।

বানরদের চেঁচামেচিতে একটু বিরক্ত হয় রাজু। বলেঃ কিন্তু তোমরা ভাই যদি এ রকম হৈ চৈ করোতো তোমাদের নগরে আমি নাও যেতে পারি।

ঃ কি মজা কি মজা।

বানরগুলি উদ্বাহু নৃত্য করতে লাগলোঃ হুজুর আমাদের নগরে নাও যেতে পারেন। চলো হে, আমরা হুজুরের নামে গান গাই। আমাদের কি কপাল যে হুজুর আমাদের নগরে নাও যেতে পারেন!

বানরেরা কোরাস গান গাইতে লাগলো!

এ আবার কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়লাম। রাজু ভাবনায় পড়ে। বানরদের গান শেষ হলে সে বলেঃ তোমরা বড় বিচিত্র জীব দেখছি!

ঃ জী হাঁ হুজুর, আমরা বড় বিচিত্র জীব।

ঃ তোমাদের জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি!

ঃ আমাদের জ্বালায় হুজুর অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন! চলো হে,

বানরেরা আবার পরস্পরকে আহ্বান করেঃ চলো হুজুরের নামে আমরা গান গাই। হুজুর আমাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন!

ঃ এইও চুপ! রাজু আর থাক্‌তে না পেরে একটা ধাড়ী বানরকে ধমক লাগায়ঃ যদি বাড়াবাড়ি করো তো মার লাগাব বলে রাখছি ....

ধাড়ী বানরটা কাঁদকাঁদ হয়ে বলেঃ আমরা বড় বাড়াবাড়ি করছি। দিন হুজুর, মার লাগিয়ে

দিন আমাদের। বড়ো বাড় বেড়ে গেছে, পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিন আমাদের! ওরে, হুজুরকে সবাই পিঠ পেতে দে। হুজুর দয়া করে আমাদের জুতো পেটা করবেন।

রাজু রেগে-মেগে আরো গোটা দুই ধমক লাগায়। তারপর হন্হন্ করে সামনের দিকে এগোয়। মেজাজ তার বিগড়ে গেছে। স্বপ্ন দেখার বন্ধু কানে কানে বললো এরা আগাছার দল। দুনিয়ার সর্বত্র আছে। কেমন লাগলো ওদের ?

ঃ কি বিচ্ছিরি!

রাজুর রাগ এখনো যায়নি ঃ আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

অদৃশ্য বন্ধু বললো, চলো রাজু, এগিয়ে চলো। রাজু এগিয়ে চললো। কিছুদূর গিয়ে রঙ বদলে গেলো। শাদা নীলের মেশামেশি একটা আশ্চর্য রঙ চারদিকে। একটু দূরে মস্ত একটা প্রাসাদ দেখা গেল! সামনে বিশাল খোলা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছে হাজার হাজার ছোট ছোট ভালুক শিশু।

এটা একটা বিদ্যালয়। অদৃশ্য বন্ধু রাজুর কানে কানে বললো। রাজু তাকিয়ে দেখলো ভালুক শিশুদের সামনে পেছনে বই, বই, আর বই। বইয়ের পাহাড়। সবাই বইয়ের পাতা ছিড়ে ছিড়ে মুখে পুরছে। রাজু অবাক হয়ে যায়। কাছে গিয়ে সে বইগুলি পরীক্ষা করে। নানা ধরনের নানা বিষয়ের বই। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য, বিজ্ঞান বিষয়ের বই।

ঃ এই, তোমরা বইয়ের পাতা খাচ্ছ কেন ? রাজু একটা ভালুক শিশুকে প্রশ্ন করে।

ভালুক শিশু বলে ঃ এটা আবার কোন্ ধরনের প্রশ্ন হলো ? সিলেবাসে যা আছে তা থেকে প্রশ্ন করো, জবাব দিয়ে যাচ্ছি। হুঁ ..... জিজ্ঞেস করো।

রাজু বলে ঃ বইয়ের পাতা কেন খাচ্ছ তা তোমরা জানো না ?

ঃ না জানি না। ঐ যে আমাদের শিক্ষক, তাঁকে বরং তুমি জিজ্ঞেস করো ভাই।

রাজু তাকিয়ে দেখলো চশমা চোখে একজন ধেড়ে ভালুক বেত হাতে গম্ভীরভাবে বসে আছে। সে তার দিকে এগিয়ে গেলো। কাছে গিয়ে আদাব দিলো। বললো ঃ যদি কিছু মনে না করেন তো একটা প্রশ্ন করি!

ঃ বলো।

ঃ ছাত্রেরা বইয়ের পাতা খাচ্ছে কেন ?

ভালুক চশমাটা ঠিক করে বসালেন নাকের গোড়ায়। গম্ভীরভাবে বললেন ঃ তুমি ভুল দেখেছ। ওরা বইয়ের পাতা খাচ্ছে না, গিলছে!

ঃ গিলছে .....

রাজু আর্তনাদ করে উঠেঃ বইয়ের পাতা গিলে খেলে অসুখ হবে না ?

ঃ তা তো হবেই। এরজন্যে আমরা একটা উপায় বার করেছি। পরীক্ষা। ছেলেদের ফি বছর পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি আমরা। পরীক্ষার খাতায় ছেলেরা গেলা বইয়ের পাতাগুলি উগ্‌রে দিয়ে আসে। খুব সুন্দর ব্যবস্থা, তাই না!

রাজু বললো ঃ এভাবেই লেখাপড়া হচ্ছে ?

ঃ ঠিক ধরেছ! এভাবেই লেখাপড়া হচ্ছে। যে ছাত্র যতবেশী বই গিলতে পারে সে তত ভাল ছাত্র। ছেলেরা যাতে সহজে বইগুলি গিল্‌তে পারে আমরা সেটা তদারক করি।

রাজু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছাত্রদের বই গেলা দেখল। একটা ভালুক ছেলে গোটা ইতিহাসটা গিলে ফেল্‌ল। শিক্ষক তাড়াতাড়ি গিয়ে এক গেলাস পানি দিলেন তার হাতে। বললেন ঃ ইতিহাসটা গিলেছ, পানি খেয়ে এবার ভূগোলটা গিলে ফেল।

ছাত্রটি বোধহয় শিক্ষকের খুব প্রিয়। সে একটু আপত্তি জানিয়ে বলল ঃ না স্যার, এক সঙ্গে এতগুলি আমি গিল্‌তে পারব না। আমার পেট ভারী হয়ে গেছে।

ঃ লক্ষ্মী বাবা, এরকম করে না ···

শিক্ষক তাকে সস্নেহে পানি খাইয়ে দেন। বলেনঃ কতকিছু এখনো গেলার বাকী আছে। ইতিহাস গিলেছ, এখনো বাকী আছে ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজ-বিদ্যা, সাহিত্য। সব গিল্‌তে হবে ····· পরিশ্রম করো বাবা,পরিশ্রম করো ···ফল পাবে।

ছাত্রটি তখন এক হাতে নিল ভূগোল আর এক হাতে সমাজ-বিদ্যা। বিনয়ের সঙ্গে বললোঃ দোয়া করবেন স্যার যেন ভালয় ভালয় সব গিলতে পারি।

রাজুর মন খারাপ হয়ে গেল। সে তখন স্বপ্ন দেখায় মানুষের যে বন্ধু, তাকে ডাকতে লাগলো। ডেকে বললো তুমি আমাকে আগাগোড়া ফাঁকি দিয়েছ। আমি এইসব দুঃস্বপ্ন দেখতে চাইনি। আমি স্বপ্নের মতো সুন্দর স্বপ্ন দেখতে চেয়েছিলাম। আমি আনন্দ চেয়েছিলাম। দুঃখ চাইনি। কষ্ট চাইনি।

অদৃশ্য সেই বন্ধু এসে তখন হাত ধরলো রাজুর। বললো ঃ মন খারাপ করো না রাজু। যা তুমি ইচ্ছে করবে তা-ই পাবে। মানুষের স্বপ্ন মানুষের হাতের মুঠোয়। শেষ তাঁবুটার দিকে তাকিয়ে দেখো রাজু! এগিয়ে যাও।

রাজু মাঠের প্রান্তে সেই তাঁবুটা দেখলো। অদৃশ্য বন্ধুর নির্দেশ মতো তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলো সে। চারদিকে আবীরের মতো কুয়াশা। কোথাও নীল ও শাদা রঙের ফোয়ারা ঝলসে উঠছে। তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলো রাজু আর কতগুলি সুন্দর, অনুপম সুখের মানুষ এগিয়ে এলো দৌড়ে। এসো রাজু তুমি আমাদের। তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি।

রাজু ওদের সাথে মিশে গেল। দেশ দেখলো। কি সুন্দর দেশ। খোলা আসমানের নিচে কাঁচা সবুজ রঙের মাঠ। মাঠের পাশ দিয়ে রূপালী নদী বইছে। নদীর ধারে কলার বাগিচা, খামার আর লোকালয়।

এখানে অন্ধকার নেই। চোখের পানি নেই। চাপা কান্না আর হিংস্র গর্জন নেই।

মানুষগুলি বললো, এখানে কলহ নেই, সন্ধ্যা নেই, আগুনের তাপ ও সন্দেহের জ্বালা নেই।

এখানে এসো, রাজু। স্বপ্নের ভেতর এসো।

ওরা রাজুকে নিবিড় করে ডাকলো ঃ এখানে হাসি আছে, আলো ও কোমলতা আছে। এখানে নক্ষত্র জ্বলে, নেভে, নদী চুপ্ চুপ্, আকাশের নাম বন্ধু ও আমরা ···ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্বপ্নের উত্তরাধিকারী।

এখানে এসো রাজু। এখানে এসো।
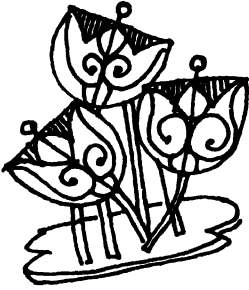
ছেঁড়া কাগজ, ফুলের তোড়া

বুলবন ওসমান

তিন জনের কাঁধে তিনটে চটের থলে। রফু আর মধুর বয়স দশ, পরণে কালো ছেঁড়া প্যান্ট, খালি গা, উচ্চতায় দু'জন সমান। নাদুর বয়স আট, তারও উদোম গা, পরণে দড়ি বাঁধা ডোরা প্যান্টালুন, কি যে তার রঙ ছিল বোঝবার উপায় নেই, ময়লা লেগে লেগে কালো হয়ে উঠেছে। মাথার কোঁকড়া চুল ঘাড় ছাপিয়ে গেছে। তেলের অভাবে চুল কটা।

রমনা থানার সামনে রাস্তার এপারে লন্ড্রিটার পেছনে দুটো ছাপড়া আড়াল হয়ে রয়েছে। সামনে থেকে চোখে পড়ে না বলে ছাপড়া দুটো টিকে আছে। না হয় কবেই পুলিশ ভেঙ্গে দিত। রফু আর নাজু পিঠোপিঠি ভাইবোন, মধু তাদের প্রতিবেশী বন্ধু।

রোজ সকালে তাদের মা-বাবারা বেরিয়ে গেলে তারাও থলে কাঁধে বেরিয়ে পড়ে। মগবাজার, ইস্কাটন ছাড়িয়ে তারা কখনো কখনো কাওরান বাজার পর্যন্ত যায়। এদিকে শাহবাগ রমনা পার্ক, পাবলিক লাইব্রেরি, বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল সবই তাদের কাগজ কুড়োনর জায়গা বেলিরোড ধরে শান্তিনগর, মালিবাগ, রাজারবাগেও তাদের যাতায়াত চলে। তিনজনে ক্ষিপ্র হাতে কুড়িয়ে চলে যত পরিত্যক্ত কাগজ। তাদের এই ক্ষিপ্রতার কারণ কাগজ কুড়োনে ব্যাপারটার সঙ্গে শুধু যে তারা তিনজন আছে তা নয়, আরো অনেক ছেলেমেয়ে এই কাজে কাঁধে থলে ফেলে ঘুরে বেড়ায়। যে যত আগে কুড়োতে পারে তার লাভ। না হয় সারা দিনেও এব থলে পুরবে না। এই কাগজ জমিয়ে জমিয়ে একদিন তারা মৌলবী বাজারে দিয়ে আসবে মহাজনের কাছে। তারা মন দরে কিনে নেবে। এই সব টুকরো কাগজ যাবে নারায়ণগঞ্জ ফুতুল্লায় হার্ডবোর্ড-পিজবোর্ড তৈরির কারখানায়। রফু, মধু আর নাজু ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সকালে একবার বেলি রোড ধরে অফিসার ক্লাবের দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়ায়। সকালে ক্লাবঘরটা নিশ্চুপ। কেউ নেই। টেনিস খেলার মাঠ ফাঁকা। বিকেলে এই জায়গার চেহারা পাল্টে

যায়। অনেক গাড়ি। অনেক লোকজন। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে খেলার মাঠে টেনিস বল নিয়ে ছুটোছুটি। তাই কখনও কখনও ওরা বিকেলে আসে খেলা দেখতে। সকালে খেলা না থাকলেও তারা আসে অন্য একটা আকর্ষণে। অনেক কাগজ পড়ে থাকে। সারা রাতের জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে ঝাড়ুদার ফেলে দিয়ে যায়। আর কোন পার্টি থাকলে খাবারের বাক্স কুড়িয়ে তারা চেটে চেটে খায়। সেদিন সকালে ওরা তিনজন অফিসার ক্লাবের দেয়ালের পাশে হাজির। বেশ কিছু কাগজ পড়ে আছে। চটপট হাত চালায় তিনজন। কাগজ শেষ। আজ কোন খাবারের বাক্স নেই যে তা নিয়ে চাটবে। না থাক। রোজ যে থাকবে এমন তারা আশা করে না। অনেক সময় দারোয়ান আর ঝাড়ুদার ঠোঙ্গা বা বাক্স নিয়ে চলে যায়। কিন্তু গতকাল রাতে যে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তার চিহ্ন পড়ে আছে, বাক্স নয়, একটা তাজা ফুলের তোড়া। রাতের শিশির মেখে ফুলগুলো সতেজ। নাজু ফুলের তোড়াটা কুড়িয়ে নেয়।

তাকে ফুল কুড়াতে দেখে রফু বলে, ফেলাই দে, রাখনের কাম নাই।

না, রাখুম, সোন্দর ফুল, বলে নাজু।

হাতে ফুল রাখলে কাগজ টোকাবি ক্যামনে!

যখন কাগজ টোকামু ফুলগুলো মাটিতে রাখুম।

দরকার নাই ঝামেলায়। ফেলাই দে!

না, অমি রাখুম। নাজু জোর দিয়েই বলে। আমি বাড়িতে নিমু।

ফুল কি খাওনের জিনিস। কি লাভ নিয়া!

না, আমি বাড়িতে নিমু! নাজু জিদ ধরে।

বড় ভাই হিসেবে রফু তার জোর খাটাতে চায়, না, বাড়িত নিয়া কাম নাই, ফেলাই দে।

না, বলে নাজু ফুলের তোড়াটা থলির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে।

রফু হঠাৎ খপ করে নাজুর থলিটা নিয়ে নেয় এবং ক্ষিপ্র হাতে তোড়াটা বের করে নর্দমায় ফেলে দেয়।

নাজু অনেকক্ষণ একভাবে ফুলের তোড়াটার দিকে চেয়ে থাকে। তোড়াটা আস্তে আস্তে ময়লা পানির নিচে তলিয়ে যায়।

একটা কথা বললে না নাজু, সে থলিটা কুড়িয়ে নিয়ে রমনা পার্কের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

আকাশে ঘন মেঘ। এই সময় বৃষ্টি নামে।

রফু-মধু একটা ঝাঁকড়া জামগাছের নিচে আশ্রয় নেয়।

এদিকে নাজু একমনে মাঝ রাস্তা দিয়ে চলেছে। বৃষ্টির ধারা গড়িয়ে চলে তার কটা চুলের জট ধরে।

রফু চীৎকার করে ডাকে, এই নাজু পানিতে ভিজিস না ....

দু' দিন আগে তর জ্বর ছিল .....

নাজুর কোন ভাবান্তর নেই। তুমুল বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আবছা একটা ছায়ামূর্তির মত সে ধীর পায়ে এগিয়ে চলে।

আমি তরে ফুল পাইড়া দিমু, নাজু শোন .... জোর গলায় ডাক দেয় মধু। বৃষ্টির শব্দে তার ডাক খানিক দূর গিয়ে মিশে যায়।

ভিজলে ভিজ, তরই জ্বর হইব .... মরবি ... গজ গজ করে রফু।

বড় মেঘটা এক নাগাড়ে আধঘন্টা বৃষ্টি ঝরিয়ে সরে গেলে রফু-মধু গাছতলা থেকে বেরিয়ে

রমনা পার্কের দিকে এগিয়ে চলে। বৃষ্টিতে ছেঁড়া কাগজ সব ভিজে গেছে। এখন আর কাজ হবে না। তারা পার্কে ঢুকে একটা বেঞ্চিতে বসে বলাবলি করে, নাজুটা যে কোথায় গেল।

মধু বলে, ফুলের তোড়াটা নিলে কি হইত ?

ফুল নিয়া লাভ কি ?

লাভ নাই, তবে অর ভালো লাগছে ...

ফুল বড় মাইনষের জিনিষ। তারা গাছ লাগায়, ফুল কাটে, ফুল ফ্যালায়া দ্যায় ... আমাগো ফুলের কোন কাম নাই ...

নাজু বাচ্চা মানুষ ত ...

রফু আর কোন কথা বলে না।

বেলা বাড়লে তারা পার্ক থেকে বেরিয়ে শাহাবাগের দিকে এগোয়। সঙ্গে নাজু নেই বলে তাদের কিছুটা খারাপ লাগে।

পি জি হাসপাতালের সামনে বা দোকানের সামনে তেমন কাগজ পড়ে থাকতে দেখল না।

হাঁটতে হাঁটতে তারা কাঁটাবন ফেলে প্রায় এলিফেন্ট রোড পর্যন্ত হাজির।

একটা ডাস্টবিনে বেশ কিছু কাগজ পড়ে থাকতে দেখে দু'জন ঝুঁকে পড়ে। ওপরের ভিজে কাগজ সরিয়ে তারা ফটাফট ঝুলিতে কাগজ পুরতে থাকে। এখন রফু আর মধুকে দুই বন্ধু বলে মনে হয় না। কেউ কাউকে যেন চেনে না। চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা। ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন গ্রাস তুলতে থাকে, মুখ চোখ হিংস্র হয়ে ওঠে, তেমনি দু'জনের মুখে হিংস্রতা লোভ। মুখে ঘাম জমতে থাকে।

কাগজ খুব বেশি ছিল না। অল্পক্ষণেই শেষ। চুপসে থাকা থলির নিচের দিক কিছুটা ফুলে ওঠে।

আরো কিছুটা এদিক ওদিক ঘুরে কোন কাগজ না পেয়ে তারা ফিরে চলে। বৃষ্টির পর চড় রোদ। পেটে ক্ষিধেটাও চাড়া দিয়ে উঠেছে। পেট মোচড় দিচ্ছে।

ঝুপড়িতে ফিরে রফু দেখে নাজু শুয়ে। গায়ে একটা ছালা চাপান। তার মা রান্নার ধোঁয়ায় ঝুপড়ি ভরিয়ে ফেলেছে।

মা, নাজু শোয়া ক্যান ?

জ্বর।

কইলাম পানিত ভিজিস না। আমার কথা হুনল না।

বিকেলে রফু থলিটা ঝুলিয়ে আবার বেরতে যাবে, তার মা তাকে বাইরে যেতে নিষেধ করে নাজুর কাছে বসতে বলে।

তার মা ছুটা কাজ সারতে যায়। আসবে সেই রাত ন'টায়। খাবার নিয়ে এলে ভাগ করে খাবে।

আটটার দিকে রফুর বাপ হাজির। মাঝ বয়সি লোক, শীর্ণ চেহারা। মুখে কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, খালি গা, পরণে ময়লা লুঙ্গি, কোমরে গামছা জড়ান।

বাপকে দেখে নাজু কান্না জুড়ে দেয়।

জ্বর বেড়েছে তার। কিছু খায়নি, ক্ষিধেও লাগছে।

আমারে কমলা আইনা দাও·· বায়না ধরে নাজু।

অখন বরষা কাল কমলা কই পামু, জবাব দেয় নাজুর বাপ।

আমি দেখছি, নিউ মার্কেটে পাওয়া যায়। আমারে কমলা আইনা দাও··

কমলা কেননের কি টাকা আছেরে মা ···

আমি কিছু চাইলেই খালি তোমার টাকা থাকে না ···

আমরা গরীব মানুষ, কমলা খাওনের কপাল করি নাইরে মা ···

আমরা গরীব ক্যান ···

আল্লা আমারারে গরীব বানাইছে ····

আল্লা আমারারে গরীব বানাইল ক্যান ···

নাজুর বাপ নিজেকেও এই প্রশ্ন করেছে অনেক বার, কোন জবাব পায়নি। জীবনে তেম

ান পাপ করেনি। গ্রামে তবু একটা ভিটে ছিল, তাও গেল মহাজনের হাতে দেনা শোধ না
ওয়ায়।

কমলা কমলা করে ঘ্যান ঘ্যান করতে করতে নাজু ঘুমিয়ে পড়ে।

রফু ভাবে সে কাগজের টাকায় নাজুকে কমলা কিনে দেবে। কিন্তু একটা কমলার দাম তিন
কা ···তাকে আরো অনেক কাগজ জমাতে হবে। কাল সকাল সকাল বেরবে কাগজ
ড়াতে।

সকালে নাজুর বাপ চলে গেল ঠেলাগাড়ি নিয়ে।

মধু ডাক দেয়, রফু বাইর হবি ····

আসি ··· রফু জবাব দেয়।

এই সময় আবার কাঁপন দিয়ে জ্বর আসে নাজুর।

রফুর আর বাইরে যাওয়া হয় না। মা আর ছেলে নাজুর মাথায় পানি ঢালায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ঘন্টখানেক পর জ্বর একটু কমলে রফুর মা যে বড়িতে ছুটা কাজ করে তাদের কাছে ছুটি
বে বলে বেরিয়ে পড়ে। রফুকে বোনের কাছে থাকতে হয়।

খানিক পর নাজুর মা ফিরে দেখে নাজু একা। রফু নেই। মা খুব রেগে যায় অসুস্থ ছোট
নটাকে ফেলে যাওয়া! আসুক দেখাবে!

দু' মিনিটও যায়নি, রফু হাজির।

মা কিছু বলার আগেই সে নাজুর কাছে এগিয়ে যায়।

ডাকে, নাজু নাজু···

নাজু আস্তে আস্তে চোখ মেলে। দেখে রফু একটা ফুলের তোড়া সামনে বাড়িয়ে রেখেছে।

নাজু হাত বাড়িয়ে তোড়াটা নিয়ে দেখে। তারপর মাথার কাছে রেখে দেয়। সে কতটা খুশী
য়েছে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু রফুর দু' চোখ তখন তৃপ্তিতে চিকচিক করছে।
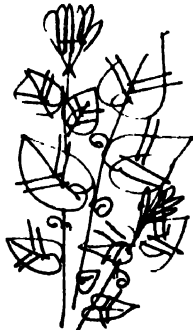
চোর

নিয়ামত হোসেন

শহরের বড়োলোকরা প্রায় সারাক্ষণই ভিড় করে আছে এই নিউ মার্কেটে।

সব সময়ই গাড়ির ভোঁ বাজছে প্যাঁ-পোঁ। সায়েব-মেমসায়েব আসছে, গাড়ি থামাচ্ছে, প্রায় নাচতে নাচতেই ঢুকে যাচ্ছে বিরাট গেট দিয়ে সারি সারি চোখ-বাঁধানো নিউ মার্কেটের দোকানের গোলক-ধাঁধায়। আর রিকশা, বেবি-ট্যাক্সি, সাইকেল, পথচলা মানুষ, ফুটপাথের দোকানদার, সেসব দোকানের খদ্দের—সবার যেন এক গমগমে ভিড় লেগে আছে সবখানে।

নিউ মার্কেটের পাশেই বাজার। লোকে বলে কাঁচা বাজার। এখানে বিক্রি হয় চাল, ডাল, মরিচ, হলদি থেকে মাছ-মাংস-হাঁস-মুরগি পর্যন্ত।

এখানেও থামে সায়েব-মেম সায়েবদের গাড়ি। তাঁরা নেমে বাজারে ঢুকে বাজার করেন। তারপর আবার গাড়িতে উঠে চলে যান বাড়িতে।

সর্বক্ষণ প্রায় ভিড় এই কাঁচাবাজারেও।

সায়েব-সুবো ছাড়াও নানান ধরণের বড়োলোক, মধ্যবিত্ত ও গরীব মানুষের ভিড় এখানে। এই ভিড়ে একবার মিশে গেলে নিজের কথা আর মনে থাকে না—মানুষের ভিড়ে আর নানান রকম শব্দে মন আনমনা হয়ে যায়—কতো রকম কতো ধরণের অন্য রকম চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করে।

ফকির আলিরও ঠিক সেই রকমই হয়।

মাঝে মাঝে এমন ভুল হয়ে যায় যে সে বাজার করতে-আসা সায়েবদের পিছু ধরতেও পারে না। অন্য ছেলেরা ধরে ফেলে।

সে হয়তো হাঁটছেই, হাঁটছেই—একবার মুরগির বাজারের ভিড় ঠেলে ঠেলে, একবার মাছের বাজারের লোকজনের গা ঘেঁসে ঘেঁসে, খেয়ালই নেই। এমন ভিড় যে অনেক সময় নিজে

শরীরের উপরও নিয়ন্ত্রণ থাকেনা প্রায়—লোকে ঠেলতে ঠেলতেই এপার থেকে ওপার করে দেয়। তার মধ্যে যদি কারো গায়ের উপর পড়ে যায় অমনি শুনতে হয় খিচানি—এই চোখে দেখিস না ? গায়ের উপর এসে পড়িস, শালা নবাবের বাচ্চা।

সে সময় ফকির সোজা হয়ে হাঁটতে চেষ্টা করে যদিও, কিন্তু পারে না, কেউ হয়তো এমন ধাক্কা মারলো যে মাথার ঝুড়িটা লাগলো গিয়ে অন্য লোকের ঘাড়ে।

ঘাড়ে লাগা লোকটা ফকিরের মাথায় চটাশ করে এক চাঁটি মারে, এই হারামজাদা ইবলিসগুলার জ্বালায় বাজারেও আসা মুশকিল।

অন্য ছেলেরা হলে প্রতিবাদ করতো, ফকির লোকটার দিকে করুণভাবে তাকাবার চেষ্টা করে। লোকটা একটা ধাক্কা মারে ঘাড়েঃ ভাগ! ভাগ!

ধাক্কার চোটে আবার হোঁচট খেয়ে সামনের এক লোকের প্রায় কোলের মধ্যেই পড়ে ফকির। কিন্তু আর একদফা মার খাওয়ার আগেই ভয়ে পালিয়ে আসে ভিড়ের বাইরে।

এসে হাঁপায়। দেখে অন্য ছেলেরা ঠিক মতো সায়েব ধরেছে। সায়েবরা বাজার করছে আর তাদের মাথার ঝুড়িতে রাখছে।

নিজের উপর বিতৃষ্ণা আনে ফকির।

ইশ, এতোটা বেলা হলো চার আনার কামও হলো না! অথচ অন্য ছেলেরা হয়তো অনেক পয়সা পেয়েছে! মাকে কি বলবে গিয়ে? মাতো অপেক্ষা করে আছে বাসায়! কি নিয়ে যাবে ফকির আলি তার মায়ের জন্য!

হঠাৎ এক সায়েবকে লক্ষ্য করে ফকির।

ছুটে যায় সেদিকে।

ঃ সাব কুলি লাগবো ?

কোন জবাব নেই তার কথার! সায়েবটি আপন মনেই নিজ পথ হাঁটেন, হয়তো ফকিরের কথাব উত্তর দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

ঃ সাব কুলি লইবেন ?

এবার খেঁকিয়ে ওঠে সেই লোকটি ঃ না, না, সর, সর, ভাগ—

ঃ সাব, লাগলে আমারে লইয়েন, কাতর মিনতি ফকিরের।

ঃ আরে লাগবো না তো কইলাম ব্যাটা, ভাগ, লোকটি ফকিরকে এমনভাবে তাড়া করতে উদ্যত হয় যেন মনে হয় স্থানটা তার চৌদ্দপুরুষের কেনা সম্পত্তি!

ফকির ভয়ে ভয়ে কিছুটা পিছিয়ে এসে আবার কাতরভাবে তাকায় সেই লোকটির দিকেঃ বকুনি দিয়েও যদি সায়েবের দয়া হয়!

কিন্তু কোথায় দয়া। ফকির দেখে তার-দিকে ফিরেও তাকায় না সায়েব, সোজা ব্যাগহাতে ভিড়ে মিশে যায়।

পিছন থেকে হিরু এসে গুঁতো দেয় পিঠে।

ঃ আরে ফকিরা, পাইলি ? ওইসে কিসু ?

ফকির মাথা নাড়ে।

ঃ শালা তুই কোন কামের না। হাতের মুঠি খুলে দুটো চকচকে সিকি দেখায় হিরু। এক সাবরে লইসিলাম, হ্যার বাজার উডায়ে দিসি রিকসায়, আর এক সাব, খুব বড়োলোখ, মাঝে মাঝে মডর গাড়ি লইয়া আহে, হেরডা উডায়সি মডর গাড়িতে—চাইর আনা, চাইর আনা—আডানা, এই দ্যাখ।

পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে রাখে হিরু। বলে, তুই খাড়াইলে খাড়া, আমি দেহি—ওইযে সা আইতাসে।

ছুটে যায় হিরু।

বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে ফকির।

নিজের উপর খুব অভিমান হয়।

আজ কি নিয়ে বাড়ি যাবে।

খুব ভয় হয় তার।

তার বাপ অনেকদিন ধরেই বাড়িতে বসা। কাম পায় না অনেকদিন হতেই। চেষ্টা করে অবশ্য প্রায়ই, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে তাই চেষ্টা করে ঠেলাগাড়িতে মাল ঠেলবার কাজের। কোনদিন হয়, কোনদিন হয় না। মা-ও তার এক বাসায় কাজ করত, এখন করেনা।

কোলে ছোট বাচ্চা, সে বাড়ির লোকদের সেজন্য অসুবিধা!

ফকিরের বাপ বাজারের বোঝা বইবার আশায় কতোদিন ঘুরেছে। হয়নি। লোকে অল্পস্বল্প বাজার করে, দরকার হলে ছোট ছোট ছেলেদের মাথায় বোঝা চাপিয়ে বাড়ি যায়। দু'চার আনা যা হয় দেয়। বুড়ো মানুষদের এ কাজে বড় একটা নিতে চায় না কেউ। তাই আসতে হয় ফকির আলিকে।

আজ ফকির আলি ঠিকমতো সায়েবই ধরতে পারছে না।

বাড়িতে একমাত্র নিশ্চিত আয় ধরতে গেলে তারই!

অথচ আজ তার এই অবস্থা!

আধ সের আটা কেনার পয়সা যদি কোনমতে জোগাড় করতে পারত ফকির আলি! তাহলে কোনমতে খাওয়া যেতো ওবেলা।

মায়ের কথা মনে হয় ফকিরের।

মা-টা তার কতো ভালো। এমন মানুষ দুনিয়ায় আর হয় না। কোনমতে যদি পাঁচটা রুটি বানাতে পারে তো দুটো বাবাকে দেয়, দুটো তাকে দেয়, একটা দেয় ছোট ভাইকে। কোলের বাচ্চা শরীর বড় শুকনো, পেট ফোলা। সেও দুধের বদলে একটা রুটিই খেয়ে থাকে, বাবাও রুটি খেয়ে বাইরে গিয়ে বসে, যদি কারো কাছ থেকে আধখানা বিড়ি চেয়ে খাওয়া যায় সেই আশায়।

শুধু ফকির বসে থাকে। সে খেয়াল করে মায়ের কিছু নাই।

ঃ মা তুমি খাইলা না?

ঃ আমি খামু পরে, তুই খা তো! মা ব্যাপারটা যেন কিছুই না এইভাবে নিজ কাজে মন দেয়।

ঃ আমি খামু না, তুমি একডা লও। ফকিরের চোখ ফেটে পানি আসে।

ঃ কেমন পুলারে, আমার লাগবোনা, তুই খা, সক্কালে তরে আবার কামে যাওন লাগবো!

ঃ একডা খাইয়াও আমি কামে যাইতে পারুম!

মায়ের কালচে মুখে যেন একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব। ছেলের চোখে চোখে তাকাতে পারে না। মুখ না ফিরিয়েই বলে ঃ আমি হেই ব্যালা খাইসি, দুখান রুডি তর জন্য কিসু না, খায়া ফালা মানিক আমার, কথা কইস না!

বাবা পুনরায় সম্পূর্ণ শরীর নুইয়ে ভেতরে ঢুকে শুধায়, কিরে ফকির কি অইসে?

রাগ হয় ফকিরের। বলে ঃ তোমার কি? তোমার তো খেয়াল নাই আমার মা খাইলো কি না খাইলো! তুমি তোমারডা বুজমতো পাইলেই অইলো!

রাগ না করেই তবু বলে ঃ মায়ে কিসু খাই নাই!

ঃ হায় আল্লাহ! একি করলো ফকিরের মা! তুমি তোমারডা না রাইখাই সবটি দিয়া দিলা!

ঃ আপনেরে কে কইলো আমি খাই নাই। হের যতো কথা! মুখ লুকায় ফকিরের মা।

এমনি অনেক কথাই ফকিরের মনে পড়ছে আজ! এসব কথা এতো বেশি মনে পড়ছে যে তার আর সায়েব ধরা হচ্ছে না!

তার ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ছে!

তাদের বস্তির বাড়ির সামনেই হিরণ মিয়ার মুদী দোকান। সেই দোকানের সামনের দিকে একটা কাঁচের বোয়েমে গোল গোল ফুল তোলা বিস্কুট রাখে। দু'পয়সায় একটি। এই বিস্কুটের জন্য এখনো ফুঁপিয়ে কাঁদে তার ছোট ভাই!

সেদিন বস্তি থেকে একটু দূরের এক বাড়িতে বিয়ে হল। সকাল থেকেই সে বাড়ির

আশেপাশে ঘুর ঘুর করছিল বস্তির অনেক ছেলেমেয়ে। রাত্রে খাওয়ার সময় ফকিরও গিয়েছি
এতো ছেলেমেয়ের চিৎকার, হৈ চৈ, তবু ছোট ভাইয়ের কান্নায় একটি থালা নিয়ে গিয়েছিল সে
যদি একমুঠো পোলাও দেয়!

বিয়ে বাড়ির অতিথিরা খেতে বসলেন দু দফায়। খাওয়া হল, বিয়েও হল, সব্বাই চলে
গেল কিন্তু কিছুতেই ফকির গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলো না। দু একবার চেষ্টা করে
অনেকের সাথে তাড়া খেয়ে ফিরে এলো।

কয়েকজন খানসামা কাজ করছিল। তারা টেবিলের কাপড় ঝেড়ে আর আধখাওয়া পোলা
ও মাংস একটা বালতিতে জমা করল। তারপর গেট পেরিয়ে এসে রাস্তার পাশে ছুঁড়ে দি
ফেলে। আর ছুটে গেল একগাদা ছেলে মেয়ে। কাড়াকাড়ি, খাবলা খাবলি। এক মুহূর্তেই
এঁটোকাঁটাও শেষ।

ফকির আধো অন্ধকারে দেখতে পেল, কয়েকজন ছেলেমেয়ে কোমরে থালা চেপে ধ
মোটা মোটা হাড় ব্যর্থতার সাথে চুষে খাচ্ছে!

সে আবার গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু সেখানেও কোন আশা নেই মনে হল তার।

একটু পরে এক সায়েব ওদের দেখে বিরক্ত হয়ে একজনকে হুকুম করলেন ওদের কিছু কি
করে দিয়ে বিদায় করতে।

ছেলেদের মধ্যে মহা উৎসাহ পড়ে গেল!

কখন আসে কখন আসে এই আশায় সবাই উদগ্রীব।

কিছুক্ষণ পর একটা ডিশে করে কিছু পোলাও নিয়ে একজন এল গেটের কাছে।

সকলে হাঁ হাঁ করে উঠল।

লোকটা ডিশটাকে সযত্নে মাথার সমান উঁচুতে ধরে চিৎকার করে উঠল, লাইন ধর, লাই
ধর, নইলে কারেও দিমুনা—

কিন্তু কে শোনে কার কথা!

কে ধরে লাইন!

সব্বাই যে যাকে পারে ঠেলে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে আর যতোদূর সম্ভব থালা বাড়ি
দেয় সামনে।

লোকটা কোন রকমে এক মুঠি এক মুঠি করে যেই দেয় অমনি সকাতর আবেদন ও
আমারে দ্যান, আমারে দ্যান .....

কেউ পেয়েও দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কাপড়ে লুকিয়ে ফেলে।

ঃ এই ভাগ্ ভাগ্ তরে না দিলাম।

কেউ হয়তো ধরা পড়ে যায় সেই লোকটার কাছে। তবু সে বলে,আর এট্টু দ্যান। দুগ
ফকির এইসব দেখতে দেখতে এক সময় খেয়াল করে লোকটার দানের কাজ সমাপ্ত হয় এ
সকলের আবেদন নিবেদন সত্বেও সে গেট বন্ধ করে দিয়ে সোজা ভিতরে চলে যায়।

অগত্যা কি আর করবে।

ফকির ফিরে আসে শূন্য থালা নিয়ে। রাত অনেক হয়েছে। এসে দেখে পোলাও-এর আশ
থেকে থেকে তার ছোট ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে!

ফকিরের মনটা দুমড়ে-মুচড়ে টনটনিয়ে ওঠে ব্যথায়। যদি সামান্য একটু পোলাও আন
পারতো, তাহলে তার ভাইটাকে, তার মাকে, বাবাকে খাওয়াতে পারতো। একটু একটু হলে

সব্বাই খুশি হতো খুব।

এইসব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে ফকির। চারদিক ভালো করে তাকিয়ে দেখে নতুন সায়েব আসছে কিনা বাজার করতে।

উহুঁ, কেউ নাই।

সব্বার হাতেই নিজের নিজের ব্যাগ। কেউ কেউ কুলি নিয়েই ফেলেছে।

একজন ভদ্রলোক বেশ ভারী ব্যাগ নিয়ে হাঁটছেন। ফকির আলি কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঃ এই বেগুন কতো ক'রে ? ভদ্রলোক বেগুনঅলাকে শুধালেন।

বেগুনঅলা জবাব দিল ঃ এক টাকা।

তিনি চলে যাচ্ছিলেন, লোকটা ডাকলো, শুনেন সাব, এই যে—

তিনি দাঁড়ালেন।

তরকারীঅলা শুধায় ঃ আসেন না, কত লইবেন ?

ঃ লাগবে না !

আহা, কতো দিবেন ? কইবেন তো !

ভদ্রলোক কি যে ভাবলেন, দাঁড়ালেন না, হাঁটতে সুরু করলেন অন্য তরকারীর দিকে। সুযোগ বুঝে ফকির আলি পিছনে যেতে সুরু করে।

ঃ সাব কুলি লাগবো ?

ঃ উঁহু, উঁহু !

ঃ লন না সাব—মিনতির মত স্বর ফকিরের।

ঃ লাগবে না, যাঃ ! তিনি ধমক দিলেন।

ফকির এবার নাছোড়বান্দা। তাঁর ভারী ব্যাগটা ধরে মৃদু টান দিয়ে বললো ঃ দশডা পাই দিয়েন সাব, আমি লয়ে যাই !

ভদ্রলোক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলেন। তারপর আরো জোরে ধমক দেন ঃ ভারী মজা তো ! বলছি লাগবেনা তবু—যাঃ ! যাঃ !

ফকির আলির মেজাজটা ভীষণ বিগড়ে যায় !

দূরে সরে আসে বিড় বিড় করে গাল দিতে দিতে। গাল তো সে বেশী দিতে পারে না। পারে দিতে লতু। কোন সায়েব ধমক দিলে সেও দূরে এসে যতো পারে মনের সুখে গাল দিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে।

ফকির আলিও দূরে এসে বিড় বিড় করে গাল দিয়ে ওঠে।

একজন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক এ সময় হন্তদন্ত হয়েই যেন বাজারে ঢুকলেন। একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দোকানের এক পাশে দড়ি দিয়ে ঝোলানো চটের থলি ধরে শুধালেন ঃ ব্যাগগুলো কতো করে ?

ঃ এক টাকা।

ঃ কতো হবে ঠিক বলেন।

ঃ দুই আনা কম দিয়েন, দোকানদার বলে।

ঃ আট আনায় হবে ? ভদ্রলোকের সরাসরি প্রস্তাব।

ঃ কী যে কন সাব !

ঃ তাহলে কতো ? দশ আনা ?

ঠিক এই সময়ে ছুটে আসছিল আর কয়জন কুলি। তাড়াতাড়ি বলে ফেলল ফকির আলিঃ কুলি লইবেন সাব ?

ঃ যাবি ? ভদ্রলোক উল্টো প্রশ্ন করলেন ঃ কতো লবি ?

ঃ চাইর আনা দিয়েন সাব, মুখটাকে করুণ করল ফকির !

হ্যাঁ, চার আনা ! দুই আনা পাবি, যাবি ?

ফকির দেখল এটাও হয়তো ফসকে যাবে, ভয়ে ভয়ে বলল ঃ বিশ পাই দিয়েন সাব !

ভদ্রলোক রাজী হয়ে গেলেন।

অন্য কয়েকজন ছুটে এসেছিল। তারা বললো, আমারে লন সাব, আমারে লন সাব। কিন্তু ভদ্রলোকও সেদিকে খেয়াল করলেন না, ফকির আলিও দৃঢ়ভাবে ব্যাগটা ধরল যাতে হাতছাড়া না হয়।

ভদ্রলোকটির পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে ফকিরের নানা কথা মনে হতে লাগলো। কুড়িটা পয়সা দিয়ে কি কেনা যাবে! তার ছোট ভাই পোলাও খেতে চেয়েছিল সেদিন, খাওয়াতে পারেনি। পারেনি এক টুকরো মাংস খাওয়াতে। কতোদিন যে হয়ে গেছে ওরা মাংস খায় না। সেদিন বিয়ে বাড়িতে ছেলেমেয়েরা ময়লা-ফেলা আস্তাকুড় থেকে খাওয়া হাড় কাড়াকাড়ি করে যেভাবে খাচ্ছিল সে কথা ফকিরের মনে পড়ে যায়। বিয়ে বাড়ি থেকে খাওয়ার যে খোশবু পাচ্ছিল সে, ওই শুকনো ফেলে দেয়া হাড়গুলোতে তার খানিকটা কি লেগে ছিল না ? অনেক সময় বড়োলোকেরা যেভাবে হাড় খেয়ে ফেলে দেয় তাতে এক-আধ কুচি মাংস লেগে থাকে, আর বিয়ে বাড়ির ভোজের খাওয়ার সময় এঁটো-কাঁটার পাতে মাঝে মাঝে দু'একটা চর্বিও ফেলে দেয়া হয়। তিনটে হাড়ও যদি সেদিন পেতো ফকির ! একটি দিতো মাকে, একটি বাবাকে আর একটি ছোট ভাইটিকে।

ভদ্রলোক মাংসের দোকানে গিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, উলটিয়ে-পালটিয়ে টিপে দেখে অবশেষে একসের মাংস কিনে ব্যাগে পুরে চাপালেন ফকিরের মাথার ঝুড়িতে। তারপর ঢুকলেন তরকারীর দোকানগুলোতে।

ফকিরের মাথায় মাংসের ব্যাগটা বেশ ভারী মনে হচ্ছিল। একসের মাংস, এমন আর কি ! তবু যেন ভারী মনে হচ্ছে। সেদিন বিয়ে বাড়ির এঁটো কুড়িয়ে সবগুলো ছেলেমেয়ে যা পেয়েছিল তার থেকে তো এটা বেশি !

ফকিরের মনে হতে লাগল এ মাংস যেন তারই কেনা ! সে-ই যেন বাজারে কেনাকাটা করছে তার বাড়ির জন্য।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের তরকারী কেনা হয়ে গেছে ! সব চাপানো হয়েছে ফকিরের মাথায়। তারপর ভদ্রলোক মাছের বাজারের দিকে এগোলেন। মাছের ঘরটিতে ভীষণ ভীড়। ঢোকা মুশকিল। ফকিরের ঢুকতে ইচ্ছা হলো না।

ভদ্রলোক ঢুকলেন, ফকিরকেও পিছু পিছু যেতে হলো। ওর মনে হল না ঢুকলেই ভালো

ভদ্রলোক মাছের দর করছেন। এ-মাছ, সে-মাছ। ভীড় ঠেলে এগোনোও শক্ত। ফকির আলি পিছু পিছু যায় আর ভাবে এই বুঝি মাছ পছন্দ হয়ে যাবে, তারপর ওকে নিয়ে তিনি বাইরে আসবেন, গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবেন, তারপর কুড়িটি পয়সা দিয়ে চলে যাবেন। ....কিন্তু তারপর ? তারপর, আবার ফকির আলিকে 'কুলি লাগবো', 'কুলি লাগবো' করে সায়েব খুঁজতে হবে। যদি কাউকে পায় তবেই আটার পয়সা হবে নইলে এ দিয়ে কি হবে ?

ফকির আলি কি যেন ভাবলো।

একবার উল্টো দিকে একটু গিয়েই আবার সায়েবের কাছে ফিরে আসলো। সায়েবকে ভালোমতো লক্ষ্য করে দ্রুত উল্টো দিকে ভিড় কাটিয়ে একটু গিয়েই ফাঁকা জায়গায় পড়লো এবং সেখান থেকে বুক টগবগ করা উত্তেজনা নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সোজা বাড়ির পথ ধরলো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে আর ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় না। কী বলবে সে ? মা কি খুশী হবে ? বাবা কী শুধাবে ? ছোট ভাইটি কী করবে ?

ঃ কে ফকির, আইছস বাবা ? মা শুধালো তাকে।

ঃ হ ! মাথার ঝুড়ি ছোট্ট ঘরের ছোট্ট মাটির মেঝেতে নামালো সে।

ঃ আরে একী ! চমকে ওঠে মা ! কার এগুলি ?

ঃ আমারোই !

ঃ এতো কিছু কই পাইলি ? এ্যাঁ ?

ঃ দিসে। ফকির বলে, আমারে এক সায়েব দিসে। সায়েব আমাকে খুব বালোবাসে। কইলো কি, যা লয়ে যা, তরে দিলাম !

ঃ হাঁচা কথা ? তরে দিসে ? মা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, কারোরডা লয়ে আসস নাই তো ?

ঃ না মা ! আমারে দিসে।

বাবা দেখে তো অবাক। চোখ দুটো তার যেন বেরিয়ে আসে অবাক হয়ে। ছোট ভাইটি খাবলা খাবলা করে ঝুড়ির মাংস তরকারী এলোমেলো করতে থাকে। মা তাড়াতাড়ি সামলে রাখে সব।

ফকিরের বাপ সেদিন নিজে হিরণ মিয়ার দোকানে গিয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কয়েক প্রকার মশলা ধারে কিনে আনলো। তার মাও চেনা কোন বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে এলো একটা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি।

কৌতূহলী দু'একজন উঁকি দিল ঃ অ ফহিরের মা, পুলায় কি আনছে, এত কি রানতাছ ?

ঃ না, এই একডু তরকারী, এমন কিছু না, সামান্যই।

ফকিরের সায়েব সেদিন অনেক দোয়া পেলেন।

পরদিন ফকির ঘর থেকে বের হলো না।

তার বাবা শুধায় ঃ ফহির, বাজারে যাবি না ?

ফকির কিছু বলে না।

মা বলে ঃ থাক, আজ না-ই গেলো, শরীলডা হয়তো বালা নাই। এসে ছেলের গায়ে হাত দেয়। না। জ্বর নাই।

তারপর দিনও যায় না ফকির। ঘরে বসে থাকে।

তিনদিনের দিন আর থাকা গেল না। যেতেই হল।

ভয়ে ভয়ে চারিদিক দেখে রওনা হল সে। কোনরকমে বুক টিপ টিপ করতে করতে বাজার পর্যন্ত গেল সে কিন্তু সায়েব ধরতে পারলো না। শঙ্কিতভাবে এদিক ওদিক চেয়ে বেড়াতে বেড়াতেই অনেক সময় হয়ে গেল। একবার বাজারের দিকে আসে আবার হঠাৎ সেই সায়েবের মতো কাউকে মনে হলে দ্রুত সরে যায়, ভিড়ের আড়ালে বা দোকানপাটের গলি ঘুচিতে লুকিয়ে থাকে। এইভাবে লুকোচুরি খেলে খেলে খালি হাতে সেদিন বাড়ি ফিরল সে।

পরদিন পুনরায় রওনা হয় বাজারে।

বেলা অনেক হয়েছে। ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ফকিরের মা বসেছিল। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয় হিরু ঃ ও ফহিরের মা, শীগগীর বাজারে যাও ফহিররে মাইরা ফালাইলো। শীগগীর—

হঠাৎ বুঝতে পারেনি ফহিরের মা। কিন্তু বোঝা মাত্রই পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগলো বাজারের দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন বাজারের ভেতর ছোট্ট জটলার কাছে এলো তখন চিৎকার শুনতে পেলো লোকের ঃ শালা চোর, বদমাশ! এইটুকুন পুলা, গিট্টে শয়তানী!

ঃ মারো শালা মুখে লাথ্থি! ভুঁড়ি গলিয়ে দাও কুত্তাটার!

ভিড় ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো ফকিরের মা। ধুলোয় গা-হাত-পা মাখামাখি হয়ে মাটিতে অসহায়ের মত পড়ে আছে তার ক্ষীণশক্তির শিশু, একটি কিশোর—ফকির আলি। ঝুড়িটির পাত্তা নেই। ছেঁড়া প্যান্ট আরো ছিড়ে গেছে, শরীরে প্রহারের চিহ্ন ফুলে ফুলে উঠেছে। শরীরে শক্তি নেই, উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই, পড়ে পড়েই লাথি খাচ্ছিল। ভিড় ঠেলে ঢুকেই ছেলের বুকে আছড়ে পড়ল ফকিরের মা। তারপর সামলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে আশেপাশে তাকাল। ঠিক যেন অনেকগুলো চিল একটি ফুটফুটে মুরগি-ছানাকে ছোঁ মারতে উদ্যত, আর ছানার মা তাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছে!

ভিড়টা একটু পিছিয়ে গেল মেয়ে মানুষ দেখে। কিন্তু সেই সায়েবটি এবং কয়েকজন বীর তখনও ফুঁসছেন ঃ শালার চোর! শয়তান! মাথা ভাইঙ্গা ফালামু!

ফকিরের মা হঠাৎ তীব্র ঝাঁঝ-মেশানো-গলায় ফকিরকে শুধায় ঃ সেদিন তাইলে তুই চুরি করসিলি! এ্যাঁ? তুই চোর!

ফকির তাকালো প্রথমে সকলের দিকে। তারপর মায়ের দিকে। তার মায়ের হাতে লেপটানো ছোট্ট শরীর থরথর করে কাঁপছে, কিন্তু মা দেখলো তার চোখ মুখ ঠোঁট দৃঢ়ভাবে স্বাভাবিক। সে অভিযোগ অস্বীকার করলো না অথচ তার সমস্ত মুখে দোষ-স্বীকারের কোন চিহ্নও নেই।
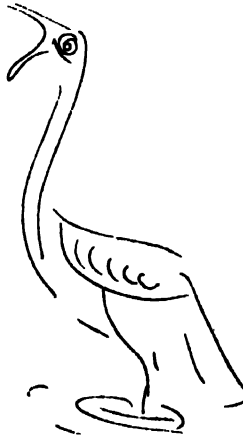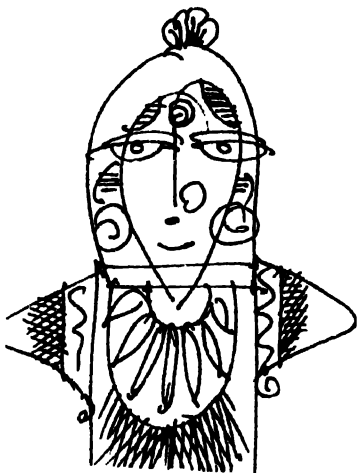
গয়নার বাক্‌সো

শেখর বসু

কাকিমা এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজে চাপা গলায় বললেন, "আমার গয়নার বাকসো!" তারপর হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পরে ছুটে গিয়ে স্টীলের আলমারির পাল্লা খুলে ফেললেন। আলমারি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও গয়নার বাকসো পাওয়া গেল না। কাকিমার গায়ের রঙ লালচে-ফর্সা, কিন্তু এখন একেবারে কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছিল। কাকিমা কাঁপা-কাঁপা গলায় আবার বললেন, "আমার গয়নার বাকসো!"

ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। বললাম, "পাচ্ছেন না?" কাকিমা আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কাঠের আলমারিটা খুলে ফেললেন এবার। স্টীলের আলমারিতে কাকিমা আস্তে আস্তে খুঁজছিলেন, এবার তাড়াতাড়ি। এত তাড়াতাড়ি যে এটা-সেটা পড়ে যাচ্ছিল মাঝেমধ্যে। আমি তুলে দিচ্ছিলাম, কিন্তু কাকিমা এদিকে নজরই দিচ্ছিলেন না। খোঁজা শেষ করে কাকিমা আরও ফ্যাকাশে হয়ে বললেন, "নেই! কী আশ্চর্য! গেল কোথায়?"

আমি বললাম, "কোথায় রেখেছিলেন, মনে নেই?"

কাকিমা এবারও আমার কথায় কোনো উত্তর দিলেন না। না দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার, শো-কেস খোঁজার পরে বেশ চেঁচিয়ে বললেন, "আমার গয়নার বাকসো চুরি হয়ে গেছে!" কাকিমা কথাটা এত চেঁচিয়ে বলেছিলেন যে, তিন সেকেণ্ডের মধ্যে এ-ঘরে সবাই চলে এল। বাড়ির লোক বলতে আমরা বাদে তিনজন কাজের লোক আর ছোটকাকা। কাকাবাবু এখন এখানে নেই, অফিসের কাজে দিল্লী গেছেন।

ছোটকাকা সবে কলেজে ঢুকেছে। গম্ভীর হয়ে বলল, "অবাক কাণ্ড! গয়নার বাকসোটা তুমি ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসোনি তো?"

"না। বাকসোটা তো বছরখানেক হল বাড়িতেই আছে।"

"সে কী, অতগুলো গয়না তুমি বাড়িতেই রেখে দিয়েছ! ব্যাঙ্কের লকার রাখার মানে কী

তাহলে ? বাড়ির পাশেই ব্যাঙ্ক !"

কাকাবাবু চটে গেলে যেভাবে কথা বলেন, কথাগুলো ঠিক সেভাবেই বলল ছোটকাকা। কাকিমা রীতিমত ভেঙে পড়ে বললেন, "কী হবে এখন !"

ছোটকাকা আরও গম্ভীর হয়ে বলল, "পুলিশে খবর দিতে হবে।"

"পুলিশ" শব্দটা কানে যেতেই আমি বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা সত্যিই খুব গুরুতর। এদিক-ওদিক সতর্ক চোখে তাকিয়ে ছোটকাকা বলল, "আচ্ছা, গয়নার বাকসোটা তুমি ঠিক কোথায় রেখেছিলে ?"

কাকিমা থেমে-থেমে বললেন, "মনে হচ্ছে, বিছানার ওপর।"

ছোটকাকা একটু খোঁচা দিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে ?"

কাকিমা এবার আমতা-আমতা করতে লাগলেন। "হ্যাঁ, মানে, বিছানার ওপরেই তো, এই তো এখানেই।"

"গয়নার বাকসো খোলা জায়গায় ফেলে রাখো কেন ?"

"ফেলে রাখিনি। এক-একবার মনে হচ্ছে, আলমারিতেই তুলে রেখেছিলাম।"

"চাবি দেওয়া ছিল আলমারিতে ?"

"হ্যাঁ।"

"চাবি ছিল কোথায় ?"

"আলমারির সঙ্গে লাগানোই ছিল।"

ছোটকাকা ঠিক কাকাবাবুর ভঙ্গিতে বলল, "তাহলে আর চাবি লাগানোর মানে কী ?"

কথাটা বলার পরে ছোটকাকা চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবল, তারপর চোখ খুলে বলল "আজ বাইরের লোক কে-কে এসেছিল এ বাড়িতে ?"

কাকিমা এ কথার কোনো উত্তর দিলেন না। তখন ছোটকাকা নিজেই উত্তর খুঁজতে লেগে গেল। দেখা গেল, সকালে থেকে বিকেলের মধ্যে এ বাড়িতে এসেছে কাজের লোকদের একজন আত্মীয়, ছোটকাকার তিন বন্ধু, কাকিমার চেনাশোনা মিসেস সিন্‌হা আর আমার বন্ধু লালটু।

ছোটকাকা এবার সবার দিকে চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল, "এ-বাড়ির কাউকেই আমি ছাড়ব না। দরকার হলে এক-এক করে সার্চ করব সবাইকে।"

সার্চ করার কথা শুনে আমি সবার আড়ালে নিজের পকেট দুটো দেখে নিলাম একবার। বলা তো যায় না যদি ভুল করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। গয়নার বাকসো অবশ্য আমার এই ছোট্ট পকেটে ঢুকবে না, তবু ··· । আসলে পুলিশের কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল সমানে।

সবাই মিলে সারা ঘর আর একবার তোলপাড় করে খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না গয়নার বাকসো। কাকিমার মুখ এখন প্রায় কাঁদো-কাঁদো। সেদিকে তাকিয়ে ছোটকাকা বলল, "এক কাজ করলে হয় না। আমি একজন গুণীকে জানি। অল্প বয়েস, কিন্তু সত্যিই গুণী। বাটি চালিয়ে হারানো জিনিস খুঁজে দিতে পারে। না পারলে এক পয়সাও নেয় না। ডাকব ?"

কাকিমা একেবারে ভেঙে পড়ে বললেন, "আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। যা পারিস কর্। তাড়াতাড়ি।"

"আচ্ছা বৌদি, গয়নাগুলোর দাম কত হবে ?"

"হাজার-পঞ্চাশ তো বটেই।"

মাথায় হাত দিয়ে ছোটকাকা বলল, "পঞ্চাশ হাজার ! তুমি তো তাও আনার পুরনো দিনের
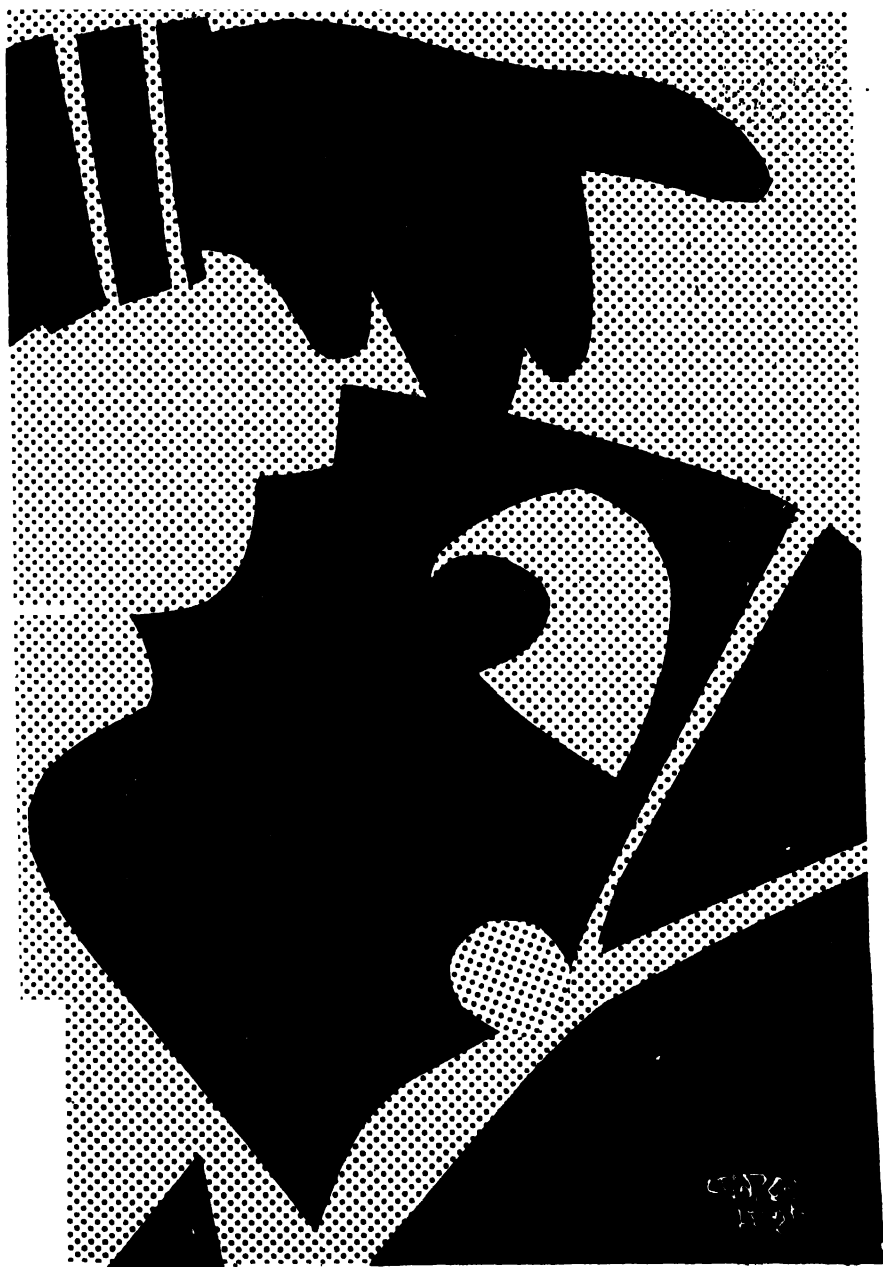
হিসেব বলছ। এখনকার হিসেবে ওই গয়নার দাম লাখ-দুয়েক তো হবেই।"

গয়নার দাম শুনে কাকিমা আঁতকে উঠলেন।

ছোটকাকা কাকিমাকে অভয় দিয়ে বলল, "একদম ঘাবড়িও না। দেখা যাক কী করতে পারি। প্রথমে নিজেরা চেষ্টা করব, না পারলে পুলিশ, পুলিশ না পারলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে খবর দেব।"

কাকিমা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "তুই বাটি-চালা না কিসের কথা যেন বলছিলি?"

"হ্যাঁ, এক্ষুণি খবর দিচ্ছি। মস্ত বড় গুণী। গয়না খুঁজে বার করতে না পারলে এক পয়সাও নেয় না। কিন্তু পেলে, একটু ভাল রকমের দক্ষিণা নেবে, এই ধরো হাজারখানেক টাকা।"

কাকিমার চোখে জল এসে গেছে প্রায়। কোনোরকমে বললেন, "দুলাখ টাকার জিনিস খুঁজে দেওয়ার জন্যে এক-দু হাজার কোনো টাকাই নয়। আমার মনে হয়, চোররা এতক্ষণ সব গয়না গালিয়েও ফেলেছে।"

"অসম্ভব নয়, আজকালকার চোররা অসম্ভব সেয়ানা। ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি, গুণীকে পাই কিনা দেখি।"

ছোটকাকা প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

কাকিমার কষ্ট দেখে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, আমি যদি ক্লাস ফাইভের বদলে টেনে পড়তাম তাহলে হয়ত এই বিপদের দিনে কাকিমার পাশে দাঁড়াতে পারতাম অনায়াসে! আমার আক্ষেপ আরও বাড়তে যাওয়ার মুখে ছোটকাকা বাটি-চালার কথা বলেছিল। বাটি-চালা আবার কী জিনিস? জীবনে শুনিনি তো! কাকিমাকে এই নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছিল না। কাকিমার যা মুখের চেহারা এখন!

ঘণ্টাখানেক বাদে ছোটকাকা ফিরে এল। সঙ্গে ছোটকাকাদের বয়সী আর একটি ছেলে। পরনে ধুতি, গায়ে চাদর। ঠিক এইরকম চেহারার পুরুতমশাই সরস্বতী পুজোর সময় দেখা যায় দু'চারজন। এই কি সেই গুণী? এই কি বাটি চালায়?

গুণীকে দেখে সারা বাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠল একসঙ্গে। তবে, কারও মুখে কোনও কথা নেই। কাকিমা অসম্ভব মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কী ভাবে খবরটা যেন ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। আশেপাশের বাড়ির দুচারজন কৌতূহলী মুখে দূরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছিল নিজেদের মধ্যে।

একটা ছোট মাপের কাঁসার বাটি মেঝের ওপর উপুড় করে রাখল গুণী। তারপর ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী রাশি?"

ছোটকাকা মৃদু গলায় কী যেন বলতেই গুণী বলল, "ঠিক আছে, আপনাকে দিয়ে চলবে। আপনি মেঝেয় বসে বাটির ওপর হাত দিন। আমি এখন মন্ত্র পড়ছি। মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে, বাটি আপনাকে নিয়ে দৌড়বে। আপনি বাধা না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। বাটি আপনাকে হারানো গয়নার কাছে নিয়ে যাবে। অবিশ্যি, গয়না যদি বাড়ির মধ্যে থাকে। গয়না বাড়ির বাইরে চলে গেলে আমার আর কিছু করার নেই।"

ছোটকাকা উবু হয়ে বসে বাটির ওপর হাত রাখতেই গুণী মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিল। কী-সব কঠিন-কঠিন মন্ত্র, শুধু অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু আর বিসর্গ। একটা শব্দেরও মানে বুঝতে পারছিলাম না আমি।

ছোটকাকা আর গুণীকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ বাটি

নড়ে উঠল। তারপর খুব জোরে ছুটে গেল কাকিমার শোবার ঘরের দিকে। বাটির ওপর ছোটকাকার হাত, ছোটকাকা হামাগুড়ি দিয়ে ছুটছিল বাটির পেছন-পেছন।

বাটি থমকে গেল শোবার ঘরের দরজায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে শাঁ করে ঘুরে ছুটল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে বসার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাটির পেছন-পেছন আমরাও। ঘরের মাঝখানে কার্পেট পাতা, সেই কার্পেটের অর্ধেক উলটে দিল বাটি। তারপর পেডেস্টাল ল্যাম্পের পাশ দিয়ে ছুটে কোণের রঙিন মোড়াটাকে ধাক্কা মারল। ধাক্কা খেয়েই মোড়া উলটোল, আর মোড়া উলটোতেই বেরিয়ে পড়ল গয়নার বাকসো।

কাকিমা প্রায় ছুটে গিয়ে ছোঁ মেরে বাকসোটা তুলে ডালা খুলে ফেললেন। বাকসোর মধ্যে থরে-থরে সাজানো একগাদা গয়না। কাকিমার মুখে হাসি আর ধরে না। সব দেখেশুনে বললেন, "ঠিক আছে, কিচ্ছু খোয়া যায়নি।"

কাকিমা গুণীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "নগদ হাজার টাকা এখনও বাড়িতেই নেই। যা আছে দিচ্ছি, বাকিটা কাল দিয়ে দেব।"

গুণী সত্যিই গুণী, লাজুক মুখে বললেন, "ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আপনি আপনার সুবিধেমতো অসিতাভর হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।" অসিতাভ ছোটকাকার নাম।

গুণী চলে যাবার পরেও বাইরের ভিড় অনেকক্ষণ ছিল এ বাড়িতে। মন্ত্রশক্তি নিয়ে নানান ধরনের গল্প হল। তারপর প্রশ্ন উঠল, কে চোর? বাড়ির কেউ, নাকি বাইরের? দিন-সাতেক এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হল, কিন্তু সন্দেহজনকরা সন্দেহজনকই থেকে গেল শেষ পর্যন্ত। চোর আর ধরা পড়ল না।

এই ক'দিনে বাটি-চালার আশ্চর্য ঘটনা আমি ডেকে-ডেকে সবাইকে শুনিয়েছি, কিন্তু কখনোই ভাবতে পারিনি, আমার জন্যে মস্ত একটা চমক অপেক্ষা করছে শিয়ালদা স্টেশনে।

আমি আর ব্রজদা স্টেশনে গিয়েছিলাম ছোটকাকাকে ট্রেনে তুলে দিতে। ছোটকাকা বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং যাবে। হঠাৎ দেখি ছোটকাকার তিন বন্ধুর মধ্যে সেই গুণী। গুণীর পরনে অবশ্য ধুতি চাদরের বদলে প্যান্ট শার্ট।

ছোটকাকাকে গুণীর কথা জিজ্ঞেস করতেই সে কী হাসি সবার। ব্রজদাও হাসছিল ওদের সঙ্গে। হাসতে হাসতে ছোটকাকা আমাকে বলল, "খবর্দার! এর কথা বাড়িতে কাউকে বলবি না। ফিরে এসে মজা হবে খুব।"

দার্জিলিং থেকে আটদিন বাদে ফিরে আসার পরে সত্যিই খুব মজা হয়েছিল বাড়িতে। মজার আসরে কাকাবাবুও ছিলেন। সব শুনে কাকাবাবু হাসতে হাসতে কাকিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খুব ভাল হয়েছে। তোমার একটা শিক্ষা হওয়ার দরকার ছিল। গয়নার বাকসো এখন থেকে আর যেখানে-সেখানে ফেলে রেখো না।"

সেই নকল গুণী ছোটকাকার কলেজের নতুন বন্ধু। নাম বরুণ, বরুণকাকা খুব মজা করতে পারে। একটু হেসে বলল, "না বৌদি, মাঝেমধ্যে এদিক-সেদিক ফেলে রাখবেন। না হলে আমাদের হাজার টাকাও জুটবে না, বেড়ানোও হবে না।"

কাকিমা চোখ পাকিয়ে বললেন, "বাঁদর কোথাকার! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।"

এবারের মজাটা আরও মজার। কাকিমা ট্রে ভর্তি করে রসগোল্লার পায়েস নিয়ে এলেন। আমরা সবাই পেট পুরে খেলাম।

লোকটা

এখ্লাসউদ্দিন আহ্মদ

মাথা ভরা প্রকাণ্ড এক টাক। তেল চকচকে। কপালের সংগে মিলেমিশে একাকার। হঠাৎ করে দেখলে সেখানে কপালটাকে আলাদা করে নেয় সাধ্য কার।

টাকের তিন পাশ বেয়ে ঝালরের মত কয়েক গোছা চুল নীচের দিকে নেমে এসেছে। কুতকুতে চোখ। দু'চোখের ঠিক উপর বরাবর সাদা ধবধবে দুই ভুরু। যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া দু টুকরো শিমুল তুলো। ভুরু পেরিয়েই কয়েকটা গভীর খাঁজ। মনে হয় রাজ্যির দুরুহ সমস্যাবলী তাঁর উপর ন্যস্ত।

রোগা, লম্বা টিংটিংয়ে। পরণে ঝোলা পাঞ্জাবী ও চুড়িদার পায়জামা। মুখে একরাশ চিন্তা ভাবনার মাখামাখি। সামনের দিকে বেশ একটু ঝুঁকে পড়া। এই লোকটাকে আমরা দেখি অহরহ এবং যত্রতত্র।

একএকদিন দেখতাম, কপালে বাড়তি কতকগুলো ভাঁজ ফেলে, ভুরু দুটোকে গুটিয়ে কাছাকাছি টেনে নিয়ে এসে, গম্ভীর মুখে হন হন করে কোথাও হেঁটে যাচ্ছেন, কিম্বা রাস্তার কোন মোড়ে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আঙুলটা ঠোঁটের উপর উঠে এলো। চুপচাপ কাটলো কিছুক্ষণ। ভাবখানা, এই মাত্র কি যেন তিনি ভাবছিলেন এবং ভাবতে ভাবতে ভাবনার খেইটাই হারিয়ে ফেলে আবার ধরার চেষ্টা করছেন।

এই অবস্থাতেই মাঝে মাঝে আবার দেখা যায়, আশপাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া; তিনি যিনিই হোননা কেন, হাত বাড়িয়ে খপ করে তাঁর হাত ধরে দাঁড় করিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করছেন। কেউ কেউ উত্তর দেন। কেউ কেউ আবার দেখি বিরক্তির সংগে মুখ ঝামটা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পা বাড়ান।

লোকটাকে দেখা গেছে, কারো জবাব শুনে মুখটাকে আরও গম্ভীর করে হাত ছেড়ে দিতে।

আবার কারো কারো জবাবে দেখেছি হঠাৎ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে। চোখ মুখের এমন ভাব যেন হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়া মণি-মাণিক্য হাতের নাগালে পেয়ে গেছেন।

সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই লোকটার সংগে আমার আলাপ করার সুযোগও কোন দিন হয়নি। এমন একজনও পরিচিত কাউকে দেখি নি, এই লোকটার সংগে মৌখিক আলাপ আছে! অথচ এক পাড়াতেই আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে এক নাগাড়ে বসবাস করছি। প্রতিদিন না হোক, প্রায়ই চোখে পড়ে, দেখি, এই পর্যন্ত, ব্যাস!

কিন্তু আজ এই ভর দুপুরবেলা সে লোকটা আমাকে প্রায় হকচকিয়ে আমারই বৈঠকখানার প্রায় মাঝখান বরাবর সশরীরে এসে হাজির হবেন তা আমি কস্মিনকালেও ভাবিনি।

জেষ্ঠির দুপুর। কাঠ ফাটা রোদ বাইরে। রাস্তা ঘাট কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। ঘরেও তিষ্টোনোর উপায় নেই গরমে। ভ্যাপসা গুমোট গরম। কিন্তু তা সত্বেও মনটাকে এক জায়গায় করে গুটিয়ে আনার চেষ্টা করছি। সকাল থেকেই কাগজ কলম টেবিলে তৈরী। পত্রিকার তাগিদ। যে ভাবেই হোক দু'চার দিনের মধ্যে একখানা গল্প দিতেই হবে। দু'চার দিনের আজই তিন দিন পার হয়ে গেলো বলে। শেষদিন আগামী কাল। যা করার আজই করতে হবে। অথচ এখন পর্যন্ত কোন কিছুই ঠিক করতে পারিনি যে কি লিখবো?

চরম অস্থিরতার মধ্যে ঘরময় পায়চারী করে, 'যা হয় একটা কিছু লিখে ফেলি' এই ভাব নিয়ে সবেমাত্র কাগজপত্র ঠিক করে, কলমটাকে বাগিয়ে ধরে কাগজের উপর ছুঁইয়েছি। ঠিক তখনই, বলা নেই কওয়া নেই দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে বারকয়েক ঘরের চারপাশটা চোখ বুলিয়ে, হঠাৎ করে আমার দিকে তাকিয়ে, চোখ দুটো টান টান করে আঙুলটা ঠোঁটের উপর উঁচিয়ে নিয়ে, ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা, কি যেন ভাবছিলাম বলো তো?

বোঝ ঠ্যালা : আলাপ নেই পরিচয় নেই। কোন দিন কোন রকম বাক্যালাপও হয়নি। হঠাৎ করে এমন ভর দুপুরে, হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে দুম করে এ রকম একটা প্রশ্নে অবাক না হয়ে কি কেউ পারে? আমিতো প্রায় হকচকিয়ে গেলাম। বোকার মত বার কয়েক ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বললাম ঃ আজ্ঞে?

আরও একটু কাছে সরে এসে চোখ দু'টো মিটমিটিয়ে গলাটা খাটো করে বললেন ঃ বলছিলাম কি, খেই হারিয়ে ফেলেছি, বুঝলে? খেই হারিয়ে ফেলেছি। সকাল থেকে কি যেন একটা কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে যেই না একটা সমাধান প্রায় পেয়ে গেছি, ঠিক সেই সময়টাই ফেললাম খেই হারিয়ে। যেটা নিয়ে ভাবছিলাম, সেটাই ফেললাম হারিয়ে। এখন সমাধানটা নিয়ে কি করি বলোতো? মূলটাই যখন নেই, সমাধানটা নিয়ে আর কি হবে, এ্যাঁ?

কিছুক্ষণ থেমে, আবার বলে উঠলেন ঃ বুঝলে, সকাল থেকে ভাবনার বিষয়টা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পাচ্ছি না খুঁজে। রাস্তাঘাটে তেমন কাউকে পেলাম না যে জিজ্ঞেস করে নেবো বিষয়টা। তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আচ্ছা, বলতে পারো ঠিক কি ভাবছিলাম?

জবাব না দিয়েই শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ইতিমধ্যে হতচকিত ভাবটা আমার কিছুটা কেটে গেছে। এ লোক নির্ঘাত দার্শনিক না হয়ে যায় না। আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

বললাম ঃ বসুন বসুন।

তিনি বসলেন। এবং বসার প্রায় সংগে সংগে পুনরায় প্রশ্নটা আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন ঃ কি যেন.......

অত্যন্ত বিনয়ের সংগে বললাম ঃ আজ্ঞে, কি যেন একটা বলছিলেন, 'সমাধান' না কি। সেটা শুনলে হয়তো বা সূত্রটা খুঁজে বার করা যাবে। যদি দয়া করে ঐ সমাধানের কথাটা একটু খুলে বলেন।

ভদ্রলোক হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এবং ঠিক তেমনিই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ জ্ঞাতিগুষ্ঠি, সাংগপাংগ সব্বাইকে, হাত পা মুখ বেঁধে, একটা বড় ছালার মধ্যে ভরে হয় বুড়িগংগা না-হয় চাটগাঁর কর্ণফুলিতে ভাসিয়ে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

আমার তো চক্ষু চড়ক গাছে। বলে কি লোকটা, এ্যাঁ ? জলজ্যান্ত লোকগুলো, সে যেই হোক

না কেন, হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেবে ? সর্বনেশে 'সমাধান' দেখি।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে, অবশেষে নাকের ডগা ও মাথাটা বারকয়েক চুলকে নিয়ে বিজ্ঞের মত ধীরে ধীরে বললুম ঃ কোন গল্পের প্লট ফ্লট, এই আর কি মানে...

কথাটা আমার শেষ না হতে হতেই ঘরেব মধ্যে যেন ছোটখাটো একটা বোমা ফাটলো। রীতিমত খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি ঃ গল্প। গল্পের প্লটের কথা বলছো ? আরে ছোঃ ওসব নিয়ে আবার কেউ চিন্তা ভাবনা করে না কি, এ্যাঁ ? বলিহারি যাই তোমাদের। গল্প একটা বিষয়, তার আবার চিন্তা ভাবনা করে সমাধান খোঁজা ? যত্তোসব।

গল্প সম্বন্ধে এমন তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্যে আমার কান মাথা গরম হয়ে উঠ্‌লো। ভিতর ভিতর কোথায় যেন একটু অপমানিত বোধ করতে লাগলুম। বলে কি লোকটা ? গল্প লেখা যেন ছেলেখেলা। অথচ এরই তাড়নায় হাতে গোনা চার চারটে দিনের তিন তিনটে দিন কি লিখবো এই অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে দিলাম।

লোকটা হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে অনর্গল বকেই চলেছেন ঃ হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে ? গল্প, আরে লেখা আবার কঠিন কাজ নাকি ? একটা দুটো কি ? হাজারো গল্প আমার জানা আছে। এই যেমন ধরো, একটা লোক। মাস পয়লা মাইনে পেয়ে, পকেটের চিমসে ম্যানি ব্যাগটাকে কোলা ব্যাঙ ফোলা ফুলিয়ে বিশ পদের মাসিক ফর্দটা আঙুলের ফাঁকে নিয়ে বাজারে ঢুকলেন। মিনিট পনেরো পরেই ফর্দের সাত নম্বরে পৌঁছাতেই, ব্যাঙ ফোলা ব্যাগটা চুপসে একসা। ঘেমে ঘুমে কোন মতে টলতে টলতে বাজারের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এর পর বেশ কিছুক্ষণ ভদ্রলোক আর কিছুই জানেন না। যখন জ্ঞান হলো, তখন দেখলেন তিনি বাড়ির সামনে দাঁড়ানো, রিক্সাওয়ালা ভাড়া চাচ্ছে। পাঁচ টাকা। ভদ্রলোক জামার প্যান্টের এপাশ ওপাশের সব ক'টা পকেট হাঁতড়েও রিক্সার ভাড়াটা আর পূরণ করতে পারেন না। বাড়ির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতেই অজানা এক আশংকায় মুখটা কালো হয়ে গেলো। কি আর করেন, অগত্যা পাশের বাড়ীর কাজের ছেলেটাকে চোখ ইশারায় এক পাশে সরিয়ে নিয়ে, মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে 'বাবারে', 'বাছারে' ব'লে, অবশেষে নানান শর্তের মৌখিক চুক্তিতে, তার সাহায্যে ভাড়াটা মিটিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ। পর মুহূর্তেই বিচিত্র ধরনের শব্দের বিস্ফোরণ। চকিতে বাতাসে ভর করে গোটা দুই আলু দু'একটা পটল রাস্তার উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এর পর আর কি ? বাকি ঊনত্রিশটা দিন বাড়িটার প্রতি নজর রাখো আর কান পাতো, লিখে শেষ করতে পারবে না।

এক নাগাড়ে কথাগুলো শেষ করে বার পাঁচেক জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কিছু বলে উঠার আগেই, বলতে সুরু করলেন ঃ কিম্বা ধরো, সেই লোকটাই। বেশ কিছু বছর পর মাস পয়লা মাইনেটা নিয়ে বাজারে গেছে। বাজারে ঢুকেই দেখে চালের বাজার। বিরাট বিরাট উঁচু করা চালের ঢিপি। তার উপর আসন পিঁড়ি হয়ে তেল চকচকে নাদুস নুদুস কয়েকজন লোক। লোকটা তাদের সামনে মুখটা কাঁচুমাচু করে, মিনমিনে গলায় বললো, পঞ্চাশ টাকার চাল দাওতো।

চালওয়ালা আড়চোখে একবার তার দিকে তাকালো, তারপর দু'তিন মুঠো চাল খামচা মেরে লোকটার থলেয় ঢালতে ঢালতে বিনয়ের হাসি হেসে বললো ঃ হেঁ হেঁ পঞ্চাশ টাকার চাল মাপার অতো ছোট বাটখারা তো নেই ভাই সাব। তবে কি না কম হবে না। আপনি আমার বাপ দাদার আমল থেকে চাল নিচ্ছেন, আপনাকে কি কম দিয়ে পারি ? বরং পুরোপুরি তিন তিন মুঠিতে আমার লোকসানই হয়। হেঁ-হেঁ-হেঁ ....

এরপর লোকটার অবস্থাটা একবার চিন্তা করো। যত ভাববে লিখে আর শেষ করতে পারবে না।

চুপ করলেন তিনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে টাকটা একটু মুছে নিলেন। সেই সংগে মুখটাও। পকেটে রুমালটা রাখতে রাখতে বললেনঃ আমায় এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারো? ঠাণ্ডা পানি।

ঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এটা আর পারবো না, বলেন কি ? ছুটলাম তড়ি-ঘড়ি পানি আনতে।

বড় এক গ্লাস পানি তাঁর হাতে দিতে না দিতেই এক নিঃশ্বাসে ঢক ঢক করে খেয়ে নিয়ে, আবার বলতে সুরু করলেনঃ বুঝলে, মাঝে মাঝে আমার এক মজার কথা মনে হয়। মনে হয় সামনেই বিরাট একটা পাহাড়। যেমন উঁচু তেমনি খাড়াই। সেই পাহাড়টার একেবারে তুঙ্গে নানান রংয়ের জাব্বাজোব্বা পরা বেশ কিছু লোক নরম গালিচায় গা এলিয়ে বসে। প্রত্যেকেরই দু'হাতে দুই লালটু লাটিম। কেউ কেউ রং-বেরংয়ের ঝুমঝুমি বাজিয়ে, নিচের দিকে তাকিয়ে সুর করে ডাকছে, আয় আয় আ—য়। আর সেই সুরের তালে তালে, প্রায় নাচতে নাচতে, হাত পা ছাড়াই কতকগুলো প্রায় অসংখ্যই বলা যায়, বোঁচকার মতো, সব কি যেন সেই পাহাড়চূড়োয় গালিচা পেতে বসে থাকা লোকগুলোর দিকে তরতর করে পাড়ি জমাচ্ছে। প্রত্যেকের পিঠেই সাদা কাগজের উপর বড় বড় করে "চাল" "ডাল" "তেল" "লবণ" ইত্যাদি লেখা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কি, এইগুলোর পিছন পিছনে প্রত্যেকেই, মানে, আমি তুমি এ ও সে আমরা সবাই আমাদের শেষ পুঁজিটা পর্যন্ত হাতের মুঠোয় নিয়ে প্রাণপণে হাঁপাতে হাঁপাতে হোঁচট খেতে খেতে, হামাগুড়ি দিয়ে ঐ লেবেল আঁটা জিনিসগুলো ধরার চেষ্টায় উপরমুখো উঠতে চেষ্টা করছি। অল্পকিছু লোক ওগুলোর সংগে তাল মিলিয়ে উপরে উঠছে, কেউ কেউ আবার দেখছি, বোঁচকাগুলোর আগেই তরতর করে, গালিচার উপর এলিয়ে থাকা মানুষগুলোর কাছ বরাবর পৌঁছে যেতে না যেতেই তাদের হাত ধরে গালিচার উপর টেনে তুলে নিচ্ছে। আর আমরা যারা উপরে উঠার চেষ্টায় আঁকপাঁক করছি, তাদের সে এক চরম দুরবস্থা। কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে আর উঠছে না। কেউ কেউ আবার জেদের বশে তরতর করে ছুটে উঠতে গিয়ে পা ফসকে একেবারে খাদে পড়ে অক্কা। কারো আবার সারা শরীরে রক্ত ঝরছে ঝরঝর করে। কাউকে দেখা যাচ্ছে ড্যাবড্যাবে চোখ বার করে শুধু ছটফটই করে যাচ্ছে, এগুতে পারছেনা এক পাও। অধিকাংশই খাড়াই পাহাড়টার একেবারে নিচের দিকে মাটিতে বুক বিছিয়ে জিভ বার করে উপর দিকে তাকিয়ে ধুঁকছে। গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুচ্ছে না তাদের। চোখ দু'টো দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। বিশ্বাস করো, সব মিলিয়ে সে যেন এক বীভৎস ব্যাপার স্যাপার। সহ্য করতে পারি না। কোন মতে চোখ বন্ধ করে ফেলি।

এই পর্যন্ত বলে লোকটা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কোন সাড়াশব্দ নেই। আমিও চুপ। কোন কথা বলতে পারছি না। লোকটা কথাগুলো এমনভাবে বলছিলেন যে, শুনতে শুনতে কেমন যেন নিজেকে বোকা বোকা বলে মনে হচ্ছিলো আমার।

হঠাৎ করে লোকটা আবার কথা বলে উঠলেনঃ আচ্ছা, হঠাৎ করে তোমার এই গল্পের-প্লটের কথা মনে হলো কেন ? গল্প টল্প লেখো বুঝি, এ্যাঁ ?

মাথাটা একটু নেড়ে জবার দিলামঃ তা একটু আধটু মাঝে মাঝে লিখে থাকি।

ঃ কোথায় লেখো ? খবরের কাগজে টাগজে লেখো না কি ?

মাথা নেড়ে স্বীকার করলাম, মাঝে মধ্যে লিখে থাকি।

শুনে চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা, একটা কথা ঠিক করে বলো তো। এই ধরো তোমরা যারা লেখো টেখো তারা কিছু কিছু শব্দ একেবারে কোনকিছু না ভেবেই যত্রতত্র ব্যবহার করো কেন বলো তো?

কথা শুনে আমি তো প্রায় হতভম্ব। কোন্ এমন শব্দ রে বাবা, যা না ভেবে চিন্তেই আমরা ব্যবহার করি? ভেবে তো আমি কোন কুল কিনারাই পেলাম না। সঙ্কোচের সংগে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আজ্ঞে কোনটা? কোন শব্দগুলো বলুন তো?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন ঃ কেন, আগুন? এই 'আগুন' শব্দটা কি তোমরা ভেবে চিন্তে ব্যবহার করো? প্রতিদিনই কাগজে দেখি, সমস্ত কাগজটা জুড়ে শুধু 'মাছের বাজারে আগুন' 'চালের বাজারে আগুন' 'আলু পটলে আগুন' 'মাংসে আগুন'--এই যে শুধু আগুন আর আগুন, এগুলো কি তোমরা ভেবে চিন্তে ব্যবহার করো? আমার তো মনে হয় মোটেই না। ঠাণ্ডা মাথায় একবার একটু ভেবে দেখো তো, ব্যাপারটা যদি সত্যি সত্যি একদিন ঘটে যায়, তা হলে কি এক সাংঘাতিক কাণ্ডটাই না ঘটে যাবে।

এই পর্যন্ত বলেই সমস্ত শরীরটা একটু ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চেয়ারটা দু'হাত দিয়ে ধরে আমার কাছাকাছি সরিয়ে নিয়ে এসে আবার বলতে সুরু করলেন ঃ প্রত্যেক জিনিসের একটা সীমারেখা আছে, জানো তো? না কি?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম ঃ জানি, অবশ্যই জানি।

ঃ বাজারেরও তো একটা দরদামের সীমরেখা আছে। ধরো চালের সের চার টাকা, সাড়ে চার টাকা-পাঁচ-সাড়ে পাঁচ-পৌণে ছয়-সাড়ে-এ-এ-এ-দপ করে সত্যি সত্যি একদিন চালের বাজারে আগুন লেগে গেলো। ঠিক এমনি ভাবেই তেলের বাজারে বিশ পঁচিশ তিরিশ ছুঁই ছুঁই,--দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

মোটা পাইপ নিয়ে দমকল ছুটে না আসতে আসতেই এক এক করে মাছ আলু পটল মাংস মশলাপাতি সাবান সোডা ঘি লংকা ইত্যাদির যাবতীয় হাট বাজার দোকান পাট দেশে যেখানে যতগুলো আছে সবগুলো একসংগে জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। হুড়হুড় করে যেখানে যত লোক আছে নেমে পড়লো রাস্তায়। উত্তেজনায় সব টগবগ করছে। উত্তেজনা আর সহনশক্তিরও তো একটা সীমারেখা আছে? দেখতে দেখতে লোকগুলোর চোখে মুখে বুকে হুহু করে জ্বলে উঠলো আগুন। এক থেকে আর একজন। সেখান থেকে দশজন। দশ থেকে শ'। হাজার। লক্ষ। এখান ওখান সেখান। মনে হলো, সমস্ত দেশটাই একটা আগুনের হল্‌কা। নেভায় সাধ্য কার? লোকগুলো উন্মাদের মত ছুটে বেড়াচ্ছে এখান ওখান সেখান। সর্বত্র। যে যেখানে যাচ্ছে পুড়ে ছাই। যেখানে ঢুকছে ভেংগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে দেখবে, সেই যে খাড়াই পাহাড়টার কথা বলেছিলাম, সেই পাহাড়টার দুধার ঘিরে হাতে হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। লক্ষ্য তাদের সেই পাহাড়ের চুড়োয় মখমলের গালিচায়, ঝুমঝুমি হাতে গা এলিয়ে থাকা লোকগুলো।সে কি উন্মাদনা। মনে হচ্ছে পাঁজা পাঁজা আগুন পাহাড়ের চার পাশ ঘিরে, হামাগুড়ি দিয়ে চুড়োয় বসে থাকা সেই লোকগুলোর দিকে এগুচ্ছে। আর ......।

উত্তেজনায় তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন ঃ দেখো দেখো, এই কথাটা ভাবতেই আমার সারাটা গা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠছে।

লোকটা দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে বহুক্ষণ বসে রইলেন। সত্যি কথা বলতে কি লোকটার কথা

শুনে আমারও বুকের মধ্যে যেন, ভয়ে কি উত্তেজনায় ঠিক বলতে পারবো না, একটা বিচ্ছিরি রকমের গুররর-গুররর শব্দ করছিলো। মুখেও কোন রকম রা সরছিলো না।

লোকটা হঠাৎ আমার হাঁটুতে হাত দিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলে উঠলেনঃ বুঝলে, এই দিনটার আশায় কবে থেকে যে বসে আছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সমস্ত দেশটা একটা মশাল হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই এক একটা আগুনের হল্‌কা। পাহাড়টা ঘিরে ফেলছে ধীরে ধীরে। নেভায় সাধ্য কার।

কথাগুলো শেষ করেই লোকটা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। বিরক্তির সংগে বলে উঠলেনঃ দূর ছাই। তোমার সংগে বকবক করে বিষয়ের মত সমস্যার সমাধানটার কথাও ভুলতে বসেছিলাম প্রায়। সব্বোনাশ হতো আর একটু হলে। তুমি তো পারলে না, যাই দেখি রাস্তাঘাটের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখি, তারা কেউ কিছু বলতে পারে কি না। আচ্ছা চলি, কি বলো এ্যাঁ?

কথাটা শেষ না হতে হতেই, ঝড়ের মত যে ভাবে এসেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই হুটপাট করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে, হন হন করে চোখের নিমেষে গেট পেরিয়ে রাস্তায় মিলিয়ে গেলেন।

কতক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসেছিলাম ঠিক বলতে পারবো না। হঠাৎ টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা কাগজগুলোর দিকে চোখ পড়তেই টনক নড়লো। হাতের দিকে তাকাতে দেখি, কলম তখনও হাতেই ধরা। গল্পতো দূরের কথা। একটা আঁচড়ও কাটা হয়নি কাগজে।
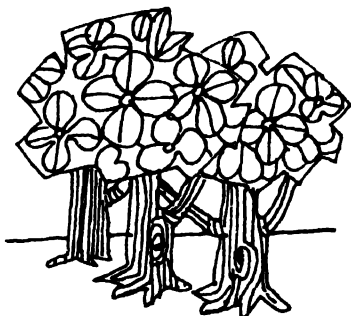
পদ্য লেখার জোরে

মাহমুদুল হক

এক দেশে ছিলেন এক বাদশাহ। প্রবল প্রতাপশালী। হাতী-ঘোড়া সেপাই-শান্ত্রী কোন কিছুরই তাঁর অভাব ছিলো না। বাদশার নাম শমশের আলীজান।

কোন এক সময় বাদশাহ খুব অসুবিধায় পড়লেন। তাঁর নামের সাথে মিলে যায় রাজ্যে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ছুতোর, কামার, গাছকাটা শিউলী এদের সকলের নামও শমশের। গোটা রাজ্য শমশেরময় হয়ে আছে এক কথায়। তাই বাদশাহ একদিন উজীর, নাজীর, পাত্র, মিত্র সভাসদ সবাইকে ডেকে দরবারে ঘোষণা করলেন—আমার ক্ষমতা তোমাদের সকলের চেয়ে খুব কম করে হলেও তিন গুণ বেশী, সুতরাং আজ থেকে আমার নামকে তিন দিয়ে গুণ করে ঠিক এইভাবে উচ্চারণ কত্তে হবে ঃ—

শমশের
শমশের
শমশের আলীজান।

এই ঘোষণায় বিশেষ করে উজীর আক্‌কেল আলী খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন—বাদশাহ নামদার দীর্ঘজীবি হউন!

উজীর আক্‌কেল আলী ছিলেন বাদশার সবচেয়ে প্রিয় পাত্র। তাঁর ওপর বাদশার বিশ্বাসও অগাধ। বাদশাহ ধরে নিয়ে আসতে বললে তিনি বেঁধে নিয়ে আসেন। বাদশাহ হাঁচ্‌লে কাশলে তিনি ডুক্‌রে কেঁদে ওঠেন।

একদিন হয়েছে কি বাদশাহ উজীরকে সঙ্গে নিয়ে তিন মহল প্রাসাদের পাশ কাটিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবার সময় দেখেন প্রাচীরের গায়ে একরাশ হিজিবিজি লেখা। বাদশাহ

বললেন—দাঁড়াও, পড়ে দেখা যাক।

আক্কেল আলী আক্কেল আলী
দেবো তোরে কি,
ঘুমের ঘোরে চাঁদিতে তোর
গাঁট্টা মেরেছি।

উজীর গরগর করতে করতে বললেন—এ্যাঁ, একি সত্যি কথা?

বাদশাহ্ বললেন—ক্ষেপেচো নাকি। কেউ ঠাট্টা করে লিখেছে আর কি!

বাদশার কথা শেষ হতে না হতেই উজীর চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন—কি সব্বোনাশ! অই দেখুন বাদশাহ্ নামদার, বাঁ দিকের প্রাচীরে আপনার নামেও কি কোথায় সব লিখে রেখেছে।

বটে বটে, বলে বাদশাহ্ পড়ে দেখলেন ঃ

শমশের
শমশের
শমশের আলীজান,
আমরুল

কচু ঘেঁচু সবই খান।
শমশের
শমশের
শমশের আলীজান,
খিট্‌খিটে
মিট্‌মিটে
শকুনের মতো জ্ঞান।

রাগে আগুন হয়ে বাদশাহ্ বললেন—দেখেছো কি ওটা? আমার জ্ঞান বলে শকুনের মতো। এ্যাঁ, এতো বড় কতা।! ধত্তে পারলে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো।

উজীর বললেন—শূলে চড়াবো বাদশাহ্ নামদার, শূলে চড়াবো। যদি না পারি আমার নাম আক্কেল আলীই নয়। ইশ, কি বিচ্ছিরি কতা!

এরপর অন্যান্য দিনের মতো বাদশাহ্ দরবারে বসলেন। বললেন—কার কি আর্জি আছে পেশ করো। নাজীর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বাদশাহ্ নামদার, আমার বাড়ীর উঠোনে আজ সকালে একটা ঘুড়ি উড়ে এসে পড়েছিলো, তাতে সব বাজে বাজে পদ্য লেখা।

বাদশাহ্ গম্ভীরভাবে বললেন—কি লেখা ছিলো? উজীর আবৃত্তি করে বললেন ঃ

শমশের শের নয়
লেজ কাটা হনুমান,
বিড়ালের ডাক শুনে
দেন তিনি পিট্‌টান।
কাঁঠালের মতো মাথা
আক্কেল আলীটার

ঘাস খেগো বুদ্ধি
এন্‌তার এন্‌তার।

সকলে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখবার জন্যে মুখ নিচু করে থাকলো
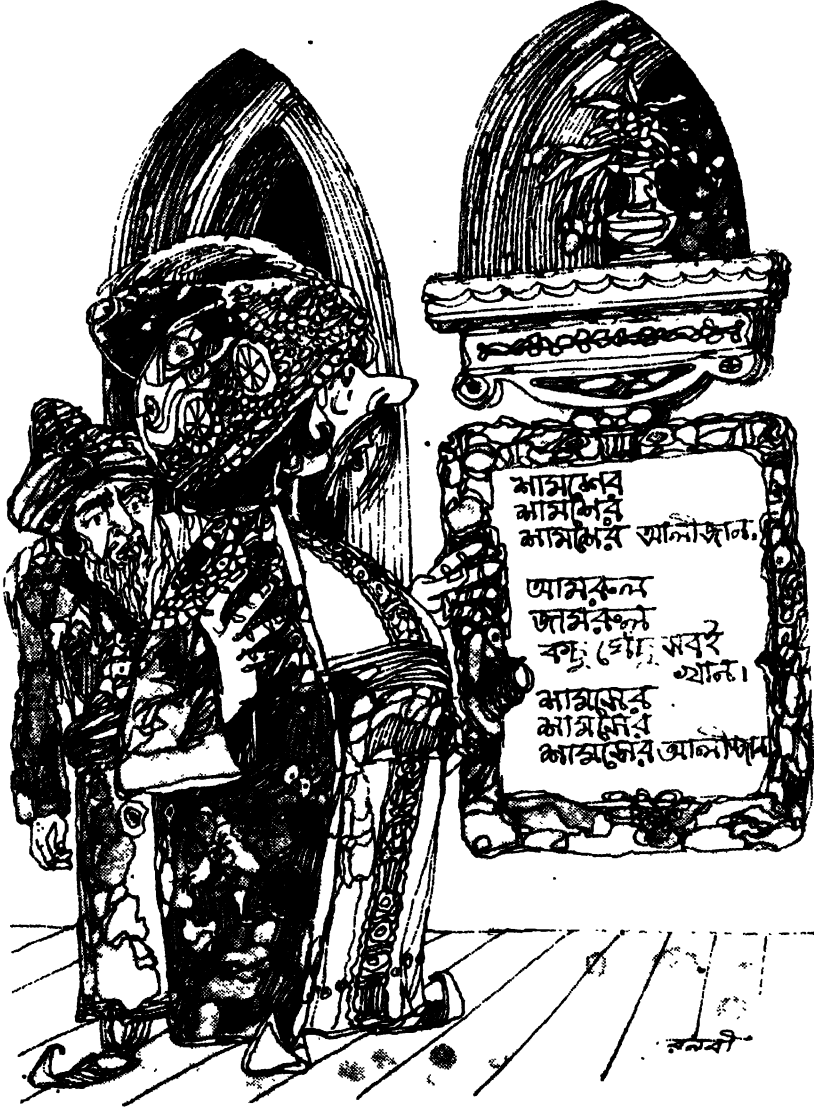
সভাসদদের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি আবৃত্তি করতে শুরু করে দিলেন ঃ—

তিনগুণ শমশের পেল্লায় ভুড়ি
দশগুণ বোকামিতে দেয় হামাগুড়ি।

খাঁদা নেকো টাক মাথা আবলুশ্ কাঠ
বিশগুণ লোভে টেকো ঘোরে মাঠ-ঘাট।

বাদশাহ্ ক্ষেপে উঠে বললেন—তার মানে ? তোমরা সব পাল্লা দিচ্ছো নাকি ?

সভাসদ বললেন—বাদশাহ্ নামদার বেয়াদবি মাফ করবেন, আজ সকালে আমার বাড়ীর সামনেও একটা ঘুড়ি এসে পড়ে, তাতে লেখা ছিলো ওইসব।

বাদশাহ্ বিরক্ত হয়ে সেদিনকার মতো দরবার ভেঙে দিলেন।

পরদিন উজীর দরবারের দিকে আসবার পথে দেখেন গাছের ডালে ঝুলছে একটা রঙীন এবং বেশ বড়ো রকমেরই একটা ঘুড়ি। ঘুড়িটার ওপর রঙ দিয়ে তাঁর মুখ খুব বিশ্রীভাবে আঁকা। আর তাতে লেখা ঃ—

আক্কেল আলী উজীর বটে
কুলোপানা কান,
পেটের পিলে বাড়ছে কেবল
গোলায় বাড়ে ধান।

উজীর তক্ষুণি বাদশার কাছে ছুট্‌লেন। বললেন—কাঁহাতক আর সহ্য করা যায় বাদশাহ নামদার, একটা বিহিত কত্তেই হবে। বাদশাহ্ বললেন—আজ থেকে রাজ্যময় আইন জারী করা গেল, ঘুড়ি ওড়ানো আর ঘুড়ি তৈরী করা দুটোই বন্‌দো। যারা মানবে না, তাদের হাত কেটে দেওয়া হবে, হাত। উজীর বললেন—খাসা আইন হয়েছে বাদশাহ্ নামদার। এইবার বাছাধনেরা জব্‌দো হবে, অ্যাঁ!

পরদিন দেখা গেল শাহীমহলের সামনের ময়দানে রাজ্যের যতো ছেলেপিলেরা শুখনো কলাপাতার তৈরী গোল গোল কি সব ঘুড়ির মত ওড়াচ্ছে।

বাদশাহ হাঁক পেড়ে বললেন—ধরো ওদের, হাত কেটে দাও ওদের সকলের।

বাদশার হুকুমে ছেলেদের সবাইকে গরু বাঁধা করে ধরে আনা হলো। বাদশাহ চীৎকার করে বললেন—তোমরা আমার হুকুম অমান্য করে ঘুড়ি উড়িয়েচো কেন ?

তাদের মধ্যে থেকে একজন চটপটে গোছের ছেলে জবাব দিলো—আমরা তো ঘুড়ি ওড়াই নি। ঘুড়ি তো চারকোণওয়ালা কাগজের তৈরী হয়।

বাদশাহ বললেন—যা উড়ে তাই ঘুড়ি। ছেলেটি খুব আশ্চর্য হয়ে বললে—তাহলে পাখী, তুলো, ধুলো, হাওয়ার জাহাজ সবই কি ঘুড়ি ? পাখীদের উড়তে দিচ্ছেন কেন, ওদেরও বারণ করে দিন।

বাদশাহ গর্জন করে বললেন—চোপ্ রও ! ব্যাপারটা গণ্ডগোলের ঠেক্‌ছে। ঠিক হ্যায়, পণ্ডিত কই ! পণ্ডিত এসে বললেন—বাদশাহ্ নামদার, বই তো অন্য রকম কথা বলে। যাহা ঘুরঘুর করে ওড়ে তাই ঘুড়ি।

ছেলেটি চোখ বড়ো বড়ো করে বললে—ঘুরঘুর করে আবার কিছু ওড়ে নাকি! আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। ওড়ে তো পৎ পৎ করে আর ফুরফুর করে। ঘুরঘুর করে ওড়া হয় না ঘোরা হয়, যেমন চোর ডাকাতরা ঘুরঘুর করে ঘোরে।

পণ্ডিত বললেন—থামো দিকি, বেশী ফ্যাচোর ফ্যাচোর কোচ্চো কেন বাপু। তা বাদশাহ নামদার একটু সময় লাগবে, বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে কিনা।

বাদশাহ্ বললেন—বেশী সময় দিতে পারবো না। এক্ষুনি নথিপত্তোর হাতড়ে দ্যাকো। এট্টা

বিহিত কত্তেই হবে।

পণ্ডিত বললেন—এ কি আর গোলায় ধান জমানো বাদশাহ নামদার, এ হলো গিয়ে আপনার দশমুনে অভিধান ঘাটাঘাটির ব্যাপার, সময় দিতেই হবে।

বাদশাহ একটা আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বললেন—দিলাম। একঘণ্টা।

চটপটে ছেলেটি পণ্ডিতকে বললে—চলুন, আমরাও আপনাকে সাহায্য করবো।

পণ্ডিত বক বক করতে করতে ওদের সবাইকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেলেন। ঘরের ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বের করে নিয়ে এলেন দশমুনে এক বাণ্ডিল। তারপর বিড় বিড় করে আঙ্গুল গুণে বললেন—ক খ গ ঘ—ঘয়ে ঘুড়ি। সব্বোনাশ করেচে! এ যে ব্যানজোন্ বন্নের চার নমবোর। গোটা তাড়াটাই খুলতে হবে। ঘুড়ি শব্দো পাওয়া যাবে এক্কেবারে সেই গোড়ার দিকে।

ছেলেরা সবাই বললে—আপনি বুড়ো মানুষ, টানা হ্যাঁচড়া আপনার শরীরে কুলোবে না। আপনি সামনের দিকটা ধরে থাকুন, আমরা সবাই মিলে বাণ্ডিলটা পিছনের দিকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তাহলেই চট করে খোলা হয়ে যাবে। পণ্ডিত বললেন—খুব ভালো কতা বাপুরা, তাড়াতাড়ি পাঠ উদ্ধার হয়ে যাবে।

ছেলেরা সবাই একযোগে বাণ্ডিলটা ঠেলতে ঠেলতে গড়িয়ে পিছনের দিকে নিয়ে চললো। পণ্ডিত ধরে বসে রইলেন সামনের দিকটা।

তারপর হলো কি, বাণ্ডিলটা ঠেলতে ঠেলতে ছেলেরা একসময় হাঁপিয়ে পড়লো, কেননা সেটা ছিল বিরাট। ওজনেও দশ মণের সমান। তাই না পেরে এক সময় সবাই ছেড়ে দিলো। এক পলকে সড় সড় করে সেটা আগের মতো আবার জড়িয়ে গিয়ে এক ধাক্কায় পণ্ডিতকে ছুঁড়ে দিলে সামনের সমুদ্রে।

ছেলেরা সবাই তক্ষুনি বাদশার কাছে ছুটে গিয়ে নালিশ জানালো। বললে—বাদশাহ নামদার, দেখুন পণ্ডিতের কি কাণ্ড! আমাদের বললে তোদের নিয়েই যতো অনর্থ, তোরাই অভিধান ঘেঁটে বের কর ঘুড়ি মানে কি, আমি ততোক্ষণ একটু সাঁতরে আসি। তারপর তিনি সেই যে সাঁতরাতে গিয়েছেন এখনো পর্যন্ত ফেরার নামটি নেই।

বাদশাহ বললেন—বুড়ো মানুষের অনেক দোষ, যতো সব বায়নাক্কা। আক্কেল আলী দ্যাকো দিকি কি ব্যাপার।

উজীর সাগর পারে গিয়ে দেখেন পণ্ডিত রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন—এই বুঝি আপনার অভিধান ঘাঁটা?

পণ্ডিত হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে পাড়ে উঠে এসে বললেন—বুঝলেন কিনা, বিদ্যা হলো সমুদ্দুর, তাই একটু ঘেঁটে দেখছিলাম আর কি।

উজীর বললেন—তা পেলেন কিছু?

পণ্ডিত বললেন—পেলাম আর কই। বুড়োমানুষ, আপনাদের মতো দেহও নেই, ক্ষমতায় কুলালো না। ঘুড়ি শব্দোটা একেবারে তলদেশে কিনা, ওটা খুঁজে আনা যার তার কম্মো নয়।

উজীর কি যেন ভাবলেন। তার মনে হলো বাদশার জন্যে তিনি কি না করতে পারেন। বিদ্যাসমুদ্দুরের তলদেশ থেকে ঘুড়ি শব্দের অর্থ খুঁজে আনা তো সহজ কাজ। বরং বাহাদুরী দেখানোর এই এক সুযোগ। বাদশাহ নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।

তিনি বললেন—কোথায় দেখিয়ে দিন।

পণ্ডিত বললেন—মাঝিদের বলুন, ওরা মাঝখানে গিয়ে ঠিক জায়গা মতোই ঝুপ্ করে নামিয়ে দেবে।

উজীর বললেন—ঠিক হায়!

জেলে নৌকোর মাঝিরা তাদের ডিঙিতে করে সমুদ্দুরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে চ্যাংদোলা করে উজীর আক্কেল আলীকে ঝুপ্ করে ছেড়ে দিলো। উজীর আক্কেল আলী সেই যে সমুদ্দুরের তলোদেশে ঘুড়ির অর্থ আনতে গেলেন আর ফিরলেন না।

ছেলেরা দল বেঁধে শাহীমহলের ময়দানে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে সুর ধরলোঃ

উজীর গেলেন রসাতলে
বাদশা গেলেন ঘরে
নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে
মাথা ঠুকে মরে।
ট্যাম্ কুড়কুড়, ট্যাম্ কুড়কুড়
তা ধিন্ ধিন্‌তা ধিন্
পদ্য লেখার জোরেই কেবল
এলো সুখের দিন।
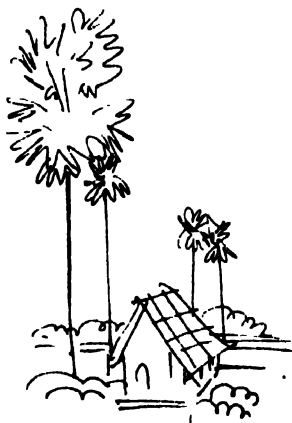
স্বপ্ন

মাহবুব তালুকদার

রোজ রাতে খোকন স্বপ্ন দেখে। বড় মজার আর সুন্দর সেই স্বপ্ন। লালপরী আর নীলপরী দুবোন এসে ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায় অনেক, অ-নে-ক দূরে। পরীদের মতো খোকনের তো পাখা নেই! তাই, ওরা দুজন তার দুহাতে ধরে উড়িয়ে নিয়ে চলে! আকাশের মাঝপথ দিয়ে যেতে যেতে ভারী অবাক হয় খোকন। মেঘগুলো যেন তুলোর পেঁজার মতো তুলতুলে; ধরতে গেলেই হাতের ফোকর দিয়ে পালিয়ে যায়। তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয়, হাজার হাজার মণি মুক্তো যেন চিকচিক করে জ্বলছে। দুটো একটা পুরে পকেটে রাখতে ভারী ইচ্ছে যায় খোকনের। কিন্তু পরীরা ভাববেটা কি?

প্রথম যেদিন খোকন স্বপ্ন দেখেছিল, ভারী ভয় হয়েছিল তার। বুক শিরশির করা ভয়টা। খোকন কেঁদেই ফেলেছিল আর কি! লালপরী ওর চোখের দিকে তাকিয়ে টের পেয়েছিল বোধ করি। একটা মন্তর শিখিয়ে দিয়েছিল তাকে ঃ ভয় ভয় ভয়—করব তোকে জয়! ব্যস! ঐ মন্তরে বুকের সব ভয় ফুরুৎ করে উড়ে পালাল। তবু প্রশ্ন করল খোকন ঃ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?

ঃ হাজার পরীর দেশে। নীলপরী বলল ঃ সেখানে আমাদের রাণী আছেন নাম তাঁর রংধনুপরী। রংধনুর মতো সাতটা রং তাঁর পাখায় কি না।

ঃ ওখানে গিয়ে কি হবে?

ঃ রংধনুপরী খেলবে তোমার সাথে।

ঃ আমার কি খেলনা আছে, না লাটাই আছে? অভিমানে গাল ফুলল খোকনের ঃ একটা সাইকেল পর্যন্ত নেই!

ঃ সব হবে। লালপরী আশ্বাস দিয়ে বলল।

খোকনের ভারী মজা। পরীদের রাণী রংধনুপরীকে কাছে পেয়ে খুব খুশী হ'ল সে।

রাজপুরীতে ঢুকেই দেখল কি তকতকে ঝকঝকে সারাটা বাড়ি। রেশমী কাপড়ের পর্দা সরিয়ে রংধনুপরীর ঘরে ঢুকতে দেখল, সাত রংয়ের পাখা ছড়িয়ে ফুটফুটে পরী রাণী তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এগিয়ে যেতেই হাসিমুখে রংধনুপরী এসে তার হাত ধরল। মস্ত বড় পদ্মফুলের পাতায় এনে বসাল তাকে। এটা নাকি সিংহাসন। খোকন গিয়ে যেই ওটার ওপরে বসল, অমনি তার কাপড়-জামাগুলো ঝলমলে শাহী পোশাক হয়ে গেল। রাণীর সহচরী দুজন পরী সোনার থালায় জর্দা নিয়ে এল ওদের সামনে। পরীরাণী আদর করে খাওয়াল তাকে। তারপর ওরা দুজনে মিলে কত কি খেলা! পরীদের বাগানে রুপোর গাছে হীরের ফুল ফোটে। যেমন ফুলের রূপ, তেমনি খুশবু। সেই গাছের ফাঁকে ফাঁকে পরীরাণী হারিয়ে গেল। খোকন খুঁজে বের করল তাকে।

ফেরার আগে খোকন ভেবেছিল, রংধনুপরীর কাছ থেকে একটা সাইকেল, লাটাই, কিছু মাঞ্জা দেওয়া সুতো চেয়ে নেবে। পরীদের দেয়া সুতো নিশ্চয়ই কাটতে পারবে না আর কারো ঘুড়ি। সাইকেলের চাকাগুলো যদি রুপোর পাতের হয় তাহলে কি মজা! সবাই চেয়ে চেয়ে দেখবে।

কিন্তু কি যে হোল, ওগুলো চাইবার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গেল খোকনের। ঘুম ভেঙ্গে কান্না জুড়ে দিল সে। মা পাশেই ছিলেন। বললেন ঃ কি হয়েছে খোকন ?

ঃ আমি সাইকেল কিনব। খোকন আবদার ধরল। তার সাথে কান্না।

মা ওর মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে আদর করলেন ঃ বড় হয়ে নিশ্চয়ই কিনবে।

ঃ বড় হয়ে নয়। একটু থেমে আবার কান্না ছড়িয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে রাখল সে ঃ এখন।

সোনামণি লক্ষ্মীমণি আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে মা বললেন ঃ এখনও রাত পোয়াতে ঢের বাকী আছে। আরেকটু ঘুমোও।

কিন্তু খোকনের চোখের পাতা আর বুঁজল না। শুয়ে শুয়ে লালপরী, নীলপরী আর রংধনুপরীর কথা ভাবল। ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে এলো। খোকন সবার আগে উঠে শিউলি কুড়োতে বাগানে চলে গেল।

সারাদিন খোকনের মন মেজাজ খুব খারাপ। ওদের পাশের বাড়ির মিঠু কি সুন্দর ঘুড়ি ওড়ায়। ওর লাটাই এ রং-বেরংয়ের সুতোর ঝালর বাধা আছে। ঘুড়ির সুতো ছাড়লে বেশ সুন্দর ঘুরতে থাকে ঝালরটা। মিঠুর সাইকেলও নতুন আর মজবুত। প্রথম একদিন ওটার সীটে বসে খোকন দেখেছিল, তোফা আরাম করে বসার জায়গা। কিন্তু মিঠু আর এখন তার সাথে খেলে না। খোকনের সাথে সাইকেল চড়ছিল বলে মিঠুর বাবা মিঠুর কান ধরে কষে চড় লাগিয়ে বলেছিলেন ঃ কতদিন বলেছি না, ছোটলোকের সঙ্গে মিশবি না।

খোকন সেই থেকে আর ওমুখো হয়নি। সত্যি তো মিঠুরা কত বড়লোক! মিঠুর বাবার বিরাট একখানা গাড়ী আছে। আয়নার মত মসৃণ গাড়ীটার দেহ। খোকনের এক একদিন ইচ্ছে করেছে গাড়ীটা ছুঁয়ে দেখতে। ও বাব্বা! তাহলে রক্ষে নেই।

ওসব কথা মনে হয়ে সাইকেল কেনার কথা কখন হারিয়ে ফেলেছে খোকন, নিজেই বুঝতে পারেনি। আবার মনে হলেও নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে সে চুপ করেছে। কত কষ্ট করে দিন চলে তাদের। ভাঙ্গা একটা সাইকেলে চেপে এই বুড়ো বয়সে দাদু অফিসে যায়। দাদুর ঐ লক্কর-ঝক্করটাকে সাইকেলই বলতে ইচ্ছে করে না। মিঠু ওটা দেখে হাসে কিন্তু খোকন হাসে না।

নিজেদের অসুবিধার কথা খোকন কখনো বোঝে, কখনো বোঝে না। দাদুকে অফিসে যাওয়ার সময় কতদিন বলেছে ঃ দাদুভাই, আমাকে সাইকেল কিনে দাও। দেবে ত ?

ঃ একশবার দেব। দাদু আদর করে বলেন ঃ খুব ভাল করে লেখাপড়া শেখ।

ঃ বা রে! আমি যে ক্লাশের ফার্স্ট বয়!

ঃ হ্যাঁ, তাই ত! দাদু যেন সহসা নিজেকে সামলে নেন ঃ বেশ, আমার সাইকেলটাই তোমাকে দিয়ে দেব।

ঃ বয়ে গেছে আমার ঐ লক্কর ঝক্কর নিতে। খোকন মুখ ভার করে রাখে।

আর কথা না বলে দাদু ওকে আদর করে অফিসে চলে যান। তারপর বিকেলে ফেরার পথে কোনদিন চকলেট, কোনদিন মার্বেল নিয়ে আসেন। ওগুলো পেয়ে খোকনের মুখে হাসি ফোটে।

রাতে আবার সেই স্বপ্ন। মেঘের দেশ, তারার দেশ পেরিয়ে লালপরী আর নীলপরীর হাত ধরে এগিয়ে চলল খোকন। চাঁদের বুড়ী দোক্তা মুখে সুতো কাটছে। বুড়ীকে দেখে খোকন বলল ঃ বুড়ী, তোমার ত ভারী রূপ। জানো, তোমার রূপের আলোয় আমাদের সারা দেশ জোৎস্নাময় হয়ে যায়।

ঃ এ আর কি রূপ দেখছ? ফোকলা দাঁতে বুড়ী হেসে ফেলল ঃ কমবয়সে আমার রূপের আলোয় সবার চোখ ধাঁধিয়ে যেত। তোমার পরীরাণীর মত রূপসী ছিলাম তখন।

ঃ তাই নাকি! খোকনও হাসল।

পলক পড়তে না পড়তে পরীরাণীর রাজ্যে পৌঁছে গেল খোকন। সত্যি ভারী সুন্দর আর রূপসী রংধনুপরী। নিজের দিকে তাকিয়ে খোকন দেখল, তাকেও কম সুন্দর দেখাচ্ছে না। মাথায় হীরে বসানো পাগড়ী সারা গায়ে রত্নরাজিখচিত পোশাক। খোকন এসে পরীরাণীর হাত ধরল। ফুলের দোলনায় চড়ে দোল খেল দুজনে। তারপর ওরা একটা ফুলের ওড়াগাড়ীতে চাপল। পরীরাণী বলল ওটার নাম নাকি পুষ্পরথ! আকাশে পাতালে সব জায়গায় উড়ে যেতে পারে ওটা। পরীরাণীকে নিয়ে খোকন পুষ্পরথে এক চক্কর ঘুরে এল। আর কি আশ্চর্য! পুষ্পরথে চড়তে গিয়ে পরীরাণীর কাছ থেকে সাইকেল চেয়ে নেয়ার কথা বেমালুম ভুলে গেল সে।

ঘুম ভাঙ্গতেই খোকন আবার কেঁদে উঠল ঃ আমি সাইকেল কিনব।

মা প্রথমে সোনামণি বলে আদর করলেন। তাতে কান্না থামল না খোকনের। এরপর বেজায় রেগে গেলেন মা ঃ রোজ খালি এক কথা! গরীবের ছেলে গরীবের মত থাকবে না। ঘোড়া রোগ হয়েছে আর কি!

খোকন আরো জোরে গলা ফাটিয়ে কান্না শুরু করল।

ওঘর থেকে দাদু এগিয়ে এলেন। বললেন ঃ কি হয়েছে দাদুমণি?

ঃ সাইকেল কিনবে! মা রাগের সুরে কথাটা বলে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

ঃ বেশ তো, কালই সাইকেল কিনে আনব তোমার জন্যে। দাদু প্রসন্নমুখে বললেন ঃ আজ অফিসে ঈদের বোনাস পাওয়া যাবে। কাল তোমার সাইকেল নিয়ে আসব।

ঃ সত্যি? অবিশ্বাসের দৃষ্টি ছড়িয়েও আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল খোকন।

দাদু ওর গালে টোকা দিয়ে বললেন ঃ সত্যি, সত্যি, সত্যি।

সারাটা দিন কি করে কোথা দিয়ে কাটল, খোকন টের পেল না। পাড়ায় সমবয়সী বন্ধুদের যাকে যাকে পারল খবরটা দিয়ে এল। খুব ইচ্ছে ছিল মিঠুকেও বলে কথাটা। কিন্তু মস্তবড় লোহার গেট পেরিয়ে ওদের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে খোকার সাহস হোল না।

রাতে ঘুমুতে গিয়ে খোকনের ভীষণ আনন্দ। কালই তার সাইকেল কিনে আনবেন দাদু। মনে মনে কল্পিত সাইকেলটার গায়ে হাত বুলাল সে। বিছানায় শুয়েও ওটার যেন স্পর্শ পেল। খোকন ভাবল, আজও স্বপ্নে রংধনুপরীকে দেখতে পেলে কথাটা তাকে জানাতে হবে। খোকন তাড়াতাড়ি টুপ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু খোকন সেদিন রাতে পরীরাণীকে দেখতে পেল না। লালপরীকে না নীলপরীকেও নয়। স্বপ্নই এলো না খোকনের চোখে। সারাটা রাত চোখ জুড়ে কেবল ঘুম থাকল। শুধু ঘুম।

ভোর বেলা চোখ খুলে বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল খোকনের। মুখে একটা বিষাদের কালো
চোখ মুখ শুকনো শুকনো। এমন মজার মজার স্বপ্ন ছিল তার; সব স্বপ্ন যেন চুরি হয়ে গেছে। আজ যে সাইকেল কেনার কথা, তাতেও বিশেষ আনন্দ জাগল না মনে।

দাদুকে একলাটি পেয়ে চুপি চুপি সব খুলে বলল খোকন। তার স্বপ্নের কথা। লালপরী, নীলপরী আর রংধনুপরীর কথা। হীরার ফুল, রুপোর গাছ, পুষ্পরথের কথা পর্যন্ত। তারপর খোকন বলল: কাল রাতে যে কোন স্বপ্ন দেখলাম না দাদুভাই! লালপরী, নীলপরী, এমনকি পরীরাণীকেও না।

দাদু ওর চুলে আদরের হাত বুলিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে বললেন: স্বপ্ন যে তোমার সত্যি হ'তে চলল দাদুভাই।

: তার মানে? খোকন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মিষ্টি করে হেসে দাদু বললেন: তোমার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে তুমি স্বপ্ন দেখতে। এব্বার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। তাই স্বপ্নরা আর ঘুমের চাদর মুড়ি দিয়ে তোমার কাছে আসবে না। স্বপ্ন যে সত্যি হয়ে যাবে।

দোকানে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নিতে দাদু পাশের ঘরে গেলেন। খোকনকেও বললেন ভাল কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিতে। কিন্তু খোকন উঠল না, চুপচাপ বসে রইল। কি যেন ভাবনা তার মনে।

একসময়ে খোকন আলতো পায়ে দাদুর ঘরে এল। আস্তে করে ডাকল: দাদু!

: কি রে? দাদু ফিরে তাকালেন।

: আমি সাইকেল চাই না। স্বপ্ন চাই। খোকন বলল।
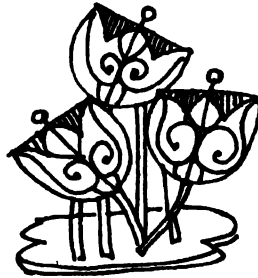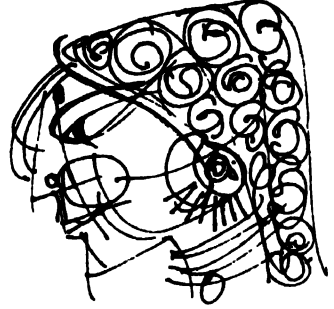
হুকু-ভুকুর গল্প

বলরাম বসাক

সেই যে ভালুক দুটো। দুই ভাই। একজন হোঁৎকা মুখো। আরেকজন ভোঁৎকামুখো। কেমন করে হাঁটে বল তো?

একজন হাঁটে হোদুল-দোদুল-নোদুল-নোদুল।

আরেকজন হাঁটে হুম্-হা। গুম-হা।

একজনের পায়ে ঘুঙুর। আরেকজনের গলায় ঘণ্টা। যখন দুজন গলা ধরাধরি করে হাঁটে, তখন শব্দ হয় ঝুমুর-ঝুম্ টুং-টাং।

ছোট ভালুক বড় ভাই। তার নাম হুকু। বড় ভালুক ছোট ভাই। তার নাম ভুকু। দুজনের মধ্যে যা ভাব না—। হুকু লাল জামা পরলে ভুকু সবুজ প্যান্ট্ পরে। হুকু নীল টুপি পরলে ভুকু হলদে মোজা পরে।

দুজনে হাত ধরাধরি করে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যায়। আর গাছতলায় বসে আইচ্কিরিম্ কিনে খায়।

একদিন হুকু আর ভুকু—কী যেন—কী—কেন—চাক্রি বাকরি ছেড়ে ছুঁড়ে-ওমা—একেবারে দেশে চলে গেল। কেন? দেশে কী?

দেশে পাতার ছাউনির দুটো ঘর—হাত দেড়েক উঁচু। সেই ঘরদুটোতে কষ্টমষ্ট করে ওরা দুজন ঘুমুতো। চারপাশে গাছ। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। আম গাছ। জাম গাছ। মহুয়া গাছ। গাছে গাছে মৌচাক, ইয়া বড় বড়। দুজন ঘুম থেকে উঠে প্রথমে একটা হাই তুলত বিরাট হাঁ করে। আর তুড়ি বাজাত তিনবার। ঠুকুৎ-ঠুকুৎ-ঠুকুৎ। তারপর খেত আম জাম মহুয়া মধু, ছাগলের দুধ, জল, শেষে একটা কাঠি। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে হুকু ভুকু কী করে?

"কী করা যায় বল্ তো?"

"আচ্ছা ঢোলটা বাজানো যাক্।" বলেই হুকু ঢোলটা বের করে বাজাতে শুরু করে, ডিডিম্ ডিম্ ডিডিম ডিম্।

"আচ্ছা তাহলে নাচা যাক্।" বলেই ভুকু নাচতে শুরু করে—হুলা হুলা হুলু হুলা।

তারপর একসময় ভুকু ঢোল বাজাতে বসে, আর হুকু নাচতে শুরু করে। বেশ ভালো, দিনগুলো কাটছিল মন্দ না।

কিন্তু একদিন কী যেন কী—কেন— কী—হুকুর হাতে একটা কোদাল। ভুকুকে বলল, "তুইও একটা কোদাল নে।"

"কেন ?"

"চল, মাটিটা খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে পৃথিবীর ওপারে চলে যাই।"

"চল্।"

দুটো কোদাল হাতে নিয়ে হুকু ভুকু হোদুল দোদুল হুম্হা গুমহা করতে করতে এলো মাঠের ওপর। কোপ বসাতে লাগল ধপাধপ ধপাধপ।

খুঁড়তে খুঁড়তে এত্তো এত্তো মাটি বেরুল। আরও বেরুল। আরও।

খালি মাটিই বেরুচ্ছে। শেষে একখানা টোপর। সোনার তৈরি। মাত্র একখানা। "ওমা একখানা যে। আরেকখানা হলে না হয় ..."

তখন ওরা আরও খুঁড়ল। কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ি করেও সোনার টোপর দুখানা হল না।

এখন সোনার টোপরটা মাথায় দেবে কে ? হুকু ? না ভুকু ? দুজনেরই মাথায় হাত গালে হাত।

হুকু বলল, "টোপর আমারই হওয়া উচিত।"

ভুকু বলল, "উহু ওটা আমারই হওয়া উচিত।"

"শুধু শুধু তোর হবে কেন শুনি ?"

"শুধু শুধু তোরই বা কেন হবে ?"

বড় ভালুক ছোট ভাই-এর এমনতর গোঁ দেখে ছোট ভালুক বড় ভাই হুকু খুউব্ রাগ করল। বলল, "আমি না তোর দাদা, গুরুজন ?"

তখন বড় ভালুক ভুকু মুখটুক গালটাল ফুলিয়ে বলল, "আমিও তো তোর ছোট্ট ভাইটি আদুরে।"

বাস্। কী ঝগড়া বেধে গেল দুজনের মধ্যে। সে-ঝগড়া কিছুতেই থামে না!

"হুম্ হা গুম-হা—এ টোপর আমার।"

"হোদুল দোদুল নোদুল নোদুল —এ টোপর আমার।"

"হুম্-হা গুম-হা—এ টোপর আমার।"

"হুম-হা ...আমার।"

"নোদুল নোদুল ... আমার।"

তখন পাড়াপড়শী খরগোশ, কাঠবেড়ালী, মোরগ, নেকড়ে, হাঁস-টাঁস, জিরাফ-টিরাফ—সব এসে পড়ল। বলল, "কী হল তোমাদের ? ঝগড়া করছ কেন ? তোমাদের কি খিদে পায় না ?"

"হ্যাঁ পায়।" হুকু বলল।

"পায় তো।" ভুকু বলল। বলেই ঝুমুর ঝুম্ টুংটাং করতে করতে ঘরে ঢুকল। তারপর মধু মেখে আমের আচার খেতে বসল। ফুরিয়ে গেলে আতা খেল। ফুরিয়ে গেলে মধু খেল। ফুরিয়ে গেলে খেজুরের গুড় খেল। ফুরিয়ে গেলে জল খেল। হেউ করে একটা ঢেকুর তুলে, কাঠি

চিবুতে চিবুতে ঘুমিয়ে পড়ল। নাক ডাকল, ঘোর্‌-ঘোর্‌-ঘোরাৎ।

যাক বাবা, পাড়াপড়শীরা ভাবল, ঝগড়াটা তাহলে খতম।

তারপর ঘুম ভাঙলে দুই ভাই হাত পা ছুঁড়ে, মস্ত হাঁ করে, হাই তুলল। ঠকাৎ-ঠকাৎ—তুড়ি বাজাতে বাজাতে হুকু এদিক তাকাল, সেদিক তাকাল। চোখ পড়ল সোনার টোপরটার দিকে...

"এ সোনার টোপর আমার।"

"না, আমার।"

"বলছি আমার।"

আবার ঝগড়া বেধে গেল। ভীষণ ঝগড়া। পাড়াপড়শী খরগোশ-টরগোশ সবাই যার-যা

দরজায় খিল এঁটে কানে আঙুল দিয়ে বসে রইল। কী কাণ্ড! ছিলি ভালো আমজাম মধু খেয়ে ঢোল বাজিয়ে, নেচে, নাক ডাকিয়ে—কোথ্‌ থেকে কী না কোথ্‌ থেকে কী ...মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিলি। তা মাটি না হয় খুঁড়লি... তায় সোনার টোপর পেয়ে গেলি। তাও একখানা। তা সোনার টোপর না হয় পেলি, একখানা পেলি, ...তা বলে তা-ই নিয়ে ঝগড়া?

হাঁস-টাঁস জিরাফ-টিরাফ সব গালে হাত দিয়ে বসে রইল। ওদিকে দুভায়ের ঝগড়া খালি বাড়ছে বাড়ছে আর বাড়ছে।

"তুই একটা বেবুন।"

"তুই বেবুন।"

"তুই একটা সাবান।"

"তুই সাবান।"

তখন শেয়ালদাদা, মাথায় ভীষণ বুদ্ধি, তাই মাথায় একটা টুপি পড়ল। আর নাকে চশমা। দেখি কী করা যায় ...

গুটি-গুটি-গুটি-গুটি হাঁটল শেয়ালদাদা।

"কী রে, তোরা ঝগড়া করচিস্ কেন?"

"এই যে শেয়ালদাদা, বল দিকিনি এই সোনার টোপরটা কার?"

"হ্যাঁ তুমিই বলতো ঠিক করে, ওটা কার?"

"সোনার টোপর নিয়ে ঝগড়া করচিস?" বলেই শেয়ালদাদা করলে কী, কাছেই একটা টুল ছিল, লেজটা দিয়ে সেই টুলের ধুলো বেশ করে ঝাড়ল। তারপর গ্যাট্ হয়ে বসল টুলের ওপর।

"দেখি তোদের সোনার টোপরটা কেমন?"

"এই যে।" হুকু তাড়াতাড়ি সোনার টোপরটা এনে দিল। শেয়ালদাদা চশমাটা খুলে সোনার টোপরটা চোখের কাছে এনে ভালো করে দেখল।

"হুঁ।" তারপর আবার চশমা পরে বলল, "কেমন করে পেলি?"

"মাটি খুঁড়ে।" হুকু বলল।

"হুঁ, কী দিয়ে মাটি খুঁড়েচিস্?"

"এই কোদাল দিয়ে।" ভুকু বলল।

"হুঁ, কতবার মাটি কুপিয়েছিস?"

হুকু মাথা চুলকোতে লাগল। ভুকু গাল চুলকোতে লাগল। ঠিক কতবার মাটিতে কোপ বসিয়েছে হুকু? ভুকুই বা কতবার কুপিয়েছে—তা কি কেউ গুনে রাখে?

"কী-রে, রা-নেই কেন?" শেয়ালদাদা হুকুর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায়, "কতবার কুপিয়েছিলি?"

হুকু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়। আর মাথা চুলকোয়।

শেষে একটা ধমক খেয়ে ঘাবড়ে-টাবড়ে হাঁচ্চো-ট্যাচ্চো অনেক কিছু করে হুকু ফস্ করে বলে ফেলল "ছেষট্টিবার।"

আর তুই?" শেয়ালদাদা ভুকুর দিকে তাকাতেই ভুকু ঢোঁক গিলতে গিলতে বলল, "আমিও ছেষট্টিবার।"

দুজনেই সমান মাটি কুপিয়েছ? ওহ্-হো, বেজায় মুশকিলে ফেললে। শেয়ালদাদা মাথার টুপিটা খুলে ফেলল। একহাতে সোনার টোপর আর আরেকহাতে টুপি নিয়ে বলল, "তোদের কি মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ হয়েছে?"

"উহুঁ।"

"তা হলে মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ কর।" বলেই শেয়ালদাদা সোনার টোপরটা মাথায় পড়ল, এখন এই সোনার টোপরটা আমার মাথাতেই থাক্। মাটি খোঁড়া শেষ হলে তোদের মধ্যে যে বেচে' বেশিবার মাটিতে কোপ বসাবে সে-ই এই সোনার টোপর পাবে। বুঝলি? নে, চট্পট্ মাটি খোঁড়া শেষ কর।"

তক্খুনি হুকু কোদাল হাতে নিল। ধুপ করে মাটিতে কোপ বসিয়ে দিয়ে বলল, "হেই সাতষট্টি।"

"এ কী, হুকু যে বেশিবার মাটিতে কোপ বসাবে। তাই ভুকুও তাড়াতাড়ি একটা কোদাল নিয়ে, ধুপ করে একটা কোপ বসিয়ে দিয়ে বলল, "হেই সাতষট্টি।"

হুকু তখন আবার কোপ বসাল। "হেই আটষট্টি।" সঙ্গে সঙ্গে ভুকুও কোপ বসাল, "হেই আটষট্টি।'

"হেই উনসত্তর।"

"হেই উনসত্তর।"

"হেই সত্তর।"

"হেই সত্তর।"

একটু পরে শেয়ালদাদা টোপর মাথায় উঠে দাঁড়াল। টুপিটা টুলের ওপর রাখল। বলল, "শোন হুকু ভুকু, আমি একটু ঘুরে আসছি বাজার থেকে। আমি যে পালাচ্ছি না তার প্রমাণ, আমার এই টুপিটা তোদের টুলে রেখে গেলাম। বুঝলি তো? এবার তোদের মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ কর।"

"আচ্ছা।" হুকু ঘাড় নাড়ল।

"আচ্ছা।" ভুকু ঘাড় নাড়ল। তারপর আবার মাটি খোঁড়া শুরু করল, "হেই একশ বত্রিশ।"

"হেই একশ বত্রিশ।"

তারপর—

তারপর শেয়ালদাদা চম্পট।

না না, চম্পট নয়। শেয়ালদাদা খুউব ভালো। পাড়াপড়শীদের সঙ্গে যুক্তি করে সোনার টোপরটা জাদুঘরে রেখে এল। আর হুকু ভুকু? তারা মাটি খুঁড়েই যাচ্ছে, "হেই একলক্ষ বারো হাজার তিনশ সাতাশ।"

"হেই একলক্ষ বারো হাজার তিনশ সাতাশ।"
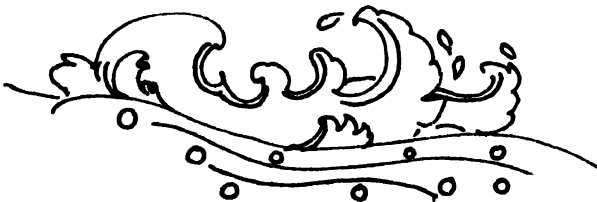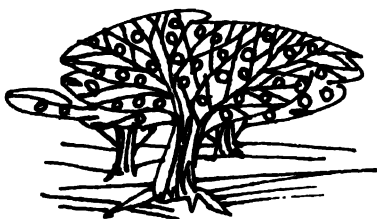
বিষমভরার বাঘ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

মাঠের মাঝখানে মস্ত এক মজা দীঘি। নাম বিষমভরা। এককালে এই দীঘি বিষমভাবে ভরা ছিল বলেই হয়তো এইরকম নাম হয়েছিল। কালে দীঘি শুকিয়ে গেল। দীঘি শুকিয়ে গিয়ে ভরে গেল শর বনে। তার সঙ্গে আরো নানারকম গাছপালা গজিয়ে দীঘিটা পরিণত হলোএক গভীর জঙ্গলে। সেই জঙ্গলে একদিন হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক বাঘ এসে বাসা বাঁধল।

বাঘটাকে প্রথম দেখল কুশো বাগদী।

তখন বৈশাখ মাস। মাসের সুরুতেই কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ভিজে মাটি লাঙল দেবার উপযোগী হয়ে উঠল। তাই খুব ভোরে হাল বলদ নিয়ে কুশো চলল মাঠের দিকে।

ভোরের দিকে ফাঁকা মাঠে মনের আনন্দে লাঙল দিচ্ছে কুশো। এমন সময় তার মনে হলো বিষমভরার জঙ্গলের দিকে পেছন ফিরবার সময় কে যেন তার পিঠের ওপর আলতো করে হাত রাখছে। একবার দুবার করে পর পর তিনবার এইরকম হবার পর কুশোর মনে সন্দেহ হলো। সেই দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠে কুশো তখন ভয় পেয়ে গেল খুব। মনে মনে ভাবল, ভূতুড়ে ব্যাপার নয়তো ? এবার সে খুব হুঁশিয়ার হয়ে পিছন দিকে নজর রেখে বিষমভরার কাছে এলো। বিষমভরার কাছে এসে যেই না পিছন হয়েছে অমনি আড়চোখে তাকাতেই দেখতে পেল জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা ইয়া কেঁদো বাঘ বেরিয়ে এসে তার পিঠের ওপর থাবা দিয়ে তাকে আলতো করে ছুঁচ্ছে।

যেই না দেখা অমনি কুশোর চক্ষুস্থির। তবে আর পাঁচজনের চেয়ে কুশোর বুদ্ধিটা একটু সরেস বলে সে তক্ষুণি দৌড় ঝাঁপ না করে আগের মতোই লাঙল দিতে দিতে মাঠের একেবারে ওপ্রান্তে গিয়ে চোঁ চোঁ দৌড়। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একেবারে গ্রামের ভেতরে গিয়ে চিৎকার করে উঠল—ওরে, কে কোথায় আছিস রে, শিগ্‌গির আয়। বিষমভরায় বাঘ বেরিয়েছে।

কুশোর চিৎকার শুনে গাঁ শুদ্ধু লোক সকলেই ছুটে এলো প্রায়। দুলেদের লক্ষ্মী চোখ দুটো বড় বড় করে বলল—সত্যি বলছ বাঘ ? নাকি বাঘের মতো দেখতে অন্য কোন প্রাণী ?

কুশোর গা দিয়ে তখন কালঘাম ছুটছে। বলল—কি যে বলো সব। বাঘ বাঘই। বাঘের মতো দেখতে আবার অন্য কোন প্রাণী হয় নাকি ? তাছাড়া আমি নিজে চোখে দেখেছি। ইয়া মোটা কেঁদো বাঘ। থাবা বার করে আমার পিঠের ওপর রাখছিল। নেহাৎ বরাৎ জোর, তাই বেঁচে গেছি এ যাত্রা।

গাঁয়ের প্রবীণ হরি ডাক্তার বললেন—তা তোমার হাল বলদের কি হলো ?

—সে সব মাঠেই পড়ে রয়েছে ডাক্তারবাবু। কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। একেবারে বুনো বাঘ। বন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। এখনো রক্তের স্বাদ পায়নি বোধ হয়। পেলে আমাকে সহজে ছাড়ত না।

ডাক্তারবাবু এবার কপাল কুঁচকে বললেন—তবে তো মহা সমস্যার বিষয়। তুমি যখন নিজে চোখে দেখেছ বাঘকে তখন আর তোমার কথায় অবিশ্বাস করি কি করে বলো ? এখন বাঘটাকে না মারতে পারলে তো বিপদের শেষ থাকবে না। মানুষ গরু সব খেয়ে শেষ করে দেবে একধার থেকে।

গ্রামের আরো পাঁচজন যারা জড় হয়েছিল তারাও সকলে একজোট হলো এবার। বলল—তবে আর দেরি কেন ? বাঘটাকে কোন রকমেই এখান থেকে পালাতে দেওয়া হবে না। লাঠি সোঁটা নিয়ে সব এক্ষুণি তৈরী হয়ে পড়ো।

কুশো বলল—সেই ভালো। দিনের আলোয় কোন অসুবিধেও হবে না। চলো সব দল বেঁধে যাই।

এ খবর শুধু যে এই গ্রামেই চাপা রইল তা নয়। আসপাশের গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। বিষমভরায় বাঘ ঢুকেছে। বাঁচতে চাও তো সবাই এসো।

আসপাশের গ্রামের লোকরাও তখন সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সবাই মিলে জোট বেঁধে চলল বিষমভরার দিকে।

বিষমভরায় গিয়ে সর্বাগ্রে সকলে মিলে বিষমভরার চারপাশ ঘিরে ফেলল। কিন্তু ঘিরলেই বা হবে কি ? বিষমভরা কি একটুখানি জায়গা ? গোটা বিষমভরা ঘিরতে গিয়ে সমস্ত দলটাই হাল্কা হয়ে গেল প্রায়। কাজেই সকলে সাহস হারিয়ে অস্ত্রশস্ত্র লাঠি সোঁটা হাতে নিয়ে বিষমভরার বনের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে। ভেতরে ঢুকতে সাহস হলো না কারো। বাইরে থেকেই সবাই বলতে লাগল—কই কুশো ! কোথায় তোমার বাঘ ?

বাঘ তখন কোথায় ? একেবারে গভীর বনের ভেতরে।

অনেক চেষ্টা করেও তাকে দেখা গেল না।

কুশো এদিক সেদিক ঘুরে বলল—এই, এইখানেই ব্যাটা আমাকে থাবাচ্ছিল।

লক্ষ্মী দুলে বলল—তা তো হলো। কিন্তু বাঘকে এখন পাই কোথা ?

যেই না বলা অমনি একটা ঝোপের একটু অংশ নড়ে উঠল। আর কুশোও অমনি লাফিয়ে উঠে সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—ঐ। ঐ যে। ঐ দেখো বাঘ। ঐ ব্যাটা বসে আছে।

কুশোকে ঐভাবে লাফিয়ে উঠতে দেখে বাঘটা ভয় পেয়েই হোক বা রেগে গিয়েই হোক একেবারে এক লাফে কুশোর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

কুশো তো 'বাবারে মারে' বলে চিৎকার করে উঠল তখন।

অন্যান্য লোকেরাও তখন ছুটে এলো। তারপর সবাই মিলে এলোপাতাড়ি বাঘটাকে বেশটি

করে ঘা কতক দিতেই কুশোকে ছেড়ে দিয়ে বাঘটা এক লাফে বনের ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

সেই যে ঢুকল আর বেরুলো না।

বাঘের চেহারাটা সবাই তখন চাক্ষুষ দেখে আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করল না কেউ। সবাই মিলে যুক্তি করে চলল তখন থানায়।

এখানকার থানা হলো রায়না থানা। গ্রামের নাম নাড়ুগ্রাম। নাড়ুগ্রাম থেকে রায়না অনেক দূর। তবুও সবাই মিলে দল·বেঁধে থানায় গিয়ে বাঘের কথা বলল। বাঘটাকে যাতে সরকারি কায়দায় ধরা হয় বা গুলি করে মারা হয় তার জন্য চেষ্টা করতে বলল।

থানার দারোগাবাবু সকলের কথা বেশ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে। তোমরা নিজেরাই আরো দু'একবার চেষ্টা করে দেখো বাঘটাকে মারতে পারো কিনা। তারপর যদি একান্ত না পারো তখন যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আর যদি কেউ মারতে পারো তবে তাকে নগদ পঞ্চাশটা টাকা আর একটা দোনলা বন্দুক আমরা পুরস্কার দেবো। একথ' গ্রামের সবাইকে গিয়ে জানিয়ে দাও।

সবাই তখন গ্রামে ফিরে চারিদিকে ঘোষণা করে দিল কথাটা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঘোষণা করাই সার হলো। শুধু হাতে বা সামান্য একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে যে বাঘ মারবে এমন সাহসই বা কার·আছে? তাই ঘোষণা শুনে বাঘ মারবার জন্য সাহস করে এগিয়ে এলো না কেউই।

এদিকে পুরস্কারের কথা শুনে কুশোর মন তো অস্থির হয়ে উঠল। সে ভাবল, বাঃ রে! আমি দেখলুম বাঘ, আর বাঘ মেরে টাকা লুটবে আর একজন? এ কখনই হতে দেওয়া যায় না। টাকাটা যে আর একজন নেবে বা বাঘ মারার সম্মানটা যে আর একজন পাবে কুশো তা কোন মতেই সহ্য করতে পারবে না। কেননা যে লোকটা বাঘ মারবে লোকের মুখে মুখে তখন তার নামই ছড়িয়ে পড়বে। কুশো যে বাঘটাকে প্রথম দেখেছিল সে কথা কেউ ভুলেও বলবে না,সে নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না। তাই না ভেবে কুশোর মেজাজ গেল বিগড়ে। সে তখন নিজেই হঠাৎ পণ করে বসল যে, বাঘটাকে যখন সে-ই দেখেছে তখন বাঘ মারারো সম্মানটাও সে-ই

লাভ করবে। অর্থাৎ সে নিজেই মারবে বাঘটাকে।

কুশোর কথা শুনে কুশোর বউ তো অবাক। বলল—সে কি! তুমি গিয়ে বাঘ মারবে কি? এই তালপাতার সেপাইয়ের মতো চেহারা নিয়ে? বাঘ মারা কি যা তা লোকের কাজ? বাঘ মারতে গেলে হিম্মতের দরকার হয় কতো।

কুশো বলল—সে হিম্মত আমারও আছে। কেন, আমি কি পুরুষ মানুষ নই?

কুশোর বউ এবার কপাল চাপড়াতে লাগল—হায় হায়। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কি খেতে পাও তুমি যে বাঘের সঙ্গে লড়বে?

কুশো বলল—কোন রকমে বাঘটাকে মারতে পারলেই পঞ্চাশটা টাকা নগদ পেয়ে যাবো বুঝলি? সেই সঙ্গে পাবো একটা দোনলা বন্দুক।

—টাকাটা না হয় কাজে লাগল। কিন্তু বন্দুক নিয়ে তুমি কি করবেটা শুনি? কেমন করে বন্ধুক ছুঁড়তে হয় তা তুমি জানো? সামান্য একটা গুলতি দিয়ে কাক মারতে পারো না, আর তুমি ছুঁড়বে বন্দুক?

কুশো বলল—খবরদার বলছি। আমাকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল করিস না। যেমন করেই হোক বাঘ আমি মারবোই।

কুশোর বউ বলল—বেশ। তাহলে বাঘ মারবার সময় আমাকেও তোমার সঙ্গে নিতে হবে। মরি তো দুজনেই মরব।

কুশোর বউয়ের কথা কুশোর বেশ মনঃপুত হলো। বলল—তা মন্দ বলিসনি বউ। তোতে আমাতে দুজনে মিলেই বাঘ মারতে যাবো। কি বল্?

এই বলে একদিন ভর সন্ধ্যেবেলা কুশো আর কুশোর বউ চলল বিষমভরায় বাঘ মারতে। সন্ধ্যেবেলা গেল তার কারণ বাঘটা লোকজনের ভয়ে দিনের বেলা বেরুত না। বেরুত রাত্রি বেলা।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা।

সন্ধ্যের পর সারা মাঠ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। গ্রামের কাউকে কিছু না জানিয়ে কুশো আর কুশোর বউ বেশ মোটা দেখে একখানা লাঠি আর এক গোছা শক্ত দড়ি নিয়ে সাহসে ভর করে চলল বাঘ মারতে।

তারপর মাঠে নেমে যেই না ওরা বিষমভরার কাছে এসেছে অমনি বাঘটা করল কি বিকট গর্জন করে তেড়ে এলো দুজনকে। বাঘের সে কি গর্জন! গর্জনের চোটে বাঘ মারা তো দূরের কথা ভয়ে কুশোর হাত থেকে লাঠি দড়ি দুটোই ছিটকে পড়ল মাটিতে।

কুশোর বউ চেঁচিয়ে উঠল—ওগো। তুমি কেন বাঘ মারতে এসেছিলে গো?

বাঘ তখন কুশোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে দু'হাতের থাবা দিয়ে জাপটে ধরেছে কুশোকে।

কুশোও প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছে বাঘের গলাটা।

সে এক দেখবার মতো দৃশ্য। যেন বাঘে আর কুশোতে বিজয়া দশমীর কোলাকুলি হচ্ছে দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে সে কি দারুণ ধস্তাধস্তি।

কুশোর বউও এদিকে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে—ওগো কত্তা গো! তুমি কেন ঝকমারি করে বাঘ মারতে এসেছিলে গো?

কুশো প্রাণপণে বাঘের গলাটাকে জড়িয়ে থাকতে থাকতেই বলল—তুই খামোকা চেল্লাস না

বউ। যা বলি তা কর দিকিনি। আমি কোন রকমে ঠেলে ঠেলে বাঘটাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে যাই আর তুই দড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে বেশটি করে গাছের সঙ্গে বেঁধে দে ব্যাটাকে। তারপর দেখ ধোলাই কাকে বলে। এমন মার মারবো যে তখন বুঝতে পারবে কার পাল্লায় পড়েছে বাছাধন।

এই বলে কুশো যথাশক্তিতে বাঘটাকে জড়িয়ে ধরে কোনরকমে ঠেলে ঠুলে নিয়ে চলল।

ভাগ্যক্রমে কাছেই একটা খেজুর গাছ ছিল। সেই খেজুর গাছের গায়ে বাঘটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল কুশো। তারপর যেই না কুশো বাঘটাকে গাছের সঙ্গে ঠেকিয়েছে কুশোর বউ অমনি তাড়াতাড়ি দড়ি দিয়ে বেশটি করে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল বাঘটাকে।

কুশোকে তখন পায় কে! আনন্দে কুশোর বুকের ছাতি তখন এত্তোখানি হয়ে উঠল। বাঘের গলা ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকা লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে তখন বেদম প্রহার শুরু করে দিল বাঘটাকে।

বাঘ তো ওরকম মার বাপের কালে খায়নি কখনো। তাই মারের চোটে দারুণ হাঁক ডাক সুরু করে দিল। বাঘের হাঁক ডাকে আসপাশের গ্রামের লোকেদেরও পিলে চমকে উঠল তখন। তারা ভাবল বাঘটা বোধ হয় ক্ষেপেছে। তাই যে যার ঘরে খিল কপাট লাগিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল সব।

এদিকে মারের পর মার তার ওপর মার খেয়ে যখন দেখা গেল বাঘটা আর একটুও নড়াচড়া করছে না—একেবারে মরে গেছে, তখন কুশো আর কুশোর বউ মরা বাঘটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল তাদের ঘরের দিকে।

পরদিন সকালে গ্রামের লোক কুশোর ঘরে রক্তাক্ত কলেবরে মরা বাঘটাকে দেখে তো খুবই অবাক হয়ে গেল। তখন বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না তাদের। একবাক্যে সকলেই কুশোর প্রশংসা করতে লাগল।

লক্ষ্মী দুলে তাড়াতাড়ি খবর দিলো থানায।

খবর পেয়ে দারোগাবাবু নিজে এলেন বাঘ দেখতে।

বাঘ দেখে সকলের সামনেই কুশোর হাতে গুণে গুণে পঞ্চাশটা টাকা পুরস্কার দিলেন। সেই সঙ্গে দিলেন একটা দোনলা বন্দুক।

বন্দুকটা অবশ্য কুশো নিল না। দারোগাবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—আমরা গরীব মানুষ হুজুর। চাষবাস করে খাই। বন্দুক নিয়ে কি করব? তার চেয়ে আপনি একটা 'সারফিঁটিকেট' লিখে দিন। বাঁধিয়ে রেখে দেবো।

দারোগাবাবু তাই করলেন। কুশোর পিঠ চাপড়ে তাকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দেবেন বলে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন মরা বাঘটাকে গরুর গাড়িতে করে থানায় পৌছে দিতে।

গ্রামের সর্বত্র কুশোকে নিয়ে তখন ধন্য ধন্য রব উঠেছে।

রাজপুত্র

রশীদ হায়দার

যেই দেখুক, চোখ তুলে একবার তাকাবেই। তাকিয়েই যে চোখ নামিয়ে নেবে, এমন নয়; বারবার, খুঁটে খুঁটে মাথার ওপর চুলটা থেকে পায়ের আঙ্গুলের নখ পর্যন্ত দেখে বলবে—রাজপুত্রের মতো চেহারা। এখনই যদি রাজভাণ্ডার থেকে জড়ির জুতো, পাজামা, পাঞ্জাবী, পাগড়ি এনে বলা যায়—সাধন এগুলো পরোতো! ব্যস, দেখতে দেখতে সাধন প্রিন্স অব জলপাইগুড়ি বা জলপাইগুড়ির কুমার বাহাদুর হয়ে যাবে। দেখে মনেই হবেনা, এই কিছুক্ষণ আগেও ছেঁড়া গেঞ্জি ও ছেঁড়া খাকি হাফপ্যান্ট পরে থাকার জন্যে একটা ভিখিরির মতো চেহারা ছিল ওর।

সাধনের বাড়ি জলপাইগুড়ি ছিল বলেই জলপাইগুড়ির কুমার বাহাদুর বলে সম্বোধন করলাম। কিন্তু ওর বয়েস বেশি নয়। মনে হবে নয় পার হয়েছে, দশ ছুঁই ছুঁই করছে, অথবা কেবল নয়ের গোড়ার দিকে। এই বয়সেই রাজপুত্র হলে সবাই বলতো, ছোট কুমার বাহাদুর, ইয়াংগেস্ট। কিন্তু তা হয়নি। না হয়ে হয়েছে এক কন্ট্রাক্টরের ছেলে। চেহারা পেয়েছে রাজপুত্রের মতো, কিন্তু রাজপুত্র উপাধি পায় নি। পরে ছেঁড়া গেঞ্জি ও ময়লা খাকি প্যান্ট। তাতে তালিও আছে, আবার ছেঁড়া জায়গায় সেলাইও নেই।

সাধনরা যেদিন আমাদের পাড়ায় এলো, তখন সবাই একবাক্যে বললো,

: ছেলে তো নয়, হীরের টুকরো।

সাধনের মা কমলা হেসে বলে,

: আপনারা দোয়া করবেন।

'আপনারা দোয়া করবেন' কথাটা যত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে লিখলাম, কমলা কিন্তু তত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বলেনি। তার বাংলা উচ্চারণ ভাঙা ভাঙা, যেমন করে বলতে চায়

তেমনটি না হয়ে অন্যভাবে জিবের ফাঁক দিয়ে কথা দুষ্টু ছেলের মতো ছুটে বেরিয়ে যায়। আমরা শুনে হাসি। সাধনের মা বুঝতে পারে, কিন্তু লজ্জা পায়না, মিটমিট করে হাসে।

আমরা হাসি সাধনের মা ভালো করে কথা বলতে পারে না বলে, আর বড়রা হাসে আজিজ সাহেবের নতুন বউ দেখে। আজিজ সাহেবের আগের বৌ আছে, তার তিনটি ছেলে ও দু'টি মেয়ে আছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বড় ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। তাঁরা যখন পাবনায় এলেন জলপাইগুড়ি থেকে, তখন কমলা ও সাধনও এলো। ওখানে থাকতেই আজিজ সাহেব কমলাকে বিয়ে করেছিলেন। আর পাবনার শচীন চৌধুরীর সঙ্গে বাড়ি বদল করে যখন চলে এলেন, তখন সাধনের বয়স ওই নয় দশের কোঠায়।

প্রথমদিনই সাধনের মার মুখে আমি হাসি দেখেছি। খুব যে জোরেসোরে হাসে তা নয়, হাসলে দাঁত কখনো দেখা যায়, কখনো যায়না, মনে হয় খুব গরমের দিনে খানিক ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেল। বেঁটেখাটো মানুষটি, চোখ ছোট ছোট, গায়ের রং ফবসা ধবধবে এবং চুলগুলো জলপ্রপাতের মতো। এমন মায়ের ছেলে সাধন, গায়ের রং আর চেহারা পেয়েছে বাবার। আজিজ সাহেব দেখতে সুন্দর ও যথেষ্ট লম্বা চওড়া। সাধনকে তাই রাজপুত্র বললে কম বলা হয়না।

প্রথমদিনই সাধনের মার মুখে যে হাসি দেখেছি, সে হাসি কোনোদিন মিলিয়ে যেতে দেখলাম না। মানুষ আত্মীয় স্বজনের কথা মনে করেও মন খারাপ করে, চোখের পানি ফেলে, নিরালায় মুখ গম্ভীর করে বসে থাকে। কিন্তু কমলা?

মা জিগেস করেছিলেন,

ঃ হ্যাঁ কমলা, তোমাদের বাড়ি কি জলপাইগুড়িতেই?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ ওখানে তোমার কে কে আছে?

ঃ মা, বাবা, এক ভাই ও তিন বোন।

ঃ মা বাবা ভাই বোনের কথা মনে পড়ে না?

ঃ মনে পড়লে কি করব? ফিরে তো আর যেতে পারব না!

হয় তো ফিরে যেতে পারবে না মনে করেই কমলা দুঃখ করে না। জলপাইগুড়ির পাহাড়ি এলাকায় তাদের ঘরবাড়ি ছিলো, ঘরের চালে আকাশ ছিলো আর চা বাগানে কাজ ছিলো; তারা সবাই সেখানে কাজ করত, মিলেমিশে, হাসিখুশীভাবে। সেই খুশী ও স্বাধীনতার দিনগুলো তখন সাধনের মার জীবন থেকে হারিয়ে গেলেও কেবল সাধনের দিকে তাকিয়ে বলে,

ঃ আমার সাধন আছে, আমার আর চিন্তা কি? বলেই ফিক করে হেসে ফেলে।

আমার মনে হয় মানুষের দুঃখ কষ্ট সহ্য করার জন্যে আলাদা একটা মন থাকে। নইলে সাধন হতে পারতো প্রিন্স অব জলপাইগুড়ি, না হয়ে হয়েছে আজিজ কন্ট্রাক্টরের ছেলে, যে লোক ভুলেও বুঝি তার ছেলের দিকে তাকায় না, তার ছেঁড়া ফাটা পোষাকটা বদলে দেবার কথা মনেও আনে না। সাধন কিংবা তার মার এজন্যে কোনো অভিযোগ নেই। সাধন, বলা চলে দিন রাত আমাদের বাসাতেই থাকে, আমার ছোট ভাই রোকনের সাথে খেলা করে।

একদিন দেখলাম, সাধন একটা ইঁট মাথায় করে তাতানো রোদে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে, রোকন কাগজের ঠোঙ্গা থেকে কি যেন বের করে করে খাচ্ছে। আমাকে দেখেই রোকন দৌড়ে পালিয়ে গেল। সাধনকে জিগেস করলাম,

ঃ কি রে, তুই ইঁট মাথায় করে দাঁড়িয়ে কেন ?

ঃ রোকন আমাকে চানাচুর খাওয়াবে।

ঃ চানাচুর খাওয়ার জন্যে ইঁট মাথায় করে দাঁড়িয়ে ?

আমার এ প্রশ্নের জবাব সাধন দিতে পারে না। ইঁটটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে, চুপ করে

অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কাছে ডেকে জিগেস করি,

ঃ রোকন তোকে আজকেই না আরো এমনভাবে কষ্ট দিয়েছে ?

মনে হলো, আমারই ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস হারিয়ে ফেলেছে সাধন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, চোখ দুটো টানা টানা, মণি দুটো কালোয় কালোয় চক চক করছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বলি,

ঃ কিরে, বললি না তো ?

ঃ আমাকে একদিন পিঁপড়ের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো, একদিন সর্দি খাইয়ে দিয়েছিলো, আরেকদিন অনেকক্ষণ চোখ বেঁধে রেখে দিয়েছিলো।

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। রোকনকে মজা দেখাচ্ছি। আচ্ছা তোকে এমন করে শাস্তি দেয় কেন ?

ঃ আমাকে যে আইসক্রিম খাওয়ায়, চিনেবাদাম খাওয়ায়, চানাচুর দেয়।

লক্ষ্য করলাম, খাবার জিনিসের নামগুলো বলার সাথে সাথে একটা ক্ষুধার ছায়া ওর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন চোখের মণি দুটো অনবরত ঘুরে ঘুরে খাবার জিনিসগুলোকে স্পর্শ

করে যাচ্ছে।

সেইদিনই রোকনকে সাধনের মার সামনে শাস্তি দিলাম। কমলা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে রোকনকে হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললো,

ঃ ছিঃ বাবা, ওরা ছোট ছেলে, ওদের কি দোষ ধরতে আছে ?

ঃ তাই বলে অমন কষ্ট দেবে কেন ?

ঃ একটু কষ্ট পেলেও তো সখের জিনিসগুলো খেতে পায়। আমি তো দিতে পারি নে।

কথাগুলো বলতে সাধনের মার মুখে কোনো বেদনাই লক্ষ্য করি নি, বরং একটা মিষ্টি হাসির ছটা তার মুখটাকে যেন আলোকিত করে রেখেছে। অথচ ছেলে খেতে পায় না, এবং পেলেও এভাবে কষ্ট পায় মনে করে কমলার কাঁদা উচিত ছিলো। কিন্তু কি দিয়ে যে ওর মন তৈরী হয়েছে—হয়ত পাহাড়ি এলাকার পাথুরে ছোঁয়া ওর মন থেকে যায় নি বলে সহজে চোখ দিয়ে পানি বেরোয় না।

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে সাধনের মা সহজভাবে আমার দিকে তাকিয়ে সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো হেসে বললো,

ঃ ছোটবেলা থেকে কষ্ট করতে শেখা ভালো। আমাদের জলপাইগুড়ির পাহাড়ে পাহাড়ে কাজ করতে ' ! হতো, তাও তো করতে হতো !

আমরা যারা ওখানে উপস্থিত ছিলাম, কারো মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি। মানুষের মন যে কতোভাবে গঠিত হয়, তা ভেবে ভেবে আকুল হয়ে গেলেও হদিস পাওয়া যায় না। শুনেছি, আজিজ কন্ট্রাকটরের বাসায় একজন ঝি চাকরানীর যতোটা কাজকর্ম করতে হয়, কমলাকেও ঠিক ততটাই, এমন কি বেশিও করতে হয়। প্রায় সবসময়ই রান্নাঘরের ধোঁয়াকালির মাঝে ডুবে থাকতে হয় তাকে, আর একটু ফুরসৎ পেলেই আমাদের বাসায় চলে আসে, তখন দেখে মনেই হবে না, এইমাত্র কাজে কর্মে তার আর বাইরে বেরুনোর উপায় ছিল না।

মা জিগেস করেন,

ঃ তোমাকে এতোটা খাটায়, তুমি কিছু বলতে পারো না ?

ঃ কে খাটায় ? যে কাজ করি, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ দেশে করতে হতো। আর এতো ঘরে বসেই কাজ করি।

কথাগুলো শেষ করে কমলা সুন্দর দু'পাটি দাঁত বের করে ঝির ঝির করে হেসে ফেলে।

ঃ আচ্ছা কমলা, তুমি যে আমাদের বাসায় আসো ওরা জানে না ?

ঃ জানে।

ঃ কিছু বলে না তোমাকে ?

ঃ বলে, কিন্তু কানে তুলি না। কানে তুললে যদি ঝগড়া বাধে ? ঝগড়া হওয়া ভালো ? ঝগড়া হলে আমার সাধনকে যদি ভাত না দেয় ?

একটার পর একটা প্রশ্ন তুলে কমলা, হাসিমুখে চেয়ে রইলো, ভাবখানা এত বড় একটা সমস্যার কথা আদৌ চিন্তা না করে মা কথাটি তুলেছিলেন, সে সেটার অতি সহজে সমাধান করে দিলো।

ঠিক সেই সময় সাধন এলো আইসক্রিম খেতে খেতে। গায়ের গেঞ্জিটা ঝুলে পড়েছে—ময়লা, ছেঁড়া প্যান্ট আর মাথায় তেলের নেই বালাই—মনে হচ্ছে এইমাত্র কাদামাটির ভেতরে গড়াগড়ি দিয়ে এলো। কমলা হেসে সাধনকে বললো,

ঃ আইসক্রিম কে দিলো রে ?

ঃ আমি কিনেছি।

ঃ তুই কিনেছিস ? পয়সা পেলি কোথায় ?

ঃ তোমার বিছানার নিচে দুই আনা পয়সা ছিলো, তাই দিয়ে আমি দুটো কিনে একটা রোকনকে দিয়েছি, আর একটা আমি। তাই না রোকন ?

রোকন মাথা নেড়ে সায় দেয়।

কমলা বেশ জোরে হেসে বলে,

ঃ এখনই যদি চুরি করা শিখিস, বড় তো হসইনি।

ঃ তোমার কাছে পয়সা চাইলে দাও না। আর রোজ রোকনই তো খাওয়ায়। আজকে আমি রোকনকে খাইয়েছি। তাই না রোকন ? মা জানো, আজকে যে আইসক্রিমটা কিনেছি, খুব মিষ্টি খুউব মিষ্টি, না রোকন ? আজকে আমি রোকনকে খাইয়েছি।

সাধন আর কথা বলতে পারছে না। খুশী জোয়ারের পানির মতো তার চোখ মুখ ছাপিয়ে উপচে পড়ছে, আর কমলা ? ছেলের খুশীর সাথে সাথে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে, কাঁদতে কাঁদতে একসময় সে ফোঁপাতে থাকে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ফোলা-ফোলা চোখ মুখ আরো ফোলা-ফোলা হয়ে যায়, মনে হয় সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছিলো।

ক্যাপটেন ডি সুজা

দেবব্রত মল্লিক

খিদিরপুর বন্দর। কোল জেটি।

শেষ বার্থে রয়েছে 'বিশ্ব সমুদ্র'। মালবাহী জাহাজ। এ পাশে কাছাকাছি অন্য কোন জাহাজ নেই এখন। শুধু রয়েছে হাইড্রোলিক ব্রীজের দু পাশে দুটো জাহাজ। এম ভি হর্ষবর্ধন আর জলতরঙ্গ। প্রথমটি নিয়মিত আন্দামান যায় এবং অন্যটি মালবাহী।

এ সমস্ত দেখতে দেখতে মুখস্ত হয়ে গেছে রতনের। এরই মধ্যে বন্দরের রক্ষী বাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা দাঁড়িয়েছে দু বছর। একটা রেল ইঞ্জিন ঝকঝক করতে করতে এসে জলের ট্যাঙ্কের কাছে দাঁড়াল। জল ভরবে নিশ্চয়ই। এধারে গেটের পাশে বটগাছের ছায়ায় রতন পাহারায় দাঁড়ানো।

হঠাৎ গেটের পাশে এসে দাঁড়াল একজন বৃদ্ধ। এক মাথা পাকা চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি পরনে প্যান্ট, গায়ে একটা চেক চেক শার্ট, চোখমুখ দেখে মোটেও স্বাভাবিক ঠেকছে না। গেট থেকে আর একটু ভেতরে হঠাৎ ঢুকে এল।

ঃ আপ কৌন। কোথায় যাবেন ?

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ বিশ্ব সমুদ্র জাহাজের দিকে তারপর রতনের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। পরে বলে ঃ ই জাহাজ কব ছোড়েগি।

ঃ এ আর কোনদিনই ছাড়বে না।

ঃকেন ? কেন ? বৃদ্ধ বিমর্ষ, হতবাক।

ঃ বিশ্ব সমুদ্র এখন স্ক্র্যাপ। ভেঙে ফেলা হবে। বিক্রি হয়ে গেছে।

ঃ বিশ্ব সমুদ্র আর জলে ভাসবে না কখনো ? পাগলের মত শব্দগুলো আওড়াতে থাকে বৃদ্ধ।

হঠাৎ হেসে হেসে বলে ঃ এই জান তো, এটা আমারই জাহাজ ছিল।

এ কথায় রতন আর কোন উত্তর করে না। বুঝতে পারে বৃদ্ধের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। মি দশ-পনের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বৃদ্ধ, তারপর গেটের পাশ থেকে চলে যায়। আবার ফিরে আসে। এবার রতনকে বলে ঃ আমাকে একবার ভেতরে যেতে দেবে ?

ঃ ভেতরে যাওয়া বারণ।

ঃ শুধু একবার। আমার কেবিনটা দেখে ফিরে আসব। অনুরোধ জানায় বৃদ্ধ। ঐ কেবিনে আমার বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

ঃ আপনি সত্যি সত্যি পাগল দেখছি। ঐ ভাঙা জাহাজে উঠবেন ? রতন পাশ থেকে বৃদ্ধকে জোর করে সরিয়ে দিল।

পরের দিন।

রতনের ডিউটি সেই একই জায়গায়। শুধু সময়ের হেরফের হয়ে বিকেলে হয়েছে। গেটের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই অবাক। হই চই, মানুষে মানুষে ছড়াছড়ি। বিশ্ব সমুদ্র জাহাজের পাশে ভিড়ে ভিড়াক্কার। লোক পরম্পরায় খবর এসে পৌছল। বিশ্ব সমুদ্র জাহাজের কেবিনে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাজ্জব ব্যাপার। স্ক্র্যাপ জাহাজ। সেখানেও মৃত দেহ। পুলিশ এসেছে। এসেছে ফায়ার ব্রিগেডের লোক। জাহাজের মালিকপক্ষকে খবর দিয়ে আনানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তি ওঁদের নাকি পরিচিত। দীর্ঘদিন এ কম্পানিতে কাজ করেছেন। নাম ডি সুজা। গোয়ার মানুষ। জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন।

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে একটা ডায়রি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা রয়েছে ঃ আমি গত সপ্তাহে শিপিং নিউজ কাগজে দেখলাম বিশ্ব সমুদ্রকে স্ক্র্যাপ করা হবে। কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। তাই ছুটে আসি কলকাতা বন্দরে। এখানে এসে দেখি, কথাটা সত্যি। গেটের একজন সান্ত্রীও তাই জানাল। আমি তাকালাম আমার প্রিয় বিশ্ব সমুদ্রের দিকে। আমার মনে হল ও যেন আমাকে দেখে অঝোরে কেঁদে চলেছে। আমারই কি কম কান্না পাচ্ছিল তখন। আমি সবার চোখে ধুলো দিয়ে আমার কেবিনে উঠে এসেছি। আমার সেই প্রিয় কেবিন। উঃ কতদিন এখানে আসিনি। দারুণ ভাল লাগছে আমার। আমার পরম ...এরপর আর কিছু লেখা নেই। কালির একটা দুটো আঁকিবুকি রয়েছে। ডাক্তারের অভিমত ঃ হার্টফেল। পরম আনন্দের অন্য এক প্রকাশ।

গেটে দাঁড়িয়ে রতন কিরকম যেন একটা উত্তেজনা অনুভব করছে। বিভিন্ন বন্দর কর্মীরা আসছে, চলে যাচ্ছে। এক অদ্ভুত ঘটনা। কারো কারো অভিমত ঃ এমন জাহাজ-প্রেমিক কখনো দেখিনি। রতন সবকিছুই লক্ষ্য করছিল। প্রায় বিকেল চারটের সময় মৃতদেহটি জাহাজ থেকে নিচে নামিয়ে আনা হল। ডেড বডি শোয়ানো রয়েছে বিশ্ব সমুদ্রের পাশে। আরো কিছুক্ষণ এখানেই শোয়ানো থাকবে। তারপর যাবে মর্গে।

রতন একজনকে ওর জায়গায় দাঁড়াতে বলে এক ছুটে এসে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মাথা গলাল। হ্যাঁ কালকের সেই বৃদ্ধ। খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছেন। এখন ওঁর মুখে চোখে সেই অস্বাভাবিক ভাব নেই। অবিন্যস্ত এক মাথা পাকা চুল ও মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ। মুখে প্রশান্তির প্রতিচ্ছায়া।

কুড়ানো টাকার কুরুক্ষেত্র

ইমরুল চৌধুরী

কুড়ানো টাকা নিয়ে কুরুক্ষেত্র!

পুরো দশটা দিন দিশেহারা নারু কাণ্ড-জ্ঞানহীন কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে বসে। জানা মতো সকল চাতুরী খাটিয়ে চতুর নারু আমাকে ফতুর করে দেয়। যুক্তিযুক্তহীন যুক্তিতর্কে আমাকে ভড়কে দিতে চায়ঃ দ্যাখ ইমু, মানিব্যাগটা কুড়িয়ে পাওয়ার সময় আমিও তোর সংগে ছিলুম। পাওয়া টাকার পাওনা অংশ আমাকে দিতেই হবে।

বলে স্থির সংকল্প নারু পাওয়া টাকার আশায় পাওনাদার হবার ভান করে।

নারুর কচকচানি আমি তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দিইঃ টাকাটা তুই কুড়িয়ে পাসনি। ফাঁকা রাস্তা থাকলেই টাকা কুড়িয়ে পাওয়া যায়না। এর জন্যে বাঁকা চোখ থাকা চাই। টাকা পাওয়ার ব্যাপারে তোর কোনো অবদান আছে তা আমি স্বীকারই করি না। আমি হককথার মতো নারুকে সাফ সাফ জানিয়ে দিই। নারু তথাপি নিজের হক ছাড়তে রাজী হয়না। বরং হক কথার হকিকত শুনিয়ে আমার সাথে হঠকারী করতে চায়ঃ 'তুইতো রোজই খালি হাতে ফিরিস। আমি সংগে ছিলুম বলেই তো মানিব্যাগটা তোর নজরে এলো। আমিই তো তোকে মানির মাণিক্য দেখালুম।' বলে নারু চানক্যের মতো আমার দিকে তাকায়। বাক্যবাণে আমাকে বাঁকা করতে চায়। বাক্যের চাকচিক্যে বাকায়দা ফায়দা ওঠাতে চায়।

আমি কায়দামতো নারুকে 'নো' করার চেষ্টা করিঃ তুই আমার সংগে ছিলি ওটা নেহাৎ কোইন্সিডেন্ট। তুই আমার সংগে না থাকলেও সেদিন কালিচরণ রোডে মানিব্যাগের মাণিক্য ঠিকই চিকচিক করতো। তুই ভেবেছিস ওই চাকচিক্য ছেড়ে আমি খালি হাতে হাততালি দিয়ে বাড়ী ফিরতাম। আর তুই কি কম বিদ্রোহ না করতে চেয়েছিলি আমার সংগে। ছোঁ মেরে মানিব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পুরো টাকাইতো আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলি। ঠিক সময় মতো পা দিয়ে তর্জনী চেপে না রাখলে পুরো টাকার মালিকতো তুই হতিস্।

বলে আমি নারুর আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। কিন্তু যেখানেই মানির প্রশ্ন সেখানে কোনো ক্ষীণ আশাও নিরাশ হতে দেয় না নারু। প্রয়োজনবোধে মুনি হতেও দ্বিধাবোধ করে না। মানির প্রশ্নে রক্তাক্ত হানাহানি ঘটাতেও তৎপর হয়ে ওঠে নারু। 'ফাও টাকার ফিফটিপার্সেন্ট তোকে দিতেই হবে ইমু।' রক্তচক্ষু নারু শক্তভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে। ফিফটিপার্সেন্ট আদায় করার জন্যে যেন শক্তভাবে গাঁট হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপারটা মিটমাট করে নিজের ভাগ নিয়ে নারু ভেগে পড়তে চায়।

নারুর আচরণ আমাকে বিস্মিত করে। আমি যতই স্মিতমুখে জবাব দিই নারু যেন ততই আমাকে ভীত করে তুলতে চায়। যতই নির্ভয় হবার ভাণ করি ততই নারু ভয় দেখিয়ে আমাকে রীতিমত পেরেশান করে তোলে। নারুর সকল চাতুরী প্রয়োগ সত্ত্বেও ওর ব্ল্যাকমেইলের মুখে টিকে থাকার চেষ্টা করি। একে একে ওর সকল প্রচেষ্টাই ফেইল হতে থাকে।

'তার মানে পুরো টাকাটা তুই একাই আত্মসাৎ করবি।' নারু যেন শেষ কথা জানতে চায়। আমিও সর্বশেষ কথা নারুকে জানিয়ে দিতে দেরী করিনেঃ 'তোর এখনও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় নারু। প্রয়োজন হলে বেমালুম তাই করবো। পুরো টাকাটাই আমি দু'হাতে দেদারভাবে উড়িয়ে ফুর্তি করে বেড়াবো। এটা তোর অনেক আগেই মালুম হওয়া উচিত ছিলো।'

বলতে বলতে নারুকে আমার শেষ কথাটা প্রচণ্ডভাবে মালুম করাবার চেষ্টা করি। নারুর মুখের সামনে বজ্রপাতের মতো দরজার খিল এঁটে খিলখিল করে উঠি।

'দুরহ' বলে দুরূহ নারুকে দূর হয়ে যেতে বলি। আর নারু রাগে দু'হাত রগড়াতে থাকে। খিল বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড ঢিল মেরে সব লণ্ডভণ্ড করার জন্য যেন মারমুখো হয়ে ওঠে। তারস্বরে তারবার্তার মতো সংক্ষেপে ক্ষ্যাপা নারু তথাপি জানতে চায়, 'তাহলে এই তোর শেষ কথা ইমু।'

আমি দরজার খিল ধরে সেই রকম খিলখিলিয়ে উঠিঃ আর কথার বাড়াবাড়ি হওয়া উচিত নয় নারু। এখন তুই ভালোয় ভালোয় কেটে পড়তে পারিস।

বন্ধ দরজার ওপাশে রাগান্বিত নারুকে যেন সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই আমি। উপায়ান্তর না দেখে যেন মন্ত্র উচ্চারণের মতো নারু বলে যায়ঃ আমি খেটে খাওয়া ছেলে ইমু। পাওয়া টাকায় আমার কোনো লোভ নেই। জেনে রাখিস কেবল কুঁড়ে লোকের জন্যেই কুড়ানো টাকা। তুই কুড়িয়ে পেয়েছিস আমি খেটে ওই টাকা আনবো। এই টাকা তোর পেটে সইবে না ইমু বলে যাচ্ছি।

বলতে বলতে নারু যাবার ভান করে।

আমিই আবার নারুকে থামাই। কোনো বদহজম হবে বলতে চাস? হ্যামবার্গার-চিকেন রোস্ট-ফ্রাইডপ্রন বদহজমের কিছু নেই নারু। না হয় কয়েকটা ফ্রুটসল্ট লাগবে বড়ো জোর।

বলে আমি জোর শব্দ তুলে নারুকে ফলস ঢেকুর শোনাই।

নারু শুনতে পায় কিনা জানিনে। তবে আমি স্পষ্ট শুনতে পাই নারুর জিভের চুকচুক শব্দ। রসনার রসে যেন আস্ত রসমালাই অনুভব করে নারু। নারুর সবটাই ফাও। ফাও টাকা। ফাও খাওয়া।

উল্টো নারুই আমাকে উপদেশ দেয়ঃ ফাও টাকার ভোগ তোর হবে না ইমু। বরং ভোগান্তিই হবে বলে যাচ্ছি।

বলে নারু যাবার জন্যে আবারও পা বাড়ায়। আমি নারুকে আবারও থামাইঃ তাহলে এও শুনে যা নারু, তুই সেদিন মাহবুব ক্লথ মার্কেটে ডবল নীটের যে জাপানী প্যান্ট পীসটা দেখেছিলি

আর সেদিন ফারাডাইস মার্টে লংকলার রেডস্ট্রাইপ সার্টটা দেখার পর থেকে তোর যে রকম হার্টবিট হচ্ছিল কাল থেকে আমাকে দেখা মাত্রই তোর সেই হার্টবিট মানে ...... ।

বলে আমি সম্পূর্ণ কমা সারার আগেই নারুকে ওর হার্টফেল করার চেষ্টা করি। কিন্তু নারু উল্টে নিজের বুক দাপড়ে দাপট দেখায়ঃ কাল থেকে কার হার্টকে বিট করবে তা তুই নিজেই টের পাবিনে ইমু।

বলতে বলতে নারু একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। পাওয়া টাকা ছেড়ে ওর চলে যাওয়ায় খটকা লাগলেও আমি আপাততঃ নির্ভয়ে দরজা খুলে দিই। আপনমনে খোলা দরজার খোলা হাওয়া খাই। ভুলে যাই নারুও যে একজন অংশীদার। আমি কুড়ানো টাকার পুরোটা একাই ভোগ করতে গিয়ে ভোগান্তি বাড়িয়ে তুলি। নারুর কথাই ঠিক। যেন ক্ষণিকের মধ্যেই অদৃশ্য নারুর অদৃশ্য হাতের কারসাজি দৃশ্যময় হয়ে ওঠে। পরের দিনই টের পাই। বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড শব্দে আমারই হার্টফেল হবার উপক্রম হয়। বন্ধ দরজা যেন খোলার অপেক্ষায় থাকে না। যেন আপনাতেই খুলে যায়। আর অপর প্রান্তের ষণ্ডা লোকের পাণ্ডা দেখে কাঁপুনী ধরে যায় আমার। শর্টহ্যান্ডের মতো শর্টকাটে কাজ সেরে ফেলতে চায়—মানে, মানিব্যাগ নিয়ে মানে মানে কেটে পড়তে চায়।

আমি বিনা বজ্রপাতে আকাশ থেকে পড়ি। কার মানি ব্যাগ! আমি কিছুই না জানার ভান করি। তাহলে কি নারু টাকা আদায় করার জন্যে গণ্ডা লাগিয়েছে। ভেবে আমার গণ্ডদেশ থেকে যেন ঘাম ঝরতে থাকে। হীন নারুর হীন কার্যকলাপে আমার ঘেন্না ধরে যায়।

এদিকে ষণ্ডা লোকটা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ওঠে। পাওয়া টাকা নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে চায়। স্বীয় কথা বিশ্বাস করাতে গিয়ে আমাকে দ্বিগুণ বিস্মিত করে তোলেঃ আমি কি হাওয়া থেকে বাক্য করছি। এই দেখুন না আজকের খবরের কাগজেইতো রয়েছে বলে সে বগলদাবা খবরের কাগজ সবলহাতে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। আমি একদিকে বড়ো হাত করে তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিই অপর দিকে আমার ভেতরটা আস্তে আস্তে জড় হয়ে যেতে থাকে। ত্বরিতে আমার হার্টবিট তড়াক করে বেড়ে যায়, যেন তড়িতাহতের মতো আমি শুধু হাত বাড়িয়েই থাকি নির্জীবের মতো। আড়ষ্ট জিভে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারিনে কিছুই।

কেবল বুঝতে পারি নারুরই দেয়া মরণ পণ বিজ্ঞাপন এবং তাও নিজের নামে নয় অপরের নামে। নারু পরকে দিয়ে অপরের ধন আর পরকেই দিতে চায়। বিজ্ঞাপন দেখে আমিও পণ করি। পাই পাই করে পাওনাদারদের পই পই জবাব দিই। কথার খই ছুটাই। মানে মানে সকলকে মানিয়ে অপরের মানিব্যাগ নিজের জেবে আগলে রাখি। পাওয়া টাকার পাওনা লোকদের ধাওয়া করে ফিরি। ধাওয়া করি আর দায় সারি। তাড়া করা লোকদের তাড়া খেয়েও তোড়া নোট হাত ছাড়া করিনে।

এক সময় নারুও তাড়া করেঃ 'তার মানে তুই অন্যায়ভাবে টাকাটা ভোগ করবি। মানিব্যাগটা মেরে দিয়ে একটা গর্হিত কাজ করবি।' বলতে বলতে নারু যেন আমাকে হিতোপদেশ দেয়। হিতে বিপরীতের মতো আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। নারুর অপকর্মের একটা বিহিত করতে চাইঃ তাই বলে তুই যার তার নামে যাতা একটা বিজ্ঞাপন দিবি। অবিবেকজনিত অবিজ্ঞ কাজ করবি। নারু তথাপি বিজ্ঞলোকের মতো ভান করেঃ বিজ্ঞাপনটা নিশ্চয়ই বিফলে যায়নি। যার টাকা সে নিশ্চয়ই সন্ধান পেয়েছে।

বলে আমাকে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ করে তুলতে চায়। একটা পুলিশী কাণ্ডকারখানা না ঘটিয়ে নাকি আমি নিস্তার পাবো না এই বলে নারু আমাকে সতর্ক করে। সবিস্তারে আমাকে ক্রিমিন্যাল এ্যাক্ট সম্পর্কে অবহিত করে নারু। আমাকে ভয় দেখায় এবং ভাবিয়ে তোলে।

তথাপি টাকার মায়াডোর আমাকে বিভোর করে রাখে। আমি সহজেই কুড়ানো মানিব্যাগের মায়া ছাড়তে পারিনে। মানির মাণিক্য আমি কাঁকড়ার মতো আঁকড়ে থাকতে চাই।

নারু আমার ভাবসাব দেখে প্রীত হয় না। বরং হৃত টাকা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আমাকে আরও ভীত করে তুলতে চায়ঃ টাকার আসল মালিক কে তা তুই নিজেও জানিসনে ইমু। আসল মালিক তোর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নেবেই। পাওয়া টাকা ভোগ করার আশা তুই এখনও ছেড়ে দে। নিজের সর্বনাশ তুই নিজেই ডেকে আনছিস ইমু।

বলে নারু আমার সর্বনাশা পরিণতির ইংগিত দেয়। আসল মালিককে টাকা না দেয়া পর্যন্ত খবরের কাগজে নাকি বিজ্ঞাপন বেরুতেই থাকবে—এই বলে নারু আমাকে সচেতন করতে চায়। আমার নাকি চেতনা ফেরা দরকার বলে নারু আমার চেতনায় আঘাত করতে চায়।

নারুর সদুপদেশ যেন আমার বিবেকে ঝড় তুলে দেয়। আমি সৎকাজে নিজেকে মনোনিবেশ করি এবং নারুকে শেষ কথা জানিয়ে দিইঃ দেখ নারু পাওয়া টাকা দিয়ে বরং মেকি কাজ করা ভালো। পুরো টাকাটাই তারচেয়ে গেনডারিয়া মসজিদে দান করে নেকি হাসিল করবো।

নারু আমার কথা শুনে ন্যাকা সাজার চেষ্টা করে। উদগ্রীব হয়ে উৎসাহ দেয়ঃ তাই ভালো ইমু। সকলের নেক নজরে থাকার চেষ্টা কর। অপরের টাকার ওপর যে লোভ দেখিয়েছিস তাতে তোর কৃতপাপের কোনো ক্ষোভ থাকবে না। তোর বরং প্রায়শ্চিত্য করা দরকার।

মেকি নারু আমাকে উপদেশ দেয়। নেক কাজে দেরী করা উচিত নয় বলে নারু আমার নেক নজর থেকে উধাও হয়ে যায়। আমি সহজেই নারুর মেকআপ বুঝতে পারিনে।

তথাপি মেকি সিদ্ধান্তে অটল থাকি আমি। পাওয়া টাকা ও মেকি নারু—এ দুয়ের প্রাণান্তকর অবস্থা থেকে আমি আশু মুক্তি চাই। মুক্তি চাই গেনডারিয়ার জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যার সফেদ শ্বশ্রু গুম্ফময় অলৌকিক মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে তুলে দিই কালিচরণ রোডে কুড়িয়ে পাওয়া কালো মানিব্যাগ। নেকি হাসিল করি এবং কপর্দকহীন শূন্যহাতে ঘরে ফিরেও পুণ্যি অর্জনের এক অলীক চেহারায় উদ্ভাসিত হই।

কিন্তু সেই অলীক উদ্ভাসিত চেহারা যেন ক্ষণিকের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। মেকি নারু ওর মেকআপ নিয়ে স্মিতমুখে খিলখিল করে ওঠেঃ ভালোই হলো ইমু। তোরও নেকি হাসিল হলো আমিও চরিতার্থ হলাম।

আমি অর্থহীন সন্দিগ্ধ নারুর দিকে তাকাইঃ তাহলে কি .... ।

পুরো মানিব্যাগটা কেড়ে নেয়ার মতো নারু আমার মুখের কথাও কেড়ে নেয়ঃ আসল মালিককেই শেষ পর্যন্ত টাকাটা দিলি তবে ......

আমিও নারুর কথার গ্রাস কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করি। বিশ্বাস করি না নারুর কথায়ঃ তবে কি ইমাম সাহেবই ...... ।

নারু যেন থাম থাম বলে চিৎকার করে ওঠে। পকেট থেকে কালিচরণ রোডের কুড়ানো কালো মানিব্যাগ বের করে রীতিমত আমার ঘাম ছুটিয়ে দেয়ঃ তুই আমাকে ইমামসাহেব বললেও আমার আপত্তি নেই। প্রয়োজন হলে আমি ইমামতিও করতে পারি। হাঃ হাঃ ইমু, তুই যেন কি বলছিলি। হ্যামবার্গার ফ্রাইডপ্রণ রেডস্ট্রাইপ লংকলার সার্ট। নারুর কথাগুলো আমার হার্টের ভেতর সূক্ষ্ম পিনের মতো চিন চিন করে বাজতে থাকে।
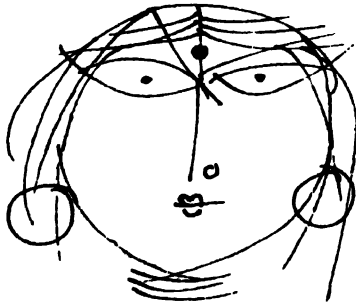
বারো বছর আগে

আবু কায়সার

রোকনপুর গাঁয়ের পূবপ্রান্তে অনেক দিনের পুরনো একটা বটগাছ। ডাইনীবুড়ির জটার মতো তার পাকানো ঝুরি নেমে এসেছে মাটির ওপর। বুড়ো বটের অজস্র ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে হাজারো পাখি দিনভর কিচির মিচির করে। রাত্রে আবার কিন্তু টু-শব্দটিও নেই। যখন বটফল পেকে ওঠে—তখন যেন শুরু হয়ে যায় পাখিদের মহোৎসব। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সুইট-বলের মতো লাল লাল বটফলে মস্ত গাছের ছড়ানো ছায়াটা রংচঙে হয়ে ওঠে। জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। দিন-দুপুরেও এদিকটায় কেউ সহজে পা বাড়ায় না। রোকনপুরের প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে, যদি কেউ কখনো এ পথে আসেই, তবে নিবিড় বটের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে একটুখানি জিরিয়ে না নিয়ে সে পারে না।

বারো বছর হ'য়ে গেলো। কিন্তু এই প্রকাণ্ড বটগাছের ঢেউ ওঠা শরীরের ওপর অনেকগুলো কালো কালো ফুটো এখনও মিলিয়ে যায়নি। বারো বছর আগে ওই গাছের ছাল-বাকলের ওপর শুকনো রক্তের দাগ ছিলো বেশ স্পষ্ট। কিন্তু গুঁড়ির ওপরকার ফুটোগুলো অ্যাদ্দিনে মিইয়ে এলেও একেবারে মিলিয়ে যায়নি। ফুটোগুলোর দিকে একবার চোখ পড়লেই বারো বছর আগেকার সেই অঘটনটির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে, ছোট নামের ছোট্ট একটি ছেলের কথা, যার বুকে পিঠে ওই রকম এক ঝাঁক ফুটো হয়েছিলো। আহা, বছর-বারো বয়সের সেই ছোট আজ বেঁচে থাকলে চব্বিশ বছরের যুবক হতো। বারো বছর কি কম সময়!

মিলিটারীরা ছোটকে হুড-খোলা জীপে তুলে এইখানটায় এনে বলেছিলো, আভি যাও, ভাগো হিঁয়াসে। ···ছোট প্রথমটায় কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলো। চমক ভাঙ্গতেই এক লাফে জীপ থেকে নেমে দৌড় দিয়েছিলো বটগাছটার নিচ দিয়ে। ভেবেছিলো, মাঠ পেরিয়ে নদীর দিকটায় চলে যাবে; কিন্তু জীপ থেকে সে গজ পনেরো যেতেই একটা কর্কশ শব্দে চমকে উঠলো গাছের [illegible] মিয়ে পড়া পাখিরা। শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটা লাফ দিয়েই মুখ

থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলো ছেলেটা। দরকার ছিলো না। তবু স্টেনগানের পুরো ম্যাগাজিনটা এক নিমেষে খালি করে ফেলেছিলো আর্মিরা। অস্ফুট শব্দ করে দু'মিনিটে স্থির হয়ে গেলো ছোটর ছোট্ট শরীর। তার পিঠের ওপর অনেকগুলো ফুটো—বুকের দিকে ক্ষতগুলো বড়ো।

পাখিরা স্তব্ধ হয়ে গেছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে বটতলার ঠাণ্ডা মাটি। ফোয়ারার ধারার মতো টুকটুকে লাল শিশুর রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে উঠে বোবা বটের বুড়ো চামড়ায় আলপনা আঁকলো। রক্তমাখা বেশ ক'টা বুলেট গাছের গুঁড়িতেই ঢুকে পড়েছে। চরাচর স্তব্ধ। যেন কিছুই ঘটেনি, এরকম সহজভাবে শিস্ দিয়ে বাজখাই গলায় কথা বলতে বলতে দু'টি হুডখোলা জীপ নিয়ে জনাবারো দখলদার সৈন্য শহরের দিকে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর ছোটর রক্তমাখা নিথর শরীরটার দিকে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলো অগুন্‌তি লাল পিঁপড়ে। খুনীরা অবশ্য পরক্ষণেই বিপদে পড়েছিলো শহরে যাবার পথের ওপর। তাহলে, গোড়া থেকেই বলতে হয়।

মায়ের নিষেধ ছোট মানেনি। এই তুলকালাম তাণ্ডবের মধ্যে ও রোজকার মতো খেলতে গিয়েছিলো সেই পুবের মাঠে। নদীর ওপারে গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে দু'দিন ধরে। পাকিস্তানী সৈন্যরা শহর ছেড়ে ঢুকে পড়েছে এমন পাণ্ডববর্জিত গাঁয়ে গঞ্জেও। ভয়ে দুশ্চিন্তায় সারা রোকনপুর তটস্থ। কখন ওরা এপারে এসেও হানা দেয়, কে বলবে। গ্রাম অবশ্য এর মধ্যেই প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। বেশির ভাগ পরিবার তাদের গাঁটরি-বোচ্‌কা গরু-ছাগল নিয়ে পশ্চিমের দিকে সরে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার গোলাম রসুল সাহেব দো-টানায় পড়ে কি করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। ঢাকার কোনো সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় নেতারা ক'দিন আগেও হাটখোলায় এসে বক্তৃতা দিলেন। বললেন—কাজ একটাই, রুখে দাঁড়াতে হবে। জানালেন, ঢাকার রাস্তাঘাটে জোর লড়াই চলেছে—পাঞ্জাবীরা পিছু হটতে হটতে ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

এইরকম খবর পেয়ে গাঁয়ের মানুষ, বিশেষ করে কম বয়েসী ছেলেগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। কেউ কেউ দু'একটা পাখি-মারা বন্দুক আর লাঠি-বল্লম যোগাড় করে কাছের জেলা-সদর আক্রমণ করারও পরিকল্পনা নিয়েছিলো। গোলাম রসুল অনেক কষ্টে জঙ্গী-যুবকদের হাত থেকে গাঁয়ের মধু মেম্বারকে রক্ষা করেছেন। পাকিস্তানের দালালী করছে বলে মারমুখো ছাত্ররা মধু মেম্বারকে এই মারে তো সেই মারে। কিন্তু নদীর ওপারে মিলিটারী আসবার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। গ্রামবাসী এমন ঘাবড়ে গেছে যে তারা ঘরোয়া কথাও ফিস ফিস করে বলে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শোনা গেলো, জঙ্গী-ছাত্রদের নিয়ে নেতারা সীমান্তের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে গোলাম রসুলও সিদ্ধান্ত নিলেন গ্রাম থেকে সরে যেতে হবে। সেদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর সামান্য বাঁধাছাঁদা শেষ হলে দেখা গেলো, ছোট নেই। কী ব্যাপার? না, সঙ্গী-সাথী নিয়ে রোজকার মতো সে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে নদীর ধারে গেছে। বিরক্ত হলেন গোলাম রসুল। এটা একটা কথা হলো? এমন দুর্বিপাকের মধ্যেও ছেলেপিলেরা খেলতে যাবে? বাঁধাছাঁদা শেষ। এবার ঘরের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়াই কেবল বাকি। ছোটর মা রাগে বিড়বিড় করছেন। বকাঝকা করছেন দুই মেয়ে রুমকি-ঝুমকিকে। ওদের অপরাধ, ওরা ছোটকে আটকে রাখেনি, আগলে রাখেনি।

এতো দুঃখের মধ্যেও বেদনার হাসি ফুটে উঠলো গোলাম রসুলের মুখে। ছেলেটা শার্প। খুবই মেধাবী। লেখায় পড়ায় খেলার মাঠে ওর জুড়ি সারাটা ইস্কুলে নেই। কিন্তু ওই এক দোষ—বড়ো দুরন্ত, বড়ো ছট্‌ফটে। দেশ জুড়ে ধুন্ধুমার সুরু হবার পর থেকেই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার

হিড়িক লেগেছে ওদের ভেতর। একদল হয় মুক্তি বাহিনী—অন্য দল সাজে পাকিস্তানী সৈন্য! নদীর পারে ঝাউবনের মধ্যে দূর্গ বানিয়ে গাছের ডালের বন্দুক-কামান নিয়ে সেকি যুদ্ধ! বেলা আর একটু পড়লে নদীর ওপারে সারাটা গ্রাম জুড়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী জেগে উঠলো। গোলাগুলির শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। বাড়ির সামনে, কাঁচা রাস্তায় তিনটে মালপত্র-বোঝাই গরুর গাড়িতে সপরিবারে যেতে যেতে আলতাফ পেশকার অবাক হয়ে তাকালেন গোলাম রসুলের মুখের দিকে! লোকটা পাগল নাকি? লটবহর নিয়ে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছোটা কি? চেঁচিয়েই উঠলেন পেশকার সাহেব—কী ব্যাপার হেডমাস্টার। মনস্থির করতে পারছো না বুঝি? আরে,

যদি বাঁচতে চাও তো চলে এসো। ভাইরে, জানে বাঁচলে বাড়ি ঘর দোর আবার হবে।

ম্লান হেসে গোলাম রসুল বললেন—হ্যাঁ আলতাফ ভাই, এখুনি সব বেরিয়ে পড়বো। এতোক্ষণ রওয়ানা হয়ে যেতাম। গোল বাঁধালো পাজি ছেলেটা। ও ফিরে এলেই—তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না-হতেই ব্যস্তভাবে পেশকার বলে উঠলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ আর দেরী করা ঠিক হবে না। অবস্থা খুব খারাপ। শীগ্‌গির চলে এসো তোমরা। আমরা তাহলে এগোই।—বাঁশঝাড় পেরিয়ে আঁধার আঁধার তেঁতুল তলা দিয়ে গরুর গাড়িগুলো এগিয়ে গেলো জেলা বোর্ডের রাস্তার দিকে।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে বেরিয়েই পড়লেন গোলাম রসুল। রাগত গলায় বললেন—তোমরা বসো। আমি পাজিটার ঘাড় ধরে নিয়ে আসি গিয়ে। তিনি পথে নামলেন। বেলা এখন আরো হেলে পড়েছে। নিকারি পাড়ায় পালিয়ে যাবার তাড়া নেই। মধু মেম্বারের বাড়ির কামলারা বেগুন ক্ষেতে কঞ্চির বেড়া দিচ্ছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগলো গোলাম রসুলের কাছে। এদের কি কোনো চিন্তাভাবনা নেই? এমন দুর্বিপাকে এরকম ঠাণ্ডা মাথায় কাজকাম করছে কিভাবে? একি সাহস, না কি নির্লিপ্ততা? তিনি জোর পায়ে হাঁটা দিলেন মাঠের ওপর দিয়ে। মাথাটা যেন দপ্ দপ্ করছে। গলা শুকিয়ে খা খা। এরকম অবস্থার কথা সত্যি কেউ কল্পনাও করেনি। আলোচনা ভেঙ্গে গেলেই স্বাধীনতা-যুদ্ধ সুরু হয়েছে। আন্দোলন চলছে তো কতোকাল ধরেই। কিন্তু এবার এমন কি হলো যে আন্দোলন ঢাকা ছাড়িয়ে সারাটা দেশে ছড়িয়ে পড়লো এতো তাড়াতাড়ি! বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাই সরে পড়েছে রোকনপুর থেকে। প্রবীণ শিক্ষক বীরেন পাঠক গতকাল গ্রাম ছাড়লেন। সদর দরজায় তালা দেবার সময় ভদ্রলোকের সে কি কান্না। ধরা গলায় উচ্চারণ করলেন—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী! মেয়েরা তুলসীতলায় মাথা খুঁড়তে লাগলো। বীরেন বাবু বাড়ির আঙ্গিনার একমুঠো মাটি দামী স্বর্ণরেণুর মতো পাঞ্জাবীর পকেটে ভরতে ভরতে বললেন—মা, আবার কি তোমার কোলে ফিরে আসতে পারবো?

গোলাম রসুল নিজে গিয়ে বীরেন বাবুকে হিজলী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছেন। অনেকেই গেছে। কিন্তু কয়েকটি দুর্দান্ত ছেলে এখনো গ্রাম ছাড়েনি। শহর থেকে পালিয়ে আসা পুলিশ-কনস্টেবলদের দু'টি থ্রী-নট-থ্রী রাইফেল যোগাড় করেছে ওরা! জেলা শহর অবশ্য ফল্ করেছে। নেতা ও কর্মীরা নেই। ডিস্ট্রিক্ট হাই-কমাণ্ডের বাড়িটা হানাদাররা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। শহরে মারা গেছে অনেক মানুষ। সারাটা শহর এখন মিলিটারীদের কব্জায়। ওদিকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সক্ষম বাঙালীদের মুক্তিযুদ্ধে সামিল হবার আহ্বান শোনা যাচ্ছে ঘন ঘন। কিন্তু কোথায় গিয়ে, কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তা স্পষ্ট বোঝার উপায় নেই।

মধু মেম্বার বাল্যবন্ধু হলেও বর্তমান অবস্থায় তাকে খুব একটা বিশ্বাস করেন না গোলাম রসুল! তাল তলার মজে-আসা দীঘি আর তারই লাগোয়া অনাবাদী জমিটুকুর ওপর লোভ আছে মধুর। অনেক দিনের লোভ। অবশ্য ন্যায্য দাম দিয়েই জমি আর দীঘিটা সে কিনে নিতে চায়। গোলাম রসুল একদিন কথায় কথায় বলেছিলেনঃ জমিটা অবশ্য পড়েই থাকে। তুমি লাঙ্গল দেওয়াতে চাও—দাওগে। কিন্তু দীঘিটা আমি পরিষ্কার করাবো। জমিটাও সাফকবালা করে দিতে চাইনা মধু—চষতে চাও চষো—আমাকে কিছু ধান দিও, তাহলেই হবে। হুঁকো টানতে টানতে মধু মেম্বার তখন বললোঃ শুনলাম, বেচে দিচ্ছো। দক্ষিণ পাড়ার আইনুদ্দিন মণ্ডল বলছিলো সেদিন। তা বেচবেই যখন ... আমি কি দোষ করলাম হেডমাস্টর!

গোলাম রসুল একটু সতর্ক হলেন। গলা ঝেড়ে বললেনঃ আইনুদ্দিন একেবারে বানিয়ে বলেনি হে মধু। তবে কিনা—একটু ফাঁড়া ছিলো—কেটেও গেলো হঠাৎ। তাই বিক্রিবাটার কোনো কথাই ওঠেনা। তবে হ্যাঁ—কখনো যদি বিক্রি করতেই হয়—তোমাকে না জানিয়ে কিছু করবো না।

কিন্তু এখন? হেলে পড়া সূর্যের ম্লান আলো নিজের বিষণ্ণ মুখটায় মেখে নদীর ওপারে পাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়া দেখতে দেখতে মনে মনে হাসলেন গোলাম রসুল। ভালোই হয়েছে। এবার আর টাকা দিয়ে জমি কেনার ঝামেলা থাকবে না মধুর। যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে হেডমাস্টারের নিজের আর ক'বিঘে,—পাঠক বাড়ির দোতলা দালান সুদ্ধু গাঁয়ের বেশির ভাগ

ঘরবাড়ি আর জমিজমা এবার মধুর হবে। ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নদীর ধারে ঝাউগাছগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন গোলাম রসুল। এখানে, নদীর এই খাঁড়িতেই পাড়ার ছেলেরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে। নিকারীদের ছেলেরা খুঁজতে আসে মাছরাঙার ডিম। কিন্তু কোথায় কি! নির্জন নদীতটে কাক পক্ষিটি নেই। এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা দুলে উঠলো গোলাম রসুলের। কোথায় গেলো পাড়ার ছেলেরা? কোথায় গেলো ছোট? কী করবেন তিনি এখন! গলা ছেড়ে কয়েকবার ডাকলেন—ছোট, ছোট,—ছোটন রে—! গেলি কোথায় তোরা? কিন্তু আঁকাবাঁকা নদীর খাঁড়িতে কারো সাড়া শব্দই পাওয়া গেলো না। কেবল প্রতিধ্বনি ফিরে এলো কাঁপতে কাঁপতে—ছোটন—কোথায় গেলি তোরা!

আবির-রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিমের আকাশ। বেলা যেতে আর কতোক্ষণ! ওরা কি তবে খালের ধার দিয়ে গাঁয়ে ফিরে গেছে! চিন্তিতভাবে ফিরে চললেন গোলাম রসুল। সারা গ্রাম নীরব নিঝুম। কেবল নিকারী পাড়ায় টেমির আলো জ্বলছে। আলো দেখা যায় দূরে—মধু মেম্বারের বাড়িতেও। আর প্রায় সব দিকেই কাঁচা সন্ধ্যার আবছা আঁধার। আশ্চর্য—এমন দিনেও ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, জোনাক জ্বলে! গোলাম রসুলের মনটা ছেয়ে যাচ্ছে বিষণ্ণতায়। কতো প্রিয়, কতো পরিচিত এ পথ। আজ যেন অচেনা, অন্য রকম লাগছে সবকিছুই। মনে হয়, এ রাস্তা, এই গাছপালা কিছুই আর তার নয়। গোলাম রসুল নানা কথা চিন্তা করতে করতে কখন নিজের বাড়ির সামনে এসে পড়েছেন, ঠাহর করতে পারেন নি।

হঠাৎ চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এ কি? ওরা কোথায়? বৈঠকখানার দাওয়ার ওপর তো কেউ নেই। একটা আলো পর্যন্ত জ্বালানো হয়নি। বাঁধাছাঁদা শেষ করে ছোটর মা আর রুমকি-ঝুমকিকে এখানেই তো বসিয়ে রেখে গেছেন! কিন্তু গেলো কোথায় সব! নাঃ। সারা বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজে কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না গোলাম রসুল। ঝিঁঝি ডাকা আঙিনার ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি ডাক দিলেন—রুমকি! ...ঝুমকি! ডাকলেন—ছোট, ছোটন, ফিরে এসেছিস, বাবা? যেন মাটি ফুঁড়েই দু'টি ছায়ামূর্তি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। চমকে উঠে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই দুলালের চাপা গলা শোনা গেলো : আস্তে কথা বলুন চাচা, আস্তে কথা বলুন। চাচীরা নিরাপদেই আছেন। একটু আগেই গাঁয়ে চুপে চুপে ঢুকেছে দু'টো আর্মি-জিপ। শহরের দিক থেকে দক্ষিণ-পাড়ার জঙ্গলে রাস্তা দিয়ে এসেছে ওরা! আমরা মোকাবেলা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা দলে ভারী। বেশ কখানা অটোম্যাটিক রাইফেল আর স্টেনগান আছে ওদের সঙ্গে। আমাদের সম্বল দু'টো থ্রী নট থ্রী। তা-ও আবার অ্যামুনিশান নেই।

একদমে এতোগুলো কথা বলে হাঁফাতে লাগলো দুলাল। ঠাহর করে গোলাম রসুল বুঝলেন, দুলালের পেছনে আরো একটি রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আলতাফ পেশকারের মেজো ছেলে আসলাম। চাপা ক্রোধে, যেন ছায়াচ্ছন্ন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

ওরা কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন গোলাম রসুল।

দুলাল বললো : আলতাফ চাচাদের সঙ্গে ওদের সবাইকে চর-হিজলীর মাঝি-পাড়ার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশ্য চাচী বারবার ছোট আর আপনার কথা ভেবে আপত্তি করছিলেন যেতে। জায়গাটা সেফ। খুবই দুর্গম। খালবিল ভেঙ্গে জীপটিপ যেতে পারবে না ওদিকে। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন গোলাম রসুল : 'কিন্তু আমাদের ছোট কোথায়। ওকে তো কোথাও খুঁজে পেলাম না।'

নিজের ঠোঁটের ওপর তর্জনি চেপে দুলাল শব্দ করলোঃ শ্-শ্-শ! চাপা গলায় আসলাম বললোঃ ছোট আছে মধু মেম্বারের বাড়িতে। ওই বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে খেলা শেষে ফিরে এসে ও দেখে, ঘরদোর তালাবন্ধ। কেউ কোথাও নেই। দাওয়ার ওপর বসে ফুঁপিয়ে তাই কাঁদছিলো। আপনার খোঁজে এদিকে এসে আমরা কেবল ছোটকে পেলাম। আমাদের দেখে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে সুরু করেছিলো। আমরা ওকে সব কথা খুলে বলবার আগেই কানে এলো জীপের আওয়াজ। তখন বাড়ির পেছনের জঙ্গুলে-পথে ওকে মধু মেম্বারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েই আমরা সরে পড়েছিলাম। ছোট আমাদের সঙ্গে ছুটে পারবে না। আর আমাদেরই বা কখন কি ঘটে। এইসব ভেবে আপাতত ওকে মধু মেম্বারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা এখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছি। অপেক্ষা করছি আপনার জন্যে। কিন্তু ওদিকে—আসলাম কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলো।

হারানো কথার খেই ধরলেন গোলাম রসুলঃ ওদিকে কি! ওদিককার কথা কী বলছো?

দুলাল বললোঃ আর্মিরা মেম্বারের বাড়িতে চা খাচ্ছে। মহা হৈ হল্লা সারা বাড়ি জুড়ে। যেন খুশির তুফান ছুটছে। ব্যাটা দালাল। আর ওই কামলাগুলোও মহা উজবুক। হুঁকো টানতে টানতে বলাবলি করছেঃ গাঁ-টা পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। মেম্বর সাব ছিলেন বলে রক্ষা। মেম্বর সাবই বাঁচালেন। সে যাই হোক, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। আপদগুলো বিদায় হলেই ছোটকে ডেকে নিয়ে আমরা চর হিজলীর দিকে রওয়ানা হয়ে যেতে পারি। গঞ্জের মোড়ে রিকশাটিক্‌সা এখন বোধহয় আর নেই! হেঁটেই যেতে হবে আমাদের।

আসলাম ভরসা দিলোঃ সঙ্গে টর্চ আছে। কাদাপানি ভেঙ্গে ঝোপঝাড় ডিঙ্গিয়ে চলে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। একটু থেমে সে আবার বললোঃ আপনারা দু'জন দাঁড়ান একটু। আমি ছোটকে নিয়েই আসি গিয়ে। আসলাম ওর হ্যাণ্ডব্যাগ আর রাইফেলটা উঠোনের শিউলি গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

আসলাম ততোক্ষণে বোধহয় অর্ধেক পথও যায়নি—দূরে জীপের ইঞ্জিন গর্জে উঠলো। চমকে উঠলেন গোলাম রসুল। আঁধারে নড়ে উঠলো দুলালের ছায়া-শরীর। সে আশ্বস্তের মতো বললোঃ যাক। ব্যাটারা ফিরে যাচ্ছে এবার। গাঁ-টা আগুনের হাত থেকে বেঁচেও যেতে পারে হয়তো!'—গোলাম রসুল দেখলেন—সত্যি, হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় মেম্বারবাড়ির গাছ-গাছালি আর ঝোপঝাড়গুলোকে যেন ঝলসে দিয়ে আঁকাবাঁকা মেঠো-রাস্তায় নেমে গেলো জীপ দু'টি। তারপর গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে উঁচু নিচু রাস্তায় এগিয়ে শহরের দিকে না গিয়ে উল্টো দিককার মাঠ-বরাবর ছুটলো। আশ্চর্য! গোলাম রসুল বুঝতে পারলেন না, ওদিকে ওরা যাচ্ছে কোথায়! ওদিকে তো বিরাণ প্রান্তর—তেপান্তরের মাঠ। মাঠের পরে নদী। তাইতো, ওরা ওদিকে যাচ্ছে কেন? নিচু স্বরে দুলাল বললোঃ কী ব্যাপার। ব্যাটাদের মতলব কি? জবাবে গোলাম রসুল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মুখের ওপর তীব্র আলোর ঝলকানিতে চমকে উঠে থেমে গেলেন। দুলাল বললোঃ চাচা সর্বনাশ। আর্মিরা এই দিকেই এগিয়ে আসছে! হ্যাঁ হ্যাঁ এই বাড়ির দিকেই। ওই তো গাড়ির মুখ ঘুরেছে। শিউলী গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা আসলামের রাইফেল আর ব্যাগটা এক ঝট্‌কায় তুলে গোলাম রসুলের হাতে দিয়ে দুলাল এক দৌড়ে বাড়ির পেছনকার জংলা জায়গাটায় চলে এলো। গোলাম রসুলও বিব্রত অবস্থায় অনুসরণ করলেন দুলালকে। যা ভেবেছেন, তাই। ঝুপ্‌সি আমগাছের নিবিড় জঙ্গলে, কচু ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা গেলো, জীপ দুটো তাঁরই বাড়ির সামনে এসে থেমেছে। হেডলাইট নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠলো কয়েকটা টর্চ। শক্তিশালী

বিজলী-মশালের চড়া আলোয় ফালা ফালা হচ্ছে ঘনায়মান অন্ধকার। এতো দূর থেকে এদের কথাবার্তা কিছুই শোনা যায় না। টর্চের চঞ্চল আলোয় দশ বারোজন খাকি ইউনিফর্ম পরা সৈন্যকে দেখা গেলো দ্রুতপায়ে ছোটাছুটি করতে। সবার হাতেই রাইফেল আর স্টেনগান।

হঠাৎ দখিনা-হাওয়ায় ভেসে এলো কাঁচা পেট্রোলের তীব্র ঘ্রাণ! শির শির করে উঠলো গোলাম রসুলের সারাটা শরীর। তাঁর আর বুঝতে বাকি রইলো না যে মিলিটারীরা তাদের বড়ো দুশ্‌মনের আস্তানাটির খোঁজ পেয়েছে। বিপদজনক রাজনৈতিক দলের স্থানীয় সদস্যের বাড়ি হাজার মাইল দূর থেকে আসা সৈন্যদের চেনার কথা নয়। কীভাবে এটা সম্ভব হয়েছে—তা বুঝতে কি আর দেরী হয়? মধু মেম্বারের লোভাতুর মুখ আর হিংসাকুটিল চোখ দু'টি মনে পড়ে গেলো গোলাম রসুলের। মনে পড়লো, মাত্র ক'দিন আগে জঙ্গী-ছাত্রদের রোষ থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন মধু মেম্বারকে। তার প্রতিদান এই? সারা বাড়িটায় প্রায় একসঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলে দু'চোখে ঝরঝর করে পানি এসে গেলো গোলাম রসুলের। তিন পুরুষের ভিটেবাড়ি। বাপদাদার কতো শ্রম আর যত্ন দিয়ে গড়া। দাউ দাউ করে জ্বলছে। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে মজবুত টিনের ঘরগুলো। কেমন যেন মোহাচ্ছন্নের মতো, ভূতগ্রস্তের মতো পিছিয়ে এলেন গোলাম রসুল, দুলালের হাত ধরে, প্রায় টলতে টলতে। আসলামের রেখে-যাওয়া রাইফেল আর ব্যাগটা তার কাছে এতো ভারি মনে হচ্ছে, যেন হাত দু'টো ছিঁড়ে পড়বে!

অন্ধকার খালপাড়ে আসতে না-আসতেই আসলামের দেখা পেয়ে গেলেন ওঁরা। আসলাম খুব দ্রুত, অথচ নিঃশব্দে ছুটে এসেছে। খুব হাঁফাচ্ছে এখন সে। বললোঃ মধু মেম্বার বেঈমানী করেছে। কেবল আপনার বাড়িটাই দেখিয়ে দেয়নি আরো এক সর্বনাশ করেছে সে।

ঃ আসলাম—। —প্রায় অভিভূতের মতো বলে উঠলেন গোলাম রসুল—বাড়ি গেছে যাক; কিন্তু ছোট? ছোটকে যে নিয়ে এলে না—?

আসলাম গোলাম রসুলের কাঁপা কাঁপা হাত দু'টি সজোরে চেপে ধরে বললোঃ চাচা, আপনি ঘাবড়াবেন না। আপনি কিন্তু একটুও ঘাবড়াবেন না। ছোটকে চিনিয়ে দিয়েছে মধু মেম্বার। ওরা ছোটকে নিয়ে এসেছে কেবল বাড়িটা দেখিয়ে দিতে। মেম্বারের এক বুড়ো কামলার কাছে চুপে চুপে গিয়ে তো তাই-ই শুনে এলাম। এই দুধের বাচ্চাকে আর কি করবে ওরা? দোহাই চাচা আপনি চিন্তা করবেন না।

কিন্তু কোনো কথা না-বলে, একটুও শব্দ না-করে গোলাম রসুল দু'হাতে মাথা চেপে মাটিতে বসে পড়লেন। দূরে বাড়িটা পুড়ছে। ঠাস ঠাস শব্দে ফাটছে জ্বলন্ত কাঠকুটো—ছিপি আঁটা শিশি বোতল। আগুনের লকলকে জিহ্বা সম্পূর্ণ বাড়িটা খেয়ে ফেলে এখন যেন একটু স্তিমিত, নিস্তেজ। আরো দূরে নদীর ওপারেও কোনো অগ্নিশিখা আর চোখে পড়ে না! হয়তো ধোঁয়া সেখানে এখনও উঠছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তো ধোঁয়া দেখা যায় না। বাড়িটা প্রায় ভস্মস্তূপে পরিণত হবার পর আর্মিরা আবার জীপে উঠে পড়লো টপাটপ। এতোটা তফাৎ থেকে ওদের ভালোভাবে দেখাও যায় না। সঙ্গে ছোট আছে কিনা—তা-ও বোঝবার উপায় নেই। বোধহয় গাড়ির ওপর বসে রয়েছে। কাঁদছে অথবা ছটফট করছে।

এদের তিন জনকে আরো বিমূঢ় করে দিয়ে জীপ দুটো শহর-মুখো না-হয়ে মধু মেম্বারের বাড়ির দিকেও না-গিয়ে মাঠের মাঝখানে, যেন লাফ দিয়ে নামলো।

তারপর কি হলো? না, পরের ঘটনা খুব বিস্তারিতভাবে বলার দরকার নেই। রোকনপুর গাঁয়ের পুব-প্রান্তের পুরনো বটগাছের নিচে এসে মিলিটারীরা ছোটকে জীপ থেকে নামিয়ে

দিয়েছিলো। বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো একজন—দুশমান কা আওলাদ। আভি যাও। ভাগো হিঁয়াসে। ঘর খতম্ হো চুকা। আভি বাংলাদেশ মে চলা যা—ভাগ্!—

ছোট কিন্তু এসব কথা বুঝতে পারলো না। কেবল বাংলাদেশ শব্দটাই বুঝলো। আরো অনুমান করলো, এরা তাকে এক্ষুণি এখান থেকে চলে যেতে বলছে। সে ভয়ে ভয়ে চারদিকের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার দেখলো। তারপর জীপের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে অনেক দিনের চেনা বটগাছের নিচ দিয়ে ছোট ছোট পায়ে দৌড় দিলো। কিন্তু পনেরো ষোলো গজ ছুটে যেতেই বিদ্ঘুটে—ডারা—রা-রা শব্দে চমকে উঠলো দশদিক। সঙ্গে সঙ্গে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর নেতিয়ে পড়লো হাফপ্যান্ট পরা, গেঞ্জি গায়ে ছোট্ট ছেলেটির দেহ। তার ছোট্ট পকেট থেকে ছিট্কে পড়লো একটা গুলতি আর তিনটে ম্লান মার্বেল।

বটগাছের অজস্র পাতার ভীড়ে পাখিরা তখন নিশ্চুপ। ঝিঁঝিরা নীরব। জোনাকিরাও ফেরার। তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ বেজে উঠলো হঠাৎ। হাসির হর্‌রা উঠলো দু'তিনবার! তারপর মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে দু'টি আততায়ী জীপ কাঁচা রাস্তায় গিয়ে উঠলো।

বলা দরকার, জীপ দু'টো জেলা বোর্ডের রাস্তার ওপর আচমকাই আক্রান্ত হয়েছিলো। রাইফেলের চোরাগোপ্তা গুলিতে টায়ার ফেটে উল্টেও গিয়েছিলো একটা জীপ। হতভম্ব এবং ভীত সন্ত্রস্ত সৈন্যরা হতাহত সঙ্গীদেরকে টেনে হিঁচ্ড়ে অন্য জীপটায় তুলে বৃষ্টিধারার মতো ব্রাশ-ফায়ার করতে করতে পিছু হটে গিয়েছিলো। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় আর কিছু করার ছিলোনা দুলাল এবং আসলামের। অর্ধমূর্ছিত গোলাম রসুলকে ধরাধরি করে দ্রুত পায়ে নদীর দিকটাতে পিছিয়ে যেতে হয়েছিলো ওদের।

তোমরা যদি কখনো রোকনপুর যাও—সেই গুলিবিদ্ধ বটগাছটা এখনো দেখতে পাবে। কিন্তু ছোট্ট ছেলে ছোটর ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া শরীর থেকে ছিট্কে পড়া রক্ত আজ আর দেখতে পাবে না। আঁতিপাঁতি করেও খুঁজে পাবে না একটি বিষণ্ণ গুলতি কিংবা তিনটে রাঙা মার্বেল। বারোটা বছর তো কম সময় নয়—! রক্তের দাগ কি এতোদিন থাকে?
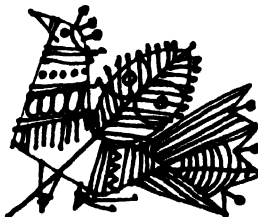
রানুর দুঃখ, ভালোবাসা

মাহমুদ আল জামান

ঝিরঝির বাতাস বইছে।

ফর্সা হয়েছে অনেকক্ষণ।

কদিন থেকে সাতরাজ্যির ঘুম রানুর চোখে। টেনেও সে চোখ খুলতে পারে না। বিছানায় শুয়ে রানু টের পেয়েছিল বাড়িটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। সে কিছুতেই চোখ খুলতে পারেনি। ঘুম এসে জাপটে ধরে রাখে ওর চোখ দুটো।

কিছুক্ষণ আগেও রানু টের পেয়েছে মা এসেছে এ ঘরে। জানালাটা খুলতে খুলতে আস্তে আস্তে ডাকছে। রানু ওঠো, সকাল হয়েছে।

দু একবার ডেকে গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে, রানুর শরীরে আবার জ্বর উঠেছে কি না? চোখ খুলেছিল রানু। এপাশ ওপাশ করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও টের পায়নি।

ঘুম ভেঙেছে তার বেশ কিছুক্ষণ পরে। তখন আটটা দশ মিনিটের ডাউন ট্রেনটা কুক কুক ঝিক ঝিক করতে করতে বেরিয়ে গেছে। চোখ খুলে দেখেছে বারান্দায় লম্বালম্বিভাবে রোদ এসে পড়েছে। উঠোন জুড়ে হই হই করে খেলছে বেনু আর কামাল। রেডিওতে খবর পড়ছে। বাবা অফিসে যাবার আগে তৈরি হবেন এখন ধীরে সুস্থে। বাবা খবর শুনছেন আর বলাবলি করছেন, শেষ রক্ষা হল না। দেখ, ছেলেরা যেভাবে ক্ষেপেছে কিছু না একটা হয়েই যায়!

মা বললেন, ছেলেদের দোষ কি? দাবি মেনে নিলেই হয়।

তুমি কি যে বল! দাবি কি সহজে কেউ মানে। দেখ না রেডিওতে কি বলছে।

রেডিওতে তখনও খবর শেষ হয়নি। রেডিও বলছে—ঢাকা সে যো জং চাল রাহা উসসে পাকিস্তান কা দুসমান লোক বহুতই তাগাদা দি যা রাহি। হুকুমতে পাকিস্তান কা উজিরে আলা নে বোলা এ জং মে কোই মদদ না দে।

রানু শুয়ে ছিল। দেখল বাবা রেডিওর নবটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন ধরতে চাইছেন। বাবার মারফি রেডিওটা পুরানো। শত চেষ্টা করার পর কখনো কখনো অন্য ষ্টেশন ধরা যায়। বেশিক্ষণ ধরে নব ঘোরালে বিকট একটা শব্দ হয়। বাবা ছাড়া অন্য কেউ এ রেডিও চালাতে পারে না। বাবা এদিক ওদিক করে গান শোনেন। খবর শোনেন। অফিসে যাবার আগে খবর শোনা বাবার অনেকদিনের পুরানো অভ্যেস।

বাবা যখন গোছল করতে যাবেন তখন কুয়োতলা থেকে একটু পরেই বাবার গুণ গুণ গান শোনা যাবে। মার সঙ্গে এটা-সেটা কথা বলবেন। তারপর গা মুছে টানা ছোট্ট বারান্দায় বাবা গরম ভাত খেতে বসবেন।

এখনো ওর চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম। আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় উঠে বসল সে। ক্র্যাচটা খাটের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। ক্র্যাচটা দেখলেই রানুর দুঃখ-কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। উথলে ওঠে। পা দুটো ব্যথায় শিরশির করতে থাকে। কাল বিকেলে ওর ব্যথাটা বেড়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে মা ওকে ওষুধ খাইয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল। সে জানে, মা এখন প্রায়ই কাঁদে। সময় নেই, অসময় নেই ওর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। সন্ধ্যায় ডাক্তার কাকা এসেছিলেন। কালো ব্যাগ থেকে থার্মোমিটার বের করে বলেছিলেন, জিব দেখি রানু! হাতের কব্জি ধরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, না জ্বর নেই। তুমি তো ভালই আছ। কোন ভয় নেই। খেলবে আর দৌড়ুবে।

ডাক্তার কাকার কথায় বুক ফেটে যাচ্ছিল রানুর। সে দৌড়ুবে। পায়ের পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। পায়ে বল নেই। আগের মতো দৌড়ু-ঝাঁপ দিতে পারে না সে। বুকটা ওর এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় থেকে থেকে। কাকে বলবে সে ওর দুঃখের কথা, কে শুনবে ? সবাই কেমন করে যেন ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডাক্তার কাকা অনর্গল কথা বলছিলেন। কোন কথাই রানুর কানে যাচ্ছে না। পাচিল ঘেঁষে ছোট্ট একটা বাগান করেছে বাবা। দূরের সব রাস্তা আলোতে দেখা যায়। আমগাছের ডালে বসেছে দুটি শালিক পাখি। আর চাপা কেমন নিবিড় গন্ধ বেরুচ্ছে। সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সেই ছোট্ট শালিক পাখি দুটির দিকে।

দুই

দু মাস থেকে রানু ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটে। এ-ঘর ও-ঘরে যায়। মাঝে মধ্যে মনটা বিষিয়ে থাকে।

ওর ঘরের খোলা দরজা দিয়ে উঠোন দেখা যায়। সে দেখল পূব দিকের খোলা জানালা দিয়ে এক চিলতে সকাল বেলার নরম সুন্দর রোদ এসে পড়ছে। কুয়োতলায় বাবা গোছল করছেন আর তাঁর সেই গানটা গুন গুন করে গাইছেন। উঠোনে রোঁয়া ওঠা কুকুরটা কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। থলে হাতে বাজার থেকে ফিরছে আজিজ।

কুয়োতলার একটু দূরের শ্যাওলা ধরা পাচিলের গা ঘেঁষে সেই বাগান। কতগুলো গাছ অযত্নেও বড় হয়ে উঠছে। অনাদরেও বেড়ে উঠছে। দেয়ালের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে অশোক গাছ। দুটো দেবদারু, গোলাপ আর হাস্নু হেনা।

বাতাসের সঙ্গে অশোকের পাতাগুলো কাঁপছে। ছোট্ট বাগানে ফুল ছিল না, কদিন থেকে অশোক গাছে ফুল ফুটছে। ঝিরঝির শিরশির কোমল বাতাসের সঙ্গে এ ফুল দ্বিগুণ আবেগে ফুটছে। ছোট এ ফুলের চাপা সুবাস রানুর খুব প্রিয়। এ ফুল যখন ফোটে তখন ওর রং হয়ে যায়

কমলা। কিন্তু বাসি হলেই ফুলের রং হয়ে যায় লাল।

রানু অশোক গাছটির পাতাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল।

ওর ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। সে এলোমেলো ভাবে এসব দেখছে আর ভাবছে। ও বাড়ির আম গাছে বসে একটা কাক ডেকে চলছে মরিয়া হয়ে।

ওর সাড়া পেয়ে মা এলেন একটু পরে। বললেন, চল রানু, মুখ হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নে। ওষুধও খেতে হবে।

মা রানুকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন কুয়োতলায়।

টানা বারান্দায় মাদুর পেতে রুটি আর দুধ খেল সে বাবার সঙ্গে।

বাবা রানুর কপালে হাত রেখে বললেন, জ্বর তো আর আসেনি। ভয় নেই। ইনজেকশান লাগবে না। কদিনেই ভাল হয়ে উঠবি মা। হাসপাতাল থেকে মালিশ করার জন্য তোকে যে ওষুধ দিয়েছে রোজ মালিশ করলে তুই সেরে উঠবি।

বাবা ভাত মাখেন আর এটা-সেটা বলেন। মুখে ভাত তোলেন না। কেমন যেন লাগে ওর।

মা বললেন, একটু ডাল দি। এ তরকারিটা মুখে তোলনি। নাও একটু।

রানু উঠতে চায়।

বাবার ইউনিভারসিটি যাবার সময় হয়ে আসছে।

বাবা বললেন, বোস রানু, বোস। বাবা ভাত খান আর রানুকে চেয়ে দেখেন।

বারান্দার এককোণে মাদুরে বসে বেনু আর কামাল পড়ছে। মা না পড়ালে কামাল কিছুতেই পড়ায় মন বসায় না। এদিকে সে হা করে চেয়ে আছে। শ্লেটে আঁক কষছে, বেনুকে ভেংচি কাটছে।

রানু মাদুর থেকে উঠে বেনুর কাছে সরে এল। ক্র্যাচটা পাশে রাখতে গিয়ে দেখল কামাল শ্লেটে হিজিবিজি আঁক কষছে।

রানুর খুব ইচ্ছে হল আবার বইপত্তর ঝেড়ে সাফ করে পড়তে বসতে। গোছগাছ করে স্কুলে যেতে। কিন্তু পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে ওর মনটা সত্যিই বিষিয়ে গেল। ওর মনে হল পায়ের গোড়ালি আবার ব্যথায় টনটন করে উঠছে। সে কাছের ব্যাগ থেকে একটা বই টেনে নিল। উল্টে পাল্টে দেখল। বছর খানেক আগেও সে স্কুলে গিয়েছিল। কি সুন্দর ছিল ওর স্কুল বাড়িটা! ক্লাশ টিচার মরিয়ম আপা ওকে খুব আদর করতেন। সুন্দর করে পড়া জিজ্ঞেস করতেন। সুন্দর আর মিষ্টি করে কথা বলতেন। মরিয়ম আপা ছিলেন স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে আলাদা। কবিতা পড়া আর বোঝাবার ভঙ্গিটি রানুর মনের মধ্যে লেগে আছে। এখনও চোখ বন্ধ করলে খুব সহজে সে মরিয়ম আপাকে দেখতে পায়।

পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে মরিয়ম আপা কত রাজ্যের যে গল্প বলতেন তার শেষ নেই। কত রূপকথা, মিষ্টি ছড়া আর কেমন করে দেশের আর বিদেশের মহৎ মানুষেরা বড় হয়ে উঠেছে—সেসব খুব সহজ করে সুন্দর করে বলতেন।

ওর স্কুলের জন্য খুব দুঃখ হয়। স্কুলের সেই পুরানো বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে। কতদিন সে আর রাহেলা স্কুলের মাঠে ছোটাছুটি করেছে। খেলার মাঠের কাছেই ছিল ঘন জঙ্গল। একটা বড় কচুর ক্ষেত, দুটো কৃষ্ণচূড়ার গাছ। বুনো গন্ধে মনটা ওর সত্যি ভরে যেত।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন গাছের সারিতে ফুল ধরেছে তখন কতদিন সে ক্লাশে বসে এই গন্ধ নিবিড় গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়েছে। শুধু শুধু তাকিয়ে থেকেছে। কী রং যে ফুলের! সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের লাল ফুলের দিকে তাকিয়ে কী যে হত সে এখন বলতে পারবে না। কখনও সে দেখত ঘন জঙ্গলের মধ্যে থোকা থোকা কৃষ্ণচূড়া পড়ে আছে।

বর্ষাকালে অবিরাম ঝর ঝর বৃষ্টির মধ্যেও কাকেরা সারি বেঁধে বসে থাকত এই গাছগুলোতে। দুপুর বেলা টিফিনের পরে সারা স্কুল বাড়িটা যখন ঝিমিয়ে যেত ওর মনে হত আর কখনও চেয়ে চেয়ে দেখত দুটো কাক মাঝে মাঝে কথা বলছে। গত বসন্তকালেও সে কোকিলের মিষ্টি ডাক শুনেছিল। জানালার বাইরে চোখ রেখে নিঃশব্দ, নিঝুম দুপুর বেলা সে দেখছিল ঝাঁ ঝাঁ রোদ। কৃষ্ণচূড়া গাছের মধ্যে কোথাও কোকিল বসে আছে আর মিষ্টি সুরে ডেকে চলছে। স্কুল বাড়িটা টিফিনের পর ঘুমোচ্ছে নয় ঝিম ধরে আছে। এই ঝিম ধরা নিঃঝুম পরিবেশে রানু নিজেকে খুব অসহায় ভাবত, কখনও খুব ভাল লাগত।

আজ রানুর স্কুলের কথা খুব মনে পড়ল, থেকে থেকে সে ভাবল। একটু সরে সে দেখল বাবা দামী কাপড় পরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

যাবার আগে কি যেন বলল বাবা। চশমার কাঁচ মুছল। মা কি যেন বলতে চাইল। বাবা বললেন, থাক। রানুকে বাবা বলল, রানু শোন মা। মনে করে ওষুধ খেয়ো। দুপুরে পারলে ঘুমিও, মালতী যে বইটা দিয়ে গেছে পারলে সেটা উল্টে পাল্টে দেখ।

রানু বলল, আচ্ছা বাবা। তাড়াতাড়ি ফিরো।

আচ্ছা মা। আচ্ছা।

বাবা ইউনিভারসিটি চলে গেলে বাড়িটা দেখতে দেখতে ঝিমিয়ে এল। ওর মনে হল পা সামান্য ব্যথা করছে। সে বিছানায় চলে এল।

খানিক পরে মা এঘরে এসে বলল, রানু সকালের ওষুধ খাওয়া হয়নি। নাও এ ওষুধ।

ছোট্ট গ্লাসে ওষুধ হাতে নিয়ে মা দাঁড়িয়ে। ওর খুব তেতো আর বিস্বাদ লাগে এ মিক্‌চার। রানুর এতটুকু ভাল লাগে না খেতে। তবুও সে মায়ের হাত থেকে গ্লাসটি তুলে নিয়ে ঢক করে ওষুধ খেল।

হাত বাড়িয়ে মা ভেজানো জানালাটা পুরো খুলে দিল।

বাইরে রোদ।

তেরচা হয়ে রোদ এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

একটু পরে বেনু আর কামাল স্কুলে যাবে।

রানু জানালা দিয়ে দেখল ওরা দুজন বারান্দায় বসে ভাত খাচ্ছে। সামনের বড় রাস্তায় কোন এক অন্ধ ভিখিরি ভিক্ষে চাইছে। টুংটাং ঘণ্টা বাজিয়ে রিক্‌সা যাচ্ছে। রানু এ ঘরে বসেও টের পায়। এঘর থেকে গলিটা দেখা যায়। গলি থেকে সামান্য দূরে বড় রাস্তা, একটু পরেই সামনের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াল। রাস্তাটা এবড়ো থেবড়ো। প্রতিদিনই ঘোড়ার গাড়িটা হেলতে দুলতে চলে আসে বাড়ির সামনে। গাড়িটা থামলে ভেতর থেকে নেমে আসে স্কুলের আয়া। চেঁচিয়ে বলে, আপা গাড়ি আইছে। স্কুলে চলেন।

ঘোড়ার গাড়িটাকে খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। পাশের বাড়ির যোবেদা আপা তৈরিই থাকেন। সাড়া পেলেই বেরিয়ে আসেন। গাড়ির খিরকিও তোলা থাকে। বাইরে থেকে ভেতরের কাউকে চেনাও যায় না, দেখাও যায় না। আপা গাড়ির দরজা বন্ধ করলেই গাড়ি চলতে থাকে। ঘোড়া দুটোর পিঠের ওপরে কোচোয়ানের চাবুক পড়ে।

ঘোড়ার গাড়ির চাকার ঘড় ঘড়, ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ মিলিয়ে গেলেই সবকিছু আবার কেমন ঝিমিয়ে আসে। বড় রাস্তা থেকে ভেসে আসে ফেরিওয়ালার হাঁক। সাইকেল রিক্‌সার টুংটাং। কখনো শোনা যায় চামড়ার ব্যাগ ভর্তি পানি নিয়ে ভিস্তি হামুদ মিয়া কার উদ্দেশ্যে যেন কথা বলছে। লোকটা দেখতে রোগা, কালো। পটকা শরীর। দেখলে মনে হয় শরীরে এতটুকুন বল নেই। শরীর একটুতেই ভেঙে যাবে। রানু অবাক হয়ে যায় যখন দেখে এরকম পটকা শরীর নিয়ে সারাদিন লোকটা কলতলা থেকে চামড়ার ব্যাগ ভর্তি পানি নিয়ে যাচ্ছে। আর কার উদ্দেশ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলছে। চামড়ার ব্যাগ কাঁখে নেবার সময় ওর শরীর খুব সহজেই বেঁকে যায়। রানুর মনে হয় লোকটা খুব রাগী আর গম্ভীর। ওদের বাড়িতে লোকটা যখন খাবার পানি দিতে আসে তখন এত তাড়াহুড়ো লাগায় যে মাঝে মধ্যে মা খুব বিরক্ত হন। বাড়িতে এসেই বলে, কই পানি লন। তাড়াতাড়ি করেন।

মা বলেন, এত তাড়াহুড়ো কেন তোমার হামদু মিয়া।

কত কাম পইরা আছে। তাড়াহুড়া না করলে চলব কেমনে।

লোকটার গোঁফ আছে। প্রথম প্রথম খুব ভয় পেত রানু। একদিন সে হামদু মিয়াকে হাসতে দেখে ভয় ভেঙে গিয়েছিল। হামদু মিয়া যখন গোঁফের ফাঁক দিয়ে হাসছিল তখন ওকে খুব ভাল মানুষ মনে হয়েছিল।

রাস্তায় একদিন বানর নাচিয়ে চলছে একটা লোক। হামদু বানর দেখছিল আর হাসছিল। সে কি হাসি! রানুর সেদিন এ দৃশ্য দেখে হামুদ সম্পর্কে ভয় ভেঙে গিয়েছিল।

তিন

একটু পরেই সিটি দিতে দিতে কুক কুক ঝিক ঝিক করতে করতে বেরিয়ে যায় আরেকটি ট্রেন। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে আকাশে। ট্রেনটি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই আসবে দুধ দিতে গোয়ালা।

ট্রেনটি বেরিয়ে যাচ্ছে, বিকট ঝিক ঝিক শব্দ উঠছে মাটি কাঁপিয়ে। জানালার সামনে দাঁড়ালে রেলগাড়িটিকে স্পষ্ট দেখা যায়।

রানু কতদিন জানালায় দাঁড়িয়ে এমনিভাবে রেলগাড়ি দেখেছে।

গতকাল বিকেলে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়েছিল। একটু মেঘ করেছিল আকাশে, খানিক পরেই মেঘ কেটে গিয়েছিল। মেঘ কমে যাবার পরেই সামনের গলি থেকে জাহানারা এসেছিল।

জাহানারা খুব চঞ্চল। স্কুলে খুব ভাব হয়েছিল ওর সঙ্গে। ওরা দুজন একসঙ্গে স্কুলে যেত আর ফিরত। বছর খানেক আগে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে দুজনের মধ্যে ভাব বেড়ে গিয়েছিল।

রানু এখনো চোখ বন্ধ করলে একটি দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পায়। হাসপাতালের বেডে রানু শুয়ে আছে। দুপুরে ইনজেকশান দিয়েছে নার্স। ইনজেকশান দিয়ে বলেছে ঘুমোও তো, ব্যথা এক্ষুণি সেরে যাবে। কিন্তু ওর চোখে ঘুম আসেনি। হাসপাতালের কেমন যেন ওষুধ ওষুধ গন্ধ, ডাক্তারদের চলাফেরা, ফিসফাস কথাবার্তা সবকিছু ওর মনে এক অজানা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আলাদা পরিবেশে কেবলই ওর মনে হত এখানে এলেই মানুষ মরে যাবে।

ওর মনে পড়ল দোতলার বিরাট জানালা। এখানে চোখ রাখলেই বাইরের সারি সারি গাছের ভেতর থেকে আকাশ দেখা যায়। রাস্তায় সারি সারি শিরীষগাছ। এ ওর গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুপাশের গাছের সারির মধ্যে থেকে ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলছে। রিক্সা যাচ্ছে আর ইউনিভারসিটির ছেলেরা গল্পগুজব করে চলেছে।

রানু দোতলার সেই বিশাল জানালা দিয়ে আকাশ দেখত। কখন যে চোখ চলে যেত রাস্তায়, সে ভেবেও পেত না। রাস্তার মানুষজনকে মনে হত বড় বেশি ব্যস্ত। কেবল ছুটছে তো ছুটছে। কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

প্রথম যেদিন সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সেদিন সে খুব ভয় পেয়েছিল। রানুর সঙ্গে মা ছিলেন সারাক্ষণ ছায়ার মতো। তবুও ওর মন থেকে ভয় এতটুকুও সরেনি। এখনও হাসপাতালের প্রথম দিনের কথা মনে হলে ওর সারা শরীর ও মন কেমন যেন হয়ে যায়।

প্রথমদিনেই ওর বাবার সঙ্গে জাহানারা এসেছিল। রানুর হাতে ইনজেক্শানের ব্যথা। মা আর বাবা মাথার কাছে বসে সারাক্ষণ রানুর সঙ্গে গল্প বলেছে।

জাহানারা হাসপাতালে এসেই কেঁদে ফেলেছে। রানু ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কোন কথা বলেনি। শুধু চেয়ে দেখেছে। সেদিন সে খুব অবাক হয়েছিল।

বাবা বলেছিল, কাঁদছ কেন জাহানারা? খুব তাড়াতাড়ি রানু ভাল হয়ে উঠবে। আবার তোমরা একসঙ্গে স্কুলে যাবে।

সে তখন বিছানায় শুয়ে। বাবাকে, মাকে আর জাহানারাকে খুব সুন্দর লাগছিল তার। সে কোনদিন ভাবেনি জাহানারা রানুকে এত ভালবাসে।

হাসপাতালে প্রথম দিন রাতে সে অদ্ভুত সব হিজিবিজি স্বপ্ন দেখেছে। সে স্বপ্নগুলোর কোন মাথামুণ্ডু নেই। কোন সুরু নেই, শেষ নেই। শেষ রাতে এই সব এলোমেলো স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে খুব গোঙাচ্ছিল। একটা দৈত্য বুড়ো ওকে ধরার জন্য ছুটে আসছে, বাবা পালাচ্ছে আর মা দৌড়ুচ্ছে।

মা ওর গোঙানি শুনতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেছিল বিছানায়। ঘুম ভাঙিয়ে বলেছিল, রানু এই যে আমি। কি হয়েছে?

সে চোখ খুলে মাকে দেখতে পেয়ে খুব আশ্বস্ত হয়েছে। অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলতে পারেনি। অপলক চেয়েছিল সে। মা ওকে বুকে জড়িয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেছে, রানু এই তো আমি। রাত এখনো অনেক বাকি। ঘুমাও মা, ঘুমাও।

ভোরবেলা এক পশলা ঝিরঝির বৃষ্টির পর আকাশে মেঘ জমেছিল। জানালায় চোখ রেখে সে দেখেছে আকাশে সাদা মেঘ এদিক থেকে ওদিকে ভেসে চলেছে।

দুরের বড় রাস্তাটা বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ঘোড়ার গাড়ি চলছে। তেমন গতি নেই, মন্থর।

রিক্‌সা চলছে। মানুষজন তেমন নেই। দু-একজন রাস্তার ধার ঘেঁষে হেঁটে চলছে। আজ সে এইসব মনে করতে গিয়ে চোখের সামনে এলোমেলোভাবে অনেক কিছু দেখল।

চার

হরিঘোষ এ বাড়ির বাঁধা গোয়ালা। রানু বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারল দুধওয়ালা এসেছে। মা ওর সঙ্গে কথা বলছে। কালকের দুধে অনেক বেশি পানি ছিল সে জন্য সর পড়েনি দুধে। মা বলছে, হরিঘোষ কোন কথা বলছে না। মেপে দুধ দিচ্ছে আর কোন কথা না বলাতে মা আরো বিরক্ত।

শোন, এভাবে চললে সামনের থেকে দুধ দিও না। তোমাকে বিশ্বাস করি বলে তুমি এমন করবে এ ভাবতে পারিনি।

ঠিক আছে, এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। জল আর মেশাব না।

গোয়ালা, চলে যাবার পর পুরো বাড়িটা আবার ঝিমিয়ে পড়ল। সব কিছু তেমনি, কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ নেই। গলির মোড় থেকে এক ফেরিওয়ালা হেঁকে চলছে চাই চুড়ি, রিবন ফিতা। চাই চুড়ি।

মা টানা বারান্দায় বসে তরকারি কুটছে। লাউ, আলু আর পটল।

একটু পরেই মালতী দিদি এল। মা বলল, এস মালতী কি খবর? তোমরা ভাল তো?

হ্যাঁ। রানু কেমন আছে?

ভাল। কাল ব্যথা উঠেছিল। আজ ভাল আছে। যাও না ওর কাছে। তোমাকে পেলে মেয়েটা ভাল থাকে।

যাই। সেই সকাল থেকে আসব আসব করছিলাম। কিছুতেই সময় করতে পারিনি।

রানু দেখল কথা বলতে বলতে টানা বারান্দা পেরিয়ে এ ঘরে এসে পড়েছে মালতী দিদি।

এইমাত্র স্নান করে এসেছে। চুল থেকে মৃদু সুগন্ধ ঝরে পড়ছে। মালতী দিদির হাসিতে কি যেন লেগে থাকে সব সময়। এত ভাল লাগে রানুর এ চাপা হাসি যে ভাবা যায় না। সুন্দর চেহারা, সুন্দর মুখশ্রী। মালতী দিদি বলল, কি করছিলে? তুমি তো দেখছি খুব ভাল আছ। আর কটা দিন পরেই তো তুমি ভাল হয়ে উঠবে। কোন চিন্তা নেই।

মালতী দিদির চাপা হাসির মধ্যে একটা দুঃখ, একটা যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে। রানুকে কেউ কোনদিন সেসব কথা বলেনি। সে বড়দের আলাপ থেকে বুঝেছিল; কিছুটা শুনেছিল। কখনো কখনো মা আর বাবা যখন এ নিয়ে আলাপ করেন তখন মালতী দিদির জন্য ওর ভালবাসা আরো বেড়ে যায়। বাবা প্রায়ই মাকে বলেন, মেয়েটির জন্য দুঃখ হয়। এমন করে কেউ মরে যায়। কি ভাল মানুষই না ছিলেন বারীন কাকা আর ইলা মাসীমা। তোমার মনে নেই সেই যে পূজোর সময় ওরা দেশে গেলেন বাড়ির চাবি আমাদের হাতে দিয়ে। দেশ থেকে ফেরার সময় কত কি যে নিয়ে এলেন। আমাদের বেনুর অসুখের সময় কি না করেছেন ওরা।

বারীন কাকা আর ইলা মাসীকে ঠিক স্পষ্ট মনে পড়ে না। আবছা অস্পষ্ট কিছু স্মৃতি মনের মধ্যে গেঁথে আছে।

মায়ের সঙ্গে সে যেত মালতী দিদির বাড়ি। খুব সুন্দর ঝকঝকে মেঝে। লেপামোছা নিকানো উঠোন। ইলা মাসীর নিজের হাতে তৈরি করা ছিমছাম বাগান। কোথায়ও কোন আবর্জনা নেই, এতটুকুন ময়লাও পড়ে নেই। পুরো বাড়িটাকে মনে হত ফ্রেমে বাঁধা একটা ছবি।

বারীন কাকার বৈঠকখানায় দুনিয়ার সব বই। ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি করে সব সাজানো। বারীন কাকা খুব কম কথা বলতেন। বাবার সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব ছিল। সন্ধ্যায় আড্ডা জমে উঠত ওর বৈঠক ঘরে। ওদের বাড়িতে তিনি এসেছেন কিনা ওর মনে পড়ে না। কিন্তু ইলা মাসীমা সন্ধ্যার পরে মার সঙ্গে গল্প করতে আসতেন।

মা আর ইলা মাসীমার মধ্যে খুব ভাব জমে উঠেছিল। ইলা মাসীমার সঙ্গে মার এই মেশামেশি পাড়ার আজিজা আপা একদম পছন্দ করতেন না, কেমন আড়চোখে দেখতেন। এ বাড়িতে বেড়াতে এলে প্রায়ই বলতেন, আচ্ছা ভাবী তুমি মানুষটা কেমন বলত। তোমার দেখি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। তুমি মালতীর মার সঙ্গে এত মেশ কেন বলত। আর রানুর বাপ যে কেমন ধারা মানুষ বুঝি না, শুধু বারীন বাবুর সঙ্গে সারাদিন গল্প, তর্ক আর গুজুর গুজুর।

তাতে কি! ওরা তো খুব ভাল মানুষ। বারীন বাবু বিদ্বান।

দিনকাল খারাপ। সে জন্যই তো বলছি। তোমরা শুধু শুধু বিপদ বাড়াচ্ছ। কখন যে কি হয়ে যায়! দেখছ না কাগজে কত ফলাও করে রায়টের কথা লিখেছে।

সে তখন বারান্দায় বসে স্কুলের পড়া করছে। আজিজা খালা যাবার আগে চাপা স্বরে কি যেন বলল। সে বুঝতে পারেনি। তখন থেকে যা গম্ভীর। অনেকক্ষণ কোন কথা বলেননি মা। ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। মার চেহারা দেখলে এ স্পষ্ট বোঝা যায়।

এক সঙ্গে খেতে বসে মা খুব গম্ভীরই ছিলেন। মনের ওপর তখন দারুণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

ভাবী খেতে খেতে বলেছিলেন, কি হল?

না এমনি। আজ আজিজা আপা এসেছিলেন। উনি ওদের নিয়ে কি সব বললেন। সেই থেকে শান্তি পাচ্ছি না। কি ব্যাপার বল তো?

না ভয় নেই। ওদের নিয়ে ভয়ের কি আছে? তবে সারা শহর খুব থমথমে, কখন কি হয় ঠিক নেই।

রানুর এতটুকুই শুধু মনে আছে। পরের দিন ওরা স্কুলে যায়নি। বাবা সকালের দিকে খুব

ছটফট করছিলেন। বললেন, আজ আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই।

ওরা তখন উঠোনে ছুটোছুটি করছে, দৌড়ুচ্ছে। তখনই মালতী দিদির আকাশ ফাটানো চিৎকার করে কান্না শুনেছিল। খুব বেশিক্ষণ না, খানিকক্ষণ। তারপর সব স্তব্ধ আর নিঝুম হয়ে গিয়েছিল।

সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে বারীন কাকা আর ইলা মাসীমা সেগুন বাগানে এক আত্মীয়ার খোঁজ খবর নিতে গিয়েছিলেন। পথের মধ্যে কারা যেন বারীন কাকা আর ইলা মাসীমাকে মেরে ফেলেছে।

মালতী দিদি এ খবর পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। জ্ঞানও হারিয়েছিল। কোন সাড়াশব্দ তারপর পাওয়া যায়নি। কোন কান্নার আওয়াজও না। কোন বিলাপ ছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যে সবকিছু থমথমে হয়ে উঠেছে। শুধু সবকিছু এ বাড়ি, ওবাড়ি, পাড়া, গলির মোড় থমথমে। সকলের মনের মধ্যে এক অজানা ভয় লেগেই আছে। কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ঘটতে চলেছে, ফিসফাস কথাবার্তায় স্পষ্ট এ বোঝা যায়।

রানু সেদিন খুব ভয় পেয়েছিল। এত ভয় সে কোনদিন পায়নি। বাবা বাইরে যায়নি। সংসারকে আগলে বসে আছেন যেন। কখন কি বিপদ হয়ে যায়।

মালতী দিদি আর ওর ছোট ভাই নিখিলকে পাড়ার রাজু আর আনিস ভাই কোথায় যেন রেখে এসেছিলেন। দুপুরের দিকে একদল লোক লাঠি ছোরা হাতে আধ ঘণ্টায় পুরো বাড়িটা তচনচ করে ফেলেছিল। রানু জানালার ছোট্ট ফোঁকর দিয়ে দেখেছে লোকগুলো বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে। সাইকেল, দেয়াল ঘড়ি, ছোট্ট রেডিও, পেতলের ঘড়া, শাড়ি, জামাকাপড় সব।

শূন্য বাড়িটায় বেশ কিছুদিন কেউ ছিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ির সুন্দর নিকানো উঠোনে ঘাস গজিয়েছিল। ও বাড়ির দিকে তাকাতেও গা ছমছম করত, কেমন যেন একটা ভয় ধরে গিয়েছিল। ঐ সময় ওর কেবলই বারীন কাকা আর ইলা মাসীকে মনে পড়ত।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে কতদিন দোয়া করেছে, হে আল্লাহ্ ওদের যেন কিছু না হয়।

মালতী দিদি সেই থেকে কেমন যেন হয়ে গেলেন। চোখের কোণ এমনভাবে কালো হয়ে উঠল যে ওকে দেখলে সহজে চেনাই যেত না। সব সময় কেমন এক ধরনের বিষাদ আর কান্না জমে আছে চোখ-মুখে।

বারীন কাকা আর ইলা মাসীদের মৃত্যুর এই ঘটনা রানুর হৃদয় মনে বহুদিন গেঁথে ছিল। উঠোনে বেনু কামালের সঙ্গে খেলতে খেলতে ওর মনটা হঠাৎ হাহাকার করে উঠত।

বাবার সঙ্গে পাড়ার আনোয়ার চাচা এ নিয়ে প্রায় গল্প করত। আনোয়ার চাচা প্রায়ই বলত, বড় ভাল আর পণ্ডিত মানুষ ছিলেন বারীন বাবু। এমন গণ্ডগোলের মধ্যে কি দরকার ছিল ওর সেগুন বাগান যাবার? বাবা বললেন, বারীন বাবুর বিশ্বাস ছিল। সেজন্যই তো তিনি সাহস পেয়েছিলেন।

এমন সাহস করতে নেই, বিশ্বাস করতে নেই। সারা শহরে যখন আগুন জ্বলছে তখন কিনা উনি গেলেন সেগুন বাগানে আত্মীয়-বন্ধুদের খোঁজ নিতে। এমন বোকা মানুষ আমি এ জন্মে দেখিনি।

না না। উনি বোকা ছিলেন না। বারীন বাবু ভেবেছিলেন উনি গণ্যিমান্যি মানুষ, সমাজের জন্য এত যখন করেছেন তখন কেউ কিছু করবে না।

তুমি যে কি বল। এখানেই তো ওঁর ভুল হল। খারাপ লোকদের কেউ বোঝাতে পারে?

ওদের যা দরকার তাই করে। ওদের যা চাই, তাই হয়।

রানুর অনেকদিন এসব খুব মনে ছিল। গতবছর হাসপাতালে ভর্তি আর পায়ের পাতা শুকিয়ে যাবার পর সবকিছু সে ভুলে যাচ্ছে। কোনকিছু মনে পড়ে না। স্মৃতি ম্লান। বারীনকাকা আর ইলা মাসীকে আগের মতো তেমন মনে পড়ে না। আবছা টুকরো সব স্মৃতি আর দৃশ্য চোখে ভাসে।

সন্ধ্যায় ইলা মাসী যখন গান গাইতেন একটির পর একটি তখন খুব ভাল লাগত। 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে'—সেই গানটার মধ্যে ওর দরদ এমনভাবে ফুটে উঠত যে ভাবা যায় না।

কিছুদিনের মধ্যে মালতী দিদি কেমন যেন হয়ে গেল। কথা বলে না। কেবল অপলক চেয়ে থাকে। সন্ধ্যায় গান গাওয়া ছেড়ে দিল।

রানু হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে মালতী দিদি আবার ধীরে ধীরে এ বাড়িতে আসছে। রানুকে নিয়ে গল্প করছে। উঠোনে হাঁটাতে নিয়ে যাচ্ছে। রানু মালতী দিদির হাত ধরে, ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে থাকে।

মালতী দিদি বলে, রানু পা ফেল, জোর দাও। ঠিক হয়ে যাবে।

মালতী দিদির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রানু সত্যি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার আনন্দে এক সময় তার শরীর মন নেচে ওঠে। মালতী দিদির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে আর এক জগতে চলে যায়। ওর মনে আশার আলো জ্বলতে থাকে। ওর কেবলই মনে হয় সে সেরে উঠবে। শরীর মনে কোন ক্লান্তি নেই। খুব তাড়াতাড়ি সে স্কুলে যাবে। আবার বন্ধুদের সঙ্গে ছুটবে, দৌড়াবে। ছোট্ট ঘন জঙ্গলের সোঁদা গন্ধে ভরে উঠবে বুক।

মালতী দিদি আজ এসেই বলল, তোমাকে আজ একটি গল্প শোনাব। তুমি এ গল্পটি শোনননি।

পাঁচ

সেদিন বিকেলে ইউনিভারসিটি থেকে ফিরল বাবা খুব উদভ্রান্ত হয়ে।মাকে বললে আর রক্ষা হল না। দেখ না কিসে কি হয়ে যায়। মা দাঁড়িয়েছিলেন বারান্দায়। বললেন, কেন তুমি না বলেছিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

না ঠিক হল কই; চারদিকে পুলিশ। আজ বিকেল থেকে আমাদের ওখানে ১৪৪ ধারা। ছেলেদের দোষ কি বল। ওরাইতো মারমুখো হয়ে আছে।

বাবা মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসলেন বারান্দায়। রানু, বেনু, কামালকে ডাকলেন। রানুকে আদর করলেন। চা খেতে খেতে বললেন, রানু ওষুধ খেয়েছ?

হ্যাঁ বাবা।

ব্যথা হয়েছিল?

না বাবা।

বাবা এরপর চামড়ার ব্যাগ থেকে রানুর জন্য দুটো বই বের করলেন। একটা গল্পের বই আর একটা ঠাকুর-মার ঝুলি। ছবি সমেত সুন্দর ছাপা। বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে রানুর হৃদয় মন ভরে গেল।

রানুর স্কুলের বন্ধুদের কথা মনে পড়ল—স্কুল বাড়ি, খেলার মাঠ হেঁটে হেঁটে দুবন্ধুর স্কুলে যাওয়া।

এক সময় হঠাৎ রানু বাবাকে বলল, বাবা আমি কবে সেরে উঠব।

খুব তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি।

সত্যি বাবা?

হ্যাঁ মা।

রোজ পায়ের পাতা মালিশ করবে। ডাক্তার কাকা যেমন করে মালিশ করতে বলেছেন তেমনি মালিশ করবে। এক্সারসাইজ করবে। খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।

আমি তো রোজ মালিশ করি বাবা।

জানি মা। চল উঠোনে হাঁটবি।

বাবার হাত ধরে ক্র্যাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানু। বাবার হাত ধরে হাঁটল।

রানুর মনে হল পায়ে তেমন কোন ব্যথা নেই। পা সেরে উঠছে। সে পায়ের পাতায় নতুন করে বল পাচ্ছে। বাবার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে রানুর মনে পড়ল অনেকদিন আগে ওরা গ্রামে গিয়ে বাবার হাত ধরে এমনি হেঁটেছিল।

তখন শীতকাল। ধান কাটা হয়ে গেছে। দু চোখে জুড়ে কেবলই দেখা যায় এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। গাঁয়ের মুখে প্রকাণ্ড একটা বট গাছের ঝুড়ি মাটি ছুঁয়ে আছে। শীর্ণ একটা খাল এঁকে বেঁকে চলে গেছে দক্ষিণে। খালে তেমন জল নেই। কিন্তু নৌকা চলছে। গঞ্জে যাচ্ছে, হাটে যাচ্ছে। অনেক দূরে ছোট্ট একটা রেল ষ্টেশন। রেল লাইনও দেখা যায়।

ছোট্ট খালটা এঁকে এঁকে চলে গেছে পদ্মায়। ইষ্টিমারের ভোঁ কিছুক্ষণ পর পর শোনা যায়। ভোরের ফুটফুটে আলোর মধ্যে ওরা ইষ্টিমার থেকে নেমেছিল। কাল সন্ধ্যায় ওরা যখন ঢাকা ছেড়ে এসেছে তখন ইষ্টিমারে ওঠার আনন্দে, গ্রামের বাড়িতে যাবার উত্তেজনায় ওর অনেক কিছু করার ইচ্ছে ছিল। একসময় ভোঁ বাজিয়ে বড় বড় চাকা জল কাটতে কাটতে যখন চলতে শুরু করেছে তখন বেনুকে সে বলেছিল, বেনু আজ আমরা ঘুমবো না। আজ সারারাত জেগে থাকব।

আকাশে রূপোর থালার মতো বড় চাঁদ। সারা নদী জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে, লঞ্চ চলছে নৌকা চলছে। সরু সরু লম্বা নৌকায় বসে আছে জেলে। স্রোতে দুলতে দুলতে জাল ফেলেছে।

রানু যত দেখছে ততই আনন্দে নেচে উঠছে। দুপাশের বাড়ি, কারখানা, গুদাম সরে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ এসব দেখতে দেখতে রানু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন সকালে আকাশ যখন একটু ফর্শা হয়ে এল তখনই ওদের ইষ্টিমার এসে ভিড়েছিল ইজিলপুরের ঘাটে।

মা বললেন, ওঠ রানু, ওঠ বেনু। আমরা এসে গেছি।

ভোরের নতুন আলো তখন ফুটিফুটি করছে। পুবদিকটা সামান্য লাল। সূর্য উঠবে হয়ত বা। কিন্তু ঠাহর করলে কিছুই বোঝা যায় না। ঘন কুয়াশায় তখন সব ঢেকে আছে।

মা বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা করে গুছিয়ে রাখলেন। খানিকপরেই ইষ্টিমার নদীর ঘাটে ভিড়েছে। ইষ্টিমার থেকে নেমে ওরা নৌকা নিয়ে গ্রামে এসেছে।

নদীতে তখন বাতাস বইছে। সবুজ ক্ষেত। এক পশলা বৃষ্টি পড়েছিল।

দিন সাতেক ছিল ওরা গ্রামে। রানুর সে কি আনন্দ।

বাবার হাত ধরে রানু আর বেনু একদিন দূরের আরেকটি গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। রেল লাইনের স্লিপার গুণে গুণে হেঁটেছিল। যাওয়া আসার পথে বাবা যে কত ধরনের গাছ চিনিয়েছিলেন তার শেষ নেই। ফেরার পথে সে রাতে আকাশে চাঁদ ছিল না। চাঁদ উঠেছিল আরো খানিক পরে। আকাশে দু-একটি তারা ছিল। বাবা গল্প করতে করতে দু-একটি তারাও চিনিয়েছিলেন।

বাবার সঙ্গে গাঁয়ের বাড়িতে বেড়াবার কথা ভাবতে ভাবতে রানু দেখল সন্ধ্যা নামছে। পাশের

বাড়িতে মালতী দিদি গান গাইছে—'অন্তর মম বিকশিত কর'। মালতী দিদির গলাটি বেশ মিষ্টি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মালতী দিদি যখন এ গানটি দিয়ে শুরু করেন তখন সে সমস্ত দুঃখ, সমস্ত কষ্ট ভুলে যায়।

পাশের বাড়ির দোতলায় কেউ যেন ঝগড়া করছে। ওদের চিৎকারে বাবা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। চল ঘরে ফিরি।

রানু ক্র্যাচে ভর দিয়ে ফিরে এল ঘরে।

বেনু আর কামাল বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে পড়ছে। সে রাতে বাবার সঙ্গে যখন ওরা সবাই রাতের ভাত খাচ্ছে রানু শুনল কে যেন কড়া নাড়ছে।

বাবা বলল, দেখ তো এই রাতে কে কড়া নাড়ে!

মা দরজা খুলে এসে বলল ফজলু এসেছে। এক্ষুণি তোমার সঙ্গে জরুরী কথা বলতে চায়। বলেছি খেতে বসেছ। বলল, স্যারকে একটু তাগিদ দিন, আমাদের সময় নেই।

বসতে বল। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

বাবার ভাত খাওয়া শেষ হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। মা বললেন কি ব্যাপার। না খেয়ে উঠে যাচ্ছ যে। ফজলু তো বসেছে।

বলিনি তোমাকে, একটা কিছু হয়ে যাবে। ও নিশ্চয় কোন জরুরী খবর এনেছে।

ভাত খেতে খেতে রানু দরজার ফাঁক দিয়ে ফজলু ভাইকে দেখল। কেমন যেন চিন্তামগ্ন।

বাবা বললেন, কি খবর তোমাদের?

এই তো স্যার। কিছু শুনছেন?

একটু একটু।

কাল আমরা বেরুবোই। ভাঙ্গা ছাড়া, মিছিল করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। বিকেল থেকে উত্তেজনা বেড়েছে। যে কোন সময় ধরপাকড়ও সুরু হয়ে যেতে পারে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

সাবধানে থেক।

আচ্ছা স্যার।

তারপর ওরা চাপা স্বরে, খুব আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলছিল। রানু শুনতে পায়নি। রানুর সঙ্গে ফজলু ভাই এর এক সময় বেশ ভাব ছিল। ওর মনে পড়ল সেই সকাল বেলার স্মৃতি।

গলির মোড়ে ছিল একটা শিউলী আর বকুল গাছ। রানু-বেনু সেই সাত সকালে সেখানে ফুল কুড়াতে যেত।

গলি থেকে সামান্য দূরেই বড় রাস্তা। গলির মুখে রানু কতদিন দেখেছে ফজলু ভাই সাতসকালে গলা সাধছে কিংবা গান গাইছে। চোখে ভারী চশমা। গায়ে গেঞ্জি। গলা সাধা শেষ হলেই পড়তে বসত ফজলু ভাই। তারপর যেত ইউনিভারসিটি। রানুর পায়ের পাতা তখনো এমন করে শুকোয়নি। একদিন ওরা দুজন—রানু-বেনু জামার কোচর ভরে ফুল নিয়ে ফিরছে।

ফজলু ভাই বলেছিল, এই রানু গান শিখবি!

রানু বলেছিল, হ্যাঁ। মাকে জিজ্ঞেস করে নিই।

সেদিন থেকেই রানুর সঙ্গে ফজলু ভাইয়ের দারুণ ভাব হয়েছিল।

রানু যখন সেবার পায়ের ব্যথার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল তখন একদিন হাসপাতালে দেখতে এসেছিল। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ক্রীম রং-এর বিলেতী মুচমুচে বিস্কুট।

রানুর মন তখন ভাল নেই। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইন্‌জেক্‌শন নিতে নিতে ওর মন কেমন যেন এক অজানা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। পায়ের পাতায় শক্তি নেই। কাঁহাতক বিছানায় শুয়ে থাকা যায়।

ফজলু ভাই খুব মিষ্টি করে রানুকে বলেছিল, ভয় নেই। তুমি ভাল হয়ে উঠবে। কদিন পরেই তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেই সময়ে একদিনের স্মৃতি ওর মনে খুব গেঁথে আছে। সামনের বড় জানালা দিয়ে সে একদিন দুপুরে দেখেছিল একটা মিছিল ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে চলছে। শ্লোগানের শব্দ কানে আসছে। ওরা হাত তুলছে আর নামিয়ে নিচ্ছে।

মিছিলটিকে এক নজর দেখবার জন্য সারা ওয়ার্ডে খুব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সবাই বড় জানালার দিকে ছুটছে, জড়ো হচ্ছে। এ কথা সে কথা বলাবলি করছে।

কে একজন যেন বলেছিল, মুখের ভাষার এ দাবি মানতেই হবে। আমরা বাংলায় কথা বলি। বাংলা হবে না তো কি ? উর্দু কি আমরা বলতে পারি, না বুঝি যে, উর্দু হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা ! এসবের কোন মানে হয় না। এ যে জবরদস্তি !

ছাত্ররা ভালই করেছে। প্রতিবাদ না করলে কেমন করে চলবে !

ঠিক, ঠিক।

এমনভাবে অনেক কথা চলেছিল অনেকক্ষণ। রানু কিছুই বুঝতে পারেনি। ও নিজেও জানে না! কেন জানি সেদিন ফজলু ভাইকে ওর খুব মনে পড়েছিল আর সারাক্ষণ ভেবেছে ফজলু ভাই এ মিছিলে আছে, মিছিলে শ্লোগান দিচ্ছে।

ছয়

পরেরদিন সকাল থেকে পুরো এলাকাটা থমথম করছে। বাবা সকাল সকাল বেরিয়ে আবার ফিরে এলেন। রানু, বেনু আর কামালকে সঙ্গে নিয়ে সকালের খাবার খেলেন।

বাবা খাবার খেতে খেতে বললেন, আজ একটু তাড়া আছে। ছেলেরা কি কাণ্ড করে, কে জানে ! যেভাবে সব তেতে আছে, কি যে হয়ে যায় !

তুমি কিন্তু এসবে একদম জড়িয়ো না। আজ তো ক্লাশ নেই। তুমি কেন যাচ্ছ ?

তবুও যেতে হবে। কখন কি হয়ে যায় !

মা অনেকক্ষণ ভাবলেন। কি যেন বলতে চাইলেন রানু বুঝতে পারল না।

বাবা বললেন, রানু তুমি তো সকালের ওষুধ খাওনি। দুধটুকু খেয়ে নাও। আমি ওষুধ আনছি।

বাবা মিক্‌চারটুকু ছোট্ট গ্লাসে ঢেলে বললেন, নাও রানু, খেয়ে নাও।

খয়েরি মিক্‌চারটুকু গলায় ঢেলে দিতেই রানুর মুখ তেতো হয়ে গেল। এক গ্লাস পানি খেয়েও মুখের তেতো ভাবটি গেল না। বাবা মাকে বললেন, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। ওদের স্কুলে পাঠিও না !

না গেলে হয় না ? মা বললেন।

না।

বেনু কামাল ওদিকে বসে পাউরুটি আর দুধ খাচ্ছে আর উঠোনে একদল কাকের ওড়াওড়ি দেখছে।

বেনু বলল, কেন বাবা স্কুলে যাব না ?

এমনি।

দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল রানু। পায়ে ব্যথা নেই। এ ঘর থেকে দেখা যায় বাবা বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছে। খুব বিষণ্ণ। মাকে দেখা যায়। মা রান্নাঘরে চা তৈরি করছে। ঠিকে ঝি কুয়োতলায় বাসন-কোসন ধুচ্ছে।

ঝিরঝির হাল্‌কা হিমেল হাওয়ায় একটু শীতের আমেজ আছে। কিছুক্ষণ আগেও সে বিশ্রী এলোমেলো স্বপ্ন দেখেছে। এ স্বপ্নের কোন সুরু নেই, শেষ নেই।

রানু স্বপ্ন দেখেছে, সে গাঁয়ের বাড়িতে চলে গেছে। সারা তল্লাট জুড়ে শুধু জল আর জল। নৌকা চলছে। সে ছুটছে। আর কেউ নেই। সঙ্গে বাবা নেই, মা নেই। নৌকায় এদিক সেদিক যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে নদীতে নামছে। ভিন গাঁয়ের বুনো জঙ্গলে হারিয়ে যাচ্ছে। শামুক কুড়োচ্ছে, ফুল তুলছে। বৈঁচি ফুলের মালা গাঁথছে।

বিছানায় উঠে বসে রানুর এসব এলোমেলো স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। ঘুমের জড়তা তখনও ওর কাটেনি। চোখে ঘুম। আরও একটু ঘুমিয়ে নেবে কিনা রানু ভাবল।

বিছানা থেকে বাবাকে দেখা যায়। বাবাকে ডাকবে কিনা ভাবল। তারপর ডাকল, বাবা, বাবা!

আসছি মা।

বাবা এসেই বলল, কখন উঠলি!

এইমাত্র।

আমি দুবার দেখে গেছি, তুই ঘুমোচ্ছিলি? তাই ডাকিনি। পায়ে ব্যথা নেই তো?

না বাবা।

রানু পায়ের পাতা নেড়ে চেড়ে দেখল।

রানু ভাবল সে বাবাকে শেষ রাতের স্বপ্নের কথা বলবে কিনা।

মুখ ধুয়ে খেতে বসে সে দেখল বাবা খুবই আনমনা। সকাল থেকে বাবা কেমন যেন হয়ে আছে। বাড়িটাও ঝিমিয়ে আছে। কোথায় কি হল রানু বুঝতে পারল না।

বাইরের গলি থেকে ভিস্তির ঝগড়া কানে আসছে। কোথায়ও একটা রেডিও বাজছে।

রানুর সময় কাটতে চায় না। এমন সময় মালতী দিদি এল। ওকে কাছে পেলেই রানু সব দুঃখ ভুলে যায়। ওর গায়ের গন্ধ চাঁপা ফুলের মতো। চুল খুব পরিপাটি আর সুন্দর। ওর শাড়ি পরবার ধরন, চলার ভঙ্গি সব কিছুই মনে হয় আলাদা।

মালতী দিদির চেহারায় কেমন উদ্ভ্রান্ত ভাব। বলল, কাকার খবর কি?

এই তো।

কিছু শুনেছেন?

হ্যাঁ।

গুলিতে কতজন মরেছে?

অনেক।

ধরেছেও নাকি অনেক?

হ্যাঁ।

বাবা মুখ খুলতে চান না। শুধু বললেন বস, তোমার ভাই কই?

বাড়িতে আছে।

ঠিক আছে।

মাও খুব চিন্তিত। মা শুধু মালতী দিদিকে লক্ষ্য করে বলল, কি সব হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

রানু ছটফট করছে। কি হল সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কেমন সব চাপা চাপা।

মালতী দিদিকে কাছে পেয়ে সে বলল, শোননি !

না।

তবে থাক।

বল না।

আজ ভাষা আন্দোলনের সেই মিছিলে গুলি চলেছে, অনেক ছাত্র মারা গেছে।

রানু আর শোনেনি। মালতী দিদিও আর কিছু বলেনি। ওর তখন ফজলু ভাইকে মনে পড়ল। ওর কিছু হয়নি তো! সারাক্ষণ সে শুধু ভাবল। সন্ধ্যারাতে ও বাড়ি থেকে মালতী দিদির গলা ভেসে আসছে।

কোথায়ও কোন সাড়া-শব্দ নেই। সব নিঝুম।

তখনই ওরা এসেছিল। জীপটি দাঁড়িয়েছিল গলির মোড়ে। প্রথমে কড়া নেড়েছিল একটি লোক। দরজা খুলতেই দুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছিল দশ বারজন পুলিশ। সারা বাড়িতে আঁতিপাঁতি করে কি যে খুঁজেছে কে জানে। যাবার সময় খুব সহজভাবে বলেছিল, চলুন আজিজ সাহেব আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে। আমরা খবর পেয়েছি আপনি ফজলুর রহমানকে লুকিয়ে রেখেছেন। আপনার যা বলবার থানায় বলবেন।

চলুন।

ভয়ে রানু এতক্ষণ কাঠ হয়ে বিছানায় বসেছিল। কি হয় !

বাবাকে নিয়ে যাবার সময় সে কেঁদে ফেলল।

বাবা রানুর চোখে চোখ রাখলেন। মা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। এতগুলো পুলিশের সামনে কিছুই ওর বলা হল না।

রানুকে শুধু বললেন, সময় মতো ওষুধ খেয়ো। দশ বারজন পুলিশ বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছে হল সেও বাবার পেছনে ছুটে যায়। হাত বাড়িয়ে সে জানালা খুলে দিল। দেখল বাবা হেঁটে যাচ্ছে।

সে বিছানা ছেড়ে দ্রুত নেমে এল। রানু দৌড়ে গেল গলির মোড়ে। বাবার পেছন দিকটা অস্পষ্ট আলোতে দেখা যায়। খাকি পোষাক পরা লোকটা বীর দর্পে হেঁটে যাচ্ছে। ভারী বুটের শব্দ হচ্ছে।

রানুর চিৎকার করে বলে ওঠার ইচ্ছে হল, দেখ বাবা, এই আমি দাঁড়াতে পারছি। পায়ে আমার কোন ব্যথা নেই। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে আমি দাঁড়াতে পারছি। তুমি মালিশ করে দিয়েছিলে কাল। বাবা তুমি কোথায় চলেছ? তোমাকে নিয়ে ওরা কোথায় যাচ্ছে? তুমি কখন ফিরবে! আমি যে ভাল হয়ে গেছি। তোমাকে কালো গাড়িতে তুলে নিয়ে কোথায় চলেছে! আমি ক্র্যাচ ছাড়া হাঁটতে পারছি। তুমি দ্যাখ বাবা।

মা বসে আছে।

বেনু কাঁদছে।

মার চোখে কি জল?

বুঝতে পারছি না।

আমি হাঁটতে পারছি।

আমার পায়ে কোন ব্যথা নেই।
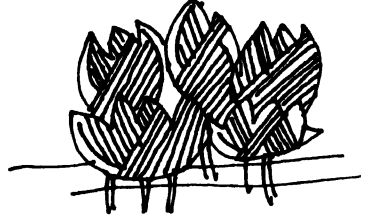
দি টাইগার

আখতার হুসেন

খুব সামনেই ওর এ্যানুয়াল পরীক্ষা। আর মাত্র মাস খানেকের মতো বাকি। তাই পড়াশোনার খুব তোড়জোর। নিঃশ্বাস ফেলবার জো'টি নেই।

ক্লাসে রটে গিয়েছে, এবার ইংরাজীতে বাঘ সম্পর্কে রচনা আসবে। সেই সাত-সকালে তাই ও ইংরাজী রচনা বই খুলে বসেছে। বার-বার পড়ছে—'দি টাইগার'। কিন্তু পড়তে গিয়ে একটা অজানা ভয়ে ও শিউরে উঠছে বার বার। গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে উঠছে। কী ভয়ঙ্কর আর হিংস্র স্বভাবের এই বাঘ! থাকে গভীর জঙ্গলে। অথচ ওর মনে হচ্ছিল, একটা ডোরাকাটা বাঘ যেন তাদের বাড়ি আর বাগানের আশেপাশেই ঘুর ঘুর করছে। লাল ভয়ঙ্কর দু'টো চোখ মেলে পাঁয়তারা কষছে। যেন এক্ষুণি দরজা খুলে থাবাটাবা মেলে ওর সামনে এসে দাঁড়াবে।

ওদের এতো বড় বাড়ীতে ও এখন একলা। কেউ নেই। আব্বা, মা-মনি আর বড়পা গেছেন নিউ মার্কেটে। প্রেজেন্টেশান কিনতে। আগামী পরশু ছোট কাকার বিয়ে। তিনি নিজে এসে ওদের সবাইকে দাওয়াত দিয়ে গেছেন। না গেলেই নয়।

ও যখন বাঘ সম্পর্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন, তখন ছোট মামা ঢুকলেন ঘরে। প্রায় হন্তদন্ত হয়ে। ঢুকেই একটা চেয়ার টেনে ওর মুখোমুখি বসলেন, 'কিরে, কারো কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। বাড়ীতে কেউ নেই?'

'না,' ও জবাব দেয়।

'তা, এতো মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিস?'

'বাঘ সম্পর্কে।'

মামা একটু অবাক হন। যেন আকাশ থেকে পড়েন।

'বাঘ সম্পর্কে পড়ে কি করবি?'

'কি করবো মানে? পরীক্ষায় আসবে। রচনা।'

ও মামাকে বুঝিয়ে বলে।

মামা ওর কথা শুনে একটুক্ষণ থ মেরে থাকেন। যেন মুখে কোন কথা যোগাচ্ছে না। ও তাই বলে, 'আচ্ছা মামা, তুমি তো শিকারটিকার করো। কখনো বাঘ শিকার করেছো ?'

'করিনি, তবে খুব শীগগিরই করবো', মামা জবাব দেন।

'আচ্ছা মামা, বইয়ে যে লেখা বাঘেরা খুব হিংস্র স্বভাবের। সত্যি কি তাই ?'

মামা ওর কথায় হো হো করে হেসে ওঠেন।

'সত্যি মানে, একশোবার সত্যি।'

ও এবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ঘাড় মটকে রক্ত খায় ?'

'সামনে একবার পড়েই দেখিস না।'

মামার জবাব দেবার ধরনে ও আর প্রশ্ন করতে সাহস করে না। আবার 'দি টাইগারে' মনোনিবেশ করে।

একটু পরে মামা ওর সামনে থেকে উঠতে উঠতে বলেন, 'খোকন, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। পরে আবার আসবো। তোর পরীক্ষা শেষ হোক, তারপর তোকে সঙ্গে করেই একদিন বাঘ শিকারে যাবো।'

'সত্যি বলছো মামা !' ও মুহূর্তে খুশী হয়ে ওঠে।

'একেবারে সদলবলে। আট-ঘাঁট বেঁধে সুন্দরবনেই যাব। পরীক্ষাটা ভালো করে দে।'

কথা বলতে বলতে মামা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আব্বু, মা-মনি আর বড় পা'রা এখনো ফেরেননি। ছোট মামা গেছেন প্রায় ঘণ্টা খানেক। আর ঘরের দরজায় খিল এঁটে ও তখনো পড়ে চলেছে এক মনে 'দি টাইগার'। ঠিক এমন সময় বাইরের দরজার কড়া বেজে ওঠে। বাড়ীর সবাই ফিরে এলো বোধহয়। বই থেকে চোখ তুলে পায়ে পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে যায় ও। এবং দরজা খুলে দিতেই দেখতে পায়—আব্বু, মা মনি, বড়'পা নয়, ওর সামনে দাঁড়িয়ে বাচ্চা মতন অথচ মোটাসোটা, ডোরাকাটা একটা বাঘ।

'গুড মর্নিং,কেমন আছো ?' ও কিছু বলার আগেই সে তার সামনের একটা পা বাড়িয়ে দ্যায় ওর হাতের দিকে। করমর্দনের ভঙ্গিতে। যেন বাঘটা ওকে অনেকদিন থেকেই চেনে।

ও ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে এসে চোখ কচলাতে থাকে। ভুল কিছু দেখছে নাতো ? চোখে ঘোর লাগেনিতো ? হঠাৎ ও স্বাভাবিক হয় বাঘটির অট্টহাসিতে, 'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হোঃ—আমাকে ভয় পেয়েছো !'

ও কি করবে, কি করতে পারে, মাথায় কিছু ঢুকছে না। একি বিপদ এসে জুটলোরে বাবা ! বইয়ের পাতা ছেড়ে একটি তর-তাজা জীবন্ত বাঘ যে ওর সামনে এসে দাঁড়াবে, জীবনেও ভাবেনি। শিকারে গেলে বন-জঙ্গলে ওদের সাক্ষাৎ পাওয়া এক কথা, আর নিজের ঘরের একেবারে দোর-গোড়ায় ওদের মুখোমুখি হওয়া আরেক কথা।

'কি হোল, কথা বলছো না যে।' বাঘটা হঠাৎ ওকে চমকে দিয়ে প্রায় ধমকে ওঠে, 'গুড মর্নিং বললাম, অথচ তুমি তার জবাবটাও দিলে না ...'

থতমত খেয়ে ও এবার কোন মতে মুখ খোলে, 'গুড় মর্নিং ...'

'আমাকে এখানে এমনভাবে দেখে খুব অবাক হোচ্ছ, তাই না ?' বাঘটা বললো।

'না, না অবাক হবো কেন ?' নিজেকে ও সামলে নেয়। 'ভয় পেলে আর দরজা খুলে তোমার

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকি ?'

'তা হলে ভদ্রতা করে ঘরে নিয়ে বসাবেতো ;' অনেকটা ঠাণ্ডা গলায় বাঘটা বলে। 'অতিথি এলে তাকে সমাদর করতে হয়।'

ও এবার মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে। ভাবে, দেখিই না কি হয়। দরজা খুলে দিতেই বাঘটা যখন ওকে আক্রমণ করেনি, ঘরে ঢুকে কিছু করবার চেষ্টা করলে চিৎকার করে পাড়া-পড়শীদের অন্ততঃ জড়ো করতে পারবে নিশ্চয়ই।

'এসো, ঘরে এসো,' ও বলে। বাঘটা ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকতেই ও দরজা বন্ধ করে দেয়।
'তোমার নামটা তো বললে না ?' ঘরের ভেতরে ঢুকে ওর প্রথম প্রশ্ন। 'নাম কি তোমার ?'
'আমার নাম খোকন ?'

'আমার নাম শান্ত। বাবা-মা অবিশ্যি আমার নাম রেখেছিল হালুম, কিন্তু আমার পছন্দ হয়নি।'

'কেন, কেন ?'

'ওটা আবার একটা নাম হোল নাকি। হালুম খালুম-বড্ড পুরনো সব নাম।'

'তা এখন তুমি এলে কোথা থেকে ?'

'তাও জানো না ?'

'আমি জানবো কি করে ?'

'বুঝলে, আমি এলাম আমাদের গাঁ থেকে।'

'তোমাদের গাঁ, সে আবার কোথায় ?'

'কেন, সুন্দরবনে, নাম শোননি ?'

'শুনেছি। তা পথে কেউ তোমাকে বাধা দেয়নি ?' ও প্রশ্ন করে। 'কোনরকম অসুবিধে হয়নি তো ?'

'একটু-আধটু যে হয়নি, তা নয়। শহরের সীমানায় পা রাখতেই ভোর হয়ে গেলো।'

'তারপর ?' ওর উৎকণ্ঠা বেড়ে চলে।

'তারপর আর কি ? লোকজন আমাকে আলোতে দেখতেই যে যেদিকে পারলো, পড়ি-মরি করে ভোঁ দৌড়। আমি যতই বলি, আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কে শোনে কার কথা। দু' একজন অবশ্য গুলী ছুঁড়েছিল।'

'কোথাও লাগেনিত ?'

'না, লাগতে পারেনি। ভীষণ গা বাঁচিয়ে চলেছি।'

'তোমার ভাগ্য সত্যিই ভাল।'

এরপর ওরা দু'জনেই চুপচাপ। বাঘটাকে আর কি বলতে বা জিজ্ঞেস করতে পারে, ভেবে পায় না ও। কিন্তু এই নীরবতার সুযোগে বাঘটাকে ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয়। যাতে বাঘের রচনা এলে, বাঘের বাইরের চেহারার একটা নিখুঁত বর্ণনা পরীক্ষার খাতায় দিতে পারে। কিন্তু এ অবস্থায় হঠাৎ করেই বাঘটা নীরবতা ভেঙে বসে, 'তোমাদের বাড়ীতে আর কেউ নেই ?'

'আছে মানে, সবাই আছে ?'

'পরিচয় করিয়ে দেবে না ?'

'বাইরে একটু কাজে গেছে কি না, ফিরলে নিশ্চয়ই করিয়ে দেব। এখুনি হয়তো ফিরে আসবে। তা তোমার কে কে আছে, তাতো বললে না ?'

'মা আছে, বাবা আছে।'

'আসবার সময় তাদের বলে অসোনি ?'

'বলে আসবো কেন ?'

'মানে, মা-বাবার কথা মেনে চলতে হয় বলে।'

'আমার সঙ্গে ওদের কোন ভাব নেই।'

'কেন, কেন ?'

'ওরা বন ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না বলে, আমাকে ওদের মত করে চলতে বলে,বলে।' বাঘটা এবার একটা হাই তোলে, 'তোমার মা-বাবা নিশ্চয়ই খুব ভালো ?'

'ভালো-মন্দ বুঝি না, তবে আমি যা করতে চাই, ভালো মনে করলে, তারা তাতে বাধ সাধে না।'

'আহা, আমার মা-বাবা যদি তোমার মা-বাবার মত হোত,' বাঘটার গলায় আক্ষেপের সুর।

টুকটাক করে আরো কিছুক্ষণ কথা বলার পর বাঘটা বার বার হাই তুলতে থাকে। বড্ড ক্লান্ত দেখায় তাকে। চোখ দু'টো প্রায় মুদে আসছে। ও বলে, 'তোমার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। ক্লান্ত বোধ করলে একটুখানি ঘুমিয়ে নিতে পারো।'

'না, ঘুমুলে চলবে না ভাই। আমাকে ঘুরেফিরে তোমাদের সবকিছু আবার দেখতে হবে কি না। তবে খাবার থাকলে একটুখানি দিতে পারো, যদি কোন রকম অসুবিধে না হয়।'

'না না অসুবিধে হতে যাবে কেন ?'

'তা'হলে নিয়ে এসো। ক্ষিদেটা বেশ লেগেছে।'

'কিন্তু তুমি যখন আমার মেহমান, তোমাকে তো আর আমি যা-তা একটা কিছু খেতে দিতে পারি না।'

'তুমি অতোসব বাদ দাওতো। যা হয় একটা কিছু হলেই আমার চলে যাবে।'

ও আর কোন কথা বাড়াতে সাহস করে না। তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রান্না ঘরে। মিটসেফের কাছে। মিটসেফ খুলতেই চোখে পড়ে রান্না করা মাংসের একটা পাতিল আর একটা প্লেটে রাখা খান কয়েক রুটি। সকালের নাস্তা সেরে বেঁচে যাওয়া।

তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে একটা প্লেটে চারখানা রুটি সাজায় ও। আর একটা চীনে মাটির বাটিতে তুলে নেয় আট দশখণ্ড মাংসের টুকরো। সেই সাথে ঝোল। ও জানে না, বাঘটা রুটি খাবে কি না, কিন্তু মাংস নিশ্চয়ই ওর সেরা খাদ্য।

রুটি আর মাংস নিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকতেই দেখতে পায়, চেয়ারে হেলান দিয়ে বাঘটা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ও ডাকে, 'এই, এই যে ওঠো।'

বাঘটা বড় মত একটা হাই তুলে চোখ কচলে তাকায়। ও বলে, 'রুটি আর মাংস খেতে তোমার আপত্তি নেইতো ?'

'আর অন্য কিছু নেই ? মুখের ভাব তেতো করে ও এবার আরো একটা হাই তোলে। 'মাংস খেতে আর ভালো লাগে না। বলতে পারো ছেড়েই দিয়েছি।'

'বলো কি !' ও অবাক হয়। 'আমিতো জানি মাংস তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার।'

'আমার মা বাবার কাছে অবশ্য এখনো মাংসই একমাত্র প্রিয় খাবার। কিন্তু আমি আর খাই না সে কাঁচাই হোক আর রান্না করাই হোক।'

ও মহামুশকিলে পড়ে। ওকে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন করতে শুরু করে।

'তাহলে কি খাবে ? পায়েশ, লুচি, ডালপুরী ?'

'না, ওসব কিচ্ছু না।'

'জিলিপি, গরম গরম ?'

'না।'

'সন্দেশ, রসগোল্লা ?'

'না।'

'কালোজাম, দই, রসমালাই ?'

'না।'

আমড়া, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, কাঁচা আম ?'

'কাঁচা-পাকা ওসব কিচ্ছু না।'

'তাইলে বিস্কুট, চকলেট, টফি, চুয়িংগাম ?

বললাম তো ওসব কিচ্ছু না।' বাঘটা এবার নড়েচড়ে বসে। বোঝা যায়, ওর মেজাজ খিচড়ে গেছে। একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আবার মুখ খোলে, 'পান্তা ভাত আছে?'

'পান্তা ভাত!' ওব আবার অবাক হবার পালা।

'হ্যাঁ, পান্তা ভাত, কাঁচা মরিচ আর লবণ। থাকলে ঝটপট নিয়ে এসো। খেয়ে দেয়ে চলে যাই।'

ও আবার ছোটে রান্না-ঘরের দিকে। মিটসেফ খুলে আঁতিপাতি খুঁজতেই পেয়ে যায় একটা গামলা-ভর্তি পানি দেয়া ভাত। রাত্রের বেঁচে যাওয়া। ইতিউতি তাকাতেই মিটসেফের পাশে রাখা একটা ঝুড়িতে পেয়ে যায় গোটা কয়েক কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ। সেই সাথে পানি ভাতে ঢেলে দ্যায় পরিমাণ মতো লবণ। তারপর ছুটে আসে ওর কাছে।

'কি, পান্তা ভাত পেলে?'

'তোমার ভাগ্য ভালো। দ্যাখোতো, এতে তোমার চলবে কি না?' বাঘের সামনে তুলে ধরে পান্তা ভর্তি গামলাটা। তাই দেখে মুহূর্তে ওর মুখটা খুশিতে লাল হয়ে ওঠে। ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পান্তা ভর্তি গামলাটা চেটেপুটে বাঘটা শেষ করে ফেলে। তারপর মুখে তৃপ্তির হাসি টেনে বলে, 'অনেকদিন পরে খুব মজা করে খেলাম।'

'কিন্তু পেট ভরেছে তো?' ও জিজ্ঞেস করে।

'ভরেনি মানে, আর কতো খাবো? আমি কি রাক্ষস নাকি?'

কথা বলতে বলতেই ও উঠে দাঁড়ায়, 'এবার আমাকে যেতে হবে ভাই?'

'যাবে?'

'হ্যাঁ, যেতেই হবে। দেরী করলে আবার অনেক কিছু দেখা হবে না কিনা। তোমাদের শহরটাতো আর কম বড় নয়। চলো, তুমি আমাকে একটু এগিয়ে দেবে।'

ও বাঘটার পেছন পেছন যেতে থাকে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে ওরা। পথে নেমে দ্যাখে, ওদের গলিতে লোকজনের কোন চলাচল নেই। কিন্তু এমনটাতো হবার কথা নয়। একটু ভালো করে চোখ বুলোতেই দ্যাখে, আশ-পাশের বাড়ির দরজা-জানলাগুলোর ফাঁক-ফোঁকড়ে কিছু চোখের উপস্থিতি। কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি ওর আর শান্তর দিকে। সেই সঙ্গে একটা হিম-শূন্যতা। তার মধ্য থেকেই কানে আসে চাপা ফিসফাস ও গুঞ্জনের শব্দ। শান্তকে ও কি বলবে বা কি বলতে পারে, ভেবে পায় না। বাঘটা বোধ হয় ওর অবস্থা আঁচ করতে পেরেই মুখ খোলে, 'তোমাদের গলিটার অবস্থা দেখেছো?'

'দেখতে পাচ্ছিই।' ও বলে।

'সবাই কেমন ভীতু, তাই না?'

'ব্যাপারটা স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক দু'টোই।

'কেন কেন?'

'যেমন ধরো, তুমি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছো। ঘরের মধ্যেও ছিলে কিছুক্ষণ। তারপরও আমি অক্ষত অবস্থায় আছি, সেটা দেখেও তো ওরা ওদের ভয়টা দূর করতে পারে।'

শান্ত এবার হেসে বলে, 'আমাদের সম্পর্কে ওদের ভয়টা অনেক দিনের। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেটা কাটবে কি করে? না ভাই, কথা বাড়ালেই বাড়বে। আমি তা'হলে যাই এবার।

তোমার মা-বাবার সঙ্গে দেখা হোল না। বেশ খারাপ লাগছে। তুমি তাদেরকে আমার সালাম দিও ?'

ও ঘাড় নাড়ে, 'দেবো। তোমার সঙ্গে তা হলে আর দেখা হচ্ছে না ?'

'কেন হবে না ! তোমার কথা যখুনি মনে হবে, ধাঁ করে চলে আসবো। যাই।'

'যাও। কিন্তু সাবধানে। আমাদের শহরে চলাফেরার কোন অসুবিধে হলে তুমি আমার নাম করো।'

'ঠিক আছে, বিদায়', বাঘটা হাত নাড়ে।

'বিদায়', ওও হাত নাড়ে। দেখতে দেখতে শান্ত একটা গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সারাদিন আর পড়ায় মন বসে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আব্বু, মা-মনি আর বড় পা'রা ফিরে এলেন। তাঁদেরকে শান্তর কথা অর্থাৎ বাঘটার কথা বললো ও সবিস্তারে। কিন্তু তাঁরা কেউই ওর কথা বিশ্বাস করতে চাইলো না। উল্টে আরো দিলো ধমকে। এলো পাড়া-প্রতিবেশীরা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলো তারা, বাঘটা ওর সঙ্গে কি কি করেছে—তার বিস্তারিত বর্ণনা। সন্ধ্যা বেলা মামা এলেন। তিনিও সব ব্যাপার শুনে-টুনে ঘর ফাটানো হাসিতে ভেঙে পড়েন, 'বাঘের রচনা পড়তে গিয়ে তোর মাথাটাই শেষ পর্যন্ত বিগড়ে গেছে।'

ও এখন বিরক্ত। শান্ত সম্পর্কে ও আর কারো কাছে কিছু বলতে চায় না বা শুনতেও চায় না।

তারপর শুরু হলো পরীক্ষা। ইংরেজির প্রশ্নপত্রে সত্যি সত্যি 'দি টাইগার' রচনা এলো। কিন্তু বাঘ সম্পর্কে বইয়ে যা যা ও পড়েছে, তার একটা অক্ষরও ওর পরীক্ষার খাতায় লিখতে ইচ্ছে হোল না।

ও লিখলো, 'বাঘ অত্যন্ত নিরীহ-শান্ত জীব। কোন কোন বাঘের নামও রাখা হয় শান্ত। আর বাঘেরা মোটেই হিংস্র নয়। তাহাদের অনেকেই মাংস খাইতেও পছন্দ করে না। কেহ কেহ মরিচ দিয়া পান্তা ভাত খায়। অনেক বাঘ মানুষের সঙ্গে দেখা হইলে গুড মর্নিং বলিয়া করমর্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দেয় ··· ।'

কাঁচ দৈত্য

সফিকুন নবী

সে এক দেশ। আর সেই দেশের পশ্চিমে এক বিরাট পাহাড়। লোকে সেই পাহাড়কে বলে কাঁচ পাহাড়। আর সেই কাঁচ পাহাড়ে বাস করে এক কাঁচ দৈত্য। কাঁচের তার হাত-পা, কাঁচের তার চোখ-মুখ, এক কথায় সারা দেহটাই তার কাঁচের তৈরী। কিন্তু কাঁচ হলে কি হবে—দেহটা তার একেবারে পাথরের মতো শক্ত।

এমনি সে কাঁচ দৈত্য, সে কিন্তু পশু খায় না, পক্ষী খায় না—খায় না মানুষও ! কিন্তু হলে কি হবে। সে দৈত্য তো বটে। হাতে না মারলেও—মারে সবাইকে ভাতে !

যখনই তার ইচ্ছে হয়, কাঁচ পাহাড় থেকে নেমে আসে সেই দেশে। আর সেই দেশের সতেজ রসালো মাটিতে মুখ ডুবিয়ে শুঁষে খেয়ে যায় সব রসটুকু। তাই সেই দেশে হয় না চাষ, হয় না ফসল। বারো মাসই দেশে লেগে থাকে আকাল।

তাই লোকে আর কি করে ? উপায়ান্তর না দেখে শেষে একদিন রাজার পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বলে,

—রাজা মশায় আমরা সবাই যে জানে-মালে মরতে বসেছি। ঘরে দু'মুঠো চাল নেই যে খেয়ে বাঁচবো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো, আমাদের চোখের সামনে শুকিয়ে মরছে না খেতে পেয়ে। কিন্তু কিছুই করতে পারছিনা আমরা। তাই উপায়ান্তর না দেখে ছুটে এসেছি আপনার কাছে। একটা কিছু উপায় যে আপনাকে করতেই হবে।

কিন্তু কে শুনবে তাদের আকুতি ! রাজা ছিল যেমন আলসে আর তেমনি নিষ্কর্মা। সারা দিন বসে বসে খেলতো কেবল পাশা। সেদিনও রাজা তাই খেলছিল। সবে একটা এঁটে সেঁটে বেশ করে চাল দিতে যাচ্ছে, আর অমনি হুড়মুড় ক'রে ঢুকলো সেই লোকরা। আর তাদের গণ্ডগোলে রাজা গেলো ভুলে তার চাল। আর তাই রেগে হলো সে টং। রেগে মেগে প্রায় তেড়ে এসে চিৎকার ক'রে উঠলো,

—জাহান্নামে যা, যতো সব নচ্ছাড়ের দল। অমন সুন্দর চালটা আমার দিলো একেবারে পণ্ড ক'রে। দাঁড়া, সব ব্যাটাকে চড়াবো আজ শূলে। তোরা মরবি তো আমার কি? সাহস কতো যে আমার খেলা করিস পণ্ড!

রাজার এমন কথায় লোকরা তো একেবারে হতবাক। আশ্চর্য হয়ে তারা বল্লে,

—রাজা, আমাদের প্রাণের চাইতে তোমার খেলাটাই হলো বড়ো! বেশ তবে তুমি খেলো। দেখি এবার থেকে তোমার খাবার জোগায় কারা। তোমার সারা বছরের চাল ডাল তো জোগাতে হয় আমাদেরই। আমরাও দিলাম আজ থেকে সব বন্ধ ক'রে। ব'লে তারা সবাই ধীরে ধীরে গেলো চ'লে। আর রাজা আবার বসলো খেলতে। কোন চিন্তাই যেন নেই তার।

এদিকে সেই লোকদের মধ্যে ছিল, বিধবার একছেলে। যেমন ছিল সে চঞ্চল, তেমনি ছিল সাহসী আর তেমনি ছিল চালাক। নাম ছিল তার নিপু।

সেই নিপু, সব দেখে—সব শুনে ছুটে এলো মা'র কাছে। বললো,

—মা, আমি যাব সেই দৈত্য মারতে।

ওর এমন কথা শুনে মা তো অবাক। বলে,

—পাগল, তুই এতটুকু ছোট্ট ছেলে। অতবড়ো দৈত্য তুই মারতে পারিস?

কিন্তু নিপু নাছোড়বান্দা। সে যাবেই। তাই মা আর কি করে? চোখের পানি মুছে একদিন তাকে বিদায় দেয়। নিপুও তাড়াতাড়ি মা'র চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সেই কাঁচ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। আর কি জানি কি ভেবে সাথে নিলো পাকা বাঁশের একটা লাঠি আর এক ঘটি খাঁটি সরষের তেল।

তারপর নিয়ে-থুয়ে বেরিয়ে পড়লো পশ্চিমের পথে। সে চলছে—চলছে আর চলছে। পথ যেন আর শেষ হয় না। সে যতোই এগোয় পাহাড়টা যেন ততোই পেছিয়ে যায়। এমনি হাঁটতে হাঁটতে—হাঁটতে, শেষে সে এসে পৌছলো এক গহীন বনে।

চারিদিকে তখন নেমে এসেছে নিকষ আঁধার। এতো আঁধার যে নিজেকে পর্যন্ত দেখা যায় না। এমনি আঁধারে নিপু পথ ফেললো হারিয়ে। এ'দিক যায়—ও'দিক যায় কিন্তু পথ সে আর পায় না। তাই কি আর করে উপায় কিছু না করতে পেরে শেষে ভাবলো, রাতটা না হয় বনেই কাটানো যাক। ভোর হলে আলোয় পথ চিনে আবার রওয়ানা দেয়া যাবে 'খন।

এই ভেবে সে এদিক ওদিক থেকে কিছু ফলমূল, জোগাড় করে পেট ভরে খেয়ে নেয়। তারপর একটা বড়ো শক্তপোক্ত গাছ দেখে—তাতে চড়ে বসে। বলা তো যায়না কখোন কোন জন্তু জানোয়ার এসে হামলা করে।

রাত গড়িয়ে চল্লো। আর রাত যতো বাড়তে লাগলো, চারিদিক ততোই হতে লাগলো নিঃঝ্‌ঝুম। শুধু থেকে থেকে পাখীর পাখা ঝাপটার শব্দ ভেসে আসে।

এমন সময় হঠাৎ একটা হিস্-হিস্ শব্দে সে একেবারে চমকে উঠে। সে সোজা হয়ে বসে এদিক ওদিক চায়। কিন্তু চোখে পড়েনা কিছু'ই। ভাবে— বাতাসের শব্দ হবে হয়তো। কিন্তু না, শব্দটা যেন ওকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। সে ত্রস্তে গাছের ডালপাতাগুলো দেখে নিলো। কিন্তু কিছুইতো নড়েনা। এতো বাতাস নয়—নিশ্চয়ই অন্য কিছু! কিন্তু কি?

এমন সময় তার চোখে পড়লো দু'টো আগুনের পিণ্ড যেন এগিয়ে আসছে ও'র দিকে। ঠিক ও' যে ডালে বসেছিল সেই ডালটা বেয়ে বেয়ে—আর তাই থেকে বেরুচ্ছে অদ্ভুত একটা হিস্-হিস্ শব্দ!

সে স্থাণুর মতো বসে বসে কেবল দেখতেই লাগলো। নড়বার শক্তিও যেন নেই তার এতোটুকু। কিসের মন্ত্রবলে যেন সে তার জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ হিম-ঠাণ্ডা একটা নিঃশ্বাসের স্পর্শে সে চম্‌কে উঠলো। দেখলো—সেই আগুনের পিণ্ড

দুটো একেবারে ওর সামনে। তারপরই ও'র মনে হলো ঠাণ্ডা কি যেন একটা ও'কে আস্তে আস্তে চেপে ধরছে। আর বুঝি ও'র রক্ষা নেই। এবার সে বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে—ময়াল অজগরের হাত থেকে কেউ যেমন রক্ষা পায়না সেও পাবেনা। আস্তে আস্তে আরো জোরে যেন চেপে ধ'রছে অজগরটা। এতো জোরে যে, ও'র হাড়গুলো পর্যন্ত গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যায় আর

এমন সময় হঠাৎ ও'র মাথায় খেলে গেলো এক বুদ্ধি। অনেক কষ্টে কোন রকমে একটা হাত মুক্ত ক'রে, হঠাৎ তেলের ঘটিটা থেকে এক খাবলা তেল নিয়ে অজগরের জ্বলন্ত চোখ দু'টোয় দিলো ছিটিয়ে।

আর অমনি অজগরের চোখ উঠলো জ্বলে। দৃষ্টি হলো অন্ধ। তারপর চেপে ধরা বাঁধনটা আস্তে আস্তে হ'য়ে গেলো ঢিলে। আর সেই ফাঁকে নিপু তাড়াতাড়ি বাগিয়ে ধরলো তার লাঠিটা, ঠিক অজগরের মাথাটা লক্ষ্য ক'রে। অজগরতো এবার প্রাণের ভয়ে হাউ মাউ ক'রে উঠে বল্লো,

—আমাকে মেরো না ভাই আমাকে মেরো না। তোমাকে আমি দৈত্য মারার পথ ব'লে দিচ্ছি। দৈত্য মারার উপায়ও ক'রে দিচ্ছি। আমায় তুমি ছেড়ে দাও। আমায় তুমি মেরো না। আমি আর তোমার কোন ক্ষতি ক'রবো না।

নিপুর কেমন যেন মায়া হলো একটু—আহা বেচারা এমন ক'রে ব'লছে। কি হবে মেরে? ব'লছে যখন—কিছু আর ক্ষতি ক'রবেনা, তখন ছেড়েই দেয়া যাক।

ছাড়া পেয়ে অজগর তো মহা খুশী। খুশী হয়ে নিপুকে বল্লে,

—তুমি যখন আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিলে, তখন আমিও তোমায় একটা উপহার দিলাম—এই নাও। ব'লে নিপুকে আশ্চর্য সুন্দর একটা তলোয়ার এগিয়ে দিলো।

নিপু তলোয়ারটা নিয়ে চোখের সামনে ধরতেই সেটা সেই আঁধারেও ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠলো। সে দেখলো তলোয়ারটা খাঁটি হীরের তৈরী। সে অদ্ভুত এই তলোয়ারটার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল।

ও'কে ওই ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অজগর আবার ব'লে উঠলো,

—এটা সাবধানে রেখো অনেক কাজে লাগবে। আর আরেকটা কথা, সকাল বেলায় এই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকবে এক পক্ষীরাজ। কথা না বলে সটান চড়ে বসবে তাতে। সে তোমায় পশ্চিমের কাঁচ পাহাড়ে পৌছে দেবে। তারপর তোমার কাজ হয়ে গেলে, পক্ষীরাজ আবার তোমায় তোমার দেশে রেখে আসবে। এই বলে অজগর আস্তে আস্তে আঁধারে গেলো মিলিয়ে। আর হতভম্ব নিপু হতবুদ্ধি হয়ে ঠায় রইল বসে।

এদিকে সময় চল্লো বয়ে। রাত প্রথম প্রহর থেকে দ্বিতীয় প্রহরে পড়লো, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় প্রহরে তারপর তৃতীয় থেকে চতুর্থ প্রহরে যেই পড়েছে, অমনি হঠাৎ আকাশ ফাটানো একটা চিঁ—হি—হি—হি শব্দে নিপু একেবারে চমকে উঠলো।

সম্বিৎ পেয়ে ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সতেই দেখে ঠিক তার নিচেই সুন্দর এক পক্ষীরাজ দাঁড়িয়ে। ব্যাপার বুঝতে কিছুমাত্র তার দেরী হলো না। অজগরের কথা মতো তাই সে সটান চ'ড়ে বসলো পক্ষীরাজের পিঠে। তলোয়ারটা বেশ করে গুঁজে নিল কোমরে আর তেলের ঘটি ও লাঠিটা হাতে নিল ঝুলিয়ে।

আর যেই না বসা, অমনি পক্ষীরাজ দিল ছুট্। সে কি আর যে-সে ছোটা? ঝড়-বিদ্যুৎকেও হার মানায়। শ' মাইল পথ যায় এক পলকে।

পক্ষীরাজতো ছুট্‌ছে-ছুট্‌ছে-ছুট্‌ছে! পথ যেন আর শেষ হয় না। অমনি ছুটতে ছুটতে কখোন যেন দিনের প্রথম প্রহর গড়িয়ে দ্বিতীয় প্রহর এলো, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় প্রহর আর তৃতীয় থেকে চতুর্থ প্রহর যেই এলো, অমনি পক্ষীরাজ পড়লো দাঁড়িয়ে। আর নিপু দেখলো সেই কাঁচ পাহাড়টা আকাশ পর্যন্ত উঁচু হয়ে পথ আগলে রয়েছে দাঁড়িয়ে।

নিপু যখন এমনি চারদিকে দেখছে, পক্ষীরাজটা তাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে—তাকে কোন মতে পিঠ থেকে নামিয়েই হাওয়ায় গেলো মিশে।

কি আর করা—ভেবে, নিপু চারিদিকে একবার ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বসে পড়লো সেখানেই।

অমনিতেই সে ক্লান্ত শ্রান্ত তার ওপর কাঁচ পাহাড়ে পড়ন্ত সূর্যের রোদ প'ড়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে আলোর ছটা। আর সে ছটা এতো প্রখর যে চোখ খুলে রাখাই দায়। তাই একসময় নিপুর চোখ জোড়া এল বুঁজে। আর অমনি পড়লো সে ঘুমিয়ে। সে ঘুম কি আর যে-সে ঘুম। সাত রাজ্যের রাজার মতো নাক ডেকে ঘুম। নাক ডাকছে সে ঘড় ঘড়, ঘড় ঘড়। আর সেই ঘড় ঘড় শব্দ কাঁচ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে হয়ে উঠছে যেন সিংহের গর্জন।

কতক্ষণ যে সে এমনি ঘুমিয়েছে কে জানে। হঠাৎ একটা বিকট হুংকারে বন্ধ হয়ে গেলো তার নাক ডাকা। ঘুম গেলো তার ভেঙ্গে। চেয়ে দেখে ভোর তখনও হয়নি। চারিদিকে আবছা আঁধার। কাঁচ পাহাড়ের ঠিকরে পড়া চোখ ঝলসানো ছটাও আর নেই। কিন্তু হঠাৎ আঁতকে উঠে তড়াক করে প্রায় লাফিয়ে উঠলো নিপু। ঠিক তার পেছনেই, প্রায় ঘাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেই কাঁচ দৈত্য।

কি সাংঘাতিক কিম্ভূতকিমাকার তার দেহ। কাঁচের চোখ দুটো কেমন অদ্ভুত আর স্থির—একটু এদিক ওদিক নড়ে না, একটা পলক পর্যন্ত পড়ে না। কাঁচের জিহ্বাটা কি সাংঘাতিক লক্‌লকে। কাঁচের হাত দুটো যেন আস্তো ইস্পাতের সাঁড়াশী।

কিন্তু ও'র আর ভাবা হলনা। সেই কাঁচ দৈত্য এবার হুংকার ছাড়লো মেঘের গর্জনে,

—কোন হতভাগারে তুই? অসময়ে নাক ডেকে, কাঁচা ঘুমটা আমার দিলি নষ্ট করে? বুকের পাটা তো তোর কম নয় দেখছি? মানুষ হয়ে আসিস দৈত্যের ঘুম ভাঙ্গাতে। সাত রাজ্য যার ভয়ে থরহরি কম্প, আর তুই ক্ষুদে পুঁচকে একটা মানুষ—তারই ঘুম দিলি পণ্ড করে? দাঁড়া দেখাচ্ছি এবার মজাটা। পাট খড়ির মতো মট্‌মট্ করে ভাঙ্গবো তোর হাড়গুলো। নেহাত আমি মানুষ-টানুষ খাইনা, নইলে ঘাড়টি মটকে খেতাম রক্তটুকু শুষে। বলে দৈত্য দুটো আঙ্গুল দিয়ে, নিপুকে ধরলো চেপে।

ওই দুটো মাত্র আঙ্গুলের চাপেই নিপুর দু' চোখে ফুটে উঠলো যেন সাত আকাশের তারা। দম এলো প্রায় বন্ধ হয়ে।

কিন্তু এতোদূর এসে এতো সহজেই কি সে হার মানবে? না—অসম্ভব! মরতে যদি হয় হাত-পা নেড়েই মরবে। এই-না ভেবে, হঠাৎ সে একটা ঝট্‌কা মেরে ও'র হাত থেকে ছিট্‌কে এলো বেরিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় খেলে গেলো এক বুদ্ধি। সে করলো কি—ঘটি ভর্তি সেই তেল আচ্ছা করে গায়ে নিলো মেখে। তাতে তার গা হলো পুরোনো ঘাটের শ্যাওলার মতো পিচ্ছিল। এবার দৈত্য ও'কে যতোই বাগিয়ে যায় ধরতে আর অমনি সুরুৎ করে পিছলে পড়ে সে বেরিয়ে।

এমনি যতো বারই দৈত্য তাকে ধরে ততবারই সে পিছলে ও'র হাত থেকে বেরিয়ে পড়ে। এমনি করতে করতে সে একবার করলো কি? তার সেই পাকা বাঁশের লাঠিটা বেশ শক্ত করে ধরে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে মারলো এক ঘা। কিন্তু দৈত্যের অত শক্ত কাঁচের দেহটা। এত তাড়াতাড়ি ভাঙবে কেন? ঘা-এর চোটে লাঠিটাই গেলো ভেঙ্গে। আর সেটা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে টুকরো টুকরো হয়ে। কাণ্ড দেখে দৈত্য লাগলো হো-হো ক'রে হাসতে। তার সেই হাসির দমকে মাটি শুদ্ধো উঠলো কেঁপে। তারপর দৈত্যটা আবার আসতে লাগলো এগিয়ে।

এদিকে নিপুর গায়ের তেলও ততক্ষণে প্রায় শুকিয়ে এসেছে। গা' আর তেমন পিছল হ'য়ে

নেই। সে এবার পড়লো মহা ভাবনায়। এখন উপায় ····এখন উপায় ?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আনন্দে সে প্রায় লাফিয়ে উঠলো। হ্যাঁ উপায় একটা আছে। অজগরের দেয়া সেই তলোয়ার। কি আশ্চর্য! ওটার কথা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল ? অথচ ওটাই কাঁচ দৈত্যের জন্য মোক্ষম অস্ত্র। হীরে দিয়েই কাঁচ কাটে—তাহলে ওই কাঁচ দৈত্যের কাঁচ দেহটা হীরের তলোয়ারে নিশ্চয়ই কেটে দু'ফাঁক হয়ে যাবে!

যা ভাবা, সেই কাজ। দৈত্যটা ছুটে আসতেই, তলোয়ারটা কোমর থেকে একটানে বের করে চোখ দুটো বন্ধ করে মারলে এক কোপ। আর সেই কোপ লাগলো ঠিক দৈত্যটার পেটে।

সে যা ভেবেছিল ফলও হলো তাই। দৈত্যটার পেট কেটে হয়ে গেলো দু'ফাঁক। আর তার পর পরই পেট চেপে ধরে দৈত্য উল্টে পড়লো মাটিতে। আর মাটিতে পড়তেই বিকট ঝন্-ঝন্ শব্দ তুলে একশো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো তার দেহটা। তারপরই আরেকটা বিকট শব্দে কাঁচ পাহাড়টাও ভেঙ্গে পড়লো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে। তারপর একসময় সেগুলো গেলো মাটির সাথে মিশে।

এতো তাড়াতাড়ি যে এতোগুলো কাণ্ড হয়ে যাবে তা নিপু ভাবতেই পারেনি। তাই সে সমস্ত কাণ্ড দেখে একেবারে 'থ' হয়ে গেল।

এমনি সে কতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা পরিচিত চিঁ—হি-হি-হি শব্দে চমকে চোখ তুলে চাইতেই দেখে সেই পঙ্খীরাজটা দাঁড়িয়ে ঠিক তার সামনেই। তার মনে পড়ে গেল অজগরের কথা। আর মনে হতেই তাড়াতাড়ি সে চেপে বসলো পঙ্খীরাজের পিঠে। আর দেখতে না দেখতে পঙ্খীরাজ দিল ছুট।

দেশে ফিরে তো নিপু অবাক! যেখানে সে দেখে গিয়েছিল ধূধূ মাঠ, সেখানে আজ সবুজের বন্যা। যেখানে সে দেখে গিয়েছিল কান্নার রোল, আজ সেখানে বসেছে হাসির হাট।

নিপু যখন এমন ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিলো, তখন সারা দেশের লোক এসে ধ'রলো তাকে ঘিরে। সে সবাইকে জিজ্ঞেস ক'রলো,

—রাজা কই ?

সবাই বল্লো,

—না খেতে পেয়ে মরেছে।

সে বল্লো,

—রাজপ্রাসাদ কই ?

সবাই বল্লো,

ধুলোয় গেছে মিশে

সে বল্লো,

—আর তোমাদের কোন অভাব আছে ?

সবাই বল্লো,

—না না না।

সে বল্লো,

—আর তোমাদের কোন দুঃখ আছে ?

সবাই বল্লো,

—না না না।
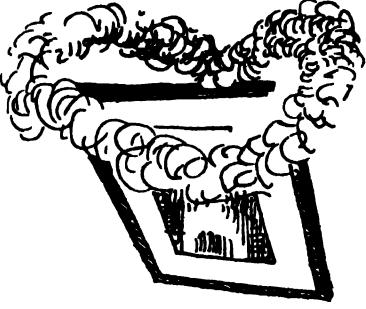
একাত্তরের যীশু

শাহরিয়ার কবির

দক্ষিণের শহর আর গ্রামগুলো পোড়াতে পোড়াতে পাঞ্জাবী সৈন্যরা ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগিয়ে আসছিলো। খবরটা শুনে মে মাসের প্রথম থেকেই গ্রামের লোক আরো উত্তরে শালবনের দিকে সরে যেতে লাগলো। অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে কুচবিহার আর পশ্চিম দিনাজপুরে চলে গেলো।

সীমান্ত বেশি দূরে নয়। অনেকে ওপারে গিয়েও নিয়মিত যাওয়া আসা করছিলো। জুনের মাঝামাঝি যখন সবাই নদীর ওপারের ছোট্ট শহরটিকে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখলো, তখন যারা যাবার তারা একেবারেই চলে গেলো। থেমে গেলো জামাত, মুসলীম লীগের কিছু দালাল আর কয়েকজন বুড়ো। গির্জার ঘন্টা টানতো বুড়ো ডেসমন ডি রোজারিও। সে ছিলো থেকে যাওয়া বুড়োদের একজন।

এতোদিন ফাদার মার্টিন ছিলেন গির্জায়। যশোরে পাঞ্জাবীরা মিশনারীদের মেরেছে—এই খবর শুনে তিনিও কিছুদিন আগে শহরে চলে গেছেন। বুড়ো ডেসমনকে ডেকে বলেছিলেন, 'উহারা মিশনারীদিগকেও হত্যা করিতেছে। আমি শহরে যাইতেছি। তুমি বিপদ দেখিলে ইণ্ডিয়া চলিয়া যাইও। ইণ্ডিয়ার মানুষ আমাদের অসহায় মানুষদিগকে আশ্রয় দিয়াছে। ঈশ্বর উহাদের মঙ্গল করিবেন।' এই বলে ফাদার বুকে ক্রস এঁকেছিলেন।

বুড়ো ডেসমন মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে জবাব দিয়েছিলো 'মুই আর কুণ্ঠে যাবেক ফাদার।'

অনেক ভেবেছিলো ডেসমন বুড়ো। আসলে সে যাবেইবা কোথায়! তার স্বজাতি সাঁওতালরা যখন যেখানে খুশি অনায়াসে চলে যেতে পারে। ওদের রক্তের সকল অণুতে মহুয়ার মতো মিশে আছে যাযাবরের নেশা। কিন্তু ডেসমনের সেই নেশা কেটে গেছে বহু বছর আগে।

গ্রামে যখন এই গির্জা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো, ডেসমন তখন বারো বছরের বালক। পাদ্রী

ছিলেন ফাদার নিকোলাস। তিনিই ডেসমনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'প্রভুর স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইওনা। প্রভু তোমাকে রক্ষা করিবেন।'

সেই থেকে ডেসমন এই গির্জায় পড়ে আছে। গির্জার পাশে সবুজ ঘাসের আঙিনা। দেয়ালের ওপাশে সারি সারি কবর। সবুজ আঙিনা আর কবরের মাঝে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে লাগানো ছোট্ট দু'টো ঘর। ছাদটা লাল টালির। দেয়ালগুলো সাদা চুনকাম করা। এই ঘর দু'টো ডেসমনের। সারাদিন ডেসমন এখানেই থাকে, আর গির্জার ঘণ্টা বাজায়। ওর মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র কাজের দায়িত্ব প্রভু ওকেই দিয়েছেন।

আগে ডেসমন সকালে গির্জার বাগানে কাজ করতো। গির্জার ভেতরের ঝাড়ামোছাগুলো শেষ করে রাখতো। বিকেলে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতো। প্রভু ছোটদের ভালোবাসতেন। বহুদিন বাইবেল থেকে ফাদাররা পড়ে শুনিয়েছেন, "যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও। বারণ করিও না। কারণ স্বর্গরাজ্য এইমত লোকদেরই।"

প্রায় জনশূন্য গ্রামগুলোতে মানুষের সাড়াশব্দ একেবারেই নেই। দু'একজন বুড়ো , যারা এখনো গ্রামে আছে, তারা ছোটদের মতো সারা গ্রাম মাতিয়ে রাখতে পারে না। বুড়ো ডেসমনের বুকে শুধু যন্ত্রণার ঢেউ উত্তাল হয়। নিবির দাদু, হরিপদর খুড়ো যখন এসে শহরে শত্রু সৈন্যদের অত্যাচারের কথা বলে, ডেসমন তখন বুকে জমে থাকা কান্না থামিয়ে রাখতে পারে না।

সারা জুলাই মাসটা বুড়ো ডেসমন একা একা কাটালো। বাগানের কাজে আগের মতো উৎসাহ পেতো না। তবু সকালটা গির্জার কাজে ব্যস্ত থাকতো। বিকেলগুলো ওর কাছে ভয়াবহ মনে হতো। গ্রামের সেই উচ্ছল ঝর্ণার মতো ছেলেমেয়েগুলো কোন এক শয়তানের যাদুবলে কোথায় কিভাবে যে হারিয়ে গেলো—ডেসমন যতো ভাবে ততো তার বুকে দুঃখের পাহাড় জমে। গির্জার প্রাঙ্গণে কতগুলো শিরিষ গাছ ছিলো। অন্য সময়ে গাছগুলোতে রঙবেরঙের পাখির মেলা বসতো। এখন পাখিরা আর শিরিষের ডালে গান গেয়ে ছুটোছুটি করে না। আঙ্গিনার সবুজ ঘাসের কার্পেটে প্রজাপতিরা নানা রঙের নকশা আঁকে না। শিরিষের পাতা গলিয়ে বিকেলের মরা রোদ গির্জার গায়ে জড়িয়ে থাকে। বিশাল এক শূন্যতা সারা গ্রাম জুড়ে হা হা করে কাঁদতে থাকে। বাতাসকে মনে হয় কোন ডাইনীর অভিশাপের নিঃশ্বাস। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বুড়ো ডেসমন শুধু ছটফট করে। ভাবে ঈশ্বর কেন ওকে এই নরকে ঠেলে দিলেন!

যখন সময়গুলো একেবারেই অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন ডেসমন জানালার তাকের ওপর থেকে, ফাদার গাঙ্গুলীর দেয়া 'মথি লিখিত সু-সমাচার' খানা নামিয়ে আনে। ভালো মতো পড়তে পারে না ডেসমন। চোখে ঝাপসা দেখে। তবু কোন রকমে বানান করে জোরে জোরে পড়ে—"ইতিমধ্যে পিতর বাহিরের প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন। আর একজন দাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে? কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি ফটকের নিকট গেলে আরেক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সেস্থানের লোকদিগকে কহিল, এ ব্যক্তি সেই নাযারথীর যীশুর সঙ্গে ছিল। তিনি আবার অস্বীকার করিলেন, দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনিনা। আর অল্পক্ষণ পরে যাহারা নিকট দাঁড়াইয়াছিল তাহারা আসিয়া পিতরকে কহিল, সত্যিই তুমি তাহাদের একজন। কেননা তোমার ভাষা তোমার পরিচয় দিতেছে। তখন তিনি অভিশাপপূর্বক শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন আমি সে ব্যক্তিকে চিনিনা। তখনই কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল। তাহাতে যীশু এই যে কথা বলিয়াছিলেন, 'কুকুড়া ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার

আমাকে অস্বীকার করিবে,' তাহা পিতরের মনে পড়িল। এবং তিনি বাহিরে গিয়া অত্যন্ত রোদন করিলেন।"

ডেসমন যতোবার বাইবেল পড়ে যীশুখৃষ্টের ক্রুসবিদ্ধ হবার ঘটনার কথা ভাবে ততোবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। তবু সে জোরে জোরে বাইবেল পড়ে। ওর মনে হতো বাইবেলের পবিত্র শব্দগুলো, শয়তানের মতো ভয়ঙ্কর নীরবতাকে তাড়া করে ফিরছে। গির্জার প্রাঙ্গণে অন্ধকার নামা পর্যন্ত ডেসমন বাইবেল পড়ে। নীরবতাকে ডেসমন ভয় করে একই সঙ্গে ঘৃণাও করে।
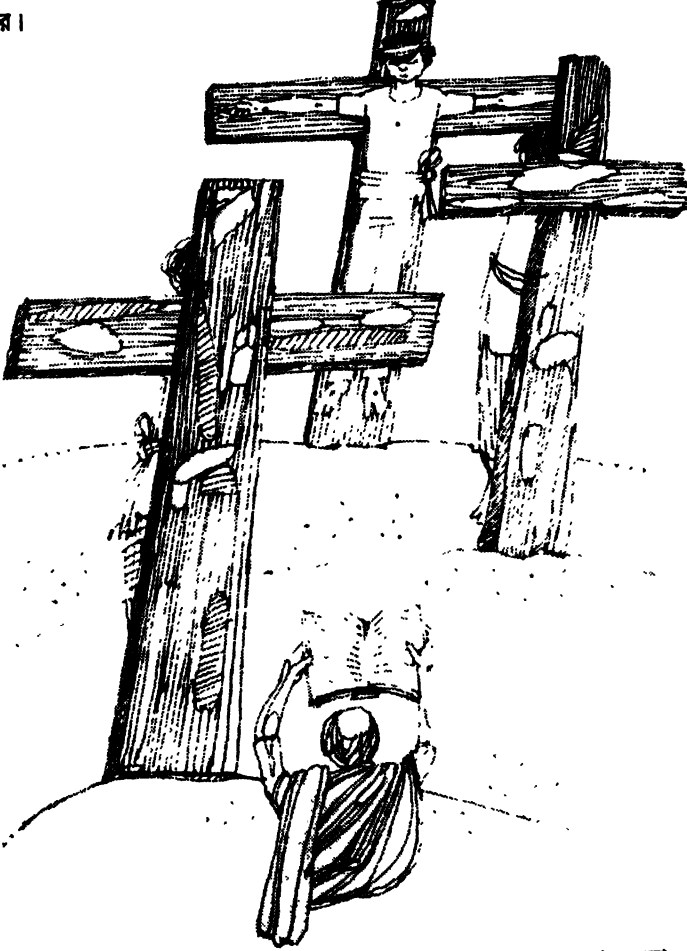
আগস্টের শেষে এক বৃষ্টিভেজা রাতে ওরা কয়েকজন এলো বুড়ো ডেসমনের ঘরে। হারিকেনের ম্লান আলোয় ডেসমন তখন গির্জার আইকন পরিষ্কার করছিলো। দরজায় হালকা পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকালো। দেখলো তিনটি ছেলে, বৃষ্টিতে ভেজা সারা শরীর, চুলের ডগা বেয়ে মুক্তোর দানার মতো জল গড়িয়ে পড়ছে। ওদের উজ্জ্বল চোখগুলো হারিকেনের ম্লান আলোতেও চকচক করছিলো। কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ডেসমনের মনে হলো, ওরা যেন তিনজন দেবদূত, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তারপর সে এতো

বেশি অভিভূত হয়ে গেলো যে, আর কোন কথাই বলতে পারলো না।

ওরা তিনজন একে অপরের মুখের দিকে তাকালো। একজন একটু হেসে বললো, 'আমরা আজ রাতে তোমার এখানে থাকবো ডেসমন দাদু।'

আরেকজন বললো, 'তোমাদের গাঁয়ের দাশু খুড়ো বলেছে, তুমি খুব ভালো লোক।'

স্বর্গের দেবদূত ওর কাছে এসেছে, ওর ঘরে থাকতে চাইছে—ডেসমন কি বলবে সহসা কিছুই ভেবে পেলো না। তারপর এলোমেলো ভাবে বললো, 'হায় হায়, থাকতি কেনে দিবেক নেই। তোমাদের কষ্ট হতিছে বাছা। আগুনের ধারে বস। সব ভিজ্যে গেছে।'

হাতের ব্যাগটা একপাশে নামিয়ে রেখে ওরা ছোট্ট উনুনটির পাশে গিয়ে বসলো। বললো, 'দাশু খুড়ো তোমার কথা অনেক বলেছে ডেসমন দাদু। বলেছে তুমিই আমাদের সাহায্য করতে পারো। তোমার মতো ভালো লোক এ গাঁয়ে আর নেই।'

বিরাশী বছরের বুড়ো ডেসমন লজ্জায় লাল হলো। স্বর্গের দেবদূত ওকে একি কথা শোনাচ্ছে! মাথা নেড়ে বললো, 'না না, সেটি ঠিক বুলে নাই। সাহাইয্য লিচ্চয়ই করিব। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন।'

অনেক রাত অবধি বুড়ো ডেসমনের সঙ্গে ওদের কথা হলো। ডেসমনের মনে হলো দেবদূতরা ওর জন্যে স্বর্গের বাণী বয়ে এনেছে। ওরা জানে, শিরিষ গাছে পাখিরা কেন গান গায় না, ঘাসফুলের প্রজাপতিরা কেন আর আসে না, পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের শব্দ আর রঙ কোথায় হারিয়ে গেছে। ওরা আনন্দের হারিয়ে যাওয়া শব্দকে ফিরিয়ে আনবে। শয়তানের বিষাক্ত যন্ত্রণার ছায়া পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে। শিরিষের ডালে আবার পাখিরা গান গাইবে। মুগ্ধ হয়ে ডেসমন ওদের কথা শোনে। ওর ঘোলাটে চোখে আনন্দ নেচে বেড়ায়। বার বার বলে, 'ঈশ্বর তুমাদের মঙ্গল করিবেন।'

স্বর্গের দেবদূত হাসতে হাসতে ডেসমনকে বলে, 'তোমাকে আমরা শিখিয়ে দেবো কি করে গ্রেনেড মারতে হয়, আর রাইফেল চালাতে হয়।'

আনন্দে উত্তেজনায় ডেসমন শুধু বলে, 'লিচ্চয়ই, লিচ্চয়ই'।

এরপর দিনগুলো যে কিভাবে কাটলো ডেসমন বুড়ো আর হিসেব রাখতে পারলো না। স্বচ্ছ সরোবর হাঁসের মতো তরতর করে সময় বয়ে যেতে লাগলো। সকালে লাঠিতে ভর দিয়ে ডেসমন নদীর তীর অবধি চলে যায়। কোনদিন আবার একেবারে শহরে ঘুরে ঘুরে সব দেখে আসে। পাহারারত পাঞ্জাবী সৈন্যরা কেউ ওকে উপেক্ষা করে, কেউ রসিকতা করে। রাতে দেবদূতের দল আসে ওর কাছে। সারা ঘর আলো হয়ে যায়। ডেসমনের কানে গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীত বাজতে থাকে। ওদের সঙ্গে ওর কথা হয়। তারপর গভীর রাতে ওরা চলে যায়। দূরে শহরে বিস্ফোরণের শব্দ হয়। মেশিনগান গর্জন করে, আবার কোথাও গ্রেনেড ফাটে। ডেসমনের চোখে আর ঘুম নামে না। শেষ রাতে ওরা এসে বলে, 'আমরা যাচ্ছি। ভালো থেকো ডেসমন দাদু। আবার দেখা হবে।'

ওরা চলে যাবার পর আবার শয়তানের মতো কদাকার সেই নীরবতা ডেসমনকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়। লাঠিতে ভর দিয়ে ডেসমন গ্রামের ভেতরে যায়। তালা বন্ধ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে, 'হরিপদর খুড়ো ঘরে আছে? ও হরিপদর খুড়ো?' কেউ কোন সাড়া দেয় না।

আরেকটা শেকল তোলা দরজার সামনে গিয়ে ডেসমন ডাকে, 'নিবির দাদু? ও নিবির দাদু?' উঠোনের কোণ থেকে হাড় বের করা একটা লোমঝরা কুকুর শুধু একবার মাথা তুলে

ডেসমনকে দেখে। গ্রামের সবাই চলে গেছে। ভীষণ ভয় পায় ডেসমন। লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে আবার গির্জায় ফিরে আসে। অসময়ে গির্জার ঘণ্টা বাজায়। ডেসমনের মনে হয়, শব্দের অভাবে ও বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

অবশেষে একদিন সেই ভয়ঙ্কর সময়ের মুখোমুখি হলো ডেসমন বুড়ো। শেষ রাতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ও গভীর আনন্দে ঘুমিয়েছিলো। তখন আকাশের অন্ধকার সবেমাত্র ফ্যাকাশে হতে সুরু করেছে—গির্জার বড় ফটকের বাইরে শব্দ শুনে ওর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। কিছু উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর—কথা বোঝা যাচ্ছে না।

লাঠি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ডেসমন। ততোক্ষণে ফটকে করাঘাত পড়েছে। ভারি ফটকটা ধীরে ধীরে খুলে বাইরে তাকিয়ে যা দেখলো তাতে ওর সমস্ত শরীর পাথরের মতো জমে গেলো। কয়েকজন হিংস্র মানুষ ওদের ঘিরে পাশবিক উল্লাসে ফেটে পড়েছে। ওরা তিনজন, স্বর্গের সেই দেবদূত—হাতগুলো বাঁধা, সারা শরীরে ধুলো আর রক্তের দাগ নিয়ে একদল ভয়াল নেকড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো।

একজন নেকড়ে ধারালো গলায় বললো, 'এই বুড়ো, এগুলোকে চিনিস ? তোদের গির্জার পাশে ঘুরছিলো।'

ডেসমন আবার দেখলো ওর প্রিয় দেবদূতদের। যারা ওর জন্যে স্বর্গের বাণী বয়ে আনতো। ডেসমন অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো, ওদের চোখে এখনো স্বর্গের আলো খেলা করছে। বিড় বিড় করে বললো 'ওরা স্বর্গের দেবদূত।'

নেকড়েরা আবার গর্জন করে উঠলো, 'কিরে কথা বলছিস না কেন ? আগে কখনো দেখিসনি এগুলোকে ?'

ডেসমনের গলাটা কেঁপে গেলো। বললো 'না'। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে ওর ঘরে চলে গেলো। পবিত্র বাইবেলে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বার বার বললো,'না, প্রভু না—'

বাইবেলের ভেতর থেকে ক্রুসবিদ্ধ যীশুর অন্তিম বাণী শুনতে পেলো ডেসমন। প্রভু ক্রুসের উপর থেকে বলছেন, "ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর ! তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ ?" এতটুকু শব্দ না করে ডেসমন অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

বেশীক্ষণ ঘরে থাকতে পারলো না ডেসমন বুড়ো। বাইরের কোলাহল আরও কাছে মনে হলো। তাকিয়ে দেখলো নেকড়ের দল পাঁচিলের ধারে পড়ে থাকা কবরের কাঠগুলো নিয়ে ছুটোছুটি করে কি যেন বানাচ্ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ডেসমন। সহসা ওর বুকের ভেতরটা কে যেন এক অদৃশ্য মেসিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিলো। একি করছে ওরা ? ডেসমন দেখলো অল্প সময়ের মধ্যে শয়তানের দল তিনটি ক্রুস বানিয়ে উঁচু ঢিবিটার ওপর পুঁতে দিয়েছে। আর তিনজন দেবদূত—হায় ঈশ্বর—ছুটে যেতে গিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ডেসমন।

তিনজন দেবদূত এতটুকু শব্দ করেনি। ওদের মুখে শুধু যন্ত্রণার নীল ছায়া গাঢ় হলো। ডেসমন মাটি থেকে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো। আকাশের ঘন কালো মেঘের গায়ে তিনটি বিশাল ক্রুস। গির্জার প্রাঙ্গণে যীশুখৃষ্টের ক্রুসবিদ্ধ মূর্তি দেখেই শয়তানের দল এই নির্মম মৃত্যুর কথা ভেবেছিলো।

তিনজন মুক্তিযোদ্ধা, যারা গতরাতেও শত্রুর শিবিরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, সকালে তারা

তিনজন যীশুখৃষ্ট হয়ে গেছে।

ডেসমন মেঘের গায়ে ক্রুসবিদ্ধ যীশুকে দেখতে পেলো। ঠিক এই রকম ক্রুসের উপর থেকেই তিনি বলেছিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী। ঈশ্বর আমার ঈশ্বর" ···· ।

নেকড়ের দল হল্লা করে বেরিয়ে গেলো। ডেসমন দেখলো কি যেন বিড় বিড় করে বলছে ওরা। হাত থেকে রক্ত ঝরছে। সারা শরীর বেয়ে রক্তের ধারা নেমে এসেছে। মাথা একপাশে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে। ডেসমন ছুটে গেলো ক্রুসের নিচে। আবার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। তবু সে শুনতে পেলো। একবার, দুবার, তিনবার। পরপর তিনবার শুনলো সেই কথা। ডেসমনের বুকের ভেতর গেঁথে গেলো—'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা।' আর ঠিক সেই সময় আকাশ আর মাটি কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো।

তিনদিন পর বুড়ো ডেসমন ঘরে বসে গুন গুন করে বাইবেল থেকে যীশুর পুনরুত্থানের অধ্যায় পড়ছিলো। দরজায় পায়ের শব্দ শুনে চমকে তাকালো। দেখলো তিনজন দেবদূত। হাসি মুখ, উজ্জ্বল চোখ, মুক্তোর মত ঘাম। আগের মতো তিনজন মুক্তিযোদ্ধা।

ডেসমনের চোখের সামনে তখন মথি লিখিত সু-সমাচারের শেষ কথাটা নেচে বেড়াতে লাগলো—"আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"—শব্দগুলো ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ ক্রুসবিদ্ধ যীশুখৃষ্ট হয়ে গেলো।

ওদের একজন একটু হেসে বললো, 'আমরা এসেছি।'

বুড়ো ডেসমন কয়েক লক্ষ যীশুখৃষ্ট দেখতে দেখতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।
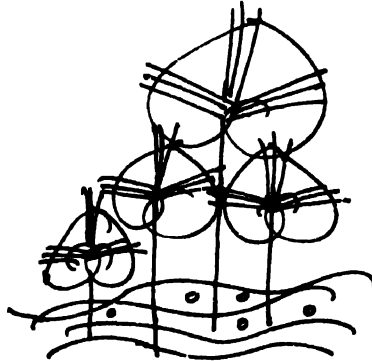
লতা পাহাড়পুরের কাশু

আলী ইমাম

কাঁচের শার্সি দিয়ে আলতো করে রোদ নেমে আসে। শীতের সকালে এই রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে। হুইল চেয়ারটিকে হাত দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বারান্দায় নিয়ে আসে কাশু। মিরপুরের রাস্তা দিয়ে তীব্র বেগে বাসগুলো ছুটে যাচ্ছে। বাগানের ফুল গাছগুলো অযত্নে শুকিয়ে যায়। সারারাতের কুয়াশায় ভিজে থাকা সবুজ ঘাসের উপর ছুটোছুটি করে একটি কি দু'টি চড়ুই। কয়েকটা পাতিকাক 'পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র' লেখা সাইন বোর্ডের উপর বসে ডাকতে থাকে। কাশুর মনে হয় এক্ষুনি বুঝি পাকঘর থেকে মা বেরিয়ে এসে ঢিল ছুঁড়বে। পাতিকাকের ডাক মা একদম সহ্য করতে পারে না।

হুইল চেয়ারটাকে গড়িয়ে সামনের দিকে নিয়ে যায় কাশু। মেঝেতে একটি পত্রিকা পড়ে আছে। বিজয় দিবস সংখ্যা। ভেতরের পাতায় কালো বর্ডার দিয়ে রকিব মাস্টারের ছবি। নিচে বড় বড় টাইপে লেখা 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা ...

তারপর পাতাটা ছেঁড়া। রকিব মাস্টার যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

হাসতে হাসতেই হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে যেতেন রকিব মাস্টার। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো যেন ঝকঝক করছে। গম্ভীর হয়ে বলতেন, 'এমনিতে হবে না। আরো ট্রেনিং লাগবে। বুকে পাথর বাঁধতে হবে। মনকে শক্ত করতে হবে। এই নরোম হাতে চলবে না। হাতে কড়া পড়তে হবে।'

ক্যাম্পের সব ছেলেদের কাছে গিয়ে এসব কথা বলতেন রকিব মাস্টার। কখনো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতেন। বলতেন, 'তুই পরানপুরের জব্বার বেপারীর ছেলে না? তোর বাপকেতো বেয়োনেট দিয়ে চিরে ফেলেছিল। তোদের গোলাবাড়িতো লুট হয়েছিল। তোদের বাড়িটাতো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সব সাফ হয়ে গিয়েছে। তোর আর কোন পিছুটান নেই। জ্বালা ছাড়া

তোর আর কোন সংগি নেই।'

আবার কখনো অন্য একটা ছেলের দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে বলতেন, 'কোথায় যেন তোকে প্রথম দেখেছি। ঠিক মনে পড়ছে। ভুবনপুরের হাটে। সেই হাটে মুড়ির মোয়া বেচতি। তিলের নাড়ু বেচতি।এখনতো ভুবনপুরের হাটে মিলিটারীদের ক্যাম্প। সারা গ্রাম তছনছ করে দিয়েছে। যাবি না সেখানে? যেতে তোকে হবেই। সাথে করে গ্রেনেড নিয়ে যাবি।

লতাপাহাড়পুর হাইস্কুলের রকিব মাস্টার এমনি করে ওদের বুকে ধিকিধিকি আগুন জ্বালিয়ে তুলেছেন।

সেই রকিব মাস্টারের ছবিটা এখন ছেঁড়া। জানালা দিয়ে শীতের বাতাস এসে পত্রিকাটিকে ঝরা পাতার মত উড়িয়ে নিয়ে গেল।

চারদিকে শনঘাসের বন। তার মাঝে ছোট একটা স্কুল। বেড়ার ঘর। পেছনে পাহাড়। সেই স্কুলটাই ছিল ওদের ট্রেনিং ক্যাম্প। কমান্ডার রকিব মাস্টার।

সে এক দারুণ সময় গেছে কাশুর। ওদের লতাপাহাড়পুর গ্রামটা যেদিন মিলিটারীরা পুড়িয়ে দিল সেদিন থেকেই অন্যরকম সে। রকিব মাস্টার বুকের ভেতর যন্ত্রণাটাকে আরো বাড়িয়ে দিলেন।

'কাশু, তোমার ছোট বোন ময়না ডুরে শাড়ি পরতো শখ করে। শাপলার ডগা দিয়ে নথ বানাতো। তোমার জন্যে সরপুটি ধরতো খাল থেকে। কামরাঙা নিয়ে আসতো কোঁচড় ভরে। সেই ময়না কই? তার ছোট শরীরটা গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের উঠোনে উপুড় হয়েছিল ময়নার লাশ। লাল রক্তে মাটি ভিজে থকথকে। খড়ের গাদায় বসে পাতিকাক ডাকছিল। তখন তোমার মা কই কাশু? তোমার মার লাশ তখন লেবু ঝোপের ভেতরে। তোমার মা আর কোনদিন সন্ধ্যা বেলায় উঠোনে বসে লালকমল আর নীলকমলের গল্প বলবে না।'

এমন করে ফিসফিস করে বলতেন রকিব মাস্টার যে হাতের আঙুলগুলো নিশপিশ করে উঠতো।

দুপুরের দিকে এসেছিল মিলিটারীরা। ওদের লঞ্চ এসে থেমেছে বিলের মুখে। সমস্ত লতাপাহাড়পুর গ্রামে নিমিষের মাঝে আতংকের স্রোত ছড়িয়ে গেল। গ্রামের উত্তর দিক থেকে ধোঁয়া উঠছে। মানুষের আর্ত চিৎকার। মাঝে মাঝে গুলীর শব্দ। গ্রামের জোয়ান ছেলেরা পালিয়ে গেল দূরের চরে। শুনেছে জোয়ান ছেলেদের দেখলেই নাকি গুলী। সন্ধ্যা বেলায় পোড়াগ্রামে ফিরে এসে দেখলো বীভৎস দৃশ্য।

রাতের অন্ধকারে গ্রাম থেকে পালালো কাশু। আরো ক'টি ছেলের সাথে। ঝিপঝিপ করে বিষ্টি হচ্ছে। তাদের যেতে হবে অনেক দূর। তারা এখন অন্যরকম মানুষ হয়ে গেছে। প্রতিশোধ নিতে হবে। যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে হবে। ঝিঙে ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবলো কাশু কতোদিন ময়না আর সে হাট থেকে সবজী কিনে এ পথ দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। রসকদমা আর তিলের নাড়ু নিয়ে।

শনঘাসের জংগল বাতাসে ছমছম করে। ভোরবেলা থেকে শুরু হয় ওদের ট্রেনিং। সারাদিন ধরে চলে নিজেকে প্রস্তুত করার সংগ্রাম। কোন কোন রাতের বেলায় রকিব মাস্টার ওদের বলিভিয়ার জংগলের কথা বলেন। চে গুয়েভারার কথা, গেরিলা যুদ্ধের কথা বলেন।

একদিন রকিব মাস্টারের কাছে গিয়ে কাশু বলে।

স্যার, আমি গ্রামে যামু। আলেফ মাতবর এখনো বুক ফুলাইয়া হাঁটে। এই মাতবরই মিলিটারীরে পথ দেখাইছিলো।

তখনো সন্ধ্যা নামেনি। চাষিরা ফিরছে মাঠ থেকে। গ্রামের পেছনের কবরস্থানের কাছে এসে দাঁড়ালো কাশু। জামগাছটার পাতা ঝিরঝির করছে। দূরে বাজারের মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। আলেফ মাতবর নিশ্চয়ই বাজারে চায়ের দোকানে বসে গল্প করছে। লোকটা মানুষ না

শয়তান। নিজের হাতে গ্রামটার সর্বনাশ করেছে। আজ কাশু ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছে। আজ সে অস্ত্র চালাতে জানে। সেদিনের মায়ের লাশ, ছোট বোনের লাশ পেছনে ফেলে পালিয়ে যাওয়া কাশু এখন অন্য মানুষ।

বাঁশঝাড়ের নিচ দিয়ে পথ। বাঁশ পাতা উলুঝুলু করে দুলছে। যেন বলতে চাইছে—কাশু এলি? চোখটা ভিজে আসে তার। কতো চেনা পথ। ঐতো শিবমন্দির। অসিতদের বাড়ি। কামরাঙা গাছ। আজ তাকে নিজের গ্রামে চুপি চুপি আসতে হচ্ছে। চারদিকে তাকিয়ে বড় মায়া লেগে গেল কাশুর। অসিতদের বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। কারা যেন ঘরের টিনগুলো খুলে নিয়ে গেছে। অসিতের বাবা ছিলেন কবিরাজ। বাড়িতে হরিতকী আর আমলকীর গাছ লাগিয়ে

ছিলেন। পুকুর পাড়ে গাছের ছায়ায় চুপচাপ বসে থাকতেন কবিরাজ কাকা। তাঁকে দেখলে মনে হতো একজন শান্ত, সুন্দর মানুষ। কবিরাজ কাকা নাকি এক সময় কবিতা লিখতেন। সেই মানুষটা বাড়ি ছেড়ে পালাতে পারেন নি। নিমগাছের ডালে বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে রেখেছিল মিলিটারীরা। কবিরাজ কাকা বলতেন—'নিমগাছ বড্ড পবিত্র গাছ। নিমগাছের বাতাসে অসুখ বিসুখ আসে না। যার বাড়িতে নিমগাছ থাকবে তার কল্যাণ হবে।'

বুকটা ঝনঝন করে ওঠে কাশুর। সমস্ত গ্রামটা চুপ হয়ে আছে। আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যায় কাশু। তার ছেলেবেলা মিশে আছে এর পথে ঘাটে। ওদের বাড়িটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে কাশুর। ছোট্ট মুলি বাঁশের সাঁকোটা পেরিয়ে যায়। কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ হয়। কি একটা পাখি ঝুপ করে উড়ে যায়। মুন্সি বাড়িতে নতুন টিন বসিয়েছে। সেই চাল ঝকঝক করে। কাশু যতো তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ততোই তার ভেতর থেকে একটা চাপা কান্না বুক ঠেলে উঠে আসছে। সন্ধ্যা বেলায় পাশের গ্রামের মাঠ থেকে ফুটবল খেলে ফিরলে ময়না দৌড়ে আসতো। মা বকাঝকা করতেন। তারপর পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে ভাত খেতে বসা। মা কই মাছ ভেজে দিয়েছেন। ময়না লেবু কেটে এনেছে। চোখ ভিজে যায় কাশুর। গাছের পাতা বাতাসে শনশন করে। বড়ুই গাছ বুঝি বলে—কাশু এলি ?

একসময় উঠোনে এসে দাঁড়ায় কাশু। ডাঁটা ক্ষেত শুকিয়ে গেছে। ময়নার লাশটা পড়েছিল এখানেই। মাটিতে বসে পড়ে কাশু। পাকঘরের দিকে তাকায়। থিকথিকে অন্ধকার। মা চুলোতে পাটখড়ি গুঁজে দিতেন। চুলোর আলোতে মার মুখ লালচে দেখাতো। শীতের রাতে মা নতুন চালের পিঠা বানাতেন। মার মুখে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। পাকঘরের দরজাটা বাতাসে কঁ্যাচ করে নড়ে উঠলো। আর সহ্য করতে পারলো না কাশু। ডুকরে কেঁদে উঠলো।

ঃ মাগো, আমি আইছি। তোমার পোলা কাশু আইছে। কত দূর থেইকা আইছে। সারাদিন তোমার পোলার পেডে কোন দানা-পানি পড়ে নাই। তারে তুমি খাইতে দিবা না মা ? তার জন্যে কই মাছ ভাইজা দিবা না ? ময়নারে, তুই ভাইজানের জন্যে লেবু কাইটা দিবি না ?

রকিব মাস্টারের কথা মনে পড়ে। মনটারে শক্ত করবে। প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিশোধ। উঠে দাঁড়ায় কাশু। বাজারে গিয়ে আলেফ মাতবরকে ধরতে হবে। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছে। হনহন করে হাঁটতে থাকে কাশু। তার মনে যেন কোন ভয় নেই।

বাজারের গফুরের চায়ের দোকানে লোকজন নিয়ে বসেছিল আলেফ মাতবর।

সাহসী পায়ে বাজারের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় কাশু। প্রথমে চোখে পড়ে আলেফ মাতবরকে। হারিকেনের মৃদু আলোতে কাশুকে আবছা দেখাচ্ছে।

ঃ কেডা, কেডা ঐহানে ?

কাশু কোন জবাব দেয় না। আলেফ মাতবর এবার দরজার বাইরে এসে বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে ওঠে 'কেডারে।'

ততক্ষণে কাশুর বুক থেকে চাদর সরে গেছে। হাতে ধরা স্টেন। ট্যাট ট্যাট ট্যাট করে শব্দ হলো। আলেফ মাতবরের বিশাল শরীর লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। বাজারের আতংকিত লোকজন ছুটতে লাগলো। হারিকেনটা মাটিতে উল্টে পড়ে আছে। আলেফ মাতবর রক্তের ভেতরে উপুড় হয়ে আছে। ঠিক তেমনি ভাবে উপুড় হয়েছিল ময়না।

কয়েক মাস পেরিয়ে গেল। সামনের বর্ষায় ওরা অপারেশনে যাবে।

কদমতলীর হাটে মিলিটারীরা একটা ক্যাম্প করেছে।

বিলের পাশ দিয়ে চুপি চুপি হেঁটে আসছে ওরা। চারদিকে লোকজন নেই। শঙ্খচিল উড়ছে কয়েকটা। দামের উপর দিয়ে গরু হেঁটে যাচ্ছে। দূরে দেখা যায় পুল। ডিস্ট্রিক বোর্ডের পাকা রাস্তা। ওখান দিয়েই মিলিটারীর জীপ যায়। কাশুদের দল ঝোপের ভেতরে সারাদিন লুকিয়ে রইলো।

কাশু আর দুটো ছেলে ব্রীজের নিচে গিয়ে ঘাপটি মেরে রইলো। বিকেল হয়ে আসছে। এখুনি জীপ আসবে। বুকটা ধকধক করছে। ব্রীজের নিচে কচুরীপানার ঝাঁক। বেগুনী ফুলের পাশে বক বসে। মন্তু বলে, আসতাছে। ···· মাথাটা একটু তুলে দেখে কাশু। একটা জীপ আসছে। হাতের মুঠোতে শক্ত করে ধরা গ্রেনেড। তিনজনেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। জীপটা কাছে আসা মাত্র গ্রেনেডের পিন খুলে ছুঁড়ে দেয়। প্রচণ্ড শব্দ। পানিতে ডুব সাঁতার দেয়ার আগেই দেখতে পায় কাশু। রাস্তার উপর ছিটকে পড়েছে কয়েকটা মিলিটারীর রক্তাক্ত শরীর। একজন সৈনিক দেখতে পেয়েছে কাশুকে। বিলের পানিতে মাছের মত নেমে যাচ্ছে। স্টেন তুলে গুলী করলো সে। কাশু তখন ঠাণ্ডা পানিতে নেমে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা গুলী এসে বিঁধলো তার কণ্ঠনালিতে। মাথাটা ঝনঝন করে উঠলো তার। পায়ে এসে আবার গুলী লাগলো।

আকাশের পাখিগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে। সামনের কাশবনের ভেতর থেকে যেন ময়না দৌড়ে আসছে। জ্ঞান হারাবার আগে কাশু বুঝলো একটা শক্ত হাত তাকে জাপটে ধরেছে।

ঘুম ভেঙ্গে কাশু দেখে ক্যাম্পের হাসপাতালে শুয়ে আছে সে। ঢোক গিলতে পারছে না। অসহ্য যন্ত্রণা। রকিব মাস্টার ঝুঁকে আছেন তার দিকে। ক্যাপ্টেন ডাক্তার বললেন, কাশুর গলার রগ ছিঁড়ে গেছে। ও আর কোনদিন কথা বলতে পারবে না। বাঁ উরুতে গুলী লেগেছে। সেটাও কেটে বাদ দিতে হবে।

দেশ স্বাধীন হলে কাশুকে এই কেন্দ্রে দিয়ে গেছেন রকিব মাস্টার। কতো কথা বলতে ইচ্ছে করে কাশুর। কিছুই বলতে পারে না। বিজয় দিবসে বাড়িতে বাড়িতে পতাকা উড়ছে। কয়েকটা ট্রাক বোঝাই ছেলে গেল চিৎকার করতে করতে। আজ এখানে ভালো খাবার দেবে। টেলিভিশন থেকে ক্যামেরা আসবে আলো জ্বালিয়ে ছবি তুলতে। ওরা হুইল চেয়ারে সার বেঁধে হাসি মুখে বসে থাকবে।

কাশু চেয়ারটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে এক কোণায় নিয়ে যায়। দেখে দুটো চড়ুই ঘাসের ভেতর থেকে কি যেন খুঁটছে। কাশু বলতে চায় 'ও চড়ুই, আমার লতাপাহাড়পুর গ্রামে উড়ে যাবি? সবুজ পাতা মুখে নিয়ে উড়ে যাবি? কদমগাছের নিচে ময়নার ছোট্ট কবর। তার উপরে পাতাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আসবি?'

কাশু তাকিয়ে থাকে চড়ুই দু'টোর দিকে। ওর চোখ ততক্ষণে ভিজে এসেছে।
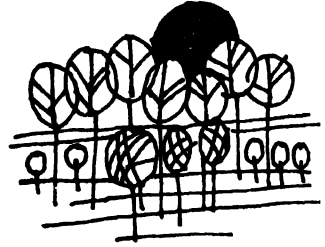
ভোটরঙ্গ

প্রণব মুখোপাধ্যায়

কয়েক বছর আগের কথা।

ছেলে পড়িয়ে খাই, মোড়ের মাথায় চারজন লোক গরম হয়ে কথা বললে উল্টো পথে হাঁটি, নিজে কখনও ভোট দিই নি আর সেই আমাকেই কিনা ভোট নিতে যেতে হল! আর এমন এক জায়গায় যার নাম শুনেই লোকে চমকে উঠে কেমন চুপ মেরে যেতে লাগল, আর আমার দিকে এমন করুণার চোখে তাকাতে লাগল যেন এই আমাকে শেষবারের মত দেখছে।

তবু বুকে সাহস আর সঙ্গে ছয় সঙ্গী, পঞ্চাশ রকমের জরুরি কাগজপত্র আর ফর্দ মিলিয়ে একাত্তরটি মালপত্র—হ্যারিকেন থেকে ছুঁচ অবধি নিয়ে বাসে চাপলাম। বহুদূর চলার পর বালির ওপর ঘসটে চাকা টেনে বাস চলল, সবাই বললে নাকি নদী পেরোচ্ছি। এখন একটু শুকিয়ে গেছে এই যা। তারপর আরো বহুক্ষণ চলার পর নামা গেল দুনিয়ার আর এক প্রান্তে। সঙ্গে দুটি সেপাই ছিল, নেহাৎই নাবালক। ওরা নাকি ওদের জমি চষছিল। এমন সময় গবরমেণ্টের লোক এসে লাঙ্গল কেড়ে পেয়ারাগাছের খেঁটে লাঠি ধরিয়ে দিয়ে জোর করে সেপাই করে দিয়েছে। ভোটের পর ছেড়ে দেবে।

সব শুনে গেঁথে, সেপাই দুটিকে ঘুম থেকে তুলে ফর্দ খুলে চৌকিদারের নাম খুঁজতে লাগলাম। এ সময় তার এখানে থাকার কথা। নাম ধরে কয়েকবার চেঁচালাম 'পঞ্চু হালুই' 'পঞ্চু হালুই' করে। দূর থেকে কি একটা পাখি বারবার সাড়া দিয়ে গা পিত্তি জ্বালিয়ে দিলে। হাঁক ডাক শুনে সেক্টর আপিসের জীপ এসে আমাদের নিয়ে চলল। পঞ্চু হালুইয়ের পাত্তা মিলল না। অথচ ওর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কথা। সেক্টর অফিসার গজরাতে লাগলেন, 'দাঁড়াও ব্যাটার চাকরি ঘোচাচ্ছি।'

গাড়ি আমাদের নিয়ে ত চলল, কিন্তু কোথায়? রাস্তা কই? এ তো উঁচুনিচু টিপি আর গাছের

ঝোপঝাড় বিছিয়ে আছে চারদিকে। তবু চলল জীপ সেই সব মাড়িয়ে। বার চারেক উল্টোতে গিয়েও সোজা হল। আমাকে শূন্যে তুলে লুফতে লুফতে মাইল তিনেক মাঠ পেরিয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা ডোবার মধ্যে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে ইস্কুল বাড়িতে হাজির হল গাড়ি। এখানেই কাল ভোট নেওয়া হবে।

এই নাকি স্থানীয় ইস্কুল। গোটা আষ্টেক খুঁটির ওপর একটা খোড়ো চাল ঝুলে আছে কোনমতে। গোবর ল্যাপা নড়বড়ে মাটির দেওয়াল। ঝোড়ো হাওয়া বইলে কাল অবধি টিঁকবে কিনা সন্দেহ।

জীপ বিদায় নিল।

কোত্থেকে এগিয়ে এলেন এক পুলিশ সাবইন্সপেক্টর। বললেন, 'আগেই আমরা এসে গেছি। ঐ ওধারে একটা ঘরে আছি।' দেখলাম বেশ বড় ধরনের একটা পুলিশ দল। এই ধূ ধূ জনপ্রাণীহীন প্রান্তরে এত পুলিশ কেন রে বাবা! বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

আসবাব বলতে দুটো ভাঙ্গা চেয়ার, একটা তিন ঠ্যাঙো টেবিল আর কয়েক সার লজগজে বেঞ্চি। ওগুলোতেই ভোট নেবার কাজ চালাতে হবে। এর মধ্যে জীপের আওয়াজ পেয়ে দুচারজন স্থানীয় মানুষ এসে হাজির।

এমন ভাবে তারা আমাদের দেখতে লাগল যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে আসছি। আমাদের

সেনবাবুর চশমাটা দেখিয়ে একটা ছেলে বুক ফুলিয়ে আর একজনকে জানাল যে তার কোন খুড়োও নাকি চোখে ও রকম পরে। তারপর বিস্ময় কমলে সেই ছেলেটিই, নাম বলল ভূতনাথ, মুড়ি আর জল নিয়ে এল। তারপর দেখি দুজন লোক একটা খাটিয়া ছেড়ে ঘুম থেকে উঠে হাই তুলে সামনে দাঁড়াল। তাদের একজন জামা তুলে পেটের তলা থেকে একটা পেতল আঁটা বেল্ট বার করে জামার ওপর পরে নিল। বুঝলাম এই চৌকিদার। বললাম, 'কি গো, তোমার না থাকার কথা ছিল বড় রাস্তায়? অফিসার বাবু চটেছেন।' তাতে ওর বিকার হল না। আরো বড় একটা হাই তুলে বলল, 'কি করব বাবু, গাড়ি গেলে ত। বাম দিকের গরুটি শিষ্ট। কিন্তুক ডেনদিকেরটি মাথাগরম করলে।' তারপর ভূতনাথকে ধমকে বলল, 'কি রে, আমরা একগাল মুড়িটুড়ি পাব না?'

খাটিয়ার অপরজন চুলটুল আঁচড়ে একটা ভাঙ্গা সাইকেল তুলে ছোট সেলাম দিয়ে বলল, 'ক্রাসিন আনতে হবে ত বলুন, যাই! আমার নাম হারানিধি, লিস্টির সঙ্গে মিলিয়ে নিন।' লিস্টে দেখলাম নাম রয়েছে, হারানিধি চৌবে, সাইকল মেসেনজার। বললাম, 'এত তাড়া কিসের? একটু রোদ পড়ুক না।' ও চমকে উঠে বলল, 'আলো পড়ে এলে স্যার কোথাও যেতে পারব না, মাপ কববেন।' স্থানীয় একজন মুরুব্বি মত লোক মজা দেখছিল। বলল, 'আলো পড়ে গেলে ঐ খালপারের মাঠ কেউ পেরোইনা আমরা। ওখানে ডাকাতির মহড়া হয়। দু পাঁচ টাকা আর তেল নুন সঙ্গে থাকলে ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে কেড়ে কুড়ে নেয়। মানুষ মারায় হাত পাকানোও হল, কিছু পাওয়াও গেল।' আমি জায়গাটার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিললাম। আর আমার দলের সেপাই দুজন লাঠি হাতে আমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। এমন সময় সাব ইন্সপেক্টর সায়েব এগিয়ে এসে ইস্কুল ঘরের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

চেয়ারটা একটা সন্দেহজনক শব্দ করল। তারপর, 'কোনো ভয় নেই স্যার, আমি খোঁজ খবর নিয়ে এলাম, গণ্ডগোলের কোন চান্স নেই,' বলে জাঁকিয়ে যেই হেলান দিয়েছেন অমনি সমস্ত জোড়টোড় খুলে চেয়ারটা হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গেল। স্থানীয় মুরুব্বিটি অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'এঃ হে হে, নিতাই সারের চেয়ার'—আকাশ থেকে ঠ্যাং নামিয়ে ধড়ফড় করে পুলিশ সায়েব উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ভাঙ্গা টুকরোগুলো লোকটির হাতে গুনে গুনে তুলে দিয়ে দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'নিতাই স্যারকে অ্যারেস্ট করা উচিত।'

তারপর কেরোসিন এল, হ্যারিকেন জ্বলল, কাগজপত্রের কাজ নিয়ে বসলাম। কাপড় টাঙ্গিয়ে গোপন ভোটকক্ষ তৈরি হল। পুলিশদের সঙ্গে মুরগীর ঝোলভাত খেয়ে, ব্যালট পেপারের বাণ্ডিল মাথায় দিয়ে ঘুম দিলাম। ঘরের একটা দরজাতেও খিল নেই। টেবিল বেঞ্চিগুলো দরজায় লাগিয়ে পুলিশদের সতর্ক থাকতে বলে তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। খালি দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে চমকে উঠলাম—ঐ বুঝি কে দোর ঠেলে ছায়ার মত এগিয়ে এল, ঐ বুঝি আমার মুণ্ডুটা বাঁ হাতে তুলে ডান হাতে ব্যালট পেপার ছিনতাই করল।

ভোর না হতেই, বাপরে বাপ, সে কি বিরাট লাইন। কোত্থেকে সব মেয়ে পুরুষ, বুড়োবুড়ি সার সার গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে। সবাই আগে ভোট দেবে। পুলিশরা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল ভিড় সামলাতে। সারাদিন ধরে চলল ভোট দেবার জন্যে কাড়াকাড়ি। অতি উৎসাহী কেউ আবার টাটকা ভোটের কালি মাথায় মুছে কিংবা চেটেপুটে আঙ্গুল থেকে তুলে ফেলছিল। ধান্দা ছিল পরে ফের বেনামে আর একবার ভোট দেবার ফিকির খুঁজবে। তাদের ধরে ধরে ভাল করে কালি মাখানো হল। পুলিশ দিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে, জেল খাটাবার ভয়

দেখিয়ে তবে কোনমতে নিরস্ত করা গেল।

কোথা দিয়ে যে দুপুর গড়িয়ে সাড়ে চারটে বেজে গেল টেরই পেলাম না। শুধু হাত পা গুলো অবশ হয়ে এল আর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। মাঝে মধ্যে একটু আধটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল বটে, বাইরে দাঁড়িয়ে দুপক্ষ মুখোমুখি আস্তিন গোটাচ্ছিল। তবে তা সামাল দিতে অসুবিধা হয়নি। একবার শুধু দুম করে কোথায় একটা পটকা ফাটল। দেখতে যাচ্ছি, ধাক্কা খেলাম সেই দুই সেপাইয়ের সঙ্গে। ঊর্ধশ্বাসে তারা ঘরে এসে ঢুকল। তাদের লাঠি দুটো কুড়িয়ে হাতে গুঁজে ধমকে ধামকে ফের বাইরে দাঁড় করিয়ে দিলাম। পুলিস লাগাতে হয় নি। শুধু জোড়হাতে অনুনয় করে বললাম, 'দয়া করে নির্বিঘ্নে ভোট হতে দিন। হাঙ্গামা বাধালে মালপত্র তুলে নিয়ে বাক্স উল্টে ভোট বাতিল করে চলে যাব।' এই কথাতেই কাজ হচ্ছিল খুব। দিনের শেষে হাঁপ ছাড়লাম। ভোটের বাক্স প্যাঁটরা গুণে, লোকজন নিয়ে জীপে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় সাদা কাগজ হাতে সেই ভূতনাথ এসে হাজির। একগাল হেসে কাগজটা সামনে মেলে ধরে বলল, 'একটা সাটিফিট দিন স্যার।' বললাম, 'কিসের সার্টিফিকেট ?' 'ঐ যে কত কাজ করলুম ! মুড়ি জল এনে দিলুম, পুলিশদের জামাটুপি টাঙ্গাবার পেরেক হাতুড়ি—'

অন্ধকার নামছিল। তাই আর কথা না বাড়িয়ে খসখস করে কোনরকমে কিছু প্রশংসা লিখে দিয়ে বললাম, 'কি হবে এটা দিয়ে ?' ও বলল, 'পঞ্চায়েৎ আফিসে চাকরি চাইব।'

আমি বললাম, 'ইস্কুলে পড় না ?' ভোটের ঘরটা দেখিয়ে ও বলল, 'এই তো আমাদের ইস্কুল। চাকরি পেলেই পড়া ছেড়ে দোব।'

আমাদের গাড়ি ফিরে চলল মাঠের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে।

সোয়ালো পাখীর গল্প

মুনতাসীর মামুন

'আমাদের এখানে শীতটা খুব মজার, তাই না?' বললো জয়া, 'একটু হিম হিম ভাব। উজ্জ্বল আকাশ। কি সুন্দর!'

'ধ্যুৎ, হিম হিম ভাবই যদি হবে আর উজ্জ্বল আকাশই থাকবে তা' হলে আর শীত হলো নাকি?' বললাম আমি, 'শীত হবে শীতের মতো। তুষার ঝরবে অবিরল বৃষ্টির মতো। ঘরের ছাদ, রাস্তা ঘাট মাঠ সব শাদা হয়ে যাবে। ঘরের দরোজা জানালা সব থাকবে বন্ধ। ভেতরে জ্বলবে গনগনে আগুন, জানালার ভেতর দিয়ে তুষার দেখবি, তবেই না শীত। আমার ঝুনুচাচা কি বলেছেন জানিস, হাঙ্গেরীর গ্রামগুলিতে শীতকালে নাকি ভীষণ শীত পড়ে। আর প্রথম যেদিন তুষার ঝরে সেদিন গ্রামের রেঁস্তোরায় টাম্বুরিন বাজিয়ে সবাই তুষারপাতকে স্বাগত জানায়। আমাদের এখানকার শীত অনেকটা আমেরিকার অটামের মতো।' অটাম শব্দটা আমি নতুন শিখেছি ঝুনুচাচার কাছে।

'অটাম মানে?' জিজ্ঞেস করে জয়া।

'শরতকাল আর কি!' বলি আমি. 'ঐ সময় আমেরিকার মফস্বল শহরগুলি পাতায় পাতায় ঢেকে যায়। রাস্তায়, অলিতে গলিতে, উঠোনে, বাড়ীর ছাদে লাল বাদামী হলুদ পাতা জমে ওঠে। আহ্, চারদিকে ঝরা পাতার গন্ধ, একবার, বুঝেছিস ঝুনুচাচা গেছেন কানেকটিকাটে—'

'ফের তোর ঝুনুচাচার গল্প শুরু হলো', ঠোঁট উলটে বললো জয়া, 'তোর চাচা তোকে সব বানিয়ে বানিয়ে বলেন, আর তুইতো একটা বুদ্ধু, যা বলা হয় তাই বিশ্বাস করিস।'

প্রথমতঃ আমাকে বুদ্ধু এবং দ্বিতীয়ত ঝুনুচাচাকে মিথ্যুক বলায় অমি খুব চটে গেলাম।· বেশী রেগে গেলে আমার আবার কথা আটকে যায়। তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'যা যা বাসায় যা, পড়িসতো মাত্র আটের ক্লাসে। মুখ্যু মেয়ে এরচেয়ে বেশী আর কি জানবি!'

একদিকে নদী। পাশে জেটি। জেটিতে বাঁধা সারসার জাহাজ। কোনোটা এসেছে লন্ডন

থেকে, কোনোটা ফ্লোরিডা থেকে, কোনোটা বা দার এস সালাম থেকে। জেটির সীমানা শেষে সরকারী হাইওয়ে। হাইওয়ে পেরিয়ে কিছুদূর হেঁটে এলে আমাদের বাড়ী। পাড়াটা সবেমাত্র গড়ে উঠছে। আশেপাশে তিনচারটে বাড়ী। ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারপাশে অনেকগুলি নারকেল গাছ। দুটো পুকুর। পুকুর পাড়ে করবী আর কুলগাছ। কয়েকটি নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। চারপাশে ভাঙ্গা ইঁটের টুকরো।

নিঝ্‌ঝুম মস্তো বাড়ী আমাদের। ঘরগুলো অন্ধকার। উঠোনের এককোণে মস্তো এক কড়ুই গাছ। সারা বাড়ীতে অবসর সময়ে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। কারণ করার কিছুই নেই। নতুন বইপত্র এখানে পাওয়া যায় না। আশেপাশের বাড়ীতে অবশ্য কয়েকটি ছেলে মেয়ে আছে কিন্তু তারা সবাই আমার হাঁটু সমান। একমাত্র ঐ হলদে বাড়ীর জয়াই আমার সমবয়সী।

এই মস্তোবড় বাড়ীতে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগে না। বাবা সকালে অফিসে চলে যান, ফেরেন কখনো বিকেলে কখনো বা রাত্রিরে। একা বাড়ীতে থাকতে মার ভালো লাগে না, তাই তিনি চাকরি নিয়েছেন। একবার মার সামনে বিড়বিড় করে বলে ফেলেছিলাম, 'আমার একটা ভাই বোন থাকলে বেশ হতো!' এ কথা শুনে মা আমাকে 'ধাড়ি ছেলে', 'পাকা ছেলে' বলে এ্যায়সা ধমক দিলেন যে আমি আর কোন কথাই খুঁজে পাই নি। কি যে দোষ করেছি বুঝতেও পারলাম না। বাবা মা'রা বোধহয় শুধু শুধু ধমকাতে ভালোবাসেন।

এই একঘেঁয়ে দিনগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যখন ঝুনুচাচা আসেন। ঝুনুচাচা চাকরি করেন বিরাট এক জাহাজে। বছরে একবার কি দু'বার এ বন্দরে তাঁর জাহাজ নোঙ্গর করে। তখন মোটাসোটা, বেঁটেখাটো, মাথায় টাক এবং গোঁফঅলা ঝুনুচাচা দু'হাতে দুটো স্যুটকেস নিয়ে হাজির হন। উঠোন থেকেই তাঁর চিৎকার শুরু হয়, 'কইগো ভাবী তোমরা কই, দেখো ফের চলে এলাম। কই গেলিরে মাম্‌না।' জয়া যদি আমায় মাম্‌না বলে ডাকতো তা'হলে হয়ত একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেতো। কিন্তু ঝুনুচাচা মাম্‌না বললে আমি রাগ করি না।

এরপর ঝুনুচাচা তার স্যুটকেস খোলেন। 'এই যে ভাবী, ন্যুইয়র্ক থেকে এই কার্ডিগানটা এনেছি তোমার জন্যে। মিয়াভাইয়ের জন্যে এই স্যুটের কাপড়। আর মাম্‌না দেখ তোর জন্যে এসব।'

মা তখন তাড়া দেন, 'যাও যাও, হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নাও। এসব পরে দেখা যাবে।' কিন্তু ততক্ষণে আমি জেঁকে বসি ঝুনুচাচার কাছে। 'এই দেখ এই কাঠের মূর্তিটা এনেছি তোর জন্যে ইন্দোনেশিয়া থেকে। এই যে মুখোশটা, এটা আফ্রিকার একটি ছোট্ট শহর, কি যেন নাম, ভুলেই গেলাম, যাক আর এই কিমানো পড়া মেমসাহেবটা টোকিও থেকে। পছন্দ হয়?'

পছন্দ হবে না আবার! ঝুনুচাচা জানেন আমি মা বাবার মতো কাপড় চোপড় পেলে খুশী হই না। বরং জানা অজানা বন্দর থেকে কেনা এইসব জিনিষের প্রতি আমার আকর্ষণ বেশী। ঝুনুচাচা বলেন, 'দেখ দেখ এ গুলি দেখ, আমি ততোক্ষণে গোসলটা সেরে আসি। বিকেলে তোকে জাহাজে নিয়ে যাবো।'

আমি জাপানী পুতুলটার ঘ্রাণ নেই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে টোকিও শহর। বসন্তকালে চেরী ফুলে ছেয়ে যায় টোকিও। আচ্ছা শীতে ফুজিয়ামাকে কেমন লাগে দেখতে? আফ্রিকার মুখোসটির ঘ্রাণ নেই। আহ্, আফ্রিকার নির্জন কোন অন্ধকার গ্রামের খোলা মাঠে বোধহয় দ্রিম দ্রিম করে ঢোল বাজছে। মাঠের মাঝখানে গনগনে আগুন। এমনি মুখোস পড়ে, বুকে পিঠে নানারকম আলপনা এঁকে হয়ত কালোকালো কিছু লোক আগুন ঘিরে হৈ হৈ করে নাচছে।

বিকেলে ঝুনুচাচা আমাকে তার জাহাজে নিয়ে যান। ছোট্ট কেবিন। বয়কে ডেকে তিনি

স্যান্ডউইচ আনান। সালাদ আর স্যান্ডউইচ খাওয়া হলে আমরা রেলিং ধরে গল্প করি। আমি বলি, 'ঝুনুচাচা তোমার খারাপ লাগে না। একলা একলা ঘুরে বেড়াও কোথায় কোথায়। বাংলা বলার লোক পর্যন্ত পাও না।'

ঝুনুচাচা উত্তর দেন, 'না খারাপ লাগবে কেন? বরং ডাঙ্গায় থাকলে আমার কষ্ট হয়। আর

সমুদ্রের কি দেখার শেষ আছে! যতো দেখবি ততোই মনে হবে আরো কি যেন বাকী রয়ে গেলো। আর সেটা জানতে না জানতেই তুই পৌছে যাস কোনো এক বন্দরে। আর বন্দরের সব জানতে না জানতেই আবার ভাসিস সমুদ্রে।'

আমি বলি, 'তবুও .....

ঝুনুচাচা বলেন. 'শোন তবে। তখন আমার জাহাজ ম্যাডিটেরিনিয়ানে। একদিন হঠাৎ

তোদের কথা ভেবে মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। বিকেল তখন, সূর্য ডুবছে। জাহাজ চলছে আপন মনে। হঠাৎ দেখি একঝাঁক সোয়ালো পাখী কলরব করতে করতে এসে বসলো জাহাজের রেলিংয়ে, মাস্তুলে। একটি দু'টি নয়, এক ঝাঁক। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তারা বোধহয় উড়াল দিয়েছে স্পেন থেকে। যাবে অন্যকোন দেশে। পথে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। পরদিন খুব ভোরে আবার তারা পাখা মেললো। হয়ত অনেক দেশ, সমুদ্র পেরিয়ে এই বাংলাদেশেই আসবে। যেই না ওরা পাখা মেললো, বুঝেছিস, অমনি আমিও একটি সোয়ালো পাখী হয়ে গেলাম। তারা মিলিয়ে গেলো দূরে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। উড়তে উড়তে অনেক দেশ ঘুরে এলাম তোদের এখানে। মিয়াভাই'র সঙ্গে গল্প করলাম। ভাবীর সঙ্গে গল্প করলাম। তোর সঙ্গে গল্প করলাম। বুঝেছিস, মাঝে মাঝে একটু খারাপ লাগে। কিন্তু যখনই মন খারাপ হয় তখনই আমি সোয়ালো পাখী হয়ে যাই। মন আমার আবার ঠিক হয়ে যায়।'

ঝনুচাচা শেষবার এসেছিলেন সেই সাতমাস আগে। পুতুল মুখোস সব এখন পুরনো হয়ে গেছে। ঘরের অন্ধকার আর গাছের ছায়া আবার চেপে বসেছে মনের ওপর। ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাকী আর মাত্র কয়েকমাস। কিছু পড়াশোনা হয়নি। ভালো লাগে না আর। এবার ছুটি হলে আমি নানা বাড়ী চলে যাবো। সেখানে গেলে সারাক্ষণ নানা নানী মামা খালারা ঘিরে রাখে। কেউ গম্ভীর মুখে কথা বলে না। আই·এ·টা আমি সেখানেই পড়বো। বাবা-মা থাকুক তাদের অফিস নিয়ে।

কি করা যায়? কি করা যায়? হঠাৎ আমি একটা সোয়ালো পাখী হয়ে যাই—নরওয়েতে এবার শীতটা একটু বেশী মনে হচ্ছে। রোদালো দিন দরকার। আমরা এক ঝাঁক সোয়ালো ডানা মেলি, গন্তব্য আমাদের এখন গ্রানাডা শহর। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে বিশ্রাম নিতে যাবো এথেন্সের জলপাই বনে। তারপর আবার উড়াল। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের ধারে ঘাসের বনে কিছুদিন কাটিয়ে—

'কি রে হা করে কি ভাবছিস?' জয়ার গলা। আমার ভীষণ রাগ হয়। পরশু আমাকে বুদ্ধু বললো। আজ সারাটা দিন আমি একলা বসে আর এই বিকেলে এসে কিনা ···। আমি কিছু বলি না। জয়া বলে, 'কি রে চটে আছিস মনে হচ্ছে। আমি আরো ভাবলাম ···· '। আমি চুপ করে থাকি। 'ঠিক আছে। কথা না বললি তো ভারী বয়েই গেলো। আমার কি তোরই ক্ষতি। এতো খুঁজে পেতে বইটা আনলাম ··· '। 'কি বই', এবার আমি আগ্রহ দেখাই। 'ক্যাপ্টেন কুকের সমুদ্র যাত্রা।' থাক তুই যখন রাগ করে আছিস ···· তখন কি আর করা। যাই।'

'আরে না, না, রাগ করলাম কই। বোস বোস দেখি বইটা।'

আমরা সিঁড়িতে বসে গল্প করি। আমি বলি, 'আর মোটে তিনবছর তার পরই আমি হাওয়া।'

'মানে ··· '

'আই·এ· পাশ করেই আমি জাহাজে ঢুকে যাবো। সাদা পোষাক, কালো-সাদা টুপি। এ বন্দর থেকে ও বন্দরে ঘুরে বেড়াবো। যখন ফিরবো তখন স্যুটকেস ভর্তি করে রাজ্যের জিনিষপত্র নিয়ে আসবো। কি মজা তাই না?'

'না, ঐ জাহাজ টাহাজে চাকরি বাকরির কোন দরকার নেই। কখন টুপ করে ডুবে যাবে সমুদ্রে তার কোন ঠিক আছে। ঐ সবের কোন দরকার নেই।'

মেয়েটা যে কি। আমি যা বলি ঠিক তার উল্টোটি বলা চাই-ই। আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকি। হঠাৎ জাহাজের ভোঁ শোনা যায়। বন্দরে নতুন জাহাজ এলো বোধহয়। আমার মন আবার ভালো হয়ে ওঠে। তখন আমি জয়াকে সেই সোয়ালো

পাখীর গল্প বলি। পুরোটা শুনে জয়া জিজ্ঞেস করে, 'সোয়ালো পাখী কি ?'

'সোয়ালো মানে জানিস না আবার ক্লাশ এইটে পড়িস। সোয়ালো মানে দোয়েল।' এইবার তার ওপর একচোট নিতে পারায় খুব খুশী হয়ে উঠি।

'ওহ্ তাই। তা দোয়েল বললেই হয়। কি নরম আর সুন্দর নাম। সোয়ালো সোয়ালো করিস ক্যান ?'

রাগ করে আমি বলি, 'দেখ জয়া বেশী ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। যা বলি তাই শুনবি। বড়দের কথার ওপর কথা বলতে নেই।'

'হুঁ, কি আমার গুরুজনরে!' বলে ভেংচি কেটে জয়া চলে গেলো।

অটাম মানে শরতে আমাদের পরীক্ষা। পুরো বছরের পড়া কয়েক মাসে শেষ করতে হবে বাসায় থাকি সারাদিন। পড়ি। পড়তে পড়তে ক্লান্ত লাগলে দূরে জাহাজের মাস্তুলের দিবে তাকিয়ে থাকি। জয়ার সঙ্গেও তেমন দেখা হয় না আজকাল।

পরীক্ষার আর কয়েকদিন বাকী। এমনি সময়, একদিন সন্ধ্যায়, জয়া এসে হাজির। বললো, 'কিরে খুব পড়ছিস বুঝি। পড় পড় ভালো রেজাল্ট করা চাই।'

আমি বলি, 'উপদেশ দিতে হবে না। কি ব্যাপার তাই বল।'

'কেন, তুই কিছু জানিস না, আমরা যে চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছিস, কই ?' এবার আমি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'চন্দনপুর।'

'সে আবার কোথায় ?'

'ঐ যশোরের দিকে। নিরিবিলি জায়গা। কি মজা তাই না ?'

আমি বললাম, 'এর মধ্যে মজা কি ? তুইও যাবি নাকি ?'

'আরে তোকে কি আর সাধে বুদ্ধু বলি। আমরার মধ্যে কি আমি পড়ছি না।'

জয়া যেমনি এসেছিল তেমনি চলে গেলো। আমার আর পড়ায় মন বসলো না। যেদিন জয়ারা চলে যাবে, সেদিন তাদের বিদায় দিতে আমি বাবা আর মা গেলাম স্টেশনে। জয়া ট্রেনের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললো, 'পরীক্ষা দিয়েই যাবি কিন্তু আমাদের ওখানে, নয়তো আমি রাগ করবো।'

'রাগ আবার কিরে!' বললাম আমি, 'ওখানে কতো বন্ধু বান্ধব পাবি।' কথাটা বললাম বটে কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেলো। জয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এতোদিন এখানে থাকলি, এখন আবার চলে যাচ্ছিস নতুন জায়গায়, সেখানে গিয়ে খারাপ লাগবে না ?'

জয়া একটু হেসে বললো, 'খারাপ লাগলে আর কি করবো ? ... একটা সোয়ালো পাখী হয়ে যাবো।'

বন্দী, বন্দী

সালেহ্ আহমদ

আজকের শনিবারে সিরাজ বাড়ী এসে দেখলো, মা 'মানকচুর চচ্চড়ি' করেছেন । আর সেই সঙ্গে আছে ডাল। মা যখন দুটো পোড়া মরিচ সিরাজের থালে এগিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন সিরাজ একবার মা যেমন না দেখে—এমনি লুকোচুরির মত মায়ের দুই চোখ দেখে নিল। সিরাজের এখন বোঝার বয়স হয়েছে যে মা তার কাছে সব সময় সংসারের অক্ষমতাগুলো লুকিয়ে রাখতে চান।

সিরাজ ভাবলো, এখন চুপচাপ খেয়ে ওঠাই মায়ের জন্য সান্ত্বনা। তা-না হলে, গভীর রাতে পাশের ঘরে একা যেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তেমনি কেঁদে উঠবে। বয়সটা এমন যে—সান্ত্বনা দিতে লজ্জা লজ্জা ভাব আসে। বারো বছরের সিরাজ বাস্তবের জন্যে কতটুকু।

ভাত পাতে থাকতে থাকতেই মা এক সময় নীরবতা ভাঙ্গলেন।

ঃ জায়গীরদের অবস্থা কেমন রে? খাবার-দাবার ভালো দেয় তো? দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন?

চট করে একটা জবাব দিয়ে দিলে হত। কিন্তু বারো বছরের সিরাজের বড় অহংকার। ঐ বয়সেই পৃথিবীর বাস্তবতা ওকে 'পুরুষ' করে তুললো। মায়ের প্রশ্নের সাথে সাথেই জায়গীর বাড়ির ঐ মহিলার ছবি ভেসে উঠলো। সকাল বেলার পান্তা ভাত আর দুটি লংকা বাইরের ঘরে চাকর ছেলেটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, মায় কইছে অন্য কোথাও জায়গীর দেখতে। পরিবারের অবস্থা অহন বালা যাইতাছে না। কিন্তু তখন মিথ্যে ছাড়া উপায় ছিল না। সিরাজ বললোঃ জায়গীর বাড়ির খালাম্মা অনেকটা তোমার মত। খুব আদর করে আমাকে।

মা খুশী হয়েছেন বলে মনে হলো সিরাজের। আরো দুটো ভাত বেড়ে দিতে চাইছিলেন তিনি। সিরাজ আপত্তি জানিয়ে বললোঃ

ঃ পেয়েছ কি তুমি? আর কত খাব?

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সিরাজ বাইরে একবার চোখ ফেরায়। আমে সবে বোল ধরেছে। পেঁপে গাছটায় দুটো পেঁপে পেকেছে। সুপারি গাছগুলোতে কয়েক ছড়ি পাকা সুপারি।

মা বললেন ঃ একটা পেঁপে নিয়ে আয়। খাবার পর ফলটল খাওয়া ভালো।

সিরাজের মন তখন অন্য কোথাও। সিরাজ বললো ঃ বাবার খবর কি মা। কবে আসবেন? কোন চিঠি পেয়েছো ?

মা বললেন ঃ গতকাল এসেছে। মসজিদের অবস্থা খুব ভালো যাচ্ছে না। লোকজন বড় একটা ডাকে না। আখেরাতের আর দেরী নাই। ধর্ম-কর্মে মানুষের আজকাল মন উঠে গেছে কাল পরশু আসতে পারেন তিনি।

সিরাজ কোন কথা বললো না। বাইরে বেরিয়ে এলো। এই বাড়ী থেকে দূরের নদী চোখে ভাসে। আকাশে এখন টুকরো মেঘের খেলা। হলুদ রঙের একটি পাখী খুব সুন্দর শিস বাজাচ্ছিল। পুকুর ঘাটের পানি পাশের বাড়ীর বউ এসে দোলা দিয়ে গেল। চাল ধোয়ার পানিগুলো একটি বৃত্তের মতো অনেকক্ষণ পুকুর ঘাটে ঘোলাটে হয়ে থাকলো। আস্তে আস্তে সিরাজ নিজেদের আঙ্গিনা পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল। হোক অভাব। তবুও নিজের বাড়ী কত ভালো। মায়ের জন্য, শুধু মায়ের জন্য। এক মুহূর্তে অনেক বড় হয়ে মাকে যদি শহরে নিয়ে যাওয়া যেত। বড় রাস্তায় পা দিতেই মায়ের গলা সিরাজকে জড়িয়ে রাখে।

ঃ এইমাত্র এলি। এখন আবার কোথায় যাচ্ছিস ?

সিরাজ ফিরে এলো আবার। মনে মনে বললো ঃ মা তুমি জান না, মাত্র তিন ঘন্টায় ২০ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে আসতে পারি আমি। যাদের পয়সা আছে তারা গাড়ী চড়ে আসতে পারে আমার শক্তি আছে আমাকে এত ছোট ভাব কেন তুমি ?

ঘরের আঙ্গিনায় বসে পড়লো সিরাজ। সামনের লেবু গাছটার কয়েকটি হলুদ ঝরা পাতা বাতাসে নিরুদ্দিষ্ট হলো। মা এসে আবার পাশে বসেন।

ঃ স্কুলে লেখাপড়া কেমন হয় রে ?

ঃ ভালো, সিরাজ ছোট্ট জবাব দিল।

ঃ বড় আপাকে কতদিন দেখিনা। ও কবে আসবে ?

ঃ আল্লা জানে ? ওর শাশুড়ী আসতে দিতে চায় না।

সিরাজের খুব রাগ হয়। এক ধরনের অস্থিরতা ওকে দুর্বিনীত করে তোলে। আমার আপা আর মাতব্যরি করেও আরেকজন ? এই ধরনের একটা ভাবনা সিরাজকে পেয়ে বসলে সিরাজ মাকে বলে—মা আমি 'কুনাগাম' যাবো, আপাকে নিয়ে আসবো। আর আব্বাতো কালকে আসছেনই

মায়ের চোখ চিক চিক করে। মুখে কথা ফুটে না। মনে হলোযেন অনেক কষ্টে মা গলা খুললেন। বললেন, যা রাবেয়াকে নিয়ে আয়। দুটো পেঁপে পেকেছে। সঙ্গে নিয়ে যা। গাছে কয়েকটি লেবুও পেকেছে। যাওয়ার সময় বাজার থেকে আধাসের জিলাপী নিয়ে গেলে ওর শাশুড়ী খুশী হবে।

এবার সিরাজ সুখী পাখী। ইস কত দিন পরে আপার সঙ্গে দেখা হবে। একা বাড়ী কেমন খা খা করে। সারা রাত দাওয়ায় বসে গল্প করবো আমরা। এখন তো আবার জ্যোস্নার সময়। সারা আকাশ জুড়ে রূপালী আলোর মেলা। 'সুন্তরা' বনে জোনাকী পোকার চঞ্চলতায় এখনো সিরাজ ভয় পায়। আর আপাও এমন দুষ্টু। সেই সময়ই যত ভূত পেত্নীর গল্প বলে।

বিকেলে আবার শ্বশুর বাড়ী যাবার একটু আগেই মসজিদের ইমাম সাহেব আসলেন। সঙ্গে আরেকটি লোক। মসজিদের ইমাম সাহেবের মাসোহারার জন্যে প্রতিটি রবিবার পিছু একসের ধান অথবা আধসের চাল বরাদ্দ। এটা থেকেই ইমাম সাহেবের বেতন হয়। গ্রামের লোকজন অবশ্য সেচ্ছায় এই চাল দিতে চায় না। সময় সময় ইমাম সাহেব এসে বাড়ী বাড়ী ঘুরে তার পাওনা নিয়ে যান।
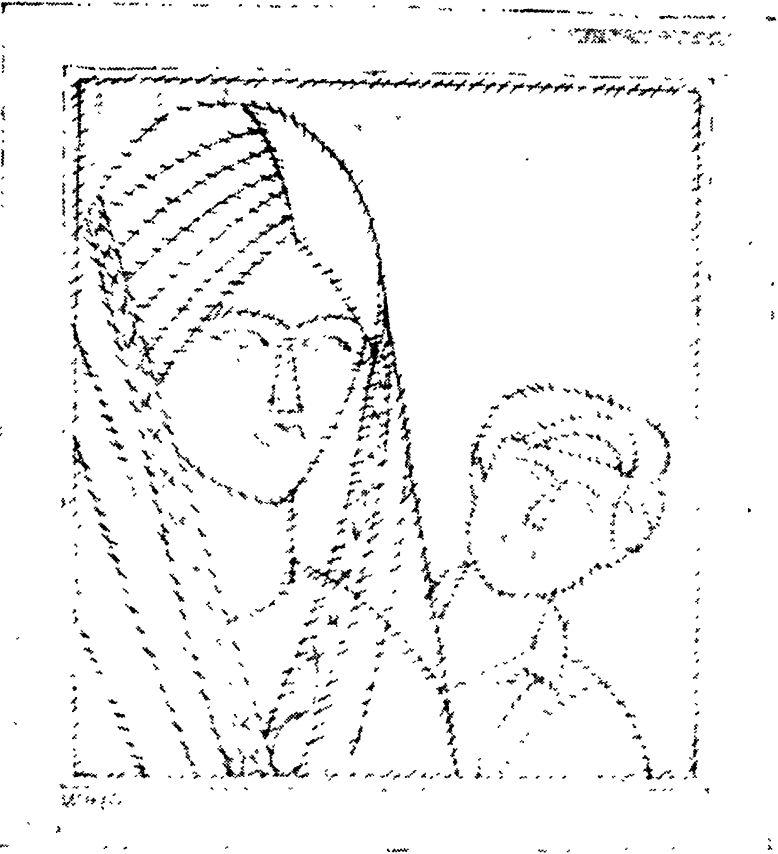
ইমাম সাহেব সুন্দর করে হাসতে জানেন। আঙ্গিনায় সিরাজকে দেখেই বললেন, সিরাজ মিয়া যাও ক? রাবেয়ার শ্বশুর বাড়ী বুঝি?

ঃ জ্বি। সিরাজ বিনীত জবাব দেয়।

মা ভেতরের ঘর থেকে সিরাজকে ডাকলেন। কেমন অবসাদ আর ভাবলেশহীন দেখাচ্ছিল মাকে। সিরাজকে ডেকে বললেন ইমাম সাহেবকে বল রবিবার আসতে। তোর বাবাও আসবে। তখন তার পাওনা দিয়ে দেবো।

সিরাজ মায়ের অসুবিধা বুঝতে পাচ্ছে। সে বাইরে এসে সোজাসুজি বলেই দিল, ওস্তাদজী রোববার দিন আপনার চাল দিয়ে আসবো।

ওস্তাদজী কিছু বললেন না। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখ কিছুটা পানসে দেখালো। দুঃখ করে বললেন, বাড়ী যাবো তো ? তাই—। ঠিক আছে তোমার আব্বা আসলে আসবো। তা তুমি এখন কোন স্কুলে পড় ?

ঃ ঝিঙ্গাবাড়ী হাইস্কুল। সিরাজ জবাব দিল।

ঃ তোমার আব্বা মস্ত ভুল করলেন। নিজে কোরাণে হাফিজ হয়ে কি করে স্কুলে দিলেন তোমাকে বুঝলাম না। এত কষ্ট করে জায়গীরে থাকো। নিজের গ্রামেই তো মাদ্রাসা ছিল।

সিরাজের মুখে তখন কথা ছিল না। সিরাজ স্কুলের কথা বললে কথা বাড়বে।

এক সময় ইমাম সাহেব চলে গেলেন।

বিকেলের একটু আগে সিরাজ আপার শ্বশুর বাড়ী রওয়ানা দিল। সঙ্গে পেঁপে, লেবু। আর বাজার থেকে কিনতে হবে আধাসের জিলাপী। বুক পকেটে হাত রেখে সিরাজ দেখলো অনেক কয়টি ভাংতি পয়সা একটি পুটলিতে বেঁধে দিয়েছেন। সিরাজ জানে এই টাকা কোথা থেকে এসেছে। মা যখন একা থাকেন তখন লুকিয়ে মুরগীর ডিম, পেঁপে, লাউ বিক্রি করেন। গ্রামের মেয়েরাই কিনে নিয়ে যায়।

দুইপাশে ধান ক্ষেত রেখে মাঝখান দিয়ে বড় রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে। হু হু করে বাতাস বইছে। দূরে কয়েকটি কানি বক সিরাজকে দেখে হুশিয়ার হয়ে গেল। কাছে আসতেই দে ছুট। সিরাজ না হেসে পারল না। মাঠ থেকে একটি নুড়ি তুলে অমনি বকগুলোকে ভয় পাইয়ে দিয়ে সিরাজ মনে মনে বলে উঠলোঃ আপারে, কত দিন পর তোকে দেখবো। আপার একটা বাচ্চা হয়েছে। ভীষণ ট্যাটন। সিরাজকে দেখলেই দূর থেকে দৌড়ে আসে। মামা মামা বলে কতভাবে যে আনন্দ প্রকাশ করে। আর আপা, অনেকটা মায়েরই মত ওর চোখ দুটোও চিক চিক করে উঠে। দৌড়ে এসে পাখা করতে থাকে। তাই দেখে হাসি পায় সিরাজের। এই আপা আগে এত দুষ্টু ছিল ? মা যদি বলতো রাবেয়া পুকুর থেকে এক বদনি পানি নিয়ে আয়। ওমনি আপা আবার হুকুম দিত সিরাজকেঃ সিরাজ মায়ের জন্য পানি নিয়ে আয়। কিংবা দুপুরে গরম লাগলে আপা শুয়ে থাকতো। আর সিরাজের উপর কড়া হুকুম থাকতোঃ ঘুম না আসা পর্যন্ত বাতাস করতে থাকবি।

সিরাজও তাই করতে বাধ্য।

সন্ধ্যের বেশ আগেই সিরাজ 'গুনাগাম' পৌঁছে গেল। দুষ্টু ভাগ্নেটি পুকুর ঘাট থেকে মামাকে দেখতে পেয়েই এক চিৎকার। 'মামা মামা' বলে দৌড়ে এক লাফে মামার কোলে। মামার হাতের পোটলা-পুটলি রাখার অবসরও মেলে না।

আপা এলো। কেমন ম্লান মুখখানি। দুই চোখে তেমনি জল। হাসলে আপাকে মায়ের মতই মনে হয়। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রাবেয়া আপা বললো, গুণ্ডা, এতদিন পর আমাকে মনে হলো ? তোর কিচ্ছু আমি মুখে দেবো না। আব্বা কেমন আছে রে ?

আপার আবার আব্বার জন্য বেশী টান। আব্বার একটু সর্দিজ্বর হলেই আপা খুব ভয় পেত। আর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতো। তাই দেখে আব্বার খুব হাসি পেত। আব্বা বলতেন—মা, এদিকে আয় তো। ঐ ছুরাটা পড়তো। লাইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ...।

রাত্রে খেতে খেতে সিরাজই প্রথম কথাটা পাড়লো। আপার শাশুড়ীকে বললোঃ খালাম্মা দু'দিন হলো এসেছি। বাড়ীতে আব্বা নেই। অনেক কাজ। আপাকে কয়েক দিনের জন্য নিয়ে যেতে চাই।

প্রথমে যেন আপার শাশুড়ী কিছু শুনেনইনি—এই রকম ভান দেখালেন। পরে সিরাজ

দ্বিতীয়বার কথাটা পাড়াতে তিনি বললেন, জামাল তো বাড়ী নেই। বউকে কেমন করে দেই ?

আপার মুখটা কালো হয়ে গেল। মানুষ উদ্যমহীন হয়ে পড়লে যেমন নেতিয়ে পড়ে, অনেকটা তেমনি।

বারো বছরের সিরাজ চালাক ছেলে। ঘটে ওরও বুদ্ধি কম নেই। সিরাজ বললেঃ দু'দিনের জন্য দেননা খালাম্মা। আম্মার খুব অসুখ।

শেষ পর্যন্ত শাশুড়ীর মন নরম হলো। ঠিক হলো পরের দিন সকাল থেকে আপার ছুটি মঞ্জুর। সময়, কিছুতেই দু'দিনের বেশী নয়। রাত্রি থাকতেই আপার গোছগাছ সুরু হলো। শাশুড়ীও পিছে পিছে লেগে থাকলেন। যদি আপা এ বাড়ীর কোন জিনিষপত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। মুখে কিছু না বললেও—সিরাজ সবই বোঝে। সকালে যাত্রা সুরুর সময়, রাবেয়া ওর শাশুড়ীর পা ধরে সালাম করে বললো, মা, দুটো ডাব নিয়ে যাই। গাছেতো অনেক ডাব ?

ডাব পাড়তে পাড়তে সময় আরো গড়িয়ে গেল। বারো বছরের সিরাজ দুই কাঁধে মামাকে তুলে নিল। এক হাতে ডাব। অপর হাতে ছোট্ট টিনের বাক্স। কালো বোরকার ভেতর থেকে শুধু দুটি চোখ দেখা যায়।

বড় রাস্তায় পা দিলে, ওরা নিজেদের খুদমুদ মনে করে। রাবেয়া সিরাজকে বলে; বাবা নিশ্চয়ই চলে আসবে ? কি বলিস ? চলে আসবে না ?

সিরাজ দুষ্টামি করে বলে, তুই আব্বার মেয়ে, আমি আম্মার ছেলে। রাবেয়া হেসে ফেলে। সিরাজের একটা হাত ধরে মাথায় একটা থাপ্পর মারে। বলে, বাড়ী গেলে খালি ঘুমিয়ে সময় কাটাবো, কোন কাজ করব না।

সিরাজ বলে, শুধু রাত্রে ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। সারা রাত তোর গল্প শুনবো।

কিছুক্ষণের মৌনতা ভেঙ্গে সিরাজ আবার বলে, তোর শাশুড়ী তোকে খুব খাটায় তাইনা আপা ? আপার দুই চোখ সজল হয়। তবু মুখে কিছু বলে না। হঠাৎ একসময় বলে বসে, সিরাজ তুই যদি আমার বড় ভাই হতি ? খুব ভালো হতো। তোকে খালি আব্দার করতাম। খালি খালি সবকিছু চাইতাম। আমাদের ওদিকে চুড়ির দাম কি রকমের ?

সিরাজের খুব কান্না পায় তখন। শুধু মনে হতে থাকে একদিনে যদি বড় হওয়া যেত।

বাড়ী পৌঁছুলে আর মায়ের আনন্দ ধরে রাখা যায়না। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে প্রথমে কান্না। তারপর নাতিকে কোলে তুলে আদর। অবস্থা দেখে সিরাজ হাসতে হাসতে বললে, এখন মেয়ে পেয়েছে। আমি আর কে ?

আপা বোরকা খুলে ধড়াস করে চৌকিতে গা এলিয়ে দিল। ঠিক যেন ছ' বছরের সেই আপা। এখনই বলবে, বাতাস কর। ঘুম না আসা পর্যন্ত বাতাস কর।

দু'দিন প'রও আব্বা যখন আসলেন না তখন সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লো। বিশেষ করে রাবেয়াতো বাচ্চাদের মতো কান্নাই জুড়ে দিল, এত দিন পরে আসলাম আব্বাকে দেখবো না।

সুতরাং আবার সিরাজের যাত্রা সুরু হয়; আপা তার টাকশাল থেকে পাঁচটি টাকা দিয়ে সিরাজকে বলল, যা, আব্বাকে নিয়ে আয়; বাড়ী আসলে হয় একবার।

একই দিন আছরের নামাজের পর আবার যাত্রা সুরু। এবার সেই 'চারবাট'। তবে হেঁটে নয়। পাকা সড়কে বেবী আছে। বেবীতে করে যাবে সিরাজ। আনন্দে সিরাজের মনে হয়—সে যেন খুব বড় লোক এখন। রাজা।

দেড় ঘন্টার মধ্যেই সিরাজ 'চারবাট' পৌঁছে যায়। বাবার মসজিদে গিয়ে তাঁকে পেলনা সে;

মসজিদে মোরাজ্জিন বললেন ; চাঁদা তুলতে গেছেন। পাশের গ্রামেই। বস। কিছু খাবে ?

সিরাজ দাঁড়াল না সেখানে। দ্রুত পায়ে পাশের গাঁয়ের দিকে পা দিল। কিছু পথ যেতেই বাবার দেখা পেল সে। গায়ে আলখেল্লা নেই। রোদে সাদা শরীর লাল হয়ে গেছে। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। গায়ে সাদা গেঞ্জি ঘামে জবজবে হয়ে গেছে ; কাঁধে ধানের টুকরি।

সিরাজ আর আবেগ ধরে রাখতে পারে না। পা ধরে সালাম ক'রে আব্বাকে বলে বসলো, একটি লোক আনলেও তো হত।

আব্বা হাসলেন, কি দরকার। আমিই তো পারি। হযরত মোহাম্মদ (আঃ) নিজের কাজ নিজেই করতেন। এটা রাসুলের সুন্নত।

আব্বা যে নিজের অক্ষমতা আড়াল করছেন, সেটা বারো বছরের সিরাজের বুঝতে বাকি রইল না। টুকরিটা মাথা থেকে নামিয়ে নিল সে ; মাটির দিকে তাকিয়ে বললোঃ আপা এসেছে। তাই তোমাকে নিতে এসেছি।

রাবেয়ার খবর পেয়ে বাবা বাচ্চা ছেলের মত খুশী হলেন। জমানো ধান আর চাল ঐ ঘরেই চল্লিশ টাকায় বিক্রি করে দিলো। তারপর সিরাজকে বল্লেন, চল যাই। তুই আমার পাঞ্জাবীটা নিয়ে আয়।

বাস স্টেশনে এসে সিরাজ আব্বাকে বলল, আব্বা, দুইটা টাকা দাও না। একটা জিনিস কিনিব।

আব্বা কোন আপত্তি তুললেন না। শুধু বললেন, কি কিনবি ?

সিরাজ টাকা নিয়ে দোকানে গেল। হাতের মধ্যে আপার বেচে যাওয়া তিন টাকা ও আব্বার দুই টাকা এই মোট পাঁচ টাকা দিয়ে এক ডজন চুড়ি কিনল। আহ, আপাকে খুব সুন্দর দেখাবে। আব্বাও রাবেয়া আপার ছেলের জন্য একটা গেঞ্জী কিনলেন আর একপোয়া বিস্কুট।

সন্ধ্যেয় ওরা বাড়ী এলো। টানাপোড়োনের একটি সংসার মুহূর্তেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঘরে এসে সিরাজ দেখলো, আপা পায়ে আলতা পরেছে। আর জোরে জোরে কথা বলছে। এক দুপুরেই যেন চেহারায় কত ঔজ্জ্বল্য এসেছে। ভিতরের ঘরে আজ ভালো রান্না হচ্ছে। ছোট্ট একটা ইলিশ মাছ ভাজি হচ্ছে। আম্মা, আব্বা আর আপা রান্না ঘরের উনুনে বসে বসে গল্প করছেন। এই ফাঁকে সিরাজ আপাকে ডাক দিল। বল্লে, আপা শোন।

রাবেয়া বাইরে এলে সিরাজ বলে, চল পুকুর ঘাটে যাই। একটা জিনিস দেব তোকে।

পুকুর ঘাটে বসে সিরাজ সার্টের পকেট থেকে চুড়ি বের করে। বলে, তোর জন্যে এনেছি।

খুশীতে আপা কেঁদে ফেলে। জড়িয়ে ধরে সিরাজকে। বলে, তুই বৃত্তির টাকা পেলে আমাকে শাড়ী দিবি। আর রোজ দেখে আসতে যাবি।

তখন রাবেয়া আর সিরাজের ছায়া জ্যোৎস্নার জলে ধরা পড়ে। বাতাসে জল কাঁপছে। সেই সঙ্গে ভাই-বোনের ছায়াটাও কাঁদছে। রাবেয়া কাঁদতে কাঁদতে বলে, ওখানে আমার ভালো লাগেনা। শুধু বন্দী বন্দী মনে হয়। তুই অনেক বড় লোক হলে ; আমাকে নিয়ে আসবি। আসবি না ?

সিরাজের মুখে কথা নেই। পুকুরের স্থির জলের মতোই ওদের চারটা চোখ পুকুর হয়। এত জল সেখানে। শুধু জল আর জল।
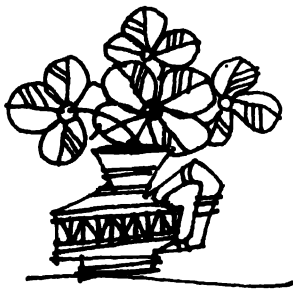
সবুজ সংকেত

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে অয়ন দেখল কেউ নেই। সব ঘরে তালাবন্ধ। শুধু তার পড়ার ঘরের দরজা খোলা। সে ঘরে এসে চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

যখন দুপুরে বাড়ি থেকে বেরোয় তখন টেবিলটা ভাল করে গুছিয়ে রেখেছিল, এখন দেখল সব কেমন এলোমেলো। অয়ন তাড়াতাড়ি উঠে একটা মোটা বই টেনে নিল। পঁচাশি পৃষ্ঠা খুলে দেখল তার কুড়ি টাকার নোটটা ঠিকই আছে। তাহলে? টেবিলের ড্রয়ার টেনে দেখল ডাকটিকিটের অ্যালবামটাও জায়গামতো আছে। এই দুটো ছাড়া তার আদতেও হারাবার মতো কিছু নেই।

টুইকে বার বার বলা হয়েছে টেবিলে যেন হাত না দেয়। সেদিন তো এই নিয়ে ভয়ানক ঝগড়া হয়ে গেল। মা শুধু বোনের দিকে। আর একটু হলেই কান ধরে টেনে দিত। অয়ন সময়মতো পালিয়ে গিয়েছিল।

টেবিলের ছড়ানো-ছেটানো বইপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে ভাবল টুই নিশ্চয়ই খুব রেগে আছে। কথা ছিল সিনেমা দেখতে গেলে অয়ন আজ সবাইকে খাওয়াবে। সবাই বলতে তো মা, টুই আর ছোটমাসি। বাবাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না। মনে হয় পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষ।

আসলে আজই যে কুনালের কাছ থেকে সমস্ত খাতা নিয়ে আসতে হবে এটা সকালের দিকে মনে ছিল না। দুপুরে সবাই যখন গভীর ঘুমে তখন কাউকে কিছু না বলে অয়ন চলে গিয়েছিল। সিনেমাটা সবার সঙ্গে দেখা হল না। তাই বলে গোছানো বইপত্র সব ওলটপালট করে দিয়ে রাগ দেখানো! আজ টুইয়ের সঙ্গে ঝগড়াটা কিছুতেই এড়ানো যাবে না।

অয়ন চিৎকার করে ডাকল, “রঘুদা, রঘুদা।” কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে দোতলার বারান্দার

রেলিং থেকে ঝুঁকে চারিদিকে তাকাল। আবার রঘুকে ডেকে নিজের ঘরে এল।

কুনালের কাছে সমস্ত খাতা ছিল তাই গত সাতদিনে তেমন পড়াশুনা হয়নি। কুনাল দু-একটি বই ছাড়া আর কোনো বই কিনতে পারেনি। ওর বাবা একটি জুট মিলে কাজ করেন। বহুদিন যাবত মিল বন্ধ। কুনালের জন্যে সে সব-কিছু করতে পারে। স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে কুনাল ছাড়া অয়নের বন্ধু নেই।

অয়নের বাবা মাঝে মাঝে বলেন, "এই যে বাড়ি-গাড়ি, অর্থ দেখছ সবই আমার পরিশ্রমে একটু-একটু করে তৈরি। তুমি যেন কখনো এসবের অহংকারে সত্যিকারের মানুষকে চিনতে ভুল কোরো না। আর একটা কথা জেনো, অর্থটাই জীবনের সব নয়।"

অয়ন আর টুইকে নিয়ে বাবা-মা'র খুব গর্ব, তাঁদের মনের মতো করে তৈরি হচ্ছে ছেলে-মেয়ে।

ঘরের আলো নিবিয়ে টেবিলের আলো জ্বেলে পড়তে বসল অয়ন। অনেকক্ষণ পড়তে পড়তে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। ঠিক তখনই ঝপ্ করে আলো নিবে গেল। সে বই বন্ধ করে মুখ তুলল। প্রথমটা বুঝতে পারেনি। তারপর ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল তার মুখোমুখি জানলার গ্রিলের ফাঁকে দুটো অদ্ভুত হলুদ আলোর বিন্দু। অয়ন চিৎকার করে বলল, "কে?"

আলোর বিন্দু দুটো চট্ করে সরে গেল। অয়ন চিৎকার করে ডাকল, "রঘুদা, রঘুদা।" কেউ সাড়া দিল না। সে জানে না কোথায় দেশলাই কোথায় কী। আলো আসার অপেক্ষায় চুপ করে বসে রইল।

অন্ধকার বারান্দায় আবার হলুদ আলোর বিন্দু দুটো দেখতে পেল সে। ছোট সরু পেনসিল টর্চের আলোর মতো দুটো তীব্র আলোর রশ্মি পাশাপাশি চারদিকে ওঠানামা করছে।

এবার আর বসে থাকা যায় না। অয়ন কোনো শব্দ না করে বেড়াল-পায়ে এগিয়ে গেল। আলো দুটো উলটো দিকে ঘুরে গেল। দেখা যাচ্ছে না। একটা ছায়ামূর্তি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অয়নের হাত দুটো অদ্ভুত ভঙ্গিতে ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে গেল। সে কোনো আঘাত করবার আগেই ছায়ামূর্তি ঘুরে গেল, হলুদ আলো দুটো সোজা এসে পড়ল অয়নের গায়ে। সে অবাক হয়ে বলল, "রঘুদা, তুমি!" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার গা-হাত-পা কেমন অবশ হয়ে এল। সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। বারান্দার রেলিং ধরে কোনো রকমে টাল সামলে নিল। কিছুতেই সোজা দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। হাঁটু মুড়ে বারান্দাতেই ধপ্ করে বসে পড়ল। সে ভাল কারাটে লড়তে পারে। গায়ের যথেষ্ট জোর। কখনো নিজেকে এমন অসহায় মনে হয়নি। বসে বসেই দেখল রঘু তার বাবার ঘরের তালাবন্ধ দরজাটা অনায়াসে খুলে ফেলল। রঘুর চোখের হলুদ আলোর রশ্মি একবার তালাটার উপরে পড়তেই তালা খুলে নীচে পড়ে গেল।

ঐ ঘরে অনেক জরুরি কাগজপত্র আছে। বেশ কয়েক মাস ধরে একটা বিরাট অপরাধীচক্র ধরবার জন্য বাবা খুবই চিন্তিত। যাবতীয় নথিপত্র একটা সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ। একটা চাবি বাবার কাছে। আর একটা অয়নের কাছে। সেটা এমন এক জায়গায় লুকনো যা কুনাল ছাড়া বাবাকেও জানায়নি সে।

রঘু কেন বাবার ঘরের তালা খুলবে। আর ওর চোখেই বা এমন হলুদ আলো কেন। রঘুর যখন দশ বছর বয়স তখন বাবা ওকে মেদিনীপুর থেকে নিয়ে আসে। সংসারে ওর কেউ নেই। তখন থেকে প্রায় তিরিশ বছর বয়স হল আজ পর্যন্ত কোনো অবিশ্বাসের কাজ করেছে বলে

শোনা যায়নি। অয়নকে রঘু খুব ভালবাসে। একবার ওর উপস্থিত বুদ্ধির জন্য বাবা মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। অয়ন কিছুতেই রঘুর এই কাজের কোনো মানে খুঁজে পেল না।

উঠে বাধা দেবে তেমন শক্তিও শরীরে নেই। তার খুব কান্না পেয়ে গেল।

অয়ন হঠাৎ দেখল সামনে সবুজ আলোর রশ্মি। খুব ভয় পেয়ে সে লাফিয়ে উঠতে গেল। খুব সহজেই উঠে দাঁড়াল। একটু আগের কোনো দুর্বলতাই আর নেই। সে দেখল তার সমস্ত গা-হাত-পা সবুজ হয়ে গেছে। যে সবুজ আলো মেঝেতে আছড়ে পড়েছে তা মনে হল তারই চোখ থেকে আসছে। একটু আগে অনেকটা এই ধরনেরই হলুদ আলো সে রঘুর চোখে দেখেছিল।

রঘুর কথা মনে পড়তেই সে অন্য কিছু ভাববার সময় পেল না। দ্রুত বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে অনুভব করল কে যেন তার নিজের ভিতর থেকে নির্দেশ দিচ্ছে। সেই অনুযায়ী সে দরজার একটা পাল্লার দিকে তাকাল। দরজার পাল্লাটা শব্দ

করে খুলে পড়ে গেল।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখল রঘু সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে। সিন্দুকটা যেন হলুদ আলোর মধ্যে ডুবে থেকে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। অয়ন ঘরে ঢুকতেই হলুদ আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। সিন্দুক না খুলতে পেরে অয়নের দিকে খরদৃষ্টিতে তাকাল রঘু। চিৎকার করে বলল, "আপনার সবুজ আলো সরিয়ে নিন। আমি সহ্য করতে পারছি না।"

অয়নের সঙ্গে রঘু কখনো আপনি করে কথা বলেনি। রঘুর কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভয়ংকর।

কিছুটা এগিয়ে অয়ন বলল, "তুমি বাবার সিন্দুক খুলছ কেন রঘুদা?"

রঘু চিৎকার করে বলল, "আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান আহাব।" এই বলে সে অয়নকে মারবার জন্য হাত ওঠাল।

অয়নের সমস্ত শরীর আরো গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে। সে রঘুকে মারবার জন্য হাত তুলতে গিয়ে ডান পা উপরে তুলে রঘুর মাথায় আঘাত করতে গেল। তার আগেই রঘু সেই মারটা এড়িয়ে কোমরের কাছে এমন এক লাথি মারল যে অয়ন সামলাতে না পেরে ছিটকে বারান্দায় এসে মুখ থুবড়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল রঘু এমন একটি মারের ভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসছে যে-মার আটকে পালটা মারবার কৌশল তার জানা নেই। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রঘুকে বাইরে নিয়ে আসবার জন্য একটা মারের ভঙ্গি করে আহ্বান জানাল। উত্তেজিত হয়ে বীভৎস মুখের ভঙ্গি করে রঘু এগিয়ে আসতেই সে আচমকা সরে গেল। রঘু বারান্দার রেলিংয়ে আছড়ে পড়তেই একটা মোক্ষম লাথি রঘুর চোয়াল লক্ষ্য করে মারতে ও বসে পড়ল।

অয়ন অবাক হয়ে গেল। এমন মার সে দিতে পারবে আশা করেনি। ভাবল এটা কেমন করে হল। আরও ভেবে অবাক হল রঘু এই সমস্ত মার শিখল কোথা থেকে!

এমন সময় রঘু বলল, "আহাব, হয় আজ আপনি থাকবেন, না হয় আমি থাকব।"

অয়নের ভিতরে কেমন এক জ্বালা। সে রঘুকে উপরি-উপরি বেশ কয়েকবার মারল। কয়েকটা মার রঘু আটকালেও বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না। বারান্দার এককোণে এলিয়ে পড়ল।

অয়নের চোখের তারা কাঁপছে। তার চোখ থেকে সবুজ আলো যেন জমাট তরল পদার্থের মতো রঘুর সর্বাঙ্গ ঢেকে দিল।

সমস্ত শরীরটা কেমন পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে অয়নের। চারিদিকটা কেমন ঘুরছে। সে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

অয়ন চোখ খুলতেই বাবা-মা টুই, ছোটমাসি আর বাবার বন্ধু পুলিশ কমিশনার নীলাঞ্জন অধিকারী একসঙ্গে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন। মা বললেন, "কেমন আছিস অয়ন?"

অয়ন কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিজের হাতদুটো তুলে দেখল। নীলাঞ্জন অধিকারী বললেন, "এতদিনে কারাটে শেখাটা তোমার সার্থক হয়েছে। তোমার তো দেখছি কিছুই হয়নি। বেচারা রঘুকে ওরা বেদম মার মেরেছে।"

মা বললেন, "কী ভাগ্যি তুই বাড়িতে ছিলি, তা না হলে রঘুকে ওরা মেরে সব নিয়ে যেত।" অয়নের বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আর কাগজপত্তরগুলো বাড়িতে রেখো না।

বাবা সামান্য হাসলেন। বললেন, "তোমরা সিনেমায় গিয়ে ভাল করেছ। তোমাদের কিছু হয়ে গেলে অনুশোচনার সীমা থাকত না।"

বাবা-মা'র কথা শুনে অবাক হয়ে অয়ন উঠে বসল। নীলাঞ্জন অধিকারীর দিকে তাকিয়ে

বলল, "নীলুকা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

বাবা বললেন, "তোমার কথা আমরা পরে শুনব। চলো ও-ঘরে রঘুকে দেখে আসি। ওকে একা ফেলে এসেছি।"

অয়নকে দেখে রঘু কেঁদে ফেলল। "দাদাবাবু, আমার কী হল। ও দাদাবাবু।" বলে আবার জোরে কেঁদে উঠতেই টুই বলল, "ও রঘুদা, তুমি আর কেঁদো না।"

মা বললেন, "একটু দুধ খাবে রঘু?"

রঘু কিছু না বলে কাঁদতে লাগল। ওর চোয়ালে, কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, "আমার সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা মা।" অয়ন দেখল রঘুর চোখ স্বাভাবিক।

নীলাঞ্জন অধিকারী বললেন, "তুমি কী যেন বলবে বলেছিলে অয়ন?"

অয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, "না, আমার কিছু বলবার নেই।"

বাবা বললেন, "খেমকার লোকজন যে আমাব বাড়িতে হামলা করতে পারে এটা একেবারে মাথায় আসেনি। যাই হোক এবার থেকে আমাদের আরো বেশি সাবধান হতে হবে। মাঝখান থেকে রঘুদা বেদম মার খেল।"

নীলাঞ্জন অধিকারী বললেন, "তবু ঘটনাটা অয়নের মুখ থেকে শোনা যাক।" অয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ক'জন এসেছিল? সবাইকে মেরে তাড়িয়ে তবে নিশ্চয়ই তুমি অজ্ঞান হয়েছ। বাহাদুর বটে।" বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, "বলো।"

অয়ন বলল, "নীলুকা, আমার শরীর ভাল লাগছে না। আজ আর কিছু বলতে পারব না।"

"ঠিক আছে ঠিক আছে। আজ তুমি বিশ্রাম করো। আর একদিন তোমার বীরত্বের কাহিনী শোনা যাবে।"

মা বললেন, "অয়ন, চল, তোকে আর টুইকে খেতে দিই। খেয়েই শুয়ে পড়। আজ আর রাত করে পড়তে হবে না।"

টুই বলল, "মা, মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষায় দাদা কিন্তু তবে লাড্ডু। পরীক্ষাটা কিন্তু কারাটে দিয়ে পাশ করা যাবে না।"

মা হাসলেন। অয়ন রেগে গিয়ে বলল, "তোকে মজা দেখাচ্ছি। আমার টেবিলের বইপত্তর এলোমেলো করে দিয়েছিস সিনেমায় যাইনি বলে।"

টুই বলল, "মা, দেখো, দাদা ঝগড়া করবার জন্য কেমন মিথ্যে বলা অভ্যাস করছে।"

অয়ন চুপ করে গেল। কোনো কথা না বলে খেয়ে উঠে পড়ল।

কিছুতেই ঘুম আসছে না। সন্ধ্যা থেকে যা ঘটেছে সব একটু-একটু করে ভাববার চেষ্টা করছে অয়ন। কোনোটাই কিছুতে গুছিয়ে সাজাতে পারছে না। চিন্তা করতে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে ফেলছে। মাঝে- মধ্যে ভাবছে সমস্তটাই মিথ্যা। তাহলে অত মজবুত দরজার একটা পাল্লা ভাঙল কে! রঘুদার চোখের হলুদ আলো, তার শরীরে সবুজ রঙ আর চোখে সবুজ জ্যোতি সব মিথ্যা? একটু আগে রঘুদার চোখ দেখে মনে হল অমন সরল বিশ্বাসী চোখ হয় না। তখনকার রঘুদার ছবি অয়নের চোখের সামনে ভেসে উঠতেই একা ঘরে সে শিউরে উঠল। যা কিছু ঘটেছে সে যাকেই বলতে যাক কোনোভাবেই বিশ্বাস করাতে পারবে কি? রঘুদার কথা বললে কেউ মানতে চাইবে না। তাছাড়া কিছুক্ষণ আগে রঘুকে কাঁদতে দেখে তারও তো চোখে জল আসছিল। মাথা গরম হয়ে উঠছে নানা রকম চিন্তায়।

অয়ন ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে-ঘাড়ে জল ছিটিয়ে এসে

দেখল বাবা বারান্দার রেলিংকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন। বাবা ডাকলেন, "অয়ন।"

"কী বাবা?"

"তোমার শরীর খারাপ লাগছে? তোমাকে কেউ বেশি মারতে পারেনি তো?"

"না বাবা। আমি ভাল আছি।" অয়ন এই বলে তার ঘরের দিকে যাবার আগে বলল, "বাবা, রঘু কেমন আছে?"

"ভাল। ও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।"

অয়নের বুকের ভিতরটা কেমন এক মমতায় টনটন করে উঠল। সে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবল খেমকা কে! তার লোকজনদের কী কাজ।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই আলোটা ঝপ করে নিবে গেল। ঘোর অন্ধকার কেটে ঘরের মধ্যে হালকা সবুজ আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ল। ঘরের দেয়ালে একটা বড় মাপের আয়না টাঙানো আছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখল আয়নায় সবুজ অক্ষরে লেখা আছে 'অয়ন'। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল অয়ন। লেখাটা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে মিলিয়ে যেতে অয়ন দেখল একটু-একটু করে আয়নাতে আরো লেখা ফুটে উঠছে।

কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে থেকেও পৃথিবীকে দখল করার ইচ্ছে আমাদের বহুদিনের। ফুল গাছে ফুটে থাকলে যত সুন্দর দেখায় ঘরে এনে ফুলদানিতে রাখলে আমার তত ভাল লাগে না। তাই একদিন আমি ঠিক করলাম পৃথিবীকে দখল না করে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলব। তাই আমার শক্তি প্রয়োগ করে পৃথিবীকে ফুলের মতো ফুটে উঠতে সাহায্য করছি বহু যুগ ধরে। কিন্তু আমার গ্রহে সকলেই আমার সঙ্গে একমত নয়। তারা চায় পৃথিবীতে যারা বুদ্ধিমান প্রাণী তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ক্রমশ গ্রহটাকে নষ্ট করে দিতে। অন্য অনেক দেশের মতো তোমাদের দেশেও কিছু মানুষের মধ্যে অশুভ বুদ্ধির প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে আমার মতের বিরোধী 'পঙ্গপাল মোর্চা'। তোমার বাবা অনির্বাণ সোম নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতায় একটা বিরাট দলকে কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেফতার করতে সক্ষম হবেন। যে দল মানুষের মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রেখে একটু-একটু করে নানা অছিলায় এই প্রাণীটিকে নষ্ট করে দেবার জন্য বিরাট চক্রান্ত করছে। আপাত সুখ এদের কাম্য। অনির্বাণ সোম এই চক্রান্তের সমস্ত গোপন কাগজ তাঁর নিজের ঘরে সিন্দুকের মধ্যে রেখেছেন। আমাদের 'পঙ্গপাল মোর্চা' চায় ঐ কাগজ নষ্ট করে চক্রান্তকারীদের মদত দিতে। আমি চাই আমার অনন্ত সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবী ফুলের মতো ফুটে থাক। তাই 'পঙ্গপাল মোর্চা' যখন রঘুকে মাধ্যম করে কাগজ নষ্ট করবার চেষ্টা করছিল তখন আমি তোমাকে মাধ্যম করে তা নষ্ট হতে দিইনি। তোমার পড়ার টেবিলে সিন্দুকের চাবি খুঁজতে গিয়ে সব ওলটপালট করেছিল রঘু। অবশ্য ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার সবুজ অভিনন্দন নাও—আহাব।"

লেখাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে অয়ন আয়নার কাছে ছুটে গেল। ঘরে ঘন অন্ধকার। বড় ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। সে অন্ধকারে আন্দাজ করে হাতড়ে নিজের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল।
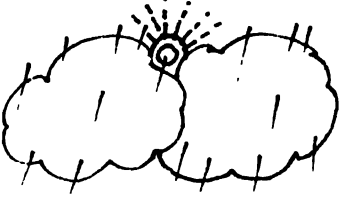
কপোট্রনিক ভবিষ্যত

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

বিকেলে আমার হঠাৎ করে মনে হলো আজ আমার কোথায় জানি যাবার কথা। ভোরে বারবার করে নিজেকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর মনে করতে পারছি না। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, তবে বিশেষ চিন্তিত হলাম না। আমি ঠিক জানি আমার মস্তিষ্কও কপোট্রনের মতো পুরানো স্মৃতি হাতড়ে দেখতে সুরু করেছে। মনে করার চেষ্টা না করলেও ঠিক মনে হয়ে যাবে।

বৈকালিক চা খাওয়ার সময় আমার মনে পড়লো আজ সন্ধ্যেয় একটি কপোট্রন প্রস্তুতকারক ফার্মে যাবার কথা। ডিরেক্টর ভদ্রলোক ফোন করে বলেছিলেন তারা কতকগুলি নিরীক্ষামূলক কপোট্রন তৈরী করেছেন, আমি দেখলে আনন্দ পাব। কিছু দিন আগে এই ডিরেক্টরের সাথে কোন এক বিষয়ে পরিচয় ও অল্প কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এখন মাঝে মাঝেই নতুন রোবট তৈরী করলে আমাকে ফোন করে যাবার আমন্ত্রণ জানান।

ফার্মটি শহরের বাইরে। পৌঁছুতে পৌঁছুতে একটু দেরী হয়ে গেল। লিফটে করে সাততলায় ডিরেক্টরের ঘরে হাজির হলাম। তিনি খানিকক্ষণ শিষ্টতামূলক আলাপ করে আমাকে তাদের রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম সদ্যপ্রস্তুত ঝকঝকে কতকগুলি রোবট দেখব কিন্তু সেরকম কিছু না। বিরাট হলঘরের মতো ল্যাবরেটরীতে ছোট ছোট কালো টেবিলের উপর কাচের গোলকে কপোট্রন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একপাশে একটি প্রিন্টিং মেশিন অপর পাশে মাইক্রোফোন, প্রশ্ন করলে উত্তর বলে দেবে কিংবা লিখে দেবে। দেয়ালে কিছু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চৌকোণা ট্রান্সফর্মার, দেখে মনে হলো এখান থেকে উচ্চচাপের বৈদ্যুতিক প্রবাহ দেয়া হয়। কপোট্রনের সামনে লম্বাটে মাউথপীস। ঠিক একই রকম বেশ কয়টি কপোট্রন পাশাপাশি সাজানো। আমি জিজ্ঞাসু চোখে ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, রোবটের

শরীরের সাথে এখনও জুড়ে—দিইনি, দিতে হবেও না বোধহয়।

কেন ?

এই কপোট্রনগুলি স্বাভাবিক নয়। সব কপোট্রনই কিছু কিছু যুক্তি-তর্ক মেনে চলে। এগুলির সেরকম কিছু নেই।

মানে ? ওরা তাহলে আবোল তাবোল বকে ?

অনেকটা সেরকমই। ভদ্রলোক হাসলেন। ওদের কল্পনাশক্তি অস্বাভাবিক। ঘোর অযৌক্তিক ব্যাপারও বিশ্বাস করে এবং সে নিয়ে রীতিমত তর্ক করে।

এগুলি তৈরী করে লাভ ? এতো দেখছি উন্মাদ কপোট্রন !

তা উন্মাদ বলতে পারেন ! কিন্তু এদের দিয়ে কোন লাভ হবে না জোর দিয়ে বলা যায় না। বল্গা ছাড়া ভাবনা যদি না করা হতো পদার্থবিদ্যা কোনদিন ক্লাসিক্যাল থেকে রিলেটিভিস্টিক স্তরে পৌঁছুতো না।

তা বটে। আমি মাথা নাড়লাম। কিন্তু তাই বলে ইচ্ছে করে পাগল কপোট্রন তৈরী করবেন ?

আপনি আলাপ করে দেখুন না, আর কোন লাভ হোক কি না হোক নির্ভেজাল আনন্দ তো পাবেন।

আমি একটা কপোট্রনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি হে ?

নাম ? নামের প্রয়োজন কি ? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকলে নামের প্রয়োজন হয় না, যন্ত্রণা দিয়ে পরিচয় পাওয়া যায়। লাল নীল যন্ত্রণারা রক্তের ভিতর খেলা করতে থাকে.....

সাহিত্যিক ধাঁচের মনে হচ্ছে ? আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম।

হ্যাঁ। এটি সাহিত্যমনা। একটা কিছু জিজ্ঞেস করুন।

আমি কপোট্রনটিকে জিজ্ঞেস করলাম, যন্ত্রণারা আবার লাল নীল হয় কেমন করে ?

যন্ত্রণারা সব রংয়ের হতে পারে, সব গন্ধের হতে পারে, এমনকি সব কিছুর মতো হতে পারে। যন্ত্রণার হাত পা থাকে, চোখ থাকে—ফুরফুরে প্রজাপতির মতো পাখা থাকে। সেই পাখা নাড়িয়ে যন্ত্রণারা আরো বড়ো যন্ত্রণায় উড়ে বেড়ায়। উড়ে উড়ে যখন ক্লান্তি নেমে আসে, তখন—

তখন ?

তখন একটি একটি লাল ফুলের জন্ম হয়। সব নাইটিংগেল তখন সবগুলো ফুলের কাঁটায় বুক লাগিয়ে রক্ত শুষে নেয়—লাল ফুল সাদা হয়ে যায়, সাদা ফুল লাল....

বেশ বেশ। আমি দ্রুত পাশের কপোট্রনের কাছে সরে আসলাম।

এটিও কি ওটার মতো বদ্ধ পাগল ?

না এটা অনেকটা ভাল। এটি আবার বিজ্ঞানমনা। যুক্তি বিদ্যা ছাড়া তো বিজ্ঞান শেখানো যায় না, কাজেই এর অল্প কিছু যুক্তি বিদ্যা আছে। তবে আজগুবি আজগুবি সব ভাবনা এর মাথায় খেলতে থাকে।

আমি কপোট্রনটির পাশে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, বলতে পার বিজ্ঞান সাধনা শেষ হবে কবে ?

এই মুহূর্তে হতে পারে। একটু চেষ্টা করলেই।

আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, তবে না বলছিলেন এটা যুক্তিপূর্ণ কথা বলবে ?

ওর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে বলুন দেখি।

আমি কপোট্রনটিকে বললাম, বিজ্ঞান সাধনা শেষ হওয়া আমি দর্শন বা অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী

থেকে বলি নি। আমি সাদা কথায় জানতে চাই বিজ্ঞান সাধনা বা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন কবে শেষ হবে ?

বললাম তো, ইচ্ছে করলে এখনই।

কি ভাবে ?

ভবিষ্যতের শেষ সীমানা থেকে টাইম মেশিনে চড়ে কেউ যদি আজ এই অতীতে ফিরে আসে আর তাদের জ্ঞান সাধনার ফলটুকু বলে দেয় তা হলেই তো হয়ে যায়। আর কষ্ট করে জ্ঞান-সাধনা করতে হয় না।

আমি বোকার মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, কিন্তু আমরা কি করতে পারি ? ভবিষ্যৎ থেকে কেউ যদি না আসে ?

নিশ্চয়ই আসবে। কপোট্রনটি যুক্তিহীন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল। ভবিষ্যতের লোকেরা নিশ্চয়ই বর্তমান কালের জ্ঞানের দুরবস্থা অনুভব করবে। এর জন্যে কাউকে না কাউকে জ্ঞানের ফল সং না পাঠিয়ে পারে না।

সেই আশায় কতো কাল বসে থাকব ?

লক্ষ বছর বসে থেকেও লাভ নেই। অথচ পরিশ্রম করলে এক মাসেও লাভ হতে পারে।

কি রকম ?

যারা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে আসবে তারা তাদের কাল থেকে নিঃসময়ের রাজত্বে ঢুকবে নিজেদের যান্ত্রিক উৎকর্ষতা দিয়ে, কিন্তু নিঃসময়ের রাজত্ব থেকে বর্তমানকালে পৌঁছুবে কিভাবে? কে তাদের সাহায্য করবে? পৃথিবী থেকে কেউ সাহায্য করলেই শুধুমাত্র সেটি সম্ভব।

তোমার কথা কিচ্ছু বুঝলাম না। নিঃসময়ের রাজত্ব কি ?

নিঃসময় হচ্ছে সময়ের সেই মাত্রা যেখানে সময়ের পরিবর্তন হয় না।

এসব কোথা থেকে বলছ ?

ভেবে ভেবে। মন থেকে বলছি।

তাই হবে। এছাড়া এমন আষাঢ়ে গল্প সম্ভব !

আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোককে বললাম, চলুন যাওয়া যাক। আপনার কপোট্রনদের সাথে চমৎকার সময় কাটল। কিন্তু যাই বলুন—আমি না বলে পারলাম না, এগুলি শুধু শুধু তৈরী করেছেন, কোন কাজে লাগবে না।

আমারও তাই মনে হয়। তাঁকে চিন্তিত দেখাল, যুক্তিহীন ভাবনা দিয়ে লাভ নেই।

ফার্ম থেকে বাসায় ফেরার সময় নির্জন রাস্তায় গাড়ীতে বসে বসে আমি কপোট্রনটির কথা ভেবে দেখলাম। সে যেসব কথা বলেছে তা অসম্ভব কল্পনাবিলাসী লোক ছাড়া বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটি কি শুধুই কল্পনা বিলাস? কথাগুলোর প্রমাণ নেই সত্যি কিন্তু যুক্তি কি একেবারেই নেই? আমি ভেবে দেখলাম ভবিষ্যৎ থেকে কেউ এসে হাজির হলে মানবসভ্যতা একধাপে কত উপরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু কপোট্রনের ঐ নিঃসময়ের রাজত্ব-টাজত্ব কথাগুলি একেবারে বাজে, শুধু কল্পনা করে কারো এরকম বলা উচিত না, তবে ব্যাপারটি কৌতুহলজনক, সত্যি সত্যি একটু ভেবে দেখলে হয়।

পরবর্তী কয়দিন যখন আমি অতীত, ভবিষ্যৎ, চতুর্মাত্রিক জগৎ, আপেক্ষিক তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে পড়াশুনা করছিলাম তখন মাঝে মাঝে আমার নিজেরই লজ্জা করত, একটি ক্ষ্যাপা কপোট্রনের কথা শুনে সময় নষ্ট করছি ভেবে। এ বিষয় নিয়ে কেন জানি আগে কেউ কোনদিন গবেষণা করেনি। সময়ে পরিভ্রমণ সম্পর্কে আমি মাত্র একটি প্রবন্ধ পেলাম এবং সেটিও ভীষণ অসংবদ্ধ। বহু পরিশ্রম করে উন্নতশ্রেণীর কয়েকটি কম্পিউটারকে নানাভাবে জ্বালাতন করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল। সেগুলি হচ্ছে, প্রথমত, উপযুক্ত পরিবেশে সময়ের অনুকূল কিংবা প্রতিকূলে যাত্রা করে ভবিষ্যৎ কিংবা অতীতে যাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সময়ের স্রোতে যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে ও শেষ মুহূর্তে অচিন্তনীয় পরিমাণ শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন। সেই মুহূর্তে শক্তিময় নিয়ন্ত্রণ না করলে পুরো যাত্রা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এবং তৃতীয়ত, যাত্রার পূর্ব ও শেষ মুহূর্তের মধ্যবর্তী সময় স্থির সময়ের ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে কোন শক্তির প্রয়োজন নেই।

আমি ভেবে দেখলাম উন্মাদ কপোট্রনটি যা বলেছিল তার সাথে এই সিদ্ধান্তগুলির খুব বেশী

একটা অমিল নেই। প্রথমবারের মতো কপোট্রনটির জন্য আমার একটু সম্ভ্রমবোধের জন্ম হলো।

এরপর আমার মাথায় ভয়ানক ভয়ানক সব পরিকল্পনা খেলা করতে লাগল। যেসব ভবিষ্যতের অভিযাত্রীরা অতীতে আসতে চাইছে আমি তাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। নিঃসময়ের ক্ষেত্র থেকে বর্তমানে পৌঁছুতে যে শক্তিক্ষয় হবে তা নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক কলাকৌশল আমার মাথায় উঁকি দিতে লাগল। এই সময়-স্টেশনটি তৈরী করতে কি ধরনের রোবটের সাহায্য নেব মনে মনে স্থির করে নিলাম।

যে উন্মাদ কপোট্রনটির প্ররোচনায় আমি এই কাজে নেমেছি তার সাথে আবার দেখা করতে গিয়ে শুনলাম সেটিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। যারা যুক্তিহীন ভাবনা ভালবাসে তারা নাকি প্রকৃত অর্থেই অপদার্থ। শুনে আমার একটু দুঃখ হলো।

যেহেতু সময়ে পরিভ্রমণ বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত নয় এবং এ বিষয়ে গবেষণার জন্য সরকারী সাহায্যের কোন আশা নেই, সেহেতু আমি এই সময়-স্টেশনটি বাসাতেই স্থাপন করব ঠিক করলাম। যান্ত্রিক কাজে পারদর্শী দুটি রোবট নিয়ে এসে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করলাম। পুরো পরিকল্পনা আমার নিজের চিন্তা প্রসূত এবং ব্যাপারটি যে কোন বিষয় থেকে জটিল। কাজ শেষ হতে একমাসের বেশী সময় লাগলো। টোপন দিনরাত সব সময় স্টেশনের পাশে বসে থাকত। এটা দিয়ে ভবিষ্যতের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা হবে শুনে সে অস্বাভাবিক কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কোন্ সুইচটি কোন্ কাজে লাগবে এবং কোন্ লিভারটি কিসের জন্যে তৈরী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে তার কোন ক্লান্তি ছিল না।

পরীক্ষামূলকভাবে যেদিন সময়-স্টেসনটি চালু করলাম সেদিন টোপন আমার পাশে বসে। উত্তেজনায় সে ছটফট করছিল। তার ধারনা এটি চালু করলেই ভবিষ্যতের মানুষেরা টুপটাপ করে হাজির হতে থাকবে!

একটা মৃদু গুঞ্জন ধ্বনির সাথে সাথে দুটি লালবাতি বিপ বিপ করে জ্বলতে লাগল। সামনে নীলাভ স্ক্রীনে আলোকতরঙ্গ বিচিত্রভাবে খেলা করছিল। আমি দুটি লিভার টেনে একটা সুইচ টিপে ধরলাম, একটা বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ হল, এখন স্থির সময়ের ক্ষেত্রের সাথে এই জটিল সময় স্টেশনটির যোগাযোগ হবার কথা। সেখানে কোন টাইম মেশিন থাকলে বড়ো স্ক্রীনটাতে সংকেত পাব। কিন্তু কোথায় কি? বসে থাকতে থাকতে আমার বিরক্তি ধরে গেল, বড়ো স্ক্রীনটিতে এতটুকু সংকেতের লক্ষণ পাওয়া গেল না।

পাশে বসে থাকা টোপনকে লক্ষ্য করলাম। সে আকুল আগ্রহে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে, উত্তেজনায় বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। সে প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এক্ষুণি একজন ভবিষ্যতের মানুষ লাফিয়ে নেমে আসবে। তাকে দেখে আমার মায়া হলো, জিজ্ঞেস করলাম,

কি রে টোপন, কেউ যে আসে না!

আসবে বাবা আসবে। তাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখাল।

কেউ যদি আসে তাহলে তাকে তুই কি বলবি?

বলব, গুড মর্নিং। সে স্ক্রীন থেকে চোখ সরাল না, পাছে ভবিষ্যতের মানুষ সেই ফাঁকে স্ক্রীনে দেখা দিয়ে চলে যায়।

আচ্ছা বাবা, আমার যদি একটা টাইম মেশিন থাকে—

হুঁ।

তাহলে আমি অতীতে যেতে পারব?

কেন পারবি না। অতীত ভবিষ্যৎ সব জায়গায় যেতে পারবি।

অতীতে গিয়ে আমার ছেলেবেলাকে দেখব ?

দেখবি।

আমি যখন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতাম তখনকার আমাকে দেখব ?

দেখবি।

আচ্ছা বাবা, অতীতে গিয়ে আমি যদি আমার হামা-দেয়া আমাকে মেরে ফেলি তাহলে আমি এখন কোত্থেকে আসব ?

আমি চুপ করে থাকলাম। সত্যিই তো! কেউ যদি অতীতে গিয়ে নিজেকে হত্যা করে আসে তাহলে সে আসবে কোত্থেকে? অথচ সে আছে, কারণ সে নিজে হত্যা করেছে! এ কি করে সম্ভব ? আমি ভেবে দেখলাম এ কিছুতেই সম্ভব না—কাজেই অতীতে ফেরাও সম্ভব না। টাইম মেশিনে করে ভবিষ্যতের মানুষ অতীতে ফিরে আসবে এসব কল্পনাবিলাস। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। একটি উন্মাদ কপোট্রনের প্ররোচনায় এতদিন শুধুশুধু পরিশ্রম করলাম, অকাতরে টাকা ব্যয় করলাম! রাগে দুঃখে আমার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হল। লিভার ঠেলে সুইচ টিপে আমি সময় স্টেশনটি বন্ধ করে দিলাম।

বাবা, বন্ধ করলে কেন ? টোপন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

তোর প্রশ্ন শুনে। তুই যে প্রশ্নটি করেছিস সেটি আমার আগে মনে হয়নি তাই।

টোপন কিছু না বুঝে বলল, কি প্রশ্ন ?

ঐ যে তুই জিজ্ঞেস করলি অতীতে নিজেকে মেরে ফেললে পরে কোত্থেকে আসব। তাই অতীতে যাওয়া সম্ভব না, টাইম মেশিন তৈরী সম্ভব না—

টোপনের চোখে পানি টলমল করে উঠল। মনে হল এই প্রশ্নটি করে আমাকে নিরুৎসাহিত করে দিয়েছে বলে নিজের উপর ক্ষেপে উঠেছে। আমাকে অনুনয় করে বলল, আর একটু থাক না বাবা।

থেকে কোন লাভ নেই। আয় যাই, অনেক রাত হয়েছে। টোপন বিষণ্ণমুখে আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম সময়ে পরিভ্রমণের উপরে কেন এতোদিন কোন কাজ হয়নি। সবাই জানত এটি অসম্ভব, ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে আসলে অতীত পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিন্তু বাস্তব জগতের পরিবর্তন—তা অতীতই হোক আর ভবিষ্যৎই হোক কোন দিনই সম্ভব নয়। আমি প্রথমে উন্মাদ কপোট্রনটির উপর পরে নিজের উপর ক্ষেপে উঠলাম। কম্পিউটারগুলিকে কেন যে বাস্তব সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞেস করিনি ভেবে অনুতাপ হল। কিন্তু তাতে লাভ কি, আমার এই অযথা পরিশ্রম আর কোন দিন ফিরে আসবে না।

টোপন হাল ছাড়ল না। প্রতিদিন আমাকে অনুনয় বিনয় করে সময় স্টেশনটি চালু করতে বলত। তাকে কোন যুক্তি দিয়ে বোঝান গেল না যে কোনদিনই ভবিষ্যতের মানুষ অতীতে আসবে না,—এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। তার অনুনয় বিনয় শুনতে শুনতে আমাকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল। আমি আবার সময় স্টেশনটি চালু করলাম। টোপনকে সুইচপ্যানেলের সামনে বসিয়ে দিয়ে আমি চলে আসলাম। আসার সময় সাবধান করে দিলাম, কোনও সুইচে যেন ভুলেও চাপ না দেয়। শুধু বড়ো স্ক্রীনটার দিকে যেন নজর রাখে। যদি কিছু দেখতে পায় (দেখবে না জানি) তবে আমাকে যেন খবর দেয়।

এই জটিল ও মূল্যবান যন্ত্রটি সাত বছরের একটি ছেলের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে

আমার কোন দ্বিধা হয়নি। আমি জানি বাচ্চা ছেলেদের ছেলেবেলা থেকে সত্যিকার দায়িত্ব পালন করতে দিলে তারা সেগুলি মন দিয়ে পালন করে, আর পরে খাঁটি মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে। টোপনের সাথে আগেও আমি বেশ গুরুত্ব দিয়ে কথা বলতাম, প্রায় বিষয়েই আমি ওর সাথে এমনভাবে পরামর্শ করেছি যেন সে একটি বয়স্ক মানুষ। এই সময় স্টেশনটি তৈরি করার সময়েও কোন্ লিভারটি কোথায় বসালে ভাল হবে তার সাথে আলাপ করে দেখেছি।

সারাদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কাটিয়ে সন্ধ্যেয় বাসায় ফিরে আসতেই বুলা আমাকে বলল, টোপন সারাদিন নাওয়া-খাওয়া করেনি। একমনে সময় স্টেশনের সামনে বসে আছে। আমি হেসে বললাম, একদিন নাওয়া-খাওয়া না করলে কিছু হয় না।

তুমি তো তাই বলবে। বুলা উষ্ণ হয়ে বলল, নিজে যেরকম হয়েছ ছেলেটিকেও সে রকম তৈরি করছ।

বেশ, বেশ, টোপনকে খেতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলে আমি সময় স্টেশনটিতে হাজির হলাম। অতিকায় যন্ত্রপাতির ভিতরে সুইচ প্যানেলের সামনে ছোট্ট টোপন গম্ভীর মুখে বড়ো স্ক্রীনটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখলাম। সে চমকে উঠে বলল, কে?

আমি, কিরে কিছু দেখলি?

এখনও দেখিনি। তবে ঠিক দেখব। সারাদিন না খেয়ে ওর মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

যা এখন খেয়ে আয়। ততক্ষণ আমি বসি।

তুমি বসবে? টোপন কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি যাব আর আসব, এক ছুটে—

এক ছুটে যেতে হবে না। ধীরে সুস্থে খেয়ে দেয়ে আয়। সারা দিনরাত তো আর এখানে বসে থাকতে পারবি না। ঘুমোতে হবে, পড়তে হবে, স্কুলে যেতে হবে,খেলাধূলা করতে হবে।

কয়দিন খেলাধুলা করব না, স্কুল থেকে এসেই এখানে বসব। তারপর পড়া শেষ করে—

বেশ বেশ!

তুমি না হয় আমাকে শিখিয়ে দিও কিভাবে এটি চালু করতে হয়? তাহলে তোমাকে বিরক্ত করব না।

আচ্ছা আচ্ছা তাই দেব। এখন খেয়ে আয়।

শেষ পর্যন্ত পুরো সময় স্টেশন ট টোপনের খেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল। সে সময় পেলেই নিজে এসে চালু করে চুপচাপ বসে থাকত, আর যাবার সময় বন্ধ করে চলে যেত। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতাম। টোপনকে জিজ্ঞেস করতাম,

কি রে, কিছু দেখলি?

এখনও দেখিনি। তবে ঠিক দেখব। এরই নাম বিশ্বাস! আমি মনে মনে হাসতাম।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। আমি সময় স্টেশনটির কথা ভুলেই গেছি। মাঝে মাঝে টোপন এসে আমাকে নিয়ে যেতো যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেবার জন্যে। খুঁটিনাটি ভুলের জন্যে ভবিষ্যতের মানুষ হাতছাড়া হয়ে গেলে তার দুঃখের সীমা থাকবে না।

সেদিন দুপুরে আমি সবে এককাপ কফি খেয়ে কতকগুলি কাগজপত্র দেখছি এমন সময় ঝন ঝন করে ফোন বেজে উঠল। সহকারী মেয়েটি ফোন ধরে রিসিভারটি আমার দিকে এগিয়ে

দিল, আপনার ছেলের ফোন।

আমি রিসিভারে কান পাততেই টোপনের চীৎকার শুনলাম, বাবা, এসেছে, এসেছে—এসে গেছে!

কে এসেছে?

ভবিষ্যতের মানুষ! তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস। ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম মানুষ?

এখনও দেখিনি। বড়ো স্ক্রীনটায় এখন শুধু আলোর দাগ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে লম্বা লম্বা থাকে পরে হঠাৎ ঢেউয়ের মতো হয়ে যায়। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।

সত্যি বলছিস তো? টোপন মিথ্যা বলে না জেনেও জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, ঠিক দেখেছিস তো?

তুমি এসে দেখে যাও মিথ্যা বলছি নাকি। টোপনের গলার স্বর কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়, এতোক্ষণে চলেই গেল নাকি!

আমি সহকারী মেয়েটিকে বললাম, জরুরী কাজে চলে যাচ্ছি, বাসায় কেউ যেন বিরক্ত না করে। তারপর লিফট বেয়ে নেমে আসলাম,

বাসা বেশী দূরে নয়, পৌছুতে বেশী সময় লাগল না। টোপন আমার জন্যে বাসার গেটে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই পুরো ঘটনাটা হড়বড় করে দু'বার বলে গেল। আমি তাকে নিয়ে সময় স্টেশনে ঢুকে দেখি বড়ো স্ক্রীনটা সত্যি সত্যি আলোক তরঙ্গে ভরে যাচ্ছে। এটি হচ্ছে স্থির সময়ের ক্ষেত্রে পার্থিব বস্তুর উপস্থিতির সংকেত। আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। আমার সামনে সম্পূর্ণ অসম্ভব একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে।

এখন আমার অনেক কাজ বাকি। সাহায্য করার কেউ নেই, টোপনকে নিয়েই কাজ সুরু করতে হল। প্রথমে দুটো বড়ো বড়ো জেনারেটর চালু করলাম—গুম গুম শব্দে ট্রান্সফর্মারগুলি কেঁপে উঠল। ঝিলিক ঝিলিক করে দুটো নীল আলো ঘুরে ঘুরে যেতে লাগল। বিভিন্ন মিটারের কাঁটা কেঁপে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। লিভারে চাপ দিতেই সামনে অনেকটুকু জায়গায় শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের জমে উঠা ধূলা-বালি আয়নিত হয়ে কাঁপনের সাথে সাথে সেখানে একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করল। এগুলি আর পরিষ্কার করার উপায় নেই।

তারপর সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সুইচ প্যানেলের সামনে বসে পড়লাম, কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

রাত দুটো বাজার পরও কিছু হলো না। আমি সব রকম প্রস্তুতি শেষ করে বসে আছি। এখন ঐ ভবিষ্যতের যাত্রী নেমে আসতে চাইলেই হয়। এক সময় লক্ষ্য করলাম টোপন টুলে বসে সুইচ প্যানেলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা দিনের উত্তেজনা ওকে দুর্বল করে ফেলেছে নইলে ও এত সহজে ঘুমোবার পাত্র নয়। ওকে জাগিয়ে দিতেই ধড়মড় করে উঠে বলল, এসেছে!

এখনো আসেনি, দেরী হতে পারে। তুই ঘরে গিয়ে ঘুমো। আসলেই খবর দেব।

না না—টোপন প্রবল আপত্তি জানাল, আমি এখানেই থাকব।

বেশ, থাক তাহলে। তোর ঘুম পাচ্ছে দেখে বলছিলাম।

একটু পরে ঘুমে বার কয়েক ঢুলে পড়ে টোপন নিজেই বলল, বাবা, খুব বেশী দেরী হবে? তা হলে আমি না হয় একটু শুয়ে আসি, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ওরা আসতেই তুমি আমাকে খবর দিও।

ঠিক আছে। পুরো কৃতিত্বটাই তো তোর—তোকে খবর না দিয়ে পারি?

টোপন খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে চলে গেল।

বসে সিগারেট খেতে খেতে বোধহয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল। প্রচণ্ড শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠলাম। হঠাৎ করে, কিছু বুঝার আগে, খালি জায়গায় অতিকায় চ্যাপটা মতো ধূসর কি একটা নেমেছে! ঘরে ঢোকার জন্যে ছোট ছোট দরজা অথচ এটি কিভাবে ভিতরে চলে এসেছে ভেবে ধাঁধাঁ লেগে যাবার কথা। ভীষণ ধুলাবালি উড়ছে, রনোমিটার কঁ কঁ শব্দ করে বিপদসংকেত দিচ্ছে, আমি তীব্র রেডিয়েশান অনুভব করে ছুটে একপাশে সরে আসলাম। একা এতোগুলো সুইচ সামলানো কঠিন ব্যাপার। টাইম মেশিনটিকে স্থির করতে আমার কালো ঘাম ছুটে গেল।

একটু পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম জিনিসটা হোভার ক্র্যাফটের মতো দেখতে, অতিকায়। পিছনের দিকটা চৌকোণা হয়ে গেছে। মাথা চ্যাপটা তাতে দুটো বড়ো বড়ো ফুটো—ভিতরে লাল আলো ঘুরছে। টাইম মেশিনটির মাঝামাঝি জায়গায় খানিকটা অংশ কালো রংয়ের, আমার মনে হলো এটিই বোধহয় দরজা। ঠিক তক্ষুণি খানিকটা গোল অংশ সরে গিয়ে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়লো। উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসলো, আমি আমার হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেলাম, এক্ষুণি ভবিষ্যতের মানুষ নামবে!

আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে একজন নেমে আসল, ভেবেছিলাম স্পেস স্যুট জাতীয় কিছু গায়ে মানুষ, কাছে আসার পর বুঝতে পারলাম ওটি একটি রোবট। রোবটটি হেঁটে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, আমার হিসেব ভুল না হলে আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন।

হ্যাঁ, পারছি। আমি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিলাম। সুদূর অতীতের অধিবাসী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

সুদূর ভবিষ্যতের অধিবাসীও প্রত্যুত্তরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমি জীবনে প্রথম একটি রোবটকে হাসতে দেখলাম। কিন্তু তার কথাটি আমার কানে খট করে আঘাত করল। সুদূর ভবিষ্যতের অধিবাসী মানে? তাহলে কি ভবিষ্যতে রোবটরাই পৃথিবীর অধিবাসী?

আমাকে অবতরণ করতে সাহায্য করেছেন বলে ধন্যবাদ। রোবটটির চোখ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। তবুও যথেষ্ট ধকল গিয়েছে। এতটা ফ্লিচিং বার্ড ছিঁড়ে গেছে।

আমি কি করতে পারি? হাত উল্টিয়ে বললাম, এই শতাব্দীতে যান্ত্রিক উৎকর্ষতার ভিতরে যতটুকু সম্ভব—

সে তো বটেই, সে তো বটেই! রোবটটি ব্যস্ত হয়ে বলল, আমরা এতটুকুও আশা করিনি।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোবটটির গঠন নৈপুণ্য, কথা বলার ভঙ্গী, ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলাম। যান্ত্রিক উৎকর্ষতা কত নিখুঁত হলে এরকম একটি রোবট তৈরি করা সম্ভব চিন্তা করতে গিয়ে কোন কূল পেলাম না। একটি মানুষের সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। খুব অস্বস্তির সাথে মনে হলো হয়তো কোন কোন দিকে এটি মানুষের থেকেও নিখুঁত। কিন্তু আমি বিস্ময় ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে কাজের কথা সেরে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। রোবটটিকে বললাম, আপনি ভবিষ্যৎ থেকে এসেছেন। সবকিছুর আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। আপনাদের পৃথিবীর হিসেবে এক ঘন্টা পরে এই টাইম মেশিন নিজে থেকে চালু হয়ে উঠে আমাকে নিয়ে আরো অতীতে চলে যাবে।

এক ঘণ্টা অনেক সময়, তার তুলনায় আমার প্রশ্ন বেশী নেই। আমি মনে মনে প্রশ্নগুলি গুছিয়ে নিয়ে বললাম, কেউ অতীতে ফিরে আসলে অতীত পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটা কি করে সম্ভব ?

অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন—

যেমন আপনি আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পরে সৃষ্টি হবেন, আপনার অতীতে আপনি নেই কারণ এখনও আপনি সৃষ্টি হননি। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি অতীতে আসবেন তৎক্ষণাৎ আগের অতীতের সাথে পার্থক্যের সৃষ্টি হবে—অতীতটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এটা কি করে সম্ভব ?

রোবটটি অসহিষ্ণু মানুষের মতো কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আপনি এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারছেন না ? অতীতে ফিরে আসলে তো সে অতীত আর আগের অতীত থাকে না, নতুন অতীতের সৃষ্টি হয়।

মানে ? অতীত কয়টা হতে পারে ?

বহু। এখানেই আপনারা ভুল করছেন। শুধু অতীত নয় জীবনও বহু হতে পারে। আপনি ভাবছেন আপনার জীবনটাই সত্যি, কিন্তু আমার অতীতে আপনার যে অস্তিত্ব ছিল তাতেও আপনার জন্য এক অস্তিত্ব তার জীবনটাকে সত্যি ভেবেছিল। এই মুহূর্তেও আপনার অনেক অস্তিত্ব বিদ্যমান, আপনার চোখে সেগুলো বাস্তব নয় কারণ আপনি সময়ের সাথে সাথে সেই অস্তিত্বে প্রবাহিত হচ্ছেন না। অথচ তারা ভাবছে তাদের অস্তিত্বটাই বাস্তব, অন্য সব অস্তিত্ব কাল্পনিক।

মানে ? আমার সবকিছু গুলিয়ে গেল। আপনার কথা সত্যি হলে আমার আরো বহু অস্তিত্ব আছে ?

শুধু আপনার নয়, প্রত্যেকের, প্রত্যেকটি জিনিসের অসীম সংখ্যক অস্তিত্ব। আপনারা আমরা সবাই সময়ের সাথে সাথে এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে প্রবাহিত হই। যে অস্তিত্বে আমরা প্রবাহিত হই সেটিকেই সত্য বলে জানি—তার মানে এই নয় অন্যগুলি কাল্পনিক।

তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে এরকম। আমি একটু চিন্তা করে নিলাম। পৃথিবী সৃষ্টি হল, মানুষের জন্ম হল, সভ্যতা গড়ে উঠল, এক সময় আমার জন্ম হল। আমি বড় হলাম, এক সময়ে মারা গেলাম। তারপর অনেক হাজার বছর পার হল, তখন আপনি সৃষ্টি হলেন। আপনি অতীতে ফিরে আসলেন আবার আমার কাছে। আবার আমি বড়ো হব, মারা যাব কিন্তু সেটি আগের আমি না—সেটি আমার আগের জীবন না, কারণ আগের জীবনে আপনাকে আমি দেখিনি।

ঠিক বলেছেন। এইটি নতুন অস্তিত্বে প্রবাহ। আপনার পাশাপাশি আরো অনেক জীবন এভাবে বয়ে যাচ্ছে সেগুলি আপনি দেখবেন না, বুঝবেন না—

কেন দেখব না ?

দুই সমতলে দুটি সরল রেখার কোনদিন দেখা হয় না, আর এটি তো ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের প্রশ্ন।

আমি মাথার চুল খামচে ধরলাম। কি ভয়ানক কথা। এই পৃথিবী, জীবনপ্রবাহ সভ্যতাকে কি সহজ ভাবতাম ! অথচ এর নাকি হাজার হাজার রূপ আছে, সবাই নিজেদের সত্যি বলে ভাবছে। আমি কাতর গলায় বললাম, এইসব হাজার হাজার অস্তিত্ব ঝামেলা করে না ? একটা আরেকটার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে—

হতে পারে। আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা আমাদের জীবনপ্রবাহটিকে ঠিক রাখতে চাই। এব্যাপারে অন্য কোন অস্তিত্ব ঝামেলা করলে আমরা তাদের জীবনপ্রবাহ বদলে অন্য রকম করে ফেলি, এর বেশী কিছু না।

বুঝতে পারলাম না।

যেমন ধরুন আপনাদের জীবনপ্রবাহটি, এটির ভবিষ্যৎ খুব সুবিধের নয়। আমরা যেরকম খুব সহজে মানুষকে পরাজিত করে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা, পৃথিবীর কর্তৃত্ব আমাদের হাতে নিয়ে নিয়েছি, আপনাদের ভবিষ্যতে রোবটরা তা পারত না আমি যদি এখানে না আসতাম। আপনাদের ভবিষ্যতের মানুষদের আমাদের অস্তিত্বে হামলা করে মানুষের পক্ষ থেকে রোবটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা। আমরা সেটি চাই না, তাই এটা পরিবর্তিত করতে চাইছি।

কিভাবে ?

এই যে আপনার কাছে চলে আসলাম—এতে এই অতীতটি পরিবর্তিত হয়ে নতুন দিকে চলছে। আমরা দেখে এসেছি এখন খুব তাড়াতাড়ি রোবটেরা আপনাদের পরাজিত করে ক্ষমতা নিয়ে নেবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

আমি চুপ করে রইলাম !

তারপর ধরুন জীবন সৃষ্টির ব্যাপারটা। আমার অতীতে যাওয়ার প্রথম কারণই তো এইটি।

কি রকম ?

আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর এক আদিম গুহায় কয়েকশত কোটি বছর আগেকার একটি আশ্চর্য জিনিস পেয়েছিলেন।

কি ?

আমাকে পেয়েছিলেন। এই টাইম মেশিনে বসে আছি, অবশ্যি বিধ্বস্ত অবস্থায়।

মানে ?

হ্যাঁ, আমার কপোট্রন বিশ্লেষণ করে দেখা গেল আমি কতকগুলি এককোষী প্রাণী নিয়ে গিয়েছিলাম।

কেন ?

পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি করতে। পৃথিবী সৃষ্টির পরে এখানে প্রাণের জন্ম সম্বন্ধে আপনারা যা ভাবছেন তা সত্যি নয়। মহাকাশ থেকে জটিল জৈবিক অণু থেকে নয়, মাটি পানির ক্রমাগত ঘর্ষণে স্বাভাবিক উপায়ে নয়, ঈশ্বরের কৃপাতেও নয়, আমিই অতীতে প্রাণ নিয়ে গিয়েছি। শুদ্ধ করে বললে বলতে হয় প্রাণ নিয়ে যাচ্ছি।

মানে ? আপনি বলতে চান সুদূর অতীতে এই এককোষী প্রাণী ছড়িয়ে দিলে পরেই প্রাণের জন্ম হবে, ক্রমবিবর্তনে গাছপালা, ডাইনোসর, বাঘ-ভালুক মানুষ এসবের জন্ম হবে ?

ঠিক ধরেছেন।

কিন্তু যদি আপনি ব্যর্থ হন ? আমি কঠোর গলায় বললাম, যদি আপনি অতীতে এককোষী প্রাণী নিয়ে প্রাণের সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে কি এই জীবন সভ্যতা কিছুই সৃষ্টি হবে না ?

ব্যর্থ হওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু আমাকে কয়েকশত কোটি বছর আগে পাওয়া গেছে, কাজেই আমি ব্যর্থ হলেও আমার অন্য কোন অস্তিত্ব নিশ্চয়ই অতীতে প্রাণ রেখে আসবে। তবে তার প্রয়োজন হবে না। আমার ব্যর্থ হওয়ার আশংকা নেই। আমি পুরো অতীত পর্যবেক্ষণ করে দেখছি।

কিন্তু তবু যদি আপনি ব্যর্থ হন ?

বললাম তো হব না। আমি আমার পুরো যাত্রাপথ ছকে এসেছি।

কিন্তু যদি তবুও কোনভাবে ব্যর্থ হন? আমি একগুঁয়ের মত বললাম, কোন দুর্ঘটনায় যদি আপনার মৃত্যু হয়? কিংবা আপনার টাইম মেশিন যদি ধ্বংস হয়?

তাহলে বুঝতে হবে আমি অন্য এক জগতে ভুলে নেমে পড়েছি।

সেটির ভবিষ্যৎ কি?

কে বলতে পারে! তবে—রোবটটি মনে মনে কি হিসেব করল, তারপর বলল, যদি আমি কোন জগতে নামার দরুন অতীতে ফিরে যেতে ব্যর্থ হই তবে সে জগতের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ, এখনও মানুষ ঠুক ঠুক করে জ্ঞান সাধনা করছে। রোবটটি হা হা করে হাসল, বলল, হয়তো আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে একেবারে গোড়া থেকে সভ্যতা সৃষ্টি করছে! রোবটটি আবার দুলে দুলে হেসে উঠল। মানুষের প্রতি এর অবজ্ঞা প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে নিজে এটি বুঝতে পারছে না।

আমি অনেক কষ্ট করে শান্ত থাকলাম। তারপর মৃদুস্বরে বললাম, আপনার কাছ থেকে অনেককিছু জানতে পারলাম।

আরো আলাপ করার ইচ্ছে ছিল, রোবটটি বলল কিন্তু এই টাইম মেশিনটি একটু পরে নিজে থেকে চালু হয়ে উঠবে। আর সময় নেই।

এক সেকেণ্ড! আমার টোপনের কথা মনে হল। বললাম, আমার ছেলে ভবিষ্যতের অধিবাসী দেখতে ভীষণ আগ্রহী। ওর আগ্রহেই আপনার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে—ওকে একটু ডেকে আনি।

বেশ, বেশ। তবে একটু তাড়াতাড়ি করুন। বুঝতেই পারছেন—

আমি টোপনের ঘরে যাওয়ার আগে নিজের ঘরে গেলাম, একটি জিনিস নিতে হবে। বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হল না, ড্রয়ারেই ছিল। সেটি সার্টের তলায় গুঁজে টোপনকে ডেকে তুললাম, টোপন, ওঠ, ভবিষ্যতের মানুষ এসেছে।

এসেছে বাবা? এসেছে? কেমন দেখতে?

দেখলেই বুঝতে পারবি, আয় আমার সাথে। আমি ওকে নিয়ে সময় স্টেশনে হাজির হলাম। রোবটটি সুইচ প্যানেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওটিকে দেখে টোপন অবাক হয়ে বলল, মানুষ কই, এটিতো রোবট!

ভবিষ্যতের মানুষ রোবট হয়! আমি দাঁতে দাঁত চেপে হাসলাম। টোপন বিমর্ষ হয়ে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল, কথা বলার উৎসাহ পেল না। রোবটটি একটু অপ্রস্তুত হল মনে হল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, এবারে বিদায় নিই, আমি অনেক বড় দায়িত্ব নিয়ে এসেছি।

বেশ। আমি হাত নাড়লাম, আবার দেখা হবে।

রোবটটি তার টাইম মেশিনের দরজায় উঠে দাঁড়াল। বিদায় নিয়ে হাত নেড়ে ওটি ঘুরে দাঁড়ালো।

টোপন—আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, চোখ বন্ধ কর। না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবি না।

কেন বাবা?

কাজ আছে, বন্ধ কর চোখ। টোপন চোখ বন্ধ করল। আমি সার্টের তলা থেকে একটু আগে নিয়ে আসা রিভলবারটি বের করলাম। রোবটটিকে শেষ করে দিতে হবে। আমার বংশধরের ভবিষ্যৎ এই রোবটদের পদানত হতে দেয়া যাবে না। এটিকে শেষ করে দিলেই পুরো ভবিষ্যৎ পাল্টে যাবে।

রিভলবারটি তুলে ধরলাম। একসময় ভালো হাতের টিপ ছিল। হে মহাকাল, একটিবার সেই টিপ ফিরিয়ে দাও ! মনুষত্বের দোহাই, পৃথিবীর দোহাই, সভ্যতার দোহাই, রোবটের দাসত্ব থেকে উদ্ধার পাবার দোহাই, একটিবার হাতের নিশানা ঠিক করে দাও ... একটিবার ....

আমি রোবটের কপোট্রন লক্ষ্য করে গুলী করলাম, প্রচণ্ড শব্দ হল। টোপন চীৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরল আর রোবটটির চূর্ণ কপোট্রন টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়ল। খুব ধীরে ধীরে রোবটটি কাত হয়ে টাইম মেশিনের ভিতর পড়ে গেল !

খানিকক্ষণ থেকেই একটা ভোঁতা শব্দ হচ্ছিল, এবার সেটা তীক্ষ্ণ সাইরেনের আওয়াজের মত হল। সাঁৎ করে হঠাৎ দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কানে তালা লাগানো শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল, তারপর কিছু বোঝার আগে ধূসর টাইমমেশিন অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্য জায়গাটা দেখে কে বলবে এখানে কখনো কিছু এসেছিল !

চোখ খোল টোপন। টোপন চোখ খুলে চারিদিক দেখল। তারপর, আমার দিকে তাকাল, কি হয়েছে বাবা ?

কিছু না ?

রোবট কই ? টাইম মেশিন কই ?

চলে গেছে।

আর আসবে না !

না। আর আসবে না। যদি আসে মানুষ আসবে।

কবে ?

আজ হোক কাল হোক আসবেই একদিন। মানুষ না এসে পারে ?

তিকি-লিকির গল্প

মঈনুল আহসান সাবের

ইঁদুর মা আর ইঁদুর বাবার দুই ছেলে। তিকি আর লিকি। তিকি বড়, লিকি ছোট। তারা থাকে বিরাট এক চারতলা বাড়ির মাটির নীচ দিয়ে যে বিরাট ড্রেনটি চলে গেছে, তার আশেপাশে। আরো অনেক অনেক ইঁদুর থাকে সেখানে। ঢ্যাঙা, লম্বা, মোটা, চিকন, রোগা-পটকা সে বহু ধরনের ইঁদুর। ছোটখাট এক রাজ্য বলা যায়।

সব ইঁদুর মিলে সেই চারতলা বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে ঢোকার কয়েকটা পথ তৈরি করে নিয়েছে। খাবার-দাবার জোগাড় করা নিয়ে তাদের খুব একটা চিন্তা নেই। তেমন দরকার হলে ভাঁড়ার ঘর ছাড়িয়ে খাবার ঘর কিংবা রান্নাঘরে যাওয়াও যাবে। সে পথও তাদের জানা আছে।

তিকি-লিকির বাবা খুবই ভাল। নিতান্তই নিরীহ, গোবেচারা। সারাদিন বইপত্রের মধ্যে ডুবে থাকেন। আগে ছোটখাট একটা স্কুল ছিল ইঁদুর রাজ্যে। তিনি ওখানে পড়াতেন। ছাত্ররা খুশী হয়ে যা দিত, তাতেই তাদের সংসারটা চলে যেত।

কিন্তু ছাত্ররা সব এমন বখাটে হয়ে গেল যে, হঠাৎ করে স্কুলটা উঠেই গেল। ওসব লেখাপড়া করে নাকি কিছুই হয়না!

তিকি-লিকির বাবা আর কি করেন, রোজগার তাঁর বন্ধ হ'ল। তবে আশার কথা, দু'এক ঘর ভদ্রলোক এখনো আছে। সেসব জায়গায় টিউশনী করে কিছু পান। কিন্তু তাতে কি আর সংসার চলে? খুব দরকার পড়লে এখন মাঝে মাঝে ভাঁড়ার ঘরের ফাঁকফোকড় গলে এটা ওটা নিয়ে আসেন। উপায় কি, বেঁচে থাকতে হবে তো।

তিকি-লিকি দু'জনের চেহারা খুব সুন্দর। অল্প অল্প গোঁফ উঠেছে। ছোট ছোট দাঁত, টানা টানা চোখ। দু'ভাইয়ের মধ্যে ওদের খুব ভাব। অবসর সময়ে ওরা আদব-কায়দা আর লেখাপড়া শেখে। ছেলেদের খুব ভালবাসলে কি হবে, একটা ব্যাপারে ওদের বাবা-মা খুব কড়া। উঁহু,

পড়াশোনার ব্যাপারে কোন ফাঁকি দেওয়া চলবে না। সময় হলেই বাবা গম্ভীর গলায় ডাক দেবেন ঃ তিকি-লিকি।

আর তিকি-লিকিও তখন হাতের সব কাজ ফেলে বইখাতা হাতে সুড় সুড় করে বাবার সামনে গিয়ে বসবে। কোনদিনও এর হেরফের হয়নি।

দু'ভাই অবশ্য খেলাধুলো আর দৌড়-ঝাঁপেও ভাল। গতবার স্পোর্টসে তিকি এক টুকরো লাল সার্টিনের কাপড় আর লিকি দু'টুকরো দারুচিনি পেয়েছিল।

ওরা অবশ্য এসব দৌড়ঝাঁপের চেয়ে লেখাপড়াই বেশী পছন্দ করে। সেই ছোট্টবেলা থেকে কত কি শিখেছে তারা। প্রথমে তারা শিখেছে আদব-কায়দা আর ভদ্রতা। গুরুজনদের দেখলে সালাম দিতে হয়, বড়দের সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলতে হয়, তাদের সব কথা শুনতে হয়, খুব জোরে কথা বলতে হয়না, খারাপ কথা বলতে নেই, মারামারি করতে নেই, সুযোগ পেলে অন্যের উপকার করা উচিত।

তিকি-লিকির বাবা ওদের বলতেন ঃ শোন, তোমরা যদি চরিত্রবান না হও, যদি আদব-কায়দা না শেখ, অন্যের উপকার না কর, তবে তোমাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। তিকি-লিকিও বাবার সব কথা শুনতো, মানতো।

সকালবেলা উঠে ওরা নীতিকথা আর বিভিন্ন উপদেশ সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তো। ওরা রাস্তায় মাথা নীচু করে হাঁটতো, মুরুব্বীদের সালাম দিত আর বন্ধুদের ঝগড়া হলে ওরাই মিটিয়ে দিত।

পাড়ার বখাটে ছেলেগুলো অবশ্য ওদের ক্ষ্যাপাতো—ওরা নাকি মিনমিনে, ন্যাকা, কোন কাজের না। ওরা অবশ্য রাগ করতো না। আসলে রাগ যে কি জিনিস সেটাইতো ওরা ভুলে গিয়েছিল।

ওদের বাবা-মার খুব গর্ব ছিল ওদের নিয়ে। আর গর্ব হবেনা কেন, বল ? পাড়ার সবাই তো ওদের প্রশংসাই করতো সব সময়। আর ওরা তো কোনদিন মারামারি করেনি, কাউকে খারাপ কথা বলেনি। কাজেই, মুরুব্বীরা কখনো ওদের খারাপ বলেননি। সবাই শুধু বলতো ঃ আহা, এমন শান্ত-ভদ্র ছেলে, এমন সাধাসিধে সরল ছেলে, এরা জীবনে উন্নতি না করে যাবেনা।

কিন্তু শুধু কি আদব-কায়দা ? তিকি-লিকি আদব-কায়দা ছাড়া আরো কত যে লেখাপড়া শিখেছিল। ওদের কথা শুনে পাড়ার ছেলেরা তো বটেই, বড়রা পর্যন্ত অবাক হয়ে যেত। ইংরেজী, বাংলা, ব্যাকরণ তো শিখেছিলই। তাছাড়া, ইঁদুরদের ইতিহাস, ওদের শহরের ভূগোল, রাজনীতি, পৌরনীতি, অর্থনীতি সবকিছু শিখে ফেলেছিল।

তিকি আবার কবিতাও লিখতো। পাড়ার ফাংশনে নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করেছিল—'যাচ্ছি আমি চাঁদে, ভয়ে দেখ মা কাঁদে।'

লিকি কবিতা লিখতে না পারলেও ভারী সুন্দর গান গায়।

তিকি-লিকির বাবা ওদের একদিন পরীক্ষা নিলেন। বাড়ির সবচেয়ে মোটা বইটাও ওরা যেদিন পড়ে শেষ করলো, তার দু'দিন পর পরীক্ষা দিয়ে ওরা খুব ভাল রেজাল্ট করলো।

মা বললেন ঃ বাছারা আমার, সোনামানিক, এই শুভদিনে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া হোক। বাসায় কিছু খাবার-দাবার তো ছিলই, ভাঁড়ার ঘর থেকেও কিছু নিয়ে আসা হলো। আর সে দিন সন্ধ্যায় এক মজার ব্যাপার ঘটে গেল। তখনো রান্নাবান্না সব শেষ হয়নি, ঠিক এ সময় হঠাৎ তিকি-লিকির দাদু এসে হাজির।

তিকি-লিকি খুব ছোট্ট বেলায় দাদুকে দেখেছিল একবার। কিন্তু এতদিন পর দেখেও ওরা দাদুকে চিনতে পারে। তিকি-লিকির দাদুর স্বভাব চরিত্র অদ্ভুত। বাড়ি থাকেন না। সেই ছোটবেলা থেকে এ রকম। চার-পাঁচ বছর পর পর বাড়ি ফিরে আসেন। দু'দিন থেকে আবার বেরিয়ে পড়েন।

ওদের বাড়িতে একটা হুল্লোড় পড়ে গেল। ঘরে ঢুকতেই তিকি-লিকির দাদু বললেন ঃ বেশ সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি হে, অনেক দিন পর এমন ভাল খাবার খাব মনে হচ্ছে। তিকি-লিকির বাবা তখন সব খুলে বললেন। শুনে দাদু ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন ঃ আচ্ছা, তা দাদু আমি একটু জিরিয়ে নেই, তারপর দেখবোখন তোরা কি কি শিখেছিস।

তিকি-লিকিকে বলতে গেলে আরেকটা পরীক্ষা দিতে হলো! দাদু রাজ্যের প্রশ্ন করলেন। তিকি-লিকি কিন্তু একটারও ভুল উত্তর দিলনা। দাদু খুব খুশী হয়ে বললেন ঃ তিকি-লিকি, তোরা দেখি অনেক কিছু শিখে ফেলেছিস। তা বাছারা, মুখ অমন নীচু করে অত মিনমিনে গলায় কথা বল কেন ? এত লাজুক আর মিনমিনে হলে এই দুনিয়ায় কি চলে রে ?

এসব কথা তিকি-লিকি কোনদিন শোনেনি। তাই ওরা একটু অবাক হলো। দাদু আবার বললেন ঃ শোন, কথা বলবে ঘাড় সোজা করে, অভদ্রতা করতে বলছিনে, কিন্তু অমন মাথা নীচু করে থাকলে কি চলে, আর গলার আওয়াজ হবে গম্ভীর, অমন আধো আধো বোল আমার বাপু

ভাল লাগে না বলে দিচ্ছি। তা, আমি আছি দিন দুই, এরমধ্যে আমি ঠিক ধরে ফেলবো, লেখাপড়া আর ওসব আদব-কায়দা ছাড়া তোরা কি কি শিখেছিস আর কি কি শিখিসনি।

হ্যাঁ, দুনিয়ায় অনেক কিছু শেখার আছে, জানো তো ?'

তিকি-লিকি মাথা নাড়লো।

দাদু বললেন ঃ বেশ।

খেতে বসে দাদু একবার চারদিকে তাকালেন। তার সামনে তিকি-লিকি, দু'পাশে ওদের বাবা-মা। দাদু বললেন ঃ এখানে খাবার দাবার কেমন পাওয়া যাচ্ছে ? বাবা মাথা নাড়লেন ঃ না, দিনকাল ভাল নয়, বেশ অনেক দিন হলো সবার খুব টানাটানি যাচ্ছে, পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যেও আর আগের মত মিল নেই, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

অবস্থা তাহলে খারাপ বলেই মনে হচ্ছে, বলতে বলতে দাদু তিকি-লিকির দিকে তাকালেন। বাবা মাথা নাড়লেন ঃ হ্যাঁ, দিনকাল ভাল না।

দাদু তখন হঠাৎ এমন কাণ্ড করলেন যে, সবাই অবাক হয়ে গেল। নিজের খাবারটুকু গপ করে খেয়ে তিনি তিকি-লিকির প্লেট থেকেও সব খাবার তুলে নিলেন। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে খুব আয়েশ করে সেই খাবার অল্প অল্প করে খেলেন।

তিকি-লিকি তো ভীষণ অবাক। বোকার মত দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। দাদু সবটা খেতে পারলেন না, বাকীটুকু মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন।

তিকি-লিকির বাবা-মাও খুব অবাক। কিন্তু কেউ কিছু বললো না দেখে দাদু খুব গম্ভীর হয়ে 'কাল সকালে দেখা হবে' বলে উঠে চলে গেলেন।

তিকি বললো ঃ মা, দাদু অমন করলেন কেন ? মা তাড়াতাড়ি ওদের নতুন করে খাবার এনে দিয়ে বললেন ঃ ছিঃ তিকি, জিগগেস করতে নেই, বুড়ো মানুষ তোমার দাদু, খেয়াল ছিলনা বোধহয়।

পরদিন সকালে নাশতার সময় আবার সেই কাণ্ড। দাদু খেতে বসেই তিকি-লিকির প্লেট থেকে সব খাবার তুলে নিলেন। এবারও বেশ আয়েশ করে খেতে খেতে ওদের দু'জনকে বললেন ঃ এটা তোমাদের ভাগ তাইনা তিকি-লিকি ? কিন্তু দেখ, তোমাদের ভাগ আমি খেয়ে ফেলছি।

তিকি-লিকি শুধু কাঁদ কাঁদ চোখে গোবেচারার মত চেয়ে থাকলো। তিকি-লিকির বাবা এবার একটু ইতস্ততঃ করে বললেন ঃ বাবা, আপনি কি করছেন, এটা যে ওদের ভাগ।

দাদু তখন খুব গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ কিন্তু কথাটা তো ওরা বললো না, তুমিতো ওদের অনেক কিছু শিখিয়েছ, কিন্তু এটা যে ওদের ভাগ এই সামান্য কথাটা বলা শেখাও নি কেন ? ওদের ভাগটা কেমন দু'দুবার কেড়ে নিলাম, একবার নাকি প্রতিবাদ করলো, কেমন হাঁদারামের মত তাকিয়ে আছে দেখ, আমি তো খাচ্ছিও না, এত খাবারের প্রয়োজন নেই আমার, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করছি।

তিকি-লিকির বাবা বললেন ঃ কিন্তু আপনাকে ওভাবে বললে সেটা ওদের অভদ্রতা হতো না ?

খিকখিক করে দাদু হেসে ফেললেন, বললেন ঃ খুব বললে হে, আমার দরকার নেই, তবু আমি ওদের ভাগটা কেড়ে নিলাম, সেটার প্রতিবাদ কেন ওরা করবে না ? আমি অন্যায় করছি তাও দেখ, কি চুপচাপ ওরা। বলি অন্যায়ের প্রতিবাদ না করাটা কি আরেকটা অন্যায় নয় ? আমি

বড় হয়েছি তো কি হয়েছে, আমার কাছ থেকে উল্টে কেড়ে নিল না কেন? নাহ, তুমি সব শিক্ষা দাওনি ছেলেদের, এখনো ভাগ- বাটোয়ারা শিখলো না।

খাবার টেবিলেই ছোটখাট একটা ঝগড়ার মত হয়ে গেল। তিকি-লিকির বাবার সাথে তিকি-লিকির দাদুর। দাদু মাঝে মাঝে খুব রেগে ওঠেন, বলেন ঃ আরে দেখ হে, তুমি একটু চেষ্টা কর, আমার নিজেরটা থাকা সত্ত্বেও আমি ওদের মুখের খাবার কেড়ে নিলাম, তাও কিছু বলবে না—এ রকম নাতি বাপু আমি চাইনি।

কিন্তু লিকির বাবার এসব কথা পছন্দ নয়। না হয় খেয়েছে কেড়ে, তাই বলে এই সাধারণ ব্যাপার নিয়ে এত হৈ চৈ করার কি দরকার। তিকি-লিকিকে আবার নতুন করে খাবার এনে দিলেই তো ব্যাপারটা মিটে যায়।

দাদু তখন আরো রেগে গেলেন ঃ দেখ, একবার যে কেড়ে নিয়েছে, সে সুযোগ পেলে বারবারই নেবে, এটা কোন সমাধান হলো না। তুমি তো কোনদিনই আমার কোন কথা শুনলে না। তাইতো আমি বাড়ি থাকিনা। যাচ্ছি, এখুনি আবার যাচ্ছি। এবার ভেবেছিলাম, দিন দুই থেকে যাব, তা আর হলোনা।

তিকি-লিকির বাবা-মা খুব করে বললেন আরো ক'টা দিন থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু দাদু ব্যাগ গুছিয়ে নিলেন। দরজার কাছে গিয়ে তিকি-লিকির দিকে ফিরে বললেন ঃ চললাম দাদুরা, আমি যা বলে গেলাম, খেয়াল রেখো, কাজে দেবে।

দাদুর কথাগুলো তিকি-লিকির কাছে খুব নতুন ঠেকলো। এ ধরনের কথা তারা কখখনো শোনেনি। বাবাতো সব সময় এর উল্টোটাই বলেন। দাদুর কথাগুলোর কি যে অর্থ! কিন্তু কি যে বলেন দাদু, 'উল্টো কেড়ে নিতে'—ধ্যাৎ, তিকি-লিকি তা কখনো পারবে না। তাই কি কখনো হয়, কি যে মজার কথা বলে গেলেন দাদু।

ওরা প্রথম দু'তিন দিন খুব ভাবলো। কিন্তু শেষে পড়াশোনা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে, দাদুর কথাগুলো একটু একটু করে ভুলে গেল।

বাবা ওদের জন্যে আলমারী থেকে আরো নতুন নতুন বই বে'র করে দিলেন। অবশ্য দাদুর কথাগুলো যে একদম মনে পড়তো না, তা নয়। কিন্তু পড়াশোনার এত চাপ, খুব একটা ভেবে দেখার সময় ওরা পেতনা। আর বাবাকে কোনদিন জিগগেস করে দেখা হয়নি। তাছাড়া, মুরুব্বীদের এসব জিগগেস না করাই ভাল—তিকি-লিকি ভাবতো।

তারপর আরো অনেক দিন চলে গেছে। তিকি-লিকি আরো অনেক লেখাপড়া শিখেছে। ওরা ইঁদুরদের জন্ম-কাহিনীর ওপর পড়াশোনা করছিল। এমন সময় ওদের শহরে একটা অঘটন ঘটে গেল।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই দেখলো, ওদের শহরের মাঝখান দিয়ে যে ড্রেন গেছে, সেখানে শুধু পানি বাড়ছে। আর সেই পানি বাড়তে বাড়তে দুপুরবেলার মধ্যে সব ইঁদুরের ঘরে ঢুকে গেল।

কোত্থেকে এত পানি এল ইঁদুররা কেউ বোঝে না, কিন্তু পানির স্রোত সব ইঁদুরের ঘরে ঢুকে সব খাবার দাবাড় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ইঁদুররা গর্তের মধ্যে ঘাপটি মেরে কোনমতে প্রাণ বাঁচালো বটে, কিন্তু পানি যখন নেমে গেল, তখন কারো ঘরে একফোঁটাও খাবার নেই। সবার খুব অসুবিধা। না খেয়ে থাকতে হয়। তখন সবাই দলবেঁধে ভাঁড়ার ঘরে ছুটলো।

তিকি-লিকির বাবাও গিয়েছিলেন সবার সাথে। কিন্তু সবাই কিছু কিছু খাবার আনতে

পারলেও তিকি-লিকির বাবা ফিরে এলেন খালি হাতে। অত ভীড় আর ঠেলাঠেলির মধ্যে তিনি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতেই পারেননি। পাড়ার সব বাসায় একবেলা রান্না হলো, কিন্তু তিকি-লিকিদের বাসায় দু'বেলাই চুলো বন্ধ। খুব ক্ষিদে পেলেও তিকি-লিকিতো খুব ভদ্র। কোন সময় বাবা-মাকে কোন ব্যাপারে বিরক্ত করেনা। তাই পেট চেপে ধরে ওরা তবু হাসি হাসি মুখে বসে থাকলো।

তার পরদিনও কিছুই জোগাড় হলোনা। আজ তিকি-লিকিও বেরিয়েছিল। কিন্তু হৈ-চৈ, টানাটানি, ধাক্কা-ধাক্কি, জোরাজুরি ওরা মোটেই করতে পারেনা। সবাই ওদের সরিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে যায়। ওরা ঠেলাঠেলিতে বারবার শুধু পিছিয়ে আসে। এভাবে পরপর দু'দিন ওরা ঢুকতে না পেরে ভাড়ার ঘরের পাশ থেকে খালি হাতে ফিরে এলো।

সন্ধ্যের সময় ওরা সবাই গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে, হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে ওঠে।

এমন সময় কে এল ? তিকি-লিকির বাবা দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলো পাড়ার সবচেয়ে ধাড়ী ইঁদুর। নাম গোগো। খুব লম্বা চওড়া শরীর গোগোর। গোগো একগাল হেসে বললোঃ শুনলাম, আপনারা না খেয়ে আছেন, ভাঁড়ার ঘরে ঢোকার রাস্তাগুলোও বাড়ির মানুষরা বন্ধ করে দিয়েছে, তবে আমি একটা নতুন রাস্তা বে'র করেছি, হেঃ হেঃ, একটা কাজ করলে হতো না ?

ঃ কি কাজ ? তিকি-লিকিরা সবাই মুখ তুলে তাকালো।

গোগো বললোঃ আমার একার পক্ষে তো সম্ভব না, তিকি-লিকি যদি আমার সাথে যেত, তবে সহজেই বেশ কিছু খাবার জোগাড় করে আনতে পারতাম ; তারপর ভাগাভাগি করে নিতাম।

গোগো মোটেই ভাল ইঁদুর নয়। পাড়ায় ওর অনেক বদনাম। কিন্তু না খেয়ে আর ক'দিন থাকবেন, তাই তিকি-লিকির বাবা রাজী হয়ে গেলেন।

গোগোর সাথে তিকি-লিকি আর ওদের বাবাও গেলেন। বাবা ফোকড়ের পাশে পাহারায় থাকলেন আর ওরা তিনজন ভেতরে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে ওরা বহু খাবার জোগাড় করে ফেললো। সেগুলো এক বস্তায় বেঁধে ওরা ফিরে চললো।

তিকি-লিকি আর ওদের বাবা খুব খুশী। অনেক দিন পর পেটপুরে খাওয়া যাবে। গোগোর বাড়ির কাছে ওরা সবাই এলে গোগো বললোঃ খুব খাটুনী গেল, এখন একগ্লাস করে শরবত খাওয়া যাক।

গোগো ওদের এত উপকার করলো, তাই ওরা না বললো না।

গোগো খুব সুন্দর করে শরবত বানিয়ে খাওয়ালো। গোগো বললোঃ এখন অনেক রাত হয়ে গেছে, আর আজকাল গুণ্ডা-বদমায়েশদেরও খুব উৎপাত। আপনারা বরং আজকের রাতের জন্যে অল্পকিছু খাবার নিয়ে যান, কাল সকালে এসে বাকীটুকু নিয়ে যাবেন। তিকি-লিকিরা ভেবে দেখলো, গোগো ঠিকই বলছে। তাই ওরা অল্পকিছু খাবার নিয়ে গোগোকে শুভরাত্রি জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

কিন্তু গোগো যে কত খারাপ তাতো ওরা জানতো না। পরদিন সকালে ওরা যখন ওদের বাকী অংশটুকু আনতে গেল, তখন গোগো জানালায় বসে ফাটা গলায় গান গাচ্ছিল। তিকি-লিকির বাবা শুভ প্রভাত জানিয়ে বললেনঃ গোগো, আমরা আমাদের ভাগ নিতে এসেছি।

গোগো তো অবাক ঃ কি বললেন, আপনাদের ভাগ ! কিসের ভাগ ? এ্যাঁ ?

বাবা তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিলেন ঃ ঐযে, কালরাতে ভাঁড়ার ঘর থেকে আনলাম। গোগো যেন আকাশ থেকে পড়লো ঃ ভাঁড়ার ঘর থেকে আবার কখন কি আনলাম ? সকাল বেলা উঠেই ইয়ার্কী মারতে এসেছেন ? জানেন না বুঝি, মানুষরা ভাঁড়ার ঘরে দু'টো বেড়াল ছেড়েছে, আমি বাপু ওদিক আর মাড়াই না। আর আপনি কিনা সকালে উঠেই মিথ্যে কথা বলে আমার কাছ থেকে খাবার-দাবার হাতিয়ে নিতে চাচ্ছেন!

তিকি-লিকি আর ওদের বাবা গোগোকে কত করে বোঝালেন, কিন্তু গোগোর ঐ এক কথা সে নাকি কিছু জানেনা। কালরাতে সে নাকি কোথাও যায়নি। রাগে-দুঃখে ওদের চোখে পানি এলো। বাবা বললেন ঃ গোগো, তুমি কিন্তু খারাপ কাজ করছো, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে।

গোগো খ্যাক খ্যাক করে হেসে বললো ঃ বলেছিলাম নাকি, যান মিথ্যে কথা বলবেন না পারেন তো প্রমাণ করেন, মামলা করেন। মামলা করার পয়সা আছে তো ?—বলে গোগোর সেকি হাসি!

তিকি-লিকির বাবা বললেন ঃ ছি ঃ বাবা, মামলা কেন করবো, তুমি অল্প কিছু খাবার অন্ততঃ আমাদের দাও, আমরা যে না খেয়ে আছি।

না খেয়ে আছেন তো আমার কি ; গোগো বললো ঃ যান পেটে পাথর বাঁধেন গিয়ে।—বলে সে একমুঠো চাল এনে জানালায় বসে চিবুতে লাগলো।

তিকি-লিকির জিভ দিয়ে জল ঝরছিল। কিন্তু তারা আর কি করবে, ঝগড়া তো করতে পারেনা। ওরা তাই গোস্যা হয়ে ফিরে এলো। ওরা ভাবতেই পারেনি গোগো এমন কাজ করবে বাসায় এসে ওরা চুপচাপ বসে থাকলো।

বিকেলের দিকে আবার একবার গেল তারা গোগোর বাসায়। রাতেও একবার গেল। কিন্তু গোগোর ঐ এক কথা। শেষে তো ধমকই দিয়ে বসলো ঃ যাও যাও, ভাল চাওতো ফ্যাচফ্যাচ কোরনা, তোমাদের সাথে গাল-গল্প করার সময় নেই আমার।

ওরা পরদিন পাড়া-প্রতিবেশীদের বাসায় গেল। কিন্তু সবাই শুধু সমবেদনাই জানালো গোগোকে যে সবাই ভীষণ ভয় পায়। সবাই শুধু বললো ঃ কি আর করবেন, কি আর করবেন জানেনই তো ও একটু এই রকমই। ওরা ভেবেছিল, সবাই মিলে একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু কেউ কোন সমাধান দিতে পারলোনা। গোগোর কথা শুনে সবাই চুপসে গেল।

এমনি করে দু'দিন গেল। পড়শীরা কিছু খাবার দিল বলে ওরা বেঁচে থাকলো, কিন্তু গোগোর মনে কোন মায়াদয়া নেই। তিকি-লিকি বললো ঃ বাবা, আমাদের ভাগ গোগো কেন দেবেনা ?

বাবা কিছু বলেন না। শেষে এমন হলো যে ওদের ঘরে কোন খাবার নেই, পড়শীরাও তাদের আর কোন খবর নেয়না। শেষে হঠাৎ একদিন বিকেলে তিকি-লিকি দু'জন কথা বলতে বলতে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

বাবা-মা জিগ্যেস করার পর্যন্ত সময় পেলনা ওরা কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার! আধঘন্টা পরেই তিকি-লিকি দু'জনই দু'কাঁধে দু'টো ব্যাগ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো। ঘরে ঢুকে ওরা ব্যাগ দু'টো খোলে। ব্যাগের মধ্যে অনেক খাবার। ওরা প্লেট এনে খাবার তুলে এগিয়ে দেয় বাবা-মাকে। নিজেরাও খায়।

বাবা-মা তো অবাক ঃ ওরে, তোরা এ খাবার কোত্থেকে আনলি ?

ঃ গোগোর কাছ থেকে এনেছি।

শুনে বাবা-মা আরো অবাক—কি কাণ্ড, ও দিল না, তোরা বুঝি চুরি করে আনলি ?

ঃ চুরি করবো কেন, জোর করেই এনেছি। দু'ভাই গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়।

ঃ জোর করে এনেছিস ?

ঃ তো কি, আমাদের ভাগ যখন দেবেনা, তখন জোর করে আনবো না কেন ? মা খুব অবাক হয়ে বললেন ঃ ওরে, ও যে একটা ডাকাত, তোরা পারলি ওর সাথে ?

তিকি-লিকি খুব আস্তে বললো ঃ পারবোনা কেন মা, আমরা যে আমাদের ভাগ আনতে গিয়েছিলাম। লিকি খুকখুক করে হাসলো ঃ জান মা, তিকি এমন একটা ঘুষি মেরেছে গোগোর নাকে, গোগোকে পনের দিন নাকে জলপট্টি দিতে হবে।

তিকি-লিকির বাবা-মা অবাক হয়ে ওদের দেখছিলেন। ওদের অন্য রকম মনে হচ্ছে। খেতে খেতে বাবা বললেন ঃ বাছারা, তোরা এতসব কোত্থেকে শিখলি, তোদের আমি তো এসব কোনদিন শেখায়নি ?

তিকি-লিকি একসাথে বললো ঃ আর কিভাবে শিখবো বল বাবা, ঠেকে শিখেছি।
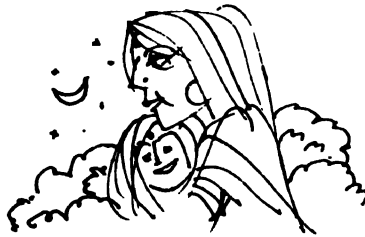
সে আমার ছোট বোন

লুৎফর রহমান রিটন

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো বিন্তি। চোখে মুখে ওর ঝিলিক দিচ্ছে দুষ্টুমি। আমি নিজেকে তৈরি করে নিই মোটামুটি। এক্ষুণি কিছু অদ্ভুত প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আমাকে। বিন্তির এই এক স্বভাব রাজ্যির যতো অদ্ভুত জিনিস ওর মাথায় ঘুর ঘুর করে। আর ও ঘুর ঘুর করে আমাদের পেছনে—ছোড়দা এটার মানে কি, ছোড়দা ওটা কেনো হলো? আব্বু তুমি অফিসে পড়া বলতে পারোতো? নাকি দাঁড়িয়ে থাকো কান ধরে? মামনি তুমি রাঁধতে গিয়ে চুপি চুপি চাকুম চুকুম করে খেয়ে নাও কেনো? ছোড়দা পাখির গায়ে ঢিল ছুঁড়লে পাখিরা কি ব্যথা পায়? আচ্ছা, শীতে পাখিদের ঠাণ্ডা লাগেনা বুঝি? পিংপিং বল লাফায় কেনো? মুরগির ডিম নাকি ছানা বেরোয়—কই, আমার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ডিমটা যে ভেঙে গেলো ফটাস কোনো ছানা তো বেরোলো না, তোমরা কচু জানো কচু।

বিন্তি এসেই আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললো, ছোড়দা, তুমি লাল কালিতে কালো লিখতে পারো?

বোঝো ঠ্যালা। আমি বিরক্ত হয়ে বলি, কে কবে লাল কালিতে কালো লিখতে পেরেছে দেবো এক গাট্টা। যা ভাগ—

বিন্তিতো গেলোই না উল্টো ঠোঁট বাঁকিয়ে ধমকে উঠলো আমাকে—পড়াশুনো কিচ্ছু করবে না সারাদিন টইটই করে ঘুরে বেড়াবে, জানবে কোত্থেকে? দ্যাখো—

উপুড় হয়ে মেঝের ওপর রাফ খাতাটা উল্টে ফেলে তার ওপরে লাল রঙা মোম পে ঠেসে ধরে আমার দিকে কটমটিয়ে তাকিয়ে বিন্তি বললো, দ্যাখো ছেলে শিখে নাও—এই আমার হাতে লাল কালির পেন্সিল, এই যে আমি লাল কালিতে লিখছি—ক এ আকার কা—ল এ ওকার লো——কালো। কি, হলো তো এবার?

ওরে দুষ্টু—আমি ওর রিবন বাঁধা বেণী ধরে টান দিই—তুই এতো কিছু জানিস রে?

আদর পেয়ে আরেক কাঠি ওপরে উঠলো একরত্তি মেয়েটা। প্রথমে আমার কোলে, কোল থেকে চেয়ারের হাতলে, চেয়ারের হাতল থেকে সোজা একেবারে আমার কাঁধে। ছোড়দার কাঁধে চড়াটা বিন্তির একটা হবি। চান্স পেলেই কাঁধে চড়বে। সকাল দুপুর সন্ধ্যে নেই। ইচ্ছে হলেই ব্যাস—আমার কাঁধে চড়ে নরম নরম পিচ্চি দুহাতে আমার ঝাকড়া চুল খামচে ধরে হুকুম করবে—চালাও ঘোড়া।

আমি তখন ঘোড়া হই। ঘোড়ার পিঠে বিন্তি তখন রাজকন্যে। শুধু ঘোড়ায় চড়ে ওর শখ মেটেনা। ওকে ছড়া বলতে হবে বানিয়ে বানিয়ে। একেকদিন একেক রকম। আজও রক্ষে নেই—কই ছোড়দা, ছড়া কই ?

কি আর করি। ছড়া বানাই—

বিন্তি সোনা ভালো
ঘর করেছে আলো
বিন্তি ভীষণ পাজি
খায় সে পটল ভাজি।

আমার চুলে হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমার কাঁধে বসে বিন্তি প্রতিবাদ করে—এ্যাই ছোড়দা। আমাকে পাজি বললে কেনো ? আমি কি পাজি ? হুঁ ? পাজি ?

চুল বাঁচাতে ভুল শুধরে আমি আবার নতুন করে ছড়া বানাই—

ইন্তি মিন্তি পিন্তি
লক্ষ্মী সোনা বিন্তি।

ইন্তি মিন্তি পিন্তি মানে কি ছোড়দা ?

আমি বলি—তাইতো ! এর তো কোনো মানে হয়না। আচ্ছা আরেকটা বলি—

বিন্তি সোনা লক্ষ্মী
কিচির মিচির পক্ষী

মানে কি ?

আমি ছড়ার মানে বোঝাই—বিন্তি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। পাখির মতো সারাক্ষণ কিচির মিচির করে। ছোড়দাকে কাজ করতে দেয়না।

কি ? আমি কাজ করতে দিইনা। আচ্ছা তুমি কাজই করো। আমাকে নামাও। আমি নামবো।

অভিমানী মেয়েটাকে নামাই কাঁধ থেকে। মুখ ভার করলে ওর গাল দুটো কেমন ফুলো ফুলো লাগে।

নেমেই গম্ভীর গলায় বললো বিন্তি—কই, কাজ করো। শিগগির কাজ করো। কণ্ঠে ওর আদেশের সুর।

আমি বইটা টেনে নিয়ে পড়ায় মনোযোগী হবার ভান করি।

বিন্তি বললো, পড়ছো যে ? পড়াটা কি কোনো কাজ হলো ?

বারে, পড়াটা কাজ না ?

মোটেও না। কাজতো করে বুয়া। যাও ঘর ঝাড়ু দাও। প্লেট মাজো। কাপড় ধুতে যাও। যাও।

আমিতো অবাক। ওরে পিচ্চিবুড়ি এতোসব কথা কে শেখালে তোকে ?

কেউ শেখায়নি বিন্তি সব নিজেই শিখেছে। খুব তো পড়া হচ্ছে। দেখি, আমি তোমার পরীক্ষা নেবো বলে টিচারের মতো ভঙ্গি করে বিন্তি শুধোয়—

কোন কেলাশে পড়ো ?

আমি সুবোধ বালকের মতো জবাব দিলাম, আই এ, ঢাকা কলেজে।

আচ্ছা। বেশ। পড়াশুনো করো তো ?

জ্বি আপা করি।

মুখস্ত-টুখস্ত করো তো না খালি খালি বাবার মতো বইয়ের দিকে তাকিয়েই থাকো ? শব্দ করে পড়ো ?

বললাম, জ্বি আপা শব্দ করেই পড়ি মাঝে মধ্যে। আর মুখস্তও করি।

খুব ভালো। লক্ষী ছেলে। তা লক্ষী ছেলে এবার ঝটপট ডিকশনারী মুখস্ত বলো তো ?

আমি চমকে একেবারে চেয়ার থেকে পড়ে যাবার যোগাড়! বলে কি মেয়েটা। ডিকশনারী মুখস্ত ?

কি ব্যাপার, চুপ করে আছো যে ? কথা কানে যায়না ?

বললাম, যায়। কিন্তু ডিকশনারী মুখস্ত বলা যায়না।

যায়। একশবার যায়। হাজারবার যায়। আমি পারি।

তুই পারিস ?

জিগেশ করেই দেখোনা।

আচ্ছা আপা ডিকশনারী মুখস্ত বলুন তো ?

বিন্তি বললো—ডিকশনারী।

আমি বললাম, তাতো বুঝলাম। তারপর ?

বিন্তি যথারীতি বললো—ডিকশনারী।

মানে ?

মানে এই তো—আমি ডিকশনারী মুখস্ত বললাম না ?

ওরে দুষ্টু বলে আমি ওর বেণী ধরতে হাত বাড়াতেই হরিণ ছানার মতো তিড়িং বিড়িং লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেলো বিন্তি—পারেনা ধুয়ো পারেনা ধুয়ো...।

তো এই হচ্ছে আমার একরত্তি বোন বিন্তি।

ওর সঙ্গে আমার একটা চুক্তি আছে। কলেজ থেকে ফেরার পথে একমুঠো চকোলেট আনতে হবে ওর জন্যে। রোজ রোজ। একদিন না আনলে রক্ষে নেই।

ওর অভ্যেস আমার পকেট হাতড়ানো। চকোলেটগুলো আমি তাই রেখে দিই পকেটে। কলেজ থেকে এসে জামা কাপড় ছেড়ে আমি যখন খেতে বসি বিন্তি তখন পকেট থেকে চকোলেটগুলো ছাড়িয়ে নেয়।

আজ আমি ওর জন্যে চকোলেট আনিনি। এনেছি মিমি। মিমি ওর খুব পছন্দ। মিমি খেতে গিয়ে ওর মুখে ল্যাপ্টালেপ্টি কাণ্ড। মিমি টিমি মাখিয়ে ওর মুখ একাকার।

আমি খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছি, বারান্দায়। শিশু অপহরণ ইদানিং বেড়ে যাচ্ছে শহরে। রোজ রোজ একটা দুটো এরকম খবর থাকবেই কাগজে। বিন্তির মতোই মিষ্টি একটা মেয়ের ছবি ছাপা হয়েছে আজ। ছবির দিকে তাকিয়ে আমি বিন্তির কথা ভাবি। ছবির মেয়েটা হঠাৎ করে বিন্তি হয়ে যায়—ছোড়দা। আমি পাগল হয়ে উঠি—বিন্তি বিন্তি বিন্তি—

ছুটে আসে বিন্তি। ওর হাতে মিমি মুখে মিমি জামা কাপড়েও লেগে আছে মিমি। আমি ঝটকায় কোলে তুলে নিই ওকে। ওর গালে চুমু খাই টুক করে। ওর গালে লেগে থাকা মিমি আমার ঠোঁটে লাগে। আমি ওকে বলি—বিন্তি, তুই কক্ষণো একা একা রাস্তায় বেরোবিনা, বুঝলি ?

কেনো. ছোড়দা ?

ছেলেধরা। ধরে নিয়ে যাবে।

বারে, আমি তো মেয়ে !

আমি কথায় হেরে যাই ওর সঙ্গে। তবুও বলি, ছেলে হোক মেয়ে হোক, ছোটরা একলা রাস্তায় বেরোলে ওরা ধরে নিয়ে যায়।

কোল থেকে নামাই ওকে। ও পালিয়ে যায়।

একটু পরে আবারো এসে হাজির বিন্তি। দুহাত পেছনে, কি যেনো লুকিয়ে রেখেছে ও।

আমি শুধোই, কিছু বলবি ?

হুঁ।

বল।

তুমি তো রোজ আমার জন্যে এতো এতো চকোলেট আনো। আজ আমি তোমার জন্যে একটা মজার জিনিস এনেছি। খাবে ছোড়দা ?

খাবোনা মানে ? অবশ্যই খাবো। দেখি কি এনেছিস—

হাত বাড়িয়ে বিন্তি আমার দিকে যা এগিয়ে দিলো তা দেখে আমার তো চোখ ছানাবড়া। ওর

হাতে বাবার সিগারেটের প্যাকেট। ট্রিপল ফাইভ। সঙ্গে লাইটার।

নাও। খাও।

বলিস কি ? সিগারেট খাবো আমি ?

বারে, বাবা খায়তো। কি সুন্দর ফুঁকফুঁক করে ধোঁয়া বের করে মুখ দিয়ে। নাক দিয়ে। তুমিও খাওনা ছোড়দা।

আমি ওকে বোঝাই—আগে বড় হয়ে নিই তারপর খাবো। এখন এগুলো রেখে আসে যাও—

বারে, তুমি বুঝি বড় হওনি ? বাবার মতোই তো গোঁফ হয়েছে তোমার, বলে আমার গোঁফ ধরে হ্যাঁচকা টান মারে বিস্তি।

ওর কথায় কেমন লজ্জা পেয়ে যাই আমি। লাজুক লাজুক ভঙ্গিতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াই। নিজেকে দেখি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাইতো !

দেখতে দেখতে সেদিনের একরত্তি মেয়েটা কি রকম ধাইধাই করে বড হয়ে উঠেছে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পড়েছে ও আজ প্রথম। গুটি গুটি পায়ে শাড়িপরা বিস্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি অপেক্ষা করি—এক্ষুণি বিস্তি আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার চুলগুলো এলোমেলো করে দেবে। বায়না ধরবে কাঁধে চড়ার।

কিন্তু না। বিস্তি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কি রকম ছলছল হয়ে উঠছে।

আমি উঠে দাঁড়াই। কিরে বিস্তি, রীতিমতো মহিলা হয়ে গেছিস মনে হচ্ছে ?

বিস্তি আমার গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে—ছোড়দা, আমাকে তোমরা এতো তাড়াতাড়ি বড় বানিয়ে ফেললে ? আমাকে সালোয়ার কামিজ এনে দাও—এনে দাও—অঝোরে কাঁদতে থাকে বিস্তি।

আমি কেমন হতভম্ব হয়ে যাই। আজ হঠাৎ কি হলো বিস্তি ? মা বকেছে ?

আমি তোমাদের খুব বোঝা হয়ে গেছি না ? আমাকে তাই পর করে দিতে চাও ?

আমি ওর কথার কোনো মানে বুঝিনা। ওকে আদর করি—তা কেনো ? মেয়েরা তো শাড়ি পড়েই। ঠিক আছে, কালই তোর জন্যে মেরুন রঙের সালোয়ার কামিজ এনে দেবো।

বিস্তি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলো অনেকক্ষণ। তারপর ছুটে গেলো ওর ঘরে। বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে একাকার হচ্ছে মেয়েটা। দেখে আমার বুকটা কেমন করে।

আমি মায়ের ঘরে যাই। আমাকে দেখেই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মা বলে, আছিস তো শুধু পলিটিক্স নিয়ে। ঘরের খোঁজ খবর কিছু রাখিস ?

আমি বোকার মতো মাথা নাড়াই, কি হয়েছে মা ?

কি আর হবে ? আজ বিস্তিকে ওরা দেখতে এসেছিলো। পছন্দ হয়েছে ওদের। ওর বিয়েটা ঠিক করে ফেললাম। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। কুয়েত ফেরৎ।

আমি চমকে উঠি—বলো কি মা! সবে তো নাইনে পড়ে বিস্তি। এরই মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেবে ? এতোটুকুন মেয়ে কি পারবে সংসার করতে ?

বাবা বললো, পারবে। নিশ্চয়ই পারবে। তোর মার যখন বিয়ে হয় তখন তো তোর মা পড়তো ক্লাশ সিক্সে, তাইনা খোকার মা ?

আমি চিৎকার করে বলি—এ বিয়ে তোমরা ভেঙে দাও।

কি পাগলের মতো বকছিস। যা এখান থেকে। তুই এসবের কি বুঝবি ? বাবা ধমকে ওঠেন।

পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলে যে মেয়ে কেঁদেকেটে একাকার হয়, নায়না খায়না, সেই মেয়ের কি সাজে নিজেই বধূর বেশে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া? আমি এর কোনো জবাব খুঁজে পাইনা।

বিন্তির বিয়ে হয়েছে আজ এক বছর। ও এখন কুয়েতে থাকে ওর স্বামীর সঙ্গে। কতোবার যে চিঠি লিখেছে বিন্তি—

ছোড়দা—আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি আর পারছিনা, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, এতো দূরে, তোমরা কেউ নেই, আমার কিচ্ছু ভাল্লাগেনা, ছোড়দা আসার সময়ে আমার জন্যে চকোলেট এনো, মিমি এনো, মেরুন রঙের বুটিদার ওড়না আর সালোয়ার কামিজ, ছোড়দা, আমার জন্যে ববিক্লিপ আর টুকটুকে লাল ফিতে আনবে কিন্তু, আচ্ছা ছোড়দা, ঢাকার আকাশে এখনও কি রবীন্দ্রনাথ শুয়ে থাকে? কুয়েতের আকাশে আমি রবীন্দ্রনাথকে কত্তো খুঁজেছি, পাইনা ছোড়দা...

নীল আকাশে শাদা টুকরো মেঘগুলো একেক সময় একেক রকম হয়। একবার বিন্তি আমাকে দেখিয়েছিলো—দ্যাখো ছোড়দা, আকাশে রবীন্দ্রনাথ শুয়ে আছে...

আমি কিচ্ছু করতে পারিনা। আমার কোনো কাজে মন বসেনা। আজকাল বিন্তির কথা মনে হলেই বুকের বাঁ দিকে চিনচিনে ব্যথাটা মোচড় দিয়ে ওঠে। একেকবার মনে হয় ছুটে যাই কুয়েত। নিয়ে আসি ওকে। কিন্তু পারিনা। মেয়েরা স্বামীর কাছে থাকবে এটাইযে নিয়ম!

প্রজাপতির মতো চঞ্চল মেয়েটা আজ দেশ ছেড়ে বহুদূরে সংসার পেতেছে ভাবতেই মনটা দুঃখে ভরে ওঠে।

সেদিন চিঠি এসেছে কুয়েত থেকে। আমাদের বিন্তি মা হবে। আমি ছটফট করি। একরত্তি মেয়েটা কি সারাদিন জানলার গ্রিলে গাল ঠেকিয়ে ছোড়দা ছোড়দা বলে কাঁদে? আমি শুনতে পাই যে!

একটু আগে পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেলো। কুয়েতের চিঠি। বিন্তির চিঠি ভেবে আমি খুলে ফেলি খাম। না। বিন্তির ইঞ্জিনিয়ার স্বামী লিখেছে বাবার কাছে। ছোট্ট চিঠি। মা হতে গিয়ে বিন্তি হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে।

আরেকটা চিঠি আছে সঙ্গে। আমাকে লেখা। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আমাকে লিখেছিলো মৃত্যুর কদিন আগে। বিন্তি লিখেছে—

ছোড়দা কাল রাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখলাম। তুমি আমাকে একটা চিঠিও লিখলে না কেনো? আমার কি দোষ ছিলো ছোড়দা...। ছোড়দা জানো, কাল দুপুরে কুয়েতের আকাশে আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। আমার আর কোনো কষ্ট নেই ছোড়দা...।

আমি আকাশের দিকে তাকাই। অইতো, আকাশে শুয়ে আছে ধবধবে শাদা দাড়িঅলা রবীন্দ্রনাথ। বাতাস শাদা মেঘের টুকরোগুলোকে ভাসিয়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ওখানে তৈরি হয় আরেকটি মুখ। হ্যাঁ, বিন্তির মুখ। আমি তাকিয়ে থাকি। তাকিয়েই থাকি। আমার চোখ দুটো জল টলমল পুকুর হয়ে যায়। আমি কাঁদতে থাকি। সে আমার ছোটবোন, বড় আদরের ছোটবোন।

রক্ত গোলাপ

আমীরুল ইসলাম

আমার নাম কপোত। দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে কখনো ভাবি, আমি যদি পাখি হতাম! কোন এক সফেদ সকালে উঠে মনে মনে বলি, পৃথিবীর সবটুকু রং আমি শুষে নেবো। শৈশবের কিছু উজ্জ্বল স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরুক। স্মৃতিভুক দুপুরে চিলেকোঠায় বই পড়তে পড়তে মন চলে যায় তেপান্তরে। 'তিমুর ও তার দলবল' বইটা পড়েছি। আমার একটা বাগান আছে। প্রতি বছর শীতে আমি সেখানে রক্তগোলাপ লাগাই। লাল টকটকে ফুলে ছেয়ে থাকে বাগান। সেই ফুল আমার খুব প্রিয়।

বাবার হাত ধরে একবার একটা সিনেমা দেখি। যুদ্ধে যায় এক কিশোর। একের পর এক শত্রুপক্ষের ট্যাংক ধ্বংস করে। মা'র টানে ঘরে ফিরতে চায়। কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ তার কাছে এখন মায়ের চেয়েও বেশি প্রিয়। দেশের মাকে মুক্ত করতে হবে। লালচে মেটে রঙের সেই ছবি মনে পড়লেই আমার বুকটা হু হু করে। মনে পড়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ। একাত্তরের সেই টালমাটাল দিন। আকাশে শকুনের আনাগোনা। রাস্তায় টহলদার কনভয়। খাকী পোশাকের লোকজন। হঠাৎ করে জংগী প্লেনের চিৎকার। কুড়িয়ে পাওয়া গুলির খোলস। বাবা মা'র মুখে গাঢ় চিন্তার ছাপ।

সেই যুদ্ধ, যখন আমার বয়স দশ, টানা নয় মাস চললো। শহর ছেড়ে ভাগছে সবাই। বাবা অনড়। তিনি যাবেন না। রাতে ঘুমোতে পারতেন না। রাত গভীরে বারান্দায় পায়চারি করতেন। ফিসফিস করে কথা বলতেন মায়ের সঙ্গে। আমার ভাইয়া তখন কলেজে পড়ে। অসম্ভব জেদী আর একগুঁয়ে। স্বদেশীরা তার আদর্শ—পরে তা বুঝেছি। যে কোন মিছিলের আগে থাকত। রাত জেগে পোস্টার লিখতো। কখনো কখনো ঘাড় গুঁজে বই পড়তো। এক চিলতে উঠোনে একটা বাগান করেছিলো ভাইয়া। লালগোলাপ ভাইয়ার খুব প্রিয়। বাগান জুড়ে টকটকে লাল গোলাপ খুবই সুন্দর লাগতো।

এক বিকেলে বাবা মা' আর আপা বসে চা খাচ্ছিলো। তিন চাকার সাইকেল নিয়ে খেলা করেছিলাম আমি। আপার দিকে হাত বাড়িয়ে বাবা বললেন,

ঃ একটু টিপে দে'তো মা।

আপা বাবার খুব ভক্ত। হাত টিপতে টিপতে আমার সঙ্গে চোখে চোখে দুষ্টুমি করছিলো। ঝড়ের বেগে এমন সময় এলো ভাইয়া। উবু হয়ে সাত তাড়াতাড়ি বাবার পায়ে সালাম করলো। আপার বেণী ধরে টান দিলো। একছুটে চলে গেলো ভেতরবাগে। মাকে জাপটে ধরে আদর কুড়িয়ে নিলো। ব্যাপার কিরে, ব্যাপার কিরে—কেউ কিছুই জানতে পারলো না। ভাইয়া একটা হ্যাভারসাকে প্রয়োজনীয় জিনিশপত্তর ভরে নিলো। গোর্কীর 'মা' উপন্যাসটা ভাইয়া নিতে ভোলেনি। কারো মানা শুনলো না। ঝটিতে বেরিয়ে গেলো। কিছুদিন পরে আমি বুঝলাম—ভাইয়া যুদ্ধে গেছে। বাবা চোখের জল মুছলেন—

ঃ পাগলটা শেষ পর্যন্ত চলেই গেলো।

মা কিন্তু সেই বিকেলে খুব কেঁদেছিলেন। কান্না দেখলেই কান্না আসে। দেখাদেখি আমি আর আপাও খুব কেঁদেছিলাম।

এরপরই আমাদের বাসায় লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষ আসতো। পরে শুনেছি, ওরা মুক্তিযোদ্ধা। ভাইয়ার খবর নিয়ে আসে। আমার মন আনন্দে নাচতো। ভাইয়ার কী মজা! সেই ছবিতে দেখা লোকটার মতো ভাইয়া বনে জংগলে, পাহাড়ে যুদ্ধ করে। মা কিছুতেই কিছু বুঝতে পারে না। মায়ের চেয়ে যুদ্ধ বড়ো—কে বোঝাবে এই কথা। একদিন শুনলাম—ভাইয়া ওপার বাংলায় চলে গেছে। গোটা গোটা অক্ষরে আমাকে এক লাইন চিঠি লিখেছে—লালগোলাপের যত্ন নিস। আমি শিগগির ফিরবো।

দ্বিগুণ উৎসাহে বাগানের যত্ন নেই। আমার সেই শৈশব চপলতায় মুখর হয়ে ওঠে সারা বাড়ি। কিন্তু বাবার চোখে আষাঢ়ের কালো মেঘ। মায়ের মনে অশান্তির ঢেউ।

দিন গড়িয়ে চলে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে তোড়জোড়ে। খুব উন্মাতাল দিন। চারিদিকে বিপদের ঘনঘটা। বাবা জমানো পয়সা ভেঙে সংসার চালাচ্ছেন। অবসর সময়ে আপার সঙ্গে দাবা খেলেন। মনভরা চিন্তা। তাই অমনোযোগের কারণে প্রায় হেরে যান। আপা খুব খুশি হয়। জয়ী হয় বলে আমার গালে টুসকি মারে। কান মলে ফুসফুস করে কথা বলে—

ঃ তুই লক্ষ্মী সোনা ভাই! কত্তো ভালোবাসি তোকে।

মিথ্যে কথা। আপা কখনোই আইসক্রীমের ভাগ দেয় না আমাকে। কালিকলম নিয়ে ঘষাঘষি করলে রাগ করে। শখ করে নেলপালিশ মাখলে কান মলে দেয়।

ফুর্তিতে থাকলে দাদা ডাকে। আর বলে,

ঃ দাদা, আমাকে দিদি ডাকবি কিন্তু!

কিছুদিন পর আপা আর আমি মিলে নতুন একটা খেলা তৈরি করলাম। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। দুজনেই মুক্তিযোদ্ধা হতে চাই। তাহলে চলবে কী করে। বাধ্য হয়ে টস করি। বারবার হেরে যাই। পাকবাহিনী সাজতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। স্কুল বন্ধ। হাতে অফুরন্ত সময়। বাবা আমাকে দশটা করে ইংরাজিতে শব্দ শিখতে বলেছেন। সন্ধেরাতে নীরস ওয়ার্ডবুক নিয়ে বসি। বাবা তখন কানের কাছে রেডিও নিয়ে কী সব শোনেন। বাসা থেকে বেরুনো নিষেধ।

ঢিমে তেতালা ছন্দে আমার সময় কাটে। হঠাৎ করে ভাইয়ার খবর আসা বন্ধ হয়ে গেলো। সেই সময়েই বাবা মা জরীফ বুড়ো হয়ে গেলেন। কান্নাকাটি করতে করতে মা'য়ের চোখের

জ্যোতি কমে গেলো। বাবা কথা বলা কমিয়ে দিলেন। পাড়ার কাকুরা বাসায় এলেও বাবা মুখচোরা থাকেন। আমাদের সেই উজ্জ্বল বাড়িতে নেমে এলো থকথকে নীরবতা।

সেই আমি তখন এসবের কিছু কিছু বুঝেছিলাম। বাকিটা অনেক পরে।

নয়মাস যুদ্ধের পর স্বাধীনতা আসে। লাখো মানুষের রক্তস্রোত। সবুজ দেশে উঠছে লাল সূর্য। দিকে দিকে সবার বিজয় উল্লাস। বুকে বুক মেলাবার দিন। রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল। রাইফেলের গুলির শব্দে মুখর হচ্ছে স্বাধীনতার চেতনা।

আমার মন ভালো নেই। যুদ্ধ শেষে ভাইয়া আর ফেরেনি। আপাও আর যখন তখন সাজগোজ করে না। বেণী বাঁধে না এলোচুলে।

আমার বোধে স্বাধীনতা দীপ্ত নয়। তবু আমি বুঝতে পারি—সবাই আজ মুক্ত। আবার আমি কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাবো। বাবা অফিস থেকে ফিরবেন হাসিমুখে। সঙ্গে থাকবে ঠোঙাভর্তি মুখরোচক খাবার। ভাইয়ারা যুদ্ধ শেষে কেন ফিরবে? কোটি কোটি মানুষের জন্য ভাইয়ারা লড়াই করেছে। মৃত্যুর মধ্যেই সেই লড়াইয়ের আসল আনন্দ।

একদিন ভাইয়ার এক বন্ধু এসে হন্তদন্ত হয়ে খবর দেয়—ও নেই। ছদিন আগে মারা গেছে। তিনদিন আমাদের বাসায় হাঁড়ি চড়েনি। মা আর আপা কেঁদেকেটে কাঁপিয়ে তুলেছে পুরো বাড়ি। বাবা চুপচাপ, নিরুত্তর। আমি কেঁদেছিলাম। ডিসেম্বরের সেই দুই তারিখ আমাদের হৃদয়ে খচিত উজ্জ্বল দিন। বছরের সুরুতেই নতুন ক্যালেন্ডারে আমি দাগ দিয়ে রাখি।

সতেরো তারিখ ভাইয়ার বন্ধু পামেল আসে। কাঁধে স্টেনগান ঝুলিয়ে। যুদ্ধ ফেরত খাঁটি যোদ্ধা মনে হয় না পামেল ভাইয়াকে। যুদ্ধে গেলে আবার ফিরে আসা কী? পামেল ভাইয়া এসে একটা ডাইরি দিয়ে যায় বাবার হাতে। বারান্দার ওপর বসে তৃপ্তি ভরে ভাত খায়। পাড়ার সবাই এসে আমাদের উঠোনে ভীড় করে। একজন মুক্তিযোদ্ধার দিকে তাকিয়ে আশ মেটে না কারো।

পামেল ভাইয়ার হাতে সময় কম।আমি সুযোগ বুঝে স্টেনগানটা একটু নাড়াচাড়া করে দেখি। পাশের ঘর থেকে আপা ডাক দেয়—

ঃ কপোত শুনে যা একটু, শিগগির—

আপা আমার কানে কানে বলে দেয়,

ঃ যন্ত্রটা একটু নিয়ে আয়।

তারপর দু'ভাইবোন মিলে সেটা উল্টাই পাল্টাই।

ভাইয়ার আরেকবন্ধু ইসমাইল আর্ট কলেজে পড়ত। ভাইয়ার একটা তেল রং-এ পোট্রেট এঁকে দেয় সে। সেটা আজো সযত্নে আমাদের ঘরে টাঙানো আছে। বাবা কখনো কখনো লাল মলাটের ডাইরি বের করে পড়েন। আর টপটপ করে চোখের পানি ফেলেন। ভাইয়ার মৃত্যুদিনে আমি ফুলের মালা দিয়ে ছবিটা সাজিয়ে দেই।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনেক কিছু জানতে পারি। একদিন লুকিয়ে পড়ে ফেলি ডাইরিটা। কিছুকিছু অংশ আমার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য গেঁথে থাকে।

....আজকে আমরা বেনাপোল বর্ডারে পৌছেছি। পাকবাহিনীর ঘাঁটির ওপর কাল ভোরবেলা আক্রমণ চালাতে হবে। আমরা চৌদ্দজন। সঙ্গে ভারি অস্ত্রশস্ত্র নেই। তবু চালিয়ে যেতে হবে। বনগাঁ রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মায়ের কথা মনে পড়লো। ইচ্ছে হলো, হাতে শান্তির রুমাল উড়িয়ে মার কাছে ফিরে যাই। দুহাত আঁকড়ে ধরে বলি মা, তোমার ছেলে ফিরে এসেছে। তোমাকে মুক্ত করেছে।

তুমি প্রাণ খুলে হাসো না।.....

...গত কদিন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। অপারেশনে মারা পড়েছে পাঁচজন। মেরেছি সাতাশজন। বাবা যদি জানতেন—আমি মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরার জন্য উন্মুখ! মুখ টিপে লাজুক হাসতেন। হয়তো বলতেন, ওগো, দেখো পাগল ছেলের কাণ্ড দেখো!

যারা মারা পড়েছে ওদের দায়সারাভাবে কবর দিতে হয়েছে। আশপাশের লোকদের সাহায্য কোনদিন ভুলবার নয়। ইসমাইল এক ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থেকে তিনদিন উপোস করে কাটিয়েছে। ডান হাতে গুলি খেয়ে পুরো একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। পরে গ্রামের লোকেরাই উদ্ধার করে। বাঁচিয়ে তোলে।

আমি সূর্যসেনের জীবনী পড়তে বসেছি।

....বাড়ির কথা মনে পড়ছে খুব বেশী। আমার লক্ষ্মী বোনটাকে আদর করি না কতোদিন। ভাবুক ছেলে কপোতই বা কেমন আছে। ও নিশ্চয়ই এখনো খুব সকালে উঠতে চায় না। গল্প শোনার জন্য কার কাছে আবদার করে? বাড়ি ফিরে কপোতকে রাইফেল চালানো শিখিয়ে দেব। ও খুব খুশি হবে। বোনের জন্য আমার ভালোবাসার ঘাটতি নেই। কিছুদিন আগে টেনিদার

সিরিজ পড়তে চেয়েছে। আমি মার্ক টোয়েনের বইগুলো ওকে কিনে দেব। বোনটির ফ্রকের আঁচল চিবুনো অভ্যেস। এখনো কিসে অভ্যেস আছে তার। অনেকদিন বাসার খবর পাই না। চার মাস যুদ্ধে এসে মনে হচ্ছে, যুগ যুগান্তর ধরে এখানে পড়ে গেছি। যেন কোনদিন আমি বাবা-মায়ের কাছে থাকিনি। আমার কোন ভাইবোন নেই।

সেই আদিম যুগের মানুষের মতো শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। আর কতদিন খেলতে হবে।

....খুব ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। আমরা যশোরে পৌঁছেছি। পাকবাহিনীর বুদ্ধি ভোঁতা। সেই সুযোগে আমরা বিজয়ের স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। গত বিকেলে পাপ্পু, তপন আর লিটু মারা গেছে। পাপ্পুর কপালের খুলি উড়ে গেছে। কী বীভৎস সে চেহারা। কিন্তু ঠোঁটের হাসিটুকু লেগে রয়েছে। আমাদের ক্যাম্পের সামনে কবর দিলাম। আমি কবরের ওপর একটা রক্তগোলাপ পুঁতে দিলাম। ফুলটা হাতে নিতেই বাড়ির কথা মনে পড়লো। একা থাকা পৃথিবীতে অনেক সুখের। বাবা মা ভাইবোনদের নিয়ে যে অখণ্ড পরিবার তাতে আমরা লতায় পাতায় জড়িয়ে পড়ি। বাইরের বাতাসে বেরিয়ে এলেই হৃদয়ে টান লাগে।

আমি ফিরে যাব। এক বুক স্বাধীনতা নিয়ে আমার সেই চিলতে উঠোনে দাঁড়াব। সবাইকে বলবো, আমি এসেছি। কপোত কি বাগানের যত্ন নিচ্ছে? বাবা কি চেহারা ভার করে অনাগত দিনের কথা ভাবছেন? আদুরে বোনটা কি গলে গলে পড়ছে ভালোবাসায়? মা তার দুরন্ত, পাগল ছেলেটার জন্যে এখনো কি কান্নাকাটি করে? কে জানে কে বলতে পারে এখন কেমন আছে ১৯৮ জগন্নাথ সাহা রোডের সেই বাড়িটি?

....আমার বাগানে নিশ্চয়ই শীতের সুরুতে অনেক রক্তগোলাপ ধরেছে। লাল টকটকে রঙের মধ্যে এক ধরনের উগ্রতা আছে। জেদী, দামাল, সাহসীজনের প্রিয় রং লাল। সূর্যে লাল স্নিগ্ধতা থাকলেও কখনো কখনো তা ভয়ংকর। অনেকগুলো রক্তগোলাপের দরকার আমার। খুব তাড়াতাড়ি কাছের মানুষরা চলে যাচ্ছে। কাল যার সঙ্গে এক পাতে ভাত খেলাম আজ সে পৃথিবীর সব মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। রিটন, হেলাল, বাচ্চু, পলু সবাই আছে শান্তিতে। যাদের ছাড়া এই বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি না তারাও হারিয়ে যায়। আসলে তাই-ই শুধু আসা যাওয়া।

এই আসা যাওয়ার মাঝখানে দুএকটি স্মৃতি, কিছু টুকরো ঘটনা। ছেঁড়া ছেঁড়া কথা। ওদের কবরে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়ার ইচ্ছে আমার। কিন্তু হাতের কাছে একটা রক্তগোলাপও পেলাম না। সময় ও সুযোগ পেলে সবাইকে রক্তগোলাপের ওপর শুইয়ে রাখতাম। কিছুদিন আগে কপোতকে তাই এক লাইনে লিখে দিয়েছি—বাগানের যত্ন নিস।

বাবা আমার জন্য দোয়া করো। মা, তোমার ছেলে নিরুদ্দেশ নয়, ফিরে আসবে। শুধু দোয়া করো।.....

আমি সেই কপোত। বারো বছর আগে আমার ভাইয়া যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। আপা শ্বশুর বাড়ি থাকে। বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। মায়েরও বয়স হয়েছে অনেক।

ভাইয়ার ডাইরিটা পুরো অংশই আমার মুখস্থ। ভাইয়ার জন্য আমি গর্ব করি। ছাব্বিশে মার্চ

আমার চেতনা জুড়ে থাকে ভাইয়া। ষোলই ডিসেম্বর ঢাকা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে ভাইয়ার অস্তিত্ব।

আজতক আমার উঠোনে বাগান রয়েছে। গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তগোলাপের সমারোহ। বাবা মাঝে মাঝে আমার খেয়াল দেখে হাসেন—

ঃ ও ফিরে আসবে না কোনদিন। অযথা বুকে কষ্ট বাড়াস ফুল লাগিয়ে।

আপা বাসায় এলেই ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। আর আমি অপেক্ষায় থাকি—ভাইয়া হয়তো আসবে। লাল রক্তগোলাপের পাপড়ি মাড়িয়ে বলবে—

ঃ কপোত, তুই ভালো আছিস। দেশতো এখন স্বাধীন। তোরা সবাই বড় হয়ে গেছিস। কতো সুখে আছিস। আমাকে কিছু রক্তগোলাপের পাপড়ি দে। একটা একটা করে আমি সব শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের দেব। কেন না—ওদের জন্যে কেউ কিছুই করেনি।

কিন্তু ভাইয়া ফিরে আসে না। কোনদিন আসবে না। আমি কপোত তবু অপেক্ষায় থাকি।

দখল

নসরত শাহ

কয়েকজন মানুষের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে নতুন চর থেকে নেমে যায়। শেষ বিকেলের হলুদ রোদ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে একটা ফড়িং ধানের শীষের ওপর থেকে ডানা কাঁপিয়ে উড়ে গেল। লম্বা কাশঘাস সাবধানে দুদিকে সরিয়ে বেরিয়ে আসে লালুর আতঙ্কিত মুখ। আশে পাশে দৃষ্টি মেলে দেখে নেয়, কেউ নেই। লুঙ্গিটায় মালকোচা দিয়ে নেয়। ফসল বাঁচিয়ে আলের ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলে। এ মুহূর্তে দৌড়াতে চাইলেও পারছে না। তাহলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বোনা ফসল পায়ের আঘাতে ঝরে যাবে। বুকের মধ্যে টন টন করতে থাকে একটুকরো কষ্ট।

পদ্মা মরে জেগে উঠছে বিশাল বিশাল চর। সবই জোতদার ও মহাজনের দখলে চলে যাচ্ছে। জমির ন্যায্য মালিকদের বুকে ক্ষোভ কিন্তু মুখে বিদ্রোহের ভাষা এলেই, রাতের আঁধারে খুন হয়ে গাঙের জলে ভেসে যাবে। ন্যায়-অন্যায় সবই তেনাদের হাতে। নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে যাওয়া পূর্বপুরুষদের কিংবা নিজের জমি নিয়ে নতুন চর জাগলেও, কেউ সাহস করে বলতে পারবে না, ওই জমিন আমার, এবার নতুন ফসল বুনবো ওই পলিমাটিতে।

লালু এবার দৌড়াচ্ছে। দ্রুত সরে যায় দুপাশের ফসলের ক্ষেত, কাশ বন ও খোলা চর। পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে ঘাস ফুল। ঘাসের তুলতুলে প্রলেপ উত্তেজনায় ম্লান। কিছুদিন আগে মহাজনের পাল থেকে ছুটে এসে এক পাগলা মোষ চরাঞ্চলের কৃষাণদের আক্রমণ করেছিল। লালুও তাড়া খেয়েছে। মুখোমুখি হয়ে আচমকা ল্যাসোর মত দড়ির ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। সেই থেকে লালুর সাহসের কথা গ্রামের সকলে জানে।

সামনেই ছোট খাল। সাঁতরে পার হয়ে যায়। শীতে কাঁপুনি নেই। বরং দরদরিয়ে ঘামছে। কুয়াশার লম্বা টানা মিহি আবরণে গ্রামগুলো ঢেকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে। দু'একটা

বাড়িতে ইতিমধ্যেই কেরসিনের কুপি জ্বলে উঠেছে। জোতদার ও মহাজনের ছেলেমেয়েরা এখন নিশ্চয় গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে বসেছে। লালুর পড়ালেখা শেখার খুব ইচ্ছা। গ্রামে একটা স্কুল ছিল, কমিটি নিয়ে গোলমাল হওয়ায় তাও তেনারা উঠিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে মনে হয়, এখানে এমন কেউ কি আসতে পারে না, যিনি ফসলের ক্ষেতে কাজ শেষে সন্ধ্যা রাতে ওদের পড়ালেখা শেখাবেন! আজ-কাল লালুর কাছে এসব স্বপ্ন মনে হয়। কদিন থেকে মনে তিরতির ফূর্তি বইছিল। ওদের জমির পাশে নতুন চর জাগছে, সেটা ওদেরই। এই জমি আর ওই চরের দুই ফসল উঠলে,ঘরে আর অভাব থাকবে না। তখন পড়া লেখা শেখার জন্য অন্য গ্রামেও যেতে পারবে।

ধবল জ্যোৎস্নায় সব কিছু ফকফক করছে। লালুর রক্তের মধ্যে এক ধরনের চঞ্চলতা। বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে গেছে। কলা আর বাসক ঝোপে ঘেরা ছোট উঠোনের কোণে ছনের ঘর। শরীর থেকে কুল কুল ঘাম ঝরছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকম উঠোনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত গলায় ডাকে, বাজান গো, বাজান। দুয়ার খোল, খবর আছে ··· !

হোগলা পাতার ঝাঁপ সরিয়ে টিমটিমে কুপির আলো হাতে লালুর বাবা মধ্য বয়সী গদাই মিঞা বেরিয়ে আসে।

'কি হইছে লালু, ওমন করতাছস ক্যান ··· ?'

'জোতদারের লাঠিয়ালরা বেইন্যা রাইতে মোগো নয়া চর দখল নেবে। জমিনের পাহা ধানের উপরও নজর পড়ছে।' লালু আর কিছু বলতে পারে না। বাজানকে জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। গদাইয়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। হাতটা কেঁপে কুপিটা পড়ে গিয়ে ধূলোয় গড়াগড়ি খায়। বুকের মধ্যে একটা উত্তাল তরঙ্গ ছলকে ওঠে।

পাশের ঝোপ থেকে শেয়াল ডাকে। খোয়াড়ের হাঁস মুরগীগুলো সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত চিৎকার করে ডানা ঝাপটাতে থাকে। লালুর ছোটভাই ভুলু 'হাই-হুউস-হা-হা-' আওয়াজ করে শেয়াল তাড়াতে লাঠি নিয়ে বের হয়। দু'জনকে ঝুপসি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কি হইছে স্যাভাই?'

'মোগো জমিনের পাহা ধান আর নয়া চর জোতদারের মাইষ্যেরা হাব্বের কালে দেইক্যা গ্যাছে। ওইহানে খাড়াইয়া পরামিশ করছে, 'সব কাইররা নেবে।' মুই কাশ খ্যাতে পলাইয়া হুনছি।'

তিন জনে স্থির। জ্যোৎস্নায় গাছের ছায়া হাওয়ায় কাঁপে। এমনি এক রাতে সর্বনাশা পদ্মা ওদের বাড়ি-ঘর, জমি কেড়ে নিয়েছে সেই ভাঙন থেকেই ওরা প্রায় নিঃস্ব-সর্বহারা। এখন দিন ফিরছে, অথচ ওরা ধরে রাখতে পারছে না। এ দুঃখে বুক ফেটে যেতে চায়। এক সময় মনের মধ্যে জন্ম নেয় নতুন শিকড়। রক্ত চনমন করে ওঠে। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে বুক ফুলে যায়। জীবন থাকতে কিছুতেই নয়াচর জোতদারকে ছেড়ে দেবে না।

নতুন চরে অন্যান্য যাদের জমি আছে তাদের খবর দিতে তিনজনে তিনদিকে ছুটে চলে।

সময় বয়ে যায়। চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ম্লান হচ্ছে জ্যোৎস্নার মোলায়েমতা। বাজান, লালু ও ভুলু আবার এসে বাড়ির উঠোনে মিলিত হয়। বুকের মধ্যে কেমন এক ধরনের হিম-শীতলতা। কেউ ওদের ডাকে সাড়া দেয়নি। চরাঞ্চলের গ্রামে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব বেশ। গ্রাম ঘুরে সকলকে অনুরোধ করেছে। কারো কারো হাত পা ধরে কেঁদেও ফেলেছে। কিন্তু জমিতে অংশিদার থাকলেও ভয়ে কেউ প্রতিরোধ করতে সাহস পাচ্ছে না। দলীয় কারণে

প্রশাসনও জোতদারের পক্ষে। তাই গুম খুন ও ভিটেমাটি থেকে উৎখাতের আতঙ্কে সাধারণ মানুষের মন পাষাণ হয়ে গেছে।

গেল সন খরায় ভাতের অভাবে বোনটা মারা গেছে। বর্ষায় ভিজে কাজ করতে গিয়ে মা অসুখে ভুগে সারা বছর বিছানায়। সুদের টাকায় লাগানো বর্গা জমি, সময় মত তা পরিশোধ করতে না পারলে মহাজন ভিটে মাটি নিলামে উঠাবে। আধ পেটা খেয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে

সল বুনেছে। গরু-মোষ পাখির অত্যাচারের জন্য তা পাহারা দিয়েছে।—এসব ভাবতে দারুণ কান্ডে লালুর কান্না পেয়ে যায়। ভুলুর বুকের মধ্যে কেমন এক ধরনের ধুকপুকানি। বাজান

চোয়াল শক্ত করে দৃঢ় কণ্ঠে বললো, 'পরানে রক্ত থাহা পর্যন্ত জোতদাররে জমিনে ঘিসতে দিমুনা। মোরা তিন বাপ বেটাই রুখমু ল দিহি তোরা !'

ভুলু দ্রুত গিয়ে ঘরের মাচায় লুকানো ট্যাডা, শড়কি ও ধারালো রামদা বের করে নিয়ে আসে। রুগ্ন মা হাতবাড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ওদের থামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনজনে ছায়া সঙ্গী করে আলের উপর দিয়ে এগিয়ে চলে। মধ্যরাতের শেষে দূরগ্রাম থেকে কুকুরের অশুভ কান্নাধ্বনি ভেসে আসে।

বুকের মধ্যে ঝড়। হাঁটু জল পেরিয়ে নতুন চরে পা রাখে। অনুভব করে, আহঃ কী আরাম। মাটিতে সোদা গন্ধ। পদ্মার পলি জমে নতুন চরের কাজল মাটি এখন সব জায়গায় শক্ত হয়নি। নরম ভেজা মাটির স্তরের নীচে কোথাও কোথাও লুকানো চোর কাদা থাকা অসম্ভবের কিছু নয়। তাই খুব সাবধানে পা ফেলে কাশবনের আড়ালে অপেক্ষায় থাকে। মাথার ওপর দক্ষিণা হাওয়ায় ঝির ঝির কাশ ফুল দোল খায়। পাশের জমি থেকে পাকা ধানের মৌ মৌ ঘ্রাণ ভেসে আসে। মোলায়েম হাওয়ায় উত্তেজিত ঘর্মাক্ত শরীর যেন জুড়িয়ে যেতে চায়। তবুও বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটানো থামেনা। বিস্তীর্ণ চরের সফেদ ফালু ফকফক করে। মুক্তোর দানার মত চাঁদের ছায়ায় ঢেউ ভেঙে বইছে পদ্মা। নতুন চর আর পদ্মার অদ্ভুত দ্যুতিময় ধূসর আভায় বিপদ আসছে যেন চুপি সাড়ে।

আচমকা সর সর পানি কাটার শব্দ উত্তর দিক থেকে ভেসে আসে। কানখাড়া করে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকায়। দ্রুত নয়া চরের পানে ছুটে আসছে ছিপ নৌকো। ধল পহরের চাঁদের আলোয় ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়, দু'জনে খোল আর কাশ বাজাতে থাকায়, অদ্ভুত নৃত্যের তালে তালে দুলছে মাথার ঝাকড়া চুলে লাল ফেটি বাঁধা ও শক্ত হাতে লাঠি ধরা এক দঙ্গল লাঠিয়াল। মুখে তাদের উত্তেজিত রব, হেঃএ··· হেঃএ··· হেএ··· এ··· এ···! সকলের সামনে সাদা পোষাক ও টুপি মাথায় জোতদার উৎফুল্লে হাসছে। যেন প্রসন্ন পবিত্র মানব, এক্ষুনি নতুন চরে আবির্ভূত হয়ে হাতে ধরা দখলের লাল নিশান উড়াবেন।

ওরা তিনজন একটুও ভড়কায় না। কাশবন থেকে বেরিয়ে আসে। পাশাপাশি তিনটে ছায়া ছড়িয়ে সমগ্র চর জুড়ে যায়। হাতের চকচকে ধারালো অস্ত্রগুলো চাঁদের আলোয় ভয়ঙ্কর হাতছানিতে ঝল্‌কে ওঠে।

নৌকা ভিড়িয়ে হৈ হুল্লোড় করে লাঠিয়ালরা দৌড়ে আসতে থাকে। লালুর বাবা গদাই মিয়া মুখে বার বার হাতের তালু ঠেকিয়ে 'আঃ- আঃ-আঃ-আওয়াজ করে বজ্র কণ্ঠে গর্জে ওঠে, সামাল! সামাল! সা-ব-ধা-ন! আর এক পাও আউগাইবেন না জোতদার সাব। এই নয়া চর আমাগো। পাশের জমিনে ফসল বুনছি মোরা। আপনে ফিইরা যান। সামাল, সামাল, সা-ব-ধা-ন - - -!

ওদের প্রতিরোধ দেখে সকলে চমকে ওঠে। থমকে দাঁড়ায়। জোতদারের অট্টহাসি শোনা যায়। চিৎকার করে বলে, 'তোগো দুঃসাহস দেইখা অবাক হই আমি। পাগলামি করিস না গদাই, সইররা যা। নইলে খুন হইয়া যাবি।'

ভুলু ওর হাতের সড়কিখানা একটু নামিয়ে লাঠিয়াল সর্দারের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলে 'মোগো হক্কলের জমি জোতদার অন্যায়ভাবে কাইররা নিতাছে। তোমরা ক্যান তার হইয়া মোগো মারতে আইছো কালু চাচা!'

কেউ ভুলুর কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না। ওকে উপেক্ষা করে দৌড়ে আরও এক ধাপ সামনে

এগোয়। মারাত্মক কিছু একটু এক্ষুনি ঘটে যেতে পারে। ওরা তিন বাপ বেটায় দুর্দান্ত বেগে রুখে দাঁড়ায়। ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে ওরাও মেতে ওঠে। কেবল উভয় পক্ষের 'হু-হা-' আর দুর্ধর্ষ শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়।

জোতদার নরম কাদায় দখলের লাল নিশান পুঁততে গিয়ে খেয়াল হয়, আস্তে আস্তে নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। উঠতে চেষ্টা করে পারেনা। বরং আরও দেবে যায়। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে চিৎকার করে। ব্যাপারটা একজন লাঠিয়ালের চোখে পড়ে। গিয়ে টেনে তুলতে চেষ্টা করে, কিন্তু চোরকাদা তাকেও টেনে নেয়।

একজনকে দাবিয়ে অন্যজন বাঁচার জন্যে উঠতে চেষ্টা করায় চোরকাদা থেকে কেউই উঠতে পারছে না। তাদের ভয়ার্ত আর্ত চিৎকারে সকলের হাতের লাঠি যায় থেমে। অসহায় ব্যাপারটা দেখে লালু তাদের বাঁচাতে দৌড়ে যেতে চায়। মুহূর্তে কালু সর্দার ওকে টেনে ধরে। বললো, যাসনে লালু, সময় শেষ। এখন আর ওদের কারো বাঁচানোর সাধ্য নেই, যে যাবে সে নিজেই মরবে। দ্যাখ এরেই কয় সময়ের বিচার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চোরকাদার রাক্ষসী গ্রাসে জোতদার চির দিনের মত হারিয়ে যায়। নতুন চরের নরম বালু কাদার ওপর কেবল পড়ে থাকে তাঁর শাদা টুপিটা।